বুধন ম্যান্ডেলা ও অন্যান্য

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭০

শব্দগ্রন্থন : পাইকা ফটোসেটার্স
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২বি, হরমোহন ঘোষ লেন,
কলকাতা-৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য
পরলোকগত প্রখ্যাত চিকিৎসক
ডাঃ নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং
তাঁর সহধর্মিণী
আমার আদরের ছোটমা
শ্রীমতী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে
(ইনি এখনো আমাকে ঘিরে রেখেছেন স্নেহে, মমতায)

সূচীপত্র

বুধন ম্যান্ডেলা
এবং অন্যান্য

প্রার্থনা

পাহাড়ের উপরে ছোট্ট মন্দির। সামনে ল্যাটেরাইট দিয়ে বাঁধানো চাতাল। পঁচিশ ত্রিশজন লোক সেখানে বসতে পারে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে মন্দিরের পাশে সমতল জায়গাটায় মেলা বসে, আশেপাশের পাঁচ-দশটা গ্রামের লোক এসে রঙিন ফিতে, প্লাসটিকের বালতি মগ বাটি কেনে, লাড্ডু ঘুগনি আর পাঁপড়ভাজা খায়, তারপর সর্বমঙ্গলার মন্দিরে পুজো দিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরে।

মন্দিরের চাতালে বসে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে চোখে পড়ে শহরটা। শহর না বলে অবশ্য গোটাকয়েক পাকাবাড়ির সমষ্টি বলাই ভাল। লাইব্রেরি, কলেজ, সিনেমা হল কিছুই নেই। বিদ্যুৎ আছে মাত্র পনেরো কুড়িটা বাড়িতে। রাত্তিরে পাহাড়ের ওপর থেকে তাকালে বেশ লাগে, চারদিকের অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে যেন একটুকরো আলোর দ্বীপ। কাছাকাছির মধ্যে ওই শহরই একমাত্র জনপদ। নিকটবর্তী রেলস্টেশন মোটরে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা। সেই স্টেশনে নেমেও অনেক ভক্ত গাড়ি ভাড়া করে সর্বমঙ্গলার পুজো দিতে আসে। দেবীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়েছে ভক্তদের মুখে মুখে।

পাহাড়ের গা বেয়ে যে রাস্তা ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে সেই রাস্তায় হেঁটে আসছিলেন বামপ্রকাশ। হাতে একটা চটের থলেতে আটা, অড়হর ডাল, আলু আব মোমবাতি। খাবার যা ছিল তা ফুরিয়ে গিয়েছে গতকাল রাত্তিবে, আজ খুব ভোরে উঠে তিনি শহরে গিয়েছিলেন দরকারি জিনিসপত্র আনতে। মোহন পাঠক, শ্যামসুন্দর লাল, প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার অযোধ্যাজীবন প্রসাদ সবাই রাগারাগি করে—আপনি কেন কষ্ট করে এতদূর আসেন প্রকাশবাবা? আমরাই তো ফি হপ্তায় আনাজ আর অন্য সব জিনিস আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারি—

রামপ্রকাশ প্রত্যেকবারই হেসে বলেন—যখন খুব বুড়ো হয়ে পড়ব, আর পাহাড় থেকে নামতে পারব না, তখন তোমরা দিয়ে এসো। একেবারে চলাফেরা না করলে শরীর জবাব দেবে যে! নাকি আমি যে আসি সেটা তোমাদের ভাল লাগে না?

কী বলেন প্রকাশবাবা! সীয়ারাম, সীয়ারাম। বসুন, দুধ-জিলিপি খান—

ঘুঁটের মতো আকারের গোটাকুড়ি জিলিপি আর সের দেড়েক দুধ অনায়াসে খেয়ে ফেলেন রামপ্রকাশ, তারপর হাতের ব্যাগটা নিয়ে মন্দিরের পথে রওনা হন। রাস্তায় কত লোক তাঁকে প্রণাম করে, কত লোক কুশল জিজ্ঞাসা করে, কত লোক মন্দির অবধি ব্যাগটা বয়ে দিয়ে আসতে চায়। তিনি কাউকে হেসে আশীর্বাদ করেন, কাউকে মিষ্টি কথায় বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করেন, কাউকে মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

মন্দিরের পাশে একটা ছোট ঘরে রামপ্রকাশ থাকেন। পাহাড়ের ওপর পৌঁছে শেকল খুলে ঘরে ঢুকলেন রামপ্রকাশ। তালা দিয়ে যাবার প্রয়োজন হয় না। প্রথমত, তাঁর ঘরে নেবার মত বিশেষ কিছু নেই। একখানা কাঁসার ঘটি, একখানা থালা। একপাশে মাদুরের ওপর পাতা পুরনো বিছানা। মাটির কুঁজো একটা, আর একটা ভাঙা হাতপাখা। চোরের এতখানি চড়াই ভাঙবার পরিশ্রম পোষাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রকাশবাবা সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা প্রায়-অলৌকিক ভীতি ও সম্ভ্রম রয়েছে। চোরেরাও তো মানুষ, রামপ্রকাশের ঘরে চুরি করতে আসার ব্যাপারটা সম্ভবত তাদের মনে জাগেই না।

ব্যাগটা ঘরের কোণে রেখে কুঁজো থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে খেলেন রামপ্রকাশ। মন্দির থেকে কিছুদূর নামলেই বনের মধ্যে একটা সুন্দর ঝরনা আছে। তার জল ভারি মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। সূর্যোদয়ের আগেই সেই ঝরনায় গিয়ে স্নান সেরে নেন রামপ্রকাশ, তারপর আসবার সময় এককুঁজো পানীয় জল নিয়ে আসেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে অবগাহন স্নানে আশ্চর্য আনন্দ, সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ পবিত্রতায় ভরে ওঠে। সদ্য জেগে ওঠা পাখির দল চারদিকে গাছের ডালে কিচমিচ করে, অনেকে মাটিতে নেমে জলের ধারে এসে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। আজকাল কাপড়ের প্রান্তে কিছু গম বা চালের দানা বেঁধে নিয়ে যান, মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে স্নান করতে নামেন। পাখিরা মহানন্দে কলরব করতে করতে খায়, মাঝে মাঝে মুখ তুলে স্নানরত রামপ্রকাশকে দেখে। জীবনের যাবতীয় কোলাহল এবং আবর্ত থেকে দূরে সেই স্থানটি এক সুনিবিড় শান্তিতে পূর্ণ হয়ে থাকে। আজ মনটা বিশেষ ভাল আছে। ভোরে স্নান করবার জন্য জলে নামবার আগে কী ভেবে গমের দানা ছড়িয়ে না দিয়ে হাতে নিয়ে সামনে বাড়িয়ে ধরলেন। পাখির দল দিব্যি এসে তাঁর হাত থেকে খাবার খেয়ে গেল।

কী আনন্দ! তার মানে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে অনেকখানি একাত্ম হতে পেরেছেন। যেমন একটি গাছ, একটি ঘাসফুল কিম্বা একটি শিলাখণ্ড। পাখিরা তাঁকে আর প্রকৃতির থেকে আলাদা কিছু ভেবে ভয় পেয়ে দূরে সরে যাচ্ছে না। মানবজন্মের এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কি হতে পারে? সকাল থেকেই মনটা এজন্য বেশ ভাল আছে।

এবেলা আর কোনো রান্নাবান্নার ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। একটা পাকা বেল আছে, দুটো শশা, শাঁক আলু, কিছু দুধ আছে জ্বাল দেওয়া। পাঠকের দোকানে যা খেয়েছেন এখন বেলা দুটো অবধি অনায়াসে চলে যাবে। বয়েস বাড়বার জন্যই হোক, বা সংযম অভ্যাস করবার জন্যেই হোক—আজকাল ক্ষুধার তাগিদ কখনো অনুভব করেন না। ইচ্ছে হলে প্রচুর খেতে পারেন, যেমন আজ সকালে, আবার ইচ্ছে না হলে দু-তিনদিন আহার গ্রহণ করেন না।

বাইরে বেরিয়ে এসে দিগন্তের দিকে তাকালেন রামপ্রকাশ। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পাথর মাটি তেতে উঠেছে, তাপতরঙ্গ কাঁপছে বায়ুমণ্ডলে। নিচে শহরের বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্য কিছু বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড় থেকে নেমে পথটা শহরের মধ্যে দিয়ে রেল স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছে। মন্দিরের চাতালে বসে সামনের দিকে তাকালে দৃশ্যমান জগতের বিপুল ব্যাপ্তি হৃদয়ের গভীরে অসীম শান্তির প্রভাব বিস্তার করে। বিকেলের দিকটায় রামপ্রকাশ চুপ করে এখানে বসে থাকেন। পশ্চিম দিগন্ত ক্রমে লাল হয়ে ওঠে, সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে গ্রাস করে পরিচিত পৃথিবীকে। কত বয়েস হল তাঁর? ষাট? সত্তর? সেভাবে কখনও বয়েসের হিসেব রাখেননি। উত্তর ভারতে হিমালয়ের পায়ের কাছে ছোট্ট এক গ্রামে জন্ম হয়েছিল, সেসব কথা এখন আর ভাল করে মনে পড়ে না। বাবা-মা মারা গেলেন জ্ঞান হবার আগেই। তারপর থেকে ত্রিশ বছর কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়িয়েছেন পথে পথে, মুটেগিরি করেছেন, বড়লোকের বাড়ি চাকরের কাজ করেছেন। ভাগ্যের চাকা ঘুরল হরিদ্বারে এসে। এক সাধুর আখড়ায় আশ্রয় পেলেন রামপ্রকাশ। আনুষ্ঠানিকভাবে সাধুর কাছে কখনও দীক্ষা নেননি, প্রচলিত অর্থে পূজা-অর্চনাও করেননি কখনো। কিন্তু সংসারেও প্রবেশ করেননি। সাধু মারা যাবার পর মোহান্তের পদ নিয়ে প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া বাধল। বিরক্ত হয়ে রামপ্রকাশ আবার ভেসে পড়লেন চলমান জগতের স্রোতে। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায়

একদিন বিকেলে এসে পৌঁছলেন এই মন্দিরের দরজায়। তখন এখানে পূজা করতেন গোপাল মিশ্র। সন্ধ্যারতি সেরে বাইরে এসে চাতালে রামপ্রকাশকে বসে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কে? কে ওখানে?

—আজ্ঞে আমি।

পৃথিবীতে সবাই তো 'আমি'। তুমি তার মধ্যে কোনজন?

—আমার নাম রামপ্রকাশ। আমার কোনো ঠিকানা নেই, আমি ঘুরে বেড়াই।

গোপাল মিশ্র এক মুহূর্ত কী ভাবলেন, তারপর বললেন—চাপাটি বানাতে পারো?

—আজ্ঞে, পারি—

—বেশ। ওই ওপাশের ঘরে আটা, বাসনপত্র সব আছে, নিয়ে এসো। মন্দিরের পেছনে কাঠ আছে, তাও নিয়ে এসো। এইখানটায় বসে চাপাটি বানাও। সবজি করতে হবে না, ওবেলার ক্ষীর আছে, তাই দিয়ে খাবো।

পট্‌পট্‌ শব্দ করে সরু সরু ডালপালা পুড়ছে, রামপ্রকাশ দুহাতে অভ্যস্ত দ্রুততায় চাপাটি গড়ে তাওয়ায় দিচ্ছেন, এমন সময় আগুনের ওপাশ থেকে গোপাল মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ব্রাহ্মণ?

একবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে সরলভাবে রামপ্রকাশ বললেন—জানি না।

—জানো না কী রকম? বাবা-মা কে ছিলেন জানো না?

—তাঁরা আমার খুব ছোটবেলাতে মারা গিয়েছিলেন। গ্রামে চেচক বেমারির মহামারী হয়েছিল। সরকারের ক্যাম্পে ছিলাম কয়েকমাস, তারপর রুটির ধান্দা করেছি আটবছর বয়েস থেকে। কেউ বলে দেয়নি আমি কী জাত—

—তুমি 'মানুষ' জাত।

ঠিক বুঝতে না পেরে বামপ্রকাশ বললেন—আজ্ঞে, কিছু বলছেন?

—বলছি যে, তুমি জাতে মানুষ। ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য কারো চামড়ায় লেখা থাকে না। কর্ম দিয়ে তার বিচার হয়। তখনও রামপ্রকাশ এর গুরুত্ব ঠিক ধরতে পারেননি, এখন পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারেন গোপাল মিশ্র কী বিরাট মানুষ ছিলেন। এসব দেশে জাতপাতের দ্বন্দ্ব বড় ভয়ানক, ঝগড়াঝাঁটি খুনোখুনি লেগেই আছে। গোপাল মিশ্র তার অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। পরদিনই সকালে নিজের হাতে একটা পৈতে বানিয়ে রামপ্রকাশের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আপত্তি কোরো না। এটা না থাকলে স্থানীয় লোক তোমাকে মানবে না। সব মূর্খের দল তো? সব অন্ধ। ঈশরের আরাধনা করবার অধিকার সবারই আছে, সেটা এরা বোঝে না।

দশবছর গোপাল মিশ্রর সঙ্গে ছিলেন রামপ্রকাশ। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে গোপাল মিশ্র ঝরনার ধারে চলে যেতেন, স্নান সেরে বনের মধ্যে কোনো নির্জন জায়গায় আপনমনে ধ্যান করতেন বসে। একদিন সন্ধ্যেবেলা আগুনের ধারে গল্প করতে করতে তিনি হেসে বলেছিলেন—আমার সব ভড়ং, বুঝলে? আমি কোনো মন্ত্রও জানি না, নিয়মও জানি না। জঙ্গলের মধ্যে চোখ বুঁজে বসে থাকি, মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করি, সবাইকে ভালবাসবার চেষ্টা করি। দুবেলা ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বলি—মা, খাও। খেয়ে প্রসাদ করে দাও। তাতে কিছু হয় কি হয় না কে জানে, তবে চলে তো যাচ্ছে।

শহরের লোকজন আর ভক্তদের দলও দেখেছিল এতদিনে পূজারী ঠাকুর একজন চেলা জোগাড় করেছেন। দশবছরে রামপ্রকাশের অস্তিত্বও তারা সহজভাবেই মেনে

নিয়েছিল। মন্দিরের একটা ট্রাস্টি বোর্ড আছে শহরে। সে কমিটিও জানত গোপাল মিশ্রের পর রামপ্রকাশই পূজার ভার নেবেন। গোপাল ঠাকুরের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অগ্রাহ্য করবে কে! তাছাড়া নিজের সুন্দর স্বভাবের গুণে রামপ্রকাশ সবারই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

দশবছরের মাথায় গোপাল মিশ্র একদিন ঝরনায় গিয়ে আর ফিরে এলেন না। পূজার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রামপ্রকাশ গুরুকে খুঁজতে বেরুলেন। বেলা দশটার সময় একটা বিশাল অর্জুন গাছের নিচে আবিষ্কার করলেন গোপাল মিশ্রের প্রাণহীন দেহ। পদ্মাসনে ধ্যানরত অবস্থাতেই কখন তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে কে জানে।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম আরতির প্রদীপ হাতে তুলে নিলেন রামপ্রকাশ।

কতবছর কেটে গেল তারপর। তাঁর জীবনে কোনো অপূর্ণতা নেই, এগিয়ে যাবার ব্যস্ততা নেই, পিছিয়ে পড়ার ভয় নেই, নির্জনতার ভেতর দিয়ে এক গভীর উপলব্ধি তাঁকে তৃপ্ত রেখেছে।

এক একদিন সন্ধ্যের পর শহর থেকে দু-একজন মানুষ আসে। কেউ মাদুলি চায়, কেউ ওষুধ চায়, কেউ বা মামলায় জিততে চায়। রামপ্রকাশ বিনীতভাবে জানান—তিনি এসব কিছু জানেন না। তারা দুঃখিত হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু বিশ্বাস করে না।

একমুঠো গমের দানা নিয়ে মন্দিরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন রামপ্রকাশ। কয়েকটা বড় বড় শাল মহুয়া পিয়াশাল গাছ জড়াজড়ি করে উঠেছে, তলায় নানান বুনো লতাপাতার ঝোপ। একহাতে পাতালতা সরিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিলেন। গোল গোল পাতা আর একটুকরো ছেঁড়া কম্বল দিয়ে বানানো বাসায় উদ্‌গ্রীব মুখ করে বসে আছে একটা বদরি পাখি। গায়ে তার হলুদ, নীল, খয়েরি রঙের পালক। চার-পাঁচদিন আগে ঝরনা থেকে ফেরবার পথে জঙ্গলের মধ্যে একে পেয়েছেন রামপ্রকাশ। ডানায় কিভাবে চোট লেগে ওড়ার ক্ষমতা নেই পাখিটার। সঙ্গে করে মন্দিরে নিয়ে এসে ঝোপের মধ্যে বাসা বানিয়ে দিয়েছেন, চুন-হলুদ মিশিয়ে ডানার গোড়ায় প্রলেপ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সম্ভবত পাখিটা আর কোনোদিনই উড়তে পারবে না। ডানার হাড় বেকায়দায় ভেঙে গিয়েছে, চুন-হলুদে কিছু হবার নয়। পাতা সরাবার আওয়াজে ভয় পেয়ে পাখিটা বাসা থেকে নেমে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়বার উদ্যোগ করছিল। রামপ্রকাশ দানাসুদ্ধু হাত বাড়িয়ে আদর করে ডাকলেন—আয়, ভয় নেই, আয়—

মন্দিরের ওপাশে একটা গাড়ি থামবার শব্দ হল। তারপরেই দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ।

যাঃ, এখন আবার কারা এল? শহর থেকে কেউ নয়, কারণ তারা জানে বিকেলের আগে মন্দিরের দরজা খুলবে না, পুজোও দেওয়া যাবে না। বাইরের কোনো যাত্রী হলে তাঁদের ফেরাতে পারবেন না রামপ্রকাশ, কতদূর থেকে হয়তো এসেছে পুজো দেবে বলে; একটু অসুবিধে হলে আর কী করা যাবে?

পায়ে চলা সুঁড়িপথ বেয়ে মন্দিরের বাঁদিক দিয়ে চাতালের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

একটা গাঢ় নীল রঙের মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। তার থেকে নেমেছে দুজন লোক, একজন গাড়ির ভেতরেই চালকের জায়গায় বসে আছে। কেউই রামপ্রকাশের চেনা লোক নয় এবং—

এবং এরা কেউই দেবীদর্শনে আগ্রহী ভক্ত যাত্রী নয়।

যে দুজন গাড়ি থেকে নেমেছে তাদের চেহারার বৈপরীত্য প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন খুব লম্বা, অপরজন নিতান্তই বেঁটে। দুজনেরই চোখে কালো রঙের রোদ চশমা। লম্বা লোকটি গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। তার ভঙ্গিতে এক ধরনের উদ্ধত স্পর্ধা রয়েছে। বেঁটে লোকটি ছটফটে, বোধহয় তার কোনো স্নায়ুর অসুখ আছে। সে অনবরত হাত মুঠো করছে আর খুলছে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিচ্ছে। গাড়িতে যে সঙ্গী বসে আছে তার চোখে চশমা নেই। ছোট ছোট ধূর্ত চোখে সে রামপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা অসম্ভব মোটা।

লম্বা লোকটা দু'আঙুলের টুসকিতে সিগারেটের দগ্ধাবশেষটুকু ছুঁড়ে ফেলল রামপ্রকাশের পায়ের কাছে। তারপর ভাঙা গলায় বলল, তুমি এখানকার পূজারী? এখানে পুজো করো?

রামপ্রকাশ কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই অসভ্য লোকগুলোর জন্য তিনি অসময়ে মন্দিরের দরজা খুলবেন না। লোকটা বড় বড় পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর গালে হঠাৎ ঠাস করে চড় মাড়ল।

মারের দাপটে মুখটা ওদিকে ঘুরে গেল রামপ্রকাশের। মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলেও মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন লোকগুলো কী চায়।

মুখের মধ্যে নোন্‌তা স্বাদ ভরে উঠছে, দাঁতে লেগে গাল কেটে গিয়েছে বোধহয়।

লোকটা রামপ্রকাশের চুল মুঠো করে এক ঝাঁকুনিতে তাঁর মুখ আকাশের দিকে উঁচু করে ধরল। বেঁটে লোকটাও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখ দ্রুত পিট্‌পিট করছে, শরীরের ভার অনবরত এক পা থেকে অপর পায়ে বদল করছে। তাব নিচেব ঠোঁট পুরু, ভেজা ভেজা।

এক হাতে চুল ধরে রেখে অন্য হাতে রামপ্রকাশের গালে আর একটা চড় মারল লোকটি।

শরীর কেমন যেন করছে, রামপ্রকাশ উবু হয়ে বসে পড়লেন। দুই গালের ভেতরেই কেটে গিয়েছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক করতেই কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে ঘাসের ওপর পড়ল।

বেঁটে লোকটা বলল—এ এমনি কথা বলবে না মনে হচ্ছে। একটু বানিয়ে দেব?

লম্বা সঙ্গী দাঁতে দাঁত চেপে বলল—দরকার নেই, এখুনি গান গাইতে শুরু করবে। দেখ্ না—

রামপ্রকাশের পাঁজরে একটা মাঝারি রকমের লাথি মেরে সে বলল—এই কুত্তা, মন্দিরের চাবি বের কর—

চোখ বুঁজলেন রামপ্রকাশ। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন তাহলে। এরা ডাকাত, দেবীর গায়ের অলঙ্কার চুরি করতে এসেছে। সহজে নিস্তার পাওয়া যাবে না এদের হাত থেকে। চাবি না দিলে এরা অত্যাচার করবে, মেরেও ফেলতে পারে। মৃত্যুকে অবশ্য তিনি বিশেষ ভয় পান না, যে আসক্তি ও পিছুটান মৃত্যুভয়ের জন্ম দেয় তার কোনোটাই তাঁর জীবনে নেই। কিন্তু সবাই তাঁকে বিশ্বাস করে, সম্মান করে। অত্যাচারের ভয়ে মন্দিরের চাবি দিয়ে দিলে সব লুঠ হয়ে যাবে। দেবীর গায়ে ত্রিশ ভরি সোনার গয়না আছে, প্রতিমার পেছনে লুকোনো কাঠের বাক্সে আরো অন্তত বিশ ভরি। তাছাড়া রুপোর বাসনপত্র তো আছেই। সব যাবে। কেউ যদি ভাবে এই চুরিতে তাঁরও যোগসাজস ছিল? ভাবতেই পারে, মানুষের

মনকে বিশ্বাস করা কঠিন।

তার চেয়েও বড় কথা—এতদিন ধরে তিনি এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন। এই দেবালয়ে, এই পর্বত শীর্ষে তাঁর অধিকার। হঠাৎ কতকগুলো দস্যু এসে তাঁর অধিকারের সীমানায় প্রবেশ করে লুঠতরাজ করে চলে যাবে? একথা ভাবতেও তাঁর অহঙ্কারে লাগছে।

কিন্তু কিছুই করার নেই। এরা পেশাদার দস্যু, এদের বিরুদ্ধে তিনি খালিহাতে একা কী করবেন?

বেঁটে লোকটা বলল—শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো ওস্তাদ, আমার হাতে দিলে এক মিনিটে চাবি বের করে দেবে—

রামপ্রকাশ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে মারের চোটে।

কিন্তু তার সঙ্গে ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক ক্রোধ জেগে উঠছে মনের মধ্যে। ক্রোধ এবং ঘৃণা।

রামপ্রকাশ বললেন—আমি চাবি দেব না।

দুই দস্যু অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। রামপ্রকাশ এবার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

ক্রমশ লম্বা লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠল। ডানপকেটে হাত ঢুকিয়ে সে একটা স্প্রিংয়ের ছুরি বের করে আনল। রাগে জড়িত গলায় সে বলল—হারামজাদা। শেষবারের মত বলছি, মন্দিরের দরজা খুলে দে—

রামপ্রকাশ অবিচলিত গলায় বললেন—ওটা রেখে দাও। ছুরি ধারালো জিনিস, হাত কেটে যেতে পারে—লম্বা লোকটা বোতাম টিপে ছুরি খুলে এগিয়ে আসতে গেল, রামপ্রকাশ অকস্মাৎ তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন—থামো! তোমাকে বললাম না ওটা রেখে দিতে?

লম্বা মানুষটি থমকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে যে বসে ছিল সেও কী ব্যাপার দেখতে পায়ে পায়ে এদিকে আসছে। বেঁটে সঙ্গী হাতের উলটোদিক দিয়ে কপাল মুছে নিল।

রামপ্রকাশের পায়ে জোর ফিরে এসেছে, মনে এক আশ্চর্য অনুভূতি। তিনি বুঝতে পেরেছেন ওরা আর আক্রমণ করবে না। কী করে বুঝেছেন তা তিনি বলতে পারবেন না, কিন্তু এটা ঠিক যে তিনি জিতে গিয়েছেন।

—ছুরি বন্ধ করো।

লোকটা ছুরির ফলা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

—তোমরা এসো আমার সঙ্গে। তিনজনেই এসো।

রামপ্রকাশ মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার ঘরে বাঁশের আড়ার ওপরে পাতা চটের তলায় লুকিয়ে রাখা চাবি বের করে মন্দিরের দরজা খুললেন। পেছনে লোক তিনজন নির্বাক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এসো এদিকে, জুতো খুলে এসো—তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করো—

বলা মাত্রই মোটা আর লম্বা দুজন নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। বেঁটে লোকটা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার ছোট ছোট গোল চোখে দুই প্রবল বিরোধী শক্তির যুদ্ধ চলছে। তিরতির করে কাঁপছে মুখের মাংসপেশী। তার দিকে চেয়ে রামপ্রকাশ বললেন—কী হল? দেরি করছো কেন?

কে যেন ঘাড় ধরে বেঁটে লোকটাকে নিচু করে দিল। সে জুতো খুলে পাশে সরিয়ে রাখল বটে, কিন্তু তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে রুদ্ধ আবেগে। প্রবলতর কোনো এক শক্তি তার পশুভাবকে কিছুতেই প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না। উপুড় হয়ে জুতো খোলবার সময়ে তার মুখ দিয়ে নাল গড়িয়ে মাটিতে পড়ল—তার শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল হয়ে গিয়েছে।

গর্ভগৃহের খোলা দরজার সামনে পাশাপাশি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তারা সর্বমঙ্গলার মূর্তিকে প্রণাম করল। কী ভেবে রামপ্রকাশ ভেতর থেকে কোশায় করে চরণামৃত এনে তাদের হাতে দিলেন। আর একখানা করে বাতাসা।

—নাও, খেয়ে ফেলো মন পবিত্র হবে।

লোকগুলো চরণামৃত খেয়ে বাধ্য ছেলের মত বাতাসা মুখে দিল।

—যাও, এবার গাড়ি চালিয়ে এখান থেকে চলে যাও। আর কখনো এসো না, বুঝলে? এলে এইরকম দশা হবে। এই মন্দিরে চুরি করার ক্ষমতা কারো নেই। যাও—

তারা তিনজন জুতো পরল, তারপর কোনো কথা না বলে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে এলে রামপ্রকাশ ক্লান্তভাবে চত্বরের ওপর বসে পড়লেন। এটা কী হল? কিভাবে ঘটনাটা তিনি ঘটালেন? তিনি মন্ত্রতন্ত্র যাদুবিদ্যা জানেন না, কাউকে সম্মোহনও করতে পারেন না। শুধু নিজের আসন্ন বিপদের কথা ভুলে ভয়ানক রেগে গিয়ে দস্যুদের তিনি একটা আদেশ করেছিলেন। সেটা ওরা মানল কেন? না মানলেও তো পারত?

তাহলে — তাহলে কি—

দেখাই যাক পরীক্ষা করে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে চত্বর পেরিয়ে মন্দিরের পেছনে জঙ্গলে হাজির হলেন। বদরি পাখিটা সব দানা খুঁটে খেয়ে আপাতত চুপ করে বসে আছে। সযত্নে পাখিটাকে ধরে মন্দিরের সামনের দিকে পাহাড়ের ধারে এলেন রামপ্রকাশ, তারপর দুহাতে সেটাকে ধরে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

ডানা খোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে একটুকরো পাথরের মত পাখিটা নিচের সমতলভূমির দিকে পড়ে যেতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে রামপ্রকাশ চিৎকার করে বললেন—পারবি! ডানা মেল, ঠিক উড়তে পারবি—

পড়তে পড়তে হঠাৎই ডানা খুলে গেল পাখিটার। কয়েকবার ডানা ঝাপটে শূন্যে একটি নিখুঁত উপবৃত্ত রচনা করে সেটা দিগন্তের দিকে উড়ে চলে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ। ধনেশ পাখি কর্কশ স্বরে ডাকছে পাহাড়ের ঢালুর অরণ্যে। সূর্য মাথার ওপরে আকাশের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করে পশ্চিমের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। রামপ্রকাশ মন্দিরের চাতালে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইলেন। অযাচিত আশ্চর্য এই ক্ষমতা তাঁকে যুগপৎ অভিভূত ও ক্লান্ত করেছে। যে কোনো ক্ষমতা দায়িত্ব এবং অস্থিরতা নিয়ে আসে।

সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্ত প্রায় স্পর্শ করেছে তখন হঠাৎ একটা কথা মনে হতে জড়তা ত্যাগ করে রামপ্রকাশ সোজা হয়ে বসলেন। ইস, অনেক সময় অকারণে নষ্ট করে ফেলেছেন।

যদি তাঁর এই ক্ষমতা নিতান্ত সাময়িক হয়? যদি কাল সকালে—কিম্বা আজ রাত্তিরেই—তিনি আবার নিতান্ত সাধারণ মানুষ হয়ে যান? বড্ড দেরি হয়ে গেল না তো?

আর একবার মাত্র তিনি তাঁর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, তারপর একেবারে ভুলে

যাবেন এর কথা। কাউকে তিনি জানাবেন না এই ঘটনা। ক্ষমতা বড় বালাই।

পাহাড়ের চূড়ায় পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন রামপ্রকাশ। পায়ের তলায় বিশাল উপত্যকা। দিনাবসানে আবহাওয়ায় জমে ওঠা অস্বচ্ছ বাষ্পের পর্দা শহরকে আড়াল করেছে। মাথার ওপরে বাসামুখী পাখিদের উড়ন্ত ঝাঁক। স্তব্ধতা।

শান্তি — শান্তি — অনাবিল শান্তি।

সেই ব্যাপ্ত চরাচরের দিকে তাকিয়ে রামপ্রকাশ উচ্চারণ করলেন—তোমরা সবাই ভাল থাকো। সবার মঙ্গল হোক। সব যুদ্ধ থেমে যাক, সব রক্তপাত। সবার দুঃখ দূর হোক, পৃথিবীতে নেমে আসুক শান্তি॥

রসনামঙ্গল

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে ভুবন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা। লাঠি হাতে গলায় চাদর ঝুলিয়ে সরকারদের বৈঠকখানায় দাবা খেলতে চলেছেন। আমাকে দেখে বললেন—'এই যে পল্টু, ভালই হল দেখা হয়ে। সন্ধের দিকে একবার আমার বাড়ি যাস তো, তোর জেঠিমা ডেকেছেন—

—আমায় ডেকেছেন জেঠিমা?

—হ্যাঁ রে বাপু। কী একটা দরকারের কথাও যেন বলে দিয়েছিল, সেটা এখন আর মনে পড়ছে না। যা হোক, তুই একবার যাস—

ফুটবল খেলা সেরে হাতমুখ ধুয়ে ভুবন জ্যাঠামশায়ের বাড়ি গেলাম। জেঠিমা আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন—'এই যে তুই এসেছিস। সব শুনেছিস তো কর্তার কাছে?

—আজ্ঞে না জেঠিমা। উনি শুধু বললেন আপনি ডেকেছেন—

—কেন তা বলেনি?

—না তো। বললেন কী একটা দরকারের কথা ছিল, কিন্তু মনে করতে পারছেন না।

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে জেঠিমা বললেন—যাক, তাহলে সব ঠিকই আছে। তাই ভাবি—কর্তাকে বলতে না বলতেই তোকে গিয়ে সব খবর দিয়েছেন মনে করে—এ কর্তার হল কী? শরীর খারাপ করল না তো? তা দেখছি ঠিকই আছে, আদ্দেক ভুলে গিয়েছেন—

—কী ব্যাপার জেঠিমা? কী হয়েছে?

—ভালই ব্যাপার বাবা। সামনের আষাঢ়ে মিনুর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। পাত্তর সেই আমতলার নিবারণ চাটুজ্যের বড় ছেলে। এই বুধবার তারা মিনুকে আশীর্বাদ করতে আসবে। দুপুরে আসছে, আশীর্বাদ করে খাওয়াদাওয়া সেরে বিকেলে যাবে। পাত্তরপক্ষ বলে কথা, আমাদের মানসম্মান রাখবার ভার তোরই ওপর বাবা পল্টু—

সে আবার কী! মিনুদির বিয়ে হচ্ছে খুব ভাল কথা, বাঁড়ুজ্যেরা খাওয়ায় ভাল, কিন্তু মানসম্মান রাখার দায় আমার ওপর কী রকম?

বললাম—আমায় কী করতে হবে বলুন, বন্ধুদের নিয়ে আদর-আপ্যায়ন বরং—

—না বাবা সে সব নয়। সেদিন মাংসটা তোকে রাঁধতে হবে বাবা। গেল শীতে চড়ুইভাতির দিন তুই যা মাংস রান্না করেছিলি, খেয়ে সারা গাঁয়ের লোক ধন্য ধন্য করেছিল। সেই রকমটা আর একবার করতে হচ্ছে বাবা—

জীবনে প্রথম খ্যাতির আস্বাদ পেয়ে—হোক সে খ্যাতি মাংস রান্নার—গৌরবে আমার বুক ফুলে উঠল। বললাম—এ আর বেশি কথা কী জেঠিমা? মিনুদির বিয়ে হবে, আমাদের তো কাজ করতে হবেই। ক-জনের জন্য রান্না জেঠিমা?

—পাত্তরপক্ষের লোক আসবে জনাতিরিশ। তার ওপর বাড়ির লোক, গাঁয়ের দু-চারজন মুরুব্বি—সবমিলিয়ে ষাটজন মত হবে। রামহরিকে বলা আছে, সে মেদিয়ার হাট থেকে দুটো পাঁঠা কিনে আনবে আগের দিন। মশলা বাটা, জোগান দেওয়া—সব লোক ঠিক করা আছে। তুই শুধু মনোযোগ দিয়ে রান্নাটা করবি—

—ঠিক আছে জেঠিমা। আমি সকাল ৯-টা নাগাদ চলে আসব। আপনি রামহরিদাকে বলবেন মাংসটা সাইজমাফিক টুকরো করে রাখতে।

বুধবার পাড়ার কোনও ছেলেমেয়েই ইস্কুলে গেল না। কোলকাতা থেকে অনেক দূরে বলেই বোধহয় আমাদের এখানে এখনো মানুষে মানুষে ভালবাসা বজায় আছে। নটা বাজার বেশ কিছু আগেই ভুবন জ্যাঠার বাড়ি হাজির হয়ে দেখলাম রৈ রৈ কাণ্ড বেধে গিয়েছে। বিরাট উঠোনের ওপর রোদ্দুর আড়াল করবার জন্য চট টাঙানো হয়েছে। মাটিতে বড় বড় দুটো উনুন খুঁড়ে তাতে কাঠ সাজানো হচ্ছে। ভুবন জ্যাঠার দশ-বারোজন প্রজা এসেছে কাজে সাহায্য করতে আর নেমন্তন্ন খেতে। প্রজা মানে এরা ভাগে জমি চাষ করে। কিন্তু জ্যাঠামশাই মানুষ ভাল, কক্ষণো অন্যায্য তাগাদা করেন না, ঝগড়াঝাঁটি করেন না। সেজন্য এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব সুন্দর। ওদিকে বৈঠকখানা ভরে গিয়েছে বুড়োমানুষদের ভিড়ে। ঘন ঘন কাঁচি সিগারেট চলছে। সবাই নানারকম পরামর্শ দিচ্ছে, ভুবন জ্যাঠা সবাইকে 'হ্যাঁ' বলছেন। একদিকে দুজন লোক বসে শিলে তাল তাল মশলা বাটছে।

আমি প্রথমে কিছুক্ষণ মাংস কাটার তদারক করলাম। তদারক করবার অবশ্য কিছুই ছিল না, কিন্তু আমি যে রান্নার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সেটা বোঝাবার জন্য মাংসের টুকরো মাঝারি রাখতে বললাম, মশলা যেন যথেষ্ট মিহি করে বাটা হয় সে বিষয়ে কর্মরত দুজনকে সতর্ক করে দিলাম। হাঁটুর ওপর ধুতিপরা খালি-গা দু-তিনজন চাষাভুষো মানুষ একটু দূরে আমার দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন অপরজনকে বলছে—এই দাদাবাবুকেই ডেইকে এনেচে রানবার জন্যি—

অপরজন বলছে—বয়েসডা কাঁচা মনে হতিচে না? পারপে তো?

—পারপে রে, পারপে। চলনবলন দ্যাখ না এলেম আছে—

গৌরবে স্ফীত বুকে আমি উনুনে বিশাল কড়াই চাপিয়ে মাংস কষবার উদ্যোগ করতে লাগলাম। একজন জোগানদারকে ডেকে বললাম—হাতের কাছে কাঠ তৈরি রাখবে, সবসময় সমান আঁচ না হলে রান্না খারাপ হয়ে যাবে। দেখি? না, অত মোটা নয়—মাঝারি কাঠ নাও, যাতে দিলেই জ্বলে ওঠে—

লোকটি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে কাঠ জড়ো করতে লাগল।

কষবার সময় অবশ্য একটু ঝামেলা উপস্থিত হল। চড়ুইভাতিতে বড়জোর পনেরো কি কুড়িজনের জন্য রান্না করেছি, ষাট-সত্তরজনের মাংস রাঁধবার অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। প্রায় শাবলের মত মোটা খুন্তি দুহাতে ধরে নাড়তে গিয়ে দু-একটুকরো মাংস কড়া থেকে ছিটকে আগুনে পড়ে গেল। জোগানদারটি বলল—এঃ হে বাবু, পইড়ে গেল—

গম্ভীরভাবে বললাম—পড়েনি, ইচ্ছে করে ফেলেছি। ওকে বলে ব্রহ্মার ভুজ্যি, রান্না শুরু করবার সময় ঠাকুরকে নিবেদন করতে হয়—

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা চাষী দুটির মধ্যে একজন তার সঙ্গীকে বলল—দেখলি তো? কী বলেছিলাম তোরে? এলেমদার লোক। কায়দা কর্ হাতের এমন এক মোচড় দেলে—ঠিক চার টুকরো গিয়ে আখায় পড়ল—

সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবছি পরবর্তী দুর্ঘটনাটা কোন দেবতার নামে উৎসর্গ করা যায়, এমন সময়ে জেঠিমা এসে বললেন—রান্না চড়িয়ে দিয়েছিস দেখছি। বেশ ভাল। তা, তোর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল পল্টু—

—কি কথা জেঠিমা? বলুন—

বলতে ভারি লজ্জা করছে, তুই আবার কী মনে করবি—

অবাক হয়ে বললাম—কী এমন কথা জেঠিমা?

—বাবা, পাত্তরপক্ষ যখন খেতে বসবে, তখন—ইয়ে, বলা হবে মাংস রান্না করেছে আমাদের মিনু, কেমন? মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে এসব একটু করতে হয়, বুঝলি না? রাগ করিস না বাবা তোরই তো দিদি—

শহীদদের মনোভাব কেমন হয় বুঝতে পারলাম। তারাও তো নিজের জন্য কিছু করে না। দেশ স্বাধীন হতে হতে সাধারণত তারা দেয়ালে ছবি হয়ে যায়। বললাম—তাতে কী জেঠিমা, তাই বলবেন—

জেঠিমা পাকা লোক কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মুখে মুখে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বড়ছেলে সুধাংশুকে বললেন বাড়ির এবং পাড়ার যত ছেলেপুলে এসেছে তাদের একজায়গায় করতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সুধাংশুদা গোটা সতেরো-আঠারো বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন। জেঠিমা হেঁকে বললেন—এই সব লাইন দিয়ে দাঁড়া—

প্রথমে জেঠিমা তাদের নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতার মাধ্যমে মূল বিষয়টি বোঝালেন, তারপর একে একে তাদের আলাদা করে তালিম দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে গেল। কেবল গোল বাধল পাঁচু হালদারের ছোট ছেলেকে নিয়ে। ঢিলে হাফপ্যান্ট কোমরের কাছে মুঠিয়ে ধরে নাক টানছিল আর বুঝতে না পারার দৃষ্টিতে ঘটনাবলীর ওপর নজর রাখছিল। সবশেষে জেঠিমা তার সামনে গিয়ে বললেন—এই কুচো, বল আজ মাংস কে রান্না করেছে?

ফোঁ করে নাক টেনে কুচো বলল—পল্টুদা।

জেঠিমার কামানগর্জন—না। রান্না করেছে মিনুদি। পাত্তরপক্ষ জিজ্ঞেস করলে তাই বলবি।

রন্ধনরত আমার দিকে নির্দেশ করে কুচো বলল—ওই যে পল্টুদা রাঁধছে।

—জানি, সে আমিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা বলবি না, বলবি মিনুদির রান্না।

কুচো মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

—ও মাথা হেলালে চলবে না। কে মাংস রেঁধেছে জিজ্ঞাসা করলে কী বলবি?

—মিথ্যে কথা বলব।

একমুহূর্তের জন্য জেঠিমার মুখখানা কেমন যেন দেখাল। তারপর সামলে নিয়ে তিনি বললেন—পাকামি করিস না। শুধু যা বলতে বলছি, তাই বলবি—

এদিকে আমি একমনে মাংস কষে চলেছি। চারদিকে গ্রাম্য মানুষদের একটা ভিড় তৈরি হয়েছে। তারা আমার রন্ধনপদ্ধতি সম্বন্ধে নানারকম সশ্রদ্ধ মন্তব্য করছে।

কঠিন কাজে হাত দিয়েছি সেটা বুঝলাম মাংসে জল দেবার পরে। ছ্যাঁক করে একটা

শব্দ হয়েই কড়া জুড়ে বুজবুঝ করে ফেনা উঠতে লাগল। হাতা দিয়ে যত কেটে ফেলে দিই, তাতে আরো ফেনা ওঠে। জলটাও বেশি দেওয়া হয়ে গেল কিনা কে জানে, ঝোলে কোনো রঙ ধরলো না। কড়াইয়ের প্রায় কানায় কানায় ভর্তি ফ্যাকফেকে ঝোল—আর তার মধ্যে প্রচুর ফেনা।

সাহস বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বোধহয় আমার মুখের ভাবে কিছু একটা ফুটে উঠে থাকবে। কারণ একটু পরেই দেখি কে একজন জেঠিমাকে ডেকে নিয়ে আসছে।

কড়ার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই তাঁর মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।—আমার মিনুর কী হবে বাবা পল্টু? ছেলের বাবা যে শুনেছি বড্ড খেতে ভালবাসে—

মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললাম—একটা উপায় আছে জেঠিমা।

জেঠিমা দৈববাণী শুনতে পাওয়ার মত মুখ করে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম—আপনি বরং নিমন্ত্রিতদের বলুন মাংসটা আমিই রেঁধেছি। তাহলে দোষ কেটে যাবে। ওদের সামনে রান্না গোলমাল করে ফেলার জন্য বকাবকিও করতে পারেন, আমি তাতে কিছু মনে করবো না।

জেঠিমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুঝলাম কথাটা মনে ধরেছে। পেছন ফিরে তিনি হাঁক দিলেন—সুধাংশু, ছেলেপুলেদের আবার ধরে নিয়ে আয়—

বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে পাকড়াও করে আনবার ফাঁকে সমবেত জনসাধারণকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য জেঠিমা যেই 'ওহে বাবা সকল' বলে শুরু করতে গিয়েছেন, অমনি চালাক চেহারার একজন শুঁটকোপানা লোক বলে উঠল—আর বলতে হবে না মা-ঠাকরোণ, মোরা বুঝে গিইচি—

বাচ্চারা এসে আবার লাইন দিয়ে দাঁড়াল। জেঠিমা তাদের বললেন—বল, মাংস কে রেঁধেছে?

সবাই সমস্বরে বলে উঠল—মিনুদি।

জেঠিমা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—না। মাংস রান্না করছে পল্টুদা। ভাল করে বুঝে নে—

এই পরিবর্তিত আদেশে বেশ একটা জটিলতার সৃষ্টি হল। বাচ্চারা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু জেঠিমার নেতৃত্বের কোনো তুলনা হয় না, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে, বকে, ভুলিয়ে এবং ধমক দিয়ে নতুন তালিমে দীক্ষিত করলেন। গোল বাধল ভুবন জ্যাঠাকে নিয়ে। সুধাংশুদা গিয়ে তাঁকেও ডেকে আনল। তিনি এসে হাসিমুখে বললেন—কিগো, কী হল? আবার ডাক পড়েছে কেন? তুমি ভেবেছ আমি বুঝি এর মধ্যেই সব ভুলে মেরে দিয়েছি? তোমরা যতটা মনে কর আসলে আমি ততটা ইয়ে নই। মাংস কে রান্না করেছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করবে তো? কেন, মাংস রান্না করেছে আমাদের মিনু। হল তো? হাঃ হাঃ হাঃ—

জেঠিমা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থেকে ভুবন জ্যাঠার উচ্ছ্বাস কমতে দিলেন, তারপর বললেন—হয়েছে? হাসি থেমেছে? উঃ, এক একসময় ভাবি আমি মরলে তোমার কী দশা হবে। শোন, মাংস রেঁধেছে পল্টু—মিনু নয়।

ভুবন জ্যাঠার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন—সে কী! কিন্তু আগে যে—

—আগের কথা ছাড়ো। এখন এই বলতে হবে। যাও, ভাল করে ঠিক করে নাও—

ভুবনজ্যাঠা বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বৈঠকখানার দিকে চলে গেলেন। বাচ্চারাও এদিক ওদিক ছড়িয়ে গে-.। আমি একমনে রান্না করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়তি জলটুকু ফুটে কমে যেতে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম।

রান্নায় বেশ রঙ ধরে আসছে।

জল বেশি দেওয়ার জন্যই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, ঝোলের যে বিবর্ণ ভাবটা ছিল, জল কমে আসতেই তা কেটে গিয়ে চমৎকার লালচে রঙ ধরল। দারুণ গন্ধও বেরুতে শুরু করল। বাঃ, তাহলে তো ভুল কিছু করিনি! মুগ্ধ চোখে নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের সামনেই ঝোলের রঙ ভাল থেকে ভালতর হতে লাগল।

এই সুসংবাদও বিদ্যুৎবেগে সর্বত্র প্রচারিত হল। চোখে সংশয় নিয়ে ছুটে এলেন জেঠিমা। কড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আদরের গলায় বললেন—তাই তো বলি, পল্টুর এত নাম শুনেছি—সে কি কখনো আমাদের এমন করে ডোবাতে পারে? আঃ, গন্ধও সুন্দর বেরিয়েছে। তোকে আশীর্বাদ করছি বাবা—তোর সোনার হাতা-বেড়ি হোক—

এই আশীর্বাদ আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কতদূর সহায়ক হবে সে কথা ভাবছি, এমন সময় জেঠিমা আবার হাঁক দিলেন—সুধাংশু!

—কী মা?

—বাচ্চাগুলোকে আবার ডাক, লাইন দিয়ে দাঁড় করা। তোর বাবাকেও নিয়ে আয়—

গ্রামের বয়স্করা খেলাটা ধরে ফেলেছিল। জেঠিমা তাদের দিকে ফিরে তাকাতেই তারা সমস্বরে বলে উঠল—মিনু দিদিঠাকরুণ।

বাড়ি, উঠোন ও বাগানের বিভিন্ন স্থান থেকে বালক-বালিকাদের আবার ধরে আনা হল। তারা এবার সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ বলে মিনুদি, কেউ বলে পল্টুদা, কেউ কিছু না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। প্যান্ট মুঠিয়ে ধরা ছোট ছেলেটি মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দিল। একটু ভেবে জেঠিমা বললেন—নাঃ, তোরা ঠিক সব গোলমাল করে ফেলবি। এক কাজ কর, তোদের সক্কলকে একটা করে টাকা দিচ্ছি, ডাল, আর ভাজা যা হয়েছে তাই দিয়ে চটপট খেয়ে তোরা কালীতলায় মেলা দেখতে চলে যা। এবেলা তোদের আর আসার দরকার নেই। সবার ভাগের মাংস আমি নিজে তুলে রাখব, সন্ধের পর এসে খাবি এখন। 'বুঝলি?' যা সব—

ভুবন জ্যাঠামশাই একদিকে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। জেঠিমা তাঁকে বললেন—তুমিও বুঝেছো তো? নাকি আলাদা করে বোঝাতে হবে?

জ্যাঠামশাই বিপন্নমুখে বললেন—তুমি তো জানো, প্যাঁচ আমার মাথায় একেবারে ঢোকে না? দাঁড়াও, একবার সড়গড় করে নিই। প্রথমে বলা ঠিক হয়েছিল মিনু রেঁধেছে, কিন্তু আসলে রান্না করছিল পল্টু। তারপর ঠিক হল পল্টু রেঁধেছে বলা হবে, আসলেও রান্না করছিল পল্টু—এটা বেশ সোজা, মনে রাখতে অসুবিধে হয় না। তারপর এখন ঠিক হল—কি যেন বললে?

—উঃ, আর পারি না। এখন বলবে মিনু রেঁধেছে। হল?

—এখন বলব মিনু রেঁধেছে। বেশ। আসলে রান্নাটা কে করছে?

—পল্টু।

—আচ্ছা। তাহলে একটা ছকে ফেলে নিই। প্রথম, পল্টু-মিনু। দ্বিতীয়, পল্টু-পল্টু। তৃতীয়, মিনু-মিনু।

জেঠিমার গর্জন—না। আবার পল্টু-মিনু।

ভুবন জ্যাঠামশাই কিছুক্ষণ আপনমনে কিসব বিড়বিড় করলেন, তারপর করুণমুখে জেঠিমার দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁগো, আমিও বরং মেলায় চলে যাই। কী বলো?

যুগান্তর

সকালবেলা বারান্দার মিঠে রোদে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন বৃন্দাবন। পায়ের কাছে পোষা বেড়ালটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। রান্নাঘর থেকে ডালে ফোড়ন দেবার শব্দ এবং একটু পরেই গন্ধ ভেসে এল। দুই ছেলে অফিসে বেরুবে, মেয়ে যাবে ইউনিভার্সিটিতে। সাড়ে নটার মধ্যে ভাত তৈরি চাই। সংসারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার জন্য একটি মেয়ে থাকলেও বৃন্দাবনের স্ত্রী রান্নাঘরের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখতে ভালবাসেন। বৃন্দাবন এই প্রৌঢ় বয়সেও নিতান্ত বৌ চাটা মানুষ, অন্তত মাছের ঝোলটা সুপ্রভা রান্না না করলে তাঁর ভাল করে খাওয়া হয় না। এই নিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গোপন রসিকতা চালু আছে।

সাড়ে নটার আগে আর একবার চা খেতে চাওয়া উচিত হবে কি না ভাবছিলেন বৃন্দাবন। ঠিক সেই সময়ে এক কাপ চা হাতে নিয়ে সুপ্রভা এলেন। খুশি হয়ে বৃন্দাবন হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসলেন। কাগজটা ভাঁজ করে রাখলেন টেবিলে। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন—বুঝলে কি করে? প্রাণটা সত্যিই চা চা করছিল—

—ভারি নতুন কথা কি না! কোনদিন সকালে তোমার দু-কাপ ছাড়া হয়?

—কাছে বোস না একটু, কথা আছে—

—না, এখন না। তোমার বয়স হচ্ছে আর সখ বাড়ছে।—

—ঠাট্টা নয়, বোস। জরুরি আলোচনা রয়েছে তোমার সঙ্গে।

সুপ্রভা বসলেন। মুখ দেখে বোঝা যায় স্বামী একটা কিছু ভাবছেন। দেখা যাক কি বলেন উনি। কৌতূহল হলেও সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করবেন না। বিয়ের পর থেকে আজ এই এত বছর তিনি স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে সংসার চালিয়েছেন, তাতে কোনোদিন কোনো অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়নি। অবশ্য তাঁর মনের ইচ্ছেটা কি করে যেন জেনে নিয়ে সেইটেই বৃন্দাবন নিজের সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রকাশ করতেন। এই ব্যাপারটি সুপ্রভার কাছে বরাবর ম্যাজিকের মত লেগেছে। স্বামীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে বেশ শান্তিতে আছেন তিনি। আজকাল এই যে নারী স্বাধীনতা নিয়ে এত গরম গরম কথাবার্তা চলছে চারদিকে, সুপ্রভা তার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝেন না। তিনি নিজে তো সারা জীবন বাড়ির ভেতরেই কাটালেন, কিন্তু স্বাধীনতার অভাব কিছু অনুভব করেন নি। আরে বাপু, পথে বেরুলেই কি আরো দুটো হাত-পা গজাবে?

—পরশু বিকেলে রায়বাড়ির লোকেরা খুকিকে আর একবার দেখতে আসবে। তার আগে তোমার সঙ্গে আর ছেলেদের সঙ্গে একবার আলোচনায় বসা উচিত বলে মনে করি। খুকির সঙ্গেও একবার কথা বলা প্রয়োজন—

সুপ্রভা একটু অবাক হয়ে বললেন—আবার দেখতে আসছে কেন? এই তো সেদিন দল বেঁধে দেখে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না কিছু জানিয়েছে?

—মেয়ে তাদের পছন্দ হয়েছে। না হবার কথা নয়। মাতৃমুখী মেয়ে। তোমাকেও তো আমি একবার দেখেই পছন্দ করেছিলাম—

—তাহলে আবার দেখতে চায় কেন?

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বৃন্দাবন বললেন—দেখতে ঠিক চায় না। বরং বলা ভাল তারা পাকা কথাবার্তা বলতে আসছে। ছেলে এবার আর আসবে না, কিন্তু তার বাবা, কাকা, পিসেমশাই, কাকীমা আর সেই মামাটি আসবে। সেই যে একটু বেশি কথা বলে—সেই মামা। এইযাত্রা তারা দেনা-পাওয়ার কথা বলবে বলে তৈরি হয়ে আসছে। তাহলে আমাদেরও তো একটু তৈরি হয়ে থাকতে হয়, তাই না?

—খুব বেশি খাঁই থাকলে আমরা কি পারব? তুমি কিছু আঁচ পেয়েছ?

একটু চুপ করে থেকে বৃন্দাবন বললেন—পেয়েছি।

কৌতূহলী হয়ে সুপ্রভা বললেন—কি রকম?

—দত্তবাবু জেনে এসেছেন, আর বাদ বাকি সব আলোচনা করে স্থির হবে—কিন্তু নগদ ওঁদের পঁচিশ হাজার চাই। মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাপের হাত খালি, এটা ওঁরা বৌভাতের খরচ হিসেবে চাইছেন—

সুপ্রভার আগ্রহী মুখ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল। তিনি বললেন—আমি তো আগেই বলেছিলাম অত উঁচু ডালে হাত বাড়িও না। অত টাকা নগদ দিলে বিয়ের অন্য খরচের কি হবে?

বৃন্দাবন বললেন—তুমি ছেলেদের ডাক, পরামর্শ করা যাক।

রজতের সবে দাড়ি কামানো শেষ হয়েছে। তুলোয় আফটার শেভ লোশন লাগিয়ে গালে ঘষতে ঘষতে সে এল। কাঁধে একখানা তোয়ালে।—বাবা আমাকে ডেকেছ?

—হ্যাঁ, কথা আছে বস ওইখানে। সুমিত কোথায়?

—সে স্নান করছে। কিন্তু এখন তো বসতে পারব না বাবা, আমায় এক্ষুনি বেরুতে হবে। অলরেডি দেরি হয়ে গিয়েছে।

বিরক্ত হয়ে বৃন্দাবন বললেন—আমি কেন তোমাকে বসতে বলছি জান?

—না, কেন?

—আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য নয়। প্রসঙ্গ না জেনেই ব্যস্ততা দেখাও কেন তোমরা? খুকির বিয়ের একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে এক জায়গা থেকে—যারা দেখে গেল দিন পনের আগে, তারাই। পরশু সেই দল আবার আসছে কথাবার্তা পাকা করতে। এ বিষয়ে তোমাদের দু'ভাইয়ের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই—

আফটার শেভ লোশন মাখা তুলোটা বারান্দার গ্রিল গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে রজত বলল—এতে আর আমাদের কি বলার আছে? তুমি যা ভাল বোঝ তাই করবে—

—তা হয় না। দুটো কারণে হয় না। প্রথম কারণ, তোমরা এখন বড় হয়েছ। সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তোমাদেরও ভাগ থাকা উচিত। দ্বিতীয় কারণ, সামান্য পেনসন ছাড়া বর্তমানে আমার কোনো আয় নেই। জমানো টাকাই ভরসা। এক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না। সুমিতকে ডাক।

ডাকবার আগেই সুমিত ঘরে ঢুকল। সে বেরোবার জন্য প্যান্ট-জামা পরে একেবারে তৈরি হয়েই এসেছে।

—কি হয়েছে বাবা? আমাকে ডাকছ কেন? খেতে বসতে যাচ্ছিলাম—

বৃন্দাবন সংক্ষিপ্তভাবে দ্বিতীয় পুত্রকে নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। দুই ছেলেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করলেন—এ বিষয়ে তোমাদের কি বলার আছে বল—

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে রজত বলল—আমরা বরং এ নিয়ে রাত্তিরে কথা বলব। এইমাত্র শুনলাম তো, এখনি একটা যাহোক কিছু কমিট করা ছেলেমানুষী হবে—

—কেন, বোনের বিয়েতে তোমাদের যে কিছু দায় বহন করতে হবে সেটা কি জানতে না?

সুমিত বলল—তা নয়। আসলে এখন আমাদের দুজনেরই বেরুবার সময়। এই আলোচনাটা অনায়াসেই রাত্তিরে আমরা ফিরলে হতে পারে।

পর্যায়ক্রমে দুই ছেলের মুখের দিকে তাকালেন বৃন্দাবন, বললেন—বেশ, তাই হোক।

প্রথমে ছেলেরা তারপর সুদেষ্ণা সারাদিনের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বৃন্দাবন খবরের কাগজের পাতাগুলো সমান করে সাজিয়ে ভাঁজ করে সরিয়ে রাখলেন। এখন সন্ধে অবধি বাড়ি ফাঁকা থাকবে। গত কয়েক বছর কাগজ পড়তে আর ভাল লাগে না, অভ্যাসে পড়েন। নানান রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ, সিনেমা, ফ্যাশন আর রান্না—এ ছাড়া কাগজে আর কিছু থাকে না। আচ্ছা, মানুষ এতবড় পৃথিবীতে অন্য কিছু করছে না কোথাও? আকাশের দূর প্রান্তে কোনো নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার হচ্ছে না? বড় বড় ওষুধ কোম্পানির ল্যাবোরেটরিতে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে কি ধরনের গবেষণা চলেছে? কেউ কি পায়ে হেঁটে পার হচ্ছে না সাহারা মরুভূমি? মানুষ কি মানুষকে ভালবাসছে না কোথাও?

মাঝে মাঝে ভূপতিনাথ রায় চা খেতে আসেন। বৃন্দাবনের বন্ধু বলতে এখন একমাত্র ভূপতি। রিটায়ার করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর্থ্রাইটিসে ধরেছে, রোজ আসবার ক্ষমতা নেই। চা খেতে খেতে একদিন এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। ভূপতি বলেছিলেন—তোমার বিপদ কি হয়েছে জানো? পৃথিবী বদলাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি বদলাচ্ছ না! বাষট্টি বছর আগে তোমার জন্মের সময় মানুষ যে মূল্যবোধকে অনুসরণ করত, এখন কি আর তা থাকতে পারে? নতুনকে মেনে নাও, শান্তি পাবে।

—এই যুগের মূল্যবোধ—যদি একে মূল্যবোধ বলা যায়—এর কি সবই ভাল?

—ভাল বা মন্দের কথাই হচ্ছে না। বাস্তবকে মেনে না নিলে কষ্ট পাবে।—

বৃন্দাবন জেদীর মত বললেন—এ জিনিস আমি মানতে পারব না—

—তাহলে, কষ্ট পাও।

বারান্দার কার্নিশের ওপর বসে একটা কি পাখি ডেকে উঠল। সামনে ঝুঁকে মুখ উঁচু করে বৃন্দাবন দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাখিটা একটু ভেতর দিকে সরে বসেছে, দেখা গেল না। দশ-পনেরো বছর আগেও এই বাড়ির আশপাশে অনেক খালি জায়গা ছিল, গাছপালা আর বনজঙ্গল ছিল। অনেক পাখির আসা যাওয়া ছিল সেই বনে। তারপর কোথা দিয়ে যে কি হল, জমির দাম বাড়তে লাগল হু হু করে। দেখতে দেখতে কত বাড়ি উঠে গেল চারদিকে। পেছনের নাবাল জলা জমিটা বেশ কিছুদিন পড়ে ছিল। একদিন সেটাও বিক্রি হয়ে গেল। মানুষ এল অনেক কিন্তু পাখিগুলো গেল কোথায়?

সুপ্রভা এসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসলেন।

—আর এক কাপ চা খাবে?

এমন লোভনীয় প্রস্তাবেও বৃন্দাবন বিশেষ উৎসাহিত বোধ করলেন না। বললেন—না, থাক। তুমি বরং কাছে বস, একটু গল্প করি।

অন্যদিনে অসময়ে এক কাপ চায়ের জন্য স্বামী কত উমেদারী করেন, সুপ্রভার কড়া শাসনে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওঁর আর কি। নিজের শরীরের দিকে কোনোদিনই ওর খেয়াল নেই। সারাদিনই কেবল চায়ের আবদার। এদিকে গত চারমাস ধরে ব্লাড প্রেসারের জন্য

ওষুধ খেতে হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, ওরা নিজেদের জীবন ঠিকই গড়ে নেবে। কিন্তু বৃন্দাবনের কিছু হলে ক্ষতি যা হবার সুপ্রভারই হবে। তবু এখন স্বামীর মুখ দেখে কেমন মায়া হল, তাই চায়ের প্রস্তাব করেছিলেন।

—তুমি খুকির বিয়ের জন্য চিন্তা করছ, না? ভেব না, বিয়ে আটকাবে না—

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বৃন্দাবন হাসলেন।

—না, হাসি নয়। আমার গয়নাগুলি রয়েছে ভুলে যাচ্ছ কেন? আজকাল সোনার দর কত যাচ্ছে? মানতাসা আর আর্মলেটটা বিক্রি করলেই বিয়ের খরচ উঠে আসবে। তুমি ভেব না—

—মেয়ের বিয়ের জন্যেই মায়েরা গয়না জমিয়ে রাখে, জানো? খুকির বিয়ের পরে আমবাও ঝাড়া হাত-পা হয়ে যাব। তোমার পেনসন আছে—ছেলেদের কাছে কখনো হাত পাততে হবে না। তুমি এখানেই বিয়ে ঠিক করে ফেল, দু-এক হাজারের জন্য পিছিয়ে যেও না।

পাখিটা আবার ডাকল। বৃন্দাবনের মনে বেশ আনন্দ হল। ওই ডাকের সঙ্গে পুরনো দিনের স্মৃতি আব উল্লাস যেন মিশে আছে। জীবনে সংগ্রাম অনেক করতে হয়েছে, গুরুতর সংকটও যে আসেনি এমন নয়—তবু সব মিলিয়ে ফেলে আসা দিনগুলো ভালই কেটেছে। কোনো কথা না বলে দুজনে সান্নিধ্যের উষ্ণ অনুভূতি মেখে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

বাত্রিবে খাওয়ার সময় ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন বৃন্দাবন। তার আগেই রজত আর সুমিত এসে ঘরে ঢুকল। বৃন্দাবন প্রভাতকুমার রচনাবলী পড়ছিলেন, চশমার খাপ দিয়ে পেজ মার্ক করে মুড়ে রেখে বললেন—বোস। তোমরা কি এখনই কথা বলতে চাও? নাকি খাওয়ার পরে?

রজত বলল—-এখনই সেরে নেওয়া যাক না, এমন আর কি বেশিক্ষণ লাগবে?

—তাহলে তোমাদের মাকে ডেকে আনো।

সুমিত গিয়ে সুপ্রভাকে ডেকে নিয়ে এল। বৃন্দাবন বললেন—এসো। ছেলেদের সঙ্গে যা কথাবার্তা হবে তোমার সামনে হওয়াই ভাল। রজত আগে বল—

রজত মাথা নিচু করে বলল—আমি যা বলতে চাই সেটা তোমাদের সামনে বলা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর, দরকার না হলে এখন জানাতামও না। অন্যপক্ষই এসে কথা বলে যেত—

বৃন্দাবন মুখ তুলে তাকালেন। সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করলেন—অন্যপক্ষ মানে?

মাথা নিচু করেই, কিন্তু বেশ দৃঢ় গলায় রজত বলল—কান্তা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। খুকির বিয়ে হয়ে গেলেই কান্তার বাবা-মা তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসবে। সে কারণেই আমার হাতে যা আছে তার সবটা আমি দিতে পারব না। বিয়ের পর, মানে—টু স্টার্ট উইথ, আমার তো কিছু টাকার দরকার হবে—

একটু চুপ করে থেকে বৃন্দাবন বললেন—সব যখন ঠিকই হয়ে গিয়েছে তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসার আর কি প্রয়োজন? আমি অমত করলে কি বিয়ে আটকাবে?

—এসব তো সেন্টিমেন্টাল কথা। কান্তা এম. এ. পাশ, ওদের ফ্যামিলিও ভাল। তোমাকে আগে বলা হ .নি বলেই কি তুমি অমত করবে?

বৃন্দাবন সে কথার উত্তর না দিয়ে সুমিতের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কি কিছু ঠিক করেছ?

রজত বলল—কিন্তু আমার কথাটা তো শেষ হল না। আমি কিছু টাকা দিতে চাই। সবদিক হিসেব করে দেখলাম আমি হাজার পাঁচেক টাকা দিতে পারব।—

সুমিত বলল—আমিও পাঁচ হাজার দেবো। ব্যবসাটা বাড়াবার জন্য আমরা একটা প্রোগ্রাম নিয়েছি। দু'জনের পার্টনারশিপ। পার্টনার যত ইনভেস্ট করবে, আমাকেও তত টাকা ম্যাচিং ক্যাপিটাল দিতে হবে। নইলে কোনো অসুবিধে ছিল না—

বৃন্দাবন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ, তোমাদের কথা শুনে রাখলাম। দরকার হলে তোমাদের সাহায্য চাইব—

রজত বলল—বাবা, তুমি কিন্তু অন্যায় রাগ করছ, সত্যি কথা বলছি বলে—

বৃন্দাবন বললেন—খেয়ে নাও, রাত হচ্ছে। কাল সকালে তো আবার বেরুনো আছে—

ছেলেরা চলে গেলে সুপ্রভা বললেন—তুমিও খেয়ে নেবে তো? একসঙ্গে দিই।

—দেবে? আচ্ছা দাও। রাত করে আর লাভ কি?

মশারির মধ্যে শুয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ বইখানা বুকের ওপর উপুড় করে রাখলেন বৃন্দাবন। চশমা খুলে হাতে নিয়ে বললেন—ঘুমোলে নাকি?

স্বামীর দিকে পাশ ফিরে সুপ্রভা বললেন—না। কেন?

—প্রভাত মুখুজ্যের লেখা পড়তে গিয়ে অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই গল্পে মডার্ন নায়ক-নায়িকা সাইকেল করে বেড়াতে বেরিয়েছে। এখন অনেক মেয়ে সাইকেল চালায়, কেউ দেখে অবাক হয় না। কিন্তু ষাট-সত্তর বছর আগে ব্যাপারটা অভিনব ছিল। যাক, কথাটা তা নিয়ে নয়। কলেজে পড়ার সময় আমরা চারবন্ধু মিলে একবার সাইকেল করে গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভারত ভ্রমণ বা ওরকম কিছু নয়, এমনি মনেব আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম ক'দিন। সেই বয়েসটা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বুঝলে? এখনও মনে পড়ে, কাঁচা রাস্তা দিয়ে, আম-জাম বাগানের মধ্যে দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছি। দুপুরে কোনো গ্রামের দোকান থেকে চিঁড়ে বা মুড়ি কিনে খাচ্ছি। রাত্তিরে কাবো বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছি। তখনও মানুষের মনে ভয় আর সন্দেহ ঢোকেনি। সাধারণ মানুষের অবস্থাও ভাল ছিল—একমুঠো ভাত অতিথিকে দিতে কেউ কুণ্ঠিত হত না। অনন্তপুর গ্রাম শ্রীপতি মোড়লের চণ্ডী মণ্ডপে কাটানো রাত চোখ বুজলেই মনে পড়ে। মোড়ল খই, দুধ আর বাতাসা দিয়ে পেট ভরে খাইয়েছে। চাঁদের আলোয় ভেসে দশদিক। আমাদের ঘুম আসছে না, চারবন্ধু রাত জেগে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছি। মণি, সে-সব সুখের দিন আর ফিরবে না।

স্বামীর মুখে নিভৃত আদরের ডাক শুনে সুপ্রভা বইখানা পাশে নামিয়ে বাঁ হাতখানা বৃন্দাবনের বুকের ওপর রেখে বললেন—আমরা এখনই বা কি খারাপ আছি?

—খারাপ? না, খারাপ থাকব কেন? বেঁচে আছি—এটাই তো বেশ এক-আনন্দের ব্যাপার। একজন মধ্যবিত্ত বাঙালি যা যা চায়, মোটামুটি সবই আমাদের আছে। সবচেয়ে বড় কথা—তুমি আছ। এখন বুঝি তোমাকে বিয়ে করাটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা—

বিয়ের পরের সুগন্ধমাখা বছরগুলো যদিও অনেক পিছিয়ে পড়েছে, তবু এখনও স্বামীর মুখে আদরের কথা শুনতে সুপ্রভার খুব ভাল লাগে। স্বামী প্রায়ই বলেনও।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করার পর বৃন্দাবনের ঘুম আসছে দেখে সুপ্রভা বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলেন।

পরের দিন দুপুরে খাওয়ার সময় বৃন্দাবন বললেন—সন্ধেবেলা খুকি ফিরলে আমার

কাছে একটু ডেকে দিও তো, বলে দেব কাল যেন আর কোথাও না বেরোয়। ভদ্রলোকেরা এসে হয়তো দেখতে চাইবে—

সুপ্রভা একটু বিরক্ত গলায় বললেন—আবার দেখবে কেন? তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেই তো হয়—

—আহা, সে রকম দেখা নয়। হয়তো বলবে—মা লক্ষ্মীকে একটু ডাকুন, একবার দেখে যাই—

—নগদটা যদি বলে কয়ে পনের হাজারের মধ্যে রাজি করাতে পারো তাহলে সুবিধে হয়। দুই ছেলে মিলে দশ দেবে বলছে, ওদের বলি ওটা পনেরো করতে। বাকি খরচ--

বৃন্দাবন বললেন—আমাকে আর একটু পালংয়ের চচ্চড়ি দাও—

কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়া চলল। তারপর সুপ্রভা বললেন—তুমি ছেলেদের ওপর রাগ করেছ, না? ওরাও ছেলেমানুষ, সবে জীবন আরম্ভ করতে চলেছে। তবু তো যা পারছে দিচ্ছে। আর রজতের বিয়ের ব্যাপারটা যদি তোমাকে আঘাত করে থাকে তাহলে আমার কিছু বলার নেই। হঠাৎ অমন শুনলে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবে দিনকাল বদলাচ্ছে, কিছু কিছু তোমাকে মেনে নিতেই হবে।

—আমি রাগ করিনি। কিন্তু ছেলেদের টাকা আমি নেব না। বরং তোমার গয়না নেব, কি বল?

দুজনেই হাসলেন। সুপ্রভা বুঝলেন মেঘ কাটল না, মাথার ওপরটা একটু পরিষ্কার হল মাত্র।

খাওয়ার পর বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে এসে বসলেন বৃন্দাবন। তিনি ধূমপান করেন না, প্লাস্টিকের কৌটো খুলে হর্তুকি আর ভাজা সুপুরির টুকরো মুখে দিলেন। বই একখানা কোলের ওপর খোলা রইল বটে, কিন্তু পড়া হল না একলাইনও। চোখের সামনে দিয়ে দিনটা গড়িয়ে গেল।

সময় যে সত্যিই বদলাচ্ছে তা বোঝা গেল সন্ধের পর। সাতটা নাগাদ সুপ্রভা ঘরে এসে বললেন—শুনছ, খুকি এখনও ফিরল না কেন বল তো? এত দেরি তো করে না—

বৃন্দাবন একটু অবাক হয়ে বললেন—এখনো ফেরেনি? কটা বাজে?

—সাতটা।

—রজত আর সুমিত ফেরেনি?

—না। আমার কিন্তু ভয় করছে—

—ভয়ের কি আছে? কলেজ থেকে কোনো বন্ধু টন্ধুর বাড়ি গিয়েছে হয়তো—

রাত আটটায় দুই ছেলে ফিরল। তখনও সুদেষ্ণা বাড়ি আসেনি। সাড়ে আটটায় রজত আর সুমিত যখন খোঁজখবর করার জন্য বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, বৃন্দাবন থুম হয়ে বসে আছেন, সুপ্রভার অশ্রু চোখের দৃষ্টি চৌকাঠে এসে আটকেছে, তখন সুদেষ্ণা বাড়ি ফিরল। তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। রজত দরজা খুলে দিয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার, কোথায় ছিলি তুই? এদিকে সবাই চিন্তা করে অস্থির।

সুদেষ্ণা হেসে বলল—তোমাকে বলব না, আগে বাবাকে বলব—

তার পেছন পেছন দুই ভাই বাবার ঘরে এল।

বৃন্দাবন আগেই মেয়ের গলার আওয়াজ পেয়েছেন, তিনি বকাবকি পছন্দ করেন না, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কেবল। সুপ্রভা স্বামীর পেছনে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুদেষ্ণা এসে বাবার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—বাবা আমাকে সিলেক্ট করেছে।

ঘরের দ্রুত টেনশন কমে যাচ্ছে, বাড়ছে কৌতূহল।

বৃন্দাবন বললেন—কে সিলেক্ট করেছে? কিসের জন্য?

—আমাদের ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গোয়েজ সোসাইটি থেকে আমাকে প্যারিসে যাবার জন্য টিমে নিয়েছে। গ্রুপ অর্গানাইজার ডেকে বললেন। সামনের মাসের বারো তারিখে রওনা দিতে হবে—

সুমিত বলল—তুই—তুই প্যারিস যাবি? মানে ফ্রান্সে?

—না তো কি? ফর্ম ফিল্-আপ করে দিয়ে আসতেই তো দেরি হল—

রজত গম্ভীর গলায় বলল—এটা কিন্তু খুব অন্যায় হয়েছে। ফর্ম ফিল্-আপ করা মানে কথা দেওয়া। তার আগে বাবার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল।

বৃন্দাবন হাত বাড়িয়ে ডাকলেন—আয়, আমার কাছে আয়। আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব খুশি।

তারপর রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন—খুকি আমার অনুমতি না নিয়েই তাদের কথা দিতে সাহস করেছে কেন জানো? কারণ ও জানে আমি সঠিক কাজে কখনো বাধা দিই না।

সুদেষ্ণা বলল—এবার তো বাইশ দিনের ট্যুর। প্যারিসে থাকার সময়েই অ্যাডভান্সড কোর্সে ভর্তির জন্য একটা পরীক্ষাও দিয়ে আসব। পাশ করলে এক বছর বিদেশে থেকে পড়ার জন্য স্কলারশিপ দেবে।

সুমিত বলল—কি কি স্কোপ আছে এ লাইনে? কেবল একবার বিদেশে ঘুরে এসে লাভ কি?

সুদেষ্ণা বলল—অনেক স্কোপ আছে। চাই কি বিদেশেও থেকে যেতে পারি—

মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অন্যমনস্কভাবে বৃন্দাবন বারবার বলতে লাগলেন—খুব, খুব খুশি হয়েছি। পরের দিন সকালে চা খেয়ে বৃন্দাবন বের হবার উদ্যোগ করছেন দেখে সুপ্রভা বললেন—বেরোচ্ছ নাকি?

হাতার বোতাম আটকাতে আটকাতে বৃন্দাবন বললেন—হ্যাঁ, একবার দত্তবাবুর কাছে যাব। রায়বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার। বিয়ের ব্যাপারটা এখন মুলতুবী থাক। খুকির ভবিষ্যৎ অনেক বড়, এখনই বিয়ে দিয়ে ওর পায়ে শেকল পরাতে চাই না। খবর না দিলে তারা সব এসে পড়বে। সে ভয়ানক লজ্জার কথা হবে। আর হ্যাঁ, আসবার সময় খুকির পাসপোর্টের ফর্মটাও নিয়ে আসব। স্নান সেরে রেখো, ফিরে একসঙ্গে খাব।

আমবিলিকাস্

নির্মলের বরাবরই গুছিয়ে কাজ করার অভ্যেস। আজ রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর সে শোবার ঘরের বিছানায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সামনে ফাইল খুলে তার বিভিন্ন সঞ্চয়ের হিসেব করছিল, রসিদপত্র তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখছিল। একটা রেকারিং ডিপোজিট দুমাস পরে ম্যাচিওর করবে, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটগুলো সামনের বছর থেকে পাঁচ-ছ মাস অন্তর অন্তর—পুরো চারবছর ধরে। জয়েন্ট লাইফ পলিসি দুটো কেবল এখনও অনেক দেরি আছে। যাই হোক, কাগজপত্র ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখা উচিত। একটু গোলমাল হলেই টাকা পাওয়া ভারি কঠিন হয়ে পড়ে।

ঠোঁটের কোণে সিগারেট ঝুলিয়ে প্ল্যাসটিকের জেম ক্লিপ দিয়ে কাগজ আটকে রাখছিল। এমন সময় লীলা ঘরে ঢুকে ছেলের সামনে খাটের ওপর বসলেন। নির্মল তাড়াতাড়িতে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে সিগারেটটা আগে ফেলে দেবে, না ফাইলটা আগে বন্ধ করবে। দুটোই একসঙ্গে কবতে গিয়ে কয়েকটা কাগজ উড়ে মেঝেয় পড়ল পাখার হাওযায়। আর অ্যাশট্রেটা বিছানায় উলটে ছাই ছড়িয়ে পড়ল বেডকভারের ওপর।

মেঝে থেকে লীলাই কাগজ কুড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের কাগজ রে?

—ও কিছু না। ও অফিসের কাগজ।

ফাইলের ফ্ল্যাপ বন্ধ কবে একপাশে সবিয়ে রেখে নির্মল জিজ্ঞাসা করল—তুমি কিছু বলবে মা?

লীলা বললেন—বৌমাকে দেখতে গিয়েছিলি আজ? কেমন আছে বৌমা?

– আজ যাইনি। বাপের বাড়ি আছে, চিন্তা কি? ভালই থাকবে—

—বৌমার ঠিক ছেলে হবে, দেখিস। চেহারা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। মেয়ে হওয়ার লক্ষণ নয়। প্রথম সন্তান ছেলে হওয়া ভাল।

নির্মল চুপ করে রইল। লীলা বললেন—বাপের বাড়ি পাঠাতে হবে কেন? আমিই কি যত্ন করতে পারতাম না? কিন্তু কি করবো বল্, বৌমা যে আমার যত্ন চায় না।

—এসব কথা অনেক হয়ে গেছে মা, আর আলোচনায় লাভ কি?

লীলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—তুই রাগ করলি? আমি কিন্তু তোর বৌকে খারাপ বলিনি। একটু অবুঝ, এই যা। আমার ভালবাসাটা নিতেই পারল না।

নির্মল এবারও কোনো উত্তর দিল না। দিলেই কথা বাড়বে। কেবল সুমিত্রাই অবুঝ এমন নয়, মা-ও যথেষ্ট গোলমাল বাধিয়ে থাকেন। কেউ কারো জমি একতিল ছাড়তে রাজি নয়।

—তুই যখন হলি, তোর বাবা তখন সিউড়িতে চাকরি করেন। শাশুড়ি মারা গিয়েছিলেন তার আগেই। আমার কি কষ্ট! ওদিকে সে-সময় আবার কাজের লোক পাওয়া যেত না। ওই শরীর নিয়েই রান্না করতাম, ঘর মুছতাম। কতবার মনে হয়েছে—আহা রে, শাশুড়ি থাকলে এই সময়টায় একটু আদরযত্ন পেতাম। একদিন হয়েছে কি, তোর বাবা অফিসে বেরিয়ে গিয়েছেন, আমি কলতলায় বসে থালাবাটিগুলো ধুয়ে রাখছি। ওমা, কাজ সেরে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠে দাঁড়াতে পারছি না। কোমর সোজা হচ্ছে না কিছুতেই!

কি করি, কেউ বাড়িতে নেই। এমন সময় শুনি বাইরে থেকে তোর বাবা আমার নাম ধরে ডাকছেন। চশমা ফেলে গিয়েছিলেন, তাই নিতে ফিরে এসেছেন। আমি দরজা খুলব কি করে, উঠতেই তো পারছি না। শেষে তোর বাবা পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন।

তারপর একটু লাজুক মুখে লীলা বললেন—সেদিন আর তোর বাবার অফিস যাওয়া হল না—

এ গল্প এবং এরকম আরো অনেক গল্প নির্মল ছোটবেলা থেকে মায়ের মুখে বহুবার শুনেছে। বর্তমানে তার মন পড়ে ছিল ইনভেস্টমেন্ট ফাইলের দিকে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কি কিছু বলবে?'

—আমার কিছু টাকা চাই।

বিপন্নমুখে নির্মল বলল—এখন আমি টাকা কোথা থেকে পাবো? কেন হঠাৎ টাকার কি প্রয়োজন হল?

—রাজারামপুরে বিনয় ঠাকুরপোদের পাঠাবো, ওর ছেলেটা মাধ্যমিক পাশ করেছে, পড়াশুনোতে মাথাও বেশ ভাল। বই কিনতে পারছে না টাকার জন্য।

—তোমাকে লিখেছে বুঝি? কত পাঠাতে লিখেছে?

—বিনয় ঠাকুরপো টাকার কথা কিছু লেখেনি। তবে সব জেনে কি আমার চুপ করে থাকা উচিত? তোর আপন কাকা না হলেও নিকট আত্মীয় তো বটেই। তাছাড়া দেশের বাড়ি-ঘরদোর ওরাই দেখেশুনে রাখে—

—আমি তো অনেকবার বলেছি মা, দেশের বাড়ি আর জমিজায়গা বিক্রি করে দাও। কে থাকবে গিয়ে আর সেখানে? মাঝখান থেকে একবার যদি বর্গা রেকর্ড হয়ে যায় সে জমি আর কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না।

লীলা দুঃখিত গলায় বললেন—দেশের বাড়ি বিক্রি করে দিবি? ভদ্রাসন কি কেউ বিক্রি করে?

—আচ্ছা, বাড়ি না হয় না-ই বিক্রি করলে, জমিগুলো বিক্রি করতে তো আপত্তি নেই? খামোখা বেদখল হয়ে যাবে। বল তো আমি নিজে গিয়ে—

এইমাত্র তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বৈষ্ণবঘাটায় রিপোজ হাউসিং স্কীমে সে একখানা ফ্ল্যাটের জন্য দরখাস্ত করে রেখেছে নিজের আর বৌয়ের জয়েন্ট নামে। হয়েও যাবে মনে হচ্ছে। চৌধুরীদা খুব করছেন তার জন্য। সেদিনও ডেকে বলেছেন—প্রথম কিস্তির টাকাটা তৈরি রেখো হে, যে কোনোদিন খবর হতে পারে। দেশের জমি বিক্রির টাকা সে ফ্ল্যাটের জন্য জমা দিলে অনেকখানি চাপ কমে যাবে।

মায়ের দিকে কিছুটা এগিয়ে বসে নির্মল নরম গলায় বলল—দেখ মা, দেশের জমি থেকে তোমার কোনো আয় নেই। বরং সেগুলো দেখাশুনো করতে আমাদের অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে। আজকাল গ্রামের অবস্থা তো জানো, সব বেদখল হয়ে যাবে, বর্গা রেকর্ড হয়ে যাবে। তার চেয়ে—

লীলা বললেন—তা হয় না বাবা। কর্তার আমলের জমি, বিয়ের পরেই সখ করে আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। বলতেন, রিটায়ার করে দেশে ফিরে যাবেন, নিজে ধানের চাষ করবেন, সবজি আর ফলের বাগান করবেন। উনি পারেন নি, তুই যাস। শান্তিতে থাকবি, কর্তার ইচ্ছেও পূর্ণ হবে।

গত দশ-বারো বছর ধরে একই কথা শুনে আসছে নির্মল। বাইরে যুগটা যে কত

বদলেছে মা তার কিছুই খবব রাখেন না, ফ্ল্যাটের জন্য দরখাস্ত করার কথাও সে মাকে বলেনি। রিটায়ার করাব সময়ে সে আর এমন কি বুড়ো হয়ে যাবে? নিজস্ব একটু ব্যবসা বা ছোট্ট একটা কনসালটেন্সী ফার্ম করতে হলে তাকে থাকতে হবে শহরেই। গ্রামে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু মাকে সে কথা বোঝায় কে?

লীলা আপনমনেই বললেন— দেশের সঙ্গে মানুষের নাড়ীর বন্ধন থাকে, তা কখনো ছেঁড়ে না। যেখানেই থাকিস, যাই করিস, আসলে কিন্তু তুই ওই গ্রামের ছেলে। দেখিস না, এখনো গ্রামে গেলে সমস্ত চেনা মানুষ আর বৌ-ঝিরা দৌড়ে আসে? শহরে কে আমার আত্মীয়? কে আমাকে চেনে?

নির্মল বলল—তোমাকে চিনতে পারে, আমাকে কেউ চেনে না।

—সে তুই যাস না বলে। যাতায়াতেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে—

নির্মল চুপ করে রইল। মাকে বোঝানো অসম্ভব। আসলে মায়ের কোনো প্র্যাকটিকাল ভিউ অফ্ লাইফ নেই। সেন্টিমেন্ট আর ইমোশন দিয়ে তো বাঁচা যায় না।

সে বলল—আচ্ছা মা, সে ভেবে দেখা যাবে এখন। যাও, শুয়ে পড়ো—

গভীর রাত্তিরে ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো নির্মলের। খোলা জানালা দিয়ে পাশের বাড়িব চৌধুরীবাবুব গলা শোনা যাচ্ছে—নির্মল ও নির্মল—

সে উঠে জানালার কাছে গেল। চোখ থেকে ঘুম এখনো কাটেনি। বুকের মধ্যে আশঙ্কার শিহবণ শিবশির করে বয়ে যাচ্ছে। ঘড়িতে রাত তিনটে।

—তোমাব ফোন এসেছে নির্মল, তাড়াতাড়ি এসো—

আলনা থেকে একটা জামা টেনে নিয়ে বাবান্দায় বেরিয়ে এল নির্মল। মাও উঠে পড়েছেন। —কি হয়েছে রে? কে ডাকছে?

—চৌধুরীবাড়িতে ফোন এসেছে, আমি যাচ্ছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করো।

গেট খুলে চৌধুরীবাবু নিজে দাঁড়িয়ে আছেন।

—কি হয়েছে দাদা?

—তোমার শ্বশুরমশাই ফোন কবছেন। যাও, কথা বলো—বসবার ঘরেই ফোন। রিসিভার নামানো আছে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ওপর।

—হ্যালো—

—কে, নির্মল? তুমি এখনি একবার চলে এসো।

—কেন কি হয়েছে? মিলির কি—মানে, লেবার স্টার্ট করেছে?

লাইনের ওপ্রান্তে শ্বশুরমশাই একবার কাশলেন। বললেন—ঠিক তা নয়। রাত এগারোটা নাগাদ বাথরুম থেকে বেরুবার সময় মিলি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার মিত্রকে ডেকে এনেছিলাম। উনি দেখে ওঁর নার্সিং হোমে ভর্তি করতে বলেন।

কিসের একটা ঠাণ্ডা স্রোত পা বেয়ে নিচের দিকে নামছে। সে বলল—তারপর?

—আমি নার্সিংহোম থেকেই বলছি। মিলিকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তোমারও চলে আসা প্রয়োজন। আমরা তো কোনো ডিসিশন নিতে পারবো না—

—কিসের ডিসিশন?

—তুমি চলে এসো, এলে সব কথা হবে।

বাড়িতে এসে লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরে নিল নির্মল। নগদ বারোশো টাকা ছিল আলমারীতে, সেটাও ভেতরের পকেটে ভরে নিল। লীলা উদ্বিগ্ন মুখে বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারটায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন—এত রাতে তুই যাবি কিসে? খুব কি

বাড়াবাড়ি হয়েছে বৌমার?

—জানি না। গিয়ে বুঝতে পারবো। তুমি দরজা দিয়ে দাও—

অশোক কুন্ডুকে ডেকে তুললো নির্মল। ছেলেটা ভারি পরোপকারী। সে ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।—কি ব্যাপার নির্মলদা? এনিথিং রং?

—অশোক, তোমার স্কুটারটা একটু দেবে? এইমাত্র শ্বশুরমশাই ফোন করেছিলেন, তোমার বৌদি নার্সিংহোমে। এক্ষুনি যেতে হবে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে অশোক বলল—দাঁড়ান, আমিও আসছি। আপনি যা আপসেট দেখছি, আপনি চালালে নির্ঘাৎ অ্যাকসিডেন্ট করবেন।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে নার্সিংহোম। পাজামার ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে ডাক্তার মিত্র একতলার চেম্বারে বসে আছেন। বললেন—বোসো নির্মল। শুনেছো তো সব?

—আজ্ঞে মিলি পড়ে গিয়েছিল বাথরুমে। এখন কেমন আছে?

—অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে। সেজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠালাম।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তাতে কি হয়?

—পুরো জলটা বেরিয়ে গেলে বাচ্চা অ্যাসফিক্সিয়েটেড হয়ে—মানে, দম বন্ধ হয়ে ইয়ে হতে পারে আর কি—

কেউ যেন কোথায় একে একে জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে। কোথায় একটা বড় ঘর আছে, তার জানালাগুলো। ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

একটু দেবি করে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ডাক্তার মিত্রই বহু প্রচেষ্টায় মিলিকে সেই সম্ভাবনাব দরজায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। তাদের বড় আশার সন্তান।

চশমা খুলে চোখের ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে ডাক্তার মিত্র বললেন, —ভয় পেয়ো না। ডেলিভারীব তারিখ আসতে চোদ্দ-পনেরোদিন বাকি আছে বটে, কিন্তু ইট উইল বি এ ভায়েব্‌ল বেবি। শুধু তোমার অনুমতিটা দরকার—

—কিসের?

—ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে সিজারিয়ান সেকশন করা দরকার। বন্ডে তো তোমাকেই সই করতে হবে।

ফর্মে সই করে দিয়ে নির্মল বলল—ডাক্তারবাবু, আমি কি একবার মিলির সঙ্গে দেখা করতে পারবো?

—হ্যাঁ, যাওনা। নার্সকে ডেকে বলে দিচ্ছি—

—আর একটা কথা, কি পরিমাণ টাকা তৈরি রাখবো যদি একটু বলেন—

চশমাটা আবার পরে ফেললেন ডাক্তার মিত্র।—সে তো এখনই ঠিক বলা যায় না। তুমি কাল সকালে হাজার চারেক টাকা জমা দিও। ডিসচার্জ করার আগের দিন পুরো বিল জানিয়ে দেব—

পাঁচ নম্বর কেবিনে অয়েল ক্লথের ওপর ফ্যাকাশে মুখে শুয়ে আছে মিলি।

মিলির একটা হাত ধরে নির্মল বলল—অত শুকনো মুখ কেন? এইমাত্র ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলাম। ভোরবেলাই দেখবে বাচ্চা তোমার পাশে শুয়ে আছে। ভালই তো হল, দু-হপ্তা আগে বাচ্চা পেয়ে গেলে।

মিলির সন্ত্রস্ত মুখ কিছুমাত্র উজ্জ্বল হল না। ফিসফিস করে সে বলল—কাল সকালে তো আমার জ্ঞান থাকবে না। তুমি কিন্তু সকালেই আমার মাকে অবশ্য নিয়ে আসবে। মা খুব চিন্তায় রয়েছে। ঠিক আনবে কিন্তু—

তারপর চেষ্টা করে একটু হেসে বলল—খোকা, না খুকি?

নির্মলও হাসল। বলল—খোকা। তোমার সাধের খোকা।

নার্সিংহোমের বাইরে পায়চারি করতে করতে এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেলল নির্মল। অশোক রোগীদের অপেক্ষা করার ঘরে সোফায় বসে ঘুমোচ্ছে। রাস্তার ওপর মেহগনী গাছের ডালে পাখিরা জেগে উঠছে এক এক করে। মাদার ডেয়ারীর দুধের গাড়ি ছুটে গেল সরকারবাজারের ডিপোর দিকে। রাত ফুরোতে আর দেরি নেই।

মিলি শুধু তার নিজের মাকে আনতে বলেছে। শাশুড়ি সম্বন্ধে তার কোনো বক্তব্য নেই। মা অবশ্য খুবই অবুঝ, তবু—

ঠিক ছটা দশে মেট্রন এসে বলল—আপনাকে ডাক্তার মিত্র ডাকছেন।

অপারেশন থিয়েটারের সামনে সার্জিক্যাল গ্লাভস পরা হাতে একটা এনামেলের ট্রে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তারবাবু। কনগ্র্যাচুলেশনস, নির্মল। ছেলে।

জন্মের ক্লেদ মাখা ভেজা-ভেজা শরীরে ট্রে-তে শায়িত তার সন্তান। নির্মল এর আগে কখনো সদ্যোজাত শিশু দেখেনি। সে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল। বাচ্চাটির পেটের ওপর ইঞ্চিদেড়েক লম্বা নীলচে-সবুজ নলের মতো কি কাঁপছে।

তার দৃষ্টি লক্ষ করে ডাক্তার মিত্র হেসে বললেন—ওটা হচ্ছে আমবিলিকাস্, আমবিলিকাল কর্ড। ওই নাড়ি দিয়েই মায়ের শরীরের সঙ্গে সন্তান যুক্ত থাকে। আমরা কেটে আলাদা করি বটে কিন্তু ওটা আসলে কাটা যায় না।

অশোক তাকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি গেল। খবর পেয়ে লীলা কেঁদে ফেললেন, বললেন—যা, মোড়ের দোকান থেকে সন্দেশ নিয়ে আয়। আমার মানত ছিল ভাল খবর পেলে দাঁড়া অবস্থায় ঠাকুরকে সন্দেশ দেব—

—এসব ওবেলা করলে হয় না মা? আমি একটু বেরুব।

—এখন আবার কোথায় যাবি?

—নার্সিং হোমে চার হাজার টাকা জমা দিতে হবে। আজ রবিবার, ব্যাঙ্ক বন্ধ। দেখি, কারো কাছে চেয়ে জোগাড় করতে হবে।

লীলা বললেন—কোথাও যেতে হবে না। তোর খোকা হয়েছে। লোকের কাছে চাইবি কেন? আমার মানতাসাটা দিচ্ছি, বন্ধক দিয়ে যা লাগে নে। পরে ছাড়িয়ে আনলেই হবে।

তারপর বললেন—আজ বিকেলে আমাকে নিয়ে যাবি তো? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। বৌমার জ্ঞান ফিরবে তো বিকেলে?

মায়ের ছবি

বোতলের ছিপি খুলে আমাকে জল খেতে দেখে পাশের সহযাত্রীটি বললেন—আর আছে? আমাকে একটু দিন তো মশাই—

সামান্যই ছিল। এই পাহাড়ি লুপ লাইনের সব স্টেশনে জল পাওয়া যায় না। কিন্তু জল খেতে চাইলে কাউকে কি 'দেবো না' বলা যায়? কাজেই জলের বোতলটা বাড়িয়ে ধরলাম। মাথা পেছনে হেলিয়ে বোতল উপুড় করে সবটুকু জল খেয়ে ভদ্রলোক বললেন—আঃ। ভারি তেষ্টা পেয়েছিল। আর কিন্তু জল রইল না। ভেরি সরি—

—তাতে কি আছে? সামনের কোনো স্টেশনে ভরে নেবো এখন।

চার বার্থের ছোট্ট ফার্স্ট ক্লাস কুপে। আমি ছাড়া তাতে কোনো যাত্রী ছিল না। মাইল তিরিশেক আগের স্টেশনে এই ভদ্রলোক এবং আরো জনাপাঁচেক যাত্রী উঠে কামরা ভরিয়ে ফেলেছেন। তবে কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি ওই পাঁচজন নিত্যযাত্রী, কোনো সরকারী অফিসে চাকরি করেন। মাইল পনেরো পরে আর একটা জংশন আসছে—সেখানে তাঁরা নেমে যাবেন। ভদ্রলোক কতদূর যাবেন কে জানে! লাইনের দুধারে চমৎকার শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, প্রান্তরে গা এলিয়ে পড়ে থাকা নদী, মাঝে মাঝে রক কাটিংয়ের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলছে—তখন কামরার মধ্যে বেশ কেমন মৃদু ছায়া ঘনিয়ে আসছে। দুপুরবেলা বিয়েবাড়ির ছাদে সামিয়ানার নিচে বসে থাকলে যেমন লাগে। কোথায় এসব সুন্দর জিনিস উপভোগ করতে করতে যাবো, তা নয়—কামরায় মধ্যে চলছে নানান বৈষয়িক কচকচি। কি আর করা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে রইলাম। সহযাত্রী ভদ্রলোকও সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে ঘুমের উদ্যোগ করতে লাগলেন।

পরের জংশনে সত্যিই কামরা ফাঁকা হয়ে গেল। রইলাম কেবল আমরা দু-জন। গাড়ি ছাড়তেই ভদ্রলোক চোখ মেলে বললেন—বাব্বা! বাঁচা গেল।

বললাম কেন? কি হয়েছে?

—বক্‌বক্‌ করে মাথা একেবারে ধরিয়ে দিয়েছিল। বিহারের এ লাইনটা সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত—চারদিকে কত দেখার জিনিস! পৃথিবীতে এত লোক বেড়েছে মশাই একটু একা থাকার জো নেই—

ভদ্রলোকের ওপর শ্রদ্ধা হল। বললাম—আজকাল লোকে সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। আপনার কথা শুনে ভাল লাগছে। কবিদের মত কথা—

ভদ্রলোক বিনীত হেসে বললেন—কবিতা অবশ্য সত্যিই লিখতাম এককালে—

মরেছে! এরকম সাহিত্য বাতিকগ্রস্ত লোকদের আমি চিনি। এরা 'পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, নিম্নে ফুল ফুটিয়াছে' ধরনের অজস্র কবিতা লেখে, পাড়ার লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে মোটা চাঁদা দিয়ে সে-সব ছাপায় এবং আত্মীয়-স্বজনের বিয়েতে পদ্য ছাপিয়ে বিলি করে। তপ্ত কড়া থেকে ফুটন্ত খোলায় পড়লাম দেখা যাচ্ছে। তবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করলাম এখন আর লেখেন না?

ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললেন—না, মানে সেবার সেই আগুন লেগে সব কবিতা পুড়ে যাবার পর আর—নইলে আজও খ্যাতি থাকতো।

বাঙ্কে রাখা চামড়ার সুটকেসে ভদ্রলোকের নাম সাদা পেন্ট দিয়ে লেখা—দীনেশ রায়।

অনেক ভেবেও এই নামের কোনো কবির রচিত কোনো কবিতা কোথাও পড়েছি বলে মনে করতে পারলাম না। গোটাকতক কবিতা পুড়ে না গেলেই বা ইনি আর কতদূর বিখ্যাত হতেন?

কবিদের ইন্দ্রিয় খুব প্রখর হয়। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে দীনেশ রায় বললেন—আমার নাম আপনার শোনার কথা নয়। সে অনেকদিনের কথা—

হেসে বললাম—আমারও কিন্তু পঞ্চাশ হল। নেহাৎ ছেলেমানুষ নই।

—তাতে কুলোবে না।

—পঞ্চাশেও কুলোবে না? কিন্তু আপনিই বা এমন কি বুড়োমানুষ?

—এখন নই। কিন্তু যখন আমি কবিতা লিখতাম সে সময় ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য চলছে। এবার বলুন, পঞ্চাশে কুলোবে?

আজকাল আবার অনেক রেলের কামরায় গাড়ি থামাবার জন্য শেকল থাকে না। লোক পাঁচটাই বা একসঙ্গে আগের স্টেশনে নেমে গেল কেন যে! এখন এ পাগল হঠাৎ তেড়ে এসে কান কামড়ে ধরলে ঠেকাবে কে? সম্রাট অশোকের সময়কার কবি। দুরারোগ্য কেস। বেশ জোরেই কামড়াবে।

দীনেশ রায় হেসে বললেন—না না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ভয় পাবেন না। একটু গুছিয়ে বললেই আপনি সব বুঝতে পারবেন। ছ-মাস আগে আমার মাথায় একটা ডাব পড়েছিল।

—অ্যাঁ? ডাব?

—ডাব। পিসেমশাইয়ের বয়েস পঁচাত্তর, দেশের বাড়িতে লোক লাগিয়ে ডাব পাড়াচ্ছিলেন। আমি বুঝতে না পেরে গাছের নিচে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, একটা ডাব মাথায় এসে পড়ে।

থাকতে না পেরে বলে ফেললাম—তারপর থেকেই আপনার এইরকম?

মিটিমিটি হেসে দীনেশ রায় বললেন—কি রকম?

—মানে, তারপর থেকেই নিজেকে অশোকের সময়ের কবি বলে মনে হয়?

—হ্যাঁ, তারপর থেকেই। তবে আপনি যে অর্থে বলছেন সে অর্থে নয়। মাথায় চোট লাগবার পর আমি ঘণ্টাখানেক অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। ভাগ্যক্রমে আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। জ্ঞান ফিরে আসার পরই আবিষ্কার করলাম আমি আমার পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারছি। কেবলমাত্র গতজন্ম নয়, বিগত অনেক অনেক জন্মের কথা।

—বলেন কি!

—ঠিকই বলছি। কাউকে বিশেষ বলিনি এ কথা—পাছে আমাকে পাগল মনে করে। কেবল কোলকাতার এক ডাক্তার বন্ধুকে বলেছি। সে মনের ডাক্তারি করে। আমাকে নিয়ে কিসব পরীক্ষা করবার পর তারও বিশ্বাস হয়েছে আমি ঠিক কথাই বলছি। ভারতবর্ষের যেসব জন্মের কথা মনে করতে পারি, সামনের মাসে আমার বন্ধু সেইসব জায়গায় নিয়ে যাবে—তার প্রোগ্রাম তৈরি হচ্ছে। প্রথম প্রথম আমারও ধারণা হয়েছিল বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রত্যেক জন্মের অজস্র খুঁটিনাটি আমার মনে আছে। পাগলে কি এত ডিটেল বানাতে পারে?

কি জানি। পাগল নিয়ে কখনো ঘর করিনি। কিন্তু ভদ্রলোকের ব্যাপারটা আমাকে ক্রমশ আকৃষ্ট করছিল। ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সূর্য পাটে বসেছে, লাল পাথুরে মাটির প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। বহুদূরে আকাশের গায়ে নীল পাহাড় যেন আঁকা। মাঝে মাঝে লাইনের পাশেই মাইলের পর মাইল চলেছে শালবন। সব মিলিয়ে

ভারি রোমান্টিক পরিবেশ। এমন পরিবেশে সবই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ধরনের ডিটেলের কথা আপনি বলছেন?

—যেমন ধরুন, কবি হিসেবে আমার জন্ম হয়েছিল প্রাচীন মিশরে। সূর্যদেবতা রা-এর মন্দিরের এক পুরোহিত আমাকে খুব ভালবাসতেন, তিনি আমাকে প্যাপিরাস দিয়ে কাগজ তৈরি করে দিতেন—সেই কাগজে আমি কবিতা লিখতাম। সে জন্মে পেশায় আমি লিপিকার ছিলাম। তখনকার দিনের মিশরে খুব কম লোকেই লেখাপড়া জানত বলে লিপিকারদের খুব মর্যাদা ছিল। যে রোসেটা স্টোনের লিপির মর্মোদ্ধার করে শাঁপোলিয়ঁ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন, তাও আমারই রচনা। কি বলছিলাম—হ্যাঁ, ডিটেলের কথা—একদিন নীলনদের ধারে আবু-সিম্বেলের মন্দিরের কাছে একটা ঢিবির ওপর বসে কবিতা লিখছি—

বললাম—কি দিয়ে লিখছেন?

দীনেশ রায়কে দমানো কঠিন। হয় ভদ্রলোক প্রকৃতই জাতিস্মর, নয়তো হোমওয়ার্ক খুব ভাল করে করেছেন। বললেন—গাছের কষ আর শস্যপোড়া গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি কালি মাটির দোয়াতে থাকত। লিখতাম প্যাপিরাসের চোখা করে কাটা স্টাইলাস দিয়ে।

বললাম—বলে যান।

—লিখতে লিখতে তাকিয়ে দেখলাম নদীর বুকে একটা কি মাছ ঘাই দিল। কিছুক্ষণ বসে লিখছি, পা চুলকোতে লাগল। কি যেন কামড়াচ্ছে। পরে দেখি সেটা একটা পিঁপড়ের ঢিবি।

এখন আবার মাঝে মাঝে রক কাটিং-এর মধ্যে ঢুকে পড়ছে ট্রেন। কামরার ভেতরে সন্ধের ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। দীনেশ রায় উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। দু-ধারে উঁচু পাথরের দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে গাড়ি যাওয়ার গুম্ গুম্ করে শব্দ হচ্ছে। ভদ্রলোকের বর্ণনার ভঙ্গি সুন্দর। আমার চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেলাম হলুদ বালির চর, ঝকঝকে নীল আকাশ, পাথরের তৈরি আবু-সিম্বেলের মন্দির—ওই যে নীল-নদের বুকে একটা মাছ ঘাই দিল।

যাঃ। এ আবার কি! আমি দীনেশ রায়ের মত ডিটেল বানাতে শুরু করলাম নাকি? মনকে বর্তমানে ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর?

একটা নিঃশ্বাস পেলে দীনেশ রায় বললেন এরপর দু-বছর নীলনদে বন্যা হয়নি, চাষবাসের খুব ক্ষতি হয়েছিল। ওই রুক্ষ দেশ, বন্যার জল না এলে কাজ-কারবার সব বন্ধ।

ট্রেনের গতি কমে আসছে। মিনিট কয়েক পর বরকাকানা জংশনে এসে গাড়ি থামল। টাইম-টেবিলে দেখেছিলাম বরকাকানাতে ট্রেন মিনিট পনেরো দাঁড়ায়, ইঞ্জিন বদল হয় এখানে। এরপর তিন-চার ঘণ্টার ভেতর আর বড় স্টেশন পড়বে না। কাজেই রাত্তিরের খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে নামলাম। প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে খাবারের দোকান, কিন্তু সেখানে দেখলাম তেলেভাজা আটার পুরি, মোটা মোটা লিট্টি আর বোঁদের লাড্ডু ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। অগত্যা সেই খাবারই দু-জনের মতো কিনে বোতলে জল ভরে কামরায় ফিরে এসে দেখি দীনেশ রায় একই ভঙ্গিতে বসে আছেন। তাঁর হাতে একটা ঠোঙা দিয়ে বললাম—নিন্, খান। এছাড়া এসব জায়গায় আর কিছু জুটবে বলে মনে হয় না—

ভদ্রলোক খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বেশ উদারপন্থী। কোনো বিনয় বা বিস্ময় কিছু প্রকাশ না করে আমার হাত থেকে ঠোঙাটা নিয়ে খুলে খেতে শুরু করলেন।

আমাদের খাওয়ার মধ্যেই ট্রেন ছাড়ল। এবার বাইরের দৃশ্য আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, রাত্রির অন্ধকার সব মুছে দিয়েছে। খাওয়া শেষ করে ঠোঙাটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে ভদ্রলোক আমার দিকে হাত বাড়িয়ে অবরুদ্ধ গলায় বললেন—জল—

জল খেয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে দীনেশ রায় বললেন—আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, প্রায় প্রত্যেক জন্মেই আমার জীবনে কিছু না কিছু বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। হয় আমি নিজেই একজন বড় মানুষ ছিলাম, নয়তো কোনো না কোনোভাবে বড় মানুষের বা যুগান্তকারী ঘটনার সংস্পর্শে এসেছি। ধরুন না কেন, উনবিংশ শতাব্দীতে আমি ছিলাম একজন সামান্য নাপিত। প্যারিস শহরে আমার চুল-দাড়ি কাটার দোকান ছিল ১৮২০ সাল নাগাদ। ১৮৬০ সালে আমি মারা যাই, তারপর সে দোকান আর ছিল কিনা জানি না। দেখুন আমি সামান্য নাপিত, কিন্তু আমার দোকানে বিখ্যাত লেখক ভিক্টর হুগো প্রায়ই আসতেন। আর কারো কাছে চুল কাটা তিনি পছন্দ করতেন না। ওঁর বিখ্যাত উপন্যাসটা, কি যেন নাম—

বললাম—লে মিজারেব্‌ল্‌?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—লে মিজারেব্‌ল্‌। সেটার অনেক অংশ আমার দোকানে বসে লেখা।

পরীক্ষা করার নেশা আর চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম—তখন তো সম্রাট নেপোলিয়ান রাজত্ব করছেন?

এক সেকেন্ডও দেরি না করে দীনেশ রায় একইরকম সহজ ভঙ্গিতে বললেন—তিনি তো আমার ছোটবেলাতে সম্রাট হয়েছিলেন। পোপ সপ্তম পিউস তাঁর অভিষেক করেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন নেপোলিয়ন মারা গিয়েছেন।

—আচ্ছা কত পুরনো কথা আপনি মনে করতে পারেন? মিশরে এক জন্মের কথা তো বললেন—সে ধরুন সাড়ে তিন বা চার হাজার বছর আগের কথা। এর চেয়ে পুরনো কিছু মনে নেই আপনার?

বহুদিনকার আব্‌ছা স্মৃতি মনে আনবার চেষ্টা করলে মানুষের চোখে যেমন একটা আলগা ভাসা ভাসা দৃষ্টি ফুটে ওঠে, দীনেশবাবুর মুখভাব সেরকম হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর খুব ধীর গলায় বললেন—অনেক-অনেক আগের এক জন্মের কথা অস্পষ্ট মনে আসে, জানেন? সে যে কতদিন আগের ব্যাপার আমিও তা বলতে পারব না। তখন সময়ের হিসেব ছিল না। বিশাল বিশাল গাছে ভরা এক অরণ্যের মধ্যে আমি থাকতাম। বাড়িঘর বা অন্য মানুষজনের কথা কিছু মনে নেই। সূর্যের তাপ যেন আরো তীব্র ছিল—শন্‌ শন্‌ হাওয়া বইত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আমার ভাবনাচিন্তার কোনো নির্দিষ্ট ধরা ছিল না সে জন্মে, সে জন্য বিশেষ কোনো কিছু মনে করতে পারি না। শুধু মনে পড়ে দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি খাদ্যের সন্ধানে। বোধহয় এটা মানুষের ভাষা আবিষ্কার করবার বা গোষ্ঠীবদ্ধ হবার অনেক আগের কথা। আর নয়তো—

দীনেশ রায় থেমে গেলেন। বললাম—নয়তো কি?

—আর নয়তো ওই জন্মে আমি মানুষ ছিলাম না। বোধহয় কোনো বনের পশু হিসেবে জন্ম নিয়ে থাকবো। একবার বনে ভয়ানক দাবানল দেখা দিল—ওঃ, কি আগুন! দৌড়ে পালাচ্ছি, অন্যান্য জানোয়ারেরাও আমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না। হয়তো ঐ আগুনেই পুড়ে মরেছিলাম।

কে জানে ভদ্রলোক সত্যিই জাতিস্মর কিনা! তবে এই মৃদু আলোকিত ছোট কামরা, চলন্ত ট্রেন, বাইরে ঘনিয়ে আসা কালো রাত—ভালই লাগছিল গল্প শুনতে।

একটা কিছু চিন্তা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে দীনেশ রায় বললেন—যাক্‌গে এসব কথা। ট্রেনে উঠলেই আমার গত জন্মেব, মানে ঠিক এর আগের জন্মের একটা মজার কথা মনে পড়ে যায়।

হেসে বললাম—আরো মজার কথা? কি সেটা?

—গত জন্মে আমার নাম ছিল অবনী সরকার। রাণাঘাটে বাড়ি ছিল, কোলকাতায় চাকরি করতাম। একবার অনেক রাত্তিরের ট্রেনে বাড়ি ফিরতে গিয়ে কামরায় একটা ছোট সুটকেস পাই। কে ভুলে ফেলে গেছে আর কি! তালা দেওয়া ছিল না, মালিকের নাম খোঁজবার জন্য বাক্স খুলে কিছু কাপড় চোপড়, টুথপেস্ট-টুথব্রাশ আর একশিশি জোয়ানের আরক ছাড়া আর কিচ্ছু পাইনি। ডালার ভেতরের দিকে খোপে একজন মহিলার একটা ফটোগ্রাফ ছিল। ছবির পেছনে নাম লেখা—বিভাবতী চৌধুরী। কিন্তু ঠিকানা-টিকানা কিচ্ছু না। এমন কিছু দামী জিনিস ছিল না বলে পয়সা খরচ করে আমি আর মালিকের খোঁজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিইনি। সব মিলিয়ে—সুটকেস নিয়ে শ'দুয়ের বেশি দাম হবে না। আমার চিলেকোঠার ঘরে থেকে গেল বাক্সটা। মজার ব্যাপার বলছি এইজন্যে যে, তখন আমার খুব অম্বলের ব্যামো চলছে, জোয়ানের আরকের শিশিটা নগদ লাভ হয়েছিল। খেয়ে মাসখানেক ভাল ছিলাম। এবার সময় করে রানাঘাট গিয়ে এটার সত্যমিথ্যা যাচাই করে আসবো।

আমি ততক্ষণে সোজা হয়ে বসেছি! বিভাবতী চৌধুরী। রাণাঘাট-শেয়ালদা লাইনে সুটকেস হারানো। নাঃ, দীনেশ বায়ের ব্যাপারটা বোধহয় পুরো গাঁজাখুরি নয়। বিভাবতী আমার মায়ের নাম। বাবা কোলকাতা থেকে নৈহাটিতে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবার সময় ভুল করে ট্রেনে সুটকেস ফেলে আসেন। এ নিয়ে বাবা শেষ পর্যন্ত খুব দুঃখ করতেন। বলতেন—জিনিস গেছে যাক্, কিন্তু তোদের মায়ের ছবিটা ছিল ওই বাক্সে। ওর তো আর ছবি নেই। একটাই ছিল, আমার দোষে সেটাও গেল!

আমাদের দুই ভাইযেরও খুব দুঃখ ছিল এ জন্য। বাবার বাঁধানো ছবির পাশে খালি দেওয়ালটা কেমন অলঙ্কারহীন বলে মনে হয়। নিকট দূর সব আত্মীয়ের কাছে বলে দেখেছি। না, মায়ের ছবি কারো কাছে নেই।

ট্রেনযাত্রার বাকি সময়টুকুও দীনেশ রায় আরো কী সব যেন গল্প করেছিলেন। তাতে মন দেবার অবস্থা আমার নয় তখন। পরদিন গন্তব্যে পৌঁছে আমরা পরস্পরের ঠিকানা বিনিময় করে বিদায় নিলাম।

নিজের সব জরুরী কাজ বাতিল করে দিয়ে দিনচারেক বাদেই হাজির রাণাঘাটে। রাণাঘাট বেশ বড় শহর, কেবলমাত্র একটা নাম সম্বল করে সেখানে কারো ঠিকানা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাও যাঁর নাম—তিনি মারা গেছেন পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে।

কিন্তু কপাল ভাল। বুদ্ধি করে প্রথম প্রশ্ন করলাম এক বছর সত্তর বয়সের বৃদ্ধকে। লাঠি হাতে ভদ্রলোক টুকটুক করে বেড়াচ্ছিলেন, আমার প্রশ্ন শুনে বললেন—কে? অবনী সরকার? কোলকাতায় চাকরী করত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বহুদিন যোগাযোগ ছিল না—মানে আমরা সবাই আবার মাঝখানে দেশের বাইরে ছিলাম কিনা—আপনি চিনতেন নাকি?

—তা চিনতাম বইকি। অবনীদাকে চিনবো না? তার ছেলে এখন বড় ব্যবসায়ী হয়েছে। ওই তো সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিয়ে যে বড় হলুদ দোতলা বাড়ি—

অবনী সরকারের ছেলের বয়েস এখন বাহান্ন-তিপান্ন হবে। খবর পেয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—নমস্কার। আপনাকে তো ঠিক—কোথা থেকে আসছেন?

একটা গল্প মনে মনে বানিয়েই এসেছিলাম, কারণ সত্যি কথা বললে ইনি আমাকে পাগল মনে করবেন। বললাম—দেখুন, ব্যাপারটা অদ্ভুত। বছর ত্রিশেক আগে আপনার বাবা ট্রেনে একটি সুটকেস পেয়েছিলেন, এ বিষয়ে আপনার কিছু মনে পড়ে কি?

সরকার জুনিয়র প্রথমে বোকা বোকা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—পেয়ে থাকলে তাতে কি?

—সুটকেসটা আমার বাবার।

বিস্ময়, অবিশ্বাস এবং আরো কয়েকটি ভাব ভদ্রলোকের মুখের ওপর দিয়ে খেলে গেল।

বললাম—আমি জানি জিনিসটা একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। আসলে আমরা মধ্যে বহুদিন দেশের বাইরে ছিলাম, এ সম্বন্ধে খোঁজখবর করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। কিছুদিন আগে কোলকাতায় আপনার বাবার পরিচিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে ওঁর সুটকেস পাওয়ার গল্পটা আমি শুনি—আপনার বাবাই মজা করে বলে থাকবেন। সেখান থেকে ঠিকানা নিয়েই আমি আসছি। দয়া করে অবিশ্বাস করবেন না। কারণ ও বাক্সে এমন কিছু দামী জিনিসও ছিল না যে, কেউ ঠকাতে চাইবে। আসলে ওর একটা খোপে আমার মায়ের একটা ছবি রয়ে গেছে। আমি শুধু সেইটে চাই—বড় করে বাঁধিয়ে রাখবো। বাক্সটা আপনাদের কাছে আছে কি? মানে, অনেকদিন হল তো?

সরকার জুনিয়র বললেন—না, আমি অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য! সেই কবে বাবা পেয়েছিলেন বাক্সটা, আজ এতবছর পরে তার মালিক এসেছে সেটা দাবি করতে—পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে! চলুন দেখি ছাদে, চিলেকোঠায় ওটা রাখা ছিল। এখন আর পাওয়া যাবে কিনা জানি না—কতবার বাড়ি রঙ হয়েছে তারপর। বিয়ে-থাওয়া, জিনিসপত্র অনেক এধার-ওধার হয়ে গিয়েছে। আসুন এদিক দিয়ে—

গৃহস্থবাড়িতে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে ভাঙাচোরা জিনিস রাখবার ঘরটি। পরিবর্তনের স্রোত এখানে পৌঁছয় না। যেসব বনেদী বাড়িতে রঙিন টেলিভিশন আর কাপড় কাচবার মেশিন এসে গেছে, তাদেরও চিলেকোঠার পুরনো তোরঙ্গ খুঁজলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পোস্টকার্ড পাওয়া যাবে।

বাবার সুটকেসটাও পাওয়া গেল। ভেতরের বুকপকেটে মায়ের ছবিখানা।

দীনেশ রায়কে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আসা উচিত। হপ্তাখানেক বাদে একদিন চলে গেলাম। দরজায় কড়া নাড়তে আটপৌরে শাড়ি পরা বছর পঁয়ত্রিশ বয়েসের একজন মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন—কি চাই?

—আজ্ঞে, আমি দীনেশবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব। উনি কি বাড়ি আছেন?

—আছেন, কিন্তু উনি খুব অসুস্থ। আমি ওঁর স্ত্রী।

—সে কি! কি হয়েছে দীনেশবাবুর?

—বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় খুব আঘাত পেয়েছেন দিন ছয়েক আগে। এখন এমনিতে ভাল আছেন। তবে ডাক্তার আরো এক সপ্তাহ বিছানা থেকে উঠতে বারণ করেছেন।

বললাম আমি ওঁর কাছে একটু যেতে পারি কি? বিরক্ত করব না, একবার দেখেই চলে যাবো।

ভদ্রমহিলা বললেন—বেশ তো আসুন।

আধো অন্ধকার ঘরে দীনেশ রায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন—কে? ওখানে কে? দীনেশবাবুর স্ত্রী বললেন—যান আপনি কথা বলুন। আমি চা করে আনি বরং—

ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমি। চিনতে পারছেন তো? সেই সারারাত্তির ট্রেনে—আমি চৌধুরী।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব খাইয়েছিলেন। যাক্, সত্যি এসেছেন তাহলে। ট্রেনের আলাপ সচরাচর কেউ মনে রাখে না। তারপর কি মনে করে?

মায়ের ছবিটার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ দিলাম। দীনেশবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বললেন—কিসের সুটকেস? কে অবনী সরকার?

—সে কি? সেই নীলনদের তীর, প্যারিসের সেলুন, ভিকটর হুগো, আপনিই তো—

দীনেশবাবু যথার্থ বিস্মিত। বললেন—কি বলছেন মশাই? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মনে পড়ল এবারও চোট লেগেছে মাথায। দ্বিতীয় আঘাতে আবার বিস্মৃতি এসেছে। ওর সত্যিই আর কিছুই মনে নেই। চা খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমার লাভের মধ্যে বাবার ছবির পাশে দেওয়ালের ফাঁকটা ভরাট হযে গেল।

আমন্ত্রণ

সমাজসেবী এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। বসার ঘরে টেবিলের ওপর পরেশ চারখানা খবরের কাগজ সাজিয়ে রেখেছে। গদিওয়ালা রিভলভিং চেয়ারে বসে প্রথম কাগজটা টেনে নিলেন। গতকাল যে জনসভা হয়ে গেল, তার খবর বেরিয়েছে কি? হ্যাঁ, বেরিয়েছে। শত্রুপক্ষের দুখানা কাগজে তাঁকে খুব গালাগালও করেছে। মনটা ভাল হয়ে গেল। এখুনিই ফোন আসতে শুরু করবে। কেউ সমবেদনা জানাবে, কেউ কাগজওয়ালাদের অবিমৃশ্যকারিতায় রেগে উঠবে, নিজের পক্ষের লোকেরা বিকেলের দিকে শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের করার প্রস্তাব করবে। সব মিলিয়ে বেশ গরম-গরম ব্যাপার। প্রশংসায় কিছু এসে যায় না, কেউ বিশ্বাসও করে না। নিন্দা হলে বাজারে নাম সার্কুলেট করে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরেশ বলল—এখন চা দেব স্যার?

—দাও। সঙ্গে দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট এনো।

চা এল। আলাদা পিরিচে বিস্কুট। সমাজসেবী বললেন—বাইরের দরজাটা খুলে দাও, একটু বাতাস আসুক—

দরজায় পর্দা আছে বটে, কিন্তু তলায় অনেকটা ফাঁক, বাতাস চলাচলে বাধা হয় না। বাইরের বারান্দায় বেঞ্চ, মরচে-ধরা লোহার চেয়ার ইত্যাদি পাতা আছে। সাক্ষাৎকারীরা সেখানে এসে বসে।

চায়ে প্রথম চুমুক দিতে দিতেই ফোন এল। সমাজসেবী রিসিভার তুললেন। বহু

দূরভাষ-সংলাপে অভ্যস্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাল্লো!

আমি রমেন বলছি দাদা। আজকের কাগজ দেখেছেন?

—এই তো হাতেই কাগজ। কেন, কী হয়েছে?

—কালকের মিটিংয়ের ব্যাপারটা ছেপেছে, দেখেছেন? 'বার্তাবাহক'-এর সেকেন্ড লিড করেছে, আবার তিনের পাতাতেও টেনে নিয়ে গেছে—

—'বার্তাবাহক' এখনও দেখিনি। 'বাংলার হরকরা' পড়ছি। ঠিকঠাক খবর দিয়েছে তো?

—ওরা পাক্কা শয়তান। আপনি যা বলেছেন, তার সব উল্টো মানে করে যা তা লিখেছে। আমরা এত অ্যালার্ট ছিলাম, 'বার্তাবাহক'-এর রিপোর্টার কী করে ঢুকল, কে জানে!

সমাজসেবী ঠাণ্ডা গলায় বললেন—তোমরা এতে উত্তেজিত হবে না। মনে রাখবে, ওরা যতই আঘাত করবে, আমাদের বর্ম ততই শক্ত হবে।

—কিন্তু দাদা, আমরা আপনাকে ভালবাসি। আমরা প্রতিবাদ জানাবই।

—না না, হঠাৎ কিছু করো না। আমাকে না জানিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না।

—আপনি কী কবতে বলেন?

—দাঁড়াও, আগে কাগজগুলো পড়ি। দেখি কি লিখেছে।

—আচ্ছা দাদা, আমি পরে আবার ফোন করছি।

কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখে সরিয়ে রাখলেন সমাজসেবী। আঃ, এবার ক'দিন চলবে ভালই।

বাইরেব দরজায় পর্দা সবিয়ে ঘরে ঢুকল অনিমেষ।

—গুডমর্নিং স্যার। কাগজ দেখেছেন?

—গুডমর্নিং। হ্যাঁ, দেখলাম। রমেন ফোন করে বলল, তখনই খেয়াল কবলাম। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। পাবলিক ওয়ার্কারকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, এতে গায়ে ফোস্কা পড়বে না।

অনিমেষ বলল—না স্যার। এ ব্যাপারটা আমরা এত সহজে ছেড়ে দেব না। প্রতিবাদ না করলে সবাই ভাববে ব্যাপারটা সত্যি, কিম্বা ভাববে আমরা ভয় পেয়েছি।

—না, কোনো হঠকাবিতা নয়। দেখি আগে কাগজ পড়ে, তারপর মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নেব।

ফোন।

স্মিত-মুখে রিসিভার তুলে সমাজসেবী বললেন—হ্যাল্লোঃ।

না, কাগজ পড়ে উত্তেজিত ভক্তের ফোন নয়। জগদীশ হালদার জিজ্ঞেস করছে বাজারের ওই গোলমালটার বিষয়ে। হকার্স ইউনিয়নকে কী জানানো হবে?

সমাজসেবী বললেন—তুমি বেলা ১১টা নাগাদ এখানে এসো। ফোনে কথা হবে না।

শহরের মূল বাজার ঢেলে সাজানো হচ্ছে। উঠছে নতুন শপিং কমপ্লেক্স! যে-সব হকার ফুটপাথে বা এমনি খোলা জায়গায় মাল নিয়ে বসত, তাদের দাবি, বসার নতুন জায়গা দিতে হবে। প্রমোটাররা নগদে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি, কিন্তু হকাররা টাকায় রাজি নয়, তাদের বসার জায়গা চাই। সমাজসেবীর দৃঢ় বিশ্বাস, মাথাপিছু টাকার পরিমাণ বাড়ালে হকারদের রাজি করানো যাবে। প্রমোটার যতটা বাড়াতে রাজি হবে তার চেয়ে কিছু কমে তিনি হকার্স ইউনিয়নকে রাজি করাবেন। ফারাকের টাকাটা তাঁর।

না, এতে তিনি বিবেকের কোনো কামড় অনুভব করেন না। সব পরিষেবারই মূল্য আছে। হয় প্রমোটাররা নতুন বাড়ি তুলতে পারত না, নয়তো হকাররা উৎখাত হয়ে যেত। তিনি শ্রম, সময় এবং বুদ্ধি ব্যয় করে সব দিক বজায় রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটা সেই কুশলতার মূল্য। একান্ত-প্রাপ্য। টাকাটা অবশ্যই নগদে হাতফেরত হবে। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য ভেড়ি কেনা আছে খুড়তুতো ভাইয়ের বেনামে। মাছের বাচ্চা ছাড়বার জন্য সেখানে প্রচুর টাকা পাঠাতে হবে। এর চেয়ে নিরাপদ আর কী আছে? দেখা যাবে না, জলে ডুবে থাকবে টাকা।

ওরিয়েন্টাল এক্সপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখন দশটা মাছে কিলো হচ্ছে। স্পেশাল হর্মোন ফিডিং করিয়ে সামনের সিজনে সাতটায় কিলো সাইজের মাছ করতে পারলে দাম অনেক বাড়বে। কতটা বাড়বে? আচ্ছা, ধরা যাক যদি—

—স্যার।

পরেশ। বিরক্ত হয়ে সমাজসেবী বললেন—কী?

—আজ্ঞে, একজন দেখা করতে এসেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকালেন সমাজসেবী। বেলা পৌনে ৮টা। খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন—অপেক্ষা করতে বল। কিংবা ঘুরে আসুক। ৯টার আগে আমি যে কারো সঙ্গে দেখা করি না, সেটা বলে দিলে না কেন?

—বলেছিলাম স্যার। বলল, বেলায় সবার সামনে আসার অসুবিধে আছে। তারপর একটু থেমে বলল—মেয়েছেলে, স্যার।

এবার সমাজসেবী নড়ে বসলেন। সবার সামনে আসতে চায় না, আবার মেয়েছেলে!

—কী চায়, বলেছে কিছু?

—আজ্ঞে না। সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। একটু ভেবে সমাজসেবী বললেন—আচ্ছা, নিয়ে এসো।

পর্দা সরিয়ে যে-মেয়েটি ঘরে ঢুকল, তাকে দেখামাত্রই সমাজসেবী তার পরিচয় বুঝে ফেললেন। শ্যামবর্ণ শরীরে গোলাপি রঙের সস্তা সিল্কের শাড়ি, সঙ্গে কটকটে সবুজ রঙের বেমানান ব্লাউজ, পায়ে প্লাস্টিকের চটি, মুখে-চোখে নিষেধহীন পেশায় দীর্ঘদিন রত থাকার কুণ্ঠাহীন প্রচার। তার হাত ধরে আছে একটি বছর আটেকের মেয়ে। পরনে ছিটের ফ্রক, রোগা-রোগা গড়ন, কিন্তু চোখমুখ বেশ সুন্দর। শহরের প্রতিপত্তিশালী, সব চেয়ে নামকরা মানুষটির বাড়িতে এসে সে অবাক বিস্ময়ে বসবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখছে শক্তিমান মানুষটিকে।

মেয়েটি নমস্কার করতে জানে না। যে আবেষ্টনীতে তার বাস, সেখানে এ ধরনের শিষ্টতার বাড়াবাড়ি নেই। ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, এখানে আসার আগে ও নিশ্চয় গল্প শুনেছে সমাজসেবীর, তাঁর খ্যাতির, প্রতিপত্তির, বিত্তের, ক্ষমতার। ওখন রাশভারি চেহারার মানুষটির সঙ্গে সেই সব গল্প মিলিয়ে দেখছে। একচমক দেখেই সমাজসেবীর মনে হল, মেয়েটির মুখের গড়ন বেশ। এই খেলো পোশাক আর অযত্নলালিত শরীরের সামান্য চর্চা করলেই, একেবারে বদলে যাবে ছবিটা।

এদের বসতে বলা উচিত কি না, সমাজসেবী তা স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর টেবিলের সামনে তিনটি চেয়ার আছে, কিন্তু সেখানে এই দুজন বসে প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করছে, এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করতে তাঁর কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। সম্বোধনই বা কী করবেন?

বেশ কিছুক্ষণ এরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবার কথা শুরু না করলে বিসদৃশ দেখায়। সমাজসেবী আঙুল দিয়ে ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁসে-রাখা বেঞ্চিটা দেখিয়ে বললেন—বোস, ওইখানে। কী প্রয়োজন তাড়াতাড়ি বল, একটু পর থেকেই কাজের লোক আসতে শুরু করবে।

বয়স্ক মেয়েটি দ্বিধাহীন, স্পষ্ট গলায় বলল—আমিও কাজের ব্যাপারেই এসেছি।

সমাজসেবী বেশ অবাক হয়ে তাকালেন। মেয়েটির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি একটা প্রায়-সঠিক আন্দাজ করে নিয়েছেন। একটা কোনো প্রার্থনা নিশ্চয় আছে। পুলিস ঝামেলা করছে, বড়বাবুকে বলে দিন। নয়তো লাইন ছেড়ে দিতে চায়, সহকর্মিণী ক'জনকে নিয়ে দল পাকিয়েছে, সেলাই করে রুজি চালাবে—গোটা কতক মেশিন কেনার টাকা সরকার থেকে পাইয়ে দিন। কিন্তু তাদের গলার স্বরে বেশ একটা মানানসই দীনতা আর করুণ প্রার্থী-প্রার্থী ভাব থাকে। এর গলায় বেশ একটা ন্যায্য দাবি চাইতে আসার ইঙ্গিত আছে।

সমাজসেবী পরবর্তী আলোচনার একটা ভিত্তি তৈরি করে নেওয়ার জন্য বললেন—কী নাম তোমার?

মেয়েটি এমনভাবে হাসল যেন সে খুব মজা পেয়েছে। তারপর বলল—বাবু, বুঝতেই তো পেয়েছেন আমি কী ক্লাসের মেয়ে, কী করি, কোথায় থাকি। আমাদের কি আপনাদের মতো নাম-পদবি থাকতে আছে? তবে, কথাবার্তার সুবিধের জন্য ধরে নিন, আমার নাম কল্পনা।

কল্পনার 'বাবু' সম্বোধনে সমাজসেবী কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করলেন। এ সম্বোধনটি *কল্পনাদের পেশায় কেবলমাত্র সম্ভ্রমসূচক মানসিকতা প্রকাশ করে না, তাদের পণ্যের সম্ভাব্য ক্রেতাকেও সূচিত করে। দূর ছাই! সক্কালবেলা এ পাপ এসে জুটল কোত্থেকে, কে জানে!* তিনি বিরক্ত গলায় বললেন—ও আচ্ছা, তা বেশ। কী দরকার, এবার তা-ই বল।

কল্পনা ছোট মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল—এ আমার মেয়ে। এর নাম জয়া।

—তো?

—আমি একে পড়াশুনো শেখাতে চাই। ওকে আমার লাইনে আনতে চাই না।

একটু সোজা হয়ে বসে সমাজসেবী বললেন—সে তো ভাল কথা। শেখাও।

—কোথায় শেখাব?

—কেন, ইয়ে-স্কুলে?

কল্পনা হাসল, বলল—শহরের সব মেয়ে-ইস্কুলে গিয়েছি, কেউ নেবে না।

—সে কি! কেন?

—বুঝতে পারছেন না? আমাদের মেয়েকে কেউ নেয়? গেরস্ত ঘরের মেয়েদের পাশে বসতে দেয়? তা ছাড়া, ওর বাবার নাম কী লেখাব সেখানে? বাবার নাম ছাড়া নেবে ওকে?

৮টা ১০। এখনই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা দরকার।

সমাজসেবী বললেন—ওর বাবার নাম কি?

তিনি জানেন, এই শ্রেণীর মেয়েদের সাধারণত একজন স্বামী-নামধারী রক্ষক থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা দালাল, বাবু ধরে আনে। প্রাথমিক দরদস্তুরও তারাই করে। তারপর ফরমাশ মতো বাবুর পান-সিগ্রেট, মদের বোতল, পেঁয়াজি-ফুলুরি ইত্যাদি এনে দেয়। বাইরে বসে পাহারা দেয়। হাঙ্গামা বাধলে তারাই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এরও নিশ্চয়

তেমন কেউ আছে। তার নামটাই দিয়ে দিক না।

কল্পনা শুকনো গলায় বলল—ওর বাবার নাম কী করে জানব বাবু? কত লোক ঘরে আসছে-যাচ্ছে, তাদেরই মধ্যে কেউ হবে। এই শহরের যারা ভদ্দরলোক, তাদেরই কেউ ওর বাবা। কাকে ধরে রাজি করাব, বলুন?

—ইয়ে, তোমার নিজের মানুষ কেউ নেই?

কল্পনা যেন একটু অবাক হয়ে তাকাল, তারপর বুঝতে পেরে বলল—ওঃ, হ্যাঁ, তা আছে। না থাকলে আমাদের ব্যবসা চলে না। আমার আছে কাঁপা হিমু।

—কাঁপা হিমু?

—হিমাদ্রি। বাঁ হাতটা সব সময় কাঁপে বলে মহল্লায় সবাই কাঁপা হিমু বলে ডাকে।

—তা হলে, তার নামটাই দিয়ে দাও না কেন?

অনেকক্ষণ ধরে কাউকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করার পর যদি আবিষ্কার করা যায় যে, শ্রোতা বিন্দুমাত্র কিছু বুঝতে পারেনি, তখন বক্তার মধ্যে যে হতাশা ও ক্লান্তির লক্ষণ ফুটে ওঠে সেগুলি কল্পনার চেহারায় প্রকট হয়ে উঠল। সে বলল—তা হয় না।

সকালবেলার ছেঁড়া ঝঞ্ঝাটে সমাজসেবী ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। বেশ ঝাঁঝাল গলায় তিনি বললেন—কেন, কেন হয় না?

—সে মেয়ের দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। মেয়ে তার নয়, ইস্কুলে তার নাম দিলে ভবিষ্যতে সেই জোরে মেয়ে যদি সম্পত্তি দাবি করে, বা অন্য কোনও ঝামেলা বাধায়? সে রাজি হলেই বা লাভ কী ছিল? শহর ঘুরে যা বুঝলাম, এখানে আমার মেয়ের কোনো সুবিধে হবে না। সবাই আমাকে দেখামাত্র বুঝে ফেলছে, আমি কে, কী করি। আমার মেয়েকে তারা নেবে না।

—তা হলে, আমি বললেই কী আর নেবে? তাদের কমিটি আছে, মেম্বাররা আছে।

জানালার পাল্লায় একটা চড়ুইপাখি এসে বসল। জয়া এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার সে পাখিটার দিকে তাকাল। জানালার বাইরে একটা নিমগাছ, তার পাতায় ঝিলমিল করছে সকালের রোদ্দুর। চড়ুইটা ঠোঁট ঘষছে জানালার কাঠে। জানালার গরাদের বাইরে গাছ, গাছের ওপাশটার মুক্ত নীল আকাশ। মন হঠাৎই খুশি-খুশি হয়ে ওঠে, যেন কত আনন্দ ছড়িয়ে আছে ওই আকাশের নিচে, কোথায় যেন অনেক ফুল ফুটেছে—সে তুলতে যাবে সেই সব ফুল। অনেক খেলা করা তার বাকি আছে, বাকি আছে অনেক ভাল সময়ের মুখোমুখি হওয়া। বাইরে ওই নীল আকাশের তলায় ঝরা শিউলির মত ছড়িয়ে আছে সুসময়। কিন্তু যাবে কী করে? মাঝে প্রহরীর মত জানালার লোহার গরাদ।

এ-সব কথা জয়া ঠিক এভাবে চিন্তা করেনি। কিন্তু তার এমন মনে হয়েছিল।

কল্পনা বলল—ইস্কুলে ভর্তি হলেই বা লাভ কী? ইস্কুল থেকে মেয়ে বিকেলে ফিরে আসবে আমাদের পাড়ায়। দেখবে, মায়ের সঙ্গে খদ্দের দরাদরি করছে। তারপর বাবু ঘরে বসলে, মেয়ে বাইরে গিয়ে রাস্তার ওপারে ইরফানের চায়ের দোকানে সময় কাটিয়ে আসবে। কখন পড়বে ও? কোথায় বসে পড়বে?

সমাজসেবী মাথা ঠাণ্ডা রাখলেন। বললেন—তুমি কী চাও, ঠিক করে বল তো?

—আপনি আমার মেয়েকে বাইরের কোথাও ভর্তির ব্যবস্থা করে দিন। এমন কোনো জায়গায়, যেখানে থেকে পড়াশুনো করা যায়। যেখানে কেউ আমাকে চেনে না।

—বোর্ডিং স্কুল?

—হ্যাঁ।

—সে আমি কী করে ব্যবস্থা করব? কোথায় তেমন স্কুল আছে, তারা তোমার মেয়েকে নেবে কি না, বোর্ডিংয়ের কত খরচ, তা কে বলবে?

কল্পনা একটু ইতস্তত করে বলল—যতই খরচ হোক, তা যদি আমি মাসে-মাসে আপনাকে এনে দিই? আপনিই পাঠিয়ে দেবেন। বিশ্বাস করুন, কোনো মাস ফাঁক যাবে না। মহল্লায সবাই বলছে, খবরেব কাগজে না কি বেরিয়েছে, কলকাতায় আমাদের মত মেয়েদের বাচ্চাদের জন্য ইস্কুল খোলা হয়েছে, ভাল-ভাল বড় ঘরের দিদিমণিরা পড়ায়!

—কী বিপদ! সে তো কলকাতায়। তারা আমার কথা শুনবে কেন?

—আপনি একটু বললেই হয়ে যাবে। আপনি এত বড় একটা মানুষ, আপনার কথা কি কেউ ফেলতে পারে? জয়া আমার মেয়ে হয়ে জন্মেছে, সে তো ওর দোষ নয়। ও কেন পড়বে না, বড় হবে না, বড় চাকরি করবে না?

৮টা ৩৫। আর নয়। দলের ছেলেপুলে আসতে আরম্ভ করবে এবার।

সমাজসেবী বললেন—খুব ঠিক কথা, তা-ই হওয়া উচিত। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ, গণতান্ত্রিক আদর্শও সেই কথা বলে। তুমি নিজে কলকাতায় গিয়ে যোগাযোগ করে দেখো।

—কালকের মিটিংয়েও আপনি তা-ই বলছিলেন। সবাই সমান। সবার সুযোগ সমান।

চমকে উঠে সমাজসেবী জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কালকের বক্তৃতা শুনেছ না কি?

—শুনেছি তো। ময়দানের ওপাশেই তো আমাদের মহল্লা, মাইকে সব শোনা যাচ্ছিল। তাই জন্যেই তো ভরসা করে এলাম।

—আমি পারব না। আমি চিনি না কাউকে।

কল্পনা কাতব হয়ে বলল—আমার মেয়েটা খারাপ হয়ে যাবে বাবু, দয়া করুন।

এদেব ভাগাতে হলে শক্ত হতে হবে। তিনি বললেন—পারব না। আমার এখন খুব জরুরি কাজ আছে, তোমরা এসো। মনে মনে হিসেব করে নিয়েছেন মহল্লার ভোটার খুব বেশি নয়। তার জন্য এদেব সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

জানালার বাইরে খোলা আকাশটা, যার নিচে মুক্তি। এ-ধারে গরাদ, তার ওপারে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল কল্পনা। মেয়ের হাত ধরে বলল—চল রে জয়া।

দরজার কাছে গিয়ে একবার ফিরে তাকাল, বলল—ব্যবসাতেই নামাই তা হলে, কাকে আর ধরব? অনেক ভাগ্য আঁমার মেয়ের, আপনার মত বড় একজন মানুষ ওর রুজির পথ খুলে দিল। কত বয়েস আপনার? পঞ্চাশ? বাহান্ন? বছর আষ্টেক পরে ষাট হবে। ওই বয়সে পুরুষের ছোঁক-ছোঁক বাড়ে। তা যাবেন, জয়ার ঘরেই যাবেন। ওর তখন ষোল চলবে, ডাগরডোগর হবে। নেমন্তন্ন রইল। চেনা লোক আপনি, কমে-সমে করে দেব।

বাসাবাঁধা আর উড়োপাখি

জ্ঞান হবার পর প্রথম তাকিয়েই শৈশবে দেখেছিলাম পুষ্পদিকে। আর দেখেছিলাম সুবীরের মা কানাইয়ের মাকে। আর ছিল নিখিলদা, মহীতোষ, চন্দ্রাবলী, মনোরমা, পদ্ম, সন্ধ্যা, ননীবালা—এরাও। আরো কত নাম। বলতে কোনোই দ্বিধা নেই, এদের জন্যই আমার শৈশব এবং কৈশোর অনেকখানি স্মরণীয় আর মধুর হয়ে রয়েছে। প্রখর বাস্তবের আলোয় দেখলে এরা ছিল পরিচারক-পরিচারিকা, পাচক-পাচিকা—মাইনে করা কর্মচারী। কিন্তু আমরা সে কথা জানতাম না, এবং মনে হয়—তারাও জানতো না। তারা সবাই দাদুকে

বাবা বলে ডাকতো, দিদিমাকে মা, আর আমার মা ও মাসীদের দিদি। আমি কাউকে ডাকতাম দিদি বলে, কাউকে মাসী। আবার অজ্ঞাত কোনো কারণে একজনকে জেঠিমা বলেও ডাকতাম। এর কথা পরে বলব।

এক একজনের বৈশিষ্ট্য ছিল এক একরকম। আজকাল যেমন সব মানুষ কলে ছাঁটা এক ধাঁচের হয়ে পড়েছে, সবাই একই রকম ভাবে, একই ধরনে জীবনযাপন করে, একজন এবং অপরজনে কোনো প্রভেদ নেই—অন্তত আমার ছোটবেলা পর্যন্ত তেমন ছিল না। মানুষ—তা সে সমাজের যে স্তরেরই বাসিন্দা হোক না কেন—তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সে অনন্য ছিল। যেমন নিখিলদা। কুড়ি-একুশ বছর বয়েসে নিখিলদা আমাদের বাড়ি রান্নার কাজে ঢোকে। পরনে সর্বদা খাকি হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছিল দোতলার ছাদের চিলেকোঠা। নিখিলদার ধারণা ছিল দিনে একটা করে ডিম না খেলে জীবনশক্তি কমে যায়। নিজের সামান্য মাইনে থেকে সে রোজ একটা হাঁসের ডিম কিনে এনে সেদ্ধ করে খেত। রাস্তার মোড়ের বুড়োদাদুর দোকানে তখন ডিম এক একটা দু-আনা। এক টাকার এক সঙ্গে কিনলে ন-টা পাওয়া যায়। নিখিলদা লুকিয়ে বিড়িও খেত। দুপুরে ঘুড়ি ওড়াবার জন্য ছাদে উঠে দেখেছি নিখিলদা বিড়ি টানতে টানতে পায়চারি করছে আর গান গাইছে—হাওয়া মে উড়তা যায় মেরা লাল দু-পাট্টা মলমল কি—আমাদের দেখে বলত—খবর্দাব কাউকে বলবে না আমি বিড়ি খাই, তাহলে ঘুড়ি লুটে দেব—।

সেই নিখিলদা দেখি একদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে বিমর্ষ মুখে চিলেকোঠার সিঁড়ির ওপর বসে আছে। কি ব্যাপার? জিগ্যেস করতে দেখাল—দাদুর দোকান থেকে ডিম কিনে ভুলে হাফপ্যান্টের পকেটে বেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতেই যা হবার তা হয়েছে। দেখলাম নিখিলদার হাতের মধ্যে ভাঙা ডিমের হড়হড়ে রস, বিড়ি-দেশলাই আর একটা ফুলকাটা রুমাল।

কানাইয়ের মা অবশ্য আমাদের বাড়ি কাজ করতো না। সে ছিল আমাদের প্রতিবেশী। পাকা চুলে বড়ি খোঁপা করে থানপরা কানাইয়ের মা একখানা সামান্য ছোট পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মা-দিদিমার সঙ্গে গল্প করতে আসত। গল্পের ভাণ্ডার এবং পরিধি অল্পই, কিন্তু তার জগতটা ছিল আমার অপরিচিত। ফলে অবাক হয়ে শুনতাম কানাইয়ের মার সংসারের কাহিনী। আমার ছোটবেলাতেই কানাইয়ের মা মারা যায়।

সে সময় জিনিসপত্রের দাম ভদ্র সীমার মধ্যে ওঠানামা করতো। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত আগে পর্যন্ত ষোলো-সতেরো টাকা মণ দরে রোজকার খাবার মত চাল পাওয়া যেত। চিনি ছিল একটাকা সের, দুধ টাকায় পাঁচপো-দেড়সের। মাংস সাড়ে তিন টাকা, কয়লা তিন টাকা মণ। দু টাকার তরি-তরকারিতে আট-দশজনের ভালভাবে চলে যেত। স্বাভাবিকভাবেই খাওয়ানো এবং অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে মানুষ এখনকার চেয়ে অনেক উদার ছিল। বাচ্চা ছেলে সুদ্ধু কাজের লোক এখন আর কেউ রাখতে চায় না। পুষ্পদি কিন্তু তার ছেলে ভুবলুকে নিয়ে আমাদের বাড়ি থাকতে এসেছিল, এবং সেটা কেউ অসুবিধের ব্যাপার বলে মনে করেনি। ভুবলু তখন খুব ছোট, একটা জাঙিয়া পরে টলমল পায়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। কাঁচা আটা ছিল তার প্রিয় খাদ্য। দাদু রেশন তুলে আটা ভাঙিয়ে এনে রাখলে ভুবলু থলে থেকে মুঠো করে আটা তুলে খেত। সে এখন কোথায় কে জানে।

দুপুরবেলা খাওয়া হলে পুষ্পদি বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে কাঁথা সেলাই করত।

আমি প্রায় রোজই গিয়ে কাছে বসতাম। পুষ্পদি গল্প বলত—এক ছিল শ্যাল—

পুষ্পদি এখন কোথায় তাই বা কে জানে। বেঁচে থাকলে অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে তার।

জিনিসপত্রের দাম প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে পড়ল, অপ্রাসঙ্গিক হলেও কৌতূহলজনক বলে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তে যেতাম, ব্যারাকপুর থেকে খড়দা ট্রেনে একপিঠের ভাড়া ছিল দশ নয়া পয়সা। মান্থলির দাম ছিল দু-টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে দেড়টাকা ও একুশ টাকা। কলেজে-ই উনিভার্সিটিতে পড়বার সময় শেয়ালদার ট্রেন ভাড়া ছিল ছ-আনা, মান্থলি চার টাকা। এখন যথাক্রমে তিন টাকা ও চল্লিশ টাকা। এসব কিছু মান্ধাতা আমলের কথা নয়, আমার বয়েস এখন চল্লিশ। ছোটবেলায় গরমকালে গলির মোড়ে চট পেতে বসা দোকানীর কাছ থেকে চার আনা কুড়ি দরে বড় বড় মজঃফরপুবের লাল লিচু কিনে খেয়েছি। অর্থাৎ পাঁচসিকে শ'। এখন শ' দরে আর কোথাও লিচু বিক্রি হয় না, হয় কিলোদরে—দাম দশ থেকে বারো টাকা। ডালপালা আর পাতাসুদ্ধ ওজন হয়, কাজেই কিলোতে পঞ্চাশটার বেশি ওঠা সম্ভব নয়। সে হিসেবে একশ'-র দাম দাঁড়ায় কুড়ি থেকে চব্বিশ টাকা। ভোলাবাবুর মিষ্টির দোকানে সিঙাড়া ছিল এক আনা করে, বেশ বড় সাইজের। এখন তার চেয়ে অনেক ছোট সিঙাড়ার দাম পঞ্চাশ পয়সা। রসগোল্লা ছিল দু আনা করে। চার আনা দামের যে রাজভোগ তৈরি হত সে সাইজের মিষ্টির দাম এখন অন্তত দু-টাকা।

এবার আসল কথায় ফিরি।

হৃদ্‌যন্ত্রের বৈক্লব্যে আমার দিদিমা শয্যাশায়ী ছিলেন। কমলাদি এসেছিলেন তাঁর দেখাশুনো করবার জন্য। সঙ্গে মেয়ে কবিতা। কবিতা আর আমি ভাইবোনের মত খেলাধুলো করে বড় হয়েছি। মনে আছে কে যেন বলেছিল বাড়ির দেওয়ালে কোথাও একটা পেরেক আমূল পুঁতে রাখলে ভূমিকম্পে সে বাড়ির কিছু হয় না। তখন আমরা যে পুরনো দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম সেটার গাঁথুনি এমন নড়বড়ে ছিল যে ধাক্কা দিলে দেয়াল কাঁপতো। ছোটবেলায় একবার ভূমিকম্প দেখার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। শেষরাত্তিরে সবার চিৎকারে জেগে দেখি পাড়ায় বাড়ি বাড়ি শাঁখ বাজছে, দাদু ব্যস্ত হয়ে আমাকে একতলার উঠোনে নেমে যেতে বলছেন, আর আমার শোবার খাটটা ঠুকঠুক করে দেয়ালে ঠোকা দিচ্ছে। শিশুরা মৃত্যু জিনিসটা চেনে না, প্রাণের ভয় পাবার বয়েস তখনো আমার হয়নি। সবার ব্যস্ততা দেখে বেশ মজা লেগেছিল। যাই হোক কবিতা আর আমি ঠিক করলাম ছাদের পাঁচিলের গায়ে একটা পেরেক পুঁতে দেব, তাহলে ভূমিকম্পে বাড়ি চাপা পড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। একদিন দুপুরে একটা ছোট্ট এক ইঞ্চি পেরেক জোগাড় করে ন-মাসীর গানের সরঞ্জাম থেকে তবলা ঠোকার হাতুড়ি নিয়ে ছাদের পাঁচিল যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই কোণের মুখে ভাল করে গেঁথে দিলাম। কবিতা বলেছিল—যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অনেক—অনেক দিন পরে, সে বাড়িতে এখন যারা ভাড়া থাকে, কার্যগতিকে তাদের কাছে যাবার দরকার হয়েছিল। কাজ মিটে গেলে বললাম—যদি কিছু মনে না করেন, একবার ছাদটায় ঘুরে আসব? এ বাড়িতে আমার ছোটবেলা কেটেছে, অনেক পুরনো স্মৃতি রয়েছে ছাদটায়—

গৃহস্বামী বললেন—বেশ তো, যান না—তাতে আর কি?

ছাদে উঠে দেখলাম বাড়ি অন্যান্য অংশে সংস্কারকর্ম সাধিত হলেও ছাদের পাঁচিলটা

একইকম রয়েছে। তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পুবদিকে পাঁচিল যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আন্দাজে হাতড়াতে শুরু করা মাত্র হাতে ঠেকল পেরেকের মাথাটা। এখনও আছে তাহলে।

আসন্ন রাত্রির ঘনায়মান ছায়ায় অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। কি এক বিচিত্র অনুভূতি মনে! গত পঁচিশ বছরে জীবন থেকে কত কি হারিয়ে গিয়েছে কত পরিবর্তন হয়েছে—আমিও আর সেই ভূমিকম্পভীত ছোট্ট ছেলেটি নই। কিন্তু এই পেরেকটা বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমার অম্লান শৈশবের প্রতীক হয়ে পাঁচিলের গায়ে গেঁথে রয়েছে। অনেক পুরনো মুখ ভেসে গেল মনের পর্দার ওপর দিয়ে—পরেশ, মঞ্জু, দিলীপ, ল্যাংড়া, বুধো, তাপস—আরো অনেক আবছা মুখ, যাদের প্রীতি এবং ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শটুকু কেবল স্মৃতিতে জেগে আছে, কিন্তু নাম আর মনে করতে পারি না।

কমলাদি সকলেরই দিদি ছিলেন। মা, মাসী, মামা—এমন কি আমরা ছোটরাও দিদি বলেই ডাকতাম। কেবল দাদু আর দিদিমা নাম ধরে ডাকতেন। বাইরের অতিথি এলে বুঝতে পারত না উনি এ বাড়ির লোক নন। বেশ কর্তৃত্বের ভাবও ছিল, মাঝেমাঝেই মাকে বা মাসীদের বকাঝকা করতেন। ওঁরাও তা মেনে নিতেন প্রাপ্য বলে। আজকের দিনে ভাবা যায়! মেয়ে কবিতার বিয়ে হয়ে যাবার পর কমলাদি আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দেন বটে, কিন্তু চিরদিন আসাযাওয়া বজায় রেখেছিলেন। বছর দশেক আগে কমলাদি মারা গিয়েছেন।

আমাদের বাড়িতে দু শ্রেণীর মানুষ কাজ করতে আসত। আমরা এদের নাম দিয়েছিলাম বাসাবাঁধা আর উড়োপাখি। উড়োপাখিরা কয়েকমাস কি একবছর থেকে কেটে পড়ত, আর বাসাবাঁধারা থাকত দীর্ঘদিন—বছরেব পর বছর। কিন্তু একটা ব্যাপার স্বীকার করতেই হবে—এদের দু-দলেরই বিশ্বস্ততা বা লয়্যালটি ছিল প্রশ্নাতীত।

এরকম একজন উড়োপাখি ছিল ভানুমতী। বোধ হয় বছর খানেক আমাদের বাড়ি থাকত। পরনে গাঢ় নীল বা লাল শাড়ি, বয়েস ষাট কি বাষট্টি, কালো রঙ, মাথায় পাকা চুলের রাশ। বারো আনা দামের রবারের টায়ার-কাটা স্যান্ডেল পরে কাজ করতে আসত। হাঁটবার সময় পা থেকে স্যান্ডেল খুলে খুলে যেত বলে একগাছা নারকেলের দড়ি দিয়ে গোড়ালির সঙ্গে বাঁধা থাকত। এর স্থায়িত্বকাল একটা ছোট্ট কিন্তু মজার ঘটনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। আমাদের ভাড়াবাড়ির পাশে পার্শীদের রয়্যাল হোটেল বিক্রি হয়ে যাবার সময় দাদু সস্তায় তাদের অনেক আসবাবপত্র কিনে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল একটা শ্বেতপাথরের লম্বাটে টেবিল, আমি সকালে স্কুলে বেরুবার সময় সেই টেবিলে বসে ধোঁয়াওঠা ফ্যানেভাত আলু সেদ্ধ আর সর্ষের তেল দিয়ে মেখে খেয়ে ট্রেন ধরতে ছুটতাম। এর ওপরের শ্বেতপাথরটা খুলে আলাদা করা যেত। একদিন দুপুরে ভানুমতী পাথরের স্ল্যাবটা নামিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে ভেঙে ফেলল। সবারই খুব সখের জিনিস, ভেঙেছেও এমন ভাবে যে আর কিছুই করবার নেই। একচোট বকাঝকা করার পর বাড়ি যখন আবার শান্ত হয়ে এসেছে, সেই নির্জনতার সুযোগে ভানুমতী নিজের বুদ্ধি মত পাথরটা মেরামত করতে বসল। আমরা সেটা জানতাম না। রাত্তিরে খেতে বসার সময় দেখা গেল শ্বেতপাথরটা যথাস্থানে সন্নিবেশিত, কেবল যেখান দিয়ে ভেঙেছে সেখানে ইঞ্চিখানেক চওড়া ফিতের মত দাগ। সবাই অবাক! এ আবার কি! পরে বড়মামা নখ দিয়ে খুঁটে দেখলেন জিনিসটা শুকিয়ে যাওয়া আটার পুলটিস। তখন সবার কি হাসি। পৌনে একমণ ওজনের দু-খানা হয়ে যাওয়া শ্বেতপাথর কখনো আটার গোলা দিয়ে জোড়া

লাগানো যায়? ভানুমতী বেচারী আর কি করবে? সে তার বুদ্ধিমত আমাদের উপকার করারই চেষ্টা করেছিল। পরের দিন সকালে হাসি হাসি মুখে ভানুমতীর প্রবেশ। আমরাও সবাই তাকে বেজায় হৈ চৈ করে সম্বর্ধনা জানালাম। হকচকিয়ে গিয়ে বেচারী অনেকক্ষণ বুঝতেই পারল না উচ্ছ্বাসটা সত্যি কিনা।

নারায়ণ মিশির উড়োপাখি হিসেবে এসে আমাদের ভালবাসা পেয়ে বাসাবাঁধা হয়ে পড়েছিল। প্রায় ছ-ফুট লম্বা, টকটকে ফর্সা রঙ, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, আবার মাথার পেছনে একটা নাতিদীর্ঘ টিকি। পরনে মোটা ধুতি আর গেঞ্জি। নারায়ণ বিড়ি খেত না। কিন্তু পান খেত। রান্নার হাত ছিল ভারি সুন্দর। মেয়েরাও অমন রান্না করতে পারে না। একদিন নারায়ণ বিনীতমুখে দাদুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—বাবু, আমাকে আজ বিকেলে ছুটি দিতে হবে। ও বেলার রান্না এবেলা করে রাখব। দাদু চশমা চোখে দিয়ে হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পড়ছিলেন, মুখ তুলে বললেন—কেন?

—আজ্ঞে, এমনিই—

—এমনি কেউ ছুটি চায় না। কারো সঙ্গে দেখা করতে যাবে? দেশের লোক কেউ?

এখানে নারায়ণ একটা মিথ্যে বললেই চলে যেত, যেমন আজকাল আমরা দিনে সাড়ে সতেরো হাজার বলে থাকি। তাতে কারো বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সে সময়কার মানুষগুলো বেশিরভাগ ছিল বেশ সরল, হঠাৎ মিথ্যে কথা বলতে চাইত না। নারায়ণ বলল—না। কারো সঙ্গে দেখা করতে যাবো না। বিকেলে একটু ইয়ে আছে—

দাদু বিরক্ত হয়ে আবার কাগজে মনোনিবেশ করে বললেন—কারণ না বললে ছুটি হবে না। ফাঁপরে পড়ে নারায়ণ বলল—আমি উড়ন খাটোলায় যাবো—

আশ্চর্য হয়ে দাদু কাগজ নামিয়ে চোখ থেকে চশমা খুলে বললেন—কিসে যাবে?

—আজ্ঞে, উড়ন খাটোলায়।

দাদু সেকেলে মানুষ, আধুনিক যুগের আমোদপ্রমোদের খবর রাখতেন না। তিনি কিছু বুঝতে না পেরে বললেন—সেটা আবার কি জিনিস? কোনো জায়গার নাম?

বিপন্ন এবং ঘর্মাক্ত নারায়ণ স্বীয় নামধারী বিপদতারণ দেবতাকে মনে মনে স্মরণ করে বলল—না বাবু ওটা একটা সিনেমার নাম। খুব ভাল সিনেমার নাম। খুব ভাল সিনেমা—দিলীপকুমার আছে—

দাদু কি বুঝলেন জানি না, একটু সূক্ষ্ম হাসি হেসে বললেন—আচ্ছা, যেও এখন। রাতে সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছাদে গিয়ে উদাস হয়ে নীরুদার উঠোনের তালগাছটার মাথার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, বেসুরো গলায় গান গায়—আর লাগুক না লাগুক অপ্রাসঙ্গিকভাবে 'ম্যায় হুঁ দূর কি মুসাফির', 'জান যায় পর বচন না যায়', 'যবসে দেখা নিদ মেরা হারাম' ইত্যাদি বলে। এর মধ্যে আবার পড়ল হোলি। একটা ক্রেপ পেপারের টুপি কিনে সারাদিন মাথায় দিয়ে ঘুরল নারায়ণ, সে টুপির ওপর বড় বড় লাল অক্ষরে হিন্দিতে লেখা—প্রেম সুপারি। মানে কি কে জানে! বসন্ত কেটে বৈশাখের মাঝামাঝি জোর গরম পড়ায় নারায়ণের মাথা থেকে উড়ন খাটোলার ভূত নামে।

আমাদের দেশের বাড়ির কাছাকাছি কোনো গ্রাম থেকে এসেছিল কালিদাসী। নামের সঙ্গে চেহারার কেমন মিল ছিল। লম্বা, সিড়িঙ্গে মত শরীর, ঘোর কালো রঙ, বয়েস পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ লোকটা। শান্ত ভালমানুষ গোছের, তিনবার না বললে কি করতে বলা হচ্ছে বুঝতে পারে না, এবং তার পরেও কাজটা গোলমাল করে ফেলে। কিন্তু শান্ত স্বভাবের জন্য কেউ তার ওপর রাগ করতো না। একদিন লক্ষ্য করা গেল কালিদাসী কাজ

করতে করতে মাঝে মাঝে খুকখুক করে কাশছে। দিদিমার মাথার কাছে কুলুঙ্গিতে তখনকার দিনের বিখ্যাত কাশির সিরাপ জেফ্‌রল থাকত, কালিদাসীকে তাই দু-চামচ করে খেতে দেওয়া হল।

কিন্তু তিন-চারদিন পরেও কালিদাসীর কাশি কমল না। দিদিমা বললেন—ওকে একটু ডাক্তার দেখিয়ে দে তোরা, কষ্ট পাচ্ছে বেচারী।

বসন্তবাবু ছিলেন আমাদের বাড়ির ডাক্তার। হাতযশ ছিল দারুণ। বেঁটেখাটো, ফর্সা, স্বাস্থ্যবান মাঝবয়েসী লোক। কারো অসুখ-বিসুখ হলে ছ-দাগ মিক্সচার আর ছ-টা পুরিয়া দিতেন। তাতেই সচরাচর আমাদের শরীর ভাল হয়ে যেত। নেহাৎ বাড়াবাড়ি হলে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল কিম্বা ইনজেকশন। আধুনিক ডাক্তারবাবুরা যেমন চেম্বারে রুগী পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ঠুকে দেন, ঘন বাঁশ ঝাড়ে একটা না একটা বাঁশে ঢিল লাগবেই ভেবে—বসন্তবাবু তেমন ছিলেন না। বলতেন—ওসব হচ্ছে লাইফ সেভিং ড্রাগ, মিসইউজ করতে নেই। প্রায় হপ্তাতেই একদিন দিদিমার হার্ট চেক-আপ্ করতে আসতেন। পরের দিনই বসন্তবাবুর আসার কথা ছিল। তিনি এসে কালিদাসীকে দেখে দাদুকে বললেন—কাশিটা ভাল না। কয়েকটা পরীক্ষা করিয়ে নিন। ছেলেপুলে রয়েছে বাড়িতে, অবহেলা করবেন না।

এক্স-রে এবং অন্যান্য পরীক্ষায় প্রকাশ পেল কালিদাসীর যক্ষ্মা হয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়াটা কারো অপরাধ নয়, অসুস্থতার কারণে একজনকে তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যায় না। কিন্তু টিবি সম্বন্ধে আপামর জনসাধারণের একটা ভীতি আছে। বড়রা বসে ঠিক করলেন আপাতত কালিদাসী গ্রামে গিয়ে ক-দিন থাকুক, তার মধ্যে কোনো হাসপাতালে ভর্তির যোগাযোগ করে তাকে নিয়ে আসা হবে। এমনিতে কালিদাসী মাসীদের ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শুত, সেদিন তাকে সিঁড়ির ঘরে শুতে বলা হল, তার থালাবাটি আলাদা করে দেওয়া হল। বসন্তবাবু বলে গিয়েছিলেন এসব রোগীর পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত, সেজন্য কালিদাসীকে এক বোতল হরলিক্স্ কিনে দেওয়া হল। এখনো যেন পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ছাদে ওঠবার সিঁড়ির ধাপে একগ্লাস হরলিক্স হাতে বিমর্ষ মুখে বসে আছে কালিদাসী, তার জবাব হয়ে গিয়েছে।

ছোটরা পরিষ্কার করে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না, তা বলে তাদের অনুভূতিশক্তি কম নয়। কালিদাসীর অবস্থা দেখে আমার মনের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। পাশের ফ্ল্যাট থেকে বন্ধু নাড়ুকে ডেকে ব্যাপারটা বললাম। সেও বলল—কালীদাসী জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর জন্য কি করা উচিত এবং তা কিভাবে করতে হয় সেটা আট-বছরের শিশুর জানবার কথা না। অনেক ভেবে আমরা দুজনে একটা পন্থা ঠিক করলাম, কালিদাসীর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললাম—মাসী তুমি আমাদের মায়ের মত।

শুনে কালিদাসী কিন্তু খুশীও হল না, হাসলও না। দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে হরলিক্সের গ্লাস হাতে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল।

কালিদাসী পুরোপুরি সেরে উঠেছিল কি না জানি না, তবে এর পরেও সে বহুদিন বেঁচে ছিল। কিন্তু আমাদের বাড়ি আর ফিরে আসে নি।

অমিয়বালার কথা বলে এই কাহিনীর প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে। কারণ নিজের অতীতস্মৃতি ব্যক্তিগতভাবে সুখকর হলেও অন্যের কাছে হয়তো তার মূল্য সামান্যই। অতিকথন এক্ষেত্রে বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে।

অমিয়বালা যখন প্রথম আসে সে সময় আমি বোধহয় স্কুলের শেষধাপে, কিম্বা সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি। পুরো নাম ছিল অমিয়বালা কর। রেললাইনের ওপারে কচুরিপানায় ভর্তি ডোবার পাশে যে মাঠটা, যার সামনে মেয়েদের হাইস্কুল, সেই মাঠে একটা টালির ঘরে অমিয়বালা থাকত। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট উঠোন, টালির চালে লাউ-কুমড়োর লতা। ত্রিসংসারে কেউ নেই—এক বলদা ছাড়া। বলদা হচ্ছে অমিয়বালার পোষা ছাগল; তার অনিন্দ্য স্বাস্থ্য দেখলে নামের উৎপত্তির যাথার্থ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

অমিয়বালার বয়েস পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন, বেশ মাতৃত্বপূর্ণ চেহারা। রঙ্ কালোর দিকে, মাথায় তেলে লেপটানো কোঁকড়া চুল। হাসলে ঝিঙের বিচির মত কালো দাঁত দেখা যায়। সারাদিনে পঁচিশ-ত্রিশটা পান খেত অমিয়বালা, সঙ্গে হাতে তৈরি করা দোক্তা। বাড়িতে তার সার্বজনীন নাম ছিল 'রাঁধুনীদি'—আমি কেবল ডাকতাম 'জেঠিমা' বলে। আদরের ডাক, অমিয়বালাও খুব খুশি হত।

বলদা ছিল চাঁদকপালে। নিজের ছেলেপুলে না থাকায় অমিয়বালা তার ভালবাসা সবটুকু বলদাকে দান করেছিল। তখন আমাদের যৌথ পরিবার, রোজ একরাশ তরকারী কোটা হত। দুপুরে রান্না করে বাড়ি যাবার সময় অমিয়বালা সেই তরকারীর খোসা আর ভাতের ফেন নিয়ে যেত বলদাকে খাওয়ানোর জন্য। সন্ধ্যেবেলা মশা কামড়াবে বলে ঘুঁটে জ্বেলে ধোঁয়া করা হত। শীতের দিনে ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দিয়ে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। খুব বেশি শীত পড়লে বলদা বাইরে থাকতে চাইত না, অমিয়বালা তখন তাকে নিজের বিছানায় নিয়ে শুত। বলদার কপাল দেখে পাড়ার বাপ-মায়ের তাড়নাপ্রাপ্ত বহু ছেলে গোপনে পরজন্মে অমিয়বালার ছাগল হয়ে জন্মাবার প্রার্থনা করত।

খাওয়াদাওয়া এবং জামাকাপড়ের ব্যবস্থা আমাদের বাড়ি থেকেই হত, কাজেই অমিয়বালার টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তার প্রাপ্য মাইনে মায়ের কাছে জমতেই থাকত। একদিন মা ডেকে বললেন—অমিয় তোমার টাকা কিছু কিছু করে নিতে শুরু কর। এত জমে গিয়েছে, একসঙ্গে চাইলে আমার দিতে অসুবিধে হবে।

অমিয়বালা হেসে বলল—জমুক না মেজদি, আমার কাছে থাকাও যা—আপনার কাছে থাকাও তাই। আমার যা ঘরদোর, পয়সাকড়ি রাখলে সব চুরি হয়ে যাবে।' তারপর একটু লাজুক হাসি হেসে বলল—অনেকদিনের এক সখ আছে মনে, আর কিছু জমলে সেটা এবার মিটিয়ে ফেলবো—

মা কৌতূহলী হয়ে বললেন—কি সখ তোমার?

—একটা সোনার বিছেহার গড়াবো মেজদি। সারাজীবন কাঁচের চুড়ি পরে কাটল, শেষজীবনটা একটু আহ্লাদ করে নিই—

কিছুদিন বাদে মায়ের পরামর্শে অমিয়বালা সোনার দোকানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এল। তখন বোধহয় সোনার ভরি আড়াইশো টাকা বা তার কাছাকাছি। হিসেব করে দেখা গেল মনের মত করে একখানা বিছেহার গড়াতে সাড়ে-সাতশো টাকার মত পড়বে, মজুরি নিয়ে। অমিয়বালা দমবার পাত্রী নয়। মায়ের কাছে দুশো টাকা জমেছিল, সেটা নিয়ে স্যাক্‌রার দোকানে জমা দিয়ে এল। মাকে বলল—আর বছর দেড়েকের মধ্যে বাকি টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। কিছু কিছু করে দিয়ে আসব এখন—

পাঁচ-ছমাস অন্তর সে কিছু টাকা স্যাকরাকে দিয়ে আসত। ইস্কুলে সাধারণ জ্ঞানের বইতে সমুদ্রগর্ভে অধ্যবসায়ী প্রবাল কীটেদের কথা পড়েছিলাম, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একটু একটু করে তারা প্রবালদ্বীপ গড়ে তোলে। অমিয়বালার বিছেহারের উপখ্যান ইতিহাসে

স্থান পাবার যোগ্য।

বছরে একটা দিন রাঁধুনীদির ছুটি চাই-ই। সেটা হচ্ছে কালীপুজোর দিন। এদিন সে রীতিমত সমারোহ করে মহালক্ষ্মী পূজো করত। পরের দিন সকালে আমি উৎসুক হয়ে বসে থাকতাম, অমিয়বালা কখন প্রসাদ নিয়ে আসবে। বেলা ন-টা নাগাদ সে দেখা দিত। হাতে ফর্সা কাপড় দিয়ে ঢাকা বড় পরাত, তাতে নারকেলের নাড়ু, খইয়ের মোয়া, লেবুর গন্ধওয়ালা চৌকো সন্দেশ, মুড়কি, প্রচুর ফল ইত্যাদি। নিজের সত্যিকারের জেঠিমার মত অমিয়বালা আমাকে পাশে বসে খাওয়াতো। শুধু প্রসাদ বলে নয়, আমাকে সে ভালবাসতো সবদিক দিয়েই। কলেজে বেরুবার সময় চটপট্ রান্না করে দেওয়া, কি কি খেতে ভালবাসি তা খবর রাখা—এখন পরিণত বুদ্ধি দিয়ে ভাবলে অবাক হই, কি স্বার্থ ছিল তাদের?

একটা লাভ অবশ্য হয়েছে। মানুষ জানে সে অমর নয়, সে জন্যেই পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় সে তার কথা স্মরণ করে বেদনাবোধ করবার মত কাউকে রেখে যেতে চায়। তার স্মৃতির ভেতর দিয়েই সে অমরত্ব লাভ করে। অপত্যকামনার উৎসও বোধহয় স্বীয় জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার এই আকাঙ্ক্ষাতেই। এদিক দিয়ে অমিয়বালার প্রচেষ্টা সার্থক। আজ সে আর পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তার কথা লেখবার জন্য আমাকে কলম ধরতে হয়েছে।

একদিন সকালে রাঁধুনীদি কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির। সবাই সন্ত্রস্ত। মা জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে অমিয়, কাঁদছো কেন?

অমনি অমিয়বালা গলা ছেড়ে ডুকরে উঠলো—ওরে আমার বলদা রে—

সর্বনাশ। বলদার কি হয়েছে?

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে জানা গেল লোভী বলদা সকালবেলা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রেললাইনের ধারে কচি ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। ছ-টা বারো মিনিটের সমস্তিপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে!

কি বিপদ। মরে গেছে নাকি? তাহলে তো রাঁধুনীদিকেও বাঁচানো কঠিন হবে।

খবর বের করা গেল—মরে নি এখনো। তবে খুব বাকিও নেই। ধুঁকছে।

আমাদের পরামর্শে অমিয়বালা মৃতপ্রায় বলদাকে চটের থলে দিয়ে জড়িয়ে রিক্সায় করে ধোবিঘাটের কাছে সরকারী পশু চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেল। আমরা অন্তিম সংবাদের অপেক্ষায় রইলাম।

ধন্য বলদার জীবনীশক্তি! ছোটবেলায় যে স্বাস্থ্যবইতে পড়েছিলাম ভাতের ফ্যান আর তরকারীর খোসাতে প্রচুর ভিটামিন, সে কি আর মিথ্যে। অমন নাদুস চেহারা বলদার, মেলট্রেনের ধাক্কায় তার কি করবে? তিন-চারদিন শুয়ে থেকে বলদা উঠে আবার ঘাস খেতে গেল।

দুপুরে খেয়েদেয়ে একবার বলদাকে দেখতে বাড়ি যেত অমিয়বালা। যাবার আগে মায়ের কাছে এসে বলত—একটা পান খাবেন নাকি মেজদি?

মায়ের পানের নেশা নেই, তবু বলতেন—দাও।

পান মুখে দু-জনে কত মনের কথা হত, কত সুখদুঃখের গল্প।

এইচ. জি ওয়েল্‌স্ তাঁর কোনো একটা ছোটগল্পের প্রারম্ভে (সম্ভবত The Diamond Maker) বলেছিলেন—'প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা গল্প আছে, লেখককে সেটা বের করে আনতে হয়।' পৃথিবীতে কোনো দু-জন মানুষের আঙুলের ছাপ যেমন একরকম হয় না, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তেমনি আলাদা। সেইটে একবার ধরে ফেলতে পারলেই

গল্পটা বেরিয়ে আসে। অমিয়বালা সাধারণ মানুষ, তার জীবনে রাণী ভিকটোরিয়া বা জোয়ান অফ আর্কের বৈচিত্র্য কোথা থেকে আসবে? কিন্তু একটা অদ্ভুত বাতিক তাকে আমাদের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছে।

বাতিকটা হল রান্নায় অত্যধিক লঙ্কার ব্যবহার।

মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছি, এবং মামারা বাঙাল—খাস ফরিদপুরের লোক। কাজেই রান্নায় ঝাল দিলে আপত্তি নেই। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। এমন একটা সময় এল যখন বাড়িতে সবারই অম্বল, বুকজ্বালা আর আমাশা শুরু হল—এবং অমিয়বালার রান্না দু-বার করে জানান দিতে লাগল। একবার খাওয়ার সময়, আর একবার পরদিন প্রাতঃকৃত্যের সময়। বাড়ির সবাই বিরক্ত হয়ে বলল আর তো পারা যায় না। রাঁধুনীদিকে ডেকে সাবধান করে দেওয়া হল—খবরদার রান্নায় এত লঙ্কা দেবে না।

কে কার কথা শোনে? রান্নায় সমান লঙ্কা চলতে লাগল। বসন্তবাবু রেগে বললেন—রান্নায় মশলা না কমালে আমার ওষুধে রোগ সারবে না। বাড়ির বেড়ালগুলো পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশীদের কাছে আশ্রয় নিল। তখন দাদু ব্যাপারটা নিজের হাতে নিলেন। একটা ঘরোয়া কমিটির বৈঠকে রাঁধুনীদিকে ডেকে বলা হল—তুমি আরম্ভ করেছো কি? লঙ্কাবাটা খাইয়ে আমাদের মারতে চাও?

অমিয়বালা স্মিতমুখে বলল—আপনারা বারণ করার পর আর বেশি লঙ্কা দিই না তো, এখন অনেক কমিয়ে দিয়েছি, এই আঙুলের ডগায় করে একটুখানি বাটা—

পাঁচ আঙুল ফাঁক করে বিশাল থাবা বানিয়ে সে 'একটুখানি বাটা' দেখাল।

মাসীরা শিউরে উঠে বলল—না না, তুমি আর একেবারেই লঙ্কা দেবে না—

অমিয়বালা ঘাড় বাঁকা করে বলল—লঙ্কা না দিলে আমি রেঁধে সুখ পাই না—

কি বিপদ। কথা বললে শোনে না যে! কিন্তু অমিয়বালাকে কেউ বিশেষ ঘাঁটাতো না। তখনকার মত কমিটির মিটিং শেষ করে দিয়ে গোপনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—মাস শেষ হতে আর দেরি নেই। এবার থেকে মাসকাবারি বাজারে লঙ্কা আনা বন্ধ।

মাসের প্রথম কয়েকদিন অমিয়বালা ম্রিয়মাণ হয়ে রইল, যেন তার জীবন থেকে একটা বড় সুখ চিরকালের জন্য চলে গিয়েছে। দিনদশেক বাদে অবশ্য তার সে ভাবটা চলে গেল। একটা দুঃখ নিয়ে মানুষ ক-দিন পড়ে থাকতে পারে? সবই শেষে সয়ে যায়—

তারপর একটু একটু করে আবার অম্বল, পেটে ভুটভাট, মাঝে মাঝে আমাশা। প্রথমে কেউ খেয়াল করেনি, জিনিসটা এতই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বাজার থেকে আর লঙ্কা আসছে না, পেটের গোলমাল হবে কি করে?

কে একজন বলল—লঙ্কা আসে না, রান্না কিন্তু বেশ ঝাল লাগছে আবার—

সবাই তাকে বোঝাল—ও তোর মনের ভুল। ঝাল খেয়ে খেয়ে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে কিনা, তাই—

একদিন বাড়ির কে যেন মুদিখানায় কি কিনতে গিয়েছে, মুদি তাকে বলল—বারবার খুচখুচ করে মশলাপাতি না নিয়ে একবারে মাসকাবারি বাজারের সময় নিয়ে নিলেই তো পারেন—

—সে কি। মাসকাবাড়ি ছাড়া আমরা তো কিছু নিই না!

—কে বলল? আপনাদের রাঁধুনী রোজ নগদ পয়সায় শুকনো লঙ্কা কিনে নিয়ে যায়—

বোঝো কাণ্ড! অমিয়বালাকে ডেকে খুঁটিয়ে জেরা করতে আসল কথা বেরিয়ে পড়ল।

সে নিজের পয়সা খরচ করে শুকনো লঙ্কা কিনে নিয়ে আসে রান্নায় দেবার জন্য। প্রচুর বকাবকি করাতে সে রেগে বলল—অমন করলে কিন্তু আমি আর কাজ করতে পারব না। রান্নায় লঙ্কা না দিলে আমি মরে যাব। আচ্ছা, এখন থেকে কম দেবো কথা দিচ্ছি—কিন্তু দেবো। নইলে বলুন, আমি কাজ ছেড়ে চলে যাই।

পরের মাস থেকে সামান্য লঙ্কা আনা হতে লাগল।

অমিয়বালার জীবনের পরিণতি বড় করুণ। মাঝে মাঝে সততা, ধর্ম, ঈশ্বর সবকিছুর ওপর গভীর অবিশ্বাস জন্মায়। ভাল মানুষরা এত কষ্ট পায়, তাহলে আর পৃথিবীতে justice কোথায়? কিছু নেই, কিছু নেই। অন্ধ হৃদয়হীন শক্তির প্রবাহে জীবনতরী ভাসমান।

একদিন অমিয়বালা বিকেলের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে চলে গেল। মা জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে গো? শরীর খারাপ?

—হ্যাঁ মেজদি। কেমন যেন জ্বর জ্বর লাগছে, গায়ে ব্যথা! একটু শুয়ে থাকি গে—

দু'দিন সে আসতে না পারায় খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম অমিয়বালার বসন্ত হয়েছে। ওঠার ক্ষমতা নেই। পাড়ার রামপদর মা দুবেলা এসে দেখে যায় আর সাবু করে দিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বললাম, জ্বরের ঘোরে অমিয়বালা জড়িয়ে জড়িয়ে কি উত্তর দিল ভাল বোঝা গেল না।

বসন্ত হয়েছে, সময়মত নিজেই সারবে। কাজেই মাঝে তিন-চারদিন খোঁজ করতে যাইনি। চতুর্থ দিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে একবার অমিয়বালাকে দেখতে গেলাম। তার বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না, রাস্তায় রামপদর মায়ের সঙ্গে দেখা। তার মুখ ভীত, শুকনো। বললাম—কি হয়েছে মাসি? মুখ অমন করে রয়েছ কেন?

—বাবা, সব্বোনাশ হয়েছে। পরশু হাসপাতালের ডাক্তার এসেছিল, সে অমিয়কে দেখে বলেছে এ পানিবসন্ত নয়, এ আসল বসন্ত। মুনসিপালি থেকে গাড়ি করে অমিয়কে কাল বেলেঘাটার সেই কি বলে, সেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কি হবে বাবা—

কয়েকদিন আমাদের শহরে খুব হই-চই হল। দেশে স্মলপক্স নেই এ কথা সরকার ঘোষণা করেছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকে দেওয়াও বন্ধ। তারপর একি কাণ্ড।

শেষপর্যন্ত অবশ্য কিছুই হল না। অমিয়বালা মারা গেল সেই সপ্তাহেই। তার মৃত্যু হাসপাতালে কিভাবে নথিভুক্ত হল জানি না। পৌরসভা থেকে কর্মীরা এসে তার ছেড়ে যাওয়া ঘর ওষুধ ছিটিয়ে, ফিউমিগেট করে দিয়ে গেল। বলদাকে নিয়ে গেল রামপদর মা। সত্যিকারের ক্ষতি যা হল তা বলদারই।

আজও আমাদের সংসারে দুজন সহায়ক কর্মী রয়েছেন। তাঁরা ঘড়ি ধরে আসেন এবং যান। সম্পর্কটা বেতনের। তাঁরা আরতি, ছায়ারাণী, সরস্বতী কিম্বা মেনকা। মাসী দিদি বা জেঠিমা নন। হয়তো আমাদেরই আচরণের ত্রুটি, হয়তো সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিণতি—মোটকথা বাসাবাঁধারা আর নেই, সব উড়োপাখি।

প্রবাহ

মধ্যবিত্ত সংসারে যেমন হয়—সারাবছর বাড়িঘর ওপর ওপর ঝেড়েপুঁছে কাজ চলে। রোজই ন্যাতা দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করা হয়, বারান্দাটাও দিনে একবার জল ঢেলে ধোয়া হয়, কিন্তু সবটাই ওপর ওপর। বাড়িতে বিকেলে লোক আসার কথা থাকলে বড়জোর

টেবিলের চিনেমাটির ফুলদানিতে কিছু শীর্ণ রজনীগন্ধার ডাঁটি কিনে এনে সাজিয়ে দেওয়া হয়, বিছানার রঙ ওঠা বাঁকুড়ার বেড় কভারের ওপরে এইসব আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য তুলে রাখা একটা বোম্বে ডাইং-এর ফুলকাটা চাদরের আবরণ পড়ে (অতিথি বিদায় নেওয়া মাত্র সেটি আবার তক্ষুনি যত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা হবে)। ছেঁড়া জামা আর গৃহিণীর বাতিল শাড়ির অংশ আত্মগোপন করে খাটের নিচে। পায়াভাঙা চেয়ারটা—যেটা গৃহস্বামীর ঔদাসীন্যের সুযোগে বহুদিন হল বারান্দার এককোণে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—সেটা একতলার কোণেরদিকে ভাঙাচোরা আসবাব রাখার ঘরে নিক্ষিপ্ত হয়। এককথায় বলতে গেলে সারাবছর বাড়ি পরিষ্কার হয় না, কেবল নোংরা চাপা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হয় মাত্র।

কিন্তু বছরে একবার...নববর্ষের সময়, কিম্বা পূজোর আগে, অথবা বাড়িতে কোনো উৎসব আসন্ন হলে তোড়জোড় পড়ে যায় ঘষামাজার। তাক থেকে নামে ধুলোপড়া খবরের কাগজের বান্ডিল, খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ে ভাঙা খেলনার টুকরো, মলাট ছেঁড়া বই, একপাটি রবারের চটি। দেওয়াল আর ছাদের অনধিগম্য কোণ থেকে উধাও হয় ঝুল আর মাকড়সার জাল। কিছু দিনের জন্য বাড়ি বেশ ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে।

সামনে আমার বড়ছেলের অন্নপ্রাশন। দিনদশেক বাকি আছে। কাজেই যথানিয়মে বাড়ি পরিষ্কার করা শুরু হয়েছে। স্ত্রীর আধময়লা একটা শাড়ি লুঙ্গির মত করে জড়িয়ে সকাল থেকে ঝুলঝাড়া ডাণ্ডা আর খ্যাংরা ঝাঁটা হাতে পরিশ্রম করে চলেছি।

সব কাজেরই একটা নেশা আছে। আরম্ভ করলে একবার শেষ না করা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি হয় না। গৃহিণী অনেকক্ষণ থেকে তাগাদা দিচ্ছেন—শুনছো? চান করে নাও, রান্না হয়ে গিয়েছে। কাজ আজকের মত থাকুক, আবার কাল করবে এখন—

কিন্তু আমার তখন বেশ একটা কাজের নেশা এসেছে। বারান্দার আর ঠাকুরঘরের ছাদের কোলে কয়েকপ্রস্থ অবাধ্য ঝুল কিছুতেই বিদায় হচ্ছে না—দেয়াল আঁকড়ে রয়েছে। দাদুর আমলের বুড়ো চাকর ভূষণদাকে আসবাব রাখবার ঘরটা পরিষ্কার করতে বলে আমি ঝুলঝাড়া ডাণ্ডার আগায় একটা ছেঁড়া গামছা জড়াচ্ছি, এবার সাফ না হয়ে কোথায় যায় দেখি!

এমন সময় গিন্নী নিঃশব্দে এসে কোমরে দুইহাত দিয়ে দাঁড়ালেন। আমার কাজের আঠা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধেক উবে গেল। সারাগায়ে ঝুল আর মাকড়সার জাল, পরনে সবুজের ওপর গাঢ় হলুদ ছককাটা শাড়ি, হাতে ঝুলঝাড়া ডাণ্ডা—আমি যতদূর সম্ভব অমায়িকভাবে হাসবার চেষ্টা করলাম। গিন্নী গললেন না। চোখের চাউনি প্রখরতর হল। অথচ নিতান্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন—তোমার হল?

ব্যস্ত হয়ে বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো—চান করতেই যাচ্ছিলাম। তুমি ভাত বেড়ে ফেল গিয়ে। আমি এইটুকু সেরেই—

আরো ঠাণ্ডা, ফুল দিয়ে বাঁধানো গলায় গিন্নী বললেন—ওইটুকু কাল সারবে। এখন চল, চান করে খেয়ে নাও—

বললাম—কিন্তু কাল তো সোমবার, আমার অফিস—

—পরশু ছুটি নিয়ে করবে। মোটকথা অবেলায় চান-খাওয়া আমি বেঁচে থাকতে চলবে না। গতবছর পেটের ব্যথায় এক হপ্তা কাবু হয়ে রইলে—ডাক্তার কি বলেছিল মনে আছে? নাও, টুল থেকে নামো—

টুল থেকে নেমে গৃহিণীর চিবুকে হাত দিয়ে নেড়ে একটা কি রসের কথা বলতে

গেলাম, তিনি 'উঁহুঃ' করে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললেন—এখন না! এখন না! দুপুরে! আগে সাবান দিয়ে ভাল করে চান করে এসো—

বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ কোণের ঘর থেকে ভূষণদার গলা—এটা কি দেখে যাও তো? দরকারী জিনিস? না ফেলে দেবো?

অনেকদিন পরে বাতিল জিনিস রাখার ঘরটায় গিয়ে ঢুকলাম। ওপাশে একখানা মাত্র জানালা, সেটা এমনিতে বন্ধ থাকে। আজ ভূষণদা আলো আসবার জন্য খুলে দিয়েছে। ঘরের ভেতরের বাতাসে একটা ছাতাধরা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। ভাঙা বেতের চেয়ার, টেবিল, প্যাকিং বাক্‌স (আমি ফেলে দিয়েছিলাম, খোকার মায়ের ধারণা একদিন না একদিন ওগুলো কাজে আসবে), ময়লা তুলোবাঁধা কাপড়ের পুঁটুলি—এসবের স্তূপ মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। এর মাঝখানে গামছা পরে একটা বিরাট ঝুড়ি ঝাঁটা হাতে ভূষণদা। মেঝেতে উবু হয়ে বসে। বাতিল জিনিসের স্তূপ থেকে সে টেনে বার করেছে কাঠের তক্তা আর টিনের পাত দিয়ে তৈরি কি একটা দ্রব্য। বলছে—দেখ তো? দরকারী?

মস্তিষ্কের ভেতরে স্মৃতি কোথায় বন্দী থাকে জানি না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি জায়গাটায় নিয়মের খুব কড়াকড়ি—পাহারারও। কিছুই হারাবার বা চুরি যাবার জো নেই। যেসব তুচ্ছ কথা, চকিত হাসি বা সজল দৃষ্টি বহুদিন আগেকার বর্তমানে একটিমাত্র মুহূর্ত জুড়ে ছিল—মেঘলা দিনের চাপা আলোয় আবার হঠাৎই কেন যেন তারা ফিরে এসে মন খারাপ করে দেয়।

ভূষণদার হাতে ধরা জিনিসটার দিকে তাকাতেই বুকের মধ্যে স্পষ্ট ডায়েরীর পাতা ওলটাবার শব্দ পেলাম। তারপর একটা চেনা তারে পরিচিত সুর বেজে উঠল স্মৃতির আঙুলে। মনে পড়েছে—আমার মনে পড়েছে—

জিনিসটা শুভঙ্করের তৈরি টেলিগ্রাফের কল। আমাদের ছোটবেলায় শুভঙ্কর বানিয়েছিল কাঠের টুকরো আর বিস্কুটের টিন কাটা লোহার পাত দিয়ে। গুরুপদবাবুর টর্চের পুরনো ব্যাটারী চেয়ে এনে তাই দিয়ে কল চালাতাম।

অনেকদিনের কথা। বছর পঁচিশ তো হবেই।

এতদিন কোথায় ছিল এটা? কত দরকারী জিনিস চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে, আর এটা ঠিক বাতিল আসবাবের নিচে আজকের দিনটির জন্য লুকিয়ে ছিল। এ জিনিসের সঙ্গে চাঁপা-ফুলের পবিত্র গন্ধের মত আমার হারানো ছোটবেলার স্মৃতি মাখা-মাখি হয়ে রয়েছে। কত কথাই যে মনে এল একসঙ্গে।

হ্যাঁ, দরকারী বইকি। খুব দরকারী জিনিস ওটা।

ভূষণদাকে বললাম—ফেলোনা, তুলে রাখ বারান্দার টেবিলে। আর কাজ বন্ধ রেখে তুমিও খেয়ে নাও, বেলা হয়েছে।

স্নানাহার সেরে বারান্দার টেবিলের সামনে এনে বসলাম। ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে গিন্নীও সেইসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছেন। খাওয়াদাওয়া সেরে ভূষণদা একতলায় বেঞ্চির ওপরে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। এই সুন্দর দুপুরটা আজ একান্তই আমার একার।

গ্রিলের ধারেই নিমগাছটার ঘন সবুজ পাতায় হলুদ রোদ্দুর এসে পড়েছে। একটা ছোট্ট মৌটুসি পাখি এসে বসল কোথা থেকে। বিকেলের হাওয়ায় ঝিরঝির করছে নিমের পাতা।

মরচে ধরে গিয়েছে আমার টেলিগ্রাফের কলে। সযত্নে একবার হাত বোলালাম যন্ত্রটায়। ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলাম—মনে আছে? মনে আছে তো?

যন্ত্রটা কথা বলতে পারে না, কিন্তু আমার কথার উত্তরেই যেন হঠাৎ একটা দমকা

হাওয়া এসে নাড়িয়ে দিল নিমগাছকে।

এমন হাওয়ার আঘাতে স্মৃতির দরজা খুলে যায়। পুরনো কথা মনে পড়ে।

॥ এক ॥

ছোটবেলায় যে বাড়িতে আমরা থাকতাম তার ছিল বিরাট ছাদ। আজকালকার ভাষায় যাকে প্লাস পয়েন্ট্ বা ভালোর দিক বলা হয়, ওবাড়ির ছাদটা ছিল তাই। দোতলা বাড়ি, চারটে ফ্ল্যাট মিলিয়ে মোট আটটা ঘর। ঢুকতেই উঠোনের মাঝখানে একটা কুয়ো, কুয়োর ধারে নিমগাছ। বর্ষার দিনে উঠোনটা কাদায়, গোবরে, পচা আবর্জনায় নরককুণ্ড হয়ে থাকতো। উঠোনের ধারে একতলার ভাড়াটেরা সকালে ছেলেপুলেদের প্যান্ট খুলে মাঠ সারবার জন্য বসিয়ে দিত। এর তুলনায় দোতলা এমন কিছু স্বর্গ ছিল না। পুরনো আমলের বাড়ি, ছোট ছোট জানালা-দরজা। সেগুলো আবার স্থাপত্যের এমন আশ্চর্য কৌশলে তৈরি, যে, আলোবাতাস প্রবেশ করতে দেবার চেয়ে আটকায় বেশি। গুরুপদবাবু বলতেন বাড়িটা নাকি ছাইয়ের গাঁথনি দিয়ে বানানো। তা হবেও বা। ছাদের পাঁচিলে জোরে ধাক্কা দিলে অনেকখানি জায়গা থর থর করে কাঁপতো।

এই বাড়িতে আমার মামারা থাকতেন। বুড়ো দাদু আর দিদিমা থাকতেন। আর থাকতাম আমি আর আমার মা। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আমাকে নিয়ে এইখানে বাপের বাড়িতে এসে ওঠেন। কারণ বাবার দিক দিয়ে আমাদের আর কোনো আত্মীয় নেই—শিশুপুত্রকে নিয়ে সম্মানের আশ্রয় আর কোথায় হতে পারে?

আমাব বাবা ধনী ছিলেন না বটে, কিন্তু মারা যাবার সময়ে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তার সুদ থেকে মা প্রতি মাসে কিছু কিছু বাপের বাড়ির সংসারে দিতেন। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বটতলায় সামাজিক উপন্যাসের মামার-বাড়িতে-মানুষ হওয়া দুঃখী ছেলেটির মত আমরা কারো গলগ্রহ ছিলাম না। বরং সংসারে আমাদের বেশ একটা সম্মানের স্থান ছিল। অবশ্য আমার দাদু এবং মামারা ভাল লোক ছিলেন, টাকা না দিতে পারলেও হয়তো যেমন ছিলাম তেমনই থাকতাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে মায়ের দেবার সাধ্য ছিল এবং অন্যরকম কোনোরকম পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে যেতে হয় নি।

বাবাকে আমার ভাল মনে পড়ে না। তিনি যখন মারা যান আমার তখন তিন বছর বয়েস। কেবল আবছা আবছা মনে করতে পারি একজন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের হাসিমুখ মানুষকে। লোকটা ঈজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ত, আর আমি তার বুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের লোমের মধ্যে মুখ ঘষতাম। আরো ভাঙা ভাঙা স্মৃতি দু-চারটে মনে আসে। তারপর হঠাৎ একদিন সেই প্রিয় মানুষটি, যে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত, খেলা দিত—সে কোথায় যেন চলে গেল। ছ-সাত বছর বয়েস অবধি জানতাম সে আবার আসবে, বেড়াতে গিয়েছে দূর এক দেশে। আট বছর বয়েসে প্রথম বাংলাভাষার 'মৃত্যু' শব্দটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। মৃত্যু যে কতবড় বিচ্ছেদ, তা সেই আট বছর বয়েসের শৈশবে বুঝতে না পারলেও এটুকু অনুভব করেছিলাম যে, আমার বাবা দূর দেশের ভ্রমণ সেরে আর ফিরবেন না।

সেই বয়েসটা খুব গভীর শোক উপলব্ধি করার বয়েস নয়। বাবার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করত ঠিকই, কিন্তু কোনো কখনো বড়রকমের অভাব বোধ করিনি। সেটা প্রথম তীব্রভাবে অনুভব করলাম সতেরো বছর বয়েসে—ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার

সময়। প্রত্যেকদিন পরীক্ষার ফার্স্ট পেপার হয়ে গেলে টিফিনের সময় আমার সহপাঠী রঞ্জিতের বাবা ডাব আর সন্দেশ নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যত্ন করে ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বলতেন—সন্দেশটা ফেললি কেন? ভাল করে খেয়ে নে, পেট খালি থাকলে উত্তর ভুল করবি—

স্কুলের পেছনে কলঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আমি টিফিনকৌটো থেকে বের করে মা-র দেওয়া খাবার খেতাম।

শব্দটা আগেই শিখেছিলাম, কিন্তু সেইসময় প্রথম 'মৃত্যু' কথাটার তাৎপর্য ঘনীভূতভাবে বুঝতে পারি।

গরমের দিনে সন্ধ্যেবেলা ছাদে শীতলপাটী পেতে আড্ডা বসতো। এটা শুধু মেয়েদের আড্ডা ছিল না। গুরুপদবাবু, তাঁর ভাগ্নে ননীগোপাল—এঁরা আমাদের ঘরের লোকের মত হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরাও এসে বসতেন আসরে। গুরুপদবাবুর ছেলে নাড়ু আমার প্রাণের বন্ধু—জীবনের প্রথম বন্ধু—সে আর আমি সর্বকনিষ্ঠ দু-জন আড্ডাধারী হিসেবে উৎসুক হয়ে বড়দের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম গল্প শোনার আগ্রহে। সে সময়কার মানুষেরা বেশ সুন্দর গল্প বলতে পারত। পরের এই কুড়ি কি পঁচিশ বছরে পৃথিবী বড় বদলে গিয়েছে, ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছাদে আসর করে বসে গল্প বলার বা শোনার সময় আজ আর কারো নেই। এখন মানুষ অবসর সময়ে পার্ট-টাইম ব্যবসা করে। নয়তো টেলিভিশন দেখে কিম্বা একা একা নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে সকালের খবরের কাগজটা আবার পড়ে।

আমার ছোটবেলায় মানুষ অনেক বেশি করে মানুষের কাছাকাছি ছিল।

আসরে টুকটুক করে লাঠি ধরে এসে বসতেন নাড়ুর ঠাকুমা। তাঁর চুল সব পাকা, ছোট ছোট করে কাটা। পরনে থান ধুতি। মাঝারি উচ্চতায় রোগা মানুষ। সূর্য ডুবে গেলেই মটরের দানার সাইজের একটি আফিংয়ের গুলি খেতেন। আমরা কোনোদিন ঠাকুমার অসুখ-বিসুখ হতে দেখিনি। তাঁর বয়েস তখন ছিয়াত্তর, আমার আর নাড়ুর সাত। বরং আমাদেরই মাঝে মাঝে অসুখ করত। সবার মুখে শুনতাম আফিংই নাকি ঠাকুমাকে খাড়া রেখেছে।

একদিন খুব মজা হয়েছিল।

সন্ধ্যেবেলা। আমার মা আর মাসীরা ছাদে মাদুর পেতে বসে আছেন। কিন্তু গুরুপদবাবুর বাড়ি থেকে এখনো কেউ না আসায় গল্প ঠিক জমছে না। ন-মাসী উঠে ওদের ডাকতে যাবেন যাবেন করছেন, এমন সময় নাড়ুর মা উদ্বিগ্ন হয়ে ছাদে উঠে বললেন—একবার নিচে চলুন তো মেজদি, আমার শাশুড়ি এসে যেন কেমন করছেন—

সবার সঙ্গে আমিও গেলাম। একটা খাটে শুয়ে আছেন ঠাকুমা। শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্ করছেন আর চিৎকার করছেন—ওঃ, শরীর কেমন করছে—আমি আর বাঁচবো না। গুরুপদ, তুই শিগ্‌গির ডাক্তার নিয়ে আয়।

আমার মা আর গুরুপদবাবুর স্ত্রী ভেজা গামছা দিয়ে ঠাকুমার মুখ মুছিয়ে দিয়ে পাখা নেড়ে হাওয়া করতে লাগলেন। বুড়ি মানুষ, হয়তো বা অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে—এই ভেবে মাতৃভক্ত গুরুপদবাবু মেঝেতে বসে পড়েছেন। ব্যাপার দেখে ননীগোপাল দৌড়েছেন ডাক্তার আনতে। আমি আর নাড়ু ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ডাক্তারবাবু সকলেরই চেনাশুনা। এসেই চট্‌পট্ পালস্ দেখলেন, আরো কি সব দেখলেন, তারপর ভুরু কুঁচকে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গুরুপদবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন—ডাক্তারবাবু, মা কি—

ডাক্তারবাবু সেদিকে ফিরে বললেন—কেসটা তো বড় কেমন কেমন—

—আজ্ঞে?

—মানে, আপনার মায়ের তো কোনো অসুখ দেখতে পাচ্ছি না। অর্গ্যানিক ডিসঅর্ডার কিছু নেই। পাল্‌স প্রেসার সব ঠিক আছে। অথচ উনি যে কষ্ট পাচ্ছেন, সেটাও ঠিক। কি করি বলুন তো?

চিকিৎসক রোগিণীর পুত্রকে 'কি করি বলুন তো?' প্রশ্ন করলে কেস যে সত্যিই ঘোরালো দাঁড়ায় তাতে সন্দেহ নেই।

একটু ভেবে ডাক্তারবাবু বললেন—আচ্ছা, ওঁর কাপড়ের বাঁধন আল্‌গা করে দিন তো। মুখে-চোখে আরো জলের ঝাঁপ্‌টা দিন। তারপরে না হয় একটা কোরামিন ইনজেকশন করা যাবে—

এবারেই ঘটল মজাটা।

নাড়ুর মা এগিয়ে এসে শাশুড়ির কাপড়-চোপড় আলগা করতে গিয়ে কাপড়ের ভাঁজ থেকে কি একটা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে বললেন—আরে! এটা কি!

ঠাকুমার আফিংয়ের গুলি!

ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। উদ্বেগ কমে যাওয়াতে হঠাৎ রেগে গিয়ে গুরুপদবাবু স্ত্রীকে বকাবকি করতে লাগলেন। ঠাকুমা হাসিমুখে উঠে বসে খাটের পাশের টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা জলের গ্লাস নিয়ে কপ্‌ করে গুলিটি গিলে ফেলে বললেন—তাই ভাবি শরীর এরকম করে কেন। কতদিনের অভ্যেস বল দিকি? সন্ধ্যেবেলা ওটুকু পেটে না গেলে প্রাণ আইঢাই করে—

গুরুপদবাবু বললেন—তা আফিংয়ের গুলি তোমার কাপড়ের ভাঁজে গেলই বা কি করে?

ঠাকুমা একগাল হেসে উত্তর দিলেন—ওরে, আমি কি আর আজকাল চোখে দেখতে পাই, না কোনো জিনিস ঠাহর হয়? কৌটো থেকে বড়ি নিয়ে গালে ফেলেছি, জল দিয়ে গিলেওছি। আমি তো ভাবছি আফিং যেখানে যাবার গিয়েছে। তা বড়ি যে হাত ফস্‌কে আমার গায়েই পড়েছে সে কথা জানবো কি করে?

পনেরো মিনিটের মধ্যে ঠাকুমা ছাদের আসরে উঠে এলেন।

আমার দাদু ছিলেন আবগারীর ইন্সপেক্টর। বছর পাঁচেক হল সে সময় রিটায়ার করেছেন। পাড়ায় আমাকে সবাই দারোগাবাবুর নাতি বলে ডাকত। দাদু ছিলেন সেকালের বি. এ. পাশ। সারাদিন বসে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই পড়তেন। রাত্তিরে আমাকে পাশে বসিয়ে ইংরেজি আর বাংলা পড়াতেন। আটটা বাজলে ছুটি। দুধ আর রুটি মেখে খাইয়ে মা আমাকে পাশে নিয়ে শুয়ে ঘুম পাড়াতেন। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে শুনতাম ভেতরের বারান্দায় নিজের শোবার খাটটিতে বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে দাদু গাইছেন—ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—

আমি আর মা যে ঘরে শুতাম সেই ঘরেই আর একদিকে দিদিমার খাট পাতা ছিল। জীবনের শেষ বাইশ-তেইশ বছর দিদিমা হার্টের অসুখে শয্যাগত ছিলেন। জ্ঞান হয়ে অবধি আমি দিদিমাকে কখনো চলাফেরা করতে দেখিনি। শয্যাগত হলে কি হবে, শুয়ে শুয়েই তিনি দিব্যি পুরো সংসারটি চালাতেন। মোটামুটি ভাল লেখাপড়া জানতেন। দাদুকে কিছু জানাবার দরকার হলেই একটুকরো কাগজে পেন্‌সিল দিয়ে সম্বোধন ও স্বাক্ষরহীন

একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে আমাকে বলতেন—দাদু, এটা বুড়োকর্তাকে দিয়ে আয় তো—

চিঠিগুলোও বিভিন্ন প্রকারের হত। যেমন—কাল যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করিও না। মনে হইল টাকা-পয়সা থাকিলেও ইহারা লোক ভাল নহে। শেষ অবধি বিবাহ সুখের হইবে না। টাকা অপেক্ষা সুখ ও সম্মান বড় ইহা জানিবা।

অথবা—কাল বাজার হইতে ফলুই মাছ আনিয়াছিলে, খোকা (আমার বড়মামা) দুপুরে খাইতেই পারে নাই। তুমি নিজে ভালবাসিলেও সংসারের জন্য এত কাঁটাওয়ালা মাছ আনিও না। কেহ পছন্দ করে না। কিন্তু তোমাকে বলিতে ভয় পায়।

এর তলায় একটি পুনশ্চ—নিজের জন্য ২/১ খানা আনিতে পার। আলাদা ঝোল করিয়া দেওয়া যাইবে।

বিহারের একটা না-শহর না-গ্রামে থাকতেন আমার সেজমাসী। বছরে একবার কি দু-বার তিনি ছেলে শুভঙ্কর আর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে নিয়ে বাপের বাড়ি আসতেন। মেসোমশাই ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার অথচ অবসর সময়ে দারুণ বেহালা বাজাতে পারতেন। তিনি এলে রাত্তিরে ছাদের আসরে বেহালা নিয়ে বসতেন। সেদিন বাড়তি সতরঞ্চি পাততে হত, কারণ ষোড়শীবাবুর জামাই এসেছেন শুনলে পাড়া থেকে লোক আসত বেহালা শুনতে। এখনও পরিষ্কার চোখের সামনে ভাসে—অষ্টমীর চাঁদের আলোয় ছাদ ভেসে যাচ্ছে, ডোরাকাটা সতরঞ্চিতে বসে চোখ বুজে বেহালায় গাল চেপে ধরে মেসোমশাই বাজাচ্ছেন তিলককামোদ।

শুভঙ্কর আমার চেয়ে ছ মাসের আর মৈত্রেয়ী আড়াই বছরের ছোট ছিল। বয়েসটা কাছাকাছি বলে আমি আর শুভঙ্কর পরম বন্ধু ছিলাম। মাসীর ছেলে বলে পরিচয় না দিলে লোকে আমাদের সহোদর ভাই ভাবত। সারাটা বছর উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম কবে গরমের বা পুজোর ছুটি পড়বে, শুভঙ্কর আসবে আমাদের বাড়ি। মৈত্রেয়ীটা তখন বড্ড ছোট, চার কি সাড়ে চার বয়েস—তাব ওপর সে মেয়ে। তাকে আমরা বিশেষ পাত্তা দিতাম না। নাড়ু যদিও সারাবছর আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে থাকত, শুভঙ্কর এলে তাকে আমার আর তেমন দরকার হত না। আসলে নাড়ু ছিল ভালমানুষ ধরনের ছেলে। শুভঙ্করের আর আমার দুষ্টুমির দিক দিয়ে নব-নব উদ্ভাবনীশক্তির কণামাত্র তার ভেতর ছিল না। ক্লাশে ফার্স্ট হত, কিন্তু সাত বছর বয়সেও বেচারার শিশুসুলভ উচ্চারণ থেকে গিয়েছিল— জিভের আড় ভাঙেনি। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতাম—এই নাড়ু, তোর ভাল নাম কি?

সে বলত—নালায়ন ব্যানাৰ্দ্দী।

—বাবার নাম কি?

—দুলুপদ ব্যানাৰ্দ্দী।

—ঠিক করে বল্। বল্ গুরুপদ—

কাঁদো কাঁদো হয়ে নাড়ু বলত—মুখ্ দিয়ে বেলোয় না দে।

শুভঙ্কর যে ক-দিন থাকত, আমরা কথায় কথায় পায়ে পা বাধিয়ে নাড়ুর সঙ্গে ঝগড়া করতাম, খেপিয়ে মজা দেখতাম। শুভঙ্কর বিহারে ফিরে গেলেই আমি আবার একা! সময় আর কাটে না। একই টানা বারান্দার দু-দিকে দাঁড়িয়ে নাড়ু আর আমি উদাস হয়ে নিমগাছের দিকে তাকিয়ে আছি। কথা বলার উপায় নেই—ঝগড়া চলছে। তারপর পরস্পরের দিকে কয়েক হাত এগিয়ে আসা, ক্রমে ফিক্ করে একটু হাসি—এসবের মধ্যে দিয়ে ভাব হয়ে যেত।

ম্যালঅ্যাপ্রোপিজম্ কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ কি জানি না, কিন্তু নাড়ু একবার ছোটবেলায় এর একটা সুন্দর উদাহরণ দেখিয়েছিল। আমার সঙ্গে মার্বেল খেলা কিম্বা হজমগুলির ভাগ নিয়ে নাড়ুর একদিন খুব ঝগড়া হয়ে গেল। ভয়ানক চটে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নাড়ু বলতে লাগল—আপনাদের ছেলেকে আপনারা আপত্তি করুন।

'আপত্তি' কথাটার প্রকৃত ব্যবহার বেচারী জানত না। হয়তো বলতে চেয়েছিল কঠিন শাস্তি দিন, বা বন্ধ করে রাখুন। এখনও নাড়ুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি।

কি সুন্দর ছিল আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলার দিনগুলো! কোনো দায়িত্ব ছিল না, আর্থিক দুর্ভাবনা ছিল না—সকালের আলো অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠত। আর সকাল থেকেই সারাদিন মনের মধ্যে একটা খুশিখুশি ভাব ঘোরাফেরা করত, মনে হত—আজ বিকেলে খুব আনন্দের কিছু একটা ঘটবে। প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু ঘটেও যেত, কারণ আনন্দ পাবার ক্ষমতা তখন ছিল অসীম—খুব সামান্য কিছু থেকেও।

এমনি একটা আনন্দ ছিল গ্রামোফোন বাজানো। আজকের যুগের ফোর-স্পিড্ প্লেয়ার বা স্টিরিও নয়—আমাদের গ্রামোফোন ছিল কাঠের ওপরে কালো বুটিদার রেক্সিন দেওয়া সেকালের মডেল। ক্লিপ খুলে ডালা তুললেই ঢাকনার ভেতরদিকে চোঙার সামনে বসা কুকুরের ছবি বেরিয়ে পড়ত। হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর প্রথমদিকের কালো, লাল আর সবুজ লেবেল লাগানো বহু রেকর্ড ছিল একটা চৌকোনা টিনের বাক্সে। আর ছিল বারোখানা রেকর্ডে সম্পূর্ণ দক্ষযজ্ঞ পালা। মাঝে মাঝে ছাদের আসরে দক্ষযজ্ঞ শোনা হত। বড় মামা হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দম দিয়ে এক একখানা রেকর্ড চালিয়ে দিতেন, আর টিং করে একটা ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ধাতব নাকিসুরে গান আরম্ভ হয়ে যেত—'বাপের বাড়ি মাঝে মাঝে না গেলে কি চলে'।

একদিন এইরকম গ্রামোফোন বাজিয়ে গান শুনছিলাম। সন্ধ্যে বেলা। মন খুব ভাল আছে, আজ শুভঙ্করররা আসবে। সবুজ লেবেলওয়ালা রেকর্ড ঘুরছে টার্নটেবলে, গান হচ্ছে—মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে, ও আকাশ বল আমারে।

হঠাৎ দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ, আর তার সঙ্গে চিৎকার—দাদা! আমরা এসে গেছি রে!

এরাই মোটামুটি আমার শৈশবের প্রধান সঙ্গী। তাছাড়া ছিল মঞ্জু, খোঁড়া, নেদো, পরেশ, তাপস—এরা। এদের মধ্যে অনেকে আমার থেকে তিন-চারবছরের বড় ছিল, লুকিয়ে সিগারেট খেত। মনে মনে জানতাম ওরা ভাল ছেলে নয়, তবু ওরা যে আমার বন্ধু ছিল তা তো আর অস্বীকার করতে পারি না।

দিন গড়িয়ে রাত, তারপর আবার একটা সকাল। এভাবেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো এক এক করে কেটে যাচ্ছিল।

॥ দুই ॥

বিলিতি প্রেতশাস্ত্রে পোল্টারগাইস্ট নামে একজাতের ভূতের উল্লেখ আছে। এরা বাড়িতে ভারী আসবাবপত্র নাড়ানো, বাসন-কোসন ঝন্ঝন্ করে ফেলে দেওয়া, ঢিল ছোঁড়া—এইসব উপদ্রব করে। পোল্টারগাইস্টের কাণ্ড আমি ছোটবেলায় একবার স্বচক্ষে দেখেছি।

ওই অঞ্চলে আমাদেরটাই একমাত্র দোতলা বাড়ি ছিল। পুবদিকে একটা ছোট মাঠ আর পুকুর, পশ্চিমদিকে রাস্তা, আর দক্ষিণে বেশ খানিকটা খোলা জায়গায় কয়েকখানা টিনের চালা আর কুঁড়ে ঘর ছিল। টিনের চালাটা আমাদের বাড়ির প্রায় গায়ে লাগানো; মধ্যে কেবল একটা সরু গলি—পুকুরপাড়ে যাবার জন্য। এই চালায় দুই মেয়ে নিয়ে পুষ্পদি থাকত। পুষ্পদি সধবা কি বিধবা ছিল এখন ঠিক মনে করতে পারি না, মোটের ওপর তার স্বামীর কথা আমার মনে নেই। একটা চালায় থাকতো দুগ্‌গা-মাসী, তার বর পোস্ট আপিসের পাবলিক রাইটারবাবু ছিল। তাদের পাশেই পীরু রিক্‌সাওয়ালার বাড়ি। তার ছিল একপাল ছেলে-পুলে, একটা সুখী-সুখী চেহারার বিরাট রামছাগল আর বেকার ভাই গোপাল।

একদিন দুপুরে খাওয়ার পর মায়ের পাশে শুয়ে শুয়ে রূপকথার গল্প শুনছি, বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। রাজপুত্র ময়নামতীর মায়াকাননে পৌঁছে সবে ব্যঙ্গমাকে জীয়নকাঠির সন্ধান জিজ্ঞেস করেছে, এমনসময় বাইরে দড়াম করে প্রকাণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপরেই অনেকের উত্তেজিত গলা।

সবাই মিলে তাড়াতাড়ি দোতলাব বারান্দায় এসে দেখি পুষ্পদির ঘরের সামনে পাড়ার অনেকে জড়ো হয়েছে, আর পুষ্পদিদের বাড়ির টিনের চালে একটা আধলা ইঁট পড়ে। ইঁটটা নতুন।

সবাই মিলে কিছুটা খোঁজাখুঁজি করে হাল ছেড়ে দিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। আমিও ঘরে এসে মায়ের পাশে শুয়ে আবার গল্প শোনার উদ্যোগ করতে লাগলাম। মিনিট দু-তিন বাদেই আবার দুম্ করে শব্দ। বাইরে এসে দেখি পুষ্পদির চালে আর একটা ইঁট এসে পড়েছে। ঝক্‌ঝকে দিনের বেলা, কাছাকাছি এমন কোনো ঝোপঝাড়ও নেই যার আড়াল থেকে কেউ ইঁট ছুঁড়তে পারে। তাছাড়া এতবড় আর ভারী ইঁট দশ হাত দুর থেকে ছুঁড়ে পাঠাতে হলেও তো বিপুল স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।

এবার পাড়ার লোকেরা অদৃশ্য নিক্ষেপকারীর উদ্দেশে চোখা চোখা কিছু ছাপার অযোগ্য বিশেষণ প্রয়োগ করল, এবং সম্ভবত তারই উত্তরে সবার চোখের সামনেই কোথা থেকে আর একখানা ইঁট দুম করে পড়ল টিনের চালে। পীরুর ভাই গোপাল বেকার ছেলে, সে পাড়ার লোকের সামনে নিজের একটা হিরোয়িক ইমেজ তৈরি করার জন্য তড়বড় করে টিনের চালে উঠে পড়েছিল। তাপসের বাবা নিবারণ ঘোষ জিজ্ঞেস করেছিলেন—'টঙে চড়ছিস কেন বাবা গোপাল?'

—আজ্ঞে, দেখি কোন কোম্পানির ইঁট—

সাহসী গোপালের কানের পাশ দিয়ে এবারের ইঁটটা গেল। গোপাল 'উই বাপ' বলে উল্টোদিকে ডিগ্‌বাজী খেয়ে একদম মাটিতে। তার নামবার কায়দা দেখে উপস্থিত দু-একজন বাহবা দিলেও নিবারণ ঘোষ বারবার বলতে লাগলেন—একবার হয়ে গিয়েছে, আর পারবে না।

সে যাই হোক, সবাইকে আশ্চর্য করে পুষ্পদির বাড়িতে ইঁট পড়তেই লাগল। ভৌতিক কাণ্ড সচরাচর রাত্রিতে ঘটে বলে প্রবাদ, কিন্তু এ ব্যাপারটা দিনে রাতে সমান তেজে চলতে থাকল।

ডিটেকটিভ নভেলের ভাষায় বলতে গেলে এবার পাড়ার মাতব্বরেরা 'কেসটা হাতে নিলেন'। একটা ডিফেন্‌স্ পার্টি তৈরি হল। তারা পালা করে রাত্তির জেগে পাহারা দিত। ফল অবশ্য পূর্ববৎ। তবু ডিফেন্‌স্ পার্টির ছেলেদের উৎসাহ দেখে কে! বাঁশের ডগায়

বসানো বল্লমের ফলা, মাছমারা কোঁচ, হকি স্টিক, বড় বড় চার-পাঁচসেলের টর্চ—এসব নিয়ে গুরুপদবাবু, ননীগোপাল, বাঁটুল (ননীগোপালের ভাই), নীতিশদা রাত্তিরে পাহারা দেওয়া শুরু করল। আমার দু-জন মামাই নিতান্ত শিষ্টস্বভাবের নির্বিরোধী লোক, তাঁরা পার্টির লোকেদের বললেন—আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি ধরে নাও, যদি তেমন কিছু ঘটে বা কাউকে দেখতে পাও, তাহলে আমাদের ডেকে নিও। কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে না এবিষয়ে তারা বেশ নিশ্চিত ছিলেন।

একদিন রাত্তিরে—সম্ভবত সেটা অমাবস্যার রাত ছিল—ঘুম ভেঙে দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডিফেন্স্ পার্টির লোকজন মামাদের ডাকছে—উঠুন! দেরি করবেন না—দেখা গিয়েছে!

বিপন্ন মুখে দুই মামা উঠে এলেন, সবাই মিলে ছাদে যাওয়া হল। দাদুর হাত ধরে আমিও পেছন পেছন গেলাম।

পুষ্পদির বাড়ির পেছন থেকে দু-টো বিরাট তালগাছ ঠেলে উঠেছে অনেকখানি। তারপরেই পুকুর। ছাদের আলসের কাছে দাঁড়িয়ে গুরুপদবাবু ফিস্ফিস্ করে বললেন—দেখতে পাচ্ছেন? তালগাছের গোড়ায় এক্কেবারে গুঁড়ি ঘেঁষে বসেছে। মতলবটা বুঝেছেন তো? এখন কেউ টর্চ জ্বালবেন না। যেই অ্যাটেম্ করবে, অমনি—বুঝলেন কিনা?

আমি তো প্রাণপণ চোখ ঠিকরেও সেই নিকষ কালো অন্ধকারে কিছুমাত্র কিছু দেখতে পেলাম না। মামারাও কিছু ঠাহর করতে পেরেছেন বলে মনে হল না তবু উত্তেজক পরিস্থিতি থেকে বাদ পড়তে চান না বলে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে গাছের গোড়ায়—

হঠাৎ গুরুপদবাবু বললেন—এইবার! জ্বালুন টর্চ!

অন্ধকার ভেদ করে তিন-চারখানা টর্চের তীব্র আলো গিয়ে পড়ল গাছের গুঁড়ির কাছে।

সেখানে পীরুর রামছাগলটা দাঁড়িয়ে কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। গুরুপদবাবু আমতা আমতা করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এটা আসলে তাঁর একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা।

এমন সময় সবার হাসিকে থামিয়ে দড়াম্ শব্দে একটা ইঁট এসে পড়ল।

আমার শৈশবের এ ব্যাপারটির কোনো সমাধান হয়নি। হঠাৎ যেমন ইঁট পড়া শুরু হয়েছিল, তেমনি একদিন আপনিই থেমে গেল।

আমার দাদুর ছিল পড়াশুনা করবার আর ডাকে জিনিস আনবার বাতিক। পি. এম. বাক্‌চির পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন দেখে দেখে তিনি পোস্টকার্ড ছাড়তেন, আর কিছুদিন পরপরই ডাকপিওন নানা আকারের বিচিত্র পার্সেল ডেলিভারী দিয়ে যেত। তার মধ্যে কবিরাজী ওষুধের কোম্পানীর বিনামূল্যে পুস্তিকা থেকে শুরু করে, ফুলগাছের বীজের ফ্রি স্যাম্পল্ অবধি থাকত। একবার পঞ্চাশ টাকার এক ভি. পি. এসে হাজির। বাড়ির সবাই অবাক! দাদু গম্ভীর মুখে ভি. পি. ছাড়িয়ে পার্সেলের গালা ভেঙে দড়ি কেটে তার মধ্যে থেকে বের করলেন দশখানা লুধিয়ানার নানারঙের গায়ের চাদর। সেসব চাদরের রঙের বাহার দেখে সবার চোখ ছানাবড়া। ওই দশখানা চাদরের এক একটা এখনো মামা আর মাসীদের ট্রাঙ্কের নিচে পড়ে রয়েছে। বিশেষ ব্যবহার হয়নি।

সমস্তই তো ভাল, কিন্তু বিপদ করল কবিরাজী ওষুধের বইটা। পরে অবশ্য জেনেছি এ বিপদ আমার একার নয়—ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়তে ঢুকে জেরোম কে জেরোমের

লেখা 'থ্রি মেন্ ইন্ এ বোট'-এর নায়কেরও আমার মতই দশা হয়েছিল।

একদিন দুপুরবেলা—কেউ কোথাও নেই—ঘুমন্ত দাদুর পাশ থেকে বইখানা তুলে একেবারে ছাদে গিয়ে হাজির। চিলেকোঠার ছায়ায় বসে কয়েকপাতা পড়েই আমি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষে পরিণত হলাম। কেন জানিনা, রোগের লক্ষণগুলো পড়ে প্রথমেই আমার মনে হল আমার ধাতুদৌর্বল্য হয়েছে। রোগের স্বরূপটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও লক্ষণ সব অবিকল মিলে যাচ্ছে দেখলাম। একটু পরেই আবিষ্কার করলাম দেয়ালের লোনাধরা দাগে বা বিকেলের মেঘের স্তূপে আমি যে পৃথিবীর ম্যাপ বা নানারকম জীবজন্তুর আকৃতি দেখতে পাই, সেটা আমি নির্দোষ খেলা বলে মনে করলেও আসলে জিনিসটা একরকমের মানসিক রোগ। এর নাম অধ্যাস, এটাই চিকিৎসা না করলে অলীক প্রত্যক্ষণে পরিণত হয় এবং তখন যাঁরা এই পুস্তিকা বিলি করছেন তাঁদের কোম্পানীর তৈরি মধ্যমনারায়ণ তৈল ব্যবহার করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারলাম আমার ভয়াবহ মনোরোগ আর অধ্যাসের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই—একেবারে অলীক প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়েছে। কোনোরকমে তিনটাকা চারআনা নগদ জোগাড় না করতে পারলে আমার মধ্যমনারায়ণ তেল ব্যবহার করা হয়ে উঠবে না এবং সেক্ষেত্রে আমার চোখ লাল হয়ে উঠবে, ব্যবহার রুক্ষ হয়ে উঠবে। সময়মত ভাল চিকিৎসা না হলে আমাকে—'উন্মাদাগারে প্রেরণ করা আবশ্যক হইতে পারে'।

আমার তখন দিনে হাতখরচ দু-আনা পয়সা! তাও সকাল দাদুর কাছ থেকে পাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চানাচুর, ক্রিম রোল এসব খেয়ে ফুরিয়ে যায়। তিনটাকা চারআনা পাবো কোথায়? তাছাড়া ডাকব্যয়ও দিতে হবে লিখেছে। তাই বা কত? নাঃ, কোনো আশা নেই। চিলেকোঠার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে দারুণ উদ্বেগে আমার বুকের মধ্যে শুকিয়ে গেল।

এইরকম চলল কয়েকদিন। রোজই দুপুরে বইখানা হাতে ছাদে গিয়ে বসি, আর আমার এক একটা নতুন অসুখের উপসর্গ দেখা দেয়। আমার বেঁচে থাকার আর কোনো মানে রইল না।

শেষে একদিন ছাদের টবে গজানো গাছে জল দিতে এসে দাদু আমাকে আয়ুর্বেদ পাঠরত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। বইখানা হাত থেকে নিয়ে উলটে পালটে দেখে গম্ভীর ভাবে বললেন—হুঁ, কে দিল?

দাদু বইটা নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। তার দু-একদিনের মধ্যেই আমার অসুখও সেরে গেল।

অনিল দত্ত নামে এক ভদ্রলোক তখন আমাকে বাড়িতে পড়াতে আসতেন। সে সময়ে আমি বোধহয় ক্লাস টুতে পড়ি। অঙ্ক বা ইংরেজিতে মোটামুটি একরকম ছিলাম, কিন্তু বাংলাটা জানতাম খুব ভাল। বয়সের তুলনায় বেশি পড়াশুনো করতাম। রেমার্কের 'থ্রি কমরেড্স্' বা হার্ডির 'এ পেয়ার অফ্ ব্লু আইজ'-এর অনুবাদ আমি ন-বছর বয়সে পড়ি। কোনো বাছাবাছি ছিল না—একেবারে পাকা ব্রাউজার ছিলাম।

সকাল এগারোটার মধ্যে ফিরে আসতাম স্কুল থেকে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে দুপুর দুটো কি আড়াইটের সময় অনিলবাবু পড়াতে আসতেন। পড়াতে আমার আপত্তি ছিল না, ভালই লাগত। কেবল অঙ্কটা পছন্দ হত না কোনোকালেই। তার ফল পরবর্তী জীবনে ভুগতে হয়েছে অনেকবার।

অনিলবাবু মানুষটি সৎ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। আমাকে ভাগ কষতে দিয়ে প্রায়ই দাদু

বা মাযের সঙ্গে ঠাকুরদেবতাব গল্প করতেন। দেবতার অলৌকিক কৃপায় কতবার কিভাবে তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছে, কিংবা ঈশ্বরের কথা ভাবলেই আজকাল তাঁর সমস্ত শরীরে কেমন বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হয়—এইসব গল্প।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—মাস্টারমশাই, আপনি যেসব গল্প বলেন, তা কি সব সত্যি?

উনি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বললেন—ওগুলো গল্প নয়। সমস্ত সত্যি।

—আমি চেষ্টা করলে ঠাকুর দেখতে পাব?

—কেন পাবে না? তবে ঐ চেষ্টা করার কথা বললে না? ওই চেষ্টাই হচ্ছে বড় কথা।

—কি করতে হবে মাস্টারমশাই?

অনিলবাবু চোখ বুজে একটু ভেবে বললেন—উঁ-ম্-ম্, তুমি প্রাথমিক ভাবে একটি মা-কালীর পট জোগাড় কব। মা-কালীর ছবিতে ফুল দিয়ে তার সামনে বসে চোখ বুজে এক মনে বলতে থাক—আমি তোমাকে দেখতে চাই, হে মা কালী! আমি তোমাকে দেখতে চাই—

—জোরে জোরে বলব?

—না, মনে মনে। দেখো তাতে কি ফল হয়।

—কি ফল হতে পারে?

যেন নিতান্ত হাস্যকব প্রশ্ন কবা হয়েছে, এমন মুখভঙ্গি কবে অনিলবাবু বললেন—আরে! কি না হতে পাবে? ধর তুমি বিলেত যেতে চাও, তোমাকে টিকিটও কাটতে হবে না, জাহাজেও চডতে হবে না। চোখ বুজে কেবল বলবে—মা, আমাকে বিলেতে নিয়ে চল। তাকিয়ে দেখবে তুমি লন্ডনে দাঁড়িযে আছ।

অবাক হয়ে বললাম—সত্যি?

মাস্টারমশাই এমনভাবে হাসলেন যাতে বোঝায়—তবে আর কি বলছি?

ছাদে দাদুর শূন্যোদ্যান থেকে যাবতীয় জবাফুল তুলে এনে ক্যালেন্ডার থেকে ছেঁড়া মা-কালীর ছবির সামনে সাজিয়ে ধ্যান শুরু করলাম। লন্ডন যাবাব আমার বড়ই ইচ্ছে।

তিন-চারদিন পর থেকেই তপস্যার ফলের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে বিলেতে যাবাব দৃঢ় ইচ্ছা মা-কালীর কাছে মনে মনে জানিয়েও যতবার চোখ মেলে তাকাই, দেখি ছোট মামার পড়বার নড়বড়ে টেবিলের সামনে কালো বার্নিশ করা টুলের ওপরে বসে আছি। বিদেশভ্রমণ আর হয়ে ওঠে না। মাস্টারমশাইকে জানালেই তিনি বললেন—মনঃসংযোগ করো, একদিনে হবার নয়—

কিছু দিন পরে স্বাভাবিক মানুষী বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝে গেলাম যে, বিদেশভ্রমণ করতে হলে যে পরিমাণ মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন, তা খুবসম্ভব আমার আয়ত্তের বাইরে। ক্রমে ধ্যানের আগ্রহ কমে গেল।

অবশ্য আমার ধর্মজীবনের এখানেই শেষ নয়। দাদু নিজে ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। দিদিমার ঘরে পাতা মঙ্গলচণ্ডীর আসনের সামনে বসে প্রায়ই পুজো আর্চ্চা করতেন। দাদু একদিন আমাকে ডেকে বললেন—শোন্, আজ সন্ধ্যে থেকে রোজ আমার সঙ্গে জপ্ করতে বসবি।

ততদিনে আমি ঈশ্বরপ্রাপ্তির দুরূহতা বেশ খানিকটা টের পেয়ে গেছি। কিন্তু দাদুর সঙ্গে যে কোনো কাজ করায় বেশ একটা আনন্দ ছিল। কাজেই রোজই সন্ধ্যেবেলা দাদুর কাছে বসতে লাগলাম। দাদু কর গুণে কি করে জপ করতে হয় দেখিয়ে দিলেন। কি নাম

জপ করব তাও বলে দিলেন। জপ হয়ে গেলে বলতেন—এইবার মনঃসংযোগ অভ্যেস করতে হবে। শিরদাঁড়া সোজা করে বসে সামনের যাহোক একটা কিছুর দিকে চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাকবার চেষ্টা কর। দেখবি, আস্তে আস্তে চারদিকের সবকিছু মুছে গিয়ে শুধু ওই জিনিসটা জেগে থাকবে।

এবং আশ্চর্য! হতও তাই। মাসখানেক পরে মন থেকে অন্য চিন্তা একেবারে দূর করে একদৃষ্টে পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকা বেশ অভ্যেস হয়ে গেল। ক্রমে চারদিকে কেমন একটা অন্ধকার ঘনিয়ে এসে কেবল সামনে একটা আলোকিত বৃত্তের মধ্যে দেখবার জিনিসটি ফুটে থাকত। এতে অন্য কিছু লাভ হোক বা না হোক, চট করে যে কোনো বিষয়ে মন লাগানো বেশ আয়ত্ত হয়েছিল। দু-তিনবার পড়ে কবিতা মুখস্থ করে ফেলতাম, একবার কোনো কিছু শুনলে আর ভুলতাম না। পরবর্তী সময়ে আমার এই ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

দাদুর ধর্মশিক্ষার সবচেয়ে বড় এবং প্রশংসনীয় দিক যেটা, তা হল—উনি জোর করে আমার মধ্যে কোনো আস্তিকতা ঢুকিয়ে দিতে চাননি। শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আমারই ছিল।

॥ তিন ॥

আগেই বলেছি, 'মৃত্যু' কথাটার সঙ্গে আমাব পরিচয় এতদিন একান্তই আভিধানিক ছিল। এবার মৃত্যুকে একদিন খুব কাছ থেকে দেখে একেবারে চমকে উঠলাম।

আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তা, তার ওপারে দুটো একই প্যাটার্নের বাড়ি ছিল। তার মধ্যে একটা বাড়িতে থাকত এক ধনী মাড়োয়ারী পরিবার। মহাবীর বলে আমাদেরই বয়েসী একটি ছিপছিপে ফর্সা ছেলে ছিল সে বাড়িতে। ছেলেটা হাতে সোনালী ব্যান্ডের ঘড়ি পরে রাস্তায় ঘোরাফেরা করত, আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম। কিন্তু জীবন যাত্রার মানের বিপুল পার্থক্যের জন্যই হোক, বা অন্য কোনো কারণেই হোক—একবয়েসী হওয়া সত্ত্বেও মহাবীরের সঙ্গে আমাদের কারো ভাব হয়নি। এখনও মনে আছে, প্রতি বছর কালীপূজোর দিন মহাবীর এক ঝুড়ি বাজি এনে ওদের বাড়ির উঠোনে পোড়াত। তার মধ্যে সবচেয়ে অবাক হতাম রুপোলী রাংতায় মোড়া তুবড়িগুলো দেখে। একটা তুবড়ি দু-তিনমিনিট ধরে ঝক্‌ঝকে সাদা আলোর ফুলকি ছড়িয়ে জ্বলত। একজন কে এগিয়ে গিয়ে মহাবীরকে জিজ্ঞেস করল—তুবড়িগুলোর কত দাম ভাই? মহাবীর খুব ঔদাসীন্যের সঙ্গে উত্তর দিল—এক একটা এক টাকা করে—

আমরা আরো অবাক হয়ে যেতাম। যে সময়ের কথা বলছি, তখন এক টাকায় এক সের চিনি, বা ষোলটা সিঙাড়া বা আটটা হাঁসের ডিম পাওয়া যায়।

কালীপূজার দিন সকালে দাদু আমাকে দু-প্যাকেট তামার ডাঁটিওয়ালা কুপার্স ফুলঝুরি, ইলেকট্রিক তার আর লাল-নীল দেশলাই কিনে দিতেন। বাড়িতে নিষিদ্ধ বাজি হিসেবে লুকিয়ে কিছু চটপটি কিনে আনতাম।

এ আর কতক্ষণ? সন্ধ্যেরাত্তিরেই আমাদের বাজির ভাণ্ডার ফুরিয়ে যেত। আমি আর নাড়ু গিয়ে মহাবীরদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়াতাম। মহাবীর এ ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করত। সে এদিক ঘোরে, ওদিক ঘোরে, বাজির ঝুড়ি আর বের করে না। আমাদেরও ধৈর্য অসীম। অপেক্ষা করে যাই।

একদিন ঠিক সন্ধ্যেবেলাটা—পশ্চিম আকাশে রক্তমেঘস্তূপ রাগী দৈত্যের চোখের মত তাকিয়ে আছে, বাতাস থম্‌থমে—খবর পেলাম মহাবীরের দিদি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে মানুষ মরার খবরটা এত স্বাভাবিক বলে ধরা হত না। পায়ে পায়ে রাস্তা পার হয়ে দেখি মহাবীরদের বাড়ির সামনে অনেক মানুষের ভিড়। শুনলাম মহাবীরের দিদি তখনো মারা যায় নি, তবে অবস্থা খুব খারাপ।

ওদের বাড়িতে ঢুকে দেখি উঠোনে কালো কালো ন্যাকড়ার মত পোড়া শাড়ির অংশ পড়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়েই নাকি মেয়েটি গায়ে আগুন দিয়েছিল। দু-এক পা করে আমি, তাপস, মন্টু এগিয়ে গেলাম ঘরের দিকে। জনতা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে নানা জল্পনা করছে। আমাদের বয়েস তখন অল্প, নীতিবোধ বিশেষ প্রখর ছিল না। আমরা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘরের মধ্যে আধো অন্ধকার। বাতাসে একটা বিশ্রী মাংসপোড়া গন্ধ। ডাঃ অনিমেষ রায়গুপ্ত খাটের পাশে বসে কাঁচি দিয়ে পোড়া মাংস কেটে বাদ দিয়ে ব্যান্ডেজ করছেন। কচ্‌কচ্‌ করে মাংস কাটার শব্দ আসছে। আশ্চর্যের কথা, মেয়েটির তখনো জ্ঞান আছে। বিকট শব্দে সে গুঙিয়ে উঠছে একটু পরে পরেই।

আমি প্রকৃতপক্ষে মজা দেখতে এসেছিলাম। আত্মহত্যা, মৃত্যু—এসব শব্দের কোনো বিশেষ মানে তখনো ছিল না আমার কাছে। কিন্তু ঘরের ভেতরের ওই কালো মৃত্যুমুখী আবহ, কড়া অ্যান্টিসেপ্‌টিকের গন্ধ, মেয়েটির চিৎকার আমার মনের ঠিক মধ্যেটায় হঠাৎ যেন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। মনে হল আমার সমস্ত শরীরে যেন আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই, যেন আর্তনাদে মুখর পৃথিবীর ওপরে আজকের সন্ধ্যেটার মত রক্তবর্ণ বিচিত্র দর্শন আকাশে উড়ছে শকুনের পাল। আমি ভয় পাইনি—এ ভয়ের চেয়েও বড় কিছু। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই এক চমকের জন্য আমার মনে হল—এ-ই সত্য। গান দিয়ে, খেলা দিয়ে, গল্প দিয়ে যতই চাপা দিয়ে রাখি না কেন, মরে যাওয়াটা ভয়ানক সত্য। সেই বয়সে এত গুছিয়ে ভাবিনি ঠিকই, কিন্তু যা মনে হয়েছিল সংক্ষেপে তা এই বটে।

সেদিকে রাত্তিরে ভট্টাচার্য পাড়ায় একটা গানের জলসা শুনতে যাবার নেমন্তন্ন ছিল। বড়মামা আমাকে নিয়ে গেলেন সেই জলসায়। অত লোকজন আর আলো দেখে মনে একটু হালকা হলেও চিন্তাটা পুরোপুরি মাথা থেকে গেল না। গান হচ্ছে, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকে লোকজন দেখছি। সবাই সেজেগুজে এসেছে উৎসব করতে, হাসিমুখে গল্প করছে বন্ধুদের সঙ্গে। ওরা তো হাসবেই, ওরা তো আনন্দ করে গান শুনবেই। ওরা তো আর আজ সন্ধ্যেবেলা একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে শোনেনি পোড়া মাংস কাটবার গা শিউরোনো আওয়াজ, শোনেনি মহাবীরের দিদির বীভৎস আর্তনাদ।

আমি কিছুতেই ঘটনাটা ভুলতে পারলাম না। একটা নীল আতঙ্ক বুকের ওপর চেপে বসে রইল। থাকতে না পেরে একদিন সন্ধ্যেবেলা জপ করার সময় দাদুকে বলে ফেললাম আমার আতঙ্কের কথাটা।

প্রথমে ভেবেছিলাম আমার ছেলেমানুষিতে দাদু হেসে উঠবেন। কিন্তু আমার কথা শুনে দাদু গম্ভীর হয়ে গেলেন। খুব গরম থাকায় সেদিন দাদু ছাদে মাদুর পেতে বসেছিলেন। গোধূলি ফুরিয়ে তখন আকাশে বেশ অনেক নক্ষত্র ফুটে উঠেছে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে দাদু সেই নক্ষত্রে ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—দাদু, বড় হয়ে ওঠবার পথে এসব ঘটনা মধ্যে মধ্যে চোখে পড়বেই। মন শক্ত করে এক বাস্তব বলে

মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? ওপরে তাকিয়ে দেখো, কত লক্ষ লক্ষ তারা আর গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে এই বিশ্বজগৎ, তুমি দেখতে পাচ্ছ না এমনও কত শত তারা আছে—সব ভগবানের নির্দেশে চলে। তাঁর ইচ্ছে না হলে একটা শুকনো পাতাও গাছ থেকে খসে পড়ে না। তিনি মঙ্গলময়, কারো অনিষ্ট করেন না। আজ তোমার কাছে যা খুব নিষ্ঠুর ঘটনা মনে হচ্ছে, তার পেছনেও ঈশ্বরের কোনো শুভ উদ্দেশ্য আছে। কেবল তুমি বুঝতে পারছ না, এই যা। এসো, আমরা জপ আরম্ভ করি।

সামান্য সান্ত্বনা পেলাম বটে, কিন্তু ততটা ভগবানের কল্যাণময় রূপের কথা ভেবে নয়, যতটা দাদুর সাহচর্যে। ঈশ্বরের চেয়ে দাদু অনেক পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এটা যে কেবল ছোটবেলাতেই, তা নয়, এখনও। যেমন নিজে ডাক্তারির কিছুই জানি না, কিন্তু ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস করি। কারণ আমি জানি যে, তিনি জানেন।

পরবর্তী সময়ে দাদুর প্রতি এই বিশ্বাস বয়ঃসন্ধির অনেক নৈতিক সমস্যার মুহূর্তে আমাকে রক্ষা করেছে। আবার কখনো জ্বর হলে দাদু এসে আমার কপালে আঙুল ছুঁইয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করে দিতেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার অনেকটা ভাল লাগতে শুরু করত।

আমার একটি দুর্বলতা ছিল। অনেক বয়েস অবধি আমি জুতোর ফিতের বা দড়ির গিঁট খুলতে পারতাম না। মা আমার এই অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতেন। আমি তখন বেশ দুষ্টু হয়ে উঠছি, ছাড়া পেলেই দুপুরবেলা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে আত্তি-পাত্তি খেলি বা রয়েল হোটেলের তারের বেড়ার ফাঁক গলে কাঁচা পেঁপে চুরি করতে যাই। কাজকর্ম সেরে মায়েরও একটু শুয়ে বিশ্রাম না করলে চলে না। বিশ্রাম আশ্চর্য রকমের তাড়াতাড়ি দিবানিদ্রায় পরিণত হয়। দুষ্টু ছেলে জেগে থাকলে মায়ের কি ঘুম আসে? বিশ্রাম নিরুপদ্রব করবার জন্য সে আমাকে পাশে শুইয়ে আমার কোমরের ঘুন্‌সির সঙ্গে নিজের আঁচলের একটা ফাঁসগেরো দিয়ে রাখতেন। আমার কাছে ফাঁসগেরোও যা, নাগপাশও তাই। ঘুমন্ত মায়ের পাশে শুয়ে অবনীন্দ্রনাথের ‘রাজকাহিনী’ পড়তাম। নাগাদিত্যের রাণীর ছুঁড়ে মারা নিরেট চাবির গোছা কপালে লেগে দুরন্ত ভীল ঘুরে পড়ছে ‘মা রে!’ বলে—কিম্বা ‘নালক’-এ বর্ধনের নিবিড় বনে ধ্যানে বসতে যাবার জন্য একটি সুদর্শন কিশোরের কান্না—‘ছেড়ে দে মা, ছেড়ে দে!’—এসব পড়তে পড়তে বুকের মধ্যে এক নাম-না-জানা আবেগে কেমন করে উঠত, বই মুড়ে রেখে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম বাইরে বেশ সুন্দর রোদ্দুর হয়েছে আজ। নিঃঝুম দুপুর গলির মধ্যে ঘুমপাড়ানী ডাক—‘শি-ই-ল্ কাটাও-ও-ও’—অনেক ওপরে আকাশের গায়ে বিন্দুর মত উড়ছে অনেকগুলো। মনে কেমন একটা আনন্দ—কাল মাংস রান্না হবে, অথবা বিকেলে কেউ বেড়াতে আসবে।

রাত্তিরে নিটোল গোল চাঁদ উঠতো আকাশে। ছাদে মায়ের কোলে হেলান দিয়ে বসে গল্প শুনতাম অবাক হয়ে। কত অলৌকিক ব্যাপার তখন লোকের জীবনে ঘটত। আজকাল আর তেমন গল্প শুনি না কারো মুখে। ছাদের পাশেই দু-টো তালগাছ খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখের মত দেখাত। সমস্ত ছাদে জ্যোৎস্না, তালের পাতায় চক্‌চক্ করছে চাঁদের আলো। মা গল্প বলছেন—ঢাকায় থাকবার সময় তাঁদের বাড়ির পেছনের জঙ্গল থেকে কার যেন আকুল কান্নার শব্দ ভেসে আসত। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ তখন উঠে অন্য বাড়িতে গিয়েছে। পুরনো বাড়ির কয়েকটা ঘর ভাড়া নিয়ে দাদু থাকতেন। সে বাড়িরই পেছন থেকে নারীকণ্ঠে কান্নার শব্দ ভেসে আসত। একবার লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতেও যাওয়া হয়েছিল—কিছু পাওয়া যায়নি।

আসলে আজকাল বড্ড আলো হয়ে গিয়েছে চারদিকে। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে

ইলেকট্রিক আলো ছিল না। চার-পাঁচটা হ্যারিকেনেই দিব্যি সংসারের সব কাজ চলে যেত। সন্ধ্যে হলে শেয়াল ডাকত আমাদের শহরে। এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিল অনেক গাছপালা। মানুষের কল্পনা এই পরিবেশে অনেক দূর যেত। এই বর্তমান যুগেও লোড্ শেডিং না হলে আমাদের বাড়িতে ভূতের গল্প জমে না।

আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে একটা মাঠ ছিল সেকথা তো আগেই বলেছি। মাঠটার ঠিক মাঝখানে ছিল একটা তুঁতগাছের ঝোপ। বর্ষার সময় ওই মাঠে একটা মাছের চারার বাজার বসত। কত ব্যাপারী আসত মাটির হাঁড়ি বাঁকে ঝুলিয়ে। সেইসব হাঁড়িতে থাকত ছোট্ট ছোট্ট প্রায় অদৃশ্য মাছের বাচ্চা। হাঁড়ি নামিয়ে রেখে মাছওয়ালারা হাঁড়ির জলে হাত দিয়ে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ করত, নইলে নাকি মাছ মরে যায়। শোবার ঘরের মাঠের দিকে যে জানালা, তার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে কেনাবেচা দেখতে দেখতে হেমেন রায়ের বই পড়তাম। তাড়াতাড়ি বই ফুরিয়ে যাবে এই ভয়ে একপাতা দু-পাতা করে পড়ে একটু বাজারের কাজকর্ম দেখে নিতাম।

এই পূর্বদিকের জানালার আর একটা স্মৃতি আছে—সেটা আমার কাছে এখনো একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে রয়েছে।

আমার তখন বোধহয় আট কি ন-বছর বয়েস, একবার খুব বিশ্রি বর্ষা আরম্ভ হল। পাঁচ-ছ-দিন ধরে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। বাড়ির সামনের রাস্তা জলের নিচে চলে গেল। রাস্তার ওপাশে পুকুরটা, যেখানে আমি আর নাড়ু মুকুন্দদার দোকান থেকে কেনা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতাম, সেই পুকুরটা আর রাস্তা জলে ভেসে এক হয়ে গেল। একজন বেপাড়ার লোক হাঁটতে হাঁটতে কোথায় পথ আর কোথায় পুকুর ঠাহর করতে না পেরে পা ফস্‌কে গিয়ে পড়ল পুকুরের জলে। বাড়িতে জামাকাপড় কিছুই শুকোচ্ছে না, সব জায়গায় একটা বিচ্ছিরি ভিজে ভিজে স্যাঁতসেতে ভাব। প্রথম দু-দিন সবারই খুব ভাল লেগেছিল, ইলিশমাছ ভাজা আর খিচুড়ি খাওয়া হল আনন্দ করে। মামারা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করলেন সারাদিন। কিন্তু তিনদিনের দিন লোকে বিরক্ত হয়ে উঠল। ঝুপ্ ঝুপ্ করে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই—একি রে বাবা!

ছ-দিনের সন্ধ্যেবেলা দিদিমা বললেন—সূর্যের স্যাঁতা লেগেছে। তোরা সূর্যকে আগুন দেখা—

নুকুমাসি জিজ্ঞেস করলেন—সে কি জিনিস মা?

—সূর্যের দিকে আগুন দেখালে তার ওঠবার কথা মনে পড়ে যাবে।

নুকুমাসি হেসেই অস্থির! তাই আবার হয় নাকি?

—করেই দেখ না তোরা।

একটা নেকড়ায় কেরোসিন ঢেলে লম্বা কাঠির ডগায় নিয়ে তাতে আগুন লাগানো হল। তারপর কাঠিসুদ্ধ সেটাকে পুবের জানালা দিয়ে বের করে নুকুমাসি কয়েকবার এদিক-ওদিক নেড়ে ফেলে দিলেন।

পরের দিন ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর উঠল। আকাশ পরিষ্কার।

ব্যাপারটা হয়ত—হয়ত কেন, সত্যিই কাকতালীয়। কিন্তু এসব প্রাচীন বিশ্বাসপালনের মধ্যে জীবনের রস আছে। আজকাল জানেই বা ক-জন? দিদিমাদের যুগটার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ঐতিহ্য ওপারে চলে গিয়েছে।

বছর নয়েক বয়েসে আমি জীবনে প্রথম ভূমিকম্প হতে দেখি। রাত্তিরে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি ঠক্‌ঠক্ করে আমাদের খাটটা

দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে বারবার লাগছে। শুয়ে শুয়ে অবাক হয়ে ভাবছি এমন হচ্ছে কেন, এমন সময় দিদিমা জেগে উঠে চিৎকার করে মাকে ডেকে বললেন—কল্যাণী। ওঠ্, দাদুকে নিয়ে পালা। ভূমিকম্প হচ্ছে। ওঠ্—

আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে খাট থেকে নেমে পড়লাম। মা আমার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে এগোবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পায়ের নীচে সমস্ত মেঝেটা এত দুলছে যে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। সারা বাড়ির লোক তখন জেগে উঠেছে। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সবাই একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করে সিঁড়ি দিয়ে নামবার চেষ্টা করছে—কার্যত কেউই নামতে পারছে না। সেই প্রথম আবছাভাবে অনুভব করলাম যে তেমন তেমন প্যানিক সৃষ্টি হলে লোকে হৃদয়হীন আর নৃশংস হয়ে ওঠে। কারো দোষ নেই, যেমন করে হোক আত্মরক্ষা করা জীবের ধর্ম। এটা আমাদের সভ্যতার পালিশের নিচে চাপা থাকলেও একথা তো অস্বীকার করা যায়না যে মানুষ social হলেও animal?

কোনোরকমে যখন সিঁড়ির মুখে পৌঁছেছি, তক্ষুনি ভূমিকম্প থেমে গেল। বলতে অনেক সময় লাগলেও সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে। অত হুড়োহুড়ির মধ্যেও মা ঠিক আমাকে ধরে রেখেছেন শক্ত করে। আত্মরক্ষা যেমন জীবের একটি মৌলিক ধর্ম, সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা ততোধিক শক্তিশালী সহজাত সংস্কার।

বাইরে অন্যান্য বাড়ি থেকে তখনও শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছিল। ননীগোপাল, গুরুপদবাবু, নিচের ভাড়াটে কিরীটীবাবু আর দত্তবাবু—সবাই ভূমিকম্পে কতখানি ক্ষতি হল তা নির্ণয় করার ব্যাপারে ভয়ানক কোলাহল করতে লাগলেন। তখন রাত ফুরিয়ে বেশ আলো ফুটেছে। দেখা গেল অত পুরনো আর নড়বড়ে হওয়া সত্ত্বেও বাড়িটার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। কেবল বাইরের দিকের দু-একজায়গার প্লাস্টার খসে নিচে দত্তবাবুদের উঠোনে পড়েছে। একতলায় গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। সমস্ত উঠোনটা যেন কেমন ঢেউখেলানো আর এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে, মাটি সরে আর ফেটে তলা থেকে বালি উঠে এসেছে ওপরে। পাড়ার অন্য বাড়িগুলোতেও লোকের মনে আকস্মিকতার ধাক্কা লাগা ছাড়া আর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।

কমলা নামে বছর ত্রিশেক বয়েসের একজন স্ত্রীলোক এ সময় আমার দিদিমার দেখাশুনো করত। আমরা তাকে ডাকতাম কমলামাসী বলে। কমলামাসীর এক মেয়ে ছিল, প্রায়ই সে আমাদের কাছে বেড়াতে আসত। তার নাম ছিল কবিতা। কবিতা আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বড় হলেও আমি তাকে নাম ধরেই ডাকতাম, তুই-তোকারি করতাম। তার মা আমাদের বাড়ির পরিচারিকা হলেও সে সময়ে, বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে, পরিচারিকাকে পরিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য বলে মনে করা হত না। কমলামাসী নিজের লোকের মতই আমাকে শাসন করত, আবার নিজের লোকের মতই ভালও বাসত। দরকার হলে আমার মা বা মাসীদেরও দু-কথা শুনিয়ে দিত, এবং সেজন্য কেউ কমলামাসীর শূল বা ফাঁসির ব্যবস্থা করেনি।

কবিতা আর আমি বন্ধুর মতই খেলাধুলো করতাম। এবার সে এল একদিন কথায় কথায় তাকে ভূমিকম্পের ব্যাপারটা বর্ণনা করলাম। শুনে কবিতা বলল—তা এরকম ভয়ে ভয়ে না থেকে ভূমিকম্প এড়াবার ব্যবস্থা করলেই তো হয়?

বললাম—কি রকম?

—বাঃ, তুই জানিস না? বাড়ির কোথাও একটা লোহার পেরেক পুঁতে রাখলে ভূমিকম্পে সে বাড়ির আর কিছু হয় না।

এত সহজে বাড়ি-চাপা পড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কে জানত। আমি খুশি হয়ে বললাম...চল্, আমরা কোথাও একটা পেরেক ঠুকে দিই গিয়ে—

নাড়ুর কাছে চেয়ে একটা ইঞ্চিখানেক লম্বা পেরেক জোগাড় হল। দুলুমাসী গান শিখতেন। তাঁর তবলা বাঁধার ছোট হাতুড়িটা সঙ্গে নিয়ে আমি, কবিতা আর নাড়ু ছাদে গেলাম। পশ্চিমদিকে পাঁচিলের এককোণে পেরেকটা পুঁতে দেওয়া হল। বোধহয় ইঁটে লেগে যাওয়ায় মাথার কাছে বেরিয়ে রইল একটুখানি।

আমি আর নাড়ু ভারি খুশি হলাম। এবার আর ভূমিকম্প হলেও ভয়ের কিছু রইল না।

॥ চার ॥

সেবার গরমের ছুটিতে শুভঙ্কর বলল—দাদা, আয় আমরা একটা টেলিগ্রাফ মেশিন বানাই।

আমি তখন ইস্কুলে 'জ্ঞান-দীপিকা' নামে সাধারণ জ্ঞানের বই পড়ি, কাজেই টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। বইতে ছবি থাকে এমন যন্ত্র কেবলমাত্র গ্রাহাম বেল বা এডিসন কিম্বা মার্কনি সাহেবই বানাতে পারেন—এ ধারণা কেমনভাবে যেন জন্মে গিয়েছিল মনে। তাই অবাক হয়ে বললাম—তুই বানাবি? নিজে? মিছিমিছি যন্ত্র, না সত্যিকারের?

—মিছিমিছি কেন হবে? ও তো বানানো খুব সোজা। একটা কাঠের লোহা পাত, কিছু তার আর একটা পুরনো ব্যাটারী হলেই বানানো যায়।

আমার বিশ্বাস হল না। তবু জিজ্ঞাসা করলাম—কি হবে?

—কেন, আমরা খেলবো। বেশ পোস্টাপিস-পোস্টাপিস খেলা যাবে। তাছাড়া তুই মনে কর নাড়ুর বাবার ঘরে বসে আছিস, আমি দিদার ঘর থেকে তোকে খবর পাঠাবো। দু-টো যন্ত্র হবে, একটা তোর কাছে থাকবে, একটা আমার কাছে। কি মজা হবে!

ইতিহাসে দেখা যায় সংশয়বাদীদের অবিশ্বাসের জন্য কোথাও বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে থাকে নি। এক্ষেত্রেও বাস্তব ঘটনা ইতিহাসকে অনুসরণ করল। দু-তিনদিন বাদে (দিদিমাকে আমরা দিদি বলতাম) আর গুরুপদবাবুর ঘরের দুস্তর দূরত্বকে খাটো করে দিল শুভঙ্করের তৈরি টেলিগ্রাফের কল।

আমরা সারাদিন ধরে ডাকঘর-ডাকঘর খেলতে লাগলাম। বদলাবদলি করে আমি আর শুভঙ্কর কখনো পোস্টমাস্টার কখনো সর্টার হতে লাগলাম। মৈত্রেয়ী একে মেয়ে, তায় ভালোমানুষ। ও বরাবরের জন্য পিওনে পরিণত হল। দেখা গেল তাতে ওর দুঃখ নেই, এবারে যে এত চমৎকার একটা খেলায় ওকে আমরা বাদ দিইনি তাতেই ও খুব খুশি। বাড়ির লোকেরা সারাদিন এত চিঠি পেতে লাগল যে, কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত জীবনেও তত চিঠি পান কিনা সন্দেহ। সর্বদেশের সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে আমাদের ডাকঘরে চিঠিপত্রের চেয়ে টেলিগ্রাম বেশি চলাচল করতে লাগল।

শুনতে অসম্ভব মনে হলেও আমি আর শুভঙ্কর মাথা খাটিয়ে একটা সোজা মর্স কোড গোছের আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। তা দিয়ে 'তুমি কেমন আছ?' 'আমি ভাল আছি' বা 'পিওনকে পাঠাও'—এ ধরনের সরল কয়েকটি বাক্য বেশ পাঠানো যেত। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে শুভঙ্করের বেশ মাথা ছিল। টেলিগ্রাফের যন্ত্রটি আমার কাছে ছোটবেলা থেকেই শুভঙ্করের প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের স্থান দখল করে রইল।

শুভঙ্কর আর মৈত্রেয়ী এলে আমার সঙ্গে ওর দাদুর কাছ থেকে সকালে দু-আনা করে হাত খরচ পেত। পাওয়ামাত্র গলির মোড় থেকে নানা কুপথ্য কিনে আমরা ছাদে বসে খেয়ে ফেলতাম। আমার বড়মামা ভারি মজাদার লোক ছিলেন। আমরা হয়তো তিন ভাইবোন কাগজের ঠোঙায় চানাচুর বা নকুলদানা নিয়ে খাচ্ছ, উনি চুপিচুপি এসে হঠাৎ খপ করে এক খাবলায় খানিকটা তুলে নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে যেতেন। আমরা হাঁউমাউ করে উঠতে উঠতে বড়মামা অনেক দূরে। ক্রমে আমাদের মনে বড়মামা সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক জন্মে গিয়েছিল। খাবার সময় আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতাম।

আমাদের ছোটবেলায় চারদিকে অনেক চিল দেখা যেত। প্রায়ই দেখতাম এগাছে ওগাছে সোনার রঙের চিল এসে বসেছে। কোথায় গেল এইসব চিলেরা? দাঁড়কাকও আজকাল আর বিশেষ দেখা যায় না। শালিক বা চড়ুই যা দু'একটা উড়তে দেখি, কলকারখানার ধোঁয়ায় আর সর্বত্রগামী মানুষের উপদ্রবে তারাও আর কতদিন থাকবে জানি না।

একদিন সকালে আমি, শুভঙ্কর আর মৈত্রেয়ী ছাদে বসে রসমুণ্ডি, সিঙাড়া আর ক্রিমরোল খাচ্ছি—হঠাৎ কিভাবে যেন আমার আর শুভঙ্করের মারামারি বেধে গেল। আধখাওয়া ক্রিমরোল হাতে করে মৈত্রেয়ী চিলেকোঠায় ওঠবার সিঁড়ির ধাপে বসে একমনে হাঁ করে আমাদের যুদ্ধ দেখছিল। অপরের অমনোযোগিতাই যাদের আহার সংগ্রহের উপায়, তারা এসব সুযোগ নষ্ট করে না। একটা চিল শোঁ করে নেমে এসে ঠোঁটে করে মৈত্রেয়ীর ক্রিমরোলটা নিয়ে উড়ে পালাল।

মৈত্রেয়ী একবার শূন্য হাতের দিকে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল—বড়মামা নিয়ে গেছে!

বেচারা চিলটাকে দেখতেই পায়নি। ঝট্‌পট্‌ শব্দ এবং হাতে খাবার নেই—এ থেকে সে স্বাভাবিক কারণটাই অনুমান করেছিল।

ইস্কুলের এক একটা পিরিয়ড যেন কাটতেই চায় না, অথচ খেলার সময় হুশ করে কোথা দিয়ে চলে যায়। আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ্‌ রিলেটিভিটিকে সপ্রমাণ করে এবারের গরমের ছুটিটাও দেখতে দেখতে চলে গেল। ততদিনে পোস্টমাস্টার হিসেবে আমি আর শুভঙ্কর এবং পিওন হিসেবে মৈত্রেয়ী এত পাকা হয়ে উঠেছি যে, সুচারুভাবে কর্তব্য পালনের জন্য আমাদের রাষ্ট্রপতির পদক পাওয়া উচিত। সরকারী ডাকব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা সমান্তরাল ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাচ্ছিলাম বলেই হয়তো ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে রাষ্ট্রপতি আমাদের পুরস্কৃত করেন নি।

শুভঙ্কর আর আমি পরামর্শ করে ফেললাম। ওরা যেদিন ফিরে যাবে তার দু-দিন আগে থেকে আমি ভয়ানক বায়না ধরে বসলাম—আমিও ওদের সঙ্গে যাবো। আমাকে একা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ফিরবো কার সঙ্গে? কাজেই শেষ অবধি ঠিক হল মাও যাবেন। দিন চার-পাঁচ থেকে ফিরে আসবো। আমারও ইস্কুল খুলতে বেশি দেরি নেই।

মেসোমশাই তখন পাঞ্চেৎ-এ থাকেন। পঞ্চকূট পাহাড় থেকে কয়েক মাইল দূরে জায়গাটা। আসানসোলে নেমে যেতে হয়।

সারারাত প্যাসেঞ্জার ট্রেনে টিকিস্‌ টিকিস্‌ করে গিয়ে শেষরাত্তিরে পৌঁছেছিলাম আসানসোল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস পাওয়া গেল। ছাব্বিশ মাইল বাসে পাড়ি দিয়ে সকালের সুন্দর আলোয় প্রথম পাঞ্চেৎকে দেখলাম।

জ্ঞান হবার পর জীবনে এই প্রথম আমার বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া।

ওই বয়েসটায় যে কোনো ঘটনা থেকে সবটুকু আনন্দ নিংড়ে নেবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে। আমার যে কি আনন্দ হল তা বলবার নয়! দেখলাম দূরে নীল পঞ্চকূট পাহাড় আকাশের অনেকখানি অংশ জুড়ে দাঁড়িয়ে। মাটি উঁচু নিচু, লাল রঙের। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র নানা আকারের ও রঙের পাথরের নুড়ি। আমাদের শহরের মত ঘিঞ্জি বসতি নেই—অনেক জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কর্মচারীদের সাদা কোয়ার্টারগুলো তৈরি হয়েছে। পথেও লোকজন নেই বললেই চলে। একটা বিরাট মোটা জলের পাইপ, অর্ধেকটা মাটির নীচে আর অর্ধেকটা ওপরে, বরাবর চলে গিয়েছে সমস্ত বসতিটার মাঝখান দিয়ে। আমরা তিনজন পাইপটার ওপরে দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করতাম। লিলি বলে একটা কুকুর ছিল শুভঙ্করের—তার সঙ্গেও আমার ভাব হয়ে গেল।

পাঞ্চেৎ পৌঁছে প্রথম দিনটা গেল নতুন জায়গার সঙ্গে পরিচিত হতে। পরের দিন ভোরবেলা উঠে দেখি তখনো সূর্য ওঠেনি। মা আর সেজমাসী রান্নাঘরে বসে চা তৈরি করছেন। বিছানা থেকে মা উঠে যাওয়াতে একটা দিক খালি—অন্যদিকে শুভঙ্কর আর মৈত্রেয়ী ঘুমোচ্ছে। পায়ে হেঁটে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অচেনা জায়গায় ঘুম ভেঙে জেগে ওঠবার একটা আমেজ আছে। চারদিকের মুক্ত প্রান্তর আর পাহাড় দেখে আমার খুব অদ্ভুত লাগছিল। সূর্য ওঠেনি বলে বাতাস তখনো ঠাণ্ডা। শেষ রাত্তিরে গায়ে চাদর দিতে হয়েছিল। কিন্তু গতকাল দেখেছি বেলা আটটা থেকে বাড়ির বাইরে যেন আগুন জ্বলে।

তখনো ঘুম ভাল করে কাটেনি, জড়িত চোখে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি—দেখলাম জলের পাইপটার ওপর দিয়ে সুন্দরভাবে শরীর ব্যালান্স করে বিশালদেহ এক ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন। তাঁর কাঁধে বন্দুক, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। ভদ্রলোক হেঁটে এসে আমাদেরই বাড়িতে ঢুকলেন। লিলি দৌড়ে গেল। ভাবলাম এবার লিলি গর্জন করে উঠবে বা কামড়ে দেবে লোকটিকে—তার বদলে সে আদর করে লোকটির হাত চাটতে লাগল। বুঝলাম ইনি লিলির পরিচিত এবং এ বাড়িতে প্রায়ই আসেন। আমি ওঁকে দেখে যতটা অবাক হয়েছি উনি আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন তার চেয়ে বেশি। লিলির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

শুনতে সাধারণ এবং দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও প্রশ্নটি নানা দার্শনিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। 'তুমি এখানে কি করছ' বা 'কোথা থেকে এসেছ' জিজ্ঞাসা করলে যাহোক একটা উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু এঁকে বোঝাই কিভাবে যে আমি কে? ভেবেচিন্তে বললাম—আমি তুম্‌পে।

—তুম্‌পে? তুম্‌পে কাকে বলে?

একটু ভেবে বললাম—আমাকে বলে।

শুনে ভদ্রলোক বাড়ি কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। হাসির শব্দে ভয় পেয়ে বাগান থেকে হর-র্-র্-র্ আওয়াজ করে একদল শালিক উড়ে গেল। লিলি দু-পা পিছিয়ে এসে শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল। এমন সময় এই সব আওয়াজে মেসোমশাই টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোককে দেখে সোল্লাসে বললেন—আয়ে! কহন্ এয়েহো? এহো এহো!

ভদ্রলোক হেসে বললেন—আমি এসেই পড়েছি। আপনি চট করে মুখ ধুয়ে নিন—

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মেসোমশাই বলে গেলেন—ভেতরে আও। বোহো—

তাঁকে দেখেই মাসী খুশি হয়ে বললেন—আরে! সি. কে. সি. যে। ব্যাপার কি? এবার এতদিন পরে যে?

—আসবার সময় পাচ্ছিলাম না বৌদি। কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে তো! ভয়ানক চাপ।

—বোস ভাই, চা খাবে তো?

—আপনারা চা ছাড়া আজকাল সকালে আর কিছু খান না? সারারাত জেগে এসেছি, খুব খিদে পেয়েছে।

মাসী বললেন—তাও দেবো। আগে চা-তো খাও—

শুভঙ্কর আর মৈত্রেয়ী ঘুম থেকে উঠে 'কাকু এসেছে, কাকু এসেছে' বলে চিৎকার করতে করতে এসে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরল।

একটু বাদে শুনলাম উনি মেসোমশাইয়ের আপন ভাই নন, তবে ভাইয়ের চেয়েও বড়। আগে একসঙ্গে কাজ করতেন। ওঁর নাম চঞ্চলকুমার চক্রবর্তী, সংক্ষেপে সি. কে. সি। সবাই সি. কে. সি. বলেই ডাকে। বিয়ে থাওয়া করেন নি। দিলদরিয়া আর ফুর্তিবাজ লোক—মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসেন।

পরিচয়পর্ব শেষ হলে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে সি. কে. সি. আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তার মানে তুমি হচ্ছ মেজদির ছেলে? তোমার কথা আমি আগেই শুনেছি। তুমি নাকি খুব বই পড়তে ভালবাসো?

—হ্যাঁ। আপনি বাসেন না?

সি. কে. সি. আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলেন—না, আমি বই-টই বিশেষ পড়েনি। আমি শিকার করি।

দেওয়ালে হেলান দেওয়া বন্দুকটা দেখিয়ে বললাম—ওটা দিয়ে?

—হ্যাঁ, ওইটে দিয়ে। তোমার শিকারী হতে ইচ্ছে করে না?

শিকারী হবার কথা কখনো ভাবিনি, কাজেই ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্ন ওঠেনি। চুপ করে রইলাম।

—আজ বিকেলে আমি দামোদরের ধারে শিকার করতে যাবো। তুমি আর শুভঙ্কর আমার সঙ্গে যাবে, বুঝলে?

আমি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

মামাবাড়ির যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, তাকে সাহিত্যিক পরিবেশ বলা যেতে পারে। মামারা রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ আবৃত্তি করেন, দাদু পড়েন গীতগোবিন্দ। মা দুপুরে শুয়ে দেশী-বিদেশী উপন্যাস পড়েন। আমার চেনাশুনো ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ শিকারী নই। কাজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না শিকার করতে যাবার কথায় কতখানি আনন্দিত হওয়া উচিত।

সারাদিন সি. কে. সি. বসে বসে শিরিষ কাগজে আর তেল দিয়ে বন্দুক পরিষ্কার করলেন। তারপর বিকেল চারটে নাগাদ চামড়ার ব্যাগটা থেকে গোটাকতক কার্তুজ বের করে পকেটে নিয়ে আমাকে শুভঙ্করকে বললেন—চলো আমার সঙ্গে, দেখা যাক কিছু পাওয়া-টাওয়া যায় কিনা—

জলের পাইপ বেয়ে কিছুদূর গিয়ে মাঠে নামলাম। পেছনে পড়ে রইল কোয়ার্টারের বাড়িগুলো। গরমকাল, কাজেই বেলা চারটেতেও মনে হচ্ছে সবে দুপুর। মাটিতে অভ্রের কুচি চক্‌চক্ করে উঠছে কাছে-দূরে। জমি থেকে গরম ভাপ উঠছে। উচ্চাবচ জমি ভেঙে চলেছি আমরা।

তারপরই হঠাৎই সামনের দামোদর।

জীবনে প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম, গৌর গোস্বামীর বাঁশিতে নীলাম্বরী রাগ শুনে চোখে জল এসেছিল—সেই অনুভূতির সঙ্গে একমাত্র প্রথম দামোদরের বিরাট ব্যাপ্তির মুখোমুখি হবার মনোভাবের তুলনা হয়। মনে হল যেন দিগন্ত অবধি গা ঢেলে বিকেলের আলোয় স্বপ্ন দেখছে বালির চর। তার মধ্যে দিয়ে গ্রীষ্মে শীর্ণ দামোদর এখান-ওখান দিয়ে সরু ফিতের মত বয়ে চলেছে। খানিকটা বালি পেরিয়ে দু-হাত চওড়া নীল জলধারা, নেমে পড়ি সেই জলে। পার হয়ে আবার বালি, তারপর আবার জল। বড় বড় কালো আগ্নেয়শিলার স্তূপ প্রাকৃতিক কবিতার যতিচিহ্নের মত পড়ে; মনে এমন একটা বাঁধনছেঁড়া আনন্দ—যা শুধু সেই বয়েসেই থাকে।

সি. কে. সি. হঠাৎ থামলেন। আমরা কোনো প্রশ্ন করার আগেই ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে আমাদের চুপ করে থাকতে বললেন, তারপর ইশারায় জানালেন—এখানে দাঁড়াও। এগিও না।

আমি আর শুভঙ্কর অবাক হয়ে চারদিকে তাকালাম। কোথাও কিছু নেই, এখানে কি করবেন ভদ্রলোক?

আমরা বুঝতে পারিনি কিন্তু সি. কে. সি.-র অভ্যস্ত চোখ দূরে পাখি দেখতে পেয়েছিল। দেখলাম উনি বগলে বন্দুক নিয়ে পা টিপে টিপে বালির ওপর দিয়ে এগুচ্ছেন। কিছুদূর এগিয়ে আস্তে করে বালির ওপরে একটা হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন সি. কে. সি.। বন্দুক তুলে খুব সাবধানে টিপ করতে লাগলেন।

আমি আর শুভঙ্কর নির্দেশমত শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বালির ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়াব মৃদু শব্দ কানে আসছে। দূরে দামোদরের জলে রোদ্দুর চিক্‌চিক্ করছে।

হঠাৎ সি. কে. সি. ফায়ার করলেন।

এটি আমাব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। কারণ সেই প্রথম আমি শান্ত পরিবেশে বন্দুকের বিকট আওয়াজ শুনে চমকে যাই। প্রথম বুঝতে পারি এমন চমৎকার পরিবেশেও কেউ এসে এবকম শব্দ কবতে দ্বিধা করে না। এবং তার ফলস্বরূপ জলের কিনারায় বালিব ওপবে পড়ে থাকে কয়েকটি পাখির মৃতদেহ।

নির্জন চবের, আমাদের কিশোরমনের এবং সেদিনকার বিকেলেব সবটুকু সৌন্দর্য খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে গেল ওই আওয়াজে।

এবং আমার জীবনে অনেকখানি ভবিষ্যৎ অবধি গড়িয়ে গেল বন্দুকের শব্দ।

॥ পাঁচ ॥

জীবনকে অনেক সময়েই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করা হলেও অন্তত একটা বিষয়ে এ দুটোর বিরাট পার্থক্য আছে। সত্যিকার জীবনে একটি অঙ্কের শেষে হঠাৎই পর্দা নেমে আসে না—জীবনের এক একটি পর্যায় শেষ হয় খুব আস্তে, তার গতি টের পাওয়া যায় না। তারপর আচম্‌কা একদিন আবিষ্কার করা যায় যা ছিল তা আর নেই, কি করে যেন সব বদলে গিয়েছে। আমিও যে একদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখলাম আমি বড় হয়ে গিয়েছি—এমন নয়। তবে এটাও ঠিক যে, আস্তে আস্তে আমার ছোটবেলাটা ফুরিয়ে আসছিল। এই সময়েই মা আর দাদু পাশাপাশি জমি কিনে একই সঙ্গে বাড়ি করতে শুরু করলেন। দাদু সরল ধার্মিক গোছের মানুষ, মিস্তিরি খাটিয়ে বাড়ি তৈরি করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না, মায়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। এ ভার পড়ল আমার পুরনো মাস্টারমশাই অনিল দত্তর ওপরে। অনিলবাবুও ধর্মপ্রাণ ছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ প্র্যাকটিক্যাল

মানুষও ছিলেন। আমি আর খোঁড়া নেদো প্রায়ই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দেখতে যেতাম বাড়ি কিরকম তৈরি হচ্ছে। দেখতাম সেই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে অনিল দত্ত চেঁচামেচি করছেন—'ও জলিল মিয়া, ও কি হচ্ছে? ইঁট ভিজিয়ে নিলে না? কিম্বা—'সিরাজুল, ওলন ঠিক করে বাঁধো—দেওয়াল বাঁকা হয়ে যাবে।

আমার এগারো বছর বয়েসে আমরা নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করি। কেন জানি না, এই বাড়িতে এসেই মনে হয়েছিল একটু যেন বড় হয়ে গিয়েছি। তার একটা কারণ বোধহয় এই বাড়িতে আসার পরেই সাঁতার কাটতে আর সাইকেল চড়তে শিখেছিলাম। এ দু-টো নবলব্ধ বিদ্যায় আমার পৌরুষের সীমা অনেকখানি প্রসারিত হয়েছিল।

বড়মামা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকাই কিনতেন। তাঁর ঘরে স্তূপ করে রাখা আনন্দবাজার আর দেশ নন্দলালের দোকানে বারো আনা সের দরে বিক্রি করে আমি আর শুভঙ্কর করুণাদার দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া নিতাম। ভাড়া ঘন্টায় চার আনা। করুণাদার নামের সঙ্গে স্বভাবের কিছুমাত্র মিল ছিল না। প্রত্যেকটি মুদ্রা ভাল করে দেখে তবিলে রেখে তবে হাঁক দিতেন—'যোগেন, দু-টো সাইকেল খোকাদের বের করে দে।' দু'-এক ঘণ্টাব ভাড়া জমা দিযে নতুন সাইকেল চড়ার উৎসাহে কখনো-সখনো দেড় কি দুই ঘণ্টাও হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে পরেব দিন বকেয়া মিটিয়ে না দিলে সাইকেল পাওয়া যেত না।

দাদুব গাছের শখ ছিল। নতুন বাড়ির সামনে একচিলতে জমিতে নানারকম গাছ লাগিয়েছিলেন। তাব মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতের কলাগাছ। অনেকদিনের পড়ে থাকা জমিতে প্রথমদিকে গাছপালা খুব ভাল হত। কোথা থেকে মর্তমান কলার চারা এনে লাগিয়েছিলেন, কয়েকমাসেব মধ্যেই বিশাল এক মোচা বেরুল। দাদু খুব খুশি। কিন্তু কার্যকালে ব্যাপাব দাঁড়াল অন্যরকম। মোটা মোটা বড় কলাগুলো পেকে গাছেই হলদে হয়ে এল। আমরা সবাই অবাক! যে মর্তমান কলা শীতলের দোকান থেকে পাঁচসিকে ডজন কিনে আনতে হয়, সেই কলা হাতেব কাছে ঝুলে থাকবে—আমরা ছিঁড়বো আর খাবো, এ তো ভারি মজা!

কলা পাকলে কাঁদি নামিয়ে বাড়ির সবাব হাতে একটা করে দেওয়া হল। সবাই—বড়মামা অবধি—হাসি হাসি মুখে কলায় কামড় দিয়েই থ!

কলার ভেতর ভর্তি শক্ত আর কালো বিচি!

ওগুলো ছিল আসলে বিচেকলা—সাধারণত অখাদ্য।

দাদু মহা চটে নিজেই একখানা দা নিয়ে বাগানে নেমে গিয়ে কুচ্‌কুচ্ করে সব কলাগাছ কেটে ফেললেন। আপদ চুকলো।

বড় হয়ে ইংরেজি প্রবাদে পেয়েছিলাম—এভ্‌রি ডার্ক ক্লাউড্ হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং। দাদু মনোকষ্টে ভুগলেন, গাছগুলো কাটা পড়ল সবই ঠিক, কিন্তু এর একটা সৃজনধর্মী দিক বেড়িয়ে পড়ল—আমরা সাঁতার শিখে ফেললাম। শুনলে মনে হয়—হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা! কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কার্যকারণ সম্পর্কহীন মনে হলেও দু-টো ঘটনার স্পষ্ট যোগসূত্র আছে। আমরা জানতাম কলাগাছের কাটা টুকরো বুকে নিয়ে ভাল সাঁতার কাটা যায়। মায়ের মুখে মায়ের ছোটবেলার গল্প শুনতাম, তারই মধ্যে মা বলেছিলেন এ কথা। সকালবেলা গাছ কাটা পড়ল, দুপুরে আমি আর শুভঙ্কর দু-খানা বড় কলাগাছের কাটা টুকরো নিয়ে পুকুরে চলে গেলাম। এই অনাচারের জন্য বকা খেতে হল অনেক, কিন্তু কোনো বাধার জন্যই পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ ঠেকে থাকেনি। পরদিন

আমরা আবার গেলাম —এবং তার পরদিন আবার। কলাগাছগুলো শুকোতে চার-পাঁচদিন লেগেছিল, প্রত্যেকদিন বাড়ি থেকে লোক এসে কান ধরে টেনে না তোলা পর্যন্ত পুকুরে থেকে আমরা এই ক-দিনেই সাঁতার বেশ রপ্ত করে ফেললাম। এরপরে আর কলাগাছ লাগতো না, প্রাথমিক ভয়টা কেটে গিয়েছিল। বাকিটা এমনিই শিখে গেলাম।

সব বাঙালী ছেলেই বয়ঃসন্ধির সময়ে প্রথম প্রেমে পড়ে এবং কবিতা লিখতে শুরু করে। আমিও চোদ্দ বছর বয়েসে বেশ কয়েকটা গল্প আর কবিতা লিখে ফেললাম। এই সময়েই কয়েকজন বন্ধুও জুটে গেল, তাদেরও বয়েস কমবেশি আমারই মতন আর তারাও কবিতা ইত্যাদি লেখে। এদের মধ্যেই শিবদাস চৌধুরী ছিল অন্যতম। আমাদের চেয়ে সে বয়সেও সামান্য বড় ছিল আর প্রেমবিষয়েও তার অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের থেকে বেশি। সার্পেন্টাইন ঝিলের ধারে ঝুরিনামা বটগাছটার ওপাশে ঝরাপাতার ওপরে তখন আমাদের বৈকালী আড্ডা দারুণ জমে ওঠে। কবির দল গড়া হয়েছে, সদস্যদের প্রতিজ্ঞা— সপ্তাহে অন্তত দশটা করে কবিতা লেখা হবে। আমি, শুভঙ্কর এবং অন্য সদস্যরা দশ-বারোটা কবিতা লিখে ফেলি ঠিকই—কিন্তু শিবদাস অদ্ভুতকর্মী, সে সারা সপ্তাহে ত্রিশ-চল্লিশটা কবিতা লিখে আনে। আমরা তার দিকে ডি. এল. রায়ের ভাষায়, 'অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।' চার পয়সায় দু-টো পানামা সিগারেট পাওয়া যায়, তাই কিনে নেওয়া হয় গোটাকতক। ক্লাস টেন-এ পড়ি, লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে মাঝে সিগারেট টানতে শিখেছি। এর মধ্যে একদিন বিকেলে তেমোহনীর বটতলায় সবাই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এখুনি কবিতা পড়া আরম্ভ হবে—হঠাৎ শিবদাস বলল—এই আজ বাংলার কত তারিখ জানিস কেউ?

আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। দেখা গেল বাংলা তারিখের খবর কেউ রাখি না। শিবদাস ভারী গলায় বলল—ছিঃ! বাঙালী হয়ে তোরা কেউ বাংলা তারিখ জানিস্ না? আজ এক মহা পুণ্যদিন, আজ পয়লা আষাঢ়।

আমরা ততোধিক গভীর জলে! পয়লা আষাঢ় তো কি?

শিবদাস বলল—তোরা দেখা যাচ্ছে মেঘদূত পড়িস নি। সেই 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানু' —জানিস না? আয়, আজ এখানে বসে কালিদাস জয়ন্তী করা যাক্—

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একেবারে মেঘমাশ্লিষ্টসানু না হলেও আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘের আনাগোনা। কাব্যযজ্ঞাগ্নিতে গোটা দশবারো পানামা সিগারেট আহুতি দিয়ে আমরা কবিপূজা সাঙ্গ করলাম। শিবদাস আগে থেকেই কালিদাস সম্বন্ধে কয়েকটা কবিতা লিখে এনেছিল, তিন পয়সা দামের রোগা মোমবাতি জ্বেলে বাতাস থেকে বাঁচানোর জন্য গাছের গুঁড়ির আড়ালে রেখে তার আলোয় সে কবিতাগুলো আবেগ দিয়ে পড়ে গেল।

শিবদাস সম্বন্ধে আমরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। আমাদের মধ্যে সে অনেক বিষয়েই পায়োনিয়ার ছিল। যেমন—ঘন ঘন প্রেমে পড়ার ব্যাপারে। একদিন শিবদাস কবিতা লিখে এনে পড়তে আরম্ভ করল—ওগো তন্বী, তোমার উজল রূপের বহ্নি, বাঁকায়ে অলক মারিছ ঝলক—

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম —না, এ হতে পারে না। তোর সব ব্যাপারে সর্দারী আমরা মেনে নিই—কিন্তু এটা কবিতা হয় নি। 'মারিছ ঝলক' কখনো কবিতার ভাষা হতে পারে?

লজ্জিত মুখে শিবদাস বলল—ঠিকই বলেছিস। ও জায়গাটা সম্বন্ধে আমার নিজেরও একটু সন্দেহ আছে। আসলে খুব আবেগের মাথায় লেখা তো। অমন হয়, বিশ্ব সাহিত্য

অনেক আছে। গ্যেটের সাফারিং অফ্ ইয়াং ভের্টর পড়ে দেখিস—

—বুঝলাম। কিন্তু ঘটনাটা কি?

ভূমিকা ছেঁটে শিবদাস বলল—মেয়েটার নাম শিপ্রা কুশারী। আমাদের পাড়াতেই থাকে। ফর্সা, বড় বড় চোখ, যখন তাকায় তখন মনে হয় একেবারে—যাক্‌গে, যা বলার কবিতাতেই বলব—

কিছুদিন এই পর্যায় চলার পর হঠাৎ দেখি শিবদাস আর শিপ্রা কুশারীর বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করে না। আমরা জিজ্ঞেস করতে সে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—নাঃ, ও বিষয়ে আর ভাবছি না—

—সেকি রে! কেন?

—নাঃ, বড্ড লাইট! সেদিন বীরেশকাকার মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি, একটু বাদে দেখি শিপ্রা কুশারীও তাঁর মায়ের সঙ্গে ঢুকছে। বিয়ে বাড়িতে অত বাঁধাবাঁধি থাকে না তা তো জানিসই—এদিক ওদিক দু-একটা কথা বলে ভাব জমিয়ে নিলাম। কি বলবো ভাই, বলাকার গতিতত্ত্ব দিয়ে আলাপ শুরু করলাম—আর মেয়েটা চলে গেল দিলীপকুমারে।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। আমার কপালটাই এইরকম। অথচ বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নায়িকারা মেঘলা বিকেলে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ফুলদানীতে রজনীগন্ধার স্টিক সাজাতে সাজাতে কেমন সুন্দর কবিতার ভাষায় কথা বলে। নাঃ, ও আমার পোষাবে না।

মাসখানেক বাদ দিয়ে আবাব হাতে গরম প্রেমেব কবিতা লিখতে শুরু করল শিবদাস। প্রথমদিন সন্দেহ কবলাম, দ্বিতীয দিন প্রশ্ন কবলাম—কে?

—ইয়ে, অনুবাধা।

—পাড়ার?

—হুঁ।

—এবার ক'দিন চলবে?

শিবদাস উত্তেজিত হয়ে বলল—তুই বুঝতে পারছিস্ না! এ সেরকম নয়। নইলে আমি কি আর—

—এ কি রকম? আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করে?

—আহা, তা কেন? অনুরাধা হচ্ছে—মানে—খুব ঘরোয়া। লেখাপড়া বেশিদূর করেনি, কিন্তু সব বিষয়ে জানবার কি আগ্রহ!

—তুই কি করে জানলি?

আমার মূর্খতায় অবাক হয়ে শিবদাস বলল—আরে! আমি যে ওকে পড়াই!

মাস দুই পরে শিবদাসের কবিতায় আবার বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। আকাশের কথা, আঁচলের কথা, হঠাৎ চোখা-চোখির কথা আর থাকে না। কবিতায় বৈরাগ্যের কথা, ভোগের চেয়ে ত্যাগ কত বড় এসব কথা প্রাধান্য পেতে লাগল। আমরা চেপে ধরলাম—কি হয়েছে?

—গেছে।

—মানে?

মাস দুয়েক আগে একবার চার-পাঁচদিন ধরে নাগাড়ে খুব বৃষ্টি হোল মনে আছে? সে সময়েই—

—কি হয়েছিল?

—বাইরে ঝুপ ঝুপ করে সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে, সকাল থেকে মানসী পড়ে দুপুরবেলা অনুরাধাকে পড়াতে গেছি। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সবুজ গাছপালা, নিমের ডালে ভিজে পালক-ফোলা কাক, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে—আমার মনে একটু ইয়ের ভাব আছে তা তো তোরা জানিসই। আমি ওর হাত দুখানা ধরে দুয়েকটা বাছাই করা কবিতার লাইন বললাম—এ রকম সিচুয়েশন আসতে পারে ভেবে বাছাই করাই ছিল। অনুরাধা হাত সরিয়ে নিল না, চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। আমি সাহস পেয়ে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে কড়ি ও কোমল থেকে ওই সনেটটা বলতে শুরু করলাম, সেই যার মধ্যে আছে—'এই কিরে বারে বারে/মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে/ভাবছ তুমি মনে মনে এ লোকটি নয় যাবার'—

দু-এক লাইন বলতে না বলতে ঘরে ঢুকলেন অনুরাধার মা!

জাঁদরেল মহিলা। আচার-ব্যবহাব এবং চেহারা দু অর্থেই। আমি বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে আছি, সনেটের পরের লাইনগুলো গলা অবধি উঠে এসেছিল, তাদের আবার গিলে ফেলেছি। অনুরাধার মা কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—অ! এই ব্যাপার! সেই জন্যেই ভাবি আজকাল মাস্টার এলে হঠাৎ ঘর নিঝুম হয়ে যায় কেন, বাংলা কবিতা ছাড়া আব পড়ার আওয়াজ শোনা যায় না কেন? কবিতা পড়া হচ্ছে, অ্যাঁ? তা বেশ ভাল, দাঁড়াও, সবাইকে ডেকে দেখাই—

আমি আতঙ্কে ধড়ফড় করে উঠতে যাচ্ছিলাম, অনুরাধার মা বাজখাঁই গলায় বললেন—খপর্দার! ওইভাবে কাঁধে হাত দিয়ে থাকো—অনুর বাপকে ডাকি—

শিবদাস চুপ করে ঝিলের ওপাবে তাকিয়ে রইল।

বললাম—তারপর?

—আর কি? হয়ে গেল—

এইরকম ছিল শিবদাসেব কাণ্ডকারখানা।

সময এগোচ্ছিল। কখন যে শৈশব পেবিয়ে কৈশোর এবং কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রেখেছিলাম টের পাইনি। প্রায়শই কোনো একটি বড় রকমের মনে দাগ কাটার মত ঘটনা আমাদের জীবনের দুটি পর্বকে ভাগ করে দেয়। ইস্কুলে জীবনের একদম শেষ বছরে এরকম একটা ঘটনা ঘটে হঠাৎ আমাকে জানিয়ে দিল আমার জীবনের একটি পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গিয়েছে।

তেমোহিনী ঝিলের ধারে প্রায়ই দেখতাম আমাদের থেকে কিছুটা দূরে একটি ছেলে এসে বসত। কান পেতে আমাদের কবিতা শুনত, কিন্তু কোনোদিন এগিয়ে এসে আলাপ কবার চেষ্টা করত না। লাজুক ধরনের ছেলে, রোগা চেহারা, দুর্বল গড়ন।

একদিন আড্ডায় গিয়ে একা বসে আছি, তখনো আর কেউ আসেনি। দেখি একটু দূরে রোগা চেহারার ছেলেটি বসে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। হেসে বললাম—এইখানে এসে বোসো না, কথা বলা যাক্—

ছেলেটি যেমন ব্যগ্রভাবে উঠে এল, তাতে বুঝলাম অনেকদিন থেকেই ও এই আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল।

বললাম—কি নাম তোমার?

—উদয়ন।

তারপর হেসে বলল—আপনার নাম কিন্তু আমি জানি।

—সে কি! কি করে জানলে?

—আমি অনেকদিন ধরে এইখানে বসি তো, সবাই আপনার নাম ধরে ডাকে—সেইভাবে জেনেছি। আপনারা কবিতা পড়েন, তাও শুনি। আপনার লেখা কবিতা আমার খুব ভাল লাগে।

কথাটা ভারি মিষ্টি লেগেছিল। পাঠকের (এখানে শ্রোতার) প্রশংসা যে কি মিষ্টি জীবনে সেই একবারই বুঝেছিলাম। কারণ এই সময়টা কেটে যাওয়ার পর শুধু কবিতা কেন, আর কোনো লেখাই কখনো লিখিনি। লিখলে হত কিনা কে জানে! সেটা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ আর হয়নি। কলেজ থেকে বেরিয়ে আজ অবধি মধ্যবিত্ত সংসারের ভার বহন করে চলেছি। কবিতাগুলো হয়তো এখনো ট্রাঙ্কের তলায় কোথাও পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কি পড়ো?

—আমি এইবার হায়ার সেকেন্ডারি দেব।

একটু অবাক হলাম। ছেলেটার চোখমুখ দেখে মনে হয়েছিল ও বোধহয় ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ে, রোগা রোগা, মেয়েলী। বললাম—তুমি আমাকে 'তুমি' বলে ডেকো, আপনি আজ্ঞে করলে বন্ধুত্ব হয় না—

উদয়ন সহজভাবেই বলল—বেশ।

—তুমিও কি কবিতা লেখ?

উদয়ন লজ্জা পেয়ে বলল—না না, আমি কবিতা লিখতে পারি না। আমার কবিতা শুনতে খুব ভাল লাগে।

—তোমার কোনো 'হবি' নেই? অবসব সময়ে কি করো? খেলো?

উদয়ন কেমনভাবে যেন কয়েকমুহূর্ত আমাব দিকে তাকিয়ে বইল, তারপব বলল—না, খেলি না। সময় পেলেই আমি বই পড়ি।

ভাবলাম খেলতে জানে না বলে বোধহয় ও লজ্জা পাচ্ছে। ওর লজ্জা কাটাবার জন্য বললাম—তাতে কি? বই পড়া তো ভাল—

কেমন নিরুৎসাহী গলায় উদয়ন বলল—হ্যাঁ, বই পড়তে ভালই লাগে।

আমার একটু অদ্ভুত লাগল। ওর নিজের কথা উঠলেই ছেলেটা কেমন গুঁটিয়ে যায়।

আস্তে আস্তে উদয়নের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল।

একদিন বিকেলে ঝিলের ধার গিয়ে দেখি ও আগে থেকে বসে আছে, হাতের কাছে পাতলা কতগুলো কি কুড়িয়ে জড়ো করে রেখেছি। আমি বসতেই উদয়ন তার মধ্যে থেকে একটা হাতে তুলে বলল—দেখেছো? কি সুন্দর, না?

দেখলাম উদয়নের হাতে একটা শুকনো অশ্বত্থপাতা। বেশ কিছুদিন মাটিতে পড়ে থাকলে পাতাগুলো সূক্ষ্ম তারের জালের মত হয়ে যায় আর সব পচে গিয়ে কেবল শিরা-উপশিরাগুলো বাকি থাকে।

বললাম—অনেকগুলো কুড়িয়েছো দেখছি—

—হ্যাঁ। এসে বসেছি, দেখলাম এরকম একটা পাতা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। সেটাকে ধরে দেখি ওদিকে আর একটা—এইরকম করে অনেকগুলো হয়ে গেল—সে যাক্, আর কোনো কবিতা লিখলে?

পকেট থেকে সদ্যলিখিত কবিতাটি বের করে তাকে শুনিয়ে দিলাম।

সচরাচর পড়া শেষ হলেই উদয়ন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সেদিন দেখি ও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ঝিলের ওপারে তাকিয়ে আছে।

বললাম—কি? ভাল লাগল না বুঝি?

উদয়ন চমকে উঠে বলল—অ্যাঁ? না, বেশ হয়েছে তো!

বলে আবার চুপ করে ঝিলের ওপারের গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম—কি হয়েছে? ওদিকে কি দেখছ?

—ওপারে গাছগুলো কেমন সুন্দব দেখায় না? দেখ কত সবুজ। গাছের তলা কেমন অন্ধকার হয়ে আছে। ওদিকে তাকালেই আমার যেন কি সব কথা মনে পড়ে, জানো?

অবাক হয়ে বললাম—কি কথা?

—তা ঠিক বলতে পারি না। এই ঝিল, ওপারের ঝুপসি গাছ, অন্ধকার ঝোপ—এসব দেখলে আমার যেন অন্য এক দেশের কথা মনে হয়।

বললাম—ভালই তো। তুমিও কবিতা লেখো না কেন? তোমার ভেতরে তো বেশ কবিত্ব আছে দেখছি। আনন্দের কথা—

উত্তর না দিয়ে উদয়ন চুপ করে বসে রইল।

বললাম—কি হল? কথা বলছ না যে?

ও খুব করুণ মুখ করে আমার দিকে তাকাল, বলল—তুমি বলছ আনন্দের কথা—কিন্তু আমার কেমন ভয় করে—

—ভয় করে? সেকি! কেন?

—তা জানি না। কোনো নদী কিম্বা ঝিলের ওপারে তাকালে বা অন্ধকার কোনো জায়গা দেখলে আমার খুব ভয় করে। জান আমার শোওয়ার ঘরে রাত্তিরে আলো জ্বালা থাকে—আমি অন্ধকারে ঘুমোতে পারি না।

অদ্ভুত তো ছেলেটা! একটু ছিটগ্রস্ত কি?

প্রায় অনুনয়ের গলায় উদয়ন বলল—আমি এসব কথা কখনো কাউকে বলিনি, শুধু আজ তোমাকে বললাম। আমি জানি তুমি ঠিক বুঝতে পারবে। কাউকে বলতে না পারলে খুব কষ্ট হয়, জানো তো?

আমারও তখন বয়েস এমন কিছু বেশি নয়—আমি এর কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। আর এমনই কাণ্ড, বোধহয় সেদিন সন্ধ্যেটা সত্যি বিষণ্ণ করে তোলবার জন্য কেউ আড্ডাতেই এলই না। অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে বসে রইলাম। একসময় উদয়ন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—নাঃ, আজকে উঠি। আমার বাড়িতে ভাববে—

তারপর শুকনো অশ্বত্থ পাতাগুলো গুছিয়ে একজায়গায় করে হাতে নিয়ে বলল—এগুলো নিয়ে যাই। এর ওপরে চাইনীজ ইংক দিয়ে খুব সুন্দর ছবি আঁকা যায়। তুমি আমাকে অনেক কবিতা শুনিয়েছ—আমি তো কবিতা লিখতে পারি না, আমি এর ওপরে ছবি এঁকে তোমাকে দেব।

আমি বসে রইলাম, ও চলে গেল। তাকিয়ে দেখলাম গাঢ় ধুসরতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে উদয়ন মাঠ থেকে বের হবার লোহার ঘোরানো গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। আবার বন্ধুরা আসে, আড্ডা হয়—কিন্তু সেদিন সন্ধ্যের বিষণ্ণতাটা আমার মনে লেগে থাকে।

দিন দশেক কেটে যাবার পর একদিন হঠাৎ আমার খেয়াল হল বেশ কিছুদিন উদয়ন আসছে না। অন্যদের সঙ্গে উদয়নের এমন কিছু পরিচয় গড়ে ওঠেনি, কিন্তু আমি ওর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলাম।

উদয়নের বাড়ি চিনি, কিন্তু যাইনি কখনো। ভেবেচিন্তে একদিন বিকেলের দিকে মাঠে

যাবার পথে ওদের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লাম।

জীবনে কখনো কখনো এমন আশ্চর্য অনুভূতি হয়, যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আমার কড়া নাড়ার উত্তরে একজন কর্মচারী শ্রেণীর লোক দরজা খুলে দাঁড়াতেই বাড়ির ভেতর দিকে আমার চোখ পড়ল। কেন জানি না, লোকটার নির্বাকভঙ্গি, বারান্দায় এলোমেলা ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা চেয়ার, উঠোনে থাবায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকা পাট্‌কিলে কুকুর—এসবের দিকে তাকিয়েই একমুহূর্তে আমি সব বুঝে ফেললাম। তবু লোকটা যখন আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়াবে বসালো, আমি কোনো প্রশ্ন না করে গিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে পাজামা পরা খালি-গা এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে কোনো কথা না বলে আমার সামনে একটা চেয়ারে বসলেন। আমরা দু-জনেই চুপ করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোকের চোখ লাল, চুল উস্‌কো-খুস্‌কো।

পাট্‌কিলে কুকুরটা থাবা থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাঙা ভাঙা, বেসুরো গলায় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—তুমি উদয়নের বন্ধু?

আমি মাথা হেলিয়ে—জানালাম—হ্যাঁ।

—আমি উদয়নের বাবা।

কুকুবটা নির্নিমেষে আমাব দিকে তাকিযে আছে।

একজন ভদ্রমহিলা এসে দবজার গাযে হাত রেখে দাঁড়ালেন। ফর্সা, পাতলা গড়নের চেহারা। কাঁদছেন দরজায মাথা হেলিযে। কাউকে বলে দিতে হয় না যে ইনি উদযনের মা।

আমার গলা আড়ষ্ট হযে গিয়েছিল, কোনোবকমে জিজ্ঞাস করলাম—কি হয়েছিল ওর?

উদয়নের বাবা বললেন—তুমি জানতে না?

কি জানার কথা বলছেন ভদ্রলোক? আমি মাথা নাড়লাম।

—জন্ম থেকেই ওর একটা ফুস্‌ফুস্‌ ছিল না, হার্টের দু-টো ভাল্‌ভ্‌ খারাপ ছিল। দেখনি, ও কখনো দৌড়ত না—খেলাধূলো করতে পারত না? হাঁপিয়ে যেত—ও বাঁচবে না আমরা জানতামই, ডাক্তার বলেই দিয়েছিল। কেবল অপেক্ষা করে ছিলাম কবে—

আরো খানিকক্ষণ বসবার পর বুঝতে পারলাম ওঁরা কেউ আর কথা বলবেন না। ব্যক্তিগত শোকের গভীরতায় বাইরের সবটা জগৎ ওঁদের কাছে মিথ্যা হয়ে গিয়েছে।

উঠে চলে আসছি, পেছন থেকে উদয়নের মা বললেন—তোমার নাম কি বাবা?

আমার নাম বললাম।

উনি বললেন—তুমি একটু দাঁড়াবে? আমি এক্ষুনি আসছি—

কুকুরটা একই জায়গায় বসে ঘোলাটে বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। উদয়নের বাবা বললেন—ও নাম টম্‌, উদযন আদর করে পুষেছিল—ও-ই খেতে দিত, যত্ন করতো। আজ চার পাঁচদিন খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, শুধু ওইরকমভাবে শুয়ে আছে। এটাও মরে যাবে দু-একদিনের মধ্যে—সবাই চলে যাবে, কেউ থাকবে না—

উদয়নের মা একটা খাম হাতে করে ফিরে এলেন। খামটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন—এটা নাও। শেষসময়টা উদয়ন বুঝতে পেরেছিল ও থাকবে না। চলে যাবার কিছুক্ষণ আগে এটা আমাকে দিয়ে বলেছিল তোমাকে খুঁজে যেন পৌঁছে দিই। তা তুমি যখন এসেই গিয়েছ—

ছায়াঘন বিকেলে একা এসে বসলাম ঝিলের ধারে। এই তো ক'দিন আগেও ওইখানটায় আমার সামনে উদয়ন বসেছিল। কোথায় গেল সে?

আস্তে আস্তে খামটা খুললাম।

ভেতরে দশ-বারোটা শুকনো অশ্বত্থের পাতা।

হঠাৎ কোথায় যেন—কোন নির্জন, সুন্দর, অপরাহ্নের হলুদ রোদ্দুরে আধোঘুমন্ত নদীর চরে—অদ্ভুত ছন্দপতনের মত বন্দুকের শব্দ হল। এই শব্দ জীবনের সমস্ত যত্নে গড়ে তোলা সৌধকে ভিত্তি থেকে কাঁপিয়ে দেয়।

পাতাগুলো সাদা, শূন্য। বেচারা উদয়ন। হয়তো আশা করেছিল আমাকে এর ওপরে ছবি এঁকে দেবে। সময় পায়নি।

তাহলে এই শুকনো পাতাগুলো পাঠালো কেন আমাকে?

হয়তো এইভাবে আমার প্রতি ওর ভালবাসা জানাতে চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল—আমি ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার জীবনের বাকি সময়টুকুতে কুলিয়ে উঠলো না—

বটপাতার ফাঁকে আটকে আছে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার ফালি চাঁদ। ডাকতে শুরু করেছে রাত্রিচর কীটের দল। ঝিলের ওপার থেকে হু হু করে বয়ে আসা বাতাসে কাঁপছে আমার হাতে ধরা শুকনো অশ্বত্থ পাতার গোছা।

আমার মৃত বন্ধুর পাঠানো শেষ প্রীতি-উপহার।

॥ ছয় ॥

উদয়নের মৃত্যু বড়ো হয়ে ওঠার পথে, জীবনের ধূসর অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে নেবার পথে আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেল। পৃথিবী এর আগে যেমনটি ছিল আর ঠিক তেমনটি রইল না। হঠাৎ জানতে পারলাম সারাজীবন কেবল দক্ষিণ থেকে বসন্তবাতাসই ভেসে আসে না। গ্রীষ্মই দীর্ঘতম ঋতু।

তখনো ভালভাবে বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমার জীবনের সোনায় বাঁধানো পবিত্র দৈবী দিনগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে কখনো কখনো যে ফসলঝরা শূন্য মাঠে রূপোলী, জ্যোৎস্না এসে পড়েনি—এমন নয়। কিন্তু নাটকের মূল সুরের মত নেপথ্য যন্ত্রী কেবলই বাজিয়ে চলেছে উদাস দিনশেষের রাগিণী।

জীবনের এই পট পরিবর্তনের সূচনা উদয়নের মৃত্যু দিয়ে, শেষ মৈত্রেয়ীর বিয়েতে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে তখন মাস্টারীতে ঢুকেছি, শুভঙ্করও টেক্‌নিক্যাল ডিপ্লোমা নিয়ে বিহারেই কি একটা কাজ করে। এমন সময়ে মৈত্রেয়ীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পাত্র বেশ সুপুরুষ, আমাদের বয়েসী। দু একবার যাতায়াত করে মনে হল পাত্রের পরিবারও বেশ ভাল। মাসী আর মেসোমশাই বিহার থেকে এলেন মেয়ের বিয়ের ঠিক করতে। পাকা কথাবার্তা হয়ে বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল।

শুভঙ্কর এখন আসতে পারবে না। সে আসবে বিয়ের দু-দিন আগে। তার নতুন চাকরী, ছুটি পাওয়া কঠিন। ফলে কার্ড ছাপানো, নিয়ন্ত্রণ করা—এসব কাজ আমারই ওপর পড়ল।

সব বেশ ভালভাবেই এগুচ্ছিল, গোলমাল শুরু হল বিয়ের দিন পাঁচেক আগে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা পাত্রের বাবা আর কাকা এসে হাজির।

ভাবী কুটুম্ব। খুব আদরযত্ন করে তাদের বসানো হল। সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে থালাভর্তি একটাকা সাইজের রাজভোগ সাজিয়ে দেওয়া হল সামনে। আজ থেকে দশবছর আগে একটাকা দামে বিশাল আকারের রাজভোগ পাওয়া যেত। দু-জন মিলে সে-

সব সাড়ে-তিন মিনিটে সাফ করে দিলেন। তারপর পকেট থেকে একটা সরুমত লম্বা কাগজ বের করে পাত্রের কাকা বললেন—একটা যে জরুরী কথা ছিল—

মেসোমশাই বললেন—আজ্ঞে, কি কথা?

পাত্রের কাকা লোকটিকে মরা পাঙাস্ মাছের মত দেখতে। রক্তহীন, মাথায় টাক, কুত্‌কুতে চোখ। লোকটাকে প্রথম থেকেই আমার পছন্দ হয়নি। বিয়েসংক্রান্ত কথাবার্তায় দেখেছি বাবা লোকটি সাইফার—সংসারের সাংবিধানিক নেতা—ভারতের রাষ্ট্রপতির মত। প্রয়োজনীয় কথা সবই কাকা বলে থাকেন। কিন্তু কেবলমাত্র দেখতে বিচ্ছিরি বলে তো কারুর সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল খারাপ ধারণা রাখা উচিত নয়। তাই মনে মনে কাকাকে ক্ষমা করে দিলেও লোকটা সম্বন্ধে কেমন একটা অপছন্দের ভাব রয়েই গেল।

পাত্রের কাকা বললেন—ইয়ে, বাড়ির মেয়েরা কয়েকটা জিনিসের আবদার করেছে—তাই এই ফর্দটা—ওরাই করে দিয়েছে আর কি—

মেসোমশাই অবাক হয়ে বললেন—সেকি! দেনাপাওনার কথা তো হয়েই গিয়েছে।

পরম বিনয়ে জিভ্ কেটে কাকা ভদ্রলোক বললেন—ছি ছি! একে দেনাপাওনা বলবেন না, লজ্জা পাই। সে তো বাস্তবিকই হয়ে গিয়েছে। এটা এমন কিছু নয়—মেয়েদের নানা সখ থাকে জানেন তো? কি করি বলুন, একটা আবদার—

—দেখি ফর্দটা—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে। দেখুন না কেন, সামান্যই ব্যাপার।

মিনিট পাঁচেক বাদে ফ্যাকাশে মুখে ফর্দের কাগজ হাতে মেসোমশাই বাড়ির ভিতরে এসে বললেন—এরা কি পাগল নাকি? সব কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে নিমন্ত্রণপত্র বিলি করা শেষ—এখন মেয়েদের নাম করে ফর্দ পাঠিয়েছে আটগাছা সলিড সোনার চুড়ি চাই, সোফা চাই—এ তো প্রায় হাজার চারেক টাকার ব্যাপার! কি করা যায়?

মাসী আর কি বলবেন? চুপ করে রইলেন।

মেসোমশাই বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে বললেন—দেখুন বেয়াইমশাই, ভেতরে আলোচনা করলাম—তা এখনই এ বিষয়ে পাকা কথা দেওয়া মুশকিল। আমরা বিদেশী লোক, এখানে থাকি না। মেয়ের বিয়ের জন্য যা সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা প্রায় সবই খরচ করে ফেলেছি—এক খাওয়ানোর টাকা ছাড়া। ফর্দ দেখে যা মনে হচ্ছে, এতে বেশ ক-হাজার টাকা লাগবে। এই দু'দিনের মধ্যে কোথা থেকে জোগাড় করব বলুন? তবু চেষ্টা দেখছি—বিয়েটা হয়ে যাক্ না। মেয়ে-জামাই তো আমারই রইলো, পরেও তো দেওয়া যেতে পারে—

পাঙাস্ মাছ বলল—ও পরে আর চাড় থাকে না, বুঝলেন? যা দেবার আগেই দিয়ে দেওয়া ভাল। দু-পক্ষেরই প্রেস্টিজের ব্যাপার কিনা? আর তাছাড়া আমরা তো এমন কিছু দাবিও করিনি, কেবল খাট আর বিছানা, আর স্টিলের আলমারি, আর ড্রেসিং টেবিল, আর পনেরোখানা নমস্কারী, আর—

মেসোমশাই বললেন—আমি গরীব মানুষ বেয়াইমশাই, এতেই আমার ওপর খুব চাপ পড়ে গিয়েছে।

তারপর ছেলের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন—এ ফর্দটা আপাতত মাপ করে নিতে পারেন না ভট্‌চাজমশাই?

সাংবিধানিক নেতা ভাইয়ের পাঁজরে গোপন খোঁচা দিয়ে বলতে লাগলেন—বলো না, তুমিই বলো—

পাঙাস্ মাছ কথাবার্তা শেষ করার ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে বলল—তা, না দিতে পারলে আর কি হবে? দাদার কিছু বলার নেই এতে, বলেছিই তো এটা মেয়েদের ব্যাপার। আমরা কি ছেলে বিক্রি করতে এসেছি নাকি মশায়? না কি আমরা খেতে পাই না? কিছু না দিতে পারলে শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে মেয়ে পাঠাবেন এখন। তবে আমরা সাদা লোক, একটা কথা আগেই বলে রাখা ভাল—এই যে প্রায় কিছুই না দিয়ে মেয়ে পাঠাচ্ছেন, এতে পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে নিন্দে করে যাবে! আমাদের মন বড় নরম, নিন্দে শুনতে শুনতে হয়তো বা একদিন আপনাদের ওপর আমাদের মন বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। আমরা পুরুষ, সংসারের সাতে পাঁচে থাকি না, কিন্তু বাড়িতে মেয়েরা হয়তো বা আপনাদের মেয়েকে একটা কি দু-টো কথা বলে ফেলল—বুঝলেন কিনা? আপনারা তো সামনে থাকবেন না—থাকবে মেয়ে। সব বুঝে কাজ করবেন—

এই রকম আশ্বাস দিয়ে সাদা লোক দুজন চলে গেলেন।

সারাটা সন্ধ্যে দুশ্চিন্তায় মুখ ভার করে থেকে রাত্তিরে খেতে বসে মেসোমশাই বললেন—বিয়েটা বরং ভেঙে দিই। কত সম্বন্ধ তো বিয়ের দিনও ভেঙে যায়। এ কুটুম্বিতা সুখের হবে বলে মনে হচ্ছে না—

বিয়ে উপলক্ষ্যে অনেক আত্মীয় এসে গিয়েছিলেন, সবাই মিলে একসঙ্গে টানা বারান্দায় খেতে বসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দু-একজন মুরুব্বি বললেন—ক্ষেপেছো নাকি তুমি? এমন বিয়ে ভেঙে দিলে নিন্দেয় কান পাততে পারবে না, পরে অন্য কোথাও মেয়ের বিয়ে দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়বে—

—কিন্তু এমন পরিবারে বিয়ে দিতে যে ভয় করছে ভাই—

—কিছু ভয় নেই। ছেলেটি ভাল, শান্ত—আমরা তো দেখেছি। ওদেব ভাব হলেই হল—বাপ মা আর ক-দিন? সেই বলে না—মিয়া বিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজী? বিয়ের পরে ছেলেই প্রোটেক্‌শন দেবে!

বেশি বোঝানোর দরকার ছিল না, মেসোমশাই 'সব ঠিক হয়ে যাবে'—একথা বিশ্বাস করার জন্যই উদ্‌গ্রীব—তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

তবু বাপ-মায়ের মন, সন্তানের মঙ্গলের জন্য করতে পারে না হেন কাজ নেই। শুভঙ্করের বিয়ে হলে বৌয়ের মুখ দেখার জন্য একগাছা হার মাসী রেখে দিয়েছিলেন। সেটার বদলে চার গাছা চুড়ি কিনে নেওয়া হল, বানাবার সময় আর ছিল না।

বিয়ের দু-দিন আগে শুভঙ্কর এসে পৌঁছল।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আমরা দু-জন গলির মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছি আর ওয়াইল্‌ড্ উডবাইন সিগারেট টানছি, হঠাৎ শুভঙ্কর বলল—দাদা, চল আমাদের পুরনো বাড়িটা থেকে একবার বেড়িয়ে আসি—

আজকের মুডের সঙ্গে শুভঙ্করের প্রস্তাবটা খুব খাপ খেয়ে গেল। বললাম—কিন্তু এখন সেখানে কারা ভাড়া থাকে কে জানে। আমাদের যেতে দেবে কেন?

—চল না, দেখা যাক। বুঝিয়ে বললেই হবে—

অনেকদিন পরে এলাম। সেই আমাদের ছোটবেলার ক্রীড়াভূমি। এ বাড়িটার প্রত্যেক কোণে, প্রত্যেক ইঁটে আমাদের একটা না একটা স্মৃতি রয়েছে।

দোতলায় উঠে আমরা যে ফ্ল্যাটে থাকতাম তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। কাঠের দরজাটা খোলা। বারান্দায় মাদুর পেতে দু-টো বাচ্চা ছেলে বসে হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশুনো করছে। আমি দরজার পাল্লায় আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ করতে

তারা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। বড় ছেলেটি বলে উঠল—মা, ও-মা! দেখে যাও কারা এসেছে!

এক ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—কি দরকার আপনাদের?

বললাম—আমরা এই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতাম অনেকদিন আগে। আমাদের দু-ভাইয়ের জন্ম এই বাড়িতে। মাঝখানে বহুদিনই আসা হয়নি। যদি কিছু মনে না করেন, আমরা একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসতে পারি কি?

দিনকাল খারাপ, আমরা চোর-ডাকাত কিনা কে জানে? ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা, যান—

সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে উঠতে শুভঙ্কর বলল—ছোট-বেলায় আমরাও দাদুর কাছে ওই রকম হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসতাম, না রে?

একটি মানুষের আয়ুর চাইতে একটা বাড়ির আয়ু অনেক বেশি। দু-দশ বছরে একটা বাড়ির চেহারা বিশেষ বদলায় না। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ছাদে গিয়ে দাঁড়াতেই মুহূর্তে আমাদের ছোটবেলাটা যেন ফিরে এল। দক্ষিণ দিকে খোলা জায়গায় সেই তালগাছটা আগের মতই খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ভূতের মুখের মত উঁকি দিচ্ছে। এদিকটায় এখনো খুব বেশি বাড়িঘর হয়নি বলে স্কাইলাইন প্রায় এই রকম রয়েছে। আমরা দু-ভাই চিলেকোঠার ছাদের সিঁড়িতে বসলাম।

চাঁদের আলো এবং রাত্রির স্তব্ধতার একটা জাদু আছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল কিছুই যেন বদলায় নি—সব সেই পুরনো দিনগুলোর মতই আছে। এক্ষুনি নিচের বারান্দা থেকে দাদুর কাশির আওয়াজ ভেসে আসবে, কিম্বা মামাবাড়ির পুরনো রাঁধুনী আশাদি ছাদে উঠে এসে বলবে—খেতে চল খোকারা, রাত হল—

ছাদের ওধারেই যেন মাদুর পেতে গল্প করছে নাড়ুর ঠাকুমা আর মাসীমা।

আচ্ছা, আমি আর কবিতা ছোটবেলায় ছাদের পাঁচিলের কোণে যে একটা ছোট্ট পেরেক পুঁতেছিলাম, সেটা কি এখনো আছে?

হেঁটে ছাদের পশ্চিমকোণে গিয়ে নিচু হয়ে দেখি পেরেকটা এখনো রয়েছে। হাত দিলে অন্ধকারে আন্দাজ করা যায়।

সবই সেইরকম আছে, কেবল আমাদের শৈশব চলে গিয়েছে। আর আসবে না।

সব ভাষারই বিদায়ের বাণীতে আবার দেখা হওয়ার একটা আশ্বাস থাকে। সে আমাদের রাষ্ট্রভাষায় 'ফির মিলেঙ্গে' কিম্বা ফরাসী 'ও রিভোয়া' কিম্বা জর্মন 'আউফ উইডারজিহেন'—যাই হোক না কেন। সবেরই মানে—আবার দেখা হবে। একেবারে চিরতরের বিদায় মানুষ মেনে নিতে পারে না—তাই শুভেচ্ছা দিয়ে তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা। তাই জ্যোৎস্নালোকিত এই নির্জন মুহূর্তে যখন সত্যি করে অনুভব করলাম যে আমাদের সে দিনগুলো একেবারেই চলে গেছে, কিছুই বাকি রেখে যায়নি—তখন হঠাৎ আমাদের আজ সন্ধ্যেবেলা শৈশবক্রীড়াভূমিতে বেড়াতে আসার 'আনন্দ' দপ করে নিভে গেল। ছাতার কাপড়ের মত কালো একটা বিষণ্ণতা আমাদের মনকে মুড়ে দিল। শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললাম—চল, যাই—

॥ সাত ॥

বিয়ের সভায় মেসোমশাই পাত্রের বাবা-কাকাকে বললেন—সোফাটা বর্তমানে পারলাম না বেয়াইমশাই। এখন এই চারগাছা চুড়ি—মেয়ের হাতেই পরিয়ে দিই, না কি?

পাঙাস্ মাছ বলল—সোফা না হয় না হল, কিন্তু আর চারগাছা চুড়ি?

—একটু সময় দিন। একটু সামলে উঠেই—

—হুম্—

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাঙাস্ মাছ বরযাত্রীদের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলছে।

তারপর বরযাত্রীদের দল যা আরম্ভ করলো সে আর বলবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' পড়ে মনে হয়েছিল একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি। এখন দেখলাম বরযাত্রীরা বিনা রিহার্সালে 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' অভিনয় করতে আরম্ভ করল। অত্যন্ত নিখুঁত অভিনয়।

খাওয়ার আগেই পঞ্চাশজন বরযাত্রী বায়না ধরল—আমাদের খিয়ে পেয়েছে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ এক্ষুনি বসবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে—

একজন পাণ্ডাগোছের লোক বলল—না, খেতে বসার কথা হচ্ছে না। সে আমরা বিয়ে দেখে তারপর খেতে বসব। আপাতত আমাদের জলখাবার দেওয়া হোক—

বরযাত্রীদের জন্য খেতে বসার আগে চা আর বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বোঝা গেল তাতে হবে না। বিয়ের লগ্ন আটটায়, বিয়ে দেখে খেতে বসলে রাত দশটা বাজবে। লোক দৌড়ল সুরুচি রেস্টুরেন্টে। মাটন কাটলেট্, বিস্কুট আ চা পরিবেশন করা হল সবাইকে। পাণ্ডামত লোকটি দু-কামড়ে কাটলেট শেষ করে বলল—আরো একটা—

পাশের ছেলেটি বোধহয় এদের মধ্যে একটু ভদ্র, এখনো পাকা বরযাত্রী হয়ে উঠতে পারেনি। সে লজ্জা পেয়ে বলল—এই যাঃ, কি হচ্ছে? না মশাই, আর দেবেন না—ও ঠাট্টা করছে—

অনেক রাত্তিরে খেতে বসে তারা চেঁচামেচি করে, ফেলে ছড়িয়ে, কে-কটা রাজভোগ খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে পাতে দশটা করে মিষ্টি নষ্ট করে, পরিবেশনে সামান্য দেরী হলে 'ও মশাই, খাবার ফুরিয়ে গেল নাকি?'—বলে চিৎকার করে শুভ উৎসবকে একটা মাছের বাজারে পরিণত করে রাত বারোটা নাগাদ বিদায় নিল। পাণ্ডামত লোকটি বোধহয় মনে করেছিল এতেও যথেষ্ট হয়নি—সে যাওয়ার আগে বাড়ির দরজার সামনে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হালকা হয়ে গেল।

পরের দিন বিকেলে মেয়ে-জামাই বিদায়ের পালা। নিয়ম মত কনের বাড়ি থেকে ভদ্রতা হিসেবে কাউকে যেতে হয়। মেসোমশাই আমাকে বললেন—যা, তুই গিয়ে ওদের দিয়ে আয়—

আমি বললাম—আমি একা পারবো না। ওরা যা লোক! সঙ্গে শুভঙ্কর গেলে ভাল হয়।

—তা যাক্, ওকেও নিয়ে নে—আর শোন্, মাথা ঠাণ্ডা রাখবি। যা বলে শুনে যাস, কোনো উত্তর করিস না—

এ উপদেশে দরকার ছিল না। আমরা জানতাম আমাদের প্রত্যেকটি কথা শতগুণ তীব্র আঘাত পেয়ে মৈত্রেয়ীর ওপর ফিরে আসবে।

সন্ধ্যে উতরে প্রথম প্রহর রাত্তিরে আমরা বোন আর ভগ্নিপতিকে নিয়ে বোনের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আগে বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তার সময়ে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দু-একবার এসেছি বটে, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর এই প্রথম আসা। তা, অভ্যর্থনা ভালই জুটলো।

পাড়ার সব বৌ-ঝিরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে উঠোনে—বরণ করে বৌ ঘরে তোলা দেখবে বলে। আমাকে আর শুভঙ্করকে কেউ বসতেও দেয়নি, কথাও বলেনি।

আমরা দু-জনে উঠোনের এককোণে দাঁড়িয়ে দেখলাম বরণ শেষ হয়ে গেল। পাড়ার মেয়েরা কেউ চলে গেল, কেউ নতুন বৌয়ের সঙ্গে ঘরে গিয়ে ভিড় জমালো।

ফাঁকা উঠোনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

খুব অস্বস্তিকর পরিস্থিতি! আমরা কি করবো বুঝতে পারছি না—দাঁড়িয়ে ঘামছি। কেউ কিছু বলেও না।

এই সময় পাত্রের মা কুলো হাতে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমাদের দিকে নজর পড়ায় বললেন—ও, তোমরা রয়েছ বটে। ওরে, এদের দু-টো চেয়ার বের করে দে তো—

কে যেন দু-টো লোহার ফোল্ডিং চেয়ার এনে ঘড়াং ঘড়াং শব্দ করে আমাদের সামনে পেতে দিল। যদিও বা এর আগে না-দেখি না-দেখি করে সট্‌কে পড়া যেত, চেয়ার দেবার পর তা আর সম্ভব নয়। আমরা বসলাম।

যে চেয়ার দিয়েছিল সে লোকটাই দুটো খাবারের রেকাবী এনে আমাদের হাতে দিয়ে গেল। খাবার কি আর গলা দিয়ে নামতে চায়! কিন্তু উপায় কি? না খেয়ে গেলে এরা সেটাকে অপমান হিসেবে গণ্য করবে।

কোনোরকমে খাবার গিলে ফেলে কাকে বলে বিয়ে নেওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় মৈত্রেয়ীর শাশুড়ি আবার এসে দাঁড়ালেন।

ভদ্রমহিলাকে দেখতে একটু আজব রকমের। বিরাট চওড়া হাঁ-মুখ—মুজতবা আলীর উপন্যাসের সেই বিখ্যাত চরিত্রের মত সিঙাপুরী কলা ইচ্ছে হলে চওড়াচওড়ি গিলতে পারেন। ফাঁক ফাঁক কলমের খাপের মত লম্বা দাঁত। তেঢ্যাঙা লম্বা, তার ওপর মনে হয় সমস্ত শরীরটা যেন মাত্র দু-ভাগে ভাগ করা—কোমরের উর্ধ্বভাগ এবং কোমরের নিম্নভাগ। আর মাঝখানে কোমরের কাছে একটা কবজা বসানো আছে, যা কিছু ভাঁজ হবার সেইখানেই হয়—ওপরে-নিচে খাড়া লম্বা আর শক্ত। চিচিঙ্গের মাঝখানটা মট করে ভেঙে দিলে যেমন লট্‌পট্‌ করবে, ইনি হাঁটলে তেমন দেখায়।

ভদ্রমহিলা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বসে থাকা অভদ্রতা হবে ভেবে আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

উনি তাকিয়েই আছেন।

নিদারুণ অস্বস্তি! আমরা এদিক-ওদিক তাকাই, উস্‌খুস্‌ করি।

হঠাৎ উনি বললেন—এদিকে এসো।

—আজ্ঞে?

—আমার সঙ্গে এসো।

গেলাম। উঠোনের মধ্যিখানে গিয়ে মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—দেখছ? দেখতে পাচ্ছ?

উঠোনটা ইঁট পয়েন্টিং করে বাঁধানো। একজায়গায় খানিকটা কালো কালির দাগ ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। কি বলতে চাইছেন ইনি?

—আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না—

—তা বুঝবে কি করে? বোঝার ক্ষমতা থাকলে তো আক্কেলও থাক্‌তো।

—আজ্ঞে—

—গতকাল বরযাত্রীরা তোমাদের বাড়ি প্রায় কিছুই খেতে পায়নি, কারো পেট ভরেনি খেয়ে। তোমাদের ওখান থেকে ফেরার পর রাত্তির একটায় এই উঠোনে ইঁট দিয়ে উনুন করে আবার তাদের ভাতে-ভাত রেঁধে খাওয়াতে হয়। ছিঃ, ছিঃ। লজ্জায় মাথা কাটা গেছে

আমাদের। তিনশো লোক নেমন্তন্ন করে দু-শো লোকের আয়োজন করেছিলে নাকি?

শুভঙ্কর আমার পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বুঝতে পারছি ও চটে উঠছে। আমি গোপনে ওর হাত চেপে ধরলাম।

আরো মিনিট পনেরো বাদে যখন ছাড়া পেলাম তখন আমার কান অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করছে। নেহাৎ মৈত্রেয়ীর মুখ চেয়ে আমরা দাঁতে দাঁতে চেপে সব সহ্য করলাম।

ফেরবার সময় শুভঙ্কর উত্তেজিত গলায় বলল—শালার ব্যাটারা কাল ফাঁসির খাওয়া খেয়ে এসে এখানে নাকি আবার রান্না করে খেয়েছে! বলে কি দাদা?

সামনে একটা সজনে গাছ, তার তলাটা অন্ধকার হয়ে আছে। এ জায়গাটা পেরিয়ে ওই সামনে বড় রাস্তা সেখান থেকে বাস বা রিকসা ধরে বাড়ি ফিরতে হবে। সজনেতলায় যখন এসেছি, হঠাৎ শুনি পেছন থেকে কে একটি মেয়ে আমাদের ডাকছে—শুনুন, একটু দাঁড়ান—

আমরা দাঁড়ালাম, মেয়েটি কাছে এসে পড়ল। অন্ধকারে তাকে ভাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হল অল্পবয়েসী—রোগা চেহারা। দৌড়ে আসার জন্য হাঁপাচ্ছে।

অবাক হয়ে বললাম—আমাদের বলছেন?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছে? কে আপনি?

একটু সামলে নিয়ে মেয়েটি বলল—আমাকে চিনবেন না, আমি আপনাদের বোনের শ্বশুরবাড়িতে বাসনমাজার কাজ করি। শুনুন ছেলের মা যে বলল না, রাত্তিরে রান্না করে বরযাত্রীদের খাইয়েছে? ও সব মিথ্যে কথা। উঠোনে দাগ কিসের জানেন? সকালে যজ্ঞ হয়েছিল না? তার পোড়া কাঠের দাগ। বরযাত্রীরা আপনাদের ওখানে খেয়ে খুশি হয়েছে। নিজেরা বলাবলি করছিল—আমি শুনেছি—

বললাম—কিন্তু তুমি এই কথা বলতে এতদূর ছুটে এলে?

মেয়েটি মুখ নিচু করে বলল—আপনারা বকুনি খেয়ে মুখ শুকনো করে চলে যাচ্ছেন দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো, তাই—

তারপর চারদিকে তাকিয়ে বলল—আমি যাই, কে কোথায় দেখে ফেলবে—আপনাদের পায়ে পড়ি, কাউকে আমার কথা বলবেন না—

মেয়েটি আবার একছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরদিন বৌভাতে আমি আর শুভঙ্কর যাবো না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই কারণে ওদের চটাতে সাহস করলাম না। আমরাও গেলাম।

খেতে বসিয়ে পাণ্ডাস্ মাছ বারবার এসে আমাদের সারির কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—খান্, খান্—ভয় নেই, ফুরিয়ে যাবে না। আমরা অনেক আয়োজন করেছি—এই! এখানে গোটাপাঁচেক মাছ দে—

—মাপ্ করবেন, আর নেবো না—

—নেবেন না মানে? নিশ্চয় নেবেন। ভয় নেই, বুঝে আয়োজন করা হয়েছে—

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কুটুমবাড়ির লোককে যত্ন করে খাওয়ানো হচ্ছে। কেবল আমরাই টের পাচ্ছিলাম আসল ব্যাপার কি!

বিয়ের আটদিনের মাথায় মৈত্রেয়ী আর তার স্বামী এসে অষ্টমঙ্গলা করে গেল। মৈত্রেয়ী খুব চাপা মেয়ে, তার মুখ দেখে ভেতরের অবস্থা আমরা কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না।

মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর একদিন মাসী বললেন—হ্যাঁগো, শুনছো? এবার তো আমাদের ফেরবার সময় হল। যাবার আগে মেয়েটাকে একবার নিয়ে এসো না কেন? ক-দিন থেকে যাক্—

সেদিনই বিকেলে মেসোমশাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেয়াইবাড়ি চললেন।

কড়া নাড়তে ভাঙা চিচিঙ্গে এসে দরজা খুলে দিলেন।

—নমস্কার বেয়ানঠাকরুণ। খবর সব ভাল তো?

—ভাল। তা হঠাৎ?

—একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে—

—অ। আসুন, বসুন।

বাইরের ঘরে আমাদের বসতে দেওয়া হল।

—বলুন কি বলবেন?

মেসোমশাই দমে গিয়েছিলেন, আমতা আমতা কবে বললেন—এই, মানে হয়েছে কি—বিয়ে থাওয়া তো হয়ে গেল। আমাদের এবাব বিহার ফিরে যেতে হয়। খুকীর মা বলছিলেন যে, দু-চারটে দিনের জন্য যদি মেয়েটাকে একটু নিযে যাই—আপনাদের কি আপত্তি হবে?

মৈত্রেয়ীর শাশুড়ি বিরসবদনে বললেন—তা হবে। আমার শরীর ভাল নয়, আমাদের রান্নার লোকও পালিয়েছে। বৌ বাপের বাড়ি গেলে দুবেলা ভাতজল করবে কে?

—কিন্তু আমরা অনেকদিনের জন্য চলে যাচ্ছিলাম—

—তা কি করবো বলুন। এখন বৌ পাঠানোর অসুবিধে আছে।

মেসোমশাই একটুখানি মুখ নিচু কবে বসে থেকে বললেন—খুকীকে একবার ডেকে দেবেন? একটু দেখা করে যাই—

—সে বাড়ি নেই, ননদের সঙ্গে বেরিয়েছে।

মেসোমশাই নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা, আসি তাহলে। বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না—

মটকানো চিচিঙ্গে বললেন—আমার লোকজন কেউ নেই, মিষ্টি আনানো অসুবিধা—বুঝলেন?

—থাক্, মিষ্টির কি দরকার?

আমরা বেরিয়ে এলাম। পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে উঠোনের কোণের চাঁচারির বেড়ার দরজাটা আধো খোলা। চলে আসতে আসতে কেন যেন একবার সে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালাম।

টিনের চাল দেওয়া বারান্দার ও প্রান্তে রান্নাঘরের দরজায় মৈত্রেয়ী একটা খুন্তি হাতে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

আমি বলে ওঠলাম—কি আশ্চর্য! মেসোমশাই, ওই তো খুকী—

মেসোমশাই ফিরে তাকালেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের ওপর দিকে বিচিত্র ভাবপরম্পরা খেলে গেল। একবার মনে হল বুঝি এগিয়ে গিয়ে মেয়েকে ডাকবেন। তারপরই আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলে উঠলেন—চল্, চল্—

—ওরা মিথ্যে কথা বলছে মেসোমশাই! খুকী তো বাড়িতেই রয়েছে! ও বোধহয় জানেও না আমরা এসেছিলাম—কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে দেখলেন না?

মেসোমশাই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে শুধু বললেন—চল্, বাড়ি চল্—

অনেকগুলো বছর কেটে গেল তারপর। কারো বেদনায়, বিচ্ছেদের চোখের জলে মহাকালের রথচক্র থেমে থাকে না। ইতিহাসের পাঁজর গুঁড়িয়ে এগিয়ে যায় তার রথের চাকা।

মৈত্রেয়ী নেই। বিয়ের দু-বছর পরে বাড়ির সামনের পুকুরে তার মৃতদেহ ভেসে ওঠে একদিন শ্রাবণ মাসের মেদুর সকালে।

কেউ তাকে ভালবাসেনি, নিবাপত্তার বেড় দিয়ে তাকে ঘিরে দেয়নি।

তার স্বামী ছিল দুশ্চরিত্র, মেরুদণ্ডহীন। বিয়ের সময় কিছুই জানা যায়নি। স্ত্রীকে নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। ইদানীং রাতে বাড়িও ফিরতো না। শুনেছি সে নাকি আবার বিয়ে করবে বলে পাত্রী দেখছে।

মৈত্রেয়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শৈশবের দলটা ভেঙে গেল। এ তো একমাস, কি একবছর, কি দু-বছরের জন্য কোথাও যাও নয়। জগৎটা চলবে নিজের লয়ে, সূর্যের আবর্তনের সঙ্গে বদলাবে ঋতু—বৃষ্টি ঝরবে, বনের আড়ালে ফুটে উঠবে বছরের প্রথম ফুলটি। কিন্তু আমাদের ছোটবেলার সবচেয়ে নিকট সঙ্গিনী, ম্লানমুখ সেই মেয়েটি আর কখনো ফিরে আসবে না।

দুপুরের আলো তখন হলুদ হয়ে এসেছে নিমের ডালে। ডালের ওপর বসে ঠোঁট ঘস্‌ছে একটা দাঁড়কাক। আমি চুপি চুপি ঘুমন্ত বাড়িটা পেরিয়ে ভাঙাচোরা জিনিস রাখবার ঘবটায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

শুভঙ্করের বানানো টেলিগ্রাফের কলটা পড়ে আছে এককোণে।

আমি এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে নিলাম জিনিসটা।

কত পুরনো কথা মনে আসে—নিষ্পাপ সরল শৈশবের কত মন-কেমন-করা স্মৃতি।

বিচিত্র কর্কশ গলায় দাঁড়কাকটা ডেকে উঠে দুপুরকে আরো উদাস করে দিল।

আঙুল দিয়ে যন্ত্রের হাতল টিপ্‌লাম। শব্দ হল—খট্।

হঠাৎই মনে হল আমার হাতের নিচে মরচেধরা ব্যাটারীহীন টেলিগ্রাফের কলটা যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে। আচ্ছা, এটা দিয়ে আমার ছোটবেলার সব পরিচিত মানুষদের খবর পাঠানো যায় না? যারা আছে এবং যারা নেই? আমি যে তাদের ভালবাসি, আমি যে তাদের মনে করে রেখেছি—এর কি কোনো মূল্যই নেই? আমি স্মরণ করলে তাদেরও কি মনে পড়ে যাবে না আমাকে? যেখানেই তারা থাক্?

ছেলেমানুষের মত এক যুক্তিহীন, অকারণ আনন্দে আমি আওয়াজ তুললাম টেলিগ্রাফের কলে খট্ খট্ খট্ খট্...

আজকের এই দাঁড়কাক-ডাকা, হলুদ রোদ্দুরের অলৌকিক অপরাহ্নে এই যান্ত্রিক নীরস শব্দ বুকের একেবারে ভেতর থেকে কান্নার ভাষা হয়ে বেরিয়ে এল—'মৈত্রেয়ী, তুই শুনতে পাচ্ছিস্ মৈত্রেয়ী? তুই ভাল আছিস? আমি ভাল নেই। আমার ছোটবেলার পুরনো বন্ধুরা, তোমরা ভাল আছো? আমি ভাল নেই।'

এমন আরো কত কথা—কত জনের সঙ্গে। বাইরে রোদ্দুর নিভে এল আস্তে আস্তে। দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল, আমি তখনো আসবাবের ঘরে আলো-আঁধারিতে বসে জীবনের প্রবাহে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একান্ত আপনজনদের বার্তা পাঠাচ্ছি আশ্চর্য টেলিগ্রাফে।

বুধন ম্যান্ডেলা

বুধু মানুষ ভাল। তার বৌ মরে গিয়েছে সেই কোন কালে, কত বছর আগে। কিন্তু তখন বয়েস কম থাকা সত্ত্বেও সে চরিত্র খারাপ করেনি। সমবয়সী বন্ধুরা লোভ দেখিয়েছে, শিবনাথের দোকানে রাতের বেলা ঝাঁপ ফেলে মাছভাজা আর বেসনের ফুলুরি নিয়ে মালঝালের আড্ডায় বসবার নেমন্তন্ন করেছে, বুধু যায়নি। সেই সময়টা তার নিজের বাড়ির মাটির দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে। বাড়িতে ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, সে একদম একা লোক। একবেলা রান্না করে রাখে, দু বেলা খায়। রান্নাই বা কী, মোটা আউশ চালের লাল ভাত, ডাল আর শাক-লতাপাতার একটা যাহোক তরকারি। তাই ভেসে যায়। মাসে দু-একদিন মাছ। একটু বেলা করে সুটরার বাজারতলায় গেলে কমদামে ট্যাংরা খলসে বা পুঁটি পাওয়া যায়। সেদিন কড়া ঝাল দিয়ে রান্না মাছের ঝোল মেখে মহাভোজ।

আজ সকাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি। গ্রামের রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা। বেশ ঠাণ্ডা জোলো বাতাস দিচ্ছে। এমন দিনে বেশিক্ষণ খাটতে ভাল লাগে না। দুপুরের পর রিকসা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে বুধু, ওই যে উঠোনের গাবতলায় ভেড়ানো রয়েছে রিকসাখানা। বেশি খাটলে বেশি পযসা। বেশি পয়সা দিয়ে কী করবে সে? তিনকুলে পুড়িয়ে খেতে কেউ নেই। তার চেয়ে দাওযায় বসে মৌজ করা ভাল। বর্তমানে সে তাই করছে।

বড্ড ভাল রিকসাখানা তার। হোক সিটের ঢাকনা ছেঁড়া, না হয় পেছনের দুটো চাকাই গ্যাটিস্ মারা, চলতে গেলে ল্যাগব্যাগ করে, হর্নটা ফুটো, বাজাতে গেলে টিবিরুগীর কাশির মত ফ্যাঁসফেসে আওয়াজ বের হয়। তবু গাড়িটা তাকে ভাতেজলে রেখেচে। সোনা গাড়ি, লক্ষ্মী গাড়ি।

নদীর ওপার থেকে ঘন কালো আর একখানা মেঘ এসে আকাশে যেটুকু আলো ছিল মুছে নিল। ঘরের পেছনে বর্ষার জমা জলে জাঁওকো জাঁওকো করে কোলাব্যাঙের দল ডাকছে। বৃষ্টিটা সামান্য বাড়ল মনে হচ্ছে, খড়ের চালে জলের ফোঁটা পড়ার সুন্দর শব্দ। ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যেই জোনাকি জ্বলছে গাবতলায়, শশার মাচার নিচে। এমন আকাশ অন্ধকার করা বর্ষার দিনে বেশ লাগে বুধুর। মনের মধ্যে কী একটা কথা যেন কেমন ওপরের দিকে ভেসে উঠতে চায়, কিন্তু পুরোটা ওঠে না, কারণ বুধু জানেনা কী করে ভাবতে হয়, কী করে মনের ভাবকে রূপ দিতে হয়। তাই ভরা বর্ষায় বুধু একা বসে গাবতলায় জোনাকি দেখে আর ক্রমশ আরও একা হয়ে যায়।

ট্যাংরার বিলের ওপার দিয়ে সাতটার গাড়ি যাবার আওয়াজ পাওয়া গেল। খুব ক্ষীণ, তবু শোনা যায়। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। দাওয়ার একপাশেই রান্না করে বুধু। দুটো মেটে হাঁড়ি, একখানা কড়া একটা পেতলের ঘটি, লোহার খুন্তি—এইসব হচ্ছে রান্নার সরঞ্জাম। কিছু শুকনো কাঠ জড়ো করা আছে উনুনের পাশে। দিনের কাজ সেরে ফেরবার সময় রাস্তার পাশে, ঝোপের মধ্যে যেখানে যা কাঠ লতাপাতা চোখে পড়ে তা সব বুধু কুড়িয়ে রিকসায় তুলে নেয়। কয়লা কেনার সাধ্য তার নেই। যা দাম! রান্নার জায়গা থেকে কলাইকরা থালা আর জার্মান সিলভারের গ্লাসখানা নিয়ে এসে দাওয়ায় রাখল বুধু। ঘরের মধ্যে এককোণে ভাতের হাঁড়ি আর দুটো বাটিতে ডাল আর তরকারি

ঢাকা দেওয়া। খাট নেই বুধুর, মাটিতে কয়েক আঁটি খড় বিছিয়ে তার ওপর চট পেতে তোফা বিছানা বানিয়েছে সে। দড়ি দিয়ে ঝোলানো একখানা আড়বাঁশে ছেঁড়া লুঙ্গি, ফুটো গেঞ্জি শতছিন্ন, গামছা ইত্যাদি ঝুলছে। বাঁশের বেড়ার দেয়ালে মজুমদার বিল্ডার্স কোম্পানীর লক্ষ্মী ঠাকুরের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। বাজারে রায়চৌধুরীদের দোকানঘর বানানোর সময় প্রায় একমাস ধরে মজুমদার বিল্ডার্স থেকে সিমেন্টের বস্তা বয়ে দিয়েছিল বুধু। ফলে নববর্ষের সময় বুধুকে ডেকে মালিক রবি মজুমদার ক্যালেন্ডারখানা তার হাতে দিয়ে বলেছিল—'নে বুধু, দেয়ালে টাঙিয়ে রাখিস।' বুধু লেখাপড়া জানে না, কাজেই তারিখও দেখতে পারে না কিন্তু রোজ কাজে বেরোবার সময় সে ছবিটাকে প্রণাম করে। ছবিটা ভারি সুন্দর। মা লক্ষ্মীর চেয়ে প্যাঁচাটা বুধুর বেশি পছন্দ। একেবারে যেন জ্যান্ত, হাততালি দিলে উড়ে পালাবে। তার ঘরে চোরের নেবার মত কিছুই নেই, তবু কাজে যাওয়ার সময় বুধু দরজায় শেকল তুলে তাতে একটা সস্তা তালা লাগিয়ে যায়। নইলে কুকুর-মেকুরে ঢুকে রান্না করে রাখা রাতের খাওয়া লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে।

দাওয়ায় বসে কেরোসিনের লম্ফ জ্বালিয়ে হাঁড়ি থেকে এনামেলের থালায় ভাত বেড়ে নিল বুধু, কলসি থেকে গ্লাসে গড়িয়ে আনল জল। ওবেলার রান্না করা কাঁঠালবিচি দিয়ে অড়রের ডাল আছে, আর আছে তনতনে কাটোয়ার ডাঁটার তরকারি। বড়বড় কয়েকটা গ্রাস খেয়ে উঠোনের দিকে তাকায় বুধু। বৃষ্টি একটু ধরে যাওয়ায় গাবতলায় জোনাকিরা আবার ফিরে এসেছে। তার বৌও যদি এমন ফিরে আসত! এখনো চোখের সামনে বৌয়ের চেহারা স্পষ্ট ভেসে ওঠে। রোগা কালোকোলো মানুষ, সামনের দাঁত একটু উঁচু, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবার মত মেয়েমানুষ নয়। কিন্তু বড্ড হাসিমুখ বৌ ছিল তার। কত অভাব-অনটনে কেটেছে, ভাল কোনো জিনিস হাতে করে কিনে দিতে পারেনি, কিন্তু বৌ কখনো মুখ ভার করেনি, সবসময় হেসেছে। এমন বর্ষার রাতে দুজনে দাওয়ায় বসে খেতে খেতে হাসিগল্প করত, আজকের মতই লম্ফর আলো কাঁপত জোলো বাতাসে, মল্লিকদের বাঁশঝাড় থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসত। মাঝে মাঝে একটু যে মন কেমন করে না এমন নয়, কতদিন আর একা একা বাঁচতে ভাল লাগে মানুষের?

খাওয়া হয়ে যায়। থালা-গ্লাস ধুয়ে ঘরের ভেতরে রেখে আবার বারান্দায় এসে বসে বুধু। একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রথম আরামের টানটা দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বলে—আঃ!

বাড়ির সামনের আলপথ দিয়ে যাচ্ছে পুবপাড়ার হারাধন, ঘরামির কাজ করে। বুধু হেঁকে বলল—কে রে? হারু নাকি?

—হ্যাঁ বুধুদা। অন্ধকারে বসে যে?

—এই খেয়ে উঠলাম। আলোয় আর কী হবে? আয়, বোস। একটা বিড়ি খেয়ে যা। কোথায় গিয়েছিলি?

উঠোন পেরিয়ে এসে দাওয়ায় উঠে বসল হারাধন, বুধুর কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে নিজের লাইটার দিয়ে ধরাল, বলল—কলকাতা গিয়েছিলাম গো। এই তো সন্ধ্যের টেরেনে ফিরলাম—

—হঠাৎ কলকাতা? সেখানে কী?

বিড়িতে জমাট টান দিয়ে হারাধন বলল—ও বাব্বা! তুমি তো দেখছি কিছু খবরই রাখো না। কলকাতায় আজ বিরাট কাণ্ড হল। গ্রামের আদ্দেক লোক তো আজ কলকাতায় গিয়েছিল, লরীতে, টেরেনে। তুমি সাতে-পাঁচে থাকো না বলে তোমাকে ডাকেনি।

বুধুর মনে হল এরকম আবছা কী যেন সে শুনেছিল। বিলেত থেকে কে একজন বড়

মানুষ আসবে, তার জন্য সভা। সে বলল—হ্যাঁ শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। সেই কে একজন সাহেব আসবে তো?

—আসবে কী গো? এসে চলেও গেল। সাহেব নয়, আমাদেরই মত কালো—আরও বেশি কালো। নামজাদা মানুষ, জেল খেটেছে।

বুধু একটু অবাক হল। সাহেব নয়? কালো মানুষ? বিলেতে কি কালো মানুষ থাকে নাকি? কালো মানুষের জন্য সভা হয়? গ্রাম-গঞ্জ থেকে বাস আর লরী বোঝাই করে লোক যায়? সে বলল—কে লোক রে হারু? কী করেছে সে।

—জেল খেটেছে।

—কেন?

—সাহেবদের হাত থেকে দেশ স্বাধীন করবার জন্য। কত কাজ করেছে।

বুধু এসব খবর কিছুই জানে না। কলকাতা যাবার কথা তাকে কেউ বলেও নি, জানলেও হয়তো সে যেতে পারত না। গ্রামে একটাই রিকসা, তার এই ভাঙাচোরা নড়বড়ে গাড়িখানা। একদিন সে না থাকলে কত লোকের কত কাজ আটকে যাবে। আর সে-ই বা খাবে কী? দিনের রোজগাব, দিনের খাওয়া।

হারাধন আজ এক চমৎকার দেখে এসেছে কলকাতায়, জমিয়ে তার বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছে গ্রামে পড়ে থাকা প্রতিবেশীকে।

—সে যা দেখলাম বুধুদা। উঃ রে লোক। লোকের সুমুদ্দর। পথঘাট সব আটকে গেল, গাড়িঘোড়া বন্ধ। আরে, মানুষই গলবার জায়গা নেই তা গাড়ি চলবে কোথা দিয়ে? খুব কাছে যেতে পারিনি অবিশ্যি, তবে বেশ ভাল করেই দেখতে পেয়েছি। লম্বা চেহারা, কুচকুচে কালো রঙ, কোঁকড়া চুল আর হাসি-হাসি মুখ। বড় বড় সব নেতারা কত ভাল কথা বললেন। দেশের লোকের জন্য অনেক করেছে লোকটা। মার খেয়েছে, জেল খেটেছে। এখন দেশ স্বাধীন।

—কী নাম রে হারু মানুষটার?

হারাধন বিপদে পড়ে। নামটা সে আজ বহুবার উচ্চারিত হতে শুনেছে, কিন্তু জিভে ঠিকঠাক আসে না। সে বলল—ম্যানেলা—ম্যালেন্ডা। না, না, মনে পড়েছে, দাঁড়াও—ম্যান্ডেলা। ঠিক, ম্যান্ডেলা।

আবার বলে—কী খাতির দেখলাম বুধুদা। গাড়ি থেকে নেমে যেখান দিয়ে হেঁটে গিয়ে মাচায় উঠল, সেটুকু রাস্তা লাল কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। কত লোক কত কী দেচ্ছে, ফুল ছুঁড়ছে। বড্ড ভারি লোক—

তারপর বলে—এঃ, বিষ্টি আবার চেপে আসছে। বাড়ি যাই বুধুদা। দাও, আর একটা বিড়ি দাও, খেতে খেতে যাই। যত বিষ্টি আমাদের গাঁয়ে, কলকাতা আজ খটখটে শুকনো। গেলে না বুধুদা, একটা দারুণ জিনিস ফসকালে—

বিড়ি ধরিয়ে হারাধন রওনা দেয় বাড়ির দিকে।

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বিমর্ষ হয়ে বুধু বসে থাকে। আহা, এত বড় একজন লোককে সে দেখতে পেল না। সে সাতে-পাঁচে থাকে না বলে কেউ তাকে কোথাও ডাকে না, তবে খবর পেলেও যাওয়া হত না ঠিকই। আজ সারাদিন তার খুব খাটনি গিয়েছে। সকালে ইস্টিশনের স্ট্যান্ডে টাকাদশেকের ভাড়া খাটবার পরেই রতন পরামাণিক এসে হাজির। মুখচোখের কাঁদো-কাঁদো ভাব। সে বলল—এই যে বুধুদা, তোমাকে পেয়ে গিয়েছি। এক্ষুণি চল আমার সঙ্গে, আমার বড় বিপদ—

—কেন, কী হয়েছে রে?

—আমার বৌটা মবে যাবে বুধুদা। শেষরাত থেকে বাচ্চা হবার ব্যথা উঠেছে। আন্নাকালী দাইকে ডেকে এনেছিলাম। সে বলল অবস্থা ভাল নয়, মাথার আগে পা আসছে, বাচ্চা ঘোরেনি পেটের মধ্যে। তার কম্ম নয়। শুনে দৌড়োলাম হেলথ সেন্টারে। সেখানকার ডাক্তারবাবু ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছে, ফিরবে পরশু। ততদিন কি আমার বৌ বাচ্চা পেটে নিয়ে বসে থাকবে নাকি? তুমি চল, তোমার গাড়ি করে বৌকে আমি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাব—

বুধু অবাক হয়ে বলল—তুই কি পাগল? এই আট কিলোমিটার রাস্তা, তাই নিয়ে যাওয়া যায় কখনো? খানা ডোবা গর্ত কাদা, পথেই কিছু একটা হয়ে যাবে—

—হয় হোক। তুমি চল তো। ভ্যানে শুইয়ে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আজ চুয়াডাঙার হাট, সব ভ্যান মাল নিয়ে সেখানে গিয়েছে। যা হয় হবে, চল—

কীভাবে যে রতনের বৌকে সে পৌঁছে দিয়েছে শহরের হাসপাতালে, তা সে-ই জানে। পাড়ার কেউ আসেনি সঙ্গে, মানুষের দুঃখ-কষ্টে আজকাল আর কেউ এগিয়ে আসে না। রতনই বৌকে জাপটে ধরে ছিল। বৌটা ছটফট করছে, একটু বাদে বাদে চেঁচিয়ে উঠছে পাগলের মত। পোয়াতি রুগী নিয়ে যাওয়া, রাস্তা বেহাল, হ্যান্ডেল আর সিট ধরে সাবধানে হেঁটে গিয়েছে বুধু। যাক, শহরের হাসপাতালে বাচ্চাটা ভালয় ভালয় হয়ে গিয়েছে। রতন তাকে পঁচিশটা টাকা দিতে চেয়েছিল, সে নেয়নি। বলেছিল—এখন রেখে দে, এখন তোর টাকা দরকার হবে। পবে দিস।

আবও কত কী কবেছে। নিবারণের মেয়ের বিয়েতে জামাই এনে দিয়েছে, লোকের ধান-চাল বয়ে দিযেছে—এমনি সব। আর দেখো লোকে কত বড় বড় কাজ করে, দেশের জন্য লড়ে, জেল খাটে। তাদের জন্য সভা হয়, লাল কার্পেট পেতে দেয়।

কিন্তু মুশকিল হল, যতবারই বুধু ভাববার চেষ্টা করল সে একজন অতি অকিঞ্চিৎকর মানুষ, জীবনে তার কিছুই করা হল না, ততবারই তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বলতে লাগল—কিছুই কি না? কিছুই কি না?

গাবতলায় ফিরেছে জোনাকিরা। খড়ের চালে অবিশ্রাম বৃষ্টিপাতের শব্দ। তারই মধ্যে দাওয়ায় বসে নিজের জীবনের সার্থকতা বিষয়ে বিষম গোলযোগপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল বোকা বুধু।

যাদৃশী

রামনাথের বয়েস এখন বাহান্ন। বয়েসটা পশ্চিমের দিকে ঠিকই, কিন্তু তার শরীরের বাঁধুনি এখনো ঠিক আছে। বাবুভাইদের মত রক্তের চাপ, বুক ধড়ফড় কিম্বা ডায়াবেটিস এসব কিছুই তার নেই। এখনো সে এক আসনে বসে কুড়ি-বাইশটা লিট্টি, পনেরোটা হাতে বানানো মোটা চাপাটি, অথবা সম পরিমাণ ঠেকুয়া খেয়ে থাকে। গত ছট পরবেও খেয়েছে। রেল ইয়ার্ডের কোয়ার্টার্স থেকে পরমানন্দের বউ শনিচরি দিয়ে গিয়েছিল। শনিচরি তার দিকে একটু টেনে চলে। ভালমন্দ খাবার করলে দিয়ে যায়, এদিকে কোনো কাজ পড়লে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করে যায়, হেসে হেসে কথা বলে। বিপত্নীক রামনাথের জিনিসটা মন্দ লাগে না। নারীসংসর্গ বর্জিত শুষ্ক জীবনে একটু বসন্তের হাওয়া। দুই ছেলে সবসময় থাকে

না, তারা এখন চরে খেতে শিখেছে। কাজেই একটু আবছা রঙ্গরস করতে বাধা নেই। এ পাড়ার মাতব্বররা, মাতব্বরদের বৌয়েরা শনিচরির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রথম দিকে সামান্য ফিসফাস শুরু করেছিল। সে সব এখন মিটে গিয়েছে। মানুষ একটা কোনো ব্যাপার নিয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না। তাছাড়া মহল্লার উৎসব আর পরবে রামনাথ মোটা চাঁদা দেয়, সবার বিপদে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেঁড়া ঝামেলা নিয়ে তাকে কেউ চটাতে চায় না।

সেদিন তার টালি দিয়ে ছাওয়া ছোট খুপরির সামনে বসে লোমশ গায়ে আচ্ছা করে তেল মাখছিল রামনাথ। তেল মেখে সে রেলপুকুরে স্নান করতে যাবে। এমন সময়ে পীরু রিকসাওয়ালার ভাই পাগলা বীরু তার সামনে এসে দাঁড়াল। রামনাথ জিজ্ঞেস করল—কী রে বীরু, কেমন আছিস?

স্বভাবমত হি হি করে কারণহীন হেসে হেসে বীরু বলল—ভাল আছি কাকা, আমি তো আজকাল চাকরি করছি, জানো না?

অবাক হয়ে রামনাথ বলল—চাকরি? তুই? বলিস কী! তোকে কে চাকরি দেবে?

উবু হয়ে বসল বীরু। আবার একগাল হেসে বলল—হ্যাঁ কাকা। ওই যে বাজারে সাধুখাঁদের মুদিখানার পাশে নারায়ণ সরকার লটারির টিকিট বিক্কিরির দোকান খুলেছে না? সেইখানে আমা'কে কাজ দিয়েছে। সত্যি—

—তাই? কী করতে হবে তোকে?

—ওই টিকিট বিক্কিরি। একগোছা করে ধবিয়ে দেয় সকালে, বিকালের মধ্যে শেষ করে দিতে হয়। মাসে চারশো টাকা দেবে বলেছে, তাছাড়া দুপুরে খেতে দেয়—

আঙুলে সরষের তেল নিয়ে নাকের ফুটোয় দিতে দিতে রামনাথ বলল—খাওয়ার জন্য মাইনে ছাড়াও আলাদা পয়সা দেয়? কোথায় খাস?

—পয়সা দেয় না। দুপুরবেলা মালিকের বাড়ি থেকে টিপিনকারি করে ভাত-তরকারি আসে, তার থেকে আমাকে আলাদা করে শালপাতায় বেড়ে দেয়। তা ভালই দেয় কাকা, সেদিক দিয়ে কেপ্পন না। চূড়ো করে ভাত দেয়, তাতে খোঁদল করে আধবাটি ডাল ঢেলে দেয়, একথাবা তরকারি দেয়। হপ্তায় একদিন ডিম, একদিন মাংস। ভাল না?

—খুব ভাল। তা আমার কাছে কী মনে করে?

—আমার কাছ থেকে একটা টিকিট নাও কাকা। আজ তোমাকে দিয়ে শুরু করি—

রামনাথ বিরক্ত হয়ে বলল—যাঃ, ভাগ্। লটারির টিকিট আমি কাটি না।

—নাও না, কপালের ব্যাপার কেউ বলতে পারে? যদি তোমার লেগে যায়। একটা তো টাকা—

লটারির বিষয়ে রামনাথের কোনো উৎসাহ নেই। সন্ধেবেলা বাজারের মোড়ে এজেন্টের মাইক লাগানো ভ্রাম্যমাণ গাড়ির চারদিকে মানুষজনকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে সে টিকিট কিনতে দেখেছে। তার নিজের কখনো সেখানে ভিড় বাড়াতে ইচ্ছে করেনি। অনেকে আবার সিরিজ আর নম্বরে কী সব দেখে পছন্দমত টিকিট কেনে। কী দেখে ভগবান জানে।

বীরু কাঁধের ঝোলা থেকে টিকিটের বাণ্ডিল বের করে ফেলেছে। কিছু একটা না গছিয়ে সে ছাড়বে না। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলবার জন্য রামনাথ বলল—দে, ঝটপট একখানা দে—

—এই দেখ কাকা, বিউটি সুপার বাম্পার। এই হচ্ছে ধনলক্ষ্মী র‍্যাফল্, এই হল গে লাখপতি উইকলি ড্র—কোনটা দেব বল? দুটো নেবে?

—খবরদার! একদম বিরক্ত করবি না। একটাই নিচ্ছিলাম না, নেহাৎ তোর পাল্লায় পড়ে—

—ঠিক আছে, তুমি লাখপতি উইকলি একখানা নাও। কী সিরিজ নেবে?

—আমি ওসব কিছু বুঝি না। তুই যাহোক একটা দিয়ে যা তোর পছন্দমত।

বীরু দুঃখিত হয়ে বলল—নিজে ঠিক করে নিলে পারতে কাকা। এ থেকে এফ পর্যন্ত সিরিজ আছে। তারপর নম্বর। প্রথমে বা শেষে দুটো করে নম্বর বেছে নিতে পারো। তোমার জন্মের সাল, কী অন্য কোনো ভাল পয়মন্ত তারিখ—

—কোনো দরকার নেই। যা হোক দে—

সামান্য জিভ বের করে—এটা তার মুদ্রাদোষ—মনোযোগ দিয়ে কী সব দেখে বীরু একখানা টিকিট রামনাথের দিকে বাড়িয়ে ধরল—নাও, কাকা। যত্ন করে রেখো। ফাসট্ পেরাইজ দেড় লাখ টাকা। আজ সন্ধেবেলা একটু গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে ধুপকাটি জ্বেলে টিকিটের সামনে রেখো—

—যা যাঃ, বকিস না—

ঘরের মধ্যে জয়াপ্রদার ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের নিচে জলচৌকির ওপর বাবার আমলের একখানা রামচরিতমানস রয়েছে। বাবার কাছ থেকে পাওয়া একমাত্র সম্পত্তি। তার ভেতরেই টিকিটটা গুঁজে রাখল রামনাথ।

তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরে ছাতুর তাল নিয়ে খেতে বসে গেল রামনাথ। তেল নুন আর সামান্য জল দিয়ে মাখা ছোলার ছাতু, সঙ্গে গোটা চার-পাঁচ কাঁচালঙ্কা। পাশেই পেতলের লোটায় জল। তোফা খাওয়া। বিকেল পাঁচটা অবধি পেট ভরা থাকে। তারপর আবার মকাইদানা কা ভুজিয়ার জলখাবার। রাত্তিরে রুটি, রহড় কা দাল আর আলুব চোখা। রাত্তিরের খাওয়াটা সে সচরাচর বাইরের কোনো দোকান থেকে সেবে আসে। বৌ মারা যাওয়ার পর থেকে আর রান্নার ঝামেলা করতে ইচ্ছে করে না।

খাওয়া সেরে চাপাকল থেকে থালা-লোটা ধুয়ে ঘরে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। আর মোটে দেরি করবার উপায় নেই। এতক্ষণে গোবর আসতে শুরু করেছে। দশ-বারোজন বুড়ি তার জন্য গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়। তারা শহর আর আশেপাশের গ্রাম থেকে গোবর নিয়ে আসে। শেষরাত থেকে কাজ শুরু করে এক একজন আট-দশ ঝুড়ি গোবর আনে। তারপর রামনাথের তত্ত্বাবধানে সে গোবর মাখা হয়। নেতাজি নগর কলোনি, জি. টি. রোডে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডের সামনে যে দেয়াল, ছায়ামন্দির সিনেমা হলের পেছন দিকটা—এই সব দেয়াল তার অধিকারে। এখানে সে ঘুঁটে দেয়। সে দেয়, মানে তার হয়ে বুড়িরা দিয়ে দেয়। দু রকম সাইজ আছে ঘুঁটের। ছোট আর বড় ঘুঁটের দর হাজারে প্রায় আট টাকা কম-বেশি। বর্ষাকালে সাধারণভাবে ঘুঁটের দাম প্রায় দেড়গুণ চড়ে যায়, আর সাইজ অনুযায়ী এই ফারাকটা দাঁড়ায় বারো টাকা। কাজেই বর্ষার বাজারে ছাড়বার জন্য অন্তত দেড় কী দুমাস আগে থেকে ঘুঁটে তৈরি করে মজুত রাখতে হয়। রায়বাবুর বায়োকেমিক ডাক্তারখানার পেছনে প্রেমলাল সিং-এর যে কাঠের গুদাম ছিল, ব্যবসা ছেড়ে দেশে যাওয়ার সময় প্রেমলাল সেটা রামনাথকে ব্যবহার করতে দিয়ে গিয়েছে। বিক্রি করেনি। প্রেমলালের ছেলেপুলে কেউ এসে ব্যবসা করতে চাইলে ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে। বর্তমানে সেই ঘরে রামনাথ ঘুঁটে রাখে।

কলোনি, জি.টি. রোড আর পুলিশের মাঠ—তিনটে ব্যবসাকেন্দ্রেই চট করে ঘুরে দিনের কাজ শুরু করে দিল রামনাথ। দেরি করবার সময় নেই। আজ চমৎকার কড়া

রোদ্দুর উঠেছে। ঝপ্ করে এই ব্যাচটা শুকিয়ে যাবে মনে হয়। তবে বলা যায় না, মাঝে মাঝেই বিকেলের দিকে ঝড় আর বৃষ্টি হচ্ছে। তাহলেই কেলেঙ্কারি, ভগবানের দয়ায় এমন ক'দিন এইরকম চামড়া-জ্বালানী রোদ্দুর থাকলে সব দিক দিয়ে মঙ্গল, বর্ষার ঘুঁটের স্টকটা তৈরি করে তাহলে মজুত করে ফেলা যায়।

ঘুঁটে তৈরি চালু হয়ে গেল। বুড়িরা নিখুঁত হাতে সঠিক আন্দাজে গোবরের তাল পাকাচ্ছে, দুবার হাতে নাচিয়ে থপ্ করে ছুঁড়ে দিচ্ছে দেয়ালের গায়। পাঁচজন ছোট সাইজের, আর সাতজন বড় ঘুঁটে বানাচ্ছে। দুপুর বারোটার মধ্যে গোবর শেষ হয়ে যাবে। তারপর বুড়িদের আজকের মত ছুটি। আবার এরা আসবে কাল সকালে।

শহরের অবস্থাপন্ন বাবুরা আজকাল গ্যাসে রান্না করে। যাদের গ্যাস আনবার মত অবস্থা নয়, অথচ মনে মনে উঁচুদলে নাম লেখাবার ইচ্ছে আছে—কিম্বা ঝামেলা কমাতে চায়, তারা কেউ কেউ কেরোসিন স্টোভ ব্যবহার করে। বার্নারটা অবিকল গ্যাস বার্নারের মতই দেখতে। এর ফলে ঘুঁটের বাজার পড়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। নিম্ন মধ্যবিত্ত আর গরীব মানুষ দেশে এখনো অনেক। তারা থাকতে রামনাথের কোনো চিন্তার কারণ নেই। তার ব্যবসা এখনো বহুদিন রমরম করে চলবে।

কাজ চালু করে দিয়ে রামনাথ বেরুলো অর্ডার জোগাড় করতে। এই কাজটা সে এজেন্টের মারফতে না করে নিজের হাতে রেখেছে। দালাল লাগিয়ে দিলে তার পরিশ্রম কমে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে লাভও কমে যায়। তার শরীর এখনো বেশ ভাল আছে, পরিশ্রম করতে সে ভয় পায় না। তাহলে অনর্থক লাভেব পয়সা দালালকে দেবে কেন? শহরের উত্তর দিকটা আজ ঘুরে সে অনেক অর্ডার পেয়ে গেল। কাল আর পরশু নন্দু ভ্যানওয়ালা মাল সাপ্লাই দিয়ে দেবে।

সন্ধের দিকে রেল ইয়ার্ডের প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার লম্বা পাঁচিলের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার রোজকার মত মনে হল—আহা! এই পাঁচিলটা যদি পেতাম। সারাদিনে কত বাড়তি ঘুঁটে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হবার নয়। সে খোঁজ নিয়েছিল, ওই পাঁচিলটা ইস্টার্ন রেলওয়ের অধিকারে। রেলের কর্তাদের ধরে ও পাঁচিল ইজারা নিতে গেলে অনেক টাকা দরকার। তার এলেমে কুলোবে না।

ঘরে ফিরে বাতিটা জ্বালাতেই নজরে পড়ল রামচরিতমানসের ভেতরে গুঁজে রাখা টিকিটখানা। একটু ইতস্তত করে তাকের ওপর থেকে গঙ্গাজলের ঘটি নামিয়ে বই আর টিকিটের ওপর ছিটে দিল রামনাথ। দু খানা ধূপকাঠি জ্বেলে দিল।

দিনচারেক বাদে সকালবেলা উদ্‌ভ্রান্তের মত বীরু এসে হাজির। তার চুল উস্‌কো-খুসকো, চোখ-মুখ যেন কেমন কেমন। উত্তেজনায় তার কথা আটকে যাচ্ছে।

—কী রে, কী খবর বীরু? কী হয়েছে তোর?

—কাকা, তোমার নম্বরের টিকিট কত?

—সে আবার কী? কী বলছিস তুই?

—না, না, মানে—তোমার টিকিটের নম্বর কত? জে সি সাত দুই নয় তিন চার দুই কি? দেখো তো—কই টিকিটখানা?

রামচরিতমানসের ভেতর থেকে টিকিট বের করে আনে রামনাথ। তার বুক কাঁপছে।

—দেখি, দেখি—

বগলের তলা থেকে ভাঁজ করে রাখা একখানা খবরের কাগজ বের করে বীরু নম্বর মেলাতে শুরু করে। তার হাত কাঁপছে, কাগজে খড়্‌মড়্ করে শব্দ হচ্ছে।

—সাত দুই নয় তিন চার দুই। কাকা! তুমি ফাসট। ফাসট পেরাইজ পেয়েছ। আমাকে একখানা প্লাস্টিকের খেলনার দোকান করার টাকা দিও কাকা, মাত্র পাঁচ হাজার। দেবে তো? আমি জোর করেছিলাম বলেই তো তুমি কিনলে, তোমার তো ইচ্ছেই ছিল না। ধর্মত আমাকে তোমার দেওয়া উচিত—

খবর রটে গেল বিদ্যুতের গতিতে। এজেন্ট নারায়ণ সরকার নিজে এল, ঘুঁটে কুড়ুনি বুড়িরা এসে একশো টাকা করে বকশিস কবুল করালো, রামলীলার জন্য হাজার টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি আদায় করল পাড়ার ছেলেরা, পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে আবার বিয়ের পরামর্শ দিল। নারায়ণ সরকার বলল—এজেন্টের কমিশন, ট্যাক্স আর এই যা যা শুনলাম, এসব বাদ দিয়েও তুমি হাতে প্রায় পুরো একলাখ টাকা পাবে। অনেকগুলো টাকা রামনাথ, ব্যাঙ্কে ফেলে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। তাতে ক পয়সাই বা সুদ পাবে? ব্যবসা হল আসল জিনিস। ব্যবসা কর। যদি বল, তাহলে আমার দোকানের পাশের ঘরটাই দেখি। আমি নিজে চেষ্টা করলে অল্প সেলামিতে হয়ে যাবে। কাটা কাপড় আর রেডিমেডের দোকান দাও—

রামনাথ সাবধানী লোক, সে চেনা পরিধির বাইরে যাবে না। বিনীত গলায় সে বলল—সরকারবাবু, ওসব বড় কারবারের আমি কিছু বুঝি না। আমি আমার এই ঘুঁটের ব্যবসাটাই বড় করব। আপনি কাউকে দিয়ে বলিয়ে রেল ইয়ার্ডের পাঁচিলটা আমাকে ইজারা পাইয়ে দিন, বহোৎ মেহেরবানি হবে। ওটা পেলে শহর ঘুঁটেয় ভরে দেব, রামজী কসম!

বয়েস

•

সব বেশ মসৃণ গতিতে চলেছিল গত সাতদিন, গোলমাল বাধলো আশীর্বাদ ট্রাভেল্স্-এর কাউন্টারে।

মাঠের মধ্যে মাগুরমারি নদীর ধার দিয়ে হেঁটে বেড়িয়ে ফেরবার সময় মুক্তিনাথ বললেন—ওহে, আমাদের রিটার্ন জার্নির টিকিটগুলো বুক করে ফেলো—

কথাটাই সবারই মনে ধরল। ভ্রমণের প্রথম আবেগ বেশ সুন্দর। বহুদিন পর শহরের জাঁতাকল থেকে রেহাই পাবার আনন্দে ট্রেনে উঠেই ঝালমুড়ি, শশা, আনারস লবেঞ্চুস, কাগজের কাপে কবোষ্ণ কফি, সেদ্ধ ডিম, দুপুরবেলা ফয়েলে মোড়া লাঞ্চ প্যাকেট—এককথায় ট্রেনে যা যা ওঠে তার মধ্যে একমাত্র জুতো পালিশ বাদ দিয়ে সব খাওয়া শুরু হয়ে যায়। সহযাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে উদারতার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দেয়। ডানপাশের জন চা কিনলে বাঁ পাশের জন কেনেন চিনেবাদাম। উলটোদিকের জন পরের জংশনে কচি ডাব খাওয়াবেনই খাওয়াবেন। সঙ্গের ছেলেপুলেগুলো পর্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে। ক-বাবুর ছেলে ললিপপ কিনবেই, কিন্তু বাপ রাজি হচ্ছেন না। খ-বাবু হেসে বললেন—'আহা, ছেলেমানুষ। ও লবেঞ্চুসওয়ালা, সব বাচ্চাকে দুটো করে দাও।' পনেরো কিলোমিটার পরে খ-বাবুর ছেলের আবদারে সিঙাপুরি কলা কেনেন ক-বাবু। যে গতিতে কলার ছড়া নিঃশেষিত হয় তাতে কামরায় মানুষের আদিম পূর্বপুরুষেরা ছদ্মবেশে ভ্রমণরত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কলা ফুরোলে গ-বাবু বাচ্চাদের প্লাস্টিকের বাঁদর কিনে দেন।

কিন্তু সাতদিন কেটে যাওয়ার পর এখন প্রত্যেকেরই মন চঞ্চল। নিয়মমত যা যা

করার সবই নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছে। দার্জিলিং মিরিক খতম। ম্যালে পোলারয়েড ক্যামেরায় ফ্যামিলি গ্রুপ, গাধা সাইজের ঘোড়ায় চড়ে 'ওঁ বাঁবাঁ! পঁড়ে যাঁবো নাঁতো!' বলতে বলতে চক্কর দেওয়া, সস্তায় সোয়েটার-পাথরের মালা খরিদ, ঘুম-এ মেঘের মধ্যে দিয়ে উঠতে উঠতে 'সত্যি, এখানে একটা বাড়ি করলে হত' বলা, জলাপাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক কবিতা-আবৃত্তি—সবই ঠিকঠাক করা হয়েছে। এবার শহরের খাঁচায় ফিরতে পারলে ভাল হয়। চিরকালের বদ্ধতার অভ্যেস, মুক্তির ভেতরে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

মুক্তিনাথের সঙ্গে মেজভাই দীপ্তিনাথের বেতনগত পুরনো ঈর্ষা, ছোটভাই তৃপ্তিনাথকে যে অফিস থেকে একবার আধুনিক জুতোর ডিজাইন শেখবার জন্য হংকং পাঠানো হয়েছিল সেই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা, বড়বৌ মালা লক্ষ্মী ট্যারা কিনা—এসবের আলোচনা বন্ধ ছিল সাতদিন। আর নয়। আর পারা যায় না।

কাজেই পরিবেশ তৈরি ছিল, গোলমাল ফুটে বেরুল আশীর্বাদ ট্র্যাভেলসের কাউন্টারে। তৃপ্তিনাথ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এনি অ্যাকোমোডেশন অন্ দার্জিলিং মেল ফর ক্যালকাটা?

উত্তরে কাউন্টারের ওপাশের পাঙাসপানা লোকটা ভেতো বাংলায় বলল—কত তারিখের? ক-জন যাবেন?

জানা গেল রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে। লোকটি একটুকরো ছাপা কাগজ তৃপ্তিনাথের হাতে দিয়ে বলল—এটা ফিল-আপ করে দিন।

তৃপ্তিনাথ ট্রেনের নাম, কোথা থেকে যাবেন এবং গন্তব্যস্থলেব নাম, যাত্রীদের নাম এসব লিখে ফেললেন। নিজের এবং দুই দাদার মানানসই বয়েসও বসিয়ে দিলেন। তারপর মালার দিকে তাকিয়ে বললেন—বৌদি, আপনার তো তিপ্পান্ন হল, তাই না?

মালা জাপানী কাগজের হাতপাখা নাড়তে নাড়তে মেজবউ এবং ছোট বউয়ের সঙ্গে কোলকাতা ও দার্জিলিংয়ের বাজারে উলের তুলনামূলক দর নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আচমকা থেমে গিয়ে বিস্ময় রাগ এবং অবশ্যই ধিক্কার মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন বল তো ঠাকুরপো?

তৃপ্তিনাথ বুঝতে পারলেন প্রশ্ন অনেক ঘুরিয়ে করা উচিত ছিল। তিনি নরম গলায় বললেন—না থাক। আমি যাহোক বসিয়ে নিচ্ছি, রিজার্ভেশনের জন্য দরকার ছিল—

হিমবাহ-গলা স্বরে মালা বললেন—যা হোক বসিয়ে নেবে কেন? এসব প্রসঙ্গ উঠলে ফয়সালা করে নেওয়াই উচিত, সোজা হিসেব যখন রয়েছে—

তৃপ্তিনাথ ভুল করে একবার চোরাবালিতে পা দিয়েছেন, এ সজ্ঞানে ফাঁদে ধরা দেবেন কেন? তিনি বললেন—না না, থাক—ও হয়ে যাবে এখন—

এই বাধা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মালা স্বামীর দিকে ফিরে সৈন্যদলকে কুচকাওয়াজ করতে আদেশ দেওয়ার স্বরে বললেন—আমাদের বিয়ের সময় ছোটঠাকুরপো প্রথম চাকরিতে ঢোকে, তাই তো?

মুক্তিনাথ নির্বিকার ব্রহ্ম, মুক্তিনাথ অন্যমনস্ক দার্শনিক। তিনি বাইরে পথে লোক চলাচল দেখেন, এজেন্সীর দেওয়ালে সুপুষ্ট টিকটিকির বিচরণ দেখেন। তুচ্ছ কথায় তাঁর কান নেই।

এই নীরবতাকে সমর্থন হিসেবে ব্যাখ্যা করে মালা বললেন—আমার বিয়ে হয়েছিল যোলো বছরে—যোলে পোরেনি তখনো, পনেরো গিয়ে যোলো চলছে। তার সঙ্গে যোগ

দাও—শুনছো, আমাদের বিয়ে হল কতবছর?

শ্রবণ ও বাক্‌যন্ত্রের দিক দিয়ে মুক্তিনাথ একজন আজন্ম প্রতিবন্ধী। উদাস চোখে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছোটবউ সুদেষ্ণা বলল—আমাদের বিয়ের বছর আপনারা পঞ্চম বিবাহবার্ষিকীর উৎসব করেছিলেন—

—তোমাদের বিয়ে কত বছর হল?

—সতেরো বছরে বিয়ে হয়, এখন আমার চৌত্রিশ চলছে। যোগ দিয়ে নিন না—এতে তো আর লুকোবার কিছু নেই।

চৌত্রিশ শুনে মেজবউ সামান্য হেসে ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে শো-কেসে মেলা-মাইনের বাসনপত্র মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন।

মালা বললেন—চৌত্রিশ? না, তা কি করে হয়? তোমার বোধহয় হিসেবে কিছু গোলমাল হচ্ছে। তোমার বড়ছেলের বয়স কত হল?

—সন্তু? সন্তু আমার বিয়ের পাঁচবছর পরে হয়, যেবার ন-মাসীর ছেলের পৈতে হল। সন্তুকে কোলে করে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে। তার মানে হল গিয়ে—

মালা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললেন—ভুল হচ্ছে। সে সন্তু নয়, সে সন্তু নয়, সে ছোটটা—নন্তু। সন্তু তখন দেড়বছরের—

সুদেষ্ণার মুখ প্রথমে লাল, পরে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের স্পৃহায় চৌকো দেখাতে লাগল। সে বলল—আমার ভুল হয়নি। যেবার চাকরির গোলমালে বড়দা দেড়বছর বাড়িতে বসে রইলেন, সে বছরই নন্তুর জন্ম।

পুরনো বেদনার স্মৃতির মৌচাকে কঠোর আঘাত। মুক্তিনাথের প্রথম সন্তান বুম্‌বা তখন বছর চারেকের। একবার মেজবউ নন্দিনীকে বুম্‌বা বলেছিল—'মেজকাকা মাসে একবার মাইনে পায়, না কাকীমা? আমার বাবা রোজ মাইনে পায়, সন্ধেবেলা মাকে এনে দেয়।' মেজবউয়ের দোষ নেই, আর কাউকে না বলার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে তবে সে খবরটা আত্মীয়দের মধ্যে ছড়িয়েছিল। এই প্রত্যেকদিন মাইনে পাবার ব্যাপারেই কি গোলমালে মুক্তিনাথকে কিছুদিন বসে থাকতে হয়। অবশ্য তদন্তে কিছুই প্রমাণিত হয়নি, এবং মুক্তিনাথও পরে সসম্মানে কাজে যোগ দেন। কিন্তু গল্পটা মুখরোচক আলোচনা হিসেবে আত্মীয়দের মধ্যে থেকে যায়। অরুচিকর প্রসঙ্গ আবার ওঠবার আশঙ্কায় মুক্তিনাথ বললেন—আঃ, থাক না বাজে কথা। ফর্মটা ফিলআপ করে চলো দেখি, এদিকেও তো দেরি হয়ে যাচ্ছে—

কিন্তু ততক্ষণে মালার মুখে হিটলার—হিরোশিমা—পেরুর ভূমিকম্প—নরবলির উল্লাস সব একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। স্বামীর দিকে ফিরে তিনি বললেন—তোমাকে না বললাম ছ-টা পাতিলেবু নিয়ে আসতে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?

তারপর সুদেষ্ণার দিকে তাকিয়ে ডিজেল ট্রাক্টর স্টার্ট দেবার মত গলায় বললেন—ছোটখাট ঘটনা সবার জীবনেই থাকে, ও নিয়ে মাথা ঘামানো ভদ্রতা নয়। তোমার বাড়ি থেকে যে ফি হপ্তায় শিশিবোতলওয়ালা বস্তাভর্তি মাল কিনে ভারের চোটে কুঁজো হয়ে ফেরে—সে সবই কি ফিনাইল আর অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল? না, তাই নিয়ে আমি আলোচনা করতে গিয়েছি?

এই সময় কাউন্টারের লোকটি অসিহষ্ণু হয়ে বলল—একটু তাড়াতাড়ি করুন দিদি, আমাদের তো অন্য কাস্টমারও অ্যাটেন্ড করতে হবে, নাকি?

শোঁ করে তার দিকে ফিরে চোখ দিয়ে লেসার ছুঁড়লেন মালা। লোকটি বুকে ধাক্কা খাওয়ার ভঙ্গিতে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল এবং তাকে কিছুটা আবছা আবছা দেখাতে লাগল।

এরমধ্যে মুক্তিনাথের ছোটছেলে, বর্তমানে ক্লাস এইটে পড়ে, পকেট থেকে কাগজ আর ডট পেন বের করে ফেলেছে। সে বলল—তুমি আর একবার ফ্যাক্টরগুলো বলে যাও তো মা, আমি ঝট করে হিসেব করে দিচ্ছি। সন্তু বড়, নন্তু ছোট। তোমাদের বিয়ের বছরে ছোটকাকার চাকরি। সন্তুর দেড়বছরে ন-দিদিমার ছেলের পৈতে। তারপর হল গিয়ে—দাঁড়াও, হয়ে এল—

সুদেষ্ণা বিশেষ কোনো একদিকে না তাকিয়ে বলতে লাগলেন—কথা ওঠালে অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু নোংরা ঘাঁটা আমার স্বভাব নয় সে সবাই জানে। নইলে পেটে আমারও কম কথা নেই। কারো নাম করে বলছি না, আমার বিয়েতে কোনো একজনের দেওয়া হার কোনোদিন গলায় পরে চান করতে পারিনি, পাছে রূপো বেরিয়ে পড়ে! বুকে হাত দিয়ে বলুক দিকি, সেকথা আমার কাছ থেকে কেউ জানতে পেরেছে।

মুক্তিনাথের ছোটছেলে চেঁচিয়ে উঠল—মা, ছোটকাকার ছোটছেলের বয়েস পূর্ণসংখ্যায় আনা যাচ্ছে না। ভগ্নাংশে যাবো?

মালা হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কাউন্টারের লোকটি এক ভুল দু-বার করে না, সে তাড়াতাড়ি একটা টুল কাউন্টার ডিঙিয়ে এপাশে পেতে দিয়ে বলল—বসুন না দিদি, দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট করছেন?

দীপ্তিনাথ সন্ত্রাসেব আবহাওযা কিঞ্চিৎ লঘু কববার জন্য প্রসঙ্গ বদলাবার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা কবেছিলেন। সহজ ভঙ্গিতে সিগারেট ধবিযে বলতে শুরু করেছিলেন—এদিকে তো দেখছি সারাবছরই ফুলকপি পাওয়া যায়। অবশ্য দাম একটু—

দীপ্তিনাথকে থামিয়ে দিয়ে মালা বললেন—আগে হিসেব, পরে কথা।

হিসেব হতে বেশি সময লাগল না।। প্রযোজনীয তথ্য মাঝে মাঝে মালা জুগিয়ে দিতে লাগলেন। মিনিট পনেরো বাদে অনেক আঁকিবুঁকি কাটা কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে ছোটখোকা বলল—ব্যাস্, কমপ্লিট। লিখে নাও ছোটকাকা, আমি বলে যাচ্ছি—

তার হিসেব মত বড়ভাই মুক্তিনাথের ছাপান্ন, মালার উনচল্লিশ। মেজভাই দীপ্তিনাথের ষাট, তার বৌয়ের সাতান্ন। ছোটভাই তৃপ্তিনাথের একষট্টি...সুদেষ্ণার বাষট্টি, তৃপ্তিনাথের বড়ছেলে বত্রিশ, ছোটছেলে এখনো হয়নি।

মশা

বাথরুম সেরে সরু বারান্দাটা দিয়ে ফেরার সময় মহাদেব জামাইয়ের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। রাত্তির বারোটার সময় মেয়ে-জামাইয়ের শোবার ঘরের পাশে লুকিয়ে তাদের কথা শোনা শ্বশুরের পক্ষে গৌরবের নয়, কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে নীতিবোধও বদলায় বলে মহাদেব স্থির করলেন এবং অন্ধকারে গা মিশিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অর্জুন বলছে—তুমি বাবার সঙ্গে কাল যাচ্ছ তাহলে?

মেয়ে চুপ করে রয়েছে, কিছু বলছে না।

কি হল, উত্তর দিচ্ছ না যে? যাচ্ছ কাল?

এবার রত্নার গলা—আমি কি বলব বল? আমি জানি.না—

—তাহলে কে জানে? তোমার বাবা আসার পর থেকে তুমি এমন আচরণ করছ যাতে মনে হয় এখানে তোমার ওপর ভয়ানক অত্যাচার চলছে। সেজন্যেই উনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। আসলে যাবার ইচ্ছেটা তুমি এইভাবে জানালে।

—পিসিমার শরীর খারাপ, উনি আমাকে দেখতে চেয়েছেন।

—বাজে কথা।

—বাবা তোমাদের মিথ্যে কথা বলছেন?

—ওটা একটা গৌণ কারণ হতে পারে, কিন্তু তুমি মুখ আর একটু প্রফুল্ল করে রাখতে পারতে। এমন কিছু হয়নি যাতে—

কিছুক্ষণ দু-পক্ষেরই কোনো কথা নেই। রাত্রির স্বাভাবিক স্তব্ধতার মধ্যে ফ্যান চলার ঘস ঘস শব্দ। এবার কি মহাদেব ঘরে চলে যাবেন?

আবার রত্না কথা বলল। তার গলা ক্লান্ত, একটু হতাশা মাখানো।

—তুমি এখনো সত্যিই মনে করো যে এমন কিছু হয়নি, না? কি জানি, হয়তো আমি ভুল করছি। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যেভাবে বেঁচে আছি তাকে বোধহয় ঠিকঠাক বিবাহিত জীবন বলে না।

অর্জুনের কণ্ঠে ব্যঙ্গ—তাই বুঝি? কেন বলে না?

—বিবাহিত জীবনের মূল কথা হল ভালবাসা, নির্ভরতা। এবার তুমি ভেবে দেখো কেন বলে না।

—তুমি আমাকে ভালবাস না?

—সেটা আমি কেন বলব? তুমি বলবে। তবে এটা ঠিক, তোমার ওপর আর আমি নির্ভর করতে পারছি না—

—কেন?

—জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তুমি আমার অবলম্বন হতে পারো নি। নির্ভরতা কোথা থেকে আসবে? তোমার মা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেন, তা সহ্য করেও এ বাড়িতে থাকা যেত যদি তুমি আমার সহায় হতে—

—তোমার জন্য আমি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবো না।

—ঝগড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তোমার কাছে তো আমার আশ্রয় চাইবার অধিকার আছে। আমি বলছি না আমার কোনো ত্রুটি নেই—থাকতেই পারে, মানুষ দেবতা নয়। তাই বলে আমার সবই খারাপ? তোমার মা আমার সবেতেই দোষ ধরেন, আর তোমার কাছেও আমার পা রাখবার জায়গা নেই—

অর্জুন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গলা চড়িয়ে বলল—বাজে কথা বোলো না। আমার মা কোনো অন্যায় করতে পারেন না। মায়ের নামে কিছু বললে—

রত্না ঠাণ্ডা গলায় বলল—চেঁচিও না, বাবা শুনতে পাবেন।

—পেলেই বা কি?

—শোনো, কাল আমি চলেই যাচ্ছি। তাই ভাল।

—যাও, এভাবে আমারও পোষাচ্ছে না।

—কিন্তু যাবার আগে একটা স্পষ্ট কথা তোমাকে বলতে চাই। তোমার বিয়ে করা উচিত হয়নি। মেরুদণ্ড না থাকলে বিয়ে করা উচিত নয়—

এরপর হঠাৎ একটা হুটোপাটির শব্দ, রত্নার গলায় একবার অস্ফুট কাতরোক্তি, তারপর আবার সব শান্ত।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মহাদেব বন্ধ দরজায় দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেন। জানালার বাইরে থেকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে মেঝেতে পড়েছে। মৃদু বাতাসে কাঁপছে সাদা মশারি। একটু আগে মশারিটা মেয়ে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে। অতিথি হিসেবে এ বাড়িতে তাঁর কোনো আদর আর নেই ভেবে খারাপ লাগল। বেয়ান সকাল থেকে মোট চার-পাঁচটি বাক্যও ব্যয় করেছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এসব গায়ে মাখলে চলবে না। মেয়ের মঙ্গল সবচেয়ে আগে।

মশারি গুঁজে শুয়ে পড়লেন মহাদেব। ঘুম আসে না কিছুতেই। রাত কত হল কে জানে। নাঃ, কাল রত্নাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াই ভাল। অন্তত কিছুদিনের জন্যে। ভয় পেয়ে আর লাভ কি? যা হবার তো শুরু হয়েই গিয়েছে।

একটা মশা কিভাবে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। মাঝে মাঝেই কানের কাছে এসে পিনপিন করছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। আন্দাজে আন্দাজে ক-বার হাত মুঠো করে ধরবার চেষ্টা করলেন। বৃথা তখনকার মত উড়ে যায় বটে, আবার একটু পরেই কানের পাশে পিনপিন করতে থাকে। ক্রমে ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। আলো জ্বালবার উপায় নেই, চটাস্ চটাস্ করে শব্দ করবার উপায় নেই—মুখ বুঁজে মেনে নেওয়া ছাড়া কিছুই করবার নেই। নিজের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ঘটনাটার কোথায় যেন মিল আছে।

পিন্-ন্-ন্। মহাদেব অন্ধকারে খপ করে আর একবার শূন্য আঁকড়ে ধরলেন।

আজ পাঁচবছর হল শ্যামা চলে গিয়েছেন। মেয়ের বিয়ের আগেই। স্বামীর প্রথম জীবনের সংগ্রামেরই তিনি সঙ্গী, পরিণত বয়েসের শান্ত বিশ্রাম পর্যন্ত তিনি পৌঁছতে পারলেন না। ভালই হয়েছে। একমাত্র সন্তানের জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়া মা-বাবার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বড় যন্ত্রণা।

কিন্তু বড় একা লাগে যে! কত কথা বলতে ইচ্ছে করে—গুরুতর কিছু নয়, কারণ তেমন ঘটনা আর মহাদেবের জীবনে কি ঘটবে—এমনি পাশাপাশি বসে গল্প, পুরনো দিনের কথা—কেউ নেই সে-সব বলবার মত। প্রৌঢ় বয়েসে জীবনসঙ্গিনী চলে গেলে মানুষের বড় কষ্ট।

এক একসময় মনে হয়—আচ্ছা, লোকে স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে কি করে? একজন মেয়ে তার বাপের বাড়ির পরিচিত আবেষ্টনী, আপনজন, বন্ধুবান্ধব—আজন্ম চেনা সবকিছু চিরদিনের জন্য ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। সেই অসহায় মেয়েটির ওপর পৌরুষ ফলাবার চেয়ে কাপুরুষতা আর কি আছে? তিনি নিজে বৌকে আদরে রেখেছিলেন। তার মর্যাদা ছিল, অধিকার ছিল, বড় বড় সিদ্ধান্তে অংশীদারিত্ব ছিল। সংসারের ব্যাপারে বাড়ির মেয়ের যদি মতামত থাকে, তাহলে বাড়ির বৌয়ের থাকবে না কেন?

পিন্-ন্-ন্-

দূর! এই একটা মাত্র মশা না থাকলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়। সাধের বিশ্রামের সময় ওই একটা মশা সব মাটি করে দেয়।

পরদিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে বেয়ানের সঙ্গে দেখা। অর্জুনও আছে, একখানা খবরের কাগজ ধরে রেখেছে মুখের সামনে। রত্না সবাইকে চা ঢেলে দিচ্ছে। এ বাড়িতে

তাঁর আবাহন-বিসর্জন কিছুই নেই, কেউ প্রভাতী শুভকামনাও জানাবে না। অনাদরের অতিথি হওয়া জীবনে সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা। মেয়ের জন্য তাও সহ্য করতে হয়।

কমলা বললেন—আপনি কি তাহলে মেয়েকে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন?

ব্যস্ত হয়ে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে মহাদেব বললেন—না না, তা কেন? আমি তো সেরকম কিছু বলিনি? আপনি কাল বললেন রত্নাকে ক-দিন আমার কাছে নিয়ে রাখতে। তাই ভাবলাম—আপনি যখন অনুমতি দিচ্ছেন—আবার দিন দশ-পনেরো পরে ফিরে আসবে এখন।

—আমার অনুমতির প্রশ্ন উঠছে না। রত্না তো নিয়ে যাবার জন্যই আপনাকে চিঠি লিখে আনিয়েছে, তাই না?

মহাদেব কিছু বলবার আগেই রত্না উত্তর দিল—এটা ভুল কথা। বাবাকে আমি চিঠি দিযেছিলাম বটে, কিন্তু এসে আমাকে নিয়ে যাবার কথা কিছুই লিখিনি। পোস্ট করবার আগে সে চিঠি আপনার ছেলেও পড়েছে। জিজ্ঞেস কবে দেখতে পারেন।

কমলা সার্চলাইটের মত চোখ পুত্রবধূর দিকে ফিরিয়ে বললেন—কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। তাছাড়া আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছি, তোমার উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

তাঁর উপস্থিতিতেই একজন তাঁর মেয়েকে শাসন করছে, অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না, এতে মহাদেব নিজেকে খুব অসহায় বিবেচনা করলেন। বত্নাব চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সে উঠে ভেতবে চলে গেল।

—তাহলে কি ঠিক করলেন বলুন—

মহাদেব মৃদু গলায় বললেন—আপনি যেমন অনুমতি কবেন।

এসব ভদ্রতাব আড়াল কমলার ভাল লাগছিল না। তিনি কথা পরিষ্কার করে নিতে চান। দৃঢ় গলায় কমলা বললেন—ঠিক আছে, আপনি মেয়েকে নিয়েই যান।

মেয়েব বাপের গলা বেশি চড়তে নেই। মহাদেব এমনিতেও ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। একইরকম মৃদু গলায় তিনি বললেন—পনেরো দিন পরে আমি নিজে এসে দিয়ে যাবো।

—বেশ, দিয়ে যাবেন।

জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে মহাদেব জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কোনো অমত নেই তো?

অর্জুন কোনো জবাব না দিয়ে একমনে খবরের কাগজ পড়ে যেতে লাগল।

কমলা বললেন—আমি সামনে বসে আছি তা সত্ত্বেও ওকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? ওর কি আলাদা মত থাকবে আশা করেন? এ বাড়ির তেমন রেওয়াজ নয়—

মহাদেব মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে আস্তে আস্তে বললেন—বেয়ানঠাকরুণ, একটা কথা আপনাকে বলি। আমার ওই একমাত্র মেয়ে, ওর মাও বেঁচে নেই। আমার জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত শ্বশুরবাড়িতে কিভাবে সকলকে খুশি করে চলতে হবে সে শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। যদি ওর কোনো ত্রুটি ঘটে থাকে তবে সে দায়িত্ব আমার। ধরে নিতে হবে সংসারে চলার শিক্ষা আমি ঠিকভাবে দিতে পারিনি। ওর মা থাকলে হয়তো পারতেন। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে আপনারা বোধহয় সম্পূর্ণ সুখী নন। সে দোষ সবটাই আমার। নিজের মেয়ে ভেবে ওকে আপনারা ক্ষমা করুন, আপনি নিজের মত করে ওকে আপনাদের যোগ্য করে নিন।

মেয়ের বিয়ের পর কড়াপ্রকৃতির বেয়ানের সঙ্গে মহাদেব এতগুলো কথা কখনো

একসঙ্গে বলেন নি। এখন মরীয়া হয়ে বলে ফেলে মনে মনে হাঁপাতে লাগলেন।

অর্জুন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কাগজটা চার ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে বলল—মা, আমার খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করো, আমার বেরুবার সময় হয়েছে—

চেয়ারের পেছনে রাখা তোয়ালেটা তুলে নিয়ে সে বাথরুমে ঢুকে গেল।

কমলা মহাদেবের চোখে চোখ রেখে বললেন—এতদিন একটা আড়াল ছিল, ভালই হল আজ আপনি স্পষ্ট কথা বললেন। তবে ওসব খেলো, বানানো কথা শুনে আমার কোনো লাভ নেই। আমার সংসার করতে হয় আপনার মেয়েকে নিয়ে, আপনাকে নিয়ে নয়। প্রত্যেক দোষত্রুটির জন্যে আমি কি আপনাকে গিয়ে ধরবো? হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা হল—আমরা আপনার মেয়েকে নিয়ে সুখী নই। সে অত্যন্ত মুখরা আর জেদী। স্বভাবে কোনো সৌন্দর্য নেই। তবে ভয় পাবেন না, পুত্রবধূকে আমরা ত্যাগ করবো না। আমাদেব পরিবারের একটা নাম আছে, মর্যাদা আছে। কোনো কেলেঙ্কাবীর মধ্যে আমরা যাবো না। কিন্তু ওই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু আশা করবেন না।

মহাদেব তিরস্কৃত ছাত্রের মত মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

কমলা আবার বললেন—আর একটা কথা, এসব ক্ষেত্রে একটা সহজ উপায়ে মেয়ের বাবা-মা গোলমাল মেটাবার চেষ্টা করে থাকেন। অর্থাৎ পরামর্শ দিয়ে জামাইকে পরিবার থেকে আলাদা করে দেন। সে চেষ্টা করবেন না। আমার ছেলে তেমন নয় তা নিশ্চয় এতদিনে বুঝেছেন।

মহাদেব বুঝেছেন বইকি, মর্মে মর্মে বুঝেছেন।

ঘবে ফিরে এসে মহাদেব সুটকেসে নিজেব জামাকাঁপড়, নোটবই, তোয়ালে ইত্যাদি গুছিয়ে নিতে লাগলেন। বাইরে যাবার পোশাক পরে নিলেন একেবারে। এঘরে দেয়ালে আঁটা আয়না আছে একটা, কিন্তু কোথাও কোনো চিরুনি নেই। নিজের পকেট থেকে ছোট চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নিলেন। চিরুনিটা আবার পকেটে রাখতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

স্ত্রী মারা যাবার মাসখানেক পরে একদিন তিনি স্ত্রীর ব্যবহার করা সব জিনিস গুছিয়ে তুলে রাখছিলেন। মেয়ের সামনে লজ্জা করে। একমাস পরে সেদিনই বত্না প্রথম কলেজে গিয়েছে। সান্ত্বনা জানাতে আসা আত্মীয়দের সংখ্যাও সময়ের ব্যবধানে কমে এসেছে। সেদিনই মেয়ে কলেজে যাবার পর মহাদেব উপলব্ধি করতে পারলেন বাড়িটা প্রকৃতপক্ষে কতখানি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। সবসময় যে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করতেন তেমন নয়, কিন্তু কাছাকাছি থাকা, দু-একটা যৌথ গৃহকর্ম, কেবলমাত্র সান্নিধ্যের উষ্ণতা এক প্রায়-অলৌকিক ভালবাসার জন্ম দেয়। এতদিন লোকজনের ভিড়ে মহাদেব তেমন করে ব্যক্তিগত শোকপালনের সুযোগ পাননি। হঠাৎই তাঁর মন কেমন করে উঠল। বড় সত্য করে বুঝতে পারলেন—আর কোনোদিন না, আর কখনো না। কিন্তু এই বাড়ির আবহে, এই বাড়ির সমস্ত পরিমণ্ডলে একটি অপরিহার্য ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়ে গিয়েছে। সেটি স্মরণ করে সারাজীবন তাঁকে দুঃখ পেতে হবে।

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতেই ঘটনাটা ঘটল।

শোবার ঘরে আয়নার নিচে লম্বা দু-খানা টানা ড্রয়ার রয়েছে। তার মধ্যে টুকিটাকি নানান জিনিস। চুল বাঁধবার কালো ফিতে, কাঁটা, আধশিশি আলতা, সিঁদুর পরবার রুপোর কাঠি, শাড়ির পাড় দিয়ে বাঁধা এক বাণ্ডিল পুরনো চিঠি, একটা পুরনো শিস্‌ভাঙা

টু-বি পেনসিল—বোধহয় রত্নার ছোটবেলার। আর এসবের মধ্যে—

এসবের মধ্যে একখানা চিরুনি। তখনো তাতে কিছু চুল জড়িয়ে আছে।

শ্যামার প্রিয় মোষের শিঙের চিরুনি। পুরু, এবড়োখেবড়ো দেখতে। তার ওপরে হাতে খোদাই করা লতাপাতা, ফল। এমন সেকেলে ধরনের জিনিস আজকাল আর কেউ ব্যবহার করতে চায় না। ছাঁচে ফেলা রঙীন সেলুলয়েডের কত আধুনিক ডিজাইনের জিনিস বাজারে চালু হয়েছে। কিন্তু এই চিরুনিটার হাতে-গড়া অভিজাত চেহারা শ্যামার পছন্দ ছিল। হাসপাতালে যাবার আগে শেষবারের মত চুল আঁচড়ে এইখানে রেখে গিয়েছিলেন।

নাকের কাছে এনে নিঃশ্বাস নিলে এখনো যেন সেই চিরদিনের চেনা গন্ধ পাওয়া যায়। জানালার বাইরে পরশপিপুল গাছের পাতায় পাতায় দুপুরের বাতাসে উদাস মর্মরশব্দ বাজে। চিরুনির গায়ে প্রায় মিলিয়ে আসা মাথার তেলের গন্ধে একটা কিছু চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা মাখানো। বুক হু-হু করে।

একটা পলিথিনের প্যাকেটে চুলসুদ্ধ চিরুনিখানা যত্ন করে ভরে ড্রয়ারের একদম ভেতরে রেখে দিলেন মহাদেব। থাক ওইখানে। কেউ জানবে না, মাঝে মাঝে তিনি শুধু বের করে দেখবেন।

শ্যামা থাকলে তাঁকে মেয়ের জন্য এতটা ভাবতে হত না। যে কোনো সমস্যা সমব্যথীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে আর তত বেদনাদায়ক বলে মনে হয় না।

রত্না ঘরে ঢুকে বলল—এ কি, তোমার সব গোছানো হয়ে গেল! আমি ভাবলাম আমিই তোমারটা গুছিয়ে দেব—

—আমার আর গোছানোর আছেটা কি—ও হয়ে গিয়েছে। চল, তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক—

—খেয়ে যাবে না?

মহাদেব যেন বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। —না না, সে খুব দেরি হয়ে যাবে। এগারোটার ট্রেনটা আমরা ধরে নিই চল, বর্ধমান স্টেশনে তো ট্রেন বদল করতেই হবে—ওখানকার রিফ্রেশমেন্ট রুমে খেয়ে নেব এখন। সে বেশ মজা হবে, বল? কেমন একসঙ্গে বসে হোটেলে খাওয়া—

রত্না একমুহূর্ত বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে বলল—আচ্ছা?

কমলাও বেয়াইয়ের খাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। ঘরের সামনে সরু বারান্দায় চেয়ার নিয়ে মহাদেব শান্ত হয়ে বসে রইলেন। তিনি প্রস্তুত, সময় হলেই বেরিয়ে পড়া যাবে। শ্যামার মৃত্যুর পর থেকে একটা বোধ একটু একটু করে তাঁর বুকের ভেতরে জেগে উঠেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন মৃত্যুই পরম সত্য, শেষ কথা। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-অসাফল্য, অশ্রু অথবা হাসি শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কাছে নতজানু হয়। সেখানে চরম বিচারে শোক আর আনন্দ, ঐশ্বর্য অথবা দারিদ্র্য, খ্যাতি কিম্বা অবহেলা তুল্যমূল্য। জীবনের সামান্য পরিসরে শান্ত আনন্দ, উপভোগেই যেটুকু সার্থকতা। নতুন কথা কিছু নয়, বহু যুগ ধরে বহু মনীষী বলে আসছেন, কিন্তু নিজের জীবন থেকে উঠে আসা বেদনার রসে জারিত না হলে কোনো সত্যকেই সঠিকভাবে স্পর্শ করা যায় না।

অর্জুন এসে দাঁড়াল। তার সম্ভবত খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কারণ সে মশলা চিবোচ্ছে। আস্তিনের বোতাম আঁটতে আঁটতে সে বলল—আমি বেরুচ্ছি। শুনলাম আপনি এগারোটার ট্রেনে যাবেন।

কোনো প্রশ্ন নয়, আবেগহীন এক বিবৃতি মাত্র।

মহাদেব বললেন—হ্যাঁ, ওই ট্রেনটা ধরলে বর্ধমান থেকে কানেকশান পেতে সুবিধে হয়। তা, তুমি দিন পনেরো বাদে গিয়ে রত্নাকে নিয়ে এসো না কেন? অনেকদিন যাও নি—

রুমালের খুঁট দিয়ে চোখের কোল পরিষ্কার করতে করতে অর্জুন বলল—আমার এখন ছুটি পাবার উপায় নেই। আমি যেতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাদেব বললেন—ওঃ। ঠিক আছে, আমিই দিয়ে যাবো—

আর কিছু না বলে অর্জুন বেরিয়ে চলে গেল। মহাদেব দেখে দুঃখিত হলেন যে, জামাই তাঁকে প্রণাম করে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

পৌনে দশটার সময় রত্না বারান্দায় এল। তার মুখে খুব হাল্‌কা প্রসাধন। সে বলল—চল বাবা, বেরিয়ে পড়ি—

—এখনই কি রে। স্টেশন তো মাত্র পনেরো মিনিটের পথ। এত আগে—

—আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। তুমি স্টেশনে চলে গিয়ে টিকিট কেটে অপেক্ষা কোরো, আমি পৌনে এগারোটার ভেতর পৌঁছে যাবো।

মহাদেব একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না। এই শহরে কে এমন বন্ধু আছে মেয়ের যার সঙ্গে দেখা না করে গেলেই নয়?

একটা লম্বা কোরালাইট ব্যাগে নিজের জিনিসপত্র নিয়েছে রত্না। হাতে একটা কারুকার্য করা শান্তিনিকেতনী চামড়ার ব্যাগ। নিজের ছোট সুটকেস আর মেয়ের ব্যাগ হাতে নিলেন মহাদেব। রত্না বলল—এতটা বইবে কেন? একটা রিক্‌শা ডেকে আনলে পারতে। তুমি বোসো, আমি মঙ্গলার মাকে বরং বলি—

—কিচ্ছু দরকার নেই। গলির মোড় থেকে রিকসা নেব এখন।

বেরুবার সময় কমলা দরজা অবধি এলেন বটে, কিন্তু বেয়াইকে কোনো বিদায় সম্ভাষণ জানালেন না। একটা কেবল শুকনো নমস্কার করলেন মাত্র। তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন রত্না ও মহাদেবের হাতে কি কি জিনিস আছে। রত্না প্রণাম করতে তিনি আশীর্বাদ করে কাষ্ঠপুত্তলীবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

গলির মোড়েই রিকসা পাওয়া গেল। চকবাজার অবধি এসে নেমে পড়ল রত্না, বলল—তুমি যাও, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি। আপ প্ল্যাটফর্মে চলে যেও—

টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন মহাদেব। খুবই বিদগ্ধ অবস্থার মধ্যে দিয়ে মেয়েকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু তবু একটু আনন্দ হচ্ছেই। অন্তত কয়েকটা দিন মেয়েকে নিজের কাছে আদরে রাখতে পারবেন। আহা, কোনোদিন তিনি ওকে বকেন নি—বকবার দরকারই হয়নি। ছোটবেলা থেকেই ভারি শান্ত আর বুদ্ধিমতী মেয়ে রত্না। তাঁর অত আদরের মেয়েকে এরা কত কষ্টই না দিচ্ছে। এরা পাপী, ভীষণ পাপী।

কিন্তু এগারোটা বাজতে দশ হয়ে গেল যে। রত্না এসে পৌঁছল না কেন? ট্রেন ঠিক সময়ে আসছে। আর দেরি হলে গাড়ি ফেল হয়ে যাবে।

এগারোটা বাজতে দুই। প্ল্যাটফর্মের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে গাড়ি আসার ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। মহাদেব ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ওই যে আসছে রত্না। বুকের কাছে ব্যাগটা ধরা। মুখে ঘাম। সেও এদিক ওদিক তাকিয়ে বাবাকে খুঁজছে। মহাদেবকে দেখতে পেয়ে সে দ্রুত পায়ে কাছে এল।

—ইস, একটু হলেই যে ট্রেন ফেল করতাম। এত দেরি করলি কেন?

—কি করব বল, বড্ড ভিড় ছিল যে—

কথাটা বলেই রত্না একটু চকিত হয়ে উঠল। হঠাৎ বেফাঁস বললে যেমন হয়।

মহাদেব অবাক হয়ে বললেন—ভিড়? কিসের ভিড়? কোথায় গিয়েছিলি তুই?

সামলে নিয়ে রত্না বলল—বন্ধুর বাড়িতে সব আত্মীয়রা এসেছেন কিনা। ওকে আলাদা করে কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। চল চল, ট্রেন ঢুকছে—

বিকেলবেলা ক্লান্তদেহে তালা খুলে বাড়ি ঢুকলেন মহাদেব। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। সমস্ত অবহেলা, অপমান আর অনাদরের শেষে নিজের গৃহে ফিরে আসার তৃপ্তি। রত্নাও ছেলেমানুষের মত খুশি। সব ঘর বারান্দা ঘুরে ঘুরে দেখছে—যেন নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ। নিজের ঘর কতদিন বাদে খুলল রত্না। জিনিসপত্র রেখে মহাদেবের ঘরে এসে বলল—বাবা, তুমি আগে বাথরুমে যাবে না, আমি যাবো? স্নান করবে তো?

—স্নান করবো। তুই আগে যা, আমি একটু জিরিয়ে নিই—

—বাড়িঘর কি হয়ে আছে, হরিদাসী বুঝি দেখে না? দাঁড়াও, কাল থেকে আমি হাত লাগাবো, পরশুর মধ্যে সব তকতক করবে—

বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে জল পড়ার শব্দ আরম্ভ হতে মহাদেব চোরের মত পা টিপে টিপে মেয়ের ঘরে এলেন। কাজটা অন্যায়, খুব অন্যায়। রত্না তাঁর নিজের মেয়ে হতে পারে, কিন্তু তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দেবার অধিকার মহাদেবের নেই। তবু বাপের মন তো মানে না।

বিছানার ওপর বসানো রয়েছে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু ইতস্তত করার পর মন স্থির করে ব্যাগটা কাছে টেনে আনলেন। বেশ ভারি লাগল। কেবলমাত্র লিপস্টিক, পাউডার পাফ, রুমাল আর খুচরো টাকা-পয়সার কি এত ওজন হয়? সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে চেন টেনে ব্যাগটা খুলে ফেললেন মহাদেব।

একরাশ সোনার গয়না ব্যাগের ভেতর! হার, নেকলেস, চিক, ইয়ারিং—কত! এমন কি নিজের সখের রতনচূড় মেয়েকে দিয়ে দিয়েছিলেন শ্যামা, সেটাও রয়েছে। কতদিন জিনিসটা মহাদেব দেখেন নি।

কোনো বন্ধুর বাড়ি নয়, আসলে ব্যাঙ্কে গিয়েছিল রত্না—লকার থেকে গয়নাগুলো বের করে আনতে। কিন্তু কেন? ও কি তাহলে আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে চায় না? নাকি ধরে নিয়েছে সেখানে আর ফিরে যাওয়া যাবে না? গয়নার অধিকার মেয়েদের নিরাপত্তার বোধ এনে দেয়। তাই হয়তো সঙ্গে এনেছে—যদি তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে একেবারে অসহায় হয়ে পড়তে হবে না। কে জানে কোনটা ঠিক, কিন্তু খোলা ব্যাগের ভেতর গয়নাগুলোর দৃশ্য মহাদেবকে ভয় পাইয়ে দিল।

বাথরুমে জলের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। মহাদেব দ্রুত ব্যাগের চেন বন্ধ করে ঠিক আগের মত বসিয়ে রেখে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

সূর্য অস্ত গিয়েছে কিছুক্ষণ! স্নিগ্ধ, ঝিরঝিরে বাতাস দিতে শুরু করেছে। পরশপিপুলের পাতায় ফিসফিস শব্দ। কে যেন তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে চায়। ভাল করে শোনবার জন্য কান পাতলেন মহাদেব।

রান্নাঘরে খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছে রত্না।

নাঃ, এতে চিন্তার কি আছে? না হয় রত্না সত্যিই আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে না। তাতেই বা কি এসে যায়? প্রতিদিন অপমানের মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া বরং ভাল। তাঁর যা কিছু আছে সব তো রত্নাই পাবে। আর—মানে এখনো তেমন কিছু জড়িয়ে পড়েনি রত্না। ফিরে না গেলেও চলে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করার কথাও নিতান্ত স্বপ্ন নয়! আজকাল তো কত উদার ছেলে দেখা যায়, কতরকম বিজ্ঞাপন বের হয় খবরের কাগজে। একবার লড়ে দেখবেন তিনি, এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন না।

চা হাতে যখন ঘরে ঢুকলো রত্না তখনো মহাদেব জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—তুমি এখনো স্নান করো নি? আচ্ছা, আগে চা খেয়ে নাও। এসো, বোসো। কাল থেকে আর অনিয়ম চলবে না। দেখো কেমন শাসনে রাখি।

কেমন ভাল তাঁর মেয়েটা! ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পাপী, ভীষণ পাপী।

চা খেতে খেতে রত্না একবার বাপের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল—তোমার বোধহয় আমার শাশুড়ির ব্যবহার একটু খারাপ লেগেছে, তাই না বাবা? উনি কিন্তু আসলে লোক খারাপ নন, বাইরের ব্যবহারটা ওইরকম। আমাকে তো খুবই স্নেহ করেন। মানে মিষ্টি কথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারেন না—

মহাদেব বললেন—জানি তো।

—তোমার জামাইও মানুষ ভাল। ওই মায়ের ধারাটা পেয়েছে আর কি। কথা বলতে পারে না—

চোখে জল আসছিল মহাদেবের। সামলে নিয়ে বললেন—সেও জানি মা—

রাত্তিরে মেয়ের হাতে তৈরি রুটি, অড়হর ডাল আর ঢেঁড়সের তরকারি পেটভরে খেলেন মহাদেব। হরিদাসীর দায়সারা রান্না খেয়ে খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। এবার কিছুদিন তিনি ভাল থাকবেন।

খাওয়ার পর অভ্যেসমত বাড়ির সামনে নির্জন রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন মহাদেব। সব যেমন মনে হচ্ছে সেই পুরনো দিনের মতই, কিচ্ছু বদলায় নি। এক্ষুনি যেন বারান্দার গ্রিলের কাছে এসে শ্যামা ডাকবেন—কত রাত হল বল দেখি? আজ ঘুমোবে না?

বাইরে থেকে সব ঠিক আছে মনে হলেও ভেতরে সব বিগড়ে গিয়েছে। আসল কলই বেকল।

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে বমির শব্দ পেলেন মহাদেব।

আধো ভেজানো জানালার পাল্লার আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সর্বনাশকারী দৃশ্যটা দেখলেন।

ডাইনিং স্পেসের কোণে একহাতে বেসিনের ধার অন্যহাতে বুক চেপে ধরে বমি করছে রত্না।

নিঃশব্দে আবার রাস্তায় ফিরে গেলেন মহাদেব। এক, দুই, তিন, চার নম্বর ল্যাম্পপোস্ট ছাড়িয়ে চলে গেলেন। পেছন ফিরলেন। চার, তিন, দুই, এক।

তিনি ভুল বুঝেছিলেন। রত্না জড়িয়ে পড়েছে, ভয়ানক জড়িয়ে পড়েছে। তাকে ফিরে যেতেই হবে।

এক, দুই, তিন, চার।

নাঃ, এসব কেন ভাবছেন তিনি? একটা মানুষের জীবন কি ফালতু? অনেক লড়াই বাকি আছে। তিনি শান্ত লোক, গোলমাল পছন্দ করেন না। তবু লড়ে যাবেন, মেয়েকেও লড়তে শেখাবেন।

চার, তিন, দুই, এক।

সেদিন অনেক রাত্তিরে যখন সবে ঘুম এসেছে, তক্ষুনি মহাদেব টের পেলেন কোথা দিয়ে একটা পাজি মশা ঢুকে পড়েছে মশারীতে।

সারারাত ব্যর্থ আক্রোশে শূন্য খামচে ধরার চেষ্টা করে চললেন মহাদেব।

যুদ্ধ

সম্পাদক বললেন—লেখা রেখে যান, আমাদের নির্বাচকমণ্ডলী আছেন, তাঁরা পড়ে যে ব্যবস্থা নেবেন তাই গ্রহণ করা হবে।

তরুণ ছেলেটি বসেছিল সম্পাদকের উল্টোদিকের চেয়ারে। নতুন লেখকরা যেমন বিনত ভঙ্গিতে ঢোকে, কথা বলে, এ ঠিক তা নয়। এ যেন দাবি আদায় করতে এসেছে। ভদ্র, কিন্তু দৃঢ়, বুঝে নিতে জানে। ছেলেটির পরনে আধময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পায়জামা, পায়ে ববারের সস্তা চটি, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা। গালে দু-তিনদিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শ্যামবর্ণ, শীর্ণ চেহারা। কিন্তু অভিজ্ঞ সম্পাদক ছেলেটির চোখ দেখে সতর্ক হলেন। তীব্র, অন্তর্ভেদী, আপোসহীন দৃষ্টি সে চোখে। একে নিয়ে খেলা করা চলবে না। সাধারণ কৃপাপ্রার্থীদের মত সহজে বিদায় দেওয়াও যাবে না।

ছেলেটি বলল—আমি গল্পের সঙ্গে একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও রেখে যেতে চাই, যে ধরনের উপন্যাস আপনারা ধারাবাহিক প্রকাশ করে থাকেন।

সম্পাদক বললেন—আমরা যে ধরনের ধারাবাহিক ছাপি, আপনার লেখা সেই মানের হয়েছে সেটা কি আপনি ধরে নিচ্ছেন?

—নিশ্চয়। নইলে আপনার কাছে আসতাম? এত কষ্ট করে?

—কষ্ট করে? কোথায় থাকেন আপনি?

—আমি থাকি মেদিনীপুরের এক গ্রামে। নাম বললে কি চিনবেন? আমার গ্রামের নাম হরিশচন্দ্রপুর। রাত চারটেয় বেরিয়েছি। তিন মাইল হেঁটে এসে বাস ধরেছি, দিনের প্রথম বাস। বাসে করে বেলদা, বেলদা থেকে বাস বদলে খড়্গপুর। সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া। হোটেলে খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছি।

—হাঁটতে হাঁটতে!

ছেলেটি হাসলো। বললো—আপনারা শহরের লোক, পায়ে হাঁটাকে একটা খুব বড় ব্যাপার বলে মনে করেন। হাওড়া স্টেশন থেকে আপনাদের দপ্তর কত দূরই বা? আড়াই কি তিন কিলোমিটার হবে। এটুকু হাঁটতে আমাদের কষ্ট হয় না।

সম্পাদক একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বুঝলাম। কিন্তু উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তো আমরা রাখতে পারবো না ভাই। আপনি শুধু গল্পটাই রেখে যান।

—কেন? উপন্যাস রাখবেন না কেন?

—গল্প যে কেউ জমা দিতে পারে, কিন্তু উপন্যাস আমরা লেখকের কাছ থেকে নিজেরাই চেয়ে নিই।

—কোন লেখকের কাছ থেকে?

সম্পাদক একটু বিরক্ত বোধ করছিলেন। নিচে রিসেপশন ডেস্কের লোকেরা আজকাল আর মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। যে কেউ হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। গ্রামাগত এই ধরনের সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত লোকেদের তিনি চেনেন।

এরা প্রচুর লেখে, বাজে লেখে, অথচ উদ্ধত এবং রাগী। সহজে এদের বিদায়ও করা যায় না।

সম্পাদক বললেন—প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছ থেকে নিই। যাঁরা ভাল লেখেন তাঁদের কাছ থেকে নিই।

ছেলেটি সোজা হয়ে বসলো। তার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলো। সে বললো—আপনি বলতে চাইছেন প্রতিষ্ঠিত বা নামকরা লেখকরা ছাড়া আর কেউ ভাল লিখতে পারেন না? বাইরে থেকে লেখা না নিলে আপনারা নতুন সাহিত্যিক খুঁজে পাবেন কি করে? সম্পাদক হিসাবে এটা তো আপনার দায়িত্ব।

—বুঝলাম ভাই। কিন্তু কাগজটাকে বাঁচিয়ে রাখাও তো সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে, তাই না? বড় কাগজের একটা ব্যবসায়িক দিক থাকে। যাঁরা খ্যাতনামা তাঁদের লেখা ছাপলে কাগজের কাট্‌তি ঠিক থাকবে। নতুন লেখকের একটি ধারাবাহিক উপন্যাস হঠাৎ শুরু করলে পত্রিকার বিক্রি যদি ঝপ্ করে অর্ধেক হয়ে যায়, তাহলে মালিকের কাছে আমি কী কৈফিয়ৎ দেব?

ছেলেটি বিস্মিত, স্তম্ভিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো—তাহলে এভাবেই চলবে? এত বড় দেশ, এত লোক লিখছে, তাদের মধ্যে থেকে নতুন কেউ উঠে আসবে না? প্রতিষ্ঠিতরা তো বয়স্ক হচ্ছেন, এরপর সেই শূন্যতা ভরাট করবেন কি দিয়ে? পত্রিকা তুলে দেবেন?

সম্পাদক বললেন—কফি খাবেন?

তাঁর ঘরে বসে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ পেলে নবীন লেখকরা সেটাকে বিশেষ সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করে। এই ছেলেটি কিন্তু খুব সহজভাবেই বললো—কফি তো আমি খাই না, চা হবে?

সম্পাদক একটু অবাক হলেন, হাসিও পেল। কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললেন—একটা কফি আর একটা চা আনো।

ছেলেটি আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললো—জর্জ বার্নার্ড শ-এর কথা জানেন তো? আমার মত বয়সে তিনিও নিজের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সম্পাদক আর প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরতেন। প্রথমদিকে তাঁর লেখাও কেউ ছাপতে রাজি হয়নি। কুড়ি-বাইশটা পত্রিকা আর প্রকাশন সংস্থা থেকে তাঁর পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছিল। তারপরে তিনি কত বড় হয়েছিলেন ভাবুন তো? নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। কাউকে তুচ্ছ করতে নেই—

সম্পাদক ছেলেটিকে পাকাপাকিভাবে গ্রামাগত বাতুলের পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন। এখন একে না চটিয়ে যতদূর সম্ভব মিষ্টি কথায় বিদায় করতে পারাই ভাল।

সম্পাদক ভদ্র, শান্ত গলায় বললেন—তা অবশ্য ঠিকই। একদিন যে আপনিই দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক হবেন না, নোবেল প্রাইজ পাবেন না, সেকথা কে বলতে পারে?

ছেলেটির দৃষ্টি আবার তীব্র হয়ে উঠলো। সে বললো—আপনি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন?

পাগল চটানো স্বীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক। ত্রস্ত হয়ে সম্পাদক বললেন—না না, তা কেন! এ তো হতেই পারে।

চা এবং কফি এসে গিয়েছিল। ছেলেটি সপ্রতিভভাবে চায়ের কাপ টেনে নিয়ে চুমুক দিল। অতঃপর আর কিছুক্ষণ কথা নেই। সম্পাদক কফিতে চুমুক দিতে দিতে ছেলেটির ঈষৎ বসা গলা, দাড়ি এবং অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল দেখছিলেন। ছেলেটি হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতেই তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সম্পাদক চোখ নামিয়ে নিলেন।

ছেলেটি চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে ছোট্ট করে হাসলো। তারপর ব্যাগ থেকে রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় আড়াইশো পাতার সুতো দিয়ে সেলাই করা একটি পাণ্ডুলিপি এবং দশ-বারো পাতার একটি ছোটগল্প বের করে সম্পাদকের সামনে রাখলো। চৌকো স্টিলের ভারী পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে চাপা দিল লেখা দুটি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললো—দুটো লেখাই রেখে গেলাম। দু'মাস কি তিন মাস পরে আমি আবার আসবো। আজকে আমি প্রার্থী আর আপনি টেবিলের সুবিধাজনক দিকে বসে থেকে আমাকে করুণা করছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুনে রাখুন—খুবই দৃঢ় বিশ্বাস—একদিন আমার উপন্যাস চেয়ে আপনার সই-করা চিঠি আমার বাড়িতে যাবে। কিন্তু সেজন্য আমার এই পাণ্ডুলিপিটি আপনার পড়া দরকার। আচ্ছা, নমস্কার—

তরুণ লেখক বেবিয়ে এল বাইরে। লিফ্‌ট সে ব্যবহার করতে জানে না। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে একতলা, তারপর কাচের দরজা ঠেলে বাইরে। দশ-বারো পা হেঁটে এসে সে পেছন ফিরে একবার পত্রিকা দপ্তরের বাড়িটির দিকে তাকালো। প্রতিটি জানালায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। প্রায় সব ঘরের থেকে বড় লোহার ট্রাঙ্কের আধখানার মত বেরিয়ে আছে এয়ারকুলার মেশিন। সমস্ত বাড়িটা প্রতিরোধ, নিষেধ, উপেক্ষা আর ঔদ্ধত্যের প্রতীক। মেদিনীপুরের সুদূর গ্রাম থেকে রাত চারটের সময় উঠে কঠিন পথশ্রম স্বীকার করে আসা তরুণ লেখকটি সমান প্রতিরোধ চোখে নিয়ে বাড়িটির দিকে তাকালো। মনে মনে বললো—তোমাকে আমি জিতে নেবো, নেবোই—

তারপর সে জনারণ্যে মিশে গিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো ফেরার পথে। আবার সে আসবে। বারবার আঘাত করে একদিন জিতে নেবে এই দুর্গ।

হাওড়া স্টেশনে ঢোকার মুখে ফুটপাথের দোকান থেকে পাঁচসিকে দিয়ে সে আর একটি কলম কিনলো। হাতিয়ার না হলে কী যুদ্ধ হয়?

মানুষ

অতিমাত্রিক শূন্য থেকে মহাকাশযানটি বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলার জঙ্গলাবৃত এক ভূভাগের ওপর সাধারণ ত্রিমাত্রিক শূন্যে ফুটে উঠল।

বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে আসছে এর চালকেরা। মানুষের ভাষার নিরিখে তাদের ঠিক প্রাণী বলা চলে কী না কে জানে। কারণ তারা কখনো আকৃতিহীন বস্তুপিণ্ড, প্রয়োজনমত প্রত্যঙ্গ তৈরি করে নেয়, কখনো বা বিক্ষুব্ধ শক্তির আয়তনহীন প্রকাশ। তবে কোনো গ্রহে নামবার সময় তারা বস্তুপিণ্ড হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে, তাতে কাজের সুবিধে হয়। আর এখানে তো তারা কাজ করতেই এসেছে।

এই ছায়াপথ নীহারিকারই কেন্দ্রীয় অংশের এক নক্ষত্রের চারপাশে ঘোরা গ্রহজগৎ

থেকে যানটি এসেছে। পৃথিবী থেকে এই অংশটি ভাল দেখা যায় না। ঘন বস্তুপুঞ্জ এবং অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশে ছায়াপথের এই অংশ দুর্নিরীক্ষ্য। পৃথিবীকে যখন প্রাচীন ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ চলছে, ট্রাইলোবাইটদের রাজত্ব, সেই দুশো কোটি বছর আগেই এ গ্রহজগতের প্রাণীরা পরমাণু শক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে। পঞ্চাশ কোটি বছর আগে তাদের শরীর বস্তু ও শক্তির উভয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। বস্তুবিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত রহস্য এই প্রাণীদের কাছে উদ্‌ঘাটিত। বর্তমানের তারা বেরিয়েছে পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডের সবগুলি প্রাণীজগতকে একত্র করে একটি মহাবিশ্ব-সঙ্ঘ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। যাতায়াত বিশেষ কোনো সমস্যা নয়, সাতটি বিশ্বমাত্রা এখন তাদের করায়ত্ত, প্রথম তিনটি বাদ দিয়ে বাকি চারটিতে তাদের অনায়াস গতিবিধি।

ত্রিমাত্রিক শূন্যে যানটি ফুটে উঠলো বটে, কিন্তু সেটি সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেল। কারণ আরোহীরা মানসিক শক্তির আবরণ দিয়ে যানটিকে অদৃশ্য করে রেখেছিল। কাজেই নিচের জঙ্গলে কোলবোংসা গ্রাম থেকে বটের আর সজারু শিকারের সন্ধানে আসা দুই আদিবাসী ভাই লক্ষ্মণ আর মাধব কারকাট্টা জানতেই পারলো না সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তাদের মাথার ওপরে দেড়শো ফিট্ উঁচুতে অপার্থিব যাত্রীদের নিয়ে ভাসছে এক বিচিত্র তারার জাহাজ। সজারু আজ তারা পায়নি, কিন্তু ফাঁদ আর আঠাকাঠি ব্যবহার কবে তাবা গোটাকয়েক বটের আর একটা বনমুরগী পেয়েছে। লক্ষ্মণ বললো, বোস্ মাধব, একটি বিড়ি খেয়ে নে। দুপুর থেকে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পায়ে খিল ধরে গিয়েছে।

মাধব বললো—আজ কদিন ধরে এ জঙ্গলে ভাল্লুকের উৎপাত বেড়েছে। চল্, একেবারে গ্রামে গিয়েই বিড়ি খাবো। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, গ্রামে ফিরে যাই।

লক্ষ্মণ শুনলো না, বললো—ধুৎ, তুই বড্ড ভিতু। আমরা দুজন আছি, ভাল্লুক কাছে ঘেঁষবে না। আয়, বোস।

অনেক ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার থেকে জগতের অনেক বড় বড় ঘটনার সূত্রপাত হয়ে থাকে। মাধব আর তার ভাই লক্ষ্মণ অরণ্যের মধ্যে এক আসন্ন সন্ধ্যায় বিড়ি খেতে না বসলে পৃথিবীর মানুষদের সঙ্গে গ্রহান্তরের প্রাণীদের প্রথম আন্তর্নাক্ষত্রিক যোগাযোগ হয়তো অন্যরকম ভাবে হত, এরপর থেকে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম ভাবে লেখা হত। কেউ জানতে পারলো না বটে, এমনকী লক্ষ্মণ আর মাধব নিজেরাও না, কিন্তু তারা দুভাই পৃথিবীকে ভয়ানক এক ভবিষ্যতের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলো।

ভূপৃষ্ঠ থেকে দেড়শো ফিট্ ওপরে ভেসে থাকা মহাকাশযানের ভেতরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে অধিকর্তা যানের সব আরোহীকে ডেকে পাঠালেন। বহুদিন ভ্রমণের পর অধিকর্তা একটি জীবজগৎসম্পন্ন গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। মানসিক উত্তেজনায় অধিকর্তার শরীর পর্যায়ক্রমে দ্রুত বস্তু থেকে শক্তি এবং শক্তি থেকে বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। অধিকর্তা বললেন—এই গ্রহটির বেশির ভাগই হল তরল জল। এটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে, কারণ তরল অবস্থায় জলের অবস্থিতি না থাকলে এখানে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হত না। আমরা তো দেখেই এলাম বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চলের জল হয় কঠিন অথবা বায়বীয় অবস্থায় রয়েছে। একবার মানসিক শক্তির প্রবাহ পাঠিয়ে সমস্ত গ্রহটির সংবাদও নিলাম এইমাত্র। এখানকার প্রাণীরা অভিব্যক্তির খুব সাধারণ স্তরে রয়েছে। বিদ্যুতের ব্যবহার শিখেছে মাত্র শ-দেড়েক বছর, মানে এদের গ্রহের আবর্তনের হিসেব অনুযায়ী দেড়শো বছর, আমাদের হিসেবমত তিয়াত্তর মহাজাগতিক প্রহর। পরমাণু শক্তির ব্যবহার

শিখেছে বছর পঞ্চাশেক। নিজেদের উপগ্রহ ও কাছাকাছি মহাশূন্যে কয়েকটি যান পাঠিয়েছে, এবং বিশ্বাস করবে, সে যান পাঠানো হয়েছে কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করে?

অধিকর্তার সামনে উপস্থিত আরোহীরা এমন আশ্চর্য কথা শুনে বিস্ময়ে সবুজ থেকে খয়েরি হয়ে গেল। তাদের নাসারন্ধ্র দিয়ে প্লাজমার শিখা বেরুতে দেখা গেল।

অধিকর্তা বললেন—জলে এবং ভূ-পৃষ্ঠে দু-জায়গাতেই এই গ্রহে প্রাণ আছে। তবে ভূমির ওপরে বসবাসকারী দ্বিপদ একধরনের প্রাণীরা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান, তারাই জ্ঞান ও সম্পদের অধিকারী। বাকি প্রাণীরা আমাদের বুদ্ধ্যঙ্ক সূচকের শেষধাপেরও নিচে। দ্বিপদ প্রাণীগুলি সম্বন্ধেই বা কী বলব। তারা কেবলমাত্র বস্তুশরীর ব্যবহার করে। শক্তিতে পরিবর্তিত হতে জানে না। তবে আমি মানসশক্তির ঢেউ পাঠিয়ে এই গ্রহের ভূতত্ত্ব এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে প্রাপ্তব্য প্রায় সব সংবাদই সংগ্রহ করেছি। এই দ্বিপদ প্রাণীদের ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল। এদের মস্তিষ্কের গঠন এবং ক্ষমতাও বিস্ময়কর, কিন্তু এরা তার শতকরা পাঁচ কী দশভাগের বেশী এখনো ব্যবহার করতে শেখেনি। উত্তর ভাদ্রপদ নীহারিকার নেতৃত্বে এই স্থানীয় জড়জগতের প্রত্যন্ত সমিতির আওতায় এই গ্রহকে নিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। তাতে আমাদের বিশ্ব-মহাসঙ্ঘ উপকৃত হবে।

অধিকর্তার নিচেই যাঁর স্থান, সেই মণ্ডল আধিকারিক বললেন—মানসপ্রবাহ আমিও পাঠিয়েছিলাম। আমাকে মার্জনা করবেন, এই দ্বিপদ প্রাণীদের ক্ষমতাকে খুব ছোট করে দেখা বোধ হয় বিপজ্জনক হবে। আমাদের চাইতে তুলনায় কম হলেও বিজ্ঞানচর্চায় এদের বেশ কিছুটা অধিকাব আছে। বিশ্বসঙ্ঘে যোগ দিতে বলা মাত্রই এদের প্রথম প্রশ্ন হবে—তাতে আমাদের কী লাভ?

অধিকর্তা বললেন—ভিন্ন গোত্রীয় প্রাণী সম্বন্ধে মানসপ্রবাহের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সর্বদা সঠিক হয় না। একটি বা দুটি দ্বিপদ প্রাণীকে সামগ্রিক পরীক্ষার জন্য আমাদের যানে ধরে আনা হোক। প্রথমে প্রশ্ন করে, তারপর যান্ত্রিক বিশ্লেষণে এদের মানসিক গঠন, সহনশীলতা এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা সবটাই আমরা জেনে নিতে পারবো।

মণ্ডল আধিকারিক বললেন—আর প্রতিরোধের ক্ষমতাব সূচক যদি খুব বেশি হয়, তাহলে?

অধিকর্তা বললেন—সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করবো। জ্ঞাত মহাবিশ্বের সমস্ত প্রাণীদের বিশ্বমহাসঙ্ঘের অধীনে আনা আমাদের কর্তব্য। কোন পন্থায় আমরা সেই কর্তব্য সম্পন্ন করেছি, তার জন্য কারো কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

মণ্ডল আধিকারিক বললেন—ভালও কথা। এই মুহূর্তে আমাদের যান যেখানে রয়েছে সেখানে জনপদ লঘু, ভূভাগ অরণ্যবৃত। আমাদের যানের ঠিক নিচেই দুটি দ্বিপদ প্রাণী এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছে।

—কী করছে তারা?

—ঠিক বলতে পারছি না। তবে দুজনেই মুখ দিয়ে ধূম নির্গত করছে।

—সে কী! এরাও উত্তেজিত হলে আমাদের মত প্লাজমা-শিখা ত্যাগ করে না কি?

মণ্ডল আধিকারিক বললেন—বোধ হয় নয়। ওই ধোঁয়ায় নিঃশেষিত শক্তির বর্জ্য রয়েছে, শক্তি নেই।

অধিকর্তা বললেন—ধরে আনো তাহলে। তুমি নিজে একজন সহকারীকে নিয়ে বস্তুপিণ্ড হিসাবে যাও। বিশুদ্ধ শক্তি হিসাবে গেলে বিভিন্ন গোলমাল হবে। হয় ওরা দেখতেই পাবেনা, নয়তো তোমাদের সংস্পর্শে ওদের বস্তুশরীর ধ্বংস হয়ে যাবে।

মাধবই প্রথমে দেখতে পেল গ্রহ্যন্তরের প্রাণীদেব। তার মুখ থেকে বিড়ি খসে পড়ল। অবাক বিস্ময়ে চোখ বর্তুলাকার হয়ে গেল। এ আবার কি? এরা কারা? মানুষ তো নয়ই, পৃথিবীব কোনো চেনা জীবন্ত কিছুর সঙ্গেই এদের মিল নেই। অথচ জীবন্ত নিশ্চয়, নইলে এভাবে এগুচ্ছে কি করে?

ভাইয়ের মুখে বিস্ময় আর ভয়ের চিহ্ন দেখে লক্ষ্মণ সোজা আর শক্ত হয়ে গেল। যারা অরণ্যে বাস করে, প্রকৃতি তাদের বাড়তি ক্ষমতা দেয়, নইলে তারা প্রাণরক্ষাই করতে পারত না। আঠাকাঠির গোছার সঙ্গে অর্জুনগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রাখা টাঙির হাতলটা মুঠো করে ধরল লক্ষ্মণ, তারপর একটানে উল্টোদিকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওই গতিকেই কাজে লাগিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে অস্ত্রটা ছুঁড়ল লক্ষ্মণ। এবং সেটা গিয়ে বিঁধল মণ্ডল আধিকারিকের বস্তু শরীরে। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটল যে, আধিকারিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবার সময় পেলেন না। তাঁর সহকারী পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য লক্ষ্মণের দিকে মৃদুশক্তির, কিন্তু সাময়িক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করার মত বিদ্যুৎশক্তি চালিত করলেন। লক্ষ্মণ মুখে কেমন একটা শব্দ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

মণ্ডল আধিকারিকের অবশ্য খুব বেশি ক্ষতি হয় নি। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা মত শরীরের আহত বস্তুপিণ্ড তৎক্ষণাৎ ঝরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, বাকী শরীর বিশুদ্ধ শক্তি হিসাবে প্রবাহ সৃষ্টি করে ফিরে গেল যানের নিরাপদ আবেষ্টনীতে। মাধব ততক্ষণে তার নির্ভীক ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়েছে। ক্রমশ এগিয়ে আসা অপর প্রাণীটির দিকে তাকাতে তাকাতে সে প্রায় অচৈতন্য ভাইকে কাঁধে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো। এমন সময় মণ্ডল আধিকারিকের সহকারীর কাছে অধিকর্তার মানসবার্তা পৌঁছাল—ফিরে এসো।

পৃথিবী, সূর্য, প্রক্সিমা সেনটারি সব আবার মিলিয়ে গিয়েছে মহাশূন্যের অতলস্পর্শী গভীরতায়। কিঞ্চিৎ বিমর্ষ মণ্ডল আধিকারিকের দিকে তাকিয়ে অধিকর্তা বললেন—না, এ গ্রহটি দখল করা যাবে না। যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যায় আমরা অনেক উন্নত। কিন্তু এদের চরিত্রে এমন একটা জিনিস আছে যা আমাদের নেই। খেয়াল করেছো, আহত লোকটির সঙ্গী পালিয়ে না গিয়ে সঙ্গীকে কাঁধে করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে চাইছিলো। আমরা হলে অকেজো সঙ্গীর দেহ তৎক্ষণাৎ শক্তিতে বিশ্লিষ্ট করে দিতাম। এরকম একতা থাকলে সে জাতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন। এই যে একের জন্য অপরের—কি যে বলে—এটা দেখিনি কোথাও।

মণ্ডল আধিকারিক বললেন—একের জন্য অপরের কি? জিনিসটা কি?

—কি জানি! আমাদের ভাষায় কোনো প্রতিশব্দ নেই। বলতে পারব না।

দূরত্ব

দেখে মনে না হলেও পিন্টু আর ভোম্বল এ পাড়ার সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে। দোতলার পাশাপাশি ফ্ল্যাটে তারা থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটুখানি চৌকো বারান্দা, সামনে কোমর পর্যন্ত উঁচু রেলিং। নিচের উঠোন থেকে কুয়োতলার গা ঘেঁষে তেতলার ছাদ অবধি ঠেলে উঠেছে এক বিশাল নিমগাছ। সকাল থেকে সন্ধে তার ডালে অজস্র পাখির চেঁচামেচি। মুখোমুখি দুই ফ্ল্যাট, মেঝে থেকে ফুটসাতেক উঁচু কাঠের পার্টিশন, তারপর চৌকো বারান্দা। ওদিকে আবার পার্টিশন। ছাদের নিচে তিনচার হাত ফাঁক, সেখান দিয়ে আলো-হাওয়া চলাচল করে, আবার হেঁকে কথা বললে ওদিকের ফ্ল্যাট থেকে শোনাও যায়।

দুটো ছেলেই রোগাপানা, শ্যামবর্ণ এবং বিশেষত্বহীন চেহারার অধিকারী, আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলে যেমন হয়। কিন্তু বাইরের প্রচ্ছদ দেখে যাঁরা এদের নিরীহ এবং নিরাপদ বলে ভুল করবেন, তাঁদের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে বিস্ময়ের চমক অপেক্ষা করে আছে। দুই বন্ধু সারাদিন নতুন নতুন খেলা উদ্ভাবন করায় ব্যস্ত থাকে। ভোম্বলদের গঙ্গা নামে একটা বিশাল চেহারার গরু আছে। সেই গরু আর তার বাছুর থাকে উঠোনের পূবকোণে একটা টালির ছাদওয়ালা চালায়। একদিন দুপুরে কেউ কোথাও নেই, করার মত কাজের অভাবে পৃথিবী ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, পিন্টু আর ভোম্বল ঠিক করল গঙ্গার জন্য যে দু-বস্তা বিচুলি আনা আছে তা উঠোনে ঢেলে পাহাড় বানিয়ে তার ওপর লাফিয়ে একটা মজার খেলা করা যেতে পারে। ইচ্ছাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে দেরি হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। অবিলম্বে খেলা শুরু হল।

বেলা গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদু-দিদিমারা (উভয় পক্ষেরই) ঘুম ভেঙে উঠতে আরম্ভ করলেন, বড়দের অফিস থেকে ফেরবার সময় হয়ে এল। নিচের উঠোনের অবস্থা দেখে সবারই চক্ষুস্থির! নিমগাছের গোড়া, কুয়োতলা, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি সর্বত্র কুচোনো বিচুলিতে ভর্তি। উঠোনের মাঝখানে একটি বড় স্তূপ, তার নিচে দুটো কি জিনিস নড়ছে! নড়া ধরে টেনে বের করেও প্রথমে কিছুক্ষণ মায়েরা নিজের নিজের ছেলেকে চিনে নিতে পারলেন না। খেলার পরিশ্রমে ঘাম হয়েছে, সারাগায়ে লেপটে আছে বিচুলির কুচি আর প্রচুর ধুলো। দুই ছেলেকে স্নান করিয়ে রাত বারোটা অবধি ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার পালা চলল।

ছাদে সন্ধ্যেবেলা মেয়েদের আসর বসে। পিন্টুর দিদিমার বাপের বাড়ির গ্রামে মাটির তলায় জমিদারদের গুপ্তকক্ষ থাকা থেকে আরম্ভ করে মহাভারতের পাতার মধ্যে পাকা চুল পাওয়ার সাম্প্রতিক হুজুগ অবধি নানা বিষয় আলোচিত হয়। কোনো কোনোদিন পিন্টুর বাবা গুরুদাসবাবু ভোম্বলের মামাদের নিয়ে ব্রিজ খেলতে বসেন। পিন্টুর বোনের অন্নপ্রাশনে ভোম্বলের দুই মামা কোমরে গামছা বেঁধে কাজের তদারক করেন, আবার ভোম্বলের দিদিমার হার্টের কষ্ট বাড়লে গুরুদাসবাবু সাইকেল নিয়ে ছোটেন ডাক্তার ডাকতে। দুই পরিবারে হৃদ্যতার অভাব নেই।

কেবল একদিন একটু অন্যরকম হয়ে গেল।

কোলকাতা শহরের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে তার দুধারে কয়েকটা ঘূর্ণিফলের গাছ

রয়েছে। কুলের বিচির আকারের ছোট ছোট ফলে গাছের তলা ভরে থাকে। ফলের দুদিক সামান্য ছুঁচলো। তার একটা দিক ইঁটের ওপর ঘসে নিলে জিনিসটা দেখতে ছোট্ট এতটুকু লাট্টুর মত হয়। তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে রেখে পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে বনবন করে ঘুরতে থাকে। পাড়ার ছেলেদের কাছে এ খেলনার খুব আদর। মাঝেমাঝে প্রতিযোগিতাও হয়। দুজন মুখোমুখি কোলের কাছে ঘূর্ণিফলের রাশি নিয়ে বসে। 'এক-দুই-তিন' বলামাত্র দুজনে একই সঙ্গে নিজের নিজের লাট্টু ঘুরিয়ে দেয়। যার লাট্টু আগে থামে সে হেরে গেল, অপর বিজয়ী পক্ষকে সে দুটো ঘূর্ণিফল দিতে বাধ্য থাকে। এই খেলায় প্রায়শই বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়।

পিন্টুর একটা দারুণ ঘূর্ণিফল আছে। অনেক ঘসে মেজে হিসেব করে সেটা তৈরি। সুলেখা রয়্যাল ব্লু কালিতে ভিজিয়ে নেওয়ায় তার চেহারাও দাঁড়িয়েছে খাসা। প্রতিযোগিতায় জেতবাব এমন অব্যর্থ উপায় আর নেই। পিন্টু এর নাম দিয়েছে নীলকান্তমণি। একবার ঘুরিয়ে দিলে সেটা ঘুরছে তো ঘুরছেই। সবার তীব্র ঈর্ষাভরা দৃষ্টির সামনে জিতে নেওয়া ঘূর্ণিফলে পকেট ফুলিয়ে পিন্টু বাড়ি যায়।

নীলকান্তমণি হাত করবার জন্য ভোম্বল অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। দাদুর কাছ থেকে পাওয়া রজার্স-এর ছুরিটা, বা ছোটমামার কলেজ জীবনের স্মৃতি বায়োলজি বাক্স থেকে সংগ্রহ করা আতসী কাঁচখানা ভোম্বল দিয়ে দিতে রাজি—কিন্তু পিন্টু অটল। না, কোনো মূল্যেই নয়। ছুরি বা আতসী কাঁচ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু নীলকান্তমণি একটাই আছে।

একদিন দুপুরে গুরুদাসবাবু করাত হাতুড়ি পেরেক ইত্যাদি নিয়ে পিন্টুর পড়ার টেবিলের পায়া মেরামত করছিলেন। মুখে একটা সিগারেট লাগানো, কিন্তু দেশলাই খুঁজে পাচ্ছেন না। সামনে ভোম্বলকে ডেকে বললেন—দেখ দেখি বসবার ঘরের ওপরের তাকে একটা দেশলাই আছে। নিয়ে আয় তো, সিগারেট ধরাতে পারছি না—

ওপরের তাকে কতগুলো খালি টনিকের শিশি, তার ফাঁকে হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতে দেশলাই পাওয়া গেল। এবং—

এবং পাওয়া গেল নীলকান্তমণি। হাতের ধাক্কায় একটা চিনেমাটির কাপ কাত হয়ে যাওয়ার পর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

ঠাকুরমার ঝুলির ভাষায়—ভোম্বলের বুক দুরদুর, মন তুরতুর। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে জিনিসটা নিয়ে পকেটে পুরে ফেলল।

তারপর সারাবেলা কি অশান্তি! গলা দিয়ে ভাত নামে না, পাটিগণিত খাতার নিচে 'রহস্যের জাঁতাকল' বলে যে বইটা লুকোনো আছে সেটা পড়তে ইচ্ছে করে না। চোরাই জিনিস সবার সামনে ব্যবহার করা বিপজ্জনক, অথচ নীলকান্তমণি নিয়ে খেলতে না পারলে সেটা অধিকার করার আনন্দ কোথায়?

বেলা তিনটে নাগাদ দুই পরিবার যখন ভাতঘুমে আচ্ছন্ন, পিন্টু ইস্কুলে, (আজ ভোম্বল জ্বরভাব হওয়ায় ইস্কুল যায়নি) সাড়ে-চারটের আগে তার ফেরবার সম্ভাবনা নেই, ভোম্বল আস্তে আস্তে ছাদে উঠে চিলেকোঠার ছায়ায় গিয়ে বসল।

দু-আঙুলে ঘুরিয়ে দিলেই নিটোল ছন্দে ঘুরে চলেছে নীলকান্তমণি। ভোম্বল মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। ছাদটা যেন আকাশ, আর ওটা একটা নীল তারা। সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় ঠিক পাওয়া যায় না।

অকস্মাৎ কানেব কাছে একটা হিংস্র গর্জন! বামাল সামলে উঠে দাঁড়াবাব সময় পেল না ভোম্বল, পিন্টু কখন উঠে এসেছে ছাদে—এবং যে দৃশ্য সে দেখেছে তার একটাই অর্থ হয়। পিন্টু আর একবার গর্জন করে লাফিয়ে পড়লো। যতই অপরাধ থাকুক, কেউ দাঁড়িয়ে মার খেতে রাজি হয় না। কাজেই—

ভোম্বল পিন্টুর চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

পিন্টুর ভোম্বলের একগোছা চুল উপড়ে নিল।

ভোম্বল একটানে পিন্টুর জামার সবকটা বোতাম ছিঁড়ে দিল।

পিন্টু ল্যাং মেরে ভোম্বলকে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভোম্বল পিন্টুর ঘাড়ে কামড়ে দিল।

রাগের মাথায় মানুষের দিশা থাকে না, কামড়টা একটু জোরেই হয়ে গেল। পিন্টু কাঁদতে কাঁদতে নেমে গেল নিচে, একটু বাদেই ভোম্বল।

মুখোমুখি দুই ফ্ল্যাটেরই দরজা বন্ধ, কিন্তু পার্টিশনের ওপরটা খোলা। সেখান দিয়ে একটু বাদে পিন্টুর পিসিমাব গলা ভেসে এল—ইস্, কিভাবে কামড়েছে দেখেছ? মাংস তুলে নিয়েছে একেবারে! হাত-পা গুলো আর বাকি রাখলে কেন? ওগুলোও চিবিয়ে ফেললে পারতো। কি সব্বোনেশে ছেলেরে বাবা!

এদিক থেকে সব কথাই স্পষ্ট শোনা গেল। ভোম্বলের মাসী স্পিরিটেড্ মহিলা, তিনি হঠাৎ রেগে গিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন—অমনি একটু লেগেছে কি আদুরে ছেলে কাত! আব ভোম্বলেব যে চুল ছিঁড়ে মাথায় টাক পড়বাব জোগাড়, তার কি?

ওদিকে গুরুদাসবাবুর গলা—কুশিক্ষা পেলে এটাই তো স্বাভাবিক।

স্পিরিটেড্ মাসী কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে ভোম্বলের রাগী মামা চড়া গলায় বললেন—মেয়েদের কথার মধ্যে নাক গলানোটাই বা কোন শিক্ষাব লক্ষণ?

—ছেলে নরখাদকের হাতে পড়লে কথা বলতেই হয়।

কিছুক্ষণ উভয়পক্ষ চুপ। কে কথা বলবে এবং কি বলবে তা শানানো হচ্ছে।

পুনরায় পিন্টুর পিসীর গলা—শিক্ষার কথা উঠলে বলতেই হয়—এ বাড়িতেই সবাই গ্র্যাজুয়েট।

স্পিরিটেড্ মাসীর চোখ চক্‌চক্ করে উঠল—জানি, জানি, স্কুল থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েট। বলি, যিনি এত কথা বলছেন তিনি গতবছর কোলকাতায় বোনের বাড়ি লুকিয়ে থেকে প্রাইভেটে বি এ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেন নি?

ওপাশে চকিত নীরবতা। কি সর্বনাশ! জানতে পেরেছে!

দুই পরিবারে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কেউ কারো দিকে তাকায় না। সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেলে একপক্ষ দেয়ালে সেঁটে গিয়ে অপরপক্ষকে পথ দেয়। গুরুদাসবাবু মুদিখানা থেকে খড়ি কিনে এনে ছাদের মাঝখানে মোটা করে দাগ টেনে সেই দাগ বরাবর লিখে দিলেন—আমাদের দিক। গুরুদাসবাবুর ক্রিস্টাল সেট রেডিওর এরিয়ালের বাঁশ এদিকের ছাদে ছিল, ভোম্বলের বড়মামা তার কেটে বাঁশ নামিয়ে 'আনকালচার্ড'-দের অংশে রেখে এলেন।

পিন্টু এবং ভোম্বল মনে মনে পরস্পরের কঠিনতম শাস্তিবিধান করতে লাগল। কল্পনায় শাস্তি দেবার বড় সুবিধে—যতদূর ইচ্ছে নৃশংসতা করা যায়, কিন্তু তার জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

এদিকে ফাগুনের শেষ পেরিয়ে চৈত্রের প্রথম এসে গেল। উঠোনের গাছ থেকে নিমফুলের গন্ধ ভেসে এসে দুপুরের বাতাস ভারাক্রান্ত করে রাখে। বাড়ির পেছনদিকের মাঠে পিটুলিফলের গাছটায় কোকিল ডাকে, ঝিরঝির করে বাতাস বয়। এমন সুন্দর বিকেলগুলোতে কতরকম খেলা করা যায়। পাশে পার্শীদের রয়্যাল হোটেলের বাগানে পেঁপেগাছে অজস্র কচি পেঁপে ধরেছে। তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পেঁপে পেড়ে নুন দিয়ে খেতে কি মজা! কিন্তু সে-সব কি আর একা হয়? তা না হোক, না হয় এ জীবনে আর খেলা করা না-ই হল—তবু প্রাণ থাকতে পিন্টু আর ভোম্বল পরস্পরের সঙ্গে খেলবে না। সামান্য খেলার চেয়ে সম্মান বড়।

চমৎকার অপরাহ্ণগুলো দীর্ঘতর হয়ে পড়ে। বিকেলটা যেন আব কাটতে চায় না। এই সময় পাড়ায় খবর রটে—পিন্টুর এক মাসির বিয়ে। মাসি থাকেন কানপুরে, সেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান করার অসুবিধে, কাজেই এখান থেকে বিয়ে হবে।

সারাদিন ধরে পিন্টুদের বাড়িতে নতুন নতুন লোকেরা যাতায়াত করে, বিয়ের কাজকর্ম এগুতে থাকে। একদিন সন্ধেবেলা যাঁর বিয়ে সেই মাসিও কানপুর থেকে এসে হাজির হলেন। ভোম্বলের মামা রোজ ভোম্বলকে ল. সা. গু. কষতে দিয়ে হ্যারিকেনের আলোয় ব্র্যাড্‌শ পড়েন—নাঃ, ওদিকের ওরা বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে, বিয়ের সময়টা এখানে থাকা যাবেনা দেখছি!

বিয়ের দিনদশেক বাকি। বিকেলের দিকে ছাদে উঠে ভোম্বল দেখল ওপাশে এককোণে উনুন তৈরির জন্য নতুন ইঁট পাঁজা করা রয়েছে। সেদিকে তাকালে কেমন বুক হু হু করে। চিলেকোঠার ওধারে কি একটা নড়ল না? হ্যাঁ, পিন্টু আগে থেকেই ছিল ছাদে, তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে মুখ ঘুরিয়ে মনোযোগ দিয়ে রাস্তার দিকে কি দেখতে লাগল।

ভোম্বলের মনে হল—ভাব করেই নেওয়া যাক্ না। ওদের বাড়িতে এখন কত আনন্দ হবে, মাঝখান থেকে আমরাই বাদ পড়ে যাবো। আর সত্যি বলতে কি, আমিও অত জোরে না কামড়ালেই পারতাম। পিন্টু অবশ্য আমার চুল ছিঁড়ে নিয়েছে, তবে তার ঘূর্ণিফল নিয়ে নেওয়ায় সে রাগ করতেই পারে। পাশাপাশি থেকে ঝগড়া করা উচিত নয়।

পিন্টু আবার এদিকে তাকিয়েছিল। ও-ই বা ঘনঘন তাকাচ্ছে কেন?

বিকেলের রোদ্দুরে মাখা ইঁটের স্তূপটা যেন আসন্ন উৎসবের প্রতীক।

পরের দিন রবিবার। ভোরবেলার ট্রেন ধরে গুরুদাসবাবু কোলকাতায় গিয়েছিলেন বিয়ের দানের বাসনপত্র কিনতে। খরিদ করা মাল একজায়গায় করে কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল। কোনোরকমে স্নান সেরে যাহোক দুটো খেয়ে রান্নাঘরের সামনের প্যাসেজে আঁচাতে এসে লক্ষ্য করলেন ছাদে শুকোতে দেওয়া ভোম্বলের মামার ধুতির অনেকটা অংশ এদিকে উড়ে এসে পড়েছে। ইঁট চাপা থাকায় সবটা আসেনি, কিন্তু অন্তত দু-তিন হাত তাঁদের দিকে চলে এসেছে।

কাউকে কিচ্ছু না বলে গুরুদাসবাবু নিঃশব্দে একটা কাঁচি হাতে ছাদে চলে গেলেন। না, কোনো বেআইনি কাজ তিনি করবেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতভাবে যতটুকু এদিকে এসে পড়েছে ততটুকু কেটে নেবেন।

কাটা হল না। ছাদে উঠে দেখলেন চিলেকোঠার ছায়ায় পিন্টু আর ভোম্বল পাশাপাশি বসে গল্প করছে। যাদের নিয়ে কাণ্ড তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়েছে, কেবল বড়দের ঝগড়া এখনো চালু।

যেমন উঠে এসেছিলেন ততোধিক নিঃশব্দে গুরুদাসবাবু নেমে গেলেন।

সন্ধেবেলা ভোম্বলকে ইংরেজি হাতের লেখা করতে দিয়ে রাগী মামা সবে ব্র্যাড্‌শ হাতে নিয়েছেন, এমন সময় পড়ার ঘরে গুরুদাসবাবুর প্রবেশ। ভোম্বলের মামা হকচকিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন—অ্যাঁ? কে? কে?

গুরুদাসবাবু এগিয়ে এসে বললেন—এই, ইয়ে—আমি। আমার শালীর বিয়ে, শুনেছেন বোধহয়? একটু পরামর্শ করতে এলাম, আপনারা পাঁচজন না দাঁড়ালে— ভোম্বলের মামা প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। বসুন, বসুন! এ তো আমাদেরই কাজ। ভোম্বল, যা দেখি, চা করতে বল। তাহলে সামিয়ানার বাঁশ কবে থেকে খাটানো শুরু হচ্ছে?

ত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে।

পিন্টু আর ভোম্বল এখন যথাক্রমে সরকারী কর্মচারী এবং কেমিস্ট। তারা বাড়ি করেছে এই শহরেরই দুই প্রান্তে। পরস্পরের বাড়িতে বিশেষ যাতায়াত নেই, কালেভদ্রে পথে দেখা হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেতে খেতে গল্প করার মধ্যে বন্ধুত্ব সীমাবদ্ধ হযে এসেছে। কারো দোষ নেই, জীবন অত্যন্ত জটিল এবং সমস্যাবহুল হয়ে পড়েছে। সময় কোথায় ছোটবেলার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আড্ডা দেবার?

দু-জনের ছেলে পড়ে একই কিন্ডারগার্টেনে। ছুটির সময়ে মায়েরা গিয়ে নিয়ে আসে। মায়েদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। 'খবর ভাল?' কিম্বা 'একদিন এলে হয় না?' জাতীয় পরোক্ষ সম্ভাষণেই আলাপ থেমে যায়। তাদের ছেলেরাও খেলে, তবে ঘূর্ণিফলের যুগ চলে গিয়েছে। মার্বেল বা ডাংগুলিও নয়। এখন তারা ভিডিও গেম নিয়ে খেলা করে।

পিন্টুর ছেলেব সঙ্গে ভোম্বলের ছেলের স্কুলে একদিন মারামারি হয়ে গেল। তাদের মায়েরা মার্জিত. নিজেদেব মধ্যে ঝগড়া করল না। কেবল কঠিন মুখ করে যে যার ছেলের হাত ধরে রিকসায় উঠে বাড়ি চলে গেল। অফিস যাবার পথে স্টেশনের প্লাটফর্মে দেখা হল পিন্টু আর ভোম্বলের। দু-জনে দু-কামরায় উঠল।

এবারও বসন্ত এল, নিমফুলে ভরে গেল গাছ। বিকেলের রোদ্দুর আশ্চর্য সুন্দর হয়ে পড়তে লাগল পৃথিবীর বুকে। কিন্তু এবার আর ভাব হল না। অনেক ইলেকট্রনিক খেলনা আর রঙিন বই আছে ছেলেদের। তাদের একাকীত্ব নেই।

তাছাড়া তারা এখন পাশাপাশিও থাকে না। দূরত্বটা বাইরের দিকে দেড় কিলোমিটার, ভেতরে তিরিশ বছর।

বিশ্বেশ্বরের শেষ যাত্রা

বৃদ্ধের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার বলল—সেনমশাই, এখন কি একটু ভাল বোধ করছেন? বুকের চাপটা কি একটু কম লাগছে?

বিশ্বেশ্বর সেন উত্তর দিলেন না।

তাঁর চোখ বোঁজা। খাটের ওপরে পায়ের কাছে স্ত্রী সিন্ধুলতা বসে আছেন। চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ। খাটের ছত্রি থেকে মোটা শাড়ির পাড় দিয়ে গ্লুকোজের বোতল

ঝোলানো। রোগীর ডানহাতে ড্রিপের ছুঁচ ফোটানো রয়েছে। ডাক্তার খাটের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ছেলেকে বলল—একটা ইনজেকশন লিখে দিচ্ছি, চট করে কিনে নিয়ে আসুন—

দুই ছেলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ডাক্তার নোটপ্যাড বের করে ওষুধের নাম লিখে কাগজটা বাড়িয়ে ধরল—কে যাবেন? নিন্—

বহুক্ষণব্যাপী অশোভন নীরবতার পর বড়ছেলে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল, বলল—এর কত দাম পড়বে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চশমার কাঁচের পেছন থেকে ঠাণ্ডা চোখে বড়ছেলের দিকে তাকাল। বলল—জানিনা। দোকানে গিয়ে দেখুন।

বড় ছেলে ঘর থেকে চোখের ইঙ্গিতে ছোটভাইকে ডেকে নিয়ে গেল। বাইরে এসে ছোট ছেলে বলল—কি?

—তুই গিয়ে ওষুধটা কিনে নিয়ে আয়।

—কেন, তোমাকে বলেছে—তুমিই যাওনা।

—সে তো তুই ডাক্তারের হাত থেকে স্লিপটা কিছুতেই নিচ্ছিলি না বলে আমাকে নিতে হল। ডাক্তার আসলে তো তোর দিকেই বাড়িয়ে ধরেছিল।

—মোটেই না, ডাক্তার কাউকে মিন্ করেনি। আমি নেব নেব করছিলাম, তাব আগেই তুমি নিয়ে নিলে—

বড়ছেলে একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল—যাক গে, ওষুধটা নিয়ে আয়।

—তুমি যাও।

—কেন, বাবা আমার একার? তোব বাবা না?

—অকারণ কথা বাড়াচ্ছ কেন দাদা? এ কথা আসে কি কবে?

—বাবার এতবড় অসুখে কিছুই তো কবলি না, আমি একা খেটে মবলাম। সেই জন্যেই এসব কথা বলতে হয়।

—আমি থাকি পাঁচশো মাইল দূরে, তুমি কাছে থাকো। কাজেই তোমাকে খাটতে হয়েছে, এ কথা এত বড় করে বলবার দরকার কি?

এই সময়ে রোগীর ঘর থেকে ডাক্তার বেরিয়ে এসে দুই ভাইকে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে বলল—একি। এখনো ওষুধটা আনেন নি?

বড়ভাই একটু লজ্জা পেয়ে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জামাটা বদলেই—বাবার অবস্থা কেমন বুঝছেন ডাক্তারবাবু? আশা আছে তো?

ডাক্তার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। উঠোনের নিমগাছে রোদ্দুর এসে পড়েছে। ঝিরঝির করে কাঁপছে পাতা। আজ খুব সুন্দর আবহাওয়া, গরমও নয়—ঠাণ্ডাও নয়। এমন চমৎকার নিমফুল-ঝরা দিনে মানুষ কেন মারা যায় কে জানে।

বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে ডাক্তার বলল—বিশেষ কোনোই আশাই নেই। চেনী-স্টোক্ রেসপিরেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষা।

ছোট ভাই একটু ব্যস্ত হয়ে বলল—তাই নাকি? তাহলে তো—

বড়ভাই বলল—এই ওষুধটা কি তাহলে—

ডাক্তার স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল।

—আচ্ছা, আমি নিয়ে আসছি।

ওষুধ এল। সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে হাতে রবারের ব্যান্ড লাগিয়ে ডাক্তার যখন শিরা খুঁজছে তখন রোগীর গলায় শ্বাস ছাড়বার সময় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর সেন অবাক হয়ে দেখলেন মৃত্যুর সময় তাঁর বেশ জ্ঞান রয়েছে। সবারই কি এমন থাকে? চারিদিকে কি হচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, হাতে ইনজেকশনের ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা বেশ টের পেলেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, তিনি কথা বলতে পারছেন না।

ছেলেদুটো খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। ওদের তিনি ঠিক মানুষ করতে পারেন নি। দুজনেই এমনিতে খেয়ে পরে বাঁচবার মত ভাল উপার্জন করে—সে মানুষ করার কথা বলছেন না। আসলে নিজের ইচ্ছেমত তিনি এদের গড়তে পারেন নি। এদের মুখ বড় নিষ্ঠুর, বড় তামসিক—এরা ঐশ্বর্যকে হৃদয়ের চেয়ে উঁচু স্থান দিয়েছে। দোষ কি তাঁরই? তিনি তো অনেক চেষ্টা কবেছেন, কত ভাল গল্প শুনিয়েছেন, সদুপদেশ দিয়েছেন, উদাহরণ হিসেবে নিজের চরিত্রকে নির্মল রেখেছেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সামনে দুটো নিষ্ঠুর মুখ দাঁড়িয়ে।

তবু ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিশ্বেশ্বরের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। আহা। তাঁরই তো ছেলে, ওদেব কপাল ওরা ভাল হল না। ভাগ্যের চক্রান্ত। কত কষ্ট করে, রাত জেগে বড় করতে হয়েছে। ছোটছেলের থুতনির কাছে কাটা—খেলতে খেলতে ইঁটের পাঁজাব ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। কি রক্ত, কি রক্ত! বিশ্বেশ্বর ছেলে কোলে দৌড়ে গেলেন ডাক্তারখানায়। ওষুধ লাগিয়ে, খেলনা কিনে হাতে দিলে তবে কান্না থামে।

ছোটছেলের সেই নিষ্পাপ মুখখানা। মানুষ এত বদলে যায়।

সিন্ধুলতার জন্য অবশ্য তিনি সাধ্যমত ব্যবস্থা করে রেখে গেলেন। ছেলেরা মাকে দেখবে না তা তিনি জানেন। ওর জন্যই দুঃখ হয়। ছেলেরা নিজেদের চাপে তাঁকে ভুলে যাবে। যা যাবাব সিন্ধুলতারই গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার মুখে বিশ্বেশ্বর চলে গেলেন।

পাড়ার ছেলেরা এসে ফুল দিয়ে খাট সাজাল, খাটের কোণে গুঁজে দিল ধূপকাঠি। সিন্ধুলতা মৃতদেহ আঁকড়ে কান্নাকাটি করে কোনো নাটকীয়তা করলেন না। আসল মানুষটা তো চলেই গিয়েছে—বহুদিনের রোগক্লিষ্ট শরীরটা আঁকড়ে ধরে রেখে আর কি হবে?

খড়ের নুটি জ্বেলে দুইজনেই একবার করে মৃত পিতার মুখে ছোঁয়াল। এবার আর বিশ্বেশ্বর কিছু টের পেলেন না। ব্যাস, বাবার সঙ্গে এ জীবনের মত সব সম্পর্ক শেষ। আগুন ধরে উঠল দাউ দাউ করে। চমৎকার শুকনো কাঠ। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে কাজ খতম।

বড়ভাই বলল—চা খাবি? চল, বড়রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে যাই—

ছোটছেলে বুঝল দাদা কিছু বলতে চায়। বাবার চিতার পাশে বলতে লজ্জা পাচ্ছে।

চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বড়ছেলে চার্মিনার ধরিয়ে বলল—খরচের কি হবে?

—সে আমি কি করে বলব? আমার যা ক্ষমতা আমি দেব।

—কত দিবি?

—ধরো, এক হাজার। তার বেশি পারবো না।

—এক হাজারে শ্রাদ্ধ হয়? অসুখের সময় তো কিছুই দিলিনা—

ছোটছেলে উত্তেজিত হয়ে বলল—না থাকলে কি টাকা ছাপিয়ে দেব তোমাকে? বাবা

ক্যাশ টাকা কিছু রেখে যায়নি মার কাছে? মাকে বলো না?

—কিচ্ছু না। বাবার কি ছিল যে রেখে যাবে? বোকা লোক, পয়সা চিনত না, তুই বরং হাজার তিনেক দিস। গত দুমাসে চিকিৎসায় আমি অনেক খরচ করে ফেলেছি—

—এখন এক হাজার দিচ্ছি, বাকি দুহাজার তুমি দিয়ে দাও। আমি তো এখানে থাকবো না, বাড়ির আমার প্রাপ্য অর্ধেক অংশ বিক্রি করে সেই টাকা থেকে তোমার দেনা শোধ করে দেব।

বড়ছেলে চোখ পিট পিট করে বলল—তোকে টাকা দিতে হবে না। আমি তোকে কুড়ি হাজার টাকা দিচ্ছি, তোর অংশ তুই আমায় লিখে দে—

—মাত্র কুড়ি হাজার! আমার অর্ধেক অংশ অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা হবেই।

—আচ্ছা আরো দশ হাজার বাড়াচ্ছি না হয়—

নদীর ধারে বিশ্বেশ্বরের চিতা এখনও জ্বলছে।

দরাদরি করতে করতে তিনকাপ চা খেয়েছে দুই ছেলে। দর চলছে।

বিশ্বেশ্বরের পুরনো বন্ধু বুড়ো উকিল রমানাথ ভট্টাচার্য চায়ের দোকানে এলেন খুঁজতে খুঁজতে। বললেন—তোমরা এখানে? আহা, দেরিতে খবর পেয়ে শেষ দেখাটাই হল না বিশুর সঙ্গে—

বড়ভাই বলল—আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। আচ্ছা আমাদের বাড়ি সমান দুভাগ হচ্ছে, এক এক ভাই কত দাম পাবো মনে হয়?

রমানাথ বললেন—কিছুই পাবে না। বিশ্বেশ্বর মরবার একবছর আগে গোপনে উইল করে বাড়ি তোমাদের মাকে দিয়ে গিয়েছে। বৌঠানের মৃত্যুর সময় তাঁর ইচ্ছামত যাকে হোক দিয়ে যাবেন।

দুই ছেলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। রমানাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—যাই, বিশুর শেষকাজটা একটু দেখি। তোমরাও এসোনা—

ছোটছেলে রমানাথের সঙ্গে চলে যেতে যেতে পেছন ফিরে বলে গেল—চায়েব দামটা দিয়ে দিও দাদা।

বন্য

আমার এই অরণ্য বেশ গরম। মাথার ওপরে গাছের পাতার ছাউনি, পায়ের নিচে ভেজা-ভেজা মাটি। প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে। খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে তারপর রোদ্দুর ফুটলে মাটি থেকে গরম ভাপ ওঠে। তখন মাছির উপদ্রব খুব বাড়ে। জল শুষে গেলে নরম কাদার আস্তর পড়া মাটিতে পড়ে থাকে মরা শামুক, ফড়িং, ঝিঁঝিপোকা—এই সব। তাদের বাসি মাংসে বসবার লোভে জঙ্গলের ভেতর থেকে ভন্‌ভন্‌ করে উড়ে আসে মাছির দল। এই জন্য বৃষ্টির পরে আমার বনের গভীরে থাকতে ভাল লাগে না। মাছি বড্ড বিরক্ত করে, লেজ নাড়তে নাড়তে পেছন ব্যথা হয়ে যায়।

সব সময় বৃষ্টি থাকে না। অনেকদিন বৃষ্টি হওয়ার পরে এক সময় আকাশ খুব নীল হয়ে ওঠে, সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। তারপর যত দিন যায় একটু একটু করে ঠাণ্ডা পড়ে। এরকম ঠাণ্ডার দিন অনেককাল চলে। তারপর ঠাণ্ডা কমে আস্তে আস্তে আবার গরম

বেড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। ঘুরে ঘুরেই এমন হয়, বরাবর তাই দেখছি। ঠাণ্ডার দিনে রোদ্দুরে গা ঢেলে লম্বা লম্বা ঘাসের বনে কাত হয়ে শুয়ে থাকতে কি যে আরাম! ওপরে তাকালে দেখি ঘাসের ডগা নড়ছে, আরো অনেক, অনেক ওপরে পাখিরা ওড়ে। কালো ফুটকির মত দেখতে পাই তাদের। পেট ভরা থাকলে এসব দেখতে বেশ লাগে।

এ বনে অনেক খাবার। এখানে খেয়েদেয়ে ভালই আছি। রোজ টাটকা মাংস পেতে কোনো অসুবিধে নেই। অনেক দিন আগে, তখনো আমার গায়ের ডোরাগুলো ভাল করে ফোটেনি, আর আমি এত লম্বা-চওড়াও হইনি, আমার খুব অসুখ করেছিল। নতুন শিকার না পেয়ে ।তনদিন আগে মরা একটা জন্তুর মাংস কিছুটা খেয়েছিলাম। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে অবধি শরীরে কি আন্‌চান্! যেন মরেই যাচ্ছি। পেটের মধ্যে কেমন করছে, কি যেন ঠেলে উঠছে বুকের দিকে, অথচ সবটা উঠে আসছে না। হাতে-পায়ে জোর পাই না, চোখে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ঠেকে সব কিছু। সারাদিন ছট্‌ফট করে শেষে বিকেলের দিকে কিছুটা ঘাস খেয়ে গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করি, তারপর একটু শান্তি। এরপর থেকে আর কখনো পচা মাংস খাই না। দরকারও হয় না। বলেছি তো, বনে অনেক খাবার।

আমি শরীরের খুব যত্ন নিই। মাঝে মাঝে খুব নুন খেতে ইচ্ছে করে, তখন নুন না খেলে শরীর খারাপ হয়ে যায়। নদীর বেড়ে ওঠা জল কমে গেলে উঁচু পাড়ে সাদা নুনের দাগ লেগে থাকে, এখানকার জল বেজায় নোনা বলে। রাত্তিরবেলা বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়ে খাড়া পাড় বেয়ে নেমে সেই নুনের দাগ বরাবর চাটি। এতে অবশ্য কচকচে বালিমেশা কিছু মাটিও পেটে চলে যায়। কিন্তু উপায় কি? আর তাছাড়া আমার মত আরো অনেক জন্তু এখানে নুন চাটতে আসে। কাজেই একটু চুপিসাড়ে আসতে পারলে অনেক শিকারও মিলে যায়। অবশ্য রোজ পাওয়া যায় না।

একবার মাটি চাটতে গিয়ে আমার ভয়ানক বিপদ ঘটেছিল। সামনের দুই থাবা খাড়া পাড়ের গায়ে তুলে দিয়ে নুন চাটছিলাম, পেছনের পায়ে সম্পূর্ণ ভর। নরম মাটিতে পা পিছলে হঠাৎ প্রায় জলের কাছাকাছি গিয়ে পড়লাম। সেখানকার ভুসভুসে কাদায় আমার থাবা বসে যেতে লাগল। কিছুতেই আর উঠতে পারি না। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত কাদায় পড়ে থাকা একটা পচা গাছের গুঁড়ির ওপর একটু সময়ের জন্য ভর রেখেই বিরাট লাফ দিয়ে পাড়ে উঠে আসি। ভয়ে তখনো বুকের মধ্যে কেমন করছে। এরপর থেকে নামবার সময় থাবা দিয়ে একটু খুঁড়ে নিয়ে সেই গর্তে পা রেখে নামি। আর কোনোদিন এ বিপদ হয়নি।

আমি বেশ দৌড়োতে পারি। ঠাণ্ডার সময়ে রাত্তিরে আকাশে রুপোলী গোলাটা উঠলে তার আলোয় চারদিক ভরে যায়। নদীর জলে আলো চক্‌চক্ করে, জলের ওপরে সাদা মেঘের মত হাল্‌কা কি যেন জমা হয়। এত আলো দেখে নদীর ওপারে ঝুঁকে থাকা ঝুপ্‌সি গাছের ডালে যত পাখি সব মাঝরাত্তিরে আচম্‌কা ঘুম ভেঙে ডেকে ওঠে। শেয়াল ডাকে দূর বনে। এই সব দেখেশুনে মনের ভেতর হঠাৎ খুব আনন্দ হয়। কেন বুঝি না, আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না একদম। কেমন অস্থির-অস্থির লাগে। পায়ে যেন পাখির মত ডানা গজিয়েছে মনে হয়। তখন আমি রুপোলি গোলাটার আলোয় কেবল দৌড়ে যাই। ক্রমে শরীর গবম হয়ে ওঠে, ঘুমের ঘোর কেটে গিয়ে পায়ে ক্রমেই আরো জোর পাই। আর ঘুম আসতে চায় না, সারারাত দৌড়োদৌড়ি করি বন থেকে বনে।

কখনো কখনো আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভাল করে মনে পড়ে না,

আবছা আবছা। বেশি হয় যখন বৃষ্টি গিয়ে আকাশ নীল হয়, অথবা ঠাণ্ডা গিয়ে গরম পড়তে শুরু করে, সেই মাঝামাঝি সময়গুলোতে। দিনের বেলাতে যে আগুনের গোলাটা আকাশে থাকে, সেটা মাটির দিকে একটু হেলে পড়লে ঘাসবনে আমার যখন ঘুম ভেঙে যায়—গরম রোদ শরীরে কেমন আরাম ছড়িয়ে দেয়, তখন শরীর টানটান করে ঘুম কাটাতে কাটাতে একচমকের জন্য মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগে এমনি গরম রোদ্দুরে কার যেন নরম রোঁয়ার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকতাম। জিভে কেমন একটা মিষ্টি স্বাদ পাই। কিসের স্বাদ সেটা? পুরোটা মনে আসে না, হলুদ রোদে লম্বা ঘাস নড়ে, পাখির দল কিচিরমিচির করে—আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কেন যে খারাপ হয়! আগের দিনও নুন চেটে এসেছি, ওবেলা শিকার করা টাটকা মাংস কিছুটা রাখা আছে বনের ভেতর আমার প্রিয় জলাশয়টার ধারে, শরীরেও ঘুমিয়ে উঠে বেশ আমেজ, তবু মন খারাপ লাগে ভয়ানক। কেবলই মনে হয় মুখে নরম লোমের ছোঁয়া, জিভে ব্যাকুল করা মিষ্টি স্বাদ।

আমার প্রথম শিকারের কথাও মনে পড়ে। অল্প বয়েসে, সবে তখন কিছুদিন হল একটু-আধটু একা বেড়াতে শিখেছি, বনের মধ্যে কোনো জন্তু দেখলেই ভয় পেয়ে একদৌড়ে পালিয়ে যেতাম! কোথায় যেন যেতাম? ও, হ্যাঁ—সেই যে যার লোমের মধ্যে গোল হয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম, তার কাছে। বহুদিন হল সে কোথায় যেন চলে গিয়েছে, এখন আমি একাই থাকি।

একদিন বেড়াচ্ছি আপন মনে, হঠাৎ দেখি সামনে একটা জন্তু—তখন জানতাম না, এখন বুঝি সেটা ছিল শেযাল। আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। শেয়ালটাও আমাকে দেখে আগে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল, দেখল বড় কেউ সঙ্গে আছে কিনা। তারপর মুখ ছুঁচলো করে পায়ে পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তাব চোখ দেখে বুঝলাম আজ আমার রক্ষা নেই।

ফিরে দৌড় দিলাম।

পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম সেও পেছন পেছন আসছে। শেয়াল দেখে ভয় পেয়েছিলাম ভাবলে এখন হাসি পায় বটে, কিন্তু তখন শেয়ালই আকারে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল।

প্রাণপণে দৌড়েও আমি এগিয়ে যেতে পারলাম না, শেয়ালটা ঠিক পেছনে লেগে রইল। শুধু তাই নয়, একবার তাকিয়ে দেখি সে অনেকখানি কাছে এসে পড়েছে। আমি যে এর চেয়ে জোরে দৌড়তে পারি না, কি হবে আমার?

ক্রমশ দম কমে আসছিল, প্রাণীটার পায়ের আওয়াজ আমার একেবারে পেছনেই। আমি তখন প্রাণভয়ে পাগল হয়ে ছুটছি। ক্ষমতা নেই, ভয়টাই আমার শরীরকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

এমন সময়ে কতগুলো কি লতা পায়ে জড়িয়ে আমি পড়ে গেলাম। ছট্‌ফট্‌ করে সেগুলোর বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েই দেখি আর পালাবার পথ নেই। শেয়ালটা পৌঁছে গিয়েছে। লোভী-লোভী চোখ করে সে আমার দিকে থাবা বাড়াল।

হঠাৎই আমার মনে তখন আর কোনও ভয় নেই। কোণঠাসা হয়ে আমার পিঠ বেঁকে গিয়েছে, ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে উঠেছে সব কটা। একটুও ভয় নেই, ভীষণ রাগ হয়েছে আমার। মনের মধ্যে কে হেঁকে উঠল—মারো! সঙ্গে সঙ্গে আমার থাবা সজোরে নেমে এল শেয়ালটার মাথায়। করুণ একটা শব্দ করে জন্তুটা ঢলে পড়ল তক্ষুনি, কান দিয়ে বেরিয়ে এল গরম তাজা রক্তের ধারা।

তখনো আমি ভাল করে বুঝতে পারিনি কি হল, প্রবৃত্তির বশে মেরেছিলাম। বুকের ধড়াস্ ধড়াস্ একটু কমতে মনে অদ্ভুত আনন্দ হল। আমার থাবার এত জোর! তা তো আমি জানতাম না। আমার চেয়ে কত বড় প্রাণী এক আঘাতেই পড়ে গেল! তাহলে আর ভয় কিসের?

সেই প্রথম অনুভব করলাম শারীরিক বলের আনন্দ, প্রভুত্ব করার আনন্দ। মরা শেয়ালটার বুকের ওপরে একটা থাবা রেখে চারদিকে তাকিয়ে আমি একবার অসহ্য আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, তারপর মুখ নিচু করে শেয়ালটার কান দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত মনোযোগ দিয়ে চাটতে শুরু করলাম।

মাঝে মাঝে সঙ্গিনী পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠি। এটা সব সময় হয় না। রোদে একটা বিশেষ রঙ ধরলে, বাতাস একটু বিশেষভাবে বইতে শুরু করলে, কখনো কখনো মনে হু হু করে ওঠে। একা থাকতে আর ভাল লাগে না, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বুকে এসে ধাক্কা দেয়। অস্থির হয়ে বনে বনে ঘুরি আর নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকে দেখি—কোথায় সে? কোথায় সে?

সঙ্গিনী জুটেও যায়। যে ক'দিন রোদ ওই রকম থাকে, বাতাস বিশেষভাবে বয়, ততদিন আমরা একসঙ্গে থাকি। কেউ কারুকে চোখের আড়াল করি না। ঝলমলে রোদ্দুরে প্রান্তরের ঘাসবনে শুয়ে সঙ্গিনী আমার আদর খায়, তারপর আমার গায়েব ওপর এলিয়ে বিশ্রাম করে, রোদ পোহায়। বেশ ভাল লাগে, মনের মধ্যে একটা অধিকারের বোধ জন্মায়। এ শুধু আমার, অন্য কেউ এখানে এলে তাকে আমি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব—এই রকম মনে হয়।

একবার আমার এক সঙ্গিনীর বাচ্চা হয়েছিল। বাচ্চা নিয়ে এ-বন ও-বন ঘোরা যায় না। কাজেই সে অন্যবারের মত চলে গেল না আমাকে ছেড়ে। বাচ্চাদের নিয়ে সে চোখ বুজে বসে বসে ঝিমোত। বাচ্চারা জড়াজড়ি করে তার পেটের লোমের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দুধ খেত। প্রথম প্রথম আমার খুব মায়া হত ওদের দেখে। ছোট্ট তুলতুলে বাচ্চাগুলো, ভাল করে চোখ ফোটেনি। দুধ খাবার আগ্রহে তাড়াহুড়ো করে এ ওর গায়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কুঁই কুঁই করে শব্দ করে খিদে পেলে। ভারি অসহায় জীব। আমি থাবা পেতে বসে পাহারা দিতাম, কেউ এসে যেন ওদের ক্ষতি না করে।

কিন্তু আস্তে আস্তে ঘটনা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল।

আমার সঙ্গিনী আজকাল আমার দিকে আর নজর দেওয়ার সময় পায় না, শুধু বাচ্চাদের পাহারা দিতে আর দুধ খাওয়াতেই তার সারাটা সময় কেটে যায়। আমি কাছেই লোভীর মত বসে থাকি, কিন্তু সে আমাকে আমল দেয় না। আগে আমরা মাঠে মাঠে, অরণ্যের ভেতর শুকনো পাতার ওপরে সারাদিন খেলা করে বেড়াতাম। এখনো ইচ্ছে করে—কিন্তু করলে কি হবে? সঙ্গিনী আমাকে কাছেই যেতে দেয় না। বাচ্চা আগলে সে বসে আছে, কাউকে আর সহ্য করতে পারে না। যেন সবাই তার বাচ্চাদের মেরে ফেলবার জন্য থাবায় ধার দিচ্ছে। প্রথম দিকে আমি গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল যেদিন বুঝলাম সে আমাকেও দেখতে পারছে না, সন্দেহ করছে। কাছে ঘেঁষে মাথা দিয়ে ঘষাঘষি করে তাকে একটু আদর করতে গিয়েছিলাম, উত্তরে সে দাঁত বের করে হিংস্র গর্জন করে উঠে আমার ঘাড়ে থাবা দিয়ে মারল।

আমার রক্ত আগুন হয়ে উঠল। আদর করতে গিয়ে বাধা পেয়েছি বলে নয়, আমার

অধিকারবোধে ভয়ানক আঘাত লাগল।

সব চাইতে আশ্চর্য, সঙ্গিনীর ওপর আমার একটুও রাগ হল না, আমি চটে গেলাম বাচ্চাগুলোর ওপরে। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, আমার সঙ্গিনীকে কেড়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে।

থাবা খেয়ে আমি বিকট গর্জন করে লোম ফুলিয়ে রুখে উঠলাম। দু'বার কামড়ে দিলেই ওর শিক্ষা হয়ে যাবে।

কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড! এ যেন আমার সেই আদর-খাওয়া পুরনো সহচরী নয়, যে ঘাড়ের কাছে আদর করে আলতো কামড়ে দিলেই গলে জল হয়ে গিয়ে ঘাসের ওপরে লুটোপুটি খায় আর গলার মধ্যে গরগর শব্দ করে। বাচ্চাদের পেটের নিচে আড়াল করে সেও সমানে রুখে দাঁড়াল। তারও লোম খাড়া হয়ে উঠেছে শিরদাঁড়া বরাবর, ওপরের ঠোঁট পেছনে সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, গর্জন করছে চাপা আওয়াজে। তার এ মূর্তি আমি কখনো দেখিনি। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, আমার দিক থেকে সামান্যতম উস্কানি পেলেই সে আমার ওপরে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না।

আমি লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেলাম।

রাগে, অপমানে, ঈর্ষায় আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। বাচ্চাগুলো আমার সঙ্গিনীকে কেড়ে নিয়েছে। আমাকে একা করে দিয়েছে।

সেই রাত্তিরেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপিচুপি এসে আমি বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেললাম। খেয়েই ফেলতাম হয়তো, কিন্তু ওদের রক্তের স্বাদ আমার ভাল লাগল না। তাছাড়া সঙ্গিনী বোধ হয় জল খেতে গিয়েছিল কাছেই, হঠাৎ সে এসে পড়লে আমার আর রক্ষা থাকবে না। কাজেই খাওয়ার সময় পেলাম না। কামড়ে গলার নলি ছিঁড়ে ফেলে রেখে পালিয়ে গেলাম।

এতে ফল হল না কোনো। সঙ্গিনী আমার কাছে আর ফেরেনি কখনো। কোথায় চলে গিয়েছিল কে জানে! কেবল এরপর বহুদিন রাত্তিরে দূরের বনে তার আর্ত ডাক শুনতে পেতাম। কেন অমন করে ডাকত সে? বাচ্চা নেই বলে? সে তো আমার কাছে ফিরে এলেই পারত!

পরে অবশ্য এসব মিটে যায়। পরের বার আবার যখন রোদ্দুরে বিশেষ রঙ ধরে, বাতাস বিশেষভাবে বইতে শুরু করে, আমার পুরনো সঙ্গিনীকে আমি অন্য একজনের সঙ্গে ঘুরতে দেখি। এবার আর ঈর্ষা হয়নি। আমিও নতুন সহচরী পেয়ে গিয়েছিলাম।

আজ ঘুম ভেঙে দেখলাম বেশ সুন্দর দিনটা। কাত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম কুঁড়েমি করে। উঠে কোথায় যাব ভাবছি। এমন সময় গন্ধটা ভেসে এল নাকে।

আমি সটান উঠে বসলাম। পশ্চিম দিক থেকে বাতাসে ভর করে এল গন্ধটা। নাকে গেলেই খিদে পেয়ে যায়। মিষ্টি মাংসের গন্ধ। দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা।

লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। এখানে ওখানে পাখির দল উড়ে যাচ্ছে আমার পায়ের শব্দে। পিঠ গরম হয়ে উঠছে সকালের রোদে। সামনে একটা বড় গাছ পেয়ে তার গুঁড়িতে থাবা আঁচড়ে একটু নখের ধার করে নিলাম।

পশ্চিম দিকে জঙ্গলের ঠিক ধারেই যেখানে নরম মাটির নিচু জমিটা রয়েছে, যেখানে বৃষ্টির সময় জল জমে আর অন্য সময় কাদা-কাদা মত থাকে, সেই জমিতে একটা গাছের

নিচে দাঁড়িয়ে আছে জন্তুটা। এ জন্তু আমাদের জঙ্গলে নেই, তবে বাইরে থেকে ছিটকে মাঝে-মধ্যে এসে পড়লে খেয়ে দেখেছি, খুব ভাল স্বাদ। এখানে কি করে এল এটা?

আমাকে দেখেই প্রাণীটা ব্যস্ত হয়ে ম্যা ম্যা করে ডেকে উঠে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল, তখনই লক্ষ্য করলাম মোটা লতাব মত পাকানো কি দিয়ে যেন ওটার পা বাঁধা আছে গাছের সঙ্গে। তার মানে ঘুরতে ঘুরতে বোধ হয় বেকায়দায় পা পড়ে আটকে গিয়েছে।

চারদিকের গাছে অজস্র পাখি ভয়ানক চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে। এরা আমার শিকারের সময় এত বিরক্ত করে যে বলবার নয়। অনেক সময় এদের ডাকাডাকিতে ভড়কে গিয়ে আমার শিকার পালিয়ে যায়। অবশ্য এটার কথা আলাদা—এর নড়বার ক্ষমতা নেই।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকেই বড় লাফ দিলাম একটা। লাফের ওপরেই শূন্যে থাবা দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে জন্তুটার ঠিক ওপরে গিয়ে পড়লাম। থাবা মারবার বা দাঁত বসাবার দরকার হল না, আমার বিরাট শরীরের ভারেই প্রায় পিষে গেল জন্তুটা। একটু পেছনে সরে এসে দেখলাম ঘাড় ভেঙে সেটা নেতিয়ে পড়ে রয়েছে, কেবল পেছনের পা দুটো তড়বড় করে অনবরত নড়ে যাচ্ছে—যেন মরে গিয়েও পালাতে চায়।

এগিয়ে গিয়ে দাঁত দিয়ে টুঁটি কেটে দিলাম প্রাণীটার, তাজা রক্ত চাটলাম জিভ দিয়ে। পিঠে চড়চড়ে রোদ্দুর এসে পড়ছে, এখানে বসে খাওয়া জমবে না। ছায়া-ছায়া জায়গায় জলের কাছাকাছি বসে খেতে ভাল লাগে। খেতে খেতে জলতেষ্টা পেলে বেশি দূর যেতে হয় না। কাজেই মরা জন্তুটার ঘাড় কামড়ে ধরে নরম জমির ওপর দিয়ে আমি বনের মধ্যে আমার প্রিয় জলাশয়টার দিকে নিয়ে চললাম। জমিটা নরম হয়ে ভালই হয়েছে, কাঁকুরে মাটির ওপর দিয়ে খাবার মুখে করে নিয়ে যেতে থাবার তলায় ব্যথা লাগে। এখানে নরম জমিতে পা বসে যাচ্ছে, ভালই হল।

জলের কাছাকাছি একটা গাছের নিচে বসে খাওয়া শুরু করলাম। পেছনের একটা পা আর পাঁজরের কিছু অংশ খাওয়ার পরে এবেলার মত পেট ভরে গেল। জল খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলাম ছায়ায়। খস্খস্ করে পাতা কাঁপছে বনের, টানা গলায় কি একটা পাখি ডাকছে অনেকক্ষণ থেকে। ভরা পেটে চোখ যেন জড়িয়ে আসে।

বেলা গড়িয়ে যেতে ঘুম ভাঙল। কোনো কাজ নেই, রাত্তিরের খাবার শিকার করাই আছে, তাই মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ালাম সারা বিকেল। থম্থমে বন, মাটি থেকে ভেজা-ভেজা গন্ধ উঠছে। যেখান দিয়ে চলে যাচ্ছি, অন্য প্রাণীরা ভয় পেয়ে সরে সরে যাচ্ছে। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে যে কি মজা! আজ রাত্তিরে খাওয়া হয়ে গেলে মাঠের মধ্যে কোনো ঝোপের মধ্যে শোব ঠিক করলাম।

বেড়াতে বেড়াতে নদীর দিকে গিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার বুক ধ্বক করে উঠল। নদীতে একটা বিচিত্র জিনিস ভাসছে পাড়ের কাছে, গোঁ গোঁ শব্দে সেটা একটানা গর্জন করে চলেছে। তার পিঠে ক'জন মানুষ বসে রয়েছে, ক'জন নেমে এসেছে পাড়ে। আমি সাবধান হয়ে ঝোপের মধ্যে পিছিয়ে গেলাম। এরা বড় খারাপ প্রাণী, কেন যেন দেখলেই আমার গায়ের মধ্যে কি রকম করে। গায়েও কি বিচ্ছিরি গন্ধ! নেহাৎই খুব খিদে না পেলে এদের খেতে রাজি নই।

পাড়ে যারা নেমেছে, তাদের হাতে লম্বা লম্বা সরু গাছের ডালের মত কি যেন। বেশি

শব্দ না করে তারা বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। বাকিরা বিচিত্র জিনিসটার পিঠেই বসে আছে নদীর ওপরে। ওটা কি জিনিস? এখন আর গর্জন করছে না। বোধহয় রাগ পড়ে গিয়েছে।

সাকুল্যে এরা তিনজন মানুষ। লাফিয়ে পড়ে এক এক থাবায় দেব নাকি শেষ করে? না থাক্, তার চেয়ে বরং দেখে আসি বনের মধ্যে ওরা কোথায় গেল?

বাতাস শুঁকতে শুঁকতে আর মাটিতে ওদের পায়ের গন্ধে পেছন ধরে ফেললাম। তারপরেই সামনে কিছুদূরে ওদের দেখা গেল। যে মাঠ থেকে সকালে আমি জন্তুটা শিকার করে নিয়ে গিয়েছি, সেদিকেই হাঁটছে ওরা। আমি সাবধানে শব্দ না করে শুকনো পাতা এড়িয়ে পিছু পিছু যাচ্ছি। কিচ্ছু পাবে না ওরা। সকালেই আমি শিকার নিয়ে গিয়েছি। যে গাছের তলায় সকালে শিকার করেছি, সেখানে পৌঁছে গিয়েছে ওরা। একজন আবার বসে পড়ে মাটিতে কি দেখছে। যতই দেখ, শিকার তোমরা পাচ্ছ না। সে আমি আগে সরিয়ে ফেলেছি।

ওরা মাঠে রইল, আমি চলে এলাম।

বেশ রাত্তিরে মাঠ থেকে ফিরলাম বনের দিকে। খিদে পেয়েছে খুব। ইচ্ছে করে দেরি করেছি আমি। মানুষগুলো চলে গেলে আরাম করে খাব বলে।

বনে কোনো জন্তু চোখে পড়ল না আজ। আস্তে আস্তে পা ফেলে সাবধানে হাঁটছি। কি সব পোকা অদ্ভুত আওয়াজ করে ডাকছে পাতার ফাঁকে। খেয়েদেয়ে আবার মাঠে চলে যাব, শুয়ে শুয়ে আকাশের গায়ে যে আলোগুলো মিটমিট করে, তাদের দেখতে দেখতে ঘুম এসে যাবে।

খাবারের কাছে পৌঁছে দেখলাম চারদিক শান্ত, কেউ নেই কোথাও। কান খাড়া করে কিছুক্ষণ থেকে কোনো শব্দ না পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে চপ্‌চপ্ করে খেতে শুরু করলাম।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে বাতাসের গতি হঠাৎ কি কারণে বদলে গেল। যেদিক থেকে আসছিল, তার উল্‌টো দিক থেকে বইতে শুরু করল বাতাস—সঙ্গে সঙ্গে আমার নাকে ভেসে এল মানুষের গন্ধ, খুব জোর গন্ধ। কাছাকাছিই কোথায় রয়েছে তারা।

আমি লাফিয়ে উঠলাম খাওয়া ছেড়ে। রাগলে যেমন হয়, শিরদাঁড়ার লোম দাঁড়িয়ে গেল আমার, বন ফাটিয়ে আমি গর্জন করে উঠলাম।

একটা তীব্র আলো অন্ধকার চিরে আমার মুখে এসে পড়ল, অবাক হয়ে তাকালাম সেদিকে। গাছের ওপরে জ্বলছে আলোটা। বিকট শব্দ হল একটা, সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের একপাশ দিয়ে যেন খানিকটা আগুন ঢুকে গেল শরীরের ভেতরে।

কি অসহ্য যন্ত্রণা। ব্যথায় পাগল হয়ে আমি মরা জন্তুটার সামনের একটা পা কামড়ে ধরলাম। দাঁতের চাপে মড়মড় করে গুঁড়ো হয়ে গেল সেটা। কিন্তু যন্ত্রণা কমলো না। বরং সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে এবার। জঙ্গল কাঁপিয়ে আমি অসহায় ব্যথায় গর্জনের পর গর্জন করতে লাগলাম। মানুষ! দূর থেকে মানুষ আমাকে কি করল! আমার গর্জনে এ বনের সমস্ত প্রাণীর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মানুষকে আমি ছেড়ে দেব না। গাছের ওপরে যেখান থেকে আলো আসছিল সেদিক লক্ষ্য করে আমি লাফ দিলাম। নিশ্চয় ধরে ফেলব।

যখন আমার শরীর শূন্যে, আবার সেই শব্দ হল একটা। আরও একটা আগুনের

টুকরো যেন ঢুকে গেল আমার পাঁজর ফুটো করে। আমি আছড়ে মাটিতে এসে পড়লাম।

আমার কষ্ট হচ্ছে। আমার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে, নাল গড়াচ্ছে জিভ বেয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় আমি মুখ নিচু করে ব্যথার জায়গাটা চাটতে গেলাম, তাহলে হয়তো আমি বেঁচে যাব। কিন্তু মুখ ততদূর পৌঁছল না।

আমার পেছনের পায়ে আর জোর নেই, সামনের দুই পা দিয়ে বুকে হেঁটে আমি চলে যাচ্ছি জলের ধারে। আমার ব্যথা লেগেছে, আমি এখন একটু জল খাব। জল খেলে আমার কষ্ট সেরে যাবে। একটু জলের জন্য কেমন করছে প্রাণটা। একটু ঘাস খাব কি? ঘাস খেলে হয়তো আমি ভাল হয়ে যেতে পারি।

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে আমার। আমি পড়ে গিয়েছি। আর আমি জলের ধারে যেতে পারব না। আমার মুখে নরম লোমের ছোঁয়া—কার যেন খুব পরিচিত গায়ের গন্ধ। নীল আকাশে একরাশ পাখি উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের ডানার কোনো শব্দ নেই। গাছ থেকে নামছে কারা? ও কাদের পায়ের আওয়াজ? ওরা এসে কি করবে আমার? আমাকে ওরা ধরতেই পারবে না। আমি তো এখন ছুটে যাচ্ছি রুপোলি গোলাটার আলোয় প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে। ছুট্—ছুট্—ছুট্! সামনে একটা হরিণ। ওই হরিণটা আমি খাব।

তবে তার আগে একটু জল খাওয়া দরকার। আমার খুব জল খেতে ইচ্ছে করছে। আমি একটু জল খাব। আমি একটু—

উত্তরাধিকার

খুব ছোটবেলায় বাবা একবার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বলেছিলেন —খোকা, তোকে আমি মরবার আগে একটা সুন্দর জিনিস উপহার দিয়ে যাবো।

সে বয়সে গভীর কথা বোঝবার বুদ্ধি হয়নি। আমার আর জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি বাবা আমাকে কি দিতে চান। স্কুলে সাধুখাঁদের ছেলে কমল যেমন খেলনা রিভলবার নিয়ে আসে, তেমন কিছু? ঠিক যেন সত্যি পিস্তল, ঘোড়া টিপলেই কট্ কট্ করে আওয়াজ হয়। কমল দাম বলেছিল চল্লিশ টাকা, ওর মামা নাকি বাইরের কোন শহর থেকে ওকে এনে দিয়েছিলেন। দু-চারদিন অপেক্ষা করে দেখলাম বাবা আর কোনো কথা বললেন না। বাবা কি তবে ভুলে গিয়েছেন? একদিন রাত্তিরে বাবা আমাকে গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়াচ্ছেন, আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—বাবা, তুমি আমাকে একটা রিভলবার কিনে দেবে? কমলের মত? চল্লিশ টাকা দাম—

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। অনুভব করলাম হঠাৎ তাঁর হাত থেমে গেল। বললাম—দেবে বাবা? তুমি যে বলেছিলে আমাকে একটা সুন্দর জিনিস দেবে?

বাবা হেসে বললেন—সে তো মরবার আগে। তুই কি চাস আমি এখনই মরে যাই?

গত অঘ্রাণে পাড়ার নরেনবাবু মারা গেছেন। ছেলেরা খাটিয়া কাঁধে তাঁকে নিয়ে চলে গেল কোথায়। পরে কয়েকদিন রাস্তায় মার্বেল খেলতে গিয়ে দেখেছি নরেনবাবুর বাড়ির বারান্দায় বেতের হেলান-দেওয়া চেয়ারটা পড়ে আছে—যেখানে রোজ সকালে তিনি এসে বসতেন। মাথা রাখার জায়গায় বেতগুলো তেল লেগে কালো হয়ে আছে। কিছুদিন পরে চেয়ারটা কারা যেন সরিয়ে নিয়ে গেল। সেই যে শীত-শীত বিষণ্ণ হেমন্ত-সন্ধ্যায় নরেনবাবু

অজানা কোন গন্তব্যের দিকে চলে গিয়েছিলেন, তিনিও আর ফিরে এলেন না।

আমার বাবাও যদি আর ফিরে না আসে।

দু-হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম—আমার খেলনা চাইনা, কিচ্ছু চাইনা। তুমি মরে যাবে না তো?

কপালে চুমু খেয়ে বাবা বললেন—এখন না। কিন্তু বুড়ো হলে একদিন তো মরতেই হবে। তুই মানুষ হয়ে ওঠ।

আমার বছর ছয়েক বয়েসে বাবা আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে শুরু করলেন। ছুটির দিনে অথবা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে বাবা বলতেন—নে, তৈরি হয়ে নে। একটু ঘুরে আসি।

আমরা চলে যেতাম রঙ্গপুর গ্রামের ছায়াঢাকা বাঁধানো বটগাছ তলায়, মাথারাঙির বাঁশবাগানে, বরতি বিলের শীতে জলশূন্য মাঠে। সবুজ মটরশাকের ক্ষেতের ধারে বসে বাবা আমাকে গল্প শোনাতেন, কবিতা মুখস্থ করাতেন। পড়ন্ত রোদ্দুরে হাঁটু অবধি চোরকাঁটার বনে ছুটোছুটি করে আমরা ফড়িং ধরতাম। বাবাই আমাকে প্রথম চশমাপাখি চেনান, মাঠের ধারে রাঙ্‌চিতার বেড়ার ওপরে গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। কে কতরকম গাছের পাতা সংগ্রহ করতে পারে তার পরীক্ষা হত। সন্ধ্যেবেলা দু-পকেট ভর্তি বুনো গাছের পাতা নিয়ে বাড়ি ফিরে সেগুলো বাছাই করা হত।

এক একদিন রাত্তিরে বাবা বলতেন—চল, ছাদে গিয়ে তারা দেখি। কালপুরুষ চিনিস? দাঁড়া, আগে তোর মাথায় একটা কাপড় জড়িয়ে দিই। হিম পড়ছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

বাবার কোলে হেলান দিয়ে তাঁর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে চিনলাম কালপুরুষের কটিবন্ধ, সপ্তর্ষির জিজ্ঞাসাচিহ্ন, কাশ্যপীর পাঁচতাবা। ঘুম পেলে বাবা কোলে করে নামিয়ে আনতেন।

ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে এক একবার মনে হত—কি সুন্দর জিনিস আমাকে দেবে বাবা? কি জিনিস?

প্রত্যেক মাইনে পাওয়ার দিন বাবা আমার জন্য যুক্তাক্ষর বর্জিত ছোট ছোট গল্পের বই কিনে আনতে শুরু করলেন। তখন আমি বড় অক্ষরে ছাপা রূপকথা বানান করে করে পড়তে শিখে গিয়েছি। গল্পের আশ্চর্য নেশা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভেতরের তেপান্তর-মাঠে সাদা ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র যায় সোনার পদ্ম খুঁজে আনতে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অজানা সমুদ্রের মধ্যে পাথুরে দ্বীপের গুহায় ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরে একচক্ষু দৈত্য। ঝোড়ো বাতাসে রাজকুমারীর ঘরে যে সোনার পাতা উড়ে এসে পড়েছিল, সেই সোনার গাছের সন্ধানে পক্ষীরাজের পিঠে অবাক দেশে পাড়ি দেয় রাজপুত্র শঙ্খকুমার।

এইভাবেই বড় হয়ে উঠতে লাগলাম। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে। নিজের বাড়ির বেড়া দওয়া উঠোনটুকু থেকে অনেক মানুষের চলাচলে ব্যস্ত রাজপথে।

একদিন বাবা খুব ঘেমে বাড়ি ফিরলেন। বললেন, খোকা, বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দিবি? কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে।

তারপর আর মিনিট দশেক সময় পেয়েছিলাম। ডাক্তার ডাকবার অবসর ছিল না। বাবা চলে গেলেন।

কিছু ভাল না লাগলে, দ্বিধাবিভক্ত পথের সামনে এসে বিহুল হলে একা চলে যেতাম মাথারাঙির বাঁশবাগানে, সন্তোষপুরের দিগন্তছোঁয়া মাঠ বেয়ে হেঁটে যেতাম সূর্যাস্ত না

হওয়া অবধি। সেই ফড়িং-এর ওড়াউড়ি, অস্তমেঘে রচিত বিচিত্র রঙীন স্থাপত্য, দোয়েলের ডাক—

কেবল বাবা আর নেই!

কি দেবেন বলেছিলেন বাবা? দিলেন না তো?

বাইরের পৃথিবী চলেছে আপন তাগিদে, সোনার পালকের খোঁজে। সেই ভয়ঙ্কর বেগ যখন জীবনকে ধরে নাড়া দেয়, আমার সামান্য সঞ্চয়, সামান্য কামনাকে বিধ্বস্ত করে, তখন অনেক রাত্রে চুপি চুপি ছাদে গিয়ে দেখি কালপুরুষের শাশ্বত অগ্নিসংকেত, সপ্তর্ষির অনন্ত জিজ্ঞাসা। আমার নেই বিত্ত, নেই পথে হেঁটে গেলে দুপাশ থেকে সেলাম পাওয়ার ভাগ্য, নেই কাম্য আরো অনেক কিছুই। কিন্তু আমার আছে মটরশাকের ক্ষেতের ওপরে বিস্তৃত খোলা আকাশ, গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে মাঠের ওপর দিয়ে ইচ্ছেমত কোথাও হেঁটে যাওয়ার স্বাধীনতা, মেঘে কালো বর্ষার দিনে জানালার পাশে চেয়ার নিয়ে বসে প্রিয় বইটি পড়বার আনন্দ।

হিসেব করলাম। আমার 'আছে'-র দিকটাই ভারী।

তারপর একদিন, মূর্খ আমি, আমার পাঁচবছরের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে এতকাল পরে বুঝতে পারলাম বাবা আমাকে কি দিতে চেয়েছিলেন—এবং তা আমি পেয়েও গেছি।

সেই অনেকদিন আগের এক পিতাপুত্রের মত ছেলের কপালে চুমু খেয়ে তার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম—জানিস খোকা, আমি মরবার আগে তোকে একটা সুন্দর জিনিস দিয়ে যাবো।

ফুল মার্কস

রাত সাড়ে দশটা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাতের পোশাক পরে মুখে হার্বাল ক্রিম মাখছে মালা। স্বামী অতনু বাটিক প্রিন্টের লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা নোটপ্যাডে কলম দিয়ে কি সব হিসাব করছে। বাইরে রাস্তায় যানবাহনের শব্দ কমে এসেছে। এমনিতেই সারাদিন সল্টলেকের এই নতুন গড়ে ওঠা প্রান্ত অঞ্চলটি একটু ঝিমিয়ে থাকে, রাত নটার পর প্রায় পরিত্যক্ত ভৌতিক বসতিতে পরিণত হয়। রাস্তায় সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প জ্বলে, দুধারে আধুনিক গঠনের প্রাণের লক্ষণহীন বাড়ির সারি, তার জানালার ঘসা কাচ দিয়ে ভেতরের মৃদু, স্বপ্নিল আলো দেখা যায়, হালকা শব্দ করে এয়ার কুলার চলে। কারা থাকে এইসব বাড়িতে? তারা কি ভালবাসে? ভয় পায়? কবিতার বই পড়ে? আলুপোস্ত, কলাইয়ের ডাল আর কাটোয়ার ডাঁটার চচ্চড়ি খায়?

এই উপনগরী মানুষের তৈরি, কিন্তু মানুষের নয়।

উদ্ভাসিত হলুদ আলোয় নির্জন পথ চলেছে সোজা, এখানে ওখানে কৃষ্ণচূড়া বা জারুল গাছ শূন্যতার যতিচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে, সব মিলিয়ে স্পিলবার্গের সায়েন্স ফিকশন ছবির একটি দৃশ্যের মত, এক্ষুনি এই পথের ঠিক মাঝখানে সুদূর নক্ষত্রলোকের কোনো গ্রহ থেকে নেমে আসতে পারে মহাকাশযান।

মালা বলল—কি অত হিসেব করছ সেই থেকে?

—উঁ?

—বলছি, কি লিখছ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুখ তুলল অতনু, বলল—চার পার্সেন্ট কম হচ্ছে।

—চার পার্সেন্ট? কিসের চার পার্সেন্ট?

—বুবাইয়ের মান্থলি টেস্টগুলোর নম্বর যোগ করে একটা অ্যাভারেজ তৈরি করলাম। কত হল জানো?

—কত?

—মাত্র ছিয়াশি পার্সেন্ট। ভাবতে পারো? এত ভাল স্কুল, এত কোচিং, টিউটর—শেষে এই! নব্বই পার্সেন্টের কমে কোথায় ভর্তি করতে নিয়ে যাবো ওকে? জয়েন্ট এন্ট্রান্সে কোন পাতালে তলিয়ে যাবে বিলিয়ান্ট ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে—

মালার মুখে চিন্তার রেখা পড়ল, ক্রিম মাখা শেষ করে সে চুলের জট ছাড়ানোর চিরুনি হাতে নিয়ে বিছানায় স্বামীর পাশে এসে বসল।

দাঁতে কলমটা ঠুকতে ঠুকতে অতনু বলল—বুবাই ঠিকঠাক কোচিং-এ যাচ্ছে?

—তা যাচ্ছে। গত মাসে কেবল একদিন সর্দি হয়েছিল বলে আমিই যেতে বারণ করেছিলাম।

—স্কুল?

—সেদিকেও কোনও গোলমাল নেই। শুনছি অ্যাটেন্ডেনসের জন্য ও এবছর প্রাইজ পাবে—

—হুঁ।

নিজের লেখা হিসেবের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল অতনু।

মালা জিজ্ঞেস করল—কিসে কম হচ্ছে ওর?

—মোস্টলি ইন ম্যাথমেটিক্স। গত বছর যে ছেলে ফুল মার্কস পেতো, একশোতে একশো, এ বছর তার নম্বর কোনো মাসে আশি, কোনো মাসে সাতাত্তর! ব্যাপার কি?

—ব্যাপারটা আমিও লক্ষ করেছি, কিন্তু তোমাকে বলিনি। এমনিতেই তুমি সারাদিন কাজে যা ব্যস্ত থাকো, আই ফিল রিলাকট্যান্ট টু বার্ডেন ইউ উইথ মোর ওয়ারিজ—

অতনু সোজা হয়ে বসে বলল—বুবাইদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় ঋজু না?

—হ্যাঁ। ঋজু সেনগুপ্ত—

—ছেলেটা অঙ্কে ছিয়ানব্বই পেয়েছে। সেখানেও চার নম্বরের ফারাক। না, মালা, শোনো—অঙ্কে বুবাইকে একশো পেতেই হবে, নইলে গড়ে নাইনটি পার্সেন্ট হবে না। এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার, কাল ওর সঙ্গে বসে একটু আলোচনা করব—

স্বামী স্ত্রীর ঘরের সামনে একটুখানি হলওয়ে, তারপর ডাইনিং স্পেস, তার ওধারে বুবাইয়ের ঘর। সে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অভ্যাসবশত অতনু কাত হয়ে শোওয়া অবস্থাতেই এক হাত দিয়ে স্ত্রীকে গায়ের ওপর টেনে আনল, চুল এলোমেলো করে দিল।

—এই ছাড়ো, বুবাই ঘুমোয়নি এখনো—

—জাস্ট এ লিট্‌ল—

—প্লিজ, না। আই ডোন্ট ফিল লাইক ইট—

—টায়ার্ড?

—সর্ট অফ। শোনো, বাগবাজার গিয়েছিলে আজ?

অতনু বলল—যাঃ, একদম খেয়াল ছিল না। বিশ্রি ব্যাপার হল তো!

মালা বলল—কালই পাঠিয়ে দেবে, নইলে সেই সেবারের মত বাবা আবার ফোন করবেন। তুমি না থাকলে আমাকেই কথা বলতে হয়, আমার খুব বাজে লাগে। যে টাকা কমিট করা আছে সেটা সময়মত পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। যদিও আমি জানি না তোমার এ রকম কমিটমেন্টের মানে কি আচ্ছা, তোমার বাবা তো সেন্ট্রাল গভমেন্টে কাজ করতেন, উনি পেনশন কি রকম পান? বেশ কিছু রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটও তো নিশ্চয় পেয়েছেন, তাহলে তুমি প্রতি মাসে শুধু শুধু—

ঘনিষ্ঠতার ইচ্ছেয় বাধা পেয়ে অতনুর একটু রাগ হয়েছে, সে নীরস গলায় উত্তর দিল—কত পান জানি না, জানবার দরকারই বা কি? বাবা-মাকে টাকা দেওয়া আমার সোশ্যাল ডিউটি—

—যে বাবা-মা একবার এসে তোমার খোঁজও করেন না।

—সেটা বোধহয় দুদিক দিয়েই ভাল। এলে ওঁরাও খাপ খাওয়াতে পারেন না, আর তুমিও স্বস্তি পাও না। খামোকা জটিলতা বাড়িয়ে লাভ কি?

মালা বলল—আর তুমি? তুমি খাপ খাওয়াতে পারো?

অতনু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে হেসে বলল—উই আর কোয়ারেলিং লাইক চিলড্রেন, অনেক রাত হয়েছে—কাম, লেট্স হিট দি বেড। সকালে অনেক কাজ আছে—

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে অতনু বলল—বুবাই, ম্যাথে তোমার মার্কস কিন্তু মিজারেবলি কমে গিয়েছে। এর কারণ কি?

দুধের বৌলে কেলগ কর্নফ্লেক্স ছড়িয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বুবাই মাথা নিচু করে বলল—থার্ড টার্মে তো ভাল করেছি।

—না, করনি। ঋজু ছিয়ানব্বই পেয়েছে, তুমি বিরানব্বই। আগে তো তুমি ফুল মার্কস পেতে। মনে রেখো, সব মিলিয়ে নাইনটি পার্সেন্টের কম হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

নিঃশব্দে কয়েক চামচ কর্নফ্লেক্স খাওয়ার পর বুবাই বলল—বাবা—

—কি?

—বুধবার আমার কোনো কোচিং নেই। আমরা চার-পাঁচজন বন্ধু মিলে প্রতি বুধবার একসঙ্গে বসে অঙ্ক করব ঠিক করেছি। তাতে নম্বর বাড়বে বলে মনে হয়—

—কোন কোন বন্ধু? কেমন ছেলে তারা?

—ভাল ছেলে বাবা, আমাদের সকলেরই এক প্রবলেম—

অতনু একটু ভেবে বলল—একদিক দিয়ে জিনিসটা ভালই, স্টাডির ব্যাপারে ইনটার-অ্যাকশন প্রেফারেব্‌ল। তবে এইটি-ফাইভ পার্সেন্টের কম পায় এমন কোনো ছাত্রের সঙ্গে টিম আপ করবে না। আমাকে ঠিকানা বলে দেবে, অফিস থেকে ফেরার সময় নিয়ে আসব—

—তার দরকার হবে না বাবা। স্কুলের কাছেই কারো বাড়িতে বসব, চেনা রাস্তা, সাড়ে-সাতটা কি আটটার মধ্যেই ফিরে আসব।

মালা বলল—বুবাই, তোমার ঠোঁটের কোণ দিয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ছে, বি কেয়ারফুল হাউ ইউ আর টেকিং ইয়োর ফুড। ন্যাপকিন নাও, মুছে ফেলো—

খাওয়া শেষ করে বুবাই স্কুলের জন্য তৈরি হতে গেল। তাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে অতনু অফিসে যাবে। ফেরবার সময় বুবাই একাই চলে আসে।

মালার বয়েস পঁয়ত্রিশ ছাড়াল। এখন তার কোমরে এবং শরীরের বেমানান জায়গায় সামান্য মেদাধিক্য ঘটেছে, এবং সেজন্য মালা বেশ ভীত। বুকম্যান থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক কয়েকখানা বই কিনে এনেছে, রোজ সকালে উঠে খাবারের পরিমাণ এবং ক্যালোরি হিসেব করে নেয়। এখন সে একগ্লাস টম্যাটো জুস, দু টুকরো শসা আর মাখন ছাড়া একপিস টোস্ট খাচ্ছে। জুসে চুমুক দিয়ে সে বলল—আজ মনে করে তোমার বাবার ওটা পাঠিয়ে দেবে। আই ক্যান হার্ডলি ফেস অ্যানাদার ফোন কল—

অতনু খবরের কাগজের বিজনেস সেকশনে ডুবে ছিল, বলল—উঁ?

—তোমার বাবার ব্যাপারটা মনে রেখো।

—হুঁ।

তাদের কোম্পানি একটা বড় মার্জারের দিকে এগোচ্ছে, যদি হয়ে যায় তাহলে তাব পদ আর উপার্জন বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বিষয়টা এখনো উঁচুমহলের চার-পাঁচজন ছাড়া বিশেষ কেউ জানে না, চেপে রাখা হয়েছে। কারণ যৌথ উদ্যোগ শুরু হলেই এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু লোককে ছাঁটাই করতে হবে। উপায় নেই, তারা বাড়তি হয়ে যাবে। পুরো চুক্তি সই হওয়ার আগে কেউ কিছু জানবে না। অতনু গতকাল স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং বন্ধ হওয়ার সময়ে মার্জারের সঙ্গে যুক্ত অন্য কোম্পানিগুলোর শেয়ার দর দেখছিল। বুবাই স্কুল ইউনিফর্ম পরে এসে দাঁড়াল।

—চল বাবা।

অতনু অফিসের পোশাক পরেই ব্রেকফাস্টে বসেছিল, সে কাগজ রেখে উঠে দাঁড়াল।

অন্যদিন অফিস ছেড়ে বেরুতে বেরুতে তার সাড়ে-সাতটা কি আটটা হয়ে যায়। আজ সে পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল, পার্কি স্পট থেকে লালরঙের মারুতি এইট হানড্রেড বের করে রাইটার্সের পিছন দিয়ে ডাইনে ঘুরে সেন্ট্রাল এভিনিউতে এসে উঠল। ড্রাইভার রাখলে তার খরচ অফিস থেকে দিয়ে দেবে। কিন্তু অতনু গাড়ি চালাতে ভালবাসে। তবে কলকাতা শহরের দশা ক্রমে যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে এ শহরে আর বেশিদিন গাড়ি চালানো যাবে বলে মনে হয় না। কি অবস্থা হয়ে আছে সেন্ট্রাল এভিনিউর! এতদিন তো পাতাল রেলের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে চলেছে। এবার? এখানে মাটি খোঁড়া, ওখানে তিনটে বিশাল লোহার জয়েস্ট আড়াআড়ি পড়ে আছে, রাস্তা কোথাও নামছে কোথাও উঠছে, গাড়ি বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ভাল লাগে শহরের বাইরে ড্রাইভ করতে। দু-তিনশো কিলোমিটারের মধ্যে অফিসের কোনো ট্যুর থাকলে অতনু গাড়ি নিয়েই যায়, কখনো কখনো মালা আর বুবাইকে সঙ্গে নেয়। থ্রি-স্ট্রোক এঞ্জিনের হালকা গাড়ি, দারুণ পিক-আপ। চালিয়ে মজা।

বাগবাজারে ঢুকে একটু এগিয়ে বাঁদিকে নন্দলাল বসু স্ট্রিট। একখানা ছোট হলদে রঙের দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল অতনু। এই বাড়িতে তার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন কেটেছে। বসবার ঘরের জানালার পাল্লায় ছুরি দিয়ে সে নিজের নাম লিখেছিল। এখনো আছে কি? রাস্তা থেকে দরজায় ওঠবার যে চারটে সিঁড়ি, বর্ষার দিনে দৌড়ে নামতে গিয়ে সেখানে একবার মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে থুতনির কাছে অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। মা শাড়ির আঁচল দিয়ে চেপে ধরে বসেছিলেন, বাবা পাড়ার যামিনী ডাক্তারকে ডেকে আনতে গিয়েছিলেন। মায়ের আঁচল রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছিল।

অনেক স্মৃতি। দিনের বদল কি অদ্ভুত, স্মৃতিকে কেমন ধূসর করে দেয়।

বাবা ভেতরের বারান্দায় প্রিয় বেতের চেয়ারটায় বসে আছেন, মা বোধহয় রান্নাঘরে। অতনু প্রণাম করতে কৃষ্ণেন্দু খুশি হয়ে বললেন—কে, খোকা? ওগো, শুনছ? খোকা এসেছে—

অমলা চা করছিলেন, হাসিমুখে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন। অতনু মাকে প্রণাম করে পলিথিনের ক্যারিব্যাগটা মায়ের হাতে দিল। অমলা বললেন—কি এতে?

—কেক আছে, বাবার জন্য ডালমুট, হরলিক্স, তোমার জন্য ক্রিম বিস্কুট আর জরদা—

আর একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স অমলার হাতে দিল অতনু।

—এতে আবার কি?

—তোমার জন্য একটা শাড়ি আর বাবার জন্য পাঞ্জাবির কাপড়—

কৃষ্ণেন্দু বললেন—এসব আনবার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না, অনর্থক তুই...

কথা চলে। অমলা চা এনে দিয়ে ছেলের জন্য খাবার করতে যান। তাঁর হেঁসেলে ফাস্ট ফুড, চাইনিজ বা অন্য আধুনিক খাবারের কোনও উপকরণ নেই, তিনি পুরনো ধরনের আদর বোঝেন। তাড়াতাড়ি ময়দা মেখে পরোটা আর আলুভাজা করে ছেলেকে এনে দিলেন। বসলেন কাছে।

কোথায় যে কি একটা গোলমাল হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত কিছুই আর আগের মত থাকে না। এই বাড়িটার প্রত্যেক ঘরে, আনাচে-কানাচে কত আনন্দের স্মৃতি ফিকে হয়ে যাওয়া জলছবির মত মিশে রয়েছে। এখানে এলেই অতনুর মন কেমন করে ওঠে, বাবা আর মায়ের কাছে আবার শিশু হয়ে থেকে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে জানে তা আর হওয়ার নয়, ওসব রোমান্টিক স্বপ্ন মাত্র। এই তো, এর মধ্যেই তার গরম লাগছে, নিজের শোওয়ার ঘরে এয়ার কুলার নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা পরিবেশে পায়জামা আর হালকা পাঞ্জাবি পরে প্রাইম স্পোর্টস চ্যানেলে মিড্‌লসেক্সের সঙ্গে ভারতের ম্যাচ দেখতে ইচ্ছে করছে। দশটায় পাতলা চার পিস চিকেন স্যান্ডউইচ, একটু স্যুপ সামান্য পুডিং। বুবাই ঘুমিয়ে পড়লে কোনোদিন বা বরফের কিউব দিয়ে একটা ছোট পেগ হুইস্কি। এই বাড়ির স্বল্প আয়তনে, সীমিত আয়োজনে তার আর খাপ খাবে না।

তবু কোথাও একটা গোপন, সূক্ষ্ম আকর্ষণ থেকেই যায়। মন খারাপ করে। কষ্ট হয়।

অমলা বললেন—বুবাইকে আনলি না কেন?

পরোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে অতনু বলল—আমি তো অফিস থেকে সোজা এসেছি, ও স্কুলে ছিল।

—বুবাইকে এখানে রেখে যাস না কদিনের জন্য, ও খুব ভালবাসে এখানে আসতে। এমনিতে তো আর হয় না, বছরে দু-একদিন যা নিয়ে আসিস—

—ঠিক আছে মা, এবার যেদিন আসব দেখব চেষ্টা করে। পড়াশুনোর এত চাপ—এই তো ম্যাথমেটিক্সের জন্য প্রতি বুধবার ওরা কজন বন্ধু একসঙ্গে বসবে ঠিক করেছে। সময়ই পায় না—

কৃষ্ণেন্দু বললেন—এত চাপের মধ্যে রাখিস কেন? তোদের সময় তো এমন ছিল না—

—আজকাল লেখাপড়ার ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে বাবা। দারুণ কমপিটিশন,

একটু ঢিলে দিলেই সর্বনাশ! জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভাল না করতে পারলে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং কিছুতেই—

—সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে, কোম্পানির ম্যানেজার হবে, তাহলে স্কুলে-কলেজে কারা পড়াবে খোকা? সবাই বড়লোক হবে, তাহলে জ্ঞানী হবে কারা?

অতনু বলল—তা কেন? একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকুরে কি জ্ঞানী নয়?

কৃষ্ণেন্দু বললেন—না। তুমি জিনিয়াস আর টেকনোক্র্যাট, উইজডম আর ইনফরমেশানে গুলিয়ে ফেলছ। প্রতিভাধর মানুষেরা প্রগতির নতুন পথ দেখান, প্রযুক্তিবিদেরা তাই ভাঙিয়ে খান। ইনভেনটিভ ব্রেন আর স্কিল্‌ড লেবার এক জিনিস নয়। ছেলেকে উদ্ভাবক কর, যন্ত্রমানুষ করো না—

কৃষ্ণেন্দু রেগে গেলে বরাবরই ছেলেকে 'তুমি' সম্বোধন করেন, অতনু বাবাকে ঘাঁটালো না।

অমলা বললেন—আর পরোটা নিবি?

—না মা, এই যথেষ্ট। আমি বিকেলে জলখাবার খাই না।

আরো কিছু কিছু গল্প হল। খবরের আদান-প্রদান। তারপর অতনু বলল—মা, এইবার আমি তাহলে আসি। সামনের মাসের প্রথমদিকে একবার আসব এখন। আর, ইয়ে—এইটে রাখ—

পকেট থেকে টাকাভর্তি খামটা বের করে বাড়িয়ে ধরল অতনু।

অমলা নেওয়াব আগেই কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন—কি ওটা?

—ইয়ে, আমি যেটা মাসে মাসে দিয়ে থাকি—

—ওটা এমাস থেকে আর প্রয়োজন হবে না।

অতনুর মুখ পাংশু হয়ে গেল, সে বলল—কেন বাবা, আমার কি দিতে ইচ্ছে করে না?

কৃষ্ণেন্দু বললেন—করা উচিত, এবং করেও নিশ্চয়। কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। আমার বিশ্বাস তোমার সংসারে সিদ্ধান্তের বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন নও, প্রতি মাসে আমাদের টাকা দেওয়ার নিয়মটা বজায় রাখলে তোমায় অশান্তি ভোগ করতে হবে। তাছাড়া আমি একেবারে সম্বলহীনও নই, পেনশন যা পাই আর ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ থেকে আমাদের দুজনের ভালই চলে যায়। বিলাসিতা তো কিছু নেই। গত মাসে টাকার জন্য ফোন করতে হয়েছিল অন্য কারণে। শুক্রবার ফোন করেছিলাম মনে আছে বোধহয়? পরের দিন সন্ধ্যেবেলা একজনকে দেনা শোধ করব কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু কি কারণে যেন শনিবার ব্যাঙ্কের ছুটি পড়ে যায়। তুমি তো জানো, আমি কথা রাখতে ভালবাসি। লোকটা টাকা নিতে এসে ফিরে যাবে, এ আমার সহ্য হত না। দু-পাঁচ হাজার টাকা ধার দেওয়ার মত বন্ধু কলকাতা শহরে এখনো আমার কয়েকজন আছে, কিন্তু আমার পক্ষে সবচেয়ে গৌরবের হল তোমার কাছে চাওয়া, সেজন্যেই ফোনটা করেছিলাম। তুমি বাড়ি ছিলে না, বৌমা ফোন ধরলেন। বৌমার সঙ্গে আমার এসব কথা বলবার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমার তো ফোন নেই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই মোড়ের পেট্রোল পাম্পের কাছে পাবলিক বুথ থেকে ফোন করতে হয়। এই বয়সে বারবার তা আর পেরে উঠি না। তাই বলেছিলাম। বৌমা অবশ্য আমাকে কোনো রূঢ় বা অন্যায় কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর গলার স্বরে আর কথার ধরনে আমার মনে হয়েছে প্রতি মাসের এই প্রথা বজায় রাখলে তুমি অশান্তিতে ভুগবে—

অতনু মাথা নিচু করে শুনে গেল, তারপর বলল—আমার সংসারে কিছু কিছু ব্যাপারে মতের অমিল আছে ঠিকই, কিন্তু এ টাকা আমি রোজগার করেছি, শেষ কথাও আমিই বলব।

—তাহলে ওটা তোমার মায়ের হাতেই দাও। আমার কথা তোমাকে বলেই দিয়েছি। আর একটা কথা, এটা না বললেই বোধহয় ভাল হত, কিন্তু বর্তমানে আলাদা থাকলেও পরিবার তো একই, যেখানেই যে থাকুক না কেন, পরিবারের সদস্যদের দু-একটা কথা বলার অধিকার থেকেই যায়। কথাটা এই, বৌমা যে মনে করেন আমাদের এখানে বেশি এলে বুবাই সেকেলে রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, যথেষ্ট স্মার্ট হয়ে উঠতে পারবে না, এটা বোধহয় ঠিক নয়। আমাদের দুই সংসারের রকমসকম এখন ভিন্ন বটে, কিন্তু যাকে শিক্ষিত হতে হবে, তাকে জীবনের সবদিক দেখেশুনেই বড় হতে হবে। নইলে তার ব্যক্তিত্বের গঠন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর পৌত্রের ওপর আমাদেরও কিছু সামাজিক অধিকার আছে বইকি। মাঝে মাঝে যোগাযোগ না থাকলে সে তো আমাদের চিনবেই না। সেটা কি গৌরবের?

অতনুর অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সে সব কথা বলে লাভ নেই। জীবনের প্রবাহ অমোঘ, একমুখী। বেশির ভাগ সময়েই মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণে নয়, যেমন তার ক্ষেত্রে নয়। মালার আর যাই ত্রুটি থাক, মালা তাকে ভালবাসে। তাকে কষ্ট দেওয়ার অধিকার তার নেই। সবার পছন্দ একরকম হয় না, তার বাবা-মায়ের সঙ্গে মালার বনল না—ঘটনাটা দুঃখের, কিন্তু মেনে নিতেই হবে। এই মানিয়ে নেওয়ার নামই বেঁচে থাকা। বাবা-মাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু—

অতনু বলল—আজ আসি মা। বাবা, আসছি। তোমরা ভাল থেকো।

বাড়ি এসে অতনু দেখল মালা হেল্‌থ কেয়ার থেকে তখনো ফেরেনি। সপ্তাহে তিনদিন মালা মালটি-জিম এক্সারসাইজ করতে যায়, সাইক্লিং, ভাইব্রেটর, সান বাথ ইত্যাদির অন্তে বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি আসে। বুবাই তার ঘরে পড়ছে। ছেলের সঙ্গে একবার দেখা করে জামা-কাপড় বদলে স্নান করল অতনু, তারপর শোওয়ার ঘরে উমবের্তো একোর একখানা উপন্যাস নিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে পড়তে শুরু করল। বইখানার নাম ফুকোজ পেন্ডুলাম, এক সাহিত্যবাতিকগ্রস্থ সহকর্মী তাকে এটা আজ গছিয়েছে। দেওয়ার সময়ে বলেছে—আরে, পড়ে দেখুন মশাই, বিদেশে সাহিত্য কোথায় এগিয়ে গেল, কত রিসার্চ, কত পরিশ্রম—আর বাংলা উপন্যাসের চরিত্ররা এখনো দাড়ি রাখে, কাঁধে ঝোলা নিয়ে বড় বড় ভাবের কথা বলে বেড়ায়—

—কি বই এটা?

—উমবের্তো একো-র নাম শোনেননি? কন্টিনেন্টে এঁকে নিয়ে তো আজকাল দারুণ হৈ-চৈ। পড়ে দেখুন, তাড়াহুড়ো করবেন না। একটু একটু করে, চেটে চেটে পড়বেন—

শুধু চেটে কেন, কামড়ে, শুঁকে বা চিবিয়েও অতনু বইটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারল না। সে সাধারণত স্টিফেন কিং, উইলবার স্মিথ বা হ্যাডলি চেজ পড়ে, সাহিত্যে তার বিশেষ ঝোঁক নেই। তার মতে গল্পে গল্প থাকতে হবে, তত্ত্বের ফাঁকিবাজি চলবে না।

কলিং বেল বাজল। কাঠঠোকরার ডাকের মতো—কঠ্‌-র-র্‌-র—

অতনু চেঁচিয়ে বলল—বুবাই, দরজা খুলে দাও, মা এসেছেন—

একটু পরে মালা ঘরে ঢুকল। তার রঙ এমনিতেই ফর্সা, কিছুক্ষণ মাত্র আগেই স্টিম বাথ নিয়ে আসায় মুখের রঙ পাকা আপেলের মতো লাল্‌চে দেখাচ্ছে। অতনু মুগ্ধ চোখে দেখল, বলল—এসো না, এইখানে বোসো—

মালা এসে স্বামীর পাশে বসল, বলল—কখন এলে?

—এই তো, ঘণ্টাখানেক হল। তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে—

—নো ফ্ল্যাটারি। আই সাপোজ আই নো হোয়াট ইউ আর গেটিং অ্যাট—

—না, সত্যি। একেবারে—একেবারে মেরিলিন মনরো।

মালা হেসে বলল—তুমি আর উপমা খুঁজে পেলে না? মেরিলিন বেঁচে থাকলে তার বয়েস এখন সত্তর ছাড়াতো—

অতনু বলল—অপ্সরাদের বয়েস বাড়ে না, তারা চিরযৌবনা—

—হয়েছে, বুঝেছি। আজ খুব মুডে আছো। আচ্ছা, ও বাড়িতে গিয়েছিলে? দিয়ে এসেছ?

—হুঁ। গত মাসের ফোনের ব্যাপারটা বাবা নিজেই বললেন, পর পর দুদিন ব্যাঙ্কের ছুটি পড়ে যাওয়ায় ওঁকে বাধ্য হয়ে ফোন করতে হয়েছিল, পরের দিন কাকে টাকা মেটাবেন বলেছিলেন—

মালা বলল—কারণ একটা না একটা থাকেই, তবে আমার সঙ্গে বিষয়টা না আলোচনা করলেই ভাল করতেন। আমি জানি তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তুমি রিসেন্ট কর, কিন্তু সেটা এই ধরনের কিছু আচরণের জন্য। বুবাইকে বেশি পাঠাতে চাই না, কারণ আই ওয়ান্ট হিম টু গ্রো সিভিলাইজড্—

অতনু বলল—বাবার আজকাল হাঁটতে কষ্ট হয়। বাড়িতে তো ফোন নেই, অনেকটা পথ হাঁটলে তবে পাবলিক বুথ। তাই আমাকে না পেয়ে তোমাকেই বলেছিলেন খবরটা দিতে। জিনিসগুলো একটু সহানুভূতি নিয়ে বিচার কর।

মালা বুদ্ধিমতী। সে কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল।

জীবনের কোনো কোনো অংশে নীরবতা বিরাজ করে, ফিল্মের মতো। ফিল্মের ছবি কিন্তু চলে, চলে পূর্ব-নির্ধারিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী। অতনু বুঝতে পারল মালার চুপ করে যাওয়া কোনো কিছু মেনে নেওয়ার, কোনো পরিবর্তনের দ্যোতক নয়। এটা শূন্যতার দ্যোতক, জীবনের চিত্রনাট্যে এইখানে কোনো সংলাপ নেই, সঙ্গীত নেই, পূর্ণতার ইঙ্গিত নেই। এখানে ব্যবধানের নির্জন মরুময় প্রসার।

কিন্তু ফিল্ম চলছে। এগুচ্ছে পূর্ব-নির্ধারিত সমাপ্তির দিকে।

খাবার টেবিলে অতনু বুবাইয়ের খোঁজ নিল। মালার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলল। ভি সি পি-র রিওয়াইন্ডিং মেকানিজমটা ভাল কাজ করছে না, সেটা মেরামত করবার কথা উঠল।

রাত্রে মালা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তখনো অতনু জেগে। মাঝে মাঝে তার এমন হয়, ঘুম আসে না, বুকের ভেতরের বন্ধুহীন শূন্যতায় সময়ের পেন্ডুলাম দোল খায়। সে আসলে দুভাগ করা মানুষ। একভাগে তার ফেলে আসা দিনগুলির প্রতি বিশ্বস্ত ভালবাসা, অন্যদিকে বর্তমান জীবনের প্রতি অসহায় সমর্পণ। দুটো দুরকম, একটা জীবন যখন সে যাপন করে, অন্যটার জন্য জেগে থাকে হাহাকার।

জীবনের মজা এই, নিজের বিচিত্র চলমানতা দিয়ে সে সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়, সব বিবর্ণ ছবিকে রঙীন করে তোলে। পরদিন অফিসে গিয়ে অতনু খবর পেল সে ডেপুটি ম্যানেজার হয়েছে। মাইনে বাড়ল অনেক, তার সঙ্গে সম্মান। দুপুরে একটা গোলাপী খাম তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলেন ক্যাশ ইনচার্জ মুখার্জিবাবু, খামের ওপরে টাইপ করে লেখা—ইনসেনটিভ বোনাস, কনগ্র্যাচুলেশন্‌স। মোটা খাম, খুলে অতনু দেখল একশো টাকার নতুন একটা বান্ডিল, ব্যাঙ্ক থেকেই পিন দিয়ে গাঁথা। দশ হাজার টাকা।

তাৎক্ষণিক উল্লাস অনেক স্থায়ী বিষণ্ণতাকে সাময়িকভাবে মুছে দেয়। এই আচমকা টাকাটা পেয়ে অতনুরও বেশ আনন্দ হল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে বলে সে দুপুরে বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। গ্লোব সিনেমার সামনে পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে ঢুকল নিউ মার্কেটে। মালার জন্য কিনল কিছু দামি কসমেটিক্স, রাত্রির পোশাক, অন্তর্বাস। নিজের জন্য দুটো শার্টের লেংথ আর দুটো টাই। বুবাইয়ের জন্য একটা ভাল কার্টিজ পেন, একটা ভিডিও গেম আর কয়েকখানা অ্যাডভেঞ্চার গল্পের বই।

সেদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে বেশ একটা উৎসবের আবহাওয়া। সবাই খুশি, সবাই আনন্দ করছে। অতনুর মনে সফল মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদ।

হপ্তাখানেক পরে একদিন সকালে অফিস যাওয়ার সময় পোশাক বাছতে গিয়ে অতনু দেখল গোলাপী খামটা বাকি টাকাসুদ্ধ আলমারির মাঝের তাকে গোঁজা রয়েছে। টাকাটা সে মালাকে দিতে ভুলে গিয়েছে, আর মালা ভেবেছে সে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে।

কি ভেবে সে হাজারখানেক টাকা বের করে পকেটে রাখল।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে বাগবাজারের পথ ধরল অতনু। এই বাড়তি টাকায়, এই উৎসবে তার বাবা আর মায়েরও ভাগ আছে। এটা সে আজই মায়ের হাতে দেবে।

কলিং বেল টিপতে দরজা খুললেন অমলা। ছেলেকে দেখে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

অতনু অবাক হয়ে বলল—কি হয়েছে মা?

ভেতর থেকে কৃষ্ণেন্দুর গলা—কে এল? ওঃ, খোকা!

বাবার গলাও সন্ত্রস্ত। কি হয়েছে আজ এদের? তাকে দেখে মা-বাবা খুশি না কেন?

তারপরেই অমলার কাঁধের ওপর দিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকা ছেলেকে দেখতে পেয়েছে অতনু। হাতে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে বুবাই আড়ষ্ট হয়ে বসে। পাশে ইস্কুলের ব্যাগ।

অতনুর মাথায় খেলে গেল—আজ বুধবার।

অমলা বললেন—ওকে কিছু বলিস না খোকা, আমার মাথার দিব্বি। বেশি আসে না, সত্যি বলছি, দু-তিনদিন মাসে। ওকে কিছু বলিস না—

অতনু ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল, বলল—কি খাচ্ছিস?

কাঁপা কাঁপা গলায় বুবাই বলল—আচারের তেল দিয়ে মাখা মুড়ি—

অতনু বলল—মা, আমাকেও একটু মেখে দাও তো। আর চা বসাও—

অমলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। একটু কেশে চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজ হাতে তুলে নিলেন কৃষ্ণেন্দু।

বুবাই বলল—বাবা—

—কি?

—আমি অঙ্কে ফুল মার্কসই পাব। বুধবারটা বের করার জন্য ইচ্ছে করে দুটো অঙ্ক ভুল করেছিলাম—

মুড়িব বাটি হাতে নিয়ে অতনু বলল—ঠিক আছে। কিন্তু মাকে বলবি না, খবর্দার।

শাখাপ্রশাখা

বাড়ির সবার ইচ্ছে ছিল ছেলেটি পারিবারিক ব্যবসায় বসবে, কিম্বা যন্ত্র তৈরি করবে, কিম্বা ভেষজশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে, কিম্বা একজন হিসাবশাস্ত্রী হবে। যা যা করে বড় হওয়া যায়, অনেক ঐশ্বর্য একত্র করা যায়, সমাজে একজন মান্য এবং ক্ষমতাবান মানুষ হয়ে ওঠা যায়। অর্থাৎ যা নিয়ম। সবাই যা করে। কিন্তু বিপদ হল, ছেলেটি তার ছোটবেলায় একবার আকাশ দেখে ফেলেছিল। সেই সময় আকাশের কিছুটা তার বুকের মধ্যে ঢুকে যায়। এখন আকাশ জিনিসটা অনেক বড় তো, সেইজন্য চারপাশের মানুষ যা নিয়ে ভারি খুশি থাকে, তা দেখে তার কেবলই মনে হয়—এত সামান্য কেন? উচ্চতায় এত কম কেন? ওজনে এত হালকা কেন? দেখতে এত বিবর্ণ কেন?

প্রশ্নগুলো তাকে কষ্ট দিত। তার বয়েসী আর কাউকে দিত না। বড়দেরও না। এই কারণে ধরে নেওয়া হল তার বিচিত্র কোনো অসুখ করেছে। নামী চিকিৎসকরা তার অনেক চিকিৎসা করলেন। বিশেষ কোনো ফল হল না। ছেলেটি স্থির করল সে আর ওষুধ খাবে না। সে পড়তে যাবে।

ভাল কথা। যা। কোথায় যাবি? যন্ত্র তৈরিব কাবখানায়? হিসাবশাস্ত্রীদের দপ্তরে? বিজ্ঞানের ধনাগাবে?

না। সে যেতে চায় অরণ্যবাসী দর্শনাচার্যের কাছে। সে আকাশ দেখে ফেলেছে।

পাগল তুই, একেবারে পাগল। সেখানে গিয়ে কি করবি? অন্য কোথাও যা।

কিন্তু আর তা হয় না। প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটে আসা হাওয়া তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে, নক্ষত্রেরা তার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে, সৌরবাতাসে ভেসেছে তার ভেলা। শহরের বিপণিতে সওদা করতে সে আর ফিরে আসবে না।

বাড়ির লোকেরা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে তাকে বিদায় দিল। যাঃ, তুই চলে যা।

শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওপর অরণ্যের ভেতর আচার্যের বাড়ি। সেখানে আলো বেশি, অন্ধকার কম। পাতায় পাতায় ফিসফাস। জলে হাওয়ায় শিহরণ।

আচার্য খুশি হলেন। অবাক হলেন। কেউ তো আসে না। কতদিন পর একজন।

পরদিন সকালে, যখন সদ্যোদিত সূর্যের প্রথম আভা এসে লেগেছে পাহাড়ের চূড়াগুলোতে, আচার্য ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গেলেন উদ্যানে। এক কোণে একটি ছোট গাছের চারা রোপণ করে বললেন—প্রত্যহ এর পরিচর্যা করো।

—আর আমার শিক্ষা? আমার অধ্যয়ন?

—এই তোমার শিক্ষা। এই অধ্যয়ন।

রোজ গাছে জল দেয় ছেলেটি, যত্ন করে। গাছটি তরুণ হয়, ক্রমে পরিণত বনস্পতি। কত—কতদিন কেটে যায়। আচার্য প্রৌঢ় হন, বৃদ্ধ হন। ছেলেটি তখন বলিষ্ঠ যুবক। একদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের হাতে ভবনের দায়িত্ব দিয়ে, ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে মুখ করে চিরবিদায় নিলেন আচার্য। চলে গেলেন নক্ষত্রদের কাছাকাছি। বিকেলের রোদ্দুর থেকে তাঁর ছায়া মুছে গেল।

ভবনে যুবকটি একা।
কত—কতদিন কেটে গেল তারপর। যুবকটি প্রৌঢ় হল। বৃদ্ধ।
একদিন ভবনের দরজায় আঘাতের শব্দ। কে, কে, কে এল? কেউ তো আসে না।
দরজা খুলল শিষ্য। একটি বালক দাঁড়িয়ে বাইরে।
সে এখানে থাকবে। সে আকাশ দেখে ফেলেছে।

নির্ভর

বড় ছেলের বয়েস সতের। পুরুষ্টু গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। এই অল্পবয়েসেই সা-জোয়ান চেহারা, যেমনি লম্বা, তেমনি মুগুরের মত হাত-পা। বাপের ধারাটা পেয়েছে আর কি। কিন্তু অন্যদিকে বড় মুশকিল, সংসারের দরকারে তাকে একটুও পাওয়া সম্ভব নয়। চাষী গেরস্তর ছেলে, জমির সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে হবে সারাজীবন। তবু দয়াময় ছেলেকে হাইস্কুলে পড়িয়েছে, এইবার সে দশ ক্লাসের সরকারি পরীক্ষা দেবে। অঙ্কের মাস্টারমশাই বিশ্বনাথবাবু গত বৃহস্পতিবারের হাটেও তাকে ডেকে বলেছেন—দয়াময়, তোমার ছেলেটার বেশ মাথা আছে, ইচ্ছে করলেই অঙ্কে ভাল ফল করতে পারে। কিন্তু বড়ই অমনোযোগী। বাড়িতে পড়ে-টড়ে কৃপাময়?

পড়াশুনো করে ছেলে আমার শরীরপাত করে ফেলল। মাস্টারমশাইকে তো আর সেকথা বলা যায় না। তাই মাথা চুলকে দয়াময় বলল—আজ্ঞে, তা বসে এট্টু এট্টু—

—ও এট্টু এট্টু বসার কাজ নয়, রীতিমত খেটে পড়তে হবে। খালি পাট বুনছো, না ছেলের দিকে নজর রাখছো?

সেটা রাখে দয়াময়। তবে ছেলেকে পড়াশুনো শেখালেও সে বাবু বানাবে না। বি. এ. পাশ করে তো শেষ পর্যন্ত সেই মহকুমা শহরের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে সারা দুপুর লাইন দিয়ে বিকেলে মুখ লাল করে বাড়ি ফেরা। বি. এ. পাশ করুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু ছেলেকে সে চাষের কাজেই রাখবে। না হয় ধান-পাট না-ই করল, দয়াময়ের বহু দিনের একটা স্বপ্ন আছে তার সবটা জমিতে ফুলের চাষ করার। সেটা কৃপাময় করতে পারে। ফুলের সঙ্গে সঙ্গে হাজারি নারকেল, আমের কলম, সুপুরি ইত্যাদির চারাও বিক্রি করা যেতে পারে। কলকাতা থেকে ফুলের দোকান আর নার্সারির লোকেরা নিজেরাই এসে মাল কিনে নিয়ে যাবে। কৃপাময় নিজেও বেকার গ্র্যাজুয়েট হিসেবে এই ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাবে। আহা, এ তার অনেকদিনের স্বপ্ন!

কিন্তু বাপের স্বপ্ন কি ছেলেরা সর্বদা সফল করে? কৃপাময়কে খুঁজেই পাওয়া যায় না সারাদিন। এই বয়েসে গ্রামের অন্য সব ছেলেরা সংসারের কত কাজ করে দেয়। আজ সকালেও দয়াময় মুকুন্দ রায়ের বড় ছেলেকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যান থেকে কাঁধে করে সারের বস্তা নামাতে দেখেছে। বিমল নাথের মেয়ের বিয়ের বাজার হচ্ছে, বাপের পেছন পেছন বস্তা হাতে ঘুরছে তার ছেলে নির্মল। কেমন চমৎকার লাগে দেখতে। তার বৌ অবশ্য তাকেই বকে—অত হড়বড় কোরো না বাপু। অল্প বয়েস, আর কদিনই বা খেলাধুলো করে বেড়াবে? এই তো যা সময়—এরপর একবার দায় কাঁধে পড়লে আর কি আনন্দ করতে পারবে?

—তা বুঝি সবই, কিন্তু কাজ তো শিখতে হবে। আমি চাই না ছেলে চাকরির জন্য দরজায় দরজায় ঘুরুক—

বীণা স্বামীর কথায় অনাস্থা প্রকাশের জন্য একটা অবজ্ঞার মুখভঙ্গি করে।

বীণা যাই বলুক, তার কথার কোনো দাম নেই। সে মেয়েমানুষ, সংসারের দায়-দায়িত্ব কিই বা বোঝে? দয়াময় একটু একটু করে বুড়ো হয়ে পড়ছে। শরীর আজকাল আর আগের মত সমস্ত চাপ সহ্য করে না। এই বয়েসটা হচ্ছে কাজের চাপ হাত বদল করবার সময় এবং এমন একজনের কাছে, যাকে সব কিছু দিয়ে দিলে কোনো ক্ষতির বোধ জন্মায় না। ছোট ছেলে মনের দিক দিয়ে একটু বেশি গুছোনো, কিন্তু তার বয়েস মাত্রই দশ। তার জন্য এখনো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনো পথে বাঁদরখেলার ডুগডুগি শুনে হঠাৎ দৌড়োতে গেলে তার পেন্টুল খুলে পড়ে যায়। তবে বাড়ির পেছনের বাগানে নারকেল পড়ে থাকলে সেই কুড়িয়ে আনে। বাজার করতে গিয়ে বীণার খয়ের আর চুন কিনতে ভুলে গিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেবার উপক্রম করলে সেই মনে করিয়ে দেয়। সময় যাক। ছেলেটা দাঁড়াবে ভাল।

একটা পিপাসা তবু মনের গভীরে জেগে থাকে। বড়ছেলের প্রগাঢ় সান্নিধ্যের জন্য।

বাড়ির দাওয়ায বসে চা খাচ্ছিল দয়াময। দাওয়ারই কিছুটা অংশ পাটকাঠির বেড়া দিযে আড়াল করে রান্নাঘর। সেখান থেকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ভাত ফোটবার বগ্‌বগ্‌ আওয়াজ ভেসে আসছে। বেশ একটা সুন্দর, ঘরোয়া সকাল। বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়ে কেউ হাত দিল নাকি? ও ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ কিসের? নাঃ, কিছু নয়— জামগাছের গুঁড়িতে কাঠঠোকরা পাখিটা বসেছে আবার। নজর রাখতে হয় চারদিকে। নজর না বাখলেই লোকসান।

এই সময় সামনের পথ দিয়ে বনমালী বিশ্বাসকে তার বাড়ির দিকে আসতে দেখল দয়ামব। তাব বাড়িতেই আসছে নিশ্চয়, কারণ গ্রামের এদিকটা নির্জন, আর বিশেষ কোনো বাড়ি ঘর নেই। একটা মতলব নিয়ে আসছে বনমালী। কি সেটা?

সামনা-সামনি এসে বনমালী দাঁড়াল। একগাল হেসে বলল—যাক্‌, তোমাকে পেয়ে গেলাম। ভয় হয়েছিল, এতটা বেলা হয়েছে, দয়াময়দা কাজে বেরিয়ে গেল কি না কে জানে। কি খাচ্ছ, চা?

না, কাপে করে ভাতের ফ্যান খাচ্ছি। বললেই হয় 'চা খাবো', ন্যাকামো দেখলে গা জ্বালা করে—

মুখে অবশ্য দয়াময় বলল—আরে, এসো এসো বনমালী। চা খাবে?

—তা, পেলে এট্টু মন্দ হয় না—

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বনমালী বলল—হ্যাঁ দয়াময়দা, কাপাসিপাড়ার পুকুরে তো অনেকদিন জাল ফেলো নি—এখন জাল সস্তা যাচ্ছে, বল তো ব্যবস্থা করে ফেলি।

দয়াময় বলল—না, ও এখন থাক। মাছ তেমন বড় হয়নি এখনো—

—আর কি বড় হবে দাদা? এরপর তো মাছের গায়ে শ্যাওলা গজিয়ে যাবে। জাল ফেলো এবার।

ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে দয়াময় জিজ্ঞাসা করল—দর কি যাচ্ছে এখন?

—তা ভাল যাচ্ছে। ভাল লোক ধরে আনবো আমি, ভাল দর দেবে। ধরো, দু-কিলোর ওপর পোনা পঁচিশ টাকা, তার নিচে হলে কুড়ি টাকা—

—আর দশ কিলো মালিকের নজর—

—ওটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে দয়াময়দা, পাঁচ কিলো আজকাল রেট যাচ্ছে—

—না ভাই, পারবো না তাহলে। পুকুরে জাল পড়েছে, সব আত্মীয় বন্ধুর কানেই একথা যাবে। তারপর ধরো, মেয়ের শ্বশুর বাড়ি আছে—প্রত্যেককেই কিছু মাছ পাঠাতে হবে। এ তো আর আমি বেচবো না—

বনমালী বলল—ঠিক আছে, সে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে এখন। আট কিলো নিও, আমাকে দু কিলো দিও।

—কেন, তোমার আলাদা কিছু থাকছে না?

বনমালী আবার একগাল মসৃণ হাসি হাসে। বলে—দাদা মিথ্যে বলবো না। পেটটার জন্যই তো সব। মণকরা ত্রিশটাকা দালালি দেয় ফড়েরা। তাতে কি আর চলে দাদা? তুমিই বলো? মাসে কটা পুকুরই বা পাই?

দয়াময় বলে—আর একটা কথা, টাকা কিন্তু পুকুরপাড়ে গুনে নেবো। গত বছর আমার খুব হেনস্থা হয়েছিল। সিমহাটের বঙ্কু পাল ফড়ে নিয়ে এসেছিল। তারা মাছ মেপে তারপর বললে—স্টেশনে চলুন সেখানে কলকাতা থেকে আমাদের লোক এসে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি আর করি, গেলাম পাঁচ কিলোমিটার ঠেঙিয়ে সেই ইস্টিশনে। গিয়ে দেখা গেল সেখানে তাদের লোক আসেনি। তখন বলে কলকাতায় গিয়ে মাল বেচে পরের দিন টাকা পাঠিয়ে দেবে, বঙ্কু পাল জামিন থাকছে। শুনে আমি চেঁচামেচি করে ওইখানেই মাল আটকে দিলাম। জামিন কে? না, বঙ্কু পাল—যাকে বেচলে আড়াইশো গ্রাম সরষের তেলের দামও উঠবে না। শেষে চেনাশুনো দুজন ব্যাপারীর কাছ থেকে টাকা ধার করে তবে আমাকে টাকা দেয়। ওসব ঝামেলায় আমি আর নেই—

—না দয়াময়দা, টাকা তুমি পুকুরপাড়েই গুনে নেবে। নিজে জাল ভাড়া নিয়ে কাজ করতে পারলে অবশ্য বেশি লাভ হত, কিন্তু সে অনেক ঝামেলা। টাকার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি—আমি বঙ্কু পাল নই। এমনিতেই লোকে গালাগালি দিতে হলে বলে 'দালাল', ওটা একটা খারাপ কথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমার প্রতিজ্ঞা—লোক ঠকিয়ে আর বেশি নাম খারাপ করবো না—

বনমালী একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—তুমি হাসছো? তোমাকে দোষ দিতে পারিনে, আমার ইতিহাস তো খুব ভাল নয়—তোমাব কানেও হয়তো কিছু কথা এসে থাকবে। কিন্তু আজকাল আমি বেশি লোভ করা ছেড়ে দিয়েছি। যেখানে একটু ধাঁধা রাখলে বা পার্টির সঙ্গে একটু ঘুরিয়ে কথা বললে অনেক লাভ করা যায়, সেখানেও আমি সোজা কথা বলি, কমে খুশি থাকি। কেন জানো?

দয়াময় তাকাল। বনমালীর মুখ সত্যিই গম্ভীর। সে বলল—কেন?

—কারণ আমার ছেলেটা বড় হচ্ছে। ও আমাকে ভারি ভালবাসে। বুঝলে? ছোট ছেলেরা এমনিতে মায়ের ন্যাওটা হয়, এ ছেলেটা বাপ চাটা। আমি যা বলি তাই বিশ্বাস করে, আমার কথার অবাধ্য হয় না। এখন আমার পক্ষে কোনো অন্যায় কাজ করা খুব বিপজ্জনক, বুঝলে না? যদি ছেলেটা টের পেয়ে যায় তাহলে আমাকে আর ও শ্রদ্ধা করবে না। ছেলের চোখে চোর আর ঠকবাজ মাছের দালাল হয়ে বেঁচে থাকতে পারা যায় দয়াময়দা। তুমিই বলো?

দয়াময় মুখে বলে—ঠিক তো, ঠিক তো। আর ভেতরে ভেতরে উদাস হয়ে যায়।

উঠোনের বেড়ার ওপর একটা দোয়েল পাখি এসে বসে। কুমড়োফুল দোলে হাওয়ায়।

বনমালী উঠে দাঁড়ায়। বলে—লোক দেখি তাহলে? সামনের বুধবার সকালে বাড়ি থাকবে?

—থাকব।

—আমি খদ্দের নিয়ে আসবো একেবারে। সামনাসামনি কথা বলে নিও—

ছেলের সঙ্গে বাপের দেখা দুপুরে খাবার সময়ে। বৌ রাঁধে ভাল। মোচার ঘণ্টতে বড়ি দিয়েছে। কলাইয়ের ডাল আর মৌরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি। কৃপাময় ফেলে ছড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে খায়। বাপ বলে—ও কি খাওয়া হচ্ছে? কেমন চমৎকার রেঁধেছে বল দেখি তোর মা? অমন করে খেলে কি স্বাদ পাওয়া যায়? ধীরে ধীরে জমিয়ে খা—

খেয়ে উঠে ছেলে ঘরে ঢুকে খুটখাট করে কি গোছাচ্ছে। দয়াময় জিজ্ঞেস করল—কি হল? কি নিচ্ছিস?

—আমি একটু বেরুবো বাবা।

—বেরুবি? এই দুপুরবেলা? কোথায় যাবি?

—আমরা চার বন্ধু মিলে অবিনাশবাবুর বাড়িতে অঙ্ক কষতে যাবো। মাস্টারমশাই বলে দিয়েছেন।

দয়াময় একটু অবাক হয়ে বলে—পড়তে যাবি? সে ভাল কথা। টাকা কি দিতে হবে?

—সে রকম পড়া না। কোথাও ঠেকলে মাঝে মাঝে দেখে আসতে বলেছেন।

—তা ভাল। আচ্ছা, যা। ফিরবি তাড়াতাড়ি, সন্ধে করে ফেলিস না।

বিকেলে গোপালনগর বাজারের দিকে কাজ ছিল দয়াময়ের। গাঙ্গুলিবাবুর ছেলে বাজারে অ্যাগ্রো সার্ভিস সেন্টার খুলেছে। সার বিক্রি করে, বীজ বিক্রি করে, পাওয়ার টিলার ভাড়া দেয়। সেখানে সুপার ফসফেট আর রত্না ধানের বীজ সম্বন্ধে খোঁজ নিল দয়াময়। তারপর এসে বসল নিবারণ বারিকের দোকানে আড্ডা দিতে। নিবারণের দোকানটি বড় মজার, এখানে কেয়া-খয়ের পানবাহার গুলিসুতো ব্যাটারি অ্যানাসিন জুতোর কালি লবেঞ্চুস পাটের বস্তা পরিবার পরিকল্পনার সরঞ্জাম সবই সমান তেজে বিক্রি হয়। বিক্রিবাটার চেয়ে বেশি হয় গল্পগুজব। দোকানের সামনে তিনটে বাঁশের বেঞ্চি বানানো আছে, একেবারে মাটির সঙ্গে গাঁথা। বিকেল হতে না হতে একজন দুজন করে আড্ডাধারী এসে জমায়েত হয়। বিক্রির জন্য তেমন হা-হুতাশ নেই নিবারণের। সে একা মানুষ, বিয়ে করেছিল কি করেনি কেউ জানে না, থাকে দোকানেরই পেছনে একটা ঝুপড়িতে। একটা পেট ভালই চলে যায়। সন্ধেবেলা এই আড্ডায় বসে গল্প করতে করতে দয়াময় হঠাৎ দেখল অবিনাশ মাস্টারমশাই সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে অবিনাশবাবুকে ধরে ফেলল সে।

—নমস্কার মাস্টারমশাই।

—দয়াময় যে। খবর কি বলো, ভাল আছ তো?

—ভাল আছি মাস্টারমশাই। আপনার পড়ানো হয়ে গেল?

অবিনাশবাবু একটু অবাক হয়ে দয়াময়ের দিকে তাকালেন। বললেন, স্কুল? স্কুল তো আজ তিনটেয় ছুটি হয়ে গিয়েছে। তোমার ছেলে আজ—ওঃ, ওর তো এখন ক্লাশ নেই। পরীক্ষা এসে গেল। কৃপাময় পড়ছে টড়ছে তো?

দয়াময় বলল—পড়ছে ওই একরকম। এখন আপনাদের আশীর্বাদ। কৃপাময় যায় টায়

নাকি আপনার কাছে? একটু স্নেহ রাখবেন—

—নাঃ, কৃপাময় তো এর মধ্যে যায় নি। আমারও সময় হয় না একদম—

—ছেলেরা দলবেঁধে আপনার কাছে পড়া বুঝে নিতে যায় না? ওরা যে বলছিল—

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, যাবে বলেছে বোধহয়। তবে আমাকে কিছু বলেনি এখনো। পরীক্ষার আগে অনেকে অবশ্য পড়তে আসে। তাতে আর কি, যদি কৃপাময় প্রয়োজন বোধ করে তাহলে অবশ্যই যেতে পারে। তবে সন্ধের পর যেতে বোলো। বিকেলে আমি বাড়ি থাকি না।

—আচ্ছা মাস্টারমশাই। নমস্কার মাস্টারমশাই।

গুম হয়ে বাড়ি ফিরল দয়াময়। অন্যদিন বৌয়ের সঙ্গে দু একটা মজার কথা বলে, বাজারে কি শুনে এল সেই গল্প করে, আজ কলতলার বাঁধানো চাতালে হাত মুখ ধুয়ে গম্ভীর হয়ে দাওয়ায় এসে বসল। মাদুরের ওপর খুলে রাখা নীল হাফ শার্টের পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল একটা।

বৌ এসে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল পাশে। বলল, কি হয়েছে গো? মুখ অমন কেন?

—কিচ্ছু হয় নি।

—ঝগড়া হয়েছে কারো সঙ্গে? শরীর ভাল আছে তো?

—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না—

হাওয়া ভাল নয়। বৌ ডালে ফোড়ন দেবার জন্য উঠে গেল।

আঙুলে ছ্যাঁকা লাগা পর্যন্ত বিড়িটা টানল দয়াময়। সে খুব রেগে গিয়েছে—এ কথা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে ছেলেকে ধরে বেধড়ক ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করছে বটে, কিন্তু সে এটাও আন্দাজ করতে পারছে যে, ঠ্যাঙালে এক্ষেত্রে বিশেষ সুফল দেবে না। দুঃখ, হতাশা আর নিষ্ফল রাগ সব মিলিয়ে তার মনের অবস্থা ভাল নয়।

সন্ধে পার করে বাড়ি ঢুকল কৃপাময়। দয়াময় তখনো একই ভাবে দাওয়ায় বসে।

—এত দেরি হল যে?

—তা কি করবো? অনেক অংক বুঝে নিতে হল। সব কষিয়ে তারপর ছাড়লেন—

—হুঁ। অবিনাশবাবু বেশ ভাল পড়ান?

—খুব। কত ছেলে আসে। সবাইকে দেখাতে গিয়েই তো দেরি হয়—

—বেশ। আচ্ছা, যা। মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বোস। কেবল অংক করলে তো হবে না—

নাঃ, এ ছেলেকে পিটিয়ে কোনো লাভ নেই। মাঝখান থেকে আরও তেউড়ে যাবে। মিথ্যে কথা বলতে কৃপাময়ের মুখের একখানা রেখাও কাঁপে না।

কিন্তু অন্য উপায় বা কি আছে? সময় চলে যাচ্ছে হু হু করে। অশান্তিতে ঘুম হয় না দয়াময়ের।

মাছ ধরার দিন খুব পরিশ্রম হল বটে। রোদ্দুর আজকাল তেতে উঠেছে। ভোরের দিকে একটু শিরশিরে হাওয়া দিলেও বেলা দুপুর হবার আগেই মাটি থেকে তাত উঠতে থাকে। ভাঁজ করা গামছা মাথায় দিয়ে বনমালীর পাশে দাঁড়িয়ে পুকুরে জাল ফেলা দেখে দয়াময়। এক কিলো ওজনের মাছ ধরা যাবে না এই চুক্তি হয়েছে। পাড়ের কাছে কম জলে চারটে মোটা বাঁশ বেশ করে পুঁতে তাতে জাল লাগিয়ে বড় চৌবাচ্চা মত করেছে জেলেরা। জালের মাথা দেড় হাত উঠে আছে জলের ওপর। এক একবার জাল টানা হলে মাছ বাছাইয়ের ধুম লেগে যাচ্ছে। তৈরি হাত জেলেদের। সটাসট বড় আর মাঝারি মাছ বেছে

জালের চৌবাচ্চায় ফেলছে, ছোট মাছ আবার ছুঁড়ে দিচ্ছে জলে। একপাল ছেলেমেয়ে ভিড় করে এসেছে মাছ ধরা দেখতে এবং কিঞ্চিৎ লাভের আশায়। কারো হাতে ছোট চুপড়ি, কারো হাতে পলিথিনের প্যাকেট, কেউ বা গামছা নিয়ে এসেছে। একটু বাদে বাদেই এক একজন বলে উঠছে—ও কাকা, এট্টা ছোট দেখে মাছ দেন না—আপনাদের তো কত ফেলানি যাবে—

বনমালী মাঝে মাঝে খিঁচিয়ে উঠছে—যা যা ভাগ! মাছ আবার ফেলানি যায় কখনো? পালা।

মাথার পেছনটা দপদপ করছে কিছুক্ষণ আগে থেকে। শরীর তেমন ভাল নেই। বয়েস হয়ে যাচ্ছে। কথাটা মেনে নিতে খারাপ লাগলেও সত্যকে অস্বীকার করে লাভ কি? হাত পায়েও আগের মত আর জোর পাওয়া যায় না। খদ্দেরের আসার কথা ছিল সকাল সাতটায়, তারা শেষ অবধি এল বেলা ন'টায়। তোড়জোড় করে খেপ মারা শুরু করতে করতে সওয়া দশ। নইলে এতক্ষণে কাজ শেষ হয়ে যেত। এই রোদ্দুরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের পোষায়?

পাজি ছেলেটা। এখন একটু তাকে পেলে কত উপকার হত। তা নয়, সকালে উঠেই ভেগেছে। ছোটছেলে লায়েক হয়ে ওঠা অবধি নিজে বেঁচে থাকবে কিনা সেই চিন্তায় দয়াময়ের গলা শুকিয়ে উঠতে থাকে।

মাছ ওজন করাতেও অনেক সময় কেটে গেল। দু একবার ওজন হবার পরেই কেমন সন্দেহ হল দয়াময়ের। সে বলল, পাল্লা বদল কর। পাষাণ ওদিকে দাও, মাছ এদিকে—

এই নিয়ে ধুন্ধুমার খুব। বনমালীও কোন দলে বোঝা দায়। কখনো খদ্দেরের হয়ে কথা বলে, কখনো দয়াময়ের। খিচির মিচির শুনে দাঁড়িয়ে গেল কিছু লোক। তারা অবশ্য দয়াময়ের হয়েই কথা বলল। এমন কিছু ইয়ার বন্ধু নয়, তবে গ্রামের বাইরে থেকে বাজে লোক এসে মাথায় চাঁটি মেরে যাবে—এটা কেউ সহ্য করতে রাজি নয়। শেষে রফা হল—যা মাছ ওজন হয়েছে তা হয়ে গিয়েছে। বাকি মাছ পাষাণ বদল করে ওজন হবে। তাদের যুক্তি—নইলে অনেক সময় লেগে যাবে ইত্যাদি।

অবেলায় বাড়ি ফিরে ভাত খেলো দয়াময়। বৌ জিজ্ঞেস করল—চান করবে না?

—নাঃ। শরীর ম্যাজমাজ করছে।

কাঁচকলার তরকারি, মুগের ডাল। এমন সোনামুগ যে বাড়িতে রাঁধলে সেই নদীর ধারে গন্ধ পাওয়া যায়। তার সঙ্গে ভাজা মাছ। জাল ফেলা শুরু হতেই লোক দিয়ে একখানা বড় মাছ বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল দয়াময়। প্রথম মাছটা পুকুরের মালিককে দেওয়াই নিয়ম। পাঠিয়ে খুশি হয়েছিল দয়াময়। বৌটা মাছ বড় ভালবাসে। ছোট হোক বড় হোক, একটু মাছ রোজ চাই। আহা খাক, ঘরের লক্ষ্মী, ও মাছ খাবে না তো পুকুর রেখে লাভ কি?

এত ভাল আয়োজন, কিন্তু নিজে বিশেষ কিছু খেতে পারল না দয়াময়। মাথার পেছনে ব্যথাটা বেড়েছে, শরীর জ্বর জ্বর ভাব। গা যেন বইতে চাইছে না। চাষীর ছেলে, সামান্য একদিন রোদ্দুর লেগে অসুখ করবে সেই বা কেমন কথা? একটু ভয় পেয়ে বিকেলে ডাক্তার দেখাতে গেল সে। পাঁচটায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পাশেই ডাক্তারবাবুর বাড়ি। পাঁচ টাকা ভিজিট দিলে রোগী দেখে দেন। দয়াময়কে পরীক্ষা করে বললেন, সর্দিগর্মি মত হয়েছে, রাত্তিরে জ্বর বাড়তে পারে। প্রেসারও বেশি। ক'দিন একদম পরিশ্রম

করবেন না, খুব করে জল খাবেন। আর এই ওষুধ দিলাম প্যাকেটে। লাল বড়ি দিনে দুটো, ক্যাপসুল দুটো। সেরে যাবে।

দয়াময় পাঁচ টাকা বাড়িয়ে ধরল। ডাক্তারবাবু মিষ্টি হেসে বললেন, আর ওষুধের আট টাকা বারো আনা—

সন্ধে পেরিয়ে বাড়ি ফিরছিল দয়াময়। সরস্বতী নদীর ওপারে বাবলা গাছের সারির মাথায় বিশাল চাঁদ উঠে আসছে। চামচিকের পাখার পত্ পত্ শব্দ হচ্ছে রাস্তার পাশে রায়বাবুদের আমবাগানে। ওই যে পথের বাঁকটা ঘুরলেই তার বাড়ি, সজনে গাছের মাথাটা এখান থেকেই দেখা যায়। হঠাৎ চোখে জল এল দয়াময়ের। অনেক দিয়েছে আমাকে, কেমন বাড়ি, কেমন বৌ, বৌ রাঁধে বড় ভাল। সবদিক দিয়ে ভর ভরন্ত। কেবল যদি বড় ছেলেটা—

রাতে তেড়ে জ্বর এল তার। দুই ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দিয়েছে বৌ। নিজে বসে আছে স্বামীর মাথার কাছে, হাওয়া করছে পাখা দিয়ে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে দয়াময়। সারা গায়ে ব্যথা, মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে। বৌ ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, বলে, হ্যাঁগো, জল এনে মাথাটা একটু ধুইয়ে দিই?

—জল খাবো।

বৌ জল গড়িয়ে আনে কলসি থেকে। ছটফট করে দয়াময়, ঘুম আসে না।

অনেক রাত্তিরে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল দয়াময়।

—শুনছো, ঝাড়ে কারা যেন বাঁশ কাটছে।

বৌ আগেই শুনতে পেয়েছিল। সে স্বামীকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে বলে, ও কিছু নয়, এমনি বাতাসে শব্দ হচ্ছে, তুমি চুপ করে শোও দিকি—

দয়াময় অস্থির হয়ে ওঠে। —না না, বাতাস নয়। এ ঠিক ননী হাজরা এসেছে তাক বুঝে সর্বনাশ করতে। খবর পেয়েছে নিশ্চয় আমার অসুখের। দরজার পাশ থেকে লাঠিটা দাও দিনি, টর্চ কই? আমি যাবো—

বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়ে খট্‌খট্ শব্দ চলতে থাকে। এক হাত স্বামীর বুকে রেখে অন্য হাতে পাখা করে বৌ। এক গা জ্বর দয়াময়ের। হাত দিলে যেন ছ্যাঁকা লাগছে। একে কি বাইরে বেরুতে দেওয়া চলে?

জ্বরের ঘোরে দয়াময় ফিসফিস করে—ছেড়ে দাও, আমি যাবো। লাঠি কই? টর্চ কই?

হঠাৎ ও কে ঘরের মধ্যে? দরজার পাশ থেকে মোটা লাঠি তুলে নিচ্ছে হাতে, কুলুঙ্গি থেকে টর্চ নিচ্ছে।

—কে? কে? কে রে তুই?

—আমি বাবা, আমি কৃপাময়। বাঁশঝাড়ে কেমন যেন শব্দ হচ্ছে, দেখে আসি একটু। তুমি উঠো না—

ছেলের মত ছেলে। সা-জোয়ান চেহারা, লম্বা এত—দরজার আড়কাঠে মাথা ঠেকে। বড় ভাল ছেলে।

চিঁ চিঁ করে দয়াময় বলে, একা যাস না। ওরা সব দল বেঁধে আসে। কি করতে কি করে বসবে—

কৃপাময় হাসল, বলল, অত সোজা নয়। তুমি শুয়ে থাকো নিশ্চিন্তে, আমি ব্যাটাদের পার করে দিয়ে আসি।

কুলকুল করে ঘাম হচ্ছে, বোধহয় জ্বর নেমে যাবে। বুকের মধ্যে বেশ একটা হালকা ভাব। শালারা! আমার অসুখ শুনে বাঁশ কাটতে এসেছিস রাত দুপুরে? পারবি? আমার ছেলে উপযুক্ত হয়েছে না?

পাখাসুদ্ধু বৌয়ের হাত ধরে ফেলে দয়াময় বলে, থামো, আর না। এবার আমি একটু ঘুমবো।

টেলিভীষণ

রামবাবু চৌধুরী পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু। গত কুড়ি কি বাইশ বছর ধরে তিনি শ্যাম চৌধুরীর বাড়ির যাবতীয় কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। শ্যামবাবুর মেয়ের বিয়ে বেলঘরিয়ায় ঠিক করা হবে নাকি চন্দননগরে, বাড়িতে রঙের কাজ হচ্ছে—শোবার ঘরের রঙ অ্যাকোয়াম্যারিন হবে না হাল্কা গোলাপী, শ্যামবাবুর পেট কিছুদিন খোলসা হচ্ছে না, কুলত্থ কলাই ভেজানো জল খাবেন না ত্রিফলা—এ সমস্ত পরামর্শই রামবাবু দিয়ে থাকেন।

সেই রামবাবুর সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের মনোমালিন্য হয়ে গেল।

সূত্রপাত সামান্য ব্যাপার নিয়েই, কিন্তু ঘটনা শেষে আর সামান্য রইল না। শ্যামবাবুর বাড়িতে রামবাবু যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

প্রথম থেকে বলি, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধে হবে।

শ্যামবাবুর বাড়িতে পুরনো মডেলের একটা টেলিভিস্টা টেলিভিশন সেট ছিল। সাদা কালো সেট। ছবি খুব ভাল আসত, শব্দও স্পষ্ট। পরিবারের গিন্নি, পুত্রবধূ, ছেলেমেয়ে আর কর্তা কেউ না কেউ কোনো না কোনো সময়ে টিভির সামনে বসে থাকেন, যার যার পছন্দসই অনুষ্ঠান দেখেন। তবে নিবিড় ধানচাষ পদ্ধতির বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞানীর মতামত, কিম্বা গোবরগ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে পরিবেশবিজ্ঞানীর বক্তব্য ছাড়া। আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় সম্প্রচারে হপ্তায় দুখানা ফিলিম আর 'বৌদির শাঁখা' অথবা 'ম্যায় নাচুঙ্গি' গোছের দু চারটে ধারাবাহিক ছাড়া দেখার মত কিইবা থাকে? কাজেই চৌধুরী পরিবারের টিভি দর্শন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

এই সময় একদিন শ্যামবাবুর টেলিভিশন সেটটা খারাপ হয়ে গেল।

দোষ নেই। ছিয়াত্তর সালে কেনা প্রথম যুগের টিভি। নেহাৎ ভাল জিনিস বলে এতদিন কাজ দিয়েছে। আর ক-দিন চলবে?

নতুন সেট একটা কিনতে হয়। পরিবারের সবাই দশ-বারো দিন ধরে কাগজে টেলিভিশন সেটের বিজ্ঞাপন দেখা শুরু করলেন। বাড়িতে দু'খানা একস্ট্রা কাগজ আসতে লাগল। আর নানাবিধ রঙিন পত্রিকা। রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে জোর পরামর্শসভা বসে। কোন টিভি ভাল? রঙিন সেট কেনা হবে, না সাদা-কালো?

এর মধ্যে ছোট ছেলে নন্তু তার এক মেকানিক বন্ধুকে নিয়ে এল, পুরনো সেটটা সারাই করা যায় কিনা দেখতে। মেকানিক বন্ধু চা আর বিস্কুট খেয়ে ঘণ্টাদুয়েক খুব খাটল, পুরো সেটটার যন্ত্রাংশ সব আলাদা করে ফেলল, তারপর বলল—নাঃ, এটা সারাবার কোনো উপায় নেই। মান্ধাতার আমলের টিভি, এর পার্টস আর পাওয়া যায় না—

টিভি, ফ্রিজ, টেপ-ডেক ইত্যাদির যারা মেকানিক তাদের স্মার্টনেস দারুণ। প্রত্যেক

গৃহস্বামীই তাদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন। তবু যেহেতু ছেলের বন্ধু, তাই শ্যামবাবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে ভাই ওটার? সারানোর কি কোনো উপায় নেই?

মানুষ নিজের নিজের পেশার বিশিষ্ট শব্দবন্ধ উচ্চারণ করতে খুব ভালবাসে, বিশেষ করে যে বুঝতে পারবে না তার কাছে। শ্যামবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি যা বলল তা শ্যামবাবুর কানে শোনালো এইরকম—সেটের ভিস্‌টামনিটর রিলে খারাপ হয়েছে, তাছাড়া ভলিউমিটারের সবগুলো কাস্টিং ঠিকঠাক পনেডুন্‌ করছে না। ফলে ছবির সিগনাল করকরবক, ক্রকটাগ এবং জাইগনমেট্রিক হয়ে পড়ছে। বুঝলেন তো?

শ্যামবাবু বিষণ্ণমুখে বললেন—তা হলে তো খুবই মুশকিল!

—মুশকিল আর কি? ভাল দেখে একটা রঙিন সেট কিনে ফেলুন। নন্তুকে দিয়ে খবর দেবেন, আমি ফিট করে দিয়ে যাব—

দশদিনের মধ্যে নামী কোম্পানীর দামি সেট এসে গেল।

এবং তার সঙ্গে ঢুকলো সর্বনাশের বীজ।

নন্তুর বন্ধু বলল—মেসোমশাই, এতদিন যা হয়েছে তা হয়েছে। এবার বাড়িতে রঙিন টিভি এল, একটা কেব্‌ল্‌ লাইন নিয়ে নিন। আমরা এখন বাইশটা চ্যানেল দিচ্ছি। নাচ-গান, সিনেমা, খবর, খেলা, বাচ্চাদের জন্য কুইজ—সব আপনার হাতের মুঠোয়। করে দেব ব্যবস্থা?

বাড়ির সবাই তক্ষুণি রাজি। পাড়ার সবার চ্যানেল টিভি আছে, তাদের ছাড়া। প্রেস্টিজ বলেও তো একটা জিনিস আছে।

বাইশ চ্যানেল চালু হল বাড়িতে। চালু হয়ে গেল দিনব্যাপী উৎসব। হৈ হৈ নাচ, রৈ রৈ গান, সুপারহিট ধামাকা। সারাদিন ধরে ঝকমকে বিজ্ঞাপন। একটা মেয়ে সকাল থেকে রাত্তিরের মধ্যে আঠারোবার লিরিল সাবান মেখে স্নান করল। ঠাণ্ডাও লাগে না নাকি? বিজ্ঞাপনের অন্য মেয়েগুলোও বোধহয় বেশি পারিশ্রমিক পায় না, জামাকাপড় বেশি কেনবার পয়সা নেই। বলতে গেলে একেবারে উদোম গায়ে অভিনয় করে। গরীব বেচারারা।

পারিবারিক এইরকম একটা উন্মাদনার পর্বে একদিন রামবাবু এলেন, এবং পরিবারের সদস্যদের সাম্প্রতিক সেন্টিমেন্ট না বুঝে একদম কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে ফেললেন।

রামবাবু এসে দেখলেন টিভিতে দুর্ধর্ষ মারামারি চলেছে। ভিলেন নায়িকাকে গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রেখে খাদের ধারে নায়ককে দাঁড় করিয়ে দমাদ্দম ঘুসি মেরে যাচ্ছে। বাপ-মা-ব্যাটা-বৌ-কাজের মেয়ে সুলতা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছে। নন্তুর ইডিয়োমোটর অ্যাকশন হচ্ছে, সে নিজের অজান্তেই ভিলেনের মত করে শূন্যে ঘুসি চালাচ্ছে।

রামবাবু দাঁড়ালেন। দেখলেন। গভীর গলায় বললেন—ছিঃ।

এই প্রথম শ্যামবাবুর বাড়ির লোকেদের মনে হল—লোকটা যেন কেমন আক্কেলহীন, বড্ড অসময়ে এসে হাজির হয়।

শ্যামবাবু টিভির পর্দায় চোখ রেখেই নীরস গলায় বললেন—এই যে। অনেকদিন দেখা নেই। বসুন—

বসুন তো, কিন্তু বসেন কোথায়? খাট চেয়ার টুল সবই দখল হয়ে আছে। রামবাবু যে দাঁড়িয়ে রইলেন সেটা কেউ খেয়ালই করল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রামবাবু

বললেন—ব্যাপার কি তোমাদের? শেষে কিনা তোমরাও এই ফাঁদে পা দিলে? ছ্যাঃ, দেশটা উচ্ছন্নে গেল—

বয়েসে বড় বলে শ্যামবাবু রামবাবুকে কিঞ্চিৎ সমীহ করেন। কিন্তু আজ এমন সরেস উত্তেজনার সিনটা দেখতে না পেয়ে তিনি বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন—তাতে হলটা কি? আজকাল সবাই টিভি দেখে। এই পাশের বাড়ির যদুবাবু একজন বড়দরের ইঞ্জিনিয়ার। তিনিও তো কেব্‌ল্‌ লাইন নিয়েছেন—

—বড় ইঞ্জিনিয়ার মানে বড় মাইনের মিস্ত্রী। কালচার কি আছে তার?

এরপর নৈতিকতা, সময়ের অপব্যয়, রুচির নিম্নগামীতা ইত্যাদি নিয়ে দুজনের জোরালো এবং বেশ তিক্ত বিতর্ক হল। সমস্ত সময়টা রামবাবু দাঁড়িয়েই থাকলেন। বিতর্কে কারোই জয় হল না।

রামবাবু রেগে বাড়ি ফিরে গেলেন। অন্য অন্য বার তিনি কদিন না এলে খোঁজ করতে লোক পাঠানো হয়। এবার তার ব্যতিক্রম হল। রামবাবুও আর এলেন না, রাগ করে বসে রইলেন।

শ্যামবাবুর বাড়িতেও রামবাবুর প্রয়োজন কমে এল। টিভিতে জুতো থেকে বেবি ফুড সবকিছুর বিজ্ঞাপন থাকে। নন্তুর মায়ের একখানা বড় সাইজের প্রেসার কুকার কেনা দরকার। কোন কোম্পানীর কেনা যায়? অভ্যাসবশত নন্তুর মা বলে ফেলেছিলেন—রামবাবুকে ডাকলে হয়না?

নন্তু বলল—তা কেন? তোমাদেব সব ব্যাপাবে বামবাবুকে ডাকার অভ্যেসটা ছাড়ো তো। টিভিতে মাস্টারকুক কোম্পানীর প্রেসার কুকারের বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম সেদিন। তাই বরং একটা কেনো—

মাস্টারকুক এল। পুজোর বাজার কোথা থেকে করা হবে সে পরামর্শও প্রতিবছর রামবাবু দিয়ে থাকেন। এবার আর তাঁর ডাক পড়ল না। শ্যামবাবুর স্ত্রী বললেন—বিকিকিনি এম্পোরিয়ম বলে একটা দোকানের বিজ্ঞাপন খুব দিচ্ছে টিভিতে, সেখানেই যাই চল। ওরা ফ্রি কিসব উপহারও দেবে বলছে—

বিকিকিনি এম্পোরিয়াম থেকে সাড়ে পাঁচহাজার টাকার বাজার হল। ফ্রি গিফ্‌ট্‌ পাওয়া গেল একখানা দেড় টাকা দামের প্লাস্টিকের সাবানদানী আর বারো আনা দামের একখানা ডটপেন। সবাই খুব খুশী।

টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে বাড়িতে আসতে লাগল মুক্তোমণি দন্তমঞ্জন, গোলাপসুন্দরী সাবান, ইনস্টাওয়াশ কাপড়কাচা কল, ঠোঁটের সিঁদুর ব্র্যান্ডের লিপস্টিক। রামবাবু সুদূর স্মৃতি হয়ে এলেন।

এইসময় হঠাৎ একদিন নামল দুর্যোগ। শ্যামবাবুর আশি বছরের বৃদ্ধা মা বিছানায় বসে টিভিতে ‘সংসারের ঝংকার’ সিরিয়াল দেখতে দেখতে স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। ডাক্তার এসে বললেন—সরি, শী ইজ ডেড। ব্রেনে কোথাও অ্যানিউরিজম্‌ ছিল, হঠাৎ রাপচারড্‌ হয়ে মারা গেছেন—

আশি বছরের মা। বিশেষ কান্নাকাটি কিছু হল না। কিন্তু গভীর সমস্যা এসে সামনে দাঁড়াল।

সৎকারের কি করা যায়? কনভেনশনাল ক্রিমেশন, না ইলেকট্রিক চুল্লী? শাস্ত্রীয় করণীয়ই বা কি কি? কাকে ডাকতে হবে, কোথায় যেতে হবে? টিভির বিজ্ঞাপনে এ

বিষয়ে কি বলে নন্তু?

টিভিতে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ নেই। নন্তু চুপ। সবাই চুপ।

অনেকক্ষণ বাদে ঘরের জমাট নীরবতা ভেঙে শ্যামবাবুর স্ত্রী বললেন—একবার রামবাবুকে খবর দিলে হ'ত না?

সময়ের মোচড়

আজকাল হাঁটতে আর ভাল লাগে না। পঞ্চাশ পেরুনোর পর থেকেই কোমরে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে, বেশি হাঁটলে সেটা বাড়ে। কিন্তু উপায় কি? বাড়ি থেকে বাজার প্রায় মাইল খানেক পথ, অন্তত এটুকু তো হাঁটতেই হবে। ছেলেদের দিয়ে করানো চলে, কিন্তু সন্ধ্যার পর তারা দু-জন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যায়। অতএব বুদ্ধিমান নিমাই রায় দু-তিন দিনের বাজার এক সঙ্গে করে ফেলেন। তরি-তরকারী ছাড়াও ম্যছ আর ডিম কেনেন। প্রথম দিন মাছ খাওয়া হয়, কারণ নইলে সেটা পচে যাবে। পরের দিন ডিম। তারপরের দিন নিরামিষ। তারপর আবার বাজার।

শহরের একেবারে বাইরের দিকে নিমাই রায়ের বাড়ি। কাছাকাছি আর বসতি নেই। সেটা নিমাইবাবুর ভালই লাগে—কোলাহল তিনি মোটেও পছন্দ করেন না। পৃথিবীতে যেভাবে মানুষজন বাড়ছে, নতুন বাড়িঘর কল-কারখানা উঠছে, তাতে আর দশবছরের মধ্যে স্বস্তিতে কোথাও পা ফেলার জায়গা থাকবে না। সুন্দর ছিল তাঁর কৈশোর, যখন শহরে হাতে-গোনা লোক বাস করত, সবাই সবাইকে চিনত আর ভালবাসত। পথে ভিড় ছিল না, সর্বত্র একটা শান্তির আবহাওয়া বিরাজ করত। আঃ, সে-সব দিন কোথায় গেল!

থলে হাতে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরুলেন নিমাইবাবু। বিলের ধার দিয়ে হেঁটে এসে মাঠের মধ্যে যেখানে কয়েকটা আম-কাঁঠালের গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সিগারেট ধরাবার জন্য থামলেন। কেমন শান্ত স্তব্ধতা। গাছের পাতায় বাতাস বেধে ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। উলটোপালটা হাওয়ায় লাইটার ভাল করে ধরছে না। হাত দিয়ে বাতাস আড়াল করে কল ঘোরাতেই দপ্ করে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল। মুখ নিচু করে নিমাই রায় সিগারেটের ডগা আগুনে ছোঁয়াতে গিয়ে অনুভব করলেন সমস্ত শরীরটা যেন একবার কেমন করে উঠল—একটু গা-বমি মত ভাব, একবার যেন মাথাটা সামান্য টাল খেয়ে গেল। ওপরে গাছের পাতায় অদ্ভুত খড়্মড়্ শব্দ। এক মুহূর্তের জন্যই। তারপর আবার সব ঠিক। আরামে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন নিমাইবাবু। বয়স হচ্ছে, দু-একদিনের ভেতর অবিনাশ ডাক্তারকে দিয়ে প্রেসারটা একবার চেক করিয়ে নিতে হবে। মাথাঘোরা ভাল কথা নয়।

সিগারেট শেষ হতে হতে দূর থেকে শহরের প্রান্তে বটগাছটা দেখা গেল। ওর নিচে খোঁড়া রামদাস নাপিত বসে খদ্দেরদের চুলদাড়ি কামায়। এখন অবশ্য সে নেই। সন্ধ্যের আগেই সে তার কাঠের ছোট্ট হাতবাক্সের মধ্যে ক্ষুর, ব্রাশ, আয়না, অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ইত্যাদি ভরে বাড়ি চলে যায়। তবে গাছের নিচে একটা আলো জ্বলছে বটে। কাছে গিয়ে দেখলেন একজন আধবুড়ো লোক গ্যাসলাইটের আলোয় পানবিড়ির দোকান পেতে বসেছে। সিগারেট প্রয়োজন, এখান থেকেই কিনে নেওয়া যাক। নিমাই রায় লোকটার

সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—এক প্যাকেট চার্মিনার দাও তো ভাই—

লোকটা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—কি দেব?

—চার্মিনার। চার্মিনার সিগারেট...

—আজ্ঞে, ও নামে তো কোনো সিগারেট নেই বাবু -

নিমাই রায় আশ্চর্য হলেন। লোকটা হাবা নাকি? সিগারেট বিক্রি করে, এদিকে চার্মিনারের নাম জানে না?

—মেপোল আছে বাবু, মেপোল দেব? নইলে কাঁচি নিতে পারেন—

কাঁচি মানে সিজার্স। সে সিগারেট এখনো বাজারে পাওয়া যায় নাকি! সে তো কবেই উঠে গিয়েছে। নামটা মনের ভেতরে অনেক পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তুলল।

কাঁচি সিগারেটই এক প্যাকেট কিনে বাজারের দিকে পা বাড়ালেন নিমাই রায়। আজ পথে ভিড় এত কম কেন? শহব ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। যাক্, নিরিবিলিতে বাজার সেরে ফেলা যাবে।

দু-পা হেঁটেই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আবার থামলেন।

ওই বটগাছটা!

ওটা তো সেই কবেই কেটে ফেলা হয়েছে। এখানে তো কিছু থাকার কথা নয়! পাশেই একটা ছোট হোটেল রয়েছে। দুপুরবেলা রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে ট্রাক ড্রাইভাররা সেখানে খায়। কিন্তু বটগাছটা গত কুড়ি বছব নেই। কি দেখলেন তাহলে?

পেছন ফিরে তাকালেন নিমাই রায। হ্যাঁ, ওই যে বটগাছ—বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিচে গ্যাসলাইটের আলোয় সিগাবেটের দোকান।

—এই যে নিমু, হাঁ করে পেছনে কি দেখছ হে? বাজার করবে না?

শৈলেন ঘোষের গলা। যথারীতি সন্ধ্যেবেলা কানাইবাবুর দোকানে আড্ডা দিতে চলেছেন। নিমাইবাবু বললেন—হ্যাঁ শৈলেনদা, যাচ্ছি। কেমন আছেন?

—এই ভাই, চলে যাচ্ছে। কানাইয়ের ওখানে যাচ্ছি, একটু দাবা খেলবো—

শৈলেন ঘোষ চলে যেতেই নিমাই বায়ের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তাঁর জীবনে ভয়ঙ্কর রকমের কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। কিভাবে যেন তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছেন। প্রথমটা ঠিক খেয়াল করেন নি। কারণ চিরদিনের অভ্যস্ত ঘটনাগুলো আবার ঘটতে থাকায় মস্তিষ্ক সহজভাবেই তাদের গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ যেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার চলচ্চিত্র আবার প্রোজেকটারে ফেলে দেখানো হচ্ছে। শৈলেনদা মারা গিয়েছেন আজ অন্তত সতেরো-আঠারো বছর, কানাই চাটুজ্যে তারও বছরখানেক আগে। তাহলে এইমাত্র কার সঙ্গে কথা বললেন তিনি?

পুরানো চলচ্চিত্রই বটে। ওই যে ফিরে এসেছে মুকুন্দ পালের ছিপ আর বঁড়শির দোকান, তার পাশেই রামপ্রসাদ ভুজাওয়ালার ঝুপড়ি। সব ঠিক সেই আগেকার মত। যেন মাঝখানের বছরগুলো একেবারে মিথ্যে।

কিন্তু যথেষ্ট আনন্দ হচ্ছে না কেন? তিনিই তো মাঝখানে প্রার্থনা করেছেন—পুরনো দিনগুলো ফিরে আসুক। এখন, যে অদ্ভুত উপায়েই হোক, তা ঘটে গিয়েছে। আর একটু এগিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে গেলেই তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার পৃথিবীকে সামনে দেখতে পাবেন। এতে তো খুশি হওয়া উচিত।

নিমাইবাবুর ছেলেদের জন্য, গিন্নীর জন্য ভয়ানক মন-কেমন করতে লাগল। যদি

তিনি সময়ের এই ভাঁজে আটকে যান, তাহলে তাদের সঙ্গে তাঁর আর কখনো দেখা হবে না—কারণ তারা রয়েছে ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর পরের ভবিষ্যতে। ওদের না দেখে তিনি থাকতে পারবেন না। পৃথিবীর কোনো স্মৃতি, কোনো ঐশ্বর্যই তাদের সান্নিধ্যের চেয়ে দামি নয়।

সময় বেয়ে তিনি পিছিয়ে গেলেন কি করে?

নিমাই রায় নেহাৎ অশিক্ষিত লোক নন। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিয়োরী থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব পর্যন্ত কিছু কিছু তাঁর পড়া আছে। কোথায় যেন পড়েছেন সময়ের ভেতরের কখনো কখনো এমন মোচড় বা টুইস্ট তৈরি হয়, যার মধ্যে দিয়ে চলে গেলে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে পারে। গাছতলায় সিগারেট ধরানোর সময় সমস্ত শরীরে একটা বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল বটে একমুহূর্তের জন্য। তাহলে এক্ষেত্রে মোচড়টা কি দেশকালের ওই বিশেষ জায়গাটাতেই তৈরি হয়েছে? এবার উল্টো দিক দিয়ে ফিরে গেলে কি তিনি আবার স্ব-কালে আবির্ভূত হবেন?

বাজার না করে নিমাই রায় ফিরতি পথে দৌড়তে শুরু করলেন। এতক্ষণে যদি সময়ের মোচড়টা ওখান থেকে সরে গিয়ে থাকে? তাহলে বৌ-ছেলেপুলেকে আর কোনোদিন দেখতে পাবেন না। কি ভয়ানক!

অন্ধকার গাছতলায় এসে থামলেন। বুকের মধ্যে ধক ধক করছে। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে পা বাড়াতেই সেই অনুভূতিটা! একটু যেন গা গুলিয়ে উঠল, মাথাটা ঘুরে গেল একবার। তারপর সব ঠিক।

হেঁটে এগুতে এগুতে দূর থেকেই দেখতে পেলেন বাড়িতে আলো জ্বলছে, গিন্নীর গলা শোনা যাচ্ছে। মনে কি শান্তি! যারা তাঁকে ভালবাসে তারা ওইখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

চাবি

গরমের দিন। ইস্কুল ছুটির পরে হজমিগুলি খেতে খেতে বাড়ি ফিরছি আমি আর রতন। রতন এখন ভাল ডাক্তার হয়েছে। আমাদের ছুটি হত সাড়ে-তিনটের সময়। দুপুরের আগুন হাওয়া বইছে এলোমেলো, আমরা দুজন হাঁটছি আমবাগানের মধ্যে দিয়ে। আমার বগলে ক্লাশের বই-খাতার সঙ্গে রয়েছে এইচ জি ওয়েলসের গল্প-সংগ্রহ। ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে নেওয়া।

বিরাট আমবাগান। নিবিড় পত্রবিন্যাসে আকাশকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে। চারদিকে কেমন ছায়া ছায়া শান্তি। মাঝখানে পৌঁছে রতন বলল, আম পাড়বি তারাদাস?

—আম? এখনো তো কাঁচা—

—তাতে কি? নুন দিয়ে খাবো। পাড়বি?

—নুন পাবি কোথায়?

—এই দেখ—

পকেট থেকে একটা ছোট্ট পুরিয়া বের করে দেখালো রতন। তার সরঞ্জাম সব তৈরি থাকে।

বললাম, কি দিয়ে পাড়বি?

—কেন, ঢিল ছুঁড়ে!

—তুই ছোঁড় তাহলে, আমার হাতে তাক হয় না একদম। আমি কুড়িয়ে এনে দেবো।

এক গাদা ঢিল জড়ো করে রতন পটাপট ছুঁড়ে যেতে লাগল। ওর টিপ খুব ভাল ছিল, দেখতে দেখতে টিপ-ঢাপ করে এখানে-ওখানে অনেকগুলো আম পড়ল। চেঁচিয়ে বললাম, আর না, থাম। অনেক পড়েছে।

ঝরে-পড়া শুকনো আমপাতা আর নানান আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দুজনে আম খুঁজতে লাগলাম। রতন ছটা, আমি চারটে পেলাম। রতন তাও খুঁজছে দেখে আমি বললাম, আর নেই রে। দশটাই পড়েছিল।

—না, এগারোটা। আমি দেখেছি।

রতন এত জোর দিয়ে বলল যে, আমি ভাবলাম—হবেও বা। বললাম, পেলে আমার তো?

—তুই পেলে তোর। খোঁজ।

আবোল-তাবোল হাওয়ায় পাক খাচ্ছে শুকনো পাতা, একটা কাঠঠোকরার শব্দ পাচ্ছি অনেকক্ষণ থেকে—ঠক্‌কো, ঠক্‌কো, ঠক্‌কো। মায়াময় নির্জন দুপুর। দু'হাতে আগাছা সরিয়ে আমরা হারানো আমটি খুঁজে চলেছি।

একটা গাছের নিচে অনেক পাতার রাশি জমে। সেগুলো হাত দিয়ে নাড়া দিতে গিয়ে দেখলাম পাশেই কি যেন একটা চক্‌চক্‌ কবছে। সেই মুহূর্তেই ওদিক থেকে রতন চিৎকার করে উঠল—পেয়েছি। এটা কিন্তু আমার!

তাকিয়ে দেখলাম ও পকেট থেকে পুরিয়া বেব করে আমে কামড় দিতে শুরু করেছে। ওকে না ডেকে চুপিচুপি আমি চক্‌চকে জিনিসটা হাতে তুলে নিলাম।

একটা চাবি।

নিতান্ত সাধারণ চেহারায় ইঞ্চি দেড়েক লম্বা চাবি। বোধহয় এলুমিনিয়ামের তৈরি, কারণ রংটা সাদা এবং ওজনে খুব হাল্কা। আগার দিকটা ফাঁপা, পুরনো যুগের হবসের তালায় যেমন চাবি লাগতো। যেগুলো ছোটবেলায় ঠোটের কাছে নিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে আমরা বাঁশি বাজাতাম। এখানে কি করে এল চাবিটা? পথ-চলতি কারো হাত থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সকালে বিকেলে অনেক লোক যাতায়াত করে এখান দিয়ে। স্টেশনে যাবার এটা একটা সর্টকাট রাস্তা।

এমন কিছু জিনিস নয়। চাবিটা আমার ফেলে দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু চাবিটার সাদা রং, হালকা ওজন—এবং সবচেয়ে বড় কথা, কি একটা রহস্যময় অনুভূতি যেন আমাকে বারণ করল ওটা ফেলে দিতে। চাবিটা পকেটে রেখে আমার ভাগের চারখানা আম নিয়ে আমি রতনের পাশে গিয়ে বসলাম।

বাড়ি ফিরে আমার রঙিন পেন্সিলের বাকসে চাবিটা রেখে দিলাম। অল্প বয়সের ব্যাপার, কিছুদিনের মধ্যেই আমার একথা আর মনে রইল না।

সময় কারো অনুরোধেই থেমে থাকে না। সে এক বুড়ো জিপসী, কাঁধে তার তালিমারা বিরাট ঝোলা। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি সে চুরি করে ঝোলায় পুরে নিয়ে দৌড়ে পার হয়ে চলেছে পৃথিবীর নদী-প্রান্তর উপত্যকা। আকাশে-বাতাসে অহর্নিশি বাজে তার পায়ের ক্লান্তিহীন শব্দ। কালের নিয়মে সময় আমার সাধের শৈশব চুরি করে নিয়ে গেল একদিন।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। কলেজে গরমের ছুটি। বন্ধুরা কেউ নেই, সবাই বেড়াতে গিয়েছে কোথাও না-কোথাও। বই পড়ি সারা দিন, বিকেলে তে-মোহনী ঝিলের ধারে গিয়ে বসি।

কোনো কাজ না থাকলে পুরনো জিনিসপত্র ঘাঁটা আমার ছোটবেলার শখ। সেদিন দুপুরে একেবারে অসহ্য বোধ হওয়ায় বাইরের ঘরে দাদুর পুরনো কাঠের আলমারীর ভেতরের জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। কিছুদিন আগেও দাদু এই ঘরে থাকতেন, কান পাতলে ঘরের বাতাসে এখনো যেন তাঁর কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সেই বাস্তব মানুষ হঠাৎই একদম 'না' হয়ে গেল।

আলমারীর নানা ফাইলপত্র, আজেবাজে কাগজের মধ্যে একটা রং-চটা টিনের বাক্স। কি আছে এতে? নাপিতের যন্ত্রপাতি রাখার হাতবাক্সের মত দেখতে অনেকটা।

ডালায় হাতের চাপ দিয়ে খোলার চেষ্টা করলাম। খুললো না। চাবি দেওয়া আছে নাকি? চাবির ফুটো তো রয়েছে। এর চাবি পাই কোথায়? দাদু মারা গেছেন বছরখানেক হল, তাঁর হাতবাক্সের চাবি কি আর কেউ জমিয়ে রেখেছে এত দিন?

ভেতরে প্রয়োজনীয় কিছুই নেই আমি জানি, কিন্তু ওই যে ডালা খুলছে না—ওটাই মহা আকর্ষণ। আমাকে দেখতেই হবে কি আছে এর ভেতরে।

ঘুমন্ত মায়ের আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে এলাম। এইটুকু ফুটোয় লাগতে পারে এমন চাবির সংখ্যা কম। তাদের সবগুলো দিয়ে এক-এক করে চেষ্টা করে গেলাম। ফল সমান।

হঠাৎই মনে পড়ল ছোটবেলায় এমন এক গরমের দুপুরে আমবাগানে কুড়িয়ে পাওয়া সেই ছোট্ট চাবিটার কথা। সেটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলে হয় না? কোথায় রেখেছিলাম সেটা? হ্যাঁ, আমার রঙিন পেন্সিলের বাক্সে। বাক্সটা আছে বোধহয় এখনো।

মায়ের বাসনপত্র রাখার কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক থেকে বের করলাম পুরনো বাক্সটা। ওপরে চার-পাঁচটা উড়ন্ত হাঁসের ছবি। লর্ডসের লজেন্সের বাক্স, কে যেন দিয়েছিল আমাকে। সব লজেন্স ফুরিয়ে গেলে এতে পেন্সিল রাখতাম।

চাবিটা রয়েছে। হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম। একবার চেষ্টা করতেই কড়াৎ করে খুলে গেল ডালাটা।

ভেতরে রয়েছে দাদুর ব্যবহার করা পুরনো একখানা নস্যিমাখা রুমাল, এক বান্ডিল নীল সুতোয় বাঁধা চিঠি, মরচে ধরা তিনটে ব্লেড, ডাঁটির বদলে সুতোবাঁধা দাদুর প্লাস পাওয়ারের চশমা—এই সব।

কিছুই নয়—কোনো কাজের জিনিস নয়। কিন্তু এদের সঙ্গে ফিরে এল আমার শৈশবের গন্ধ। রাতে দাদুর কাছে পড়তে বসা, সকালে দাদুর সঙ্গে ইস্কুলে যাওয়া। ওই চশমা, ওই নস্যিমাখা রুমালের সঙ্গে আমার শৈশব মিশে আছে।

এই চাবিটা এ জিনিস আমাকে এনে দিল।

চাবিটা এবার আমার রিং-এ রেখে দিলাম। সম্পত্তির মধ্যে আমার তখন একটা বইয়ের আলমারী আর একটা তোবড়ানো সুটকেস। কিন্তু সেগুলোতে তালা দিয়ে রাখলে আমার অধিকারবোধ শান্ত থাকত।

দিন কাটে। বুড়ো জিপসী দৌড়ে যায় পাহাড়-প্রান্তর পেরিয়ে।

বিয়ের পরে নতুন বৌকে নিয়ে দীঘা বেড়াতে গিয়েছি। হাতে সময় কম, তাড়াতাড়ি

ফিরতে হবে। কাজেই দূরে কোথাও যাবার প্ল্যান করিনি। উঠেছি নীলাচল হোটেলে। মধ্যবিত্তের জন্য মধ্যবিত্ত হোটেল। দোতলার ঘর, জানালার নীল কাঁচের ভেতর দিয়ে গর্জমান সমুদ্র আর ঋজু ঝাউয়ের সারি দেখা যায়। সব কিছু গুছিয়ে আমরা সাময়িক সংসার পেতে ফেললাম।

পরদিন সকালে বিপদে পড়লাম। আমার সঙ্গে একটা বিদেশী এ্যাটাচি-কেস ছিল, তাতে আমার দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম, ডায়েরি, জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা—সব। সেটার চাবি ফেললাম হারিয়ে। বৌয়ের সুটকেস ও ভ্যানিটি ব্যাগ, আমার পকেট, সব তোলপাড় করে ফেললাম—কোথাও নেই। দুর্ভাগ্যবশত এ চাবিটা রিং থেকে আলাদা করা ছিল।

সত্যিই বিপদ হল। দাড়ি না হয় তিন দিন কামাবো না, কিম্বা সেলুনে কামাবো, একটা ট্রাউজার আর শার্টেই না হয় চালিয়ে দেবো এ কদিন—কিন্তু টাকা না হলে হোটেলের বিল দেব কি দিয়ে? ফেরার ভাড়াই বা কই? খোঁজ নিয়ে জানলাম দীঘাতে কোনো তালাওয়ালা নেই। তাহলে এখন একমাত্র উপায় এ্যাটাচির গা-তালাটা ভেঙে ওটাকে খোলা। বহু দাম দিয়ে কেনা শখের জিনিস—ভাঙতে খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু তাছাড়া আর তো কিছু করার নেই।

বৌ হঠাৎ বলল, এটা কিসের চাবি? এটা দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখ না—খুলতে পারে বোধহয়।

তাকিয়ে দেখলাম বৌয়ের হাতে আমার চাবির রিং, বৌ ছোট্ট এলুমিনিয়ামের চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

বললাম, ওটা দিয়ে কি আর—ওটা তো—

তারপব থেমে গিয়ে বললাম, আচ্ছা দাও, দেখি।

কুট্ করে শব্দ হয়ে খুলে গেল এ্যাটাচি, যেন চাবিটা এর জন্যেই তৈরি হয়েছিল।

ভাল মজা তো! এটা দেখছি মাস্টার কি হয়ে উঠল। আট আনা সিরিজের গোয়েন্দা গল্পেব বইয়ে ডিটেকটিভদের যেমন থাকে। সংকটের মুহূর্তে বার বার বাঁচিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

আমার বিয়ের পর তৃতীয় বছরে আমার মায়ের খুব বড় অসুখ করে। প্রথমটা কিছু টের পাওয়া যায় নি, হঠাৎ এক ঘণ্টার নোটিশে মাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। আচমকা ব্যাপারটা ঘটে। আমার হাতে তখন টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না, অথচ সেদিনই বিকেলের মধ্যে ওষুধপত্রের জন্য আমার বেশ কিছু টাকা প্রয়োজন। মাস ফুরোতে তখনো হপ্তাখানেক দেরি।

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এক কথায় মাসের শেষে টাকা ধার দিতে পারে। কি করা যায়? আর তিন-চার ঘণ্টার ভেতর আমার অন্তত শ' তিনেক টাকা দরকার।

সংসার খরচের টাকা থেকে মেয়েরা আশ্চর্য কৌশলে কিছু কিছু করে সরাতে পারে। মা এভাবে পাঁচ-ছ মাসে বেশ মোটা টাকা জমিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। মায়ের হলুদ ট্রাঙ্কটায় কি কিছু থাকতে পারে? অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় মা হাসপাতালে গিয়েছেন, যাবার সময় আমাদের কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যাবার মত অবস্থা ছিল না তাঁর। আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা তাঁর সঙ্গেই রয়েছে।

আজ বিকেলে সে চাবি এনে ট্রাঙ্ক খোলা যায় বটে, কিন্তু তাহলে টাকা থাকলেও কাল

সকালের আগে সে টাকা কোনো কাজে লাগে না।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আমার সেই ছোট্ট চাবিটার কথা মনে পড়ল। কিন্তু মায়ের ট্রাঙ্কে লাগানো তালাটা বিরাট বড়, অতটুকু চাবি এমনিতেই ঘুরে যাবে, লিভারগুলোকে সরাতে পারবে না বোধহয়।

কিন্তু প্রত্যেকবারের মতই এবারেও চাবিটা লাগাতেই তালা খুলে গেল মসৃণভাবে। একটু খুঁজতেই মায়ের লালপাড় গরদের শাড়ির ভাঁজে আমি বারো শ' টাকার নোট পেয়ে গেলাম।

এভাবেই বহুবার, বহুভাবে।

চাবিটার সম্বন্ধে আমার মনে একরকমের অলৌকিক ভালবাসা দানা বেঁধে উঠেছে। কে এটা আমাকে পাইয়ে দিয়েছিল আমার শৈশবেই সেই আমবাগানে, ঝিম-ঝিম করা নির্জন দ্বিপ্রহরে?

কত দরকারী জিনিস আমি হারিয়ে ফেলেছি কতবার, কিন্তু কে এই ছোট্ট এলুমিনিয়ামের চাবিটা কিছুতেই হারিয়ে ফেলতে দিল না?

সে যে-ই হোক, তার উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক। শুধুমাত্র কয়েকটা সুটকেশ-আলমারী খোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এ বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হল স্বপ্নটা দেখার পর।

কিছুদিন আগে দেখেছি স্বপ্নটা। একটা বিশাল পুরনো বাড়ির মধ্যে যেন আমি একা-একা বেড়াচ্ছি। সময়টা দিনও নয়, রাত্রিও নয়। আবছামত চাপা আলোয় ভরে আছে সে বাড়ির শূন্য অলিন্দগুলি। গোলোকধাঁধার মত অনেক সরু সরু বারান্দা। আমি দিশাহারা হয়ে ঘুরে মরছি কেবল। বারান্দার দু দিকে সারি সারি অনেক দরজা। তার সব কটাই বন্ধ। কেউ এসে আমাকে বলে দিচ্ছে না আমি কেন এখানে এসেছি—এখানে আমার কি প্রয়োজন। বাড়িটাই বা কার? সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা কেমন যেন অর্থহীন। ঘুরতে ঘুরতে লম্বা করিডরের শেষে একটা কারুকার্য করা বড় দরজার সামনে এসে আমি দাঁড়ালাম। সে দরজায় একটা বিরাট তালা ঝুলছে। মনের ভেতর থেকে কে যেন আমাকে বলল, এই দরজাটা খুলে ফেললেই তুমি সব কিছুর অর্থ জানতে পারবে। এই বাড়ি কার, কেন তোমার এখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো—সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্বপ্নেই পকেট হাতড়ে আমি চাবিটা খুঁজি।

এক একদিন রাত্তিরে ছাদে একা বসে মাথার ওপরে বিস্তৃত সৌরচরাচরব্যাপী বিশাল নাক্ষত্রিক জগতের দিকে তাকিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে—কোথা থেকে জীবন এল এই জড়জগতের অন্ধ আবর্তনের মধ্যে? কি সার্থকতা জীবনের? না হয় অনেক টাকা হবে আমার, অনেক দেশ বেড়াবো, অনেক ভোগ করবো, লিখে খ্যাতি পাবো, যা যা কামনা আছে তার সবই ধরা যাক আমার জীবনে হবে—কিন্তু তাতে কি এসে যায়? কি করছি আমি এখানে? এই বিশ্বজগতে? প্রাণ কোথা থেকে এল? শূন্যে বস্তু কোথা থেকে এল? সবটাই আমার ওই স্বপ্নের মত অর্থহীন'

কেবল এক ভরসা চাবিটা। নিশ্চয় একদিন-না-একদিন ওই বন্ধ দরজাটা আমি কোথাও পেয়ে যাব, যার ওপারে আমার প্রশ্নের উত্তর, আমার জীবন-মরণের সার্থকতা। সেদিন শেষবারের মত এ চাবি আমার কাজে লাগবে।

যে যেখানে

পিচঢালা বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ডানদিকে একটা লালমাটির এবড়ো খেবড়ো পথে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে প্রিয়া অবাক হয়ে বলল—একি! এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

অরণ্যের বাইরে অপরাহ্নের রোদ্দুর রাঙা হয়ে এসেছে। স্লেট পাথরের বড় বড় টিলার আড়ালে জমে উঠেছে বিকেলের গাঢ় ছায়া। এসব পাহাড়ি অঞ্চলের সূর্যাস্তের পরেই দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসে। জঙ্গলের ভেতর এখনই সন্ধ্যে নেমে এসেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। দুর্ভেদ্য পাতার জালে আলো আটকা পড়ে ঘনিয়ে তুলেছে অবসন্ন অন্ধকার। বিস্মিত মুখে প্রিয়া আবার জিজ্ঞাসা করল—এ রাস্তায় এলে কেন? এদিকে কি আছে?

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একটা গর্তের পাশ কাটিয়ে অজয় বলল—এ রাস্তা দিয়ে গেলে আমাদের অনেক কম ঘুর হবে। অন্তত পনের কিলোমিটার কম।

—তাই বলে এইরকম বিদ্‌ঘুটে জঙ্গলের রাস্তায় ঢুকলে? এ পথ তুমি চেনো?

—চিনি বই কি! কলেজে পড়বার সময় ছোটমামার সঙ্গে একবার গাড়ি করে এই পথে এসেছিলাম। বাইশ কি তেইশ কিলোমিটার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়ে এটা আবার বড় রাস্তায় উঠেছে। তারপর আর মাত্র বারো কিলোমিটার গেলেই রামনগর—

প্রিয়ার মুখ সামান্য বিবর্ণ হয়ে গেল। অজয়ের মাথায় মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব খেয়াল চাপে সে জানে। যেমন নারকেল তেলে আলুভাজা করে খাওয়া, হাফ প্যান্ট পরে বাজার করতে যাওয়া, ট্রেনে সম্পূর্ণ অপরিচিত ধূমপানরত সহযাত্রীকে 'ও মশায়, এদিকেও একটা সিগারেট ছাড়ুন তো' বলা, কিম্বা নজরুলগীতির সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বসিয়ে গাইবার চেষ্টা করা—এগুলো কখনো কখনো রীতিমত অস্বস্তিকর হয়ে উঠলেও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে দিব্যি বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে শর্ট কাট করবার জন্য এই সন্ধের মুখে কেউ এমন জঙ্গলে ঢোকে?

—তার মানে এখনো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার?

—হুঁ। ঘুরে গেলে পঞ্চাশ। কেন, বেশ লাগছে তো। তোমার কি ভয় করছে?

প্রিয়া বলল, ভয় করবে কেন, তবে অকারণে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে—

—অকারণ! বলো কি! দু লিটার পেট্রল বাঁচবে, তার দামই তো তিরিশ টাকা।

—আহা, তিরিশ টাকায় তোমার যেন কত কি এসে যাচ্ছে—

—আমার কিছু এসে যাচ্ছে কিনা সেটা কথা নয়, কিন্তু তোমার একটা রেডিমেড ব্লাউজ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তুমি তো এতদিন বলে এসেছো, তুমি খুব অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসো, মানুষের জীবনে অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ কমে গিয়েছে বলে তোমার দুঃখ—তাহলে আর অমন করছ কেন? জানালা বন্ধ করো—জানালা বন্ধ করো!

তাড়াতাড়ি হাতল ঘুরিয়ে কাচ তোলবার আগেই সপাং সপাং করে কয়েকটা গাছের ডাল গাড়ির পাশে চাবুকের মতো এসে পড়ল। রাস্তা এখানে বেশ সরু হয়ে এসেছে, দুপাশের ইচ্ছে মত বেড়ে ওঠা গাছের দল হাত বাড়িয়ে যেন ভেতরের আরোহীদের স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে।

অজয় বলল—জানালা বন্ধই রাখো, চোখে মুখে খোঁচা লেগে যেতে পারে। ইস, এ

পথে না এলেই হত দেখছি।

উদ্বিগ্ন মুখে প্রিয়া বলল—কেন? কেন?

—অন্য কিছু না। পথটা বড্ড সরু হয়ে এসেছে, আরও সরু হলে গাড়ি চালাব কি করে?

—ঘুরিয়ে নাও না, আবার আমরা বড় রাস্তায় ফিরে যাই।

—নাঃ, ঘোরানোর জায়গা নেই এখানে। সামনেই যেতে হবে।

অজয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার গ্রাহক। সে অফিসে বেরিয়ে গেলে প্রিয়া দুপুরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের পুরনো সংখ্যা পড়ে কাটায়। মাঝে মাঝে তার সত্যি খুব দুঃখ হয়। বিদেশে মেয়েরা কত দুঃসাহসিক কাজ করে—সাহারা মরুভূমিতে পাহাড়ের গুহায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা ছবি নিয়ে গবেষণা করে, একা এরোপ্লেন চালিয়ে অতলান্তিক পাড়ি দেয়, বেলজিয়ান কঙ্গোর অরণ্যে নতুন কীটপতঙ্গের প্রজাতি খুঁজে বের করে।

আর সে? সে স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে পাশের বাড়ির বউটার সঙ্গে বিউটি পার্লারে যাবার পরামর্শ করে।

পাশের বাড়ির বউটিকে প্রিয়ার প্রথম দিকে পছন্দ হয়নি। সারাক্ষণ অমন সেজে থাকার কি আছে রে বাপু! সকাল সাতটায় দাঁত ব্রাশ করতে করতে অন্যমনস্কভাবে দক্ষিণের ব্যালকনিতে এসে একদিন প্রিয়া দেখেছিল উল্টোদিকের বারান্দায় বউটা দাঁড়িয়ে আছে। এই সকালেই তার মুখে হালকা পাউডারের প্রলেপ, চোখের পাতায় আইশ্যাডো, ঠোঁটে কারমাইন রঙের লিপস্টিক। লজ্জায় প্রায় দৌড়ে সে ভেতরে চলে এসেছিল। তার মুখে টুথব্রাশ দেখে বউটা না জানি কি ভাবল।

দু একবার মৃদু হাসি এবং 'ভাল তো?' ইত্যাদির পরে যখন আলাপ জমল তখন প্রিয়া উপলব্ধি করল বউটা মানুষ খারাপ নয়। সরল ধরনের—হিংসে টিংসে নেই। দোষের মধ্যে একটু সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। প্রথম যেদিন প্রিয়া ওদের বাড়ি যায়, দেখে বউটা বসে বসে চিনেমাটির প্লেটে থকথকে কি একটা জিনিস আঙুল দিয়ে ঘসে মিহি করছে। কৌতূহলী হয়ে প্রিয়া জিজ্ঞাসা করল—ওটা কি জিনিস ভাই? কোনো খাবার টাবার করছ বুঝি?

বউটি হেসে বলল—না, না, খাবার নয়। এই একটু কমলালেবুর খোসা বাটা, কাঁচা হলুদবাটা আর দুধের সর দিয়ে একটা মুখে মাখার ক্রিম তৈরি করছি। স্নানের আগে এক ঘণ্টা মেখে থেকো, দেখবে চামড়া বেশ নরম হবে। আমার তো গত বছর এত ব্রণ হচ্ছিল—

কিংবা পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের মিসেস রায়। বছর চল্লিশেক বয়েস। তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলে খবরের কাগজ কেনার দরকার হয় না। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই 'কেমন আছ? কর্তা ভাল তো?' ইত্যাদির পাট সংক্ষিপ্তভাবে চুকিয়ে নিয়ে তিনি হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলবেন—জানো তো, বারো নম্বরের কাজের মেয়েটা পালিয়েছে?

—তাই নাকি?

—গিন্নি আমাকে নিজে ডেকে বলল। একটু আগে। দুদিন ধরে নাকি গিন্নি নিজেই রাঁধছে। তা এখন আর হা-হুতাশ করে কি হবে? এই নিয়ে আমার দেখতাই ছ-সাতজন কাজের লোক বারো নম্বরের থেকে পালাল। অত কৃপণের বাড়ি লোক থাকে? সংসারে

দুরকম চালের ব্যবস্থা—নিজেরা কর্তা গিন্নি খাবেন সরু পাটনাই বালাম চাল, আর কাজের লোকের জন্য রেশনের চাল বরাদ্দ। কেমন ছোট নজর ভাবো দেখি? তাছাড়া কর্তার তো আবার একটু ইয়ের দোষ আছে, সে তো নিশ্চয় জানো?

—না তো, আমি তো কিছু শুনিনি।

—ওমা সেকি! কিন্তু পিন্টুর মা তো তোমাদেরও বাসন মাজে, তার কাছে শোনোনি? আমাকে তো সে-ই বলেছে। বারো নম্বরের কর্তা নাকি একদিন সন্ধেবেলা লোডশেডিংয়ের সময় কাজের মেয়েটার হাত চেপে ধরেছিল। ছি ছি! চরিত্র খারাপ করবি আর একটু ভাল জায়গায় কর। গিন্নি বলেছে এবার বেশি বয়সের লোক ছাড়া রাখবে না।

দুপুরবেলা পত্রিকার পাতায় পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা পড়তে-পড়তে বলতে নেই—নিজেকে এইসব তুচ্ছতা ও সাধারণ মেয়েদের চাইতে অনেকখানি আলাদা বলে মনে হয়।

এদিন রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে অজয় বলল—কোথাও বেড়িয়ে এলে হয় না? যাবে?

—কোথায় যাবে? সেই তো পুরী, গোপালপুর, অথবা বড় জোর পাঁচমারি। ওসব ভাল লাগে না—

অজয় চিত হয়ে শুয়েছিল, বউয়েব কথা শুনে কাত হয়ে প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার কোনো প্রেফারেন্স আছে?

একটু ভেবে প্রিয়া বলল—আছেই তো।

—কোন জায়গা?

—ইস্টার আইল্যান্ড।

চোখ পিটপিট করে অজয় বলল—সেটা তো প্রশান্ত মহাসাগরে, তাই না? তুমি কি সত্যিই সেখানে যেতে চাও?

—চাই-ই তো। কিন্তু হবে না তাও জানি—

—তোমার বুঝি খুব অ্যাডভেঞ্চারে যেতে ইচ্ছে করে? বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এটা বেশ রেয়ার কোয়ালিটি।

শুনে প্রিয়া খুশি হল। তারপর সে অনেক অবসর মুহূর্তে স্বামীকে নিজের স্বপ্নের কথা শুনিয়েছে। অজয়ও উৎসাহ দেখিয়ে বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ কবেছে দুজনে মিলে দুঃসাহসিক কোনো অভিযানে বেরিয়ে পড়বার। অবশ্য অজয় মনে মনে জানে এ সমস্ত কেবলই কথার কথা, তবু বেঁচে থাকবার জন্য এই ধরনের স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন আছে বইকি! কিন্তু প্রিয়ার কাছে জিনিসটা অনেক বেশি বাস্তব। নিজেকে সে অনেক সময়ে তার প্রিয় অভিযানের কাহিনীর নারীচরিত্রগুলির স্থানে বসিয়ে কল্পনা করে। নন্দাঘুণ্টি অভিযানের তুষাররেখার ওপবের শিবির, পাপুয়া নিউগিনির গভীর অরণ্য, পৃথিবীর বৃহত্তম একশৈল আয়ার্স রকের নির্জন পাদদেশে—মন কোথায় চলে যায় সংসারের বন্দিত্ব পার হয়ে।

আর মায়া লাগে লক্ষ লক্ষ ভাত-রান্না করা সংসারের জোয়ালে আবদ্ধ বাঙালি মেয়ের জন্য। বেরিয়ে পড়তেই হবে এমন কোনো কথা নেই, বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে থাকাটাই বড় কথা। সেদিক দিয়ে সবাই যেন আধমরা হয়ে আছে, কেউ পুরোপুরি জীবিত নয়। ছোট গণ্ডির মধ্যে বাস করতে করতে সমস্ত দুনিয়াই সেটুকুর ভেতর সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

কাজেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয় পাওয়াটা এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত অপমান।

অন্ধকার বোধহয় এবার সত্যিই নেমে এল। রাস্তা প্রায় দেখা যায় না। প্রিয়া বলল—হেডলাইট জ্বালিয়ে চালাও, ধাক্কা লাগবে যে! কি রাস্তা!

—উঁহু। যতক্ষণ পারি আলো ছাড়াই চালাই। ব্যাটারি নতুন কেনা হল না গত সপ্তাহে—এত আস্তে গেলে আলো জ্বালানো মানেই ক্রমাগত ব্যাটারি খরচ হওয়া।

—তাহলে?

—তাহলে আর কি, মাঝে মাঝে আলো জ্বেলে দেখে নেব। একটানা জ্বালিয়ে রাখা যাবে না, ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে।

গাড়ি চলছে বোধহয় ঘণ্টায় পনেরো কিলোমিটার গতিতে। পথ আগের মতোই সরু। ডাইনে বাঁয়ে যতদূর দেখা যায় কেবল মোটা মোটা শাল, অর্জুন আর আসানগাছের ভিড়। আসন্ন রাত্রির অন্ধকার অরণ্যকে গ্রাস করে নিচ্ছে। ছোট বড় গর্তে পড়ে গাড়ি কেবলই লাফাচ্ছে, স্থির হয়ে বসে থাকা যায় না।

হেডলাইট জ্বালাল অজয়।

অদ্ভুত এক মায়াময় দৃশ্য সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

চারদিকে অন্ধকারের ঘেরাটোপ, মাঝখানে এক আলোর পথ তৈরি হয়েছে গাছের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। সেই পথ বেয়ে তাদের আশ্চর্য যাত্রা।

আলো নেভাতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘনিয়ে এল চরাচরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অজয় গাড়ি থামিয়ে দিল। ইগনিশন সুইচ বন্ধ করতেই ইঞ্জিনের আওয়াজ স্তব্ধ।

কতরকম পোকামাকড় ডাকছে বনেব ভেতর। বন্ধ কাচের মধ্যে দিয়েও তাদের শব্দ শোনা যায়। অজয় ড্যাশবোর্ডেব যন্ত্রপাতি নিয়ে কীসব খুটখাট করছে।

—কি হল, গাড়ি থামালে যে?

—আলো নেভাতেই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে। দাঁড়াও একটু—

কাচ তোলা থাকলে গাড়ির ভেতর কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। প্রিয়া জানালা খুলে বাইরে তাকাল। শেষ গোধুলির আলো মিলিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। মাথার ওপর দু'সারি গাছের ফাঁকে একটিমাত্র নক্ষত্র জ্বলে উঠেছে। কোথাও মানুষ নেই, মানুষের সৃষ্টি করা কোনো শব্দ নেই। যেন সভ্যতা থেকে বহুদূরে তারা স্বেচ্ছা-নির্বাসনে এসেছে। এই অরণ্য যেন আমাজন অববাহিকার নিবিড় উদ্ভিদসংস্থান। এখুনি ম্যাকাও পাখি ডেকে উঠবে দূরে। উইলার্ড প্রাইস-এর লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত মনে পড়ে যায়।

গাড়ির কাছেই জঙ্গলের মধ্যে কি একটা -ড়ল না? শুকনো পাতার ওপর খড়মড় করে আওয়াজ হল। বোধহয় বেজি কি বেড়াল। বনের বেড়ালকে অবশ্য বনবেড়াল বলাই উচিত। সে তো বেশ হিংস্র জীব, এ বনে কি বনবেড়াল আছে? অন্য কিছু নয় তো? সন্তর্পণে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে?

নাঃ, ওসব ভাবলে মন দুর্বল হয়ে যায়। ও কিছু না।

কিন্তু অজয় এখনো গাড়ি চালাচ্ছে না কেন? প্রিয়া তার দিকে তাকিয়ে দেখল সে মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন সুইচ নাড়াচাড়া করে চলেছে। স্টার্টার বাটন টিপতে ইঞ্জিন গোঁ গোঁ করে উঠল, কিন্তু স্টার্ট নিল না।

—কি হল তোমার? বসে আছ যে?

—বসে নেই, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না।

—তার মানে? এই তো দিব্যি চলছিল—

—আমিও তো তাই ভাবছি। কারবুরেটরে বেশি তেল চলে এসেছে বোধহয়। আচ্ছা, কাঁচা পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছ?

বাতাস শুঁকে প্রিয়া বলল—কই, না তো—

ঝুঁকে পড়ে প্রিয়ার পায়ের কাছে বনেট রিলিজ লিভারটা টানল অজয়। বলল—বোসো একটু, বনেট খুলে দেখতে হবে কি হয়েছে। তুমি নেমো না, গাড়ির মধ্যেই বসে থাকো—

অজয় গাড়ির সামনে গিয়ে বনেট তুলে কি দেখতে লাগল। খুট করে একটা শব্দ, তারপরই অজয়ের বিস্মিত গলা—ইস্!

জানালা দিয়ে গলা বের করে প্রিয়া বলল—কি হয়েছে?

—ইঞ্জিন লাইটটা জ্বলছে না। বালব ফিউজ হয়ে গিয়েছে বোধহয়। এখন দেখি কি করে? তোমার কাছে টর্চ আছে?

উদ্বেগে দরজা খুলে নেমে এল প্রিয়া।

—তুমি একটা কি! ব্যাটারি ডাউন, বালব জ্বলে না—এগুলো তো মানুষ দেখে নেয় দূরে কোথাও রওনা হবার আগে! এখন আবার গাড়ি চলছে না। এই জঙ্গলের রাস্তায় ঢুকলে কেন বলো তো?

অপ্রতিভ হাসি হেসে অজয় বলল—ইঞ্জিন লাইটটা সত্যি চেক করা উচিত ছিল, ভুল হয়ে গেছে। তোমার হাতব্যাগে তো একটা টর্চ থাকে, দেখো না—

—হলুদ ব্যাগটা আনিনি। শান্তিনিকেতনি চামড়ার ব্যাগ এনেছি। টর্চ আগেরটায় রয়ে গিয়েছে—

মুখে চুক চুক গোছেব শব্দ কবে অজয বলল—ঝামেলা হল দেখছি। যাক গে, দেখি আন্দাজে আন্দাজে কি করা যায়। তুমি আবার নেমে এলে কেন? ভেতরে বসে থাকো।

—কেন, একটু দাঁড়াই না তোমার সঙ্গে। তাতে কি হয়েছে, এ জঙ্গলে তো আর বড় জন্তু জানোয়ার নেই—

—না, না, সেজন্য বলছি না। বড় জন্তু আবার কি থাকবে, তবু ভেতরে বসাই ভাল।

প্রিয়া স্বামীব কাছে ঘন হযে এল। মাথার ওপরে গাছেব ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া একফালি আকাশ থেকে বিষণ্ন, আবছা এক ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে। তাতে অন্ধকার কমে না, বরং বাড়ে।

অজয় বনেটের নীচে মাথা গলিয়ে কি খুটখাট করে চলেছে। প্রিয়া গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। দিনের বেলাতেই এই বনভূমি হয়তো কবিত্বময় দেখাবে, এর নিবিড় শান্তিপ্রদ প্রসারে দুদণ্ড বসে বিশ্রাম করে যেতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু এখন ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে অজানা সব ভয় লুকিয়ে রয়েছে পথের থেকে মাত্র দু-হাত দূরেই।

কতক্ষণ ধরে গাড়ি সারাবে অজয়? ঝাপসা আলোটুকুও যে ফুরিয়ে এল পৃথিবী থেকে।

—হল তোমার?

মাথা তুলে অজয় বলল—অ্যাঁ?

—চলো, আর কতক্ষণ এই বনে বসে থাকব?

—আমি কি ইচ্ছে করে দেরি করছি নাকি? মনে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটার থেকে কোনো একটা তারের লিড ছিঁড়ে গিয়েছে। ঠিক করতে সময় লাগবে—যদি ঠিক করা যায়।

তোমাকে বললাম না ভেতরে গিয়ে বসতে? যাও, ভেতরে বসে কাচ তুলে দাও।

কাচ তুলে দেওয়ার কথা বারবার বলছে কেন অজয়? কি হবে বাইরে থাকলে?

কথাটা প্রিয়া জিজ্ঞেস করেই ফেলে। অজয় একটা নোংরা কালিমাখা ন্যাকড়ায় হাত মুছে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। বলল—তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছ কখনো? বন্ধ আর ঘেরা জায়গায় থাকলে নিরাপত্তার বোধ বাড়ে। গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে বেশ রোমান্টিক লাগে, ভয়ও করে না—

—ভয় করার কিছু আছে কি?

—না না, সেরকম ভয়ের আর কি আছে? তবে কি জানো, হোরেশিওর কথাই সত্যি। দুনিয়ায় এমন সব ব্যাপার আছে বিজ্ঞান এখনো যার ব্যাখ্যা করতে পারেনি। শহরে ইলেকট্রিক আলোয় হয়তো এসব কথার কোনো মানেই নেই। কিন্তু এখানে অন্যরকম। এইসব গাছপালা, পাথর আর প্রান্তরের আত্মা আছে, জানো? এই নীরবতা, অন্ধকার, এদেরও আত্মা আছে।

প্রিয়া বলল—তারা ভাল না খারাপ? তার গলার স্বর সামান্য কেঁপে গেল।

—আরে, এ কি তোমার সেই রূপকথার গল্পের ভূত নাকি যে, কোনোটা উপকারী বন্ধু আর কোনোটা সুবিধে পেলেই ঘাড় ভাঙে? এদের বলে স্পিরিট অফ দি এলিমেন্টস —সাধারণ মানুষী মাপকাঠিতে এদের বিচার করতে গেলে ভুল হবে। ধরো না কেন—দুজন সাহেব পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যেবেলা তাবা একটু ফাঁকা মত জাযগা পেযে সঙ্গের হালকা তাঁবু খাটিয়ে ফেলল রাত্রির আশ্রয় হিসেবে। খাওয়া দাওয়া সেরে তারা তো ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাত্তিরে একজন সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবুর বাইরে কেমন যেন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। বাইরে এসে সাহেবের গলা শুকিয়ে গেল। চাঁদের আলো ফুট ফুট করছে চারদিকে, সেই আলোতে সে দেখল বিকেলবেলা যে গাছগুলো অনেক দূরে ছিল, সেগুলো চারদিক থেকে তাদের তাঁবু ঘিরে ফেলে তাদের পিষে মারবার চেষ্টা করছে।

ফ্যাকাসে মুখে প্রিয়া বলল—এ তো কেবল গল্প। এ তো আর সত্যি নয়। বলো?

—কে জানে। বললাম তো, শহরে অনেক কিছুই সত্য নয়, কিন্তু এখানে তাদের সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অজয় আবার বনেটের তলায় ডুব দিল।

প্রিয়া কি বাইরে দাঁড়াবে? নাঃ, গাড়ির ভেতর বসে থাকাই ভাল। অন্য কিছু নয়—মানে, অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখাও তো যাচ্ছে না যে বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখবে। বরং একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল প্রিয়া।

সেই ভোরবেলা থেকে বিশ্রাম বলতে তেমন কিছু হয়নি। মধ্যে দুপুরে কেবল রাঁচির ওয়ালডর্ফে লাঞ্চের জন্য যেটুকু থামা। মোটরে ভ্রমণ শুনতে বেশ জমকালো লাগলেও প্রকৃতপক্ষে বেশ কষ্টকর। দূরের পথ হলে তো কথাই নেই। তিন-চার ঘণ্টা পর হাত-পা ধরে যেতে থাকে।

উদ্বেগের কি আছে? কিছুই না। গাড়ি এখনই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আর মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার—সামনে কুড়ি একুশ কিলোমিটার অবশ্য ঘন জঙ্গল—তা হোক, সে জঙ্গলে খরগোশের চেয়ে হিংস্র কোনো জন্তু না থাকাই সম্ভব। রাঁচি ছাড়ার পর অজয় অবশ্য দুদিকের জঙ্গল দেখিয়ে একবার বলেছিল এসব বনে হায়েনা আছে। হায়েনা বেশ হিংস্র

জন্তু। কিন্তু তারা কি এত সকাল সকাল বের হয়? নাঃ, প্রিয়া জানে হায়েনা কখনো গভীর রাত ছাড়া বেরোয় না। একথা সে কোথায় পড়েছে এক্ষুনি মনে করতে পারছে না বটে, কিন্তু খুব ভাল কোনো লোকের লেখায় পড়েছে। এই কিছুক্ষণ বাদেই তারা রামনগর পৌঁছে যাবে। গাড়িটা ঠিক হয়ে গেলেই হয়। আর একটা কি যেন বলল অজয়? হ্যাঁ, স্পিরিট অফ দি এলিমেন্টস। একটু গা ছমছম করে বটে, কিন্তু ওসব সাহেবদের দেশেই হয়। এখানে কেউ কখনো অমন কথা শোনেনি।

ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে। স্তব্ধতার সঙ্গীত ঘুমকে ডেকে আনে একটু একটু করে।

মিনিট পাঁচ-সাত হবে বোধহয়, কিম্বা দশ মিনিট। হঠাৎ চমক ভেঙে প্রিয়া সোজা হয়ে বসে। একটা ভয়ঙ্কর কিছু নিশ্চয় ঘটে গিয়েছে তার তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে।

বনেটের নীচে থেকে অজয়ের খুটখাট করার শব্দটা থেমে গিয়েছে।

প্রথমে সে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। নাঃ, সত্যিই কোনো শব্দ নেই। সামনে কাচের মধ্যে দিয়ে কিছু দেখা সম্ভব নয়। কারণ বনেট তোলা থাকায় সেদিকের দৃশ্য আড়াল হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল প্রিয়া, যদি অজয়ের সাড়া পাওয়া যায়। না, বনেটেব নীচে আর নেই অজয়। একটা মানুষ অত নিশ্চুপে থাকতে পারে না, থাকবেই বা কেন?

প্রায় ফিসফিস করে প্রিয়া ডাকল—শুনছ? এই, শুনছ?

উত্তবে শুধুই স্তব্ধতা। ভযের গন্ধ বয়ে আসছে অন্ধকারের ভেতর থেকে।

সন্তর্পণে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামল প্রিযা। একা নামা উচিত হল না হয়তো, কিন্তু গাড়ির ভেতরে বসে থেকেই বা সে কি করবে? একটু এগিযে বনেটের তলায় উঁকি দিল প্রিয়া।

কেউ নেই। এয়ার ক্লিনারের গোল কৌটোটার ওপর অজয়ের সিগারেটের বাক্স আর লাইটার পড়ে আছে। আর হাতঘড়িটা। কালিঝুলি লাগবে বলে খুলে রেখেছে।

ঝটকা দিয়ে পেছন ফিরে গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল প্রিয়া। নিবিড় অন্ধকারে একটা জোনাকিও জ্বলছে না কোথাও। আকাশ থেকে প্রতিফলিত তারার আলোয় সমগ্র পারিপার্শ্বিক যেন এক অজানা রহস্যলোক।

বনের ভেতর—রাস্তা থেকে একটু দূরে—শুকনো পাতার ওপর সর সর করে কেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে। কিসের শব্দ ওটা? কেউ, বা কোনো জন্তু কি চুপিসাড়ে এগিয়ে আসছে আক্রমণ করার জন্য? হায়েনা সম্বন্ধে তথ্যটা কোথায় পড়েছে বা আদৌ পড়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রিয়া এই মুহূর্তে আর অত নিশ্চিত নয়। আওয়াজটা অবশ্য একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। না, শব্দটা আর হচ্ছেই না। শব্দের সৃষ্টিকারী কি বুঝতে পেরেছে প্রিয়া টের পেয়েছে তার অস্তিত্ব? তাই সে থেমে গিয়েছে?

এ অবস্থাটা আরও খারাপ। অদৃশ্য শত্রুর অবস্থানবিন্দু আন্দাজ করতে না পারলে আতঙ্ক চারদিক থেকেই ঘনিয়ে আসে। ভয়কে আর যুক্তি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

প্রায় বুঁজে আসা গলায় প্রিয়া চেঁচিয়ে উঠল—শুনছ? কোথায় গেলে?

ঠিক তক্ষুনি যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল সেদিক থেকেই অন্ধকার ফুঁড়ে রাস্তায় উঠে এল অজয়।

—কি হল তোমার? আবার গাড়ি থেকে নেমেছ যে?

—তুমি—তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

হাতঘড়ি পরতে পরতে অজয় বলল—ছোট বাইরে। কেন?

শুকনো পাতার ওপর সরসর শব্দটা কি তাহলে—

প্রায় চটে উঠে প্রিয়া বলল—গাড়ির কি হল? চলবে?

দড়াম করে বনেট বন্ধ করে অজয় বলল—চলবে, কিন্তু একটু সাবধানে চালাতে হবে।

—কেন?

—কোনোরকমে তারটা জোড়া দিয়েছি। একবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে আর স্টার্ট নেবে না—

এমন মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে না? বেরুবার আগে কিচ্ছু দেখে নেয়নি। না ব্যাটারি, না যন্ত্রপাতি, না কিচ্ছু—গাড়ি চালায় কেন লোকটা? ওর উচিত মেলায় ঝুরিভাজা বিক্রি করা।

গাড়ি স্টার্ট নিল একবারেই। হেডলাইটও জ্বলল। পথের দুধারে বন পূর্ববৎ নিবিড়, হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে গাড়িকে। এবার আর আলো নেভাচ্ছে না কেন অজয়? যেন খুব নিশ্চিন্তে একটানা চালিয়ে চলেছে। সামান্য গতি কমিয়ে একটুকরো ঢেউ খেলানো জমি পার হয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে অজয় বলল—যারা কলম্বিয়াতে গিয়ে প্রথম বাস করেছিল তাদের এইরকম বন কেটে সাফ করতে হয়েছিল। মারকুয়েজের লেখা পড়েছ?

—এদিকে তাকাচ্ছ কেন? রাস্তার দিকে দেখো—রাস্তার দিকে দেখো—

অজয় যেন একটু অবাক হয়ে বলল—না, তুমি তো দুঃসাহসী অভিযানের গল্প ভালবাস, তাই বলছিলাম—

প্রিয়া চোয়াল শক্ত করে রইল।

তারপরই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। পথটা একটু সরু বাঁক নিয়েই এসে উঠল চওড়া একটা পিচঢালা রাস্তায়। জঙ্গল ফুরিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, সেখান থেকেই পথ ঢালু হয়ে নীচে নেমে গিয়ে মাইলখানেক দূরে কোনো একটা শহরে ঢুকেছে। শহরের বাড়ি, ইলেকট্রিক আলো, দোকানপাট সবই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অজয় ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। গিয়ার নিউট্রাল করতেই গাড়ি আপনগতিতে গড়াতে লাগল শহরটার দিকে।

এটা কেমন হল! আরও অন্তত পনেরো কিলোমিটার তো গভীর বনের ভেতর দিয়ে যাবার কথা। তার পরেও বারো কিলোমিটার গেলে তাদের গন্তব্যস্থল। কিছু বুঝতে না পেরে প্রিয়া স্বামীর দিকে তাকাল।

অজয় গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। সে কারো দিকে তাকাচ্ছে না।

—হ্যাঁগো, ওটা কি জায়গা? তুমি যা হিসেব বললে তাতে তো এখানে কোনো শহর থাকার কথা নয়—

অজয় নীরব। সে বাংলা জানে না—কিংবা জন্মবধির।

—কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে তোমার?

অজয় গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—তুমিই তো একটু আগে বললে কথা না বলে কেবল গাড়ি চালাতে—

—আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। সামনে ওটা কি জায়গা?

—ওটা রামনগর।

প্রিয়া অবাক হয়ে অজয়কে দেখল, তারপর বলল—কিন্তু রামনগর তো আরও পঁচিশ

কিলোমিটার দূরে—

—আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আসলে এই বনট্যর ভেতর দিয়ে শর্টকাট করলে একেবারে রামনগরের মুখে এসে ওঠা যায়। যেখানে গাড়ি থামিয়েছিলাম সেখান থেকে রামনগর মোটে চার কিলোমিটার।

প্রিয়া উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে বিবর্ধমান শহরের বাড়ি ঘরগুলোর দিকে তাকাল, তারপর বলল—কিন্তু তুমি এমন করলে কেন?

—বারে, তুমি অত অভিযানের গল্প পড়তে ভালবাস, ইস্টার আইল্যান্ড আর ব্রেজিলের জঙ্গলে যেতে চাও—তাই তোমাকে একটু অভিযানের স্বাদ দিলাম। কেমন লাগল অ্যাডভেঞ্চার?

ইস্, কি পাজি লোক! প্রিয়া বলল—তাহলে যেখানে গাড়ি খারাপ হল সেখান থেকে আমরা হেঁটেও রামনগর আসতে পারতাম?

ভয়ানক অবাক হয়ে অজয় বলল—গাড়ি খারাপ হয়নি তো! ওটা আমি ইচ্ছে করেই—মানে, একটু থিয়েট্রিকাল টাচ—

প্রিয়া মনে মনে অজয়কে দুটো কাঁটাওয়ালা শজারুর সঙ্গে এক বস্তায় এক সপ্তাহ পুরে রাখার আদেশ দিল।

—আর হায়েনা? হায়েনা আছে না?

—তা থাকবে না কেন? কলকাতার চিড়িয়াখানায় আছে। ঢুকে সোজা এগিয়ে ডানদিকে। একদিন তাও দেখিয়ে নিয়ে আসব—

অনেক রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে প্রিয়া বলল—হ্যাঁ গো, ঘুমোলে?

—না। কেন?

—আমাদের সামনের ফ্ল্যাটের বউটা ভারি ভাল। একটু সেজেগুজে থাকে সবসময়, কিন্তু ভাল। ওকে এবার ফিরেই একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াব, কেমন? ওর বরকেও বলব—

—বেশ তো, বোলো—

—আর একটা কথা—

—কি?

—অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয় না। কলকাতা ফিরেই বেড়াবার ব্যবস্থা করে ফেলো তো। কাছাকাছির মধ্যে পুরীই ভাল—

পাট্টির কেলাস

মানববাবু রিটায়ার করেছেন বছরখানেক। স্থানীয় কলেজের অশিক্ষক কর্মচারী ছিলেন। টাকার হিসেব, ছাত্রভর্তির হাঙ্গামা, ফর্ম ফিল আপ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো ইত্যাদির ভেতর দিয়ে কেটেছে কর্মজীবন। এখন হালকা মানুষ, বঙ্কিম-বিভূতি-শরৎ-রবীন্দ্র রচনাবলী পড়েন, আর রোজ সকালে বাজার করেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলে ইন্দোরে চাকরি করে, এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সেখানেই থাকে। কাজেই তিন-চারদিনের বাজার একসঙ্গে করে ফ্রিজে রেখে দিলে দিব্যি কাজ চলে যায়, দুজনের তো সংসার। কিন্তু রোজ টাটকা জিনিস বাজার করে আনা মানববাবুর নেশা।

আজ বাজার থেকে ফিরে রিকসাওয়ালাকে ভাড়া দেবার সময়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি একটা দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন, ফেরৎ পাবেন সাড়ে ছ টাকা, বছর বাহান্ন-তিপ্পান্ন বয়েসের প্রৌঢ় রিকসাওয়ালা একগাদা খুচরো বের করে সিটের ওপর রেখে হিসেব করার চেষ্টা করছে—কিন্তু ঠিক পারছে না। শেষে মানববাবু বললেন দাঁড়াও, আমি নিয়ে নিচ্ছি।

একটা পাঁচ, একটা এক টাকার কয়েন, আর একটা আধুলি তুলে নিলেন তিনি। রিকসাওয়ালা অপ্রতিভ হয়ে বলল—এক সময় হিসেব কেমন গুলিয়ে যায় বাবু।

মানববাবু লোকটার দিকে তাকালেন। মলিন বেশবাস, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, মুখে দীনতা আর সঙ্কোচের ছাপ। আহা! এই মানুষটা কখনো জানবে না রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ার কী মজা, পড়বে না শ্রীকান্ত, কপালকুণ্ডলা বা পথের পাঁচালী। দশ টাকার নোটের হিসেব করতে এই অবস্থা! একশো বা পাঁচশো টাকার নোট হাতে পেলে কী করবে লোকটা? রাজ্য জুড়ে সাক্ষরতা অভিযান চলছে বলে শুনেছেন, সঠিক কর্মসূচী জানেন না, কারণ বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি ছাড়া সে সব কমিটিতে অন্যরা আহ্বান পায় না। এই লোকটা কি সাক্ষর? সাক্ষরতা অভিযান কি ওকে ছুঁয়েছে?

মানববাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কী ভাই? কোথায় থাকো?

লোকটি একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল, বলল—আমার নাম আবদুল খালেক, থাকি রেলপারের কলোনীতে। কেন বাবু?

মানুষ জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রে নিতান্ত অল্পসময়ে নিয়ে ফেলে। মানববাবু বললেন—তুমি লেখাপড়া জানো না, না? নাম সই করতে পারো?

—না বাবু। কে শেখাবে? ছোটবেলায় মুদিখানায় কাজ করতাম, তারপর কুড়ি কী বাইশ বছর কারখানায় কাজ করেছি। তা, সে কারখানা গেল বন্ধ হয়ে। এখন এই করি—

—শোনো আবদুল, রোজ একটু কষ্ট করতে পারবে? রাত আটটা নাগাদ রিকসার কাজ শেষ করে তুমি আমার কাছে চলে আসবে, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাবো। এটা খুব দরকার, বুঝলে? চট করে সব হিসেব করতে পারবে, ভাল বই পড়তে পারবে—সব মিলিয়ে একটা নতুন জীবন শুরু হবে তোমার। সঙ্গে ইচ্ছে করলে বন্ধুদেরও আনতে পারো, যারা পড়াশুনো শিখতে চায়। মাইনেপত্র লাগবে না, আমি এমনিই শেখাবো—

পরের দিনই রাত থেকে মানববাবুর পাঠশালা শুরু হয়ে গেল।

দুজন ছাত্র নিয়ে শিক্ষারম্ভ, আবদুল খালেক আর তার বন্ধু নরেন ভাণ্ডর।

মানববাবু তাদের খাতা পেনসিল ধারাপাত বর্ণপরিচয় ইত্যাদি কিনে দিলেন। পড়ার মাঝখানে মুড়ি বেগুনি আর চা-ও দিতে লাগলেন। অচিরাৎ ছাত্রসংখ্যা সাতে দাঁড়ালো। মানববাবু তখন মনের মত কাজ পেয়ে মগ্ন হয়ে আছেন, নইলে বুঝতে পারতেন ছাত্রদের সবাই নির্ভেজাল শিক্ষালাভের জন্য আসেনি, তাদের বুভুক্ষা আরো বাস্তব এবং পার্থিব।

মানববাবুর সময় বড় আনন্দে কাটতে লাগল। অবসব জীবনের বিশাল শূন্যতা সার্থকভাবে ভরাট করবার একটা সুযোগ তাঁর হাতে এসেছে, সারাদিন বসে প্রাথমিক পাঠের আদর্শ উপায়ের কথা ভাবেন, নানান ছক কাটেন। বকাঝকা করে আজকাল তাঁকে বাজারে পাঠাতে হয়। তাঁর এই মানবপ্রেমমূলক কর্মসূচীর কথা একটু একটু করে শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

গোলমাল প্রথমে বাধলো মাসখানেক পরে। বাজার সেরে ফেববার পথে প্রতিবেশী রমেনবাবুর সঙ্গে দেখা। রমেনবাবু একগাল হেসে বললেন—এই যে দাদা, ভাল তো? রাস্তায় যে বড় একটা আর দেখিনা, ব্যাপার কী?

—আজ্ঞে, মানে—নানারকম কাজে ব্যস্ত আছি। সময় হয়না—

রমেনবাবু মুচকি হেসে বললেন—জানি. শুনেছি। খুব ভাল কথা, আমরা যা তত্ত্ব হিসেবে প্রচার করছি, আপনি তা হাতে-কলমে করে দেখাচ্ছেন—

মানববাবু কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বললেন—কী করছি?

—বাঃ, বাঃ। আপনার মত লোকের কাছ থেকে এই তো আমাদের আশা। এতবড় কাজ করছেন, কিন্তু কোনো অহঙ্কাব নেই। বাঃ, বাঃ!

বিস্মিত, চকিত মানববাবুকে পথে দাঁড় কবিয়ে বেখে তিনি এগিয়ে গেলেন।

এত বড় কাজ! কী কাজ? তিনি জানেন না অথচ রমেন বায় জানে?

বিকেলে এলেন লোকনাথ চৌধুরী। তাঁকে এককাপ চা দিতে হল। চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন—সকালের ব্যাপারটা আমি খেয়াল করেছি। আপনার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আমি মানকচু কিনছিলাম। কী চমৎকারভাবে আপনি ট্যাক্‌ল করলেন রমেনকে। এমন ভান কবলেন যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। ঠিক করেছেন, মন্ত্রগুপ্তিই হল আসল জিনিস। প্রকৃতপক্ষে আপনি যে আমাদের পার্টির হয়ে কালচারাল ফ্রন্টে লড়ে যাচ্ছেন সেটা ঢাক পিটিয়ে কাউকে জানাবার প্রয়োজন নেই—

মানববাবু বিস্মিত এবং হতচকিত হলেন। যে কাজ তিনি করেছেন সেটার যে এতরকম অর্থ আছে তা তিনি ছাড়া আর সবাই জানে দেখা যাচ্ছে।

আমতা আমতা করে তিনি বললেন—দল-টল ঠিক জানিনা, মানুষকে ভালবাসি বলেই—

—হ্যাঁ, তাই তো। ওটাই তো আসল কথা। চালিয়ে যান যেমন চালাচ্ছেন। আর হ্যাঁ, পারলে সন্ধ্যের দিকে আমাদের পার্টির অফিসে আসবেন মাঝে মাঝে। চেনেন তো?

পরের দিন রামহরির দোকান থেকে চা-পাতা, গুঁড়ো দুধ আর বিস্কুট কিনে ফেরবার পথে গলির মোড়ে নবীন রায়ের সঙ্গে দেখা। নবীন তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট, দল নিয়ে ঘোরে, চড়া চড়া কথা বলে, তেমাথার মোড়ে মাইকের চোঙা ফোঁকে। সে নীরস গলায় বলল—এই যে মানবদা। ছিঃ! শেষে এই করলেন!

বিস্কুট, চা আর গুঁড়ো দুধের প্যাকেট হাতে মানববাবু সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গত কিছুদিন ধরে তাঁর কৃতকর্মের মধ্যে 'ছিঃ' খুঁজতে লাগলেন।

নবীন বলল—ছদ্মবেশে মৌলবাদ প্রচার খুব খারাপ কাজ মানবদা। খুব অন্যায়।

সন্ধানী দলে নাম লেখালেন শেষে? আপনি না শিক্ষাবাদী?

মানববাবু কোনোমতে বলেন—শিক্ষাবাদী না, শিক্ষাবিদ।

—কথা দিয়ে প্যাঁচ কষবেন না। ও দল ছাড়ুন, নইলে জনগণ দেখে নেবে—

—কী বলছ নবীন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

—ঠিকই পারছেন, এরপর আরো পারবেন। আচ্ছা, চলি।

সেদিনই পড়তে বসে আবদুল খালেক বলল—আচ্ছা বাবু, এটা কী আসলে পাট্টির কেলাস?

অবাক হয়ে মানববাবু বললেন—কীসের কী?

—ওই অমরবাবু বলছিল আমরা নাকি পাট্টির কেলাসে নাম লিখিয়েছি। আপনি ভোটে দাঁড়াবেন বলে লেখাপড়ার নাম করে আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দলে টানছেন।

—তোমরা কী বললে?

—আমরা তেনাকে বকে দিয়েছি। বলেছি বাবু আমাদের ভাল লোক।

—তোমরা ভোট দাও না? কাকে দাও?

নিবারণ ভাঙর বলল—সে কিছু ঠিক নেই বাবু। সব পাট্টির লোকেরা আসে, কেউ রাস্তা সারিয়ে দেবে, কেউ পাড়ায় টিউকল করে দেবে বলে, কেউ বলে হরিসভায় টিভি বসিয়ে দেবে, কেউ ভোটের দিন সকালে বাড়ির সক্কলের নামে নামে জলপানের প্যাকেট দিয়ে যায়। কাকে যে ভোট দেব বাবু—অনেক ভাবতে হয়—

মোটের ওপব মানবাবুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সন্ধানী দলের লোক ভাবে তিনি পথিক দলের লোক, পথিক দল ভাবে তিনি প্রকৃতপক্ষে 'মেরে জাগাও' দলের গুপ্তচর, 'মেরে জাগাও' দল নিশ্চিতভাবেই জানে তিনি 'পেট ভরাও' পার্টির গোপন কর্মী। যারা সেভাবে সরাসরি রাজনীতি করেনা, তারা ধরেই রেখেছে মানববাবু এবারে নির্দল প্রার্থী হিসেবে বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন, নইলে ঘরের খেয়ে কেউ বুনো মোষ তাড়ায়? তিনি কাউকে বোঝাতে পারলেন না সমাজসেবা ছাড়া তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, মানুষকে ভালবেসেই তিনি এ কাজে নেমেছেন। তবে তিনি দমে গেলেন না, মধ্যবিত্ত বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটা ইস্পাতের কাঠামো ছিল। যে যা বলে বলুক, তাঁর কাজ তিনি করেই যাবেন।

কিন্তু নিজের সমসাময়িক যুগকে মানববাবু চিনতেন না। এ বড় খারাপ সময়, প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন, শেকড়হীন বেঁচে থাকার সময়, নির্দেশহীন স্রোতে ভেসে যাবার সময়।

চার-পাঁচদিন বাদে সন্ধ্যেবেলা একা এল আবদুল খালেক, হাতে বইপত্র নেই।

মানববাবু বললেন—এ কী! অন্যরা কই? আজ পড়বে না?

মাথা নিচু করে আবদুল বলল—না বাবু, আমরা আর আসব না। আপনার দেখাদেখি গাওনাপাড়ায় 'ইধার আও' পাট্টি কেলাস খুলেছে, আমরা সবাই সেখানে নাম লিখিয়েছি। সেখানে চা-মুড়ি-বেগুনীর সঙ্গে মাথাপিছু চারখানা জিলিপি দেবে বলেছে। আপনার নুন খেয়েছি বাবু, তাই জানিয়ে গেলাম। তবে বলে যাই বাবু, আপনি লোক ভাল। জিলিপির জন্য যাচ্ছি বটে, কিন্তু আপনি ভোটে দাঁড়ালে ভোট আপনাকেই দেব।

মানববাবুর নৈশ বিদ্যালয় উঠে গেল। আজকাল সন্ধ্যেবেলা তিনি স্ত্রীর সঙ্গে লুডো খেলে সময় কাটান।

তারানাথ বলল—কঠোর সাধনা করলেই যে সিদ্ধিলাভ হবে তন্ত্রে এমন কোনো কথা নেই। অনেক ব্যাপার আছে এর মধ্যে।

কিশোরী বলল—যেমন?

যেমন দীক্ষা। প্রশস্ত লগ্নে দীক্ষা না হলে সাধকের ব্যর্থতা অনিবার্য। তোমাদের তো বলেছি, আমার দীক্ষা হয়েছিল শাস্ত্রমতে সবচেয়ে শুভলগ্নে, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়। এছাড়া দশহরা বা পৌষের শুক্ল নবমীতে তান্ত্রিক দীক্ষা বিধেয়। ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা হয় না।

কেন?

ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা হলে মৃত্যু হয়। সাধনা সম্পূর্ণ হয় না।

তারানাথের কাছে এলে এমন নানা অদ্ভুত কথা শুনতে পাওয়া যায়। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। এইসব বিচিত্র কথা শোনবার লোভেই মাঝে মাঝে তার কাছে এসে জুটি আমরা দুজন। তার বসবার ঘর থেকে বাইরে পা দিলেই অবশ্য বিশ্বাসের জোর কমে আসে, কিন্তু যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলে ততক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শোনা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। সত্যিমিথ্যা বিচারে লাভ কী? গল্পটাই আসল!

কিশোরী বলল—যাঃ, এমন হতেই পারে না। কোথায় আকাশে কোটি কোটি মাইল দূরে রইল একটা নক্ষত্র, আর তাব প্রভাবে পৃথিবীতে একজন জলজ্যান্ত মানুষ দুম করে মরে গেল, তা কী হতে পারে?

তারানাথ বলল—ঠিক বলেছ। আমিও জানি না কিভাবে গ্রহ নক্ষত্র মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে, কাজেই বিশ্বাস না করলে তোমাকে দোষ দেব না। কিন্তু করে যে, একথা সত্যি। আমার নিজের চোখে দেখেছি।

যেমন?

বিন্ধ্যাচলের জঙ্গলে এক তান্ত্রিক গুরুর কাছে একবার মাসছয়েক ছিলাম। তিনি অবশ্য আমার গুরু নন, আমার দীক্ষা তার আগেই হয়ে গিয়েছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিলাম, জায়গাটা ভাল লাগায় কয়েকমাস থেকে যাই। সাধুজী পাতার কুটির বেঁধে আস্তানা বানিয়েছিলেন, ছ-সাতজন শিষ্য নিয়ে থাকতেন। আমিও দলে ভিড়ে গেলাম। চারদিকে ঢেউয়ের মত পাহাড়ের পর পাহাড়, সবুজ গাছপালায় ভরা। ধারে-কাছে কোনো লোকালয় নেই, কয়েকটা আদিবাসীদের বস্তি ছাড়া। সকালবেলা পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙে। দিনের বেলাটা বুনো আমলকী আর ঝরণার জল খেয়ে কাটাই। বনের ভেতর গাছের তলায় বসে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করি। রাত্তিরে সাধুজী দু-একখানা চাপাটি দেন, তাতেই বেশ চলে যায়। তোমরা নিতান্ত শহুরে গৃহীলোক, তোমরা বুঝবে না, কিন্তু আমি জানি কত সামান্য উগকরণে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। প্রয়োজন কমিয়ে আনাটা অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা সাধুজীর কাছে বসে কথাবার্তা বলছি, সাকরেদরা ধুনীর ওধারে বসে দুই হাতে চটাপট শব্দ করে চাপাটি গড়ছে, এমন সময় সাধুজী হঠাৎ সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে হেঁকে বললেন, কওন আতা হ্যায় রে?

আমি চমকে পেছনের বনের দিকে তাকালাম। শিষ্যরাও রুটি তৈরি বন্ধ রেখে অবাক হয়ে তাকাল, কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। সাধুজী একদৃষ্টে তাকিয়েই আছেন। একটু পরে টিলার উতরাইয়ের দিক থেকে কারো হেঁটে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। ঝরাপাতা আর শুকনো ডালপালা মাড়িয়ে কে যেন কুটিরের দিকে উঠে আসছে। প্রধান শিষ্য বুন্দেল কিছু একটা আশঙ্কা করে কুটিরের দেয়ালে ঠেক দিয়ে রাখা লাঠিটা আনবার জন্য উঠে দাঁড়াল। সাধুজী হাতের ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন।

একটু পরে অন্ধকারের চাদর ফুটো করে ধুনীর আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল একজন মানুষ। দেখার মত চেহারা বটে! অন্তত সাড়ে ছ-ফুট লম্বা, তদনুপাতে চওড়া। খালি গায়ে বনমানুষের মত গোছা গোছা লোম, একটা আটহাতি মোটা ধুতি কোনোরকমে কোমরে জড়ান। বিশাল দুই গোল গোল চোখ জবাফুলের মত লাল। তার একহাতে বড় একখানা পোঁটলা, অন্য হাতে একগাছা লাঠি।

সাধুজী মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী চাই বেটা?

লোকটা একটু ইতস্তত করে হাতের জিনিসপত্র নামিয়ে সাধুজীকে প্রণাম করল। আশীর্বাদ করে সাধুজী বললেন, কোথা থেকে আসছ? কী চাই?

বাবা, আমার নাম অবধলাল। আপনার মহিমা শুনে অনেক দূর থেকে আসছি। আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।

সাধুজী একটু অবাক হয়ে বললেন, দীক্ষা? তান্ত্রিক দীক্ষা?

হ্যাঁ বাবা।

কিন্তু—তান্ত্রিক দীক্ষা তো এভাবে চাইবামাত্র দেওয়া যায় না, তার অনেক নিয়মকানুন আছে। তুমি সাধনভজন কিছু করেছ?

অবধলাল বলল—না বাবা, গুরু কোথায় পাব?

তাহলে এভাবে হবে না। ফুটো পাত্রে জল রাখা যায় না জানো তো? তন্ত্রদীক্ষা পাবার যোগ্যতা তোমার আছে কিনা সে বিচার আগে করতে হবে।

উত্তরে অবধলাল সাধুজীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

অবধলাল তখনকার মত আশ্রমে থেকে গেল। সাধুজী দীক্ষার বিষয়ে পরিষ্কার কিছু বললেন না বটে, কিন্তু সে লেগে রইল। কায়িক পরিশ্রম আর সেবা দিয়ে অবধলাল সাধুজীকে ভেজাবার চেষ্টা করতে লাগল। সকাল থেকে সে বহুবার টিলার নিচের ঝরণা থেকে জল এনে দেয়, কুড়ুল দিয়ে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে রাখে—চেলাদের বলতে গেলে আর কোনো কাজই রইল না।

কিন্তু অবধলালের চোখদুটো দেখে আমার ভয় করত। সংসার ছেড়ে যে লোক সাধুর জীবন যাপন করতে এসেছে তার চোখ অমন নিষ্ঠুর হবে কেন? মুখে তার বিশেষ কথা ছিল না, কিন্তু ঠাণ্ডা, উত্তেজনাহীন চোখে যখন সে তাকিয়ে বসে থাকত, তাকে দেখলেই বুকের ভেতরে কেমন করে উঠত। এ জিনিসটা তোমাদের ঠিক বলে বোঝান যাবে না, মোটের ওপর অবধলাল আচারে ব্যবহারে শান্ত ছিল বটে, তবু তাকে দেখলেই মনে হত লোকটা মূর্তিমান অমঙ্গল।

একদিন বনের মধ্যে বসে জপ করার পর সাধুজীর আশ্রমের দিকে ফিরে আসছি, সময়টা সূর্যাস্তের কিছু পরে, বনের ভেতর দ্রুত অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পথের ধারেই ঝোপের আড়ালে পট্ পট্ করে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। প্রথমে খুব ভয় হল,

বনের মধ্যে কোনো জন্তু লুকিয়ে বসে নেই তো? বিন্ধ্যাচলের এসব অরণ্য হিংস্র প্রাণীতে ভরা, আমার হাতে একগাছা লাঠিও নেই যা দিয়ে বন্যজন্তুর আক্রমণ ঠেকাতে পারি। তারপরেই মনে হল কোনো হিংস্র প্রাণী অমন শব্দ করবে কী করে? দেখাই যাক এগিয়ে।

সন্তর্পণে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে হঠাৎ একচমকে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অনেকখানি অভিজ্ঞতা লাভ হল।

ঝোপের ওপাশে একটু পরিষ্কার মত জায়গায় উবু হয়ে আধো-অন্ধকারে বসে আছে অবধলাল, তার দুই চোখ নেকড়ে বাঘের মত জ্বলছে। সামনে গোল করে পাকানো একগোছা মোটা বুনো লতা। মুখে বিভীষণ ভঙ্গী ফুটিয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে অবধলাল সেই লতাগুলোকে দুই হাতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে। নিজের ভেতরের ক্রোধকে প্রয়োগ করবার স্থান না পেলে সাপ যেমন ব্যর্থ আক্রোশে বারবার মাটিতে ছোবল দেয়, প্রতিপক্ষকে হাতের কাছে না পেয়ে মুষ্টিযোদ্ধা যেমন বালির বস্তায় আঘাত করে অভ্যাস বজায় রাখে, অবধলাল তেমনি আশ্রমের শান্ত পরিবেশে নিজের ভয়ঙ্কর চরিত্র উদ্ঘাটিত করবার সুযোগ না পেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এখানে লুকিয়ে বসে মোটা মোটা লতাগুলো ছিঁড়ে নিজের প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ চরিতার্থ করবার চেষ্টা করছে। একবার ভাবলাম ডেকে কথা বলি, কিন্তু সাহস হল না। ওই বুড়ো আঙুলের মত মোটা দুগাছা লতা একসঙ্গে করলে হাতি বাঁধা যায়, সেগুলোকে যে মানুষ অক্লেশে গুলিসুতোর মত টেনে ছিঁড়ছে তার সঙ্গে নির্জন স্থানে অকারণ ঘনিষ্ঠতা না করাই ভাল।

খাওয়া-দাওয়া মেটবার পর ধুনীর পাশে বসে সাধুজী যৌগিক প্রক্রিয়ায় কিভাবে অন্তর্ধৌতি করতে হয় সে বিষয়ে আমাদের বলছিলেন। দেখি ভক্তিতে ঢুলুঢুলু চোখে হাতজোড় করে অবধলালও অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে বসে আছে। এমন অভিনয় ক্ষমতা থাকাটাও আশ্চর্যের কথা।

শিষ্যরা সবাই উঠে রাত্তিরের বিশ্রামের জন্য চলে গেল। সাধুজী চুপ করে একা বসে আছেন। রোজই উনি অনেক রাত অবধি এমনি বসে থাকেন। কখন ঘুমোন, বা আদৌ ঘুমোন কিনা কে জানে! একবার মনে হল—এই তো সুযোগ, ওঁকে ব্যাপারটা খুলে বলি। তারপর ভাবলাম, কী দরকার? আমি আজ এখানে আছি, কাল অন্য জায়গায় চলে যাব, এঁদের সমস্যায় আমার মাথা গলানো উচিত নয়। তাছাড়া আমার তো ভুলও হয়ে থাকতে পারে। একটা লোক দেখতে কদাকার আর তার চোখ দুটো লাল বলেই যে সে পাষণ্ডের একশেষ—এমন মনে করবার কারণ নেই। আমার মনের সন্দেহ ছাড়া অবধলালের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পাথুরে প্রমাণ আমার হাতে নেই।

পুট্‌পুট্‌ আওয়াজ করে ধুনীতে কাঠ পুড়ছে, আগুনের ফুলকি লাফিয়ে উঠছে আকাশে। হঠাৎ সাধুজী জিজ্ঞাসা করলেন—বেটা, তুমি কী আমাকে কিছু বলবে?

একটু ইতস্তত করে বললাম, না সাধুজী। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি যাই।

পরের দিন সকালে উঠে সাধুজী কোথায় যেন যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। নিজের পুঁটলি গুছিয়ে, চিমটেটা হাতে নিয়ে শিষ্যদের বললেন—আমি একটু কাজে দিনদশেকের জন্য লোকালয়ে যাচ্ছি, তোমরা সাবধানে থেকো—

শিষ্যরা কেউ কোনো প্রশ্ন করল না, কেবল অবধলাল জিজ্ঞাসা করল—আমার দীক্ষা নেবার কী হবে বাবা?

সাধুজী হেসে বললেন, ফিরে এসে দিন ঠিক করব। ততদিন ধৈর্য ধরো...

দশটা দিন আস্তে আস্তে কেটে গেল। এগারো দিনের দিন সাধুজী ফিরলেন। হাসিমুখে

শিষ্যদেব জিজ্ঞেস কবলেন, তোমরা সবাই সুস্থ ছিলে তো? কোনো কষ্ট হয়নি? বলরামপ্রসাদ ঠিক সময়ে আটা দিয়ে গিয়েছিল?

সেদিন রাত্তিরে আমি বললাম, সাধুজী, এবার আমাকে অনুমতি দিন। বড় ভাল লেগেছে আপনার কাছে থাকতে, কিন্তু এবার তো যেতেই হবে।

কবে যেতে চাও?

কালই। আগেই হয়তো যেতাম, কিন্তু আপনাকে না বলে যাওয়া উচিত নয়।

এই সময় পাশ থেকে অবধলাল বলল—বাবা, আমার দীক্ষা?

সাধুজী তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তোমার ব্যাপারটা ঠিক করে রেখেছি, সামনের শনিবার তোমাকে দীক্ষা দেব। তৈরি হও।

পরের দিন চলে আসব, সাধুজীর কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। গভীর রাত পর্যন্ত ওঁর কাছে বসে রইলাম। কোনো কথাবার্তা কিন্তু হল না। উনিও বসে আছেন, আমিও বসে আছি। সাধুজী সেই অত্যন্ত বিরল ব্যক্তিত্বশালীদের মধ্যে একজন, যাঁদের সান্নিধ্যই যথেষ্ট, বাক্যালাপ বাহুল্যমাত্র। অনেক রাতে নিঃশব্দে প্রণাম করে উঠে চলে আসছি, সাধুজী ডাকলেন, বেটা!

ফিরে তাকিয়ে বললাম—কিছু বলবেন সাধুজী?

তিনি সামান্য কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিযে থাকলেন, তাবপর বললেন, তুমি অনেকদূর যাবে। পূর্ণ তন্ত্রসাধনা তোমার হবে না বটে, কিন্তু যেটুকু হবে তা অনেকে সারাজীবন তপস্যা করেও পায় না।

তারপর বললেন, সাধুদের মাযায় জড়াতে নেই, তবু বলছি, তোমার ওপর আমার বড় স্নেহ পড়ে গিযেছিল। চলে যাচ্ছ, মনটা খারাপ লাগছে।

বললাম, আমার ওপর এত কৃপা করলেন কেন সাধুজী? আমাব তো কোনো গুণই নেই।

সাধুজী পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। কেন জানো? তুমি কখনো আমার কাছে কিছু চাওনি বলে। আর সবাই আমার কাছে কিছু না কিছু প্রার্থনা নিয়ে আসে। কেবল তুমিই এতদিন ছিলে, কিন্তু কিছু চাওনি।

না চাইতেই আপনার কাছে থাকবার আনন্দ পেয়েছি, তাই চাইনি। অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকলে ব্যবসা বা চাকরি করতাম, এখানে আসতাম না।

তিনি মৃদু হেসে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুললেন। আমি আর একবার প্রণাম করে চলে এলাম।

বছর দেড়েক ঘুরে বেড়ালাম ভারতের বিভিন্ন তীর্থে। সাধনার চেষ্টায় নয়, পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্যও নয়। আসলে একজায়গায় থাকতে ভাল লাগত না। স্বপ্নের মধ্যেও পথ হাতছানি দিয়ে ডাকত। তাই নেশার ঘোরে ঘুরে বেড়াতাম।

এইভাবে একদিন এসে পড়লাম প্রভাসতীর্থে। ধর্মশালায় থাকি, ঘুরে ঘুরে সারাদিন মন্দির দেখি আর সাধুসন্তদের খুঁজে বেড়াই। জনপদের বাইরের দিকে একটা ছোট্ট শিবমন্দির আমার খুব ভাল লেগে গেল। সন্ধ্যের দিকে মন্দিরের বাঁধানো চত্বরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। সে দিকটায় লোকজনের বিশেষ যাতায়াত নেই। শান্ত পরিবেশ, দূরে বিষ্ণুমন্দির থেকে ক্ষীণ সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। মৃদু বাতাসে দোলে প্রাঙ্গণের নীল ঝুমকোর লতা। বসে বসে এই সব দেখি। একদিন এইরকম বসে আছি।

অন্যমনস্কভাবে কী চিন্তা করতে করতে রাত হয়ে গিয়েছে খেয়াল করিনি। দারোয়ান এসে বলল—বাবুজী, মাপ করবেন, এবার মন্দিরের দরজা বন্ধ করতে হবে।

লজ্জা পেয়ে উঠে বাইরে যাবার দরজার দিকে এগুচ্ছি, শুনলাম উঠোনের একপ্রান্তে শুয়ে থাকা কাউকে দারোয়ান ধমকাচ্ছে—আরে! কওন নিদ যাতা য়হাঁ? উঠো, হঠ্ যাও—ইয়ে শোনেকা জায়গা নেহি হ্যায়—

কৌতূহল হওয়ায় কাছে গিয়ে দেখি পাঁচিলের ধার ঘেঁষে একটা কালো কম্বলের বস্তামত কী পড়ে রয়েছে। দারোয়ান পরিত্রাহি সেটার গায়ে খোঁচা দিচ্ছে আর গালাগাল করে চলেছে। জায়গাটায় আলো কম, ভাল করে তাকিয়ে দেখি মানুষই বটে, আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। দারোয়ানের কোঁৎকা খেয়ে মানুষটা উঠে বসল, তারপর টলতে টলতে বাইরে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে আবার শুয়ে পড়ল। দারোয়ান দরজায় তালা লাগাচ্ছিল, তাকে বললাম—খামোকা তুমি ওকে বকলে, বেচারির অসুখ করেছে—

অভিজ্ঞ মানুষের হাসি হেসে দারোয়ান যা বলল তার অর্থ এই যে, সে এমন বিমার আদমি দেখেছে। খুব কম পাজী লোকই তার সতর্ক চোখ এড়াতে পারে। বিমার নয়, ব্যাটা আসলে মাতোযালা।

বাইরে এসে দেখি লোকটা গায়ে কম্বল জড়িয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে। বিশাল লম্বা লোকটা, মাটিতে বসে থাকা অবস্থাতেও তার মাথা প্রায় আমার বুকের কাছে উঠে এসেছে।

আস্তে করে বললাম, কী হয়েছে ভাই তোমার? শরীর খারাপ লাগছে? কোথাও পৌঁছে দিতে হবে?

দু-চারবার ডাকাডাকির পর লোকটা মাথা তুলল।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম।

আধো অন্ধকারেও ঠিক চিনতে পেরেছি। লোকটা অবধলাল।

কিন্তু এ কী চেহারা হযেছে অবধলালের! কোথায় গেল তার সেই ক্ষুধিত, জ্বলন্ত দুই চোখ? কোথায় তার সেই সর্বশরীর দিয়ে বেরিয়ে আসা পাশবিক শক্তির পেশল বহিঃপ্রকাশ? হাড়ের কাঠামোর ওপরে আলগা চামড়ার আবরণ গরুর গলকম্বলের মত ঝুলে রয়েছে, মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন। শুকনো ঠোঁট সরে গিয়ে দাঁতগুলো যেন তর্জনের ভঙ্গিতে বেরিয়ে রয়েছে। দুই চোখ কোটরগত, গাল তোবড়ানো, সমস্ত চেহারায় একটা অসুস্থ অসহায়তা।

বললাম—অবধলাল, আমাকে চিনতে পেরেছ? কী হয়েছে তোমার?

অবধলাল চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর কী একটা বলতে গিয়ে তার ভয়ানক কাশির ধমক এল। কাশতে কাশতে উপুড় হয়ে পড়ল সে। কিছুক্ষণ পরে সোজা হলে দেখলাম সামনে মাটির ওপরে বেশ খানিকটা রক্ত পড়ে রয়েছে।

অবধলালের কী হয়েছে সে প্রশ্নের আর উত্তর খোঁজার প্রয়োজন নেই।

তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ? বল তো আমি কে?

অবধলাল মাথা নাড়ল। আমি বললাম সেই বিন্ধ্যাচলে সাধুজীর মন্দির মনে আছে? সেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তুমি আমাকে 'বাঙালী' বলে ডাকতে? মনে পড়ে?

এবার তার চোখে পরিচিতির ছায়া খেলে গেল। সে বলল—হ্যাঁ, চিনেছি।

তোমার দীক্ষার আগেই আমি চলে এসেছিলাম। তারপর কী হল তা জানিনা। তুমি সাধনা শেষ করনি?

করুণ হেসে অবধলাল বলল, আর সাধনা! দেখছেন তো আমার অবস্থা।

কী হয়েছে তোমার?

রাজযক্ষ্মা। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, নাগপুরের সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারকে দিয়েও দেখিয়েছি। সবাই বলেছে আমি আর বাঁচব না।

কিন্তু এখানে তুমি কী করছ?

প্রভাসের জলে স্নান করে বেড়াচ্ছি। দক্ষের অভিশাপে চাঁদের যক্ষ্মা হয়েছিল, তখন চন্দ্রদেব প্রভাসতীর্থে স্নান করে যক্ষ্মারোগ থেকে মুক্ত হন।

তারপর অবধলাল কেমন উদ্‌ভ্রান্তভাবে হেসে বলল, কিছুই হবে না জানি, তবু একটা আশা আর কী! এখানকার কোনো পুকুর, কুণ্ড বাদ রাখিনি।

আবার একটা কাশির দমক এল, মাটির ওপরে জমে উঠল আরো একটি রক্তের ছোট কুণ্ড। একটু সামলে নিয়ে ধুতির প্রান্তে মুখ মুছে অবধলাল বলল, দীক্ষার পর ভূপাল থেকে কিছুদূরের এক শ্মশানে সাধনা শুরু করেছিলাম। কিন্তু হল না। চার-পাঁচমাসের মধ্যে এই অসুখ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। অল্প অল্প জ্বর হত সন্ধ্যের দিকে, গলায় সামান্য খুসখুসে কাশি। জ্বরও ছাড়ে না, কাশিও ক্রমে বাড়তে লাগল। এদিকে হাত-পা থেকে যেন জোর চলে যাচ্ছে। একদিন কাশির সঙ্গে বক্ত বেব হতে ভয় পেয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। ছ-মাস চিকিৎসা কববার পর ডাক্তার বলল, তোমার যক্ষ্মা হয়েছে। কিন্তু কেমন যক্ষ্মা বুঝতে পারছি না। আমি যে ওষুধ তোমাকে দিয়েছি তাতে এতদিনে তোমার অসুখ সেরে যাওয়া উচিত, কিন্তু কোনো ওষুধই তোমার শরীরে কাজ করছে না। আমাদের আর কিছু করবার নেই। তুমি যাও, ভগবানের নাম করো...এখন একমাত্র ভগবানই তোমার অসুখ সারাতে পারেন।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ঠিকই বলেছেন ডাক্তারবাবু। ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। তুমি তাঁর নাম কবো।

অবধলাল আবার হাসল, বলল—ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনবেন না বাঙালী। আমি ঘোর পাপ করেছি। ঈশ্বর আমার দিক থেকে চিরকালের মত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

একজন মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাক্তন পাপকর্মের কথা শোনার ইচ্ছে ছিল না, কাজেই চুপ করে রইলাম। অবধলাল বলল, বাঙালী, আমি একটা খুন করেছি, জানো?

জানতাম না। এখন জেনেও লাভ নেই। অবধলাল রোগের যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে তাতে সে পাপ-পুণ্য বা পুরস্কার ও শাস্তির পরপারে চলে গিয়েছে। কিন্তু এক পা যার মৃত্যুর গহ্বরে সে বোধহয় নিজের পাপের কথা নিজের মুখে স্বীকার করে একধরনের শান্তি পায়। আমার দিকে তাকিয়ে অবধলাল বলল, আমাকে তুমি চেনো না বাঙালী, আমি আসলে সাধু নই, সাধনা করে ভগবানকে পেতে চাই নি। তন্ত্রসাধনা করে যে শক্তি পাওয়া যায় তা দিয়ে আমি ঐশ্বর্য, নারী, ক্ষমতা, এইসব চেয়েছিলাম। মরেই তো যাবো, এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই, কী পাপ না করেছি জীবনে! সাতাশ বছর বয়েসে সম্পত্তির জন্য ভাঙের সঙ্গে কল্‌কে ফুলের বীচি খাইয়ে আমি আমার খুড়তুতো ভাইকে হত্যা করি। কাকার আর কেউ ছিল না, সম্পত্তি আমার দখলে আসে। কোনো সুন্দরী মেয়ে বা কুলবধূর রেহাই ছিল না আমার হাত থেকে, ছলে বলে বা কৌশলে তাকে আমি কব্‌জায় আনবই। পারিনি কেবল একজনকে। আঃ। মরলেও আমার সে দুঃখ যাবে না।

অবধলালের মৃত্যুকবলিত নিষ্প্রভ দৃষ্টি হঠাৎ যেন আবার ধক্ করে ব্যর্থতার আগুন নিয়ে জ্বলে উঠল। বুঝলাম অবধলাল ভেতরে ভেতরে সেই অবধলালই আছে, কিছুই বদলায় নি।

সে বলল, নেহাল সিং জাঠেদারের মেয়ে ছিল সে। রাস্তায় তার হাত ধরেছিলাম বলে সে আমার হাতে কামড় দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছিল, এই দেখো তার দাগ।

অবধলাল কম্বলের তলা থেকে ডান হাতের কবজি বের করে দেখাল।

নেহাল সিং আমাকে মারবার জন্য লোক লাগায়। ভাঁটিখানা থেকে ফূর্তি করে ফেরবার পথে অনেক রাত্তিরে নেহাল সিংয়ের ভাড়াটে গুণ্ডারা আমাকে ধরে। বাঙালী, আমার সে সময়কার চেহারা তুমি দেখেছ, কটা চুহার বাচ্চা আমার সঙ্গে পারবে কেন? আমি তাদের ঠেঙিয়ে ভাগিয়ে দিই। লোকগুলো যাবার আগে দূর থেকে চাকু আর পাথর মেরে আমাকে জখম করে যায়। একমাস হাসপাতালে থেকে আমি সেরে উঠি।

ফিরে দেখি নেহাল সিং মেয়েকে আত্মীয়ের বাড়িতে দূরে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল বাঙালী। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে কে কবে বাঁচতে পেরেছে? মেয়েটাকে আমার চাই-ই চাই, আর নেহাল সিংকেও তার হঠকারিতার শাস্তি পেতেই হবে। আমি অপমান ভুলে যাবার লোক নই।

একটু থেমে দম নিয়ে অবধলাল বলল, সাধনা শেষ করতে পারলে আমি মন্ত্রের জোরে নেহাল সিংয়ের মেয়েকে টেনে নিয়ে আসতাম। উচাটন করে তার বাপকেও মেরে ফেলতাম। জানো উচাটন কী করে করতে হয়? মড়ার কাপড় নিয়ে এসে তার ওপর কাকের পালকের কলম দিয়ে মোষের রক্তে ডুবিয়ে যাকে মারতে চাই তার নাম লিখতে হবে। তারপর কাকের বাসা দিয়ে হোম করে সেই হোমের আগুনে ওই নামসুদ্ধ কাপড়টা পুড়িয়ে দিলেই সে ঠিক একমাসের মধ্যে মারা যাবে। কিন্তু যে-সে হোম করলে হবে না, হোমকারীর তন্ত্রসিদ্ধ হওয়া চাই। সেজন্যই সাধুজীর কাছে গিয়েছিলাম।

বললাম, ওসব কথা এখন থাক। তুমি কোথায় উঠেছ?

কোথাও না। এই রোগ নিয়ে কোথাও থাকতে দেয় না। পথের ধারে যেখানে সেখানে শুয়ে থাকি।

আমার আর কী করার আছে? বললাম, কিছু খাবে অবধলাল? এনে দেব?

অবধলাল হঠাৎ রাগী চোখ তুলে বলল, কিচ্ছু চাই না। তুমি ভাগো তো বাঙালী, তোমাকে দেখলে আমার রাগ হচ্ছে। তোমার স্বাস্থ্য এত ভাল কেন? তুমি বেঁচে থাকবে, আর আমি মারা যাব কেন? ভাগো, ভাগো।

চলে এলাম। কিছুদূর এসে ফিরে তাকিয়ে দেখি সে আবার গাছতলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

অবধলালকে সেই শেষ জীবিত দেখেছি।

পরদিন সকালে কিছু গরম সিঙাড়া আর জিলিপি কিনে তার খোঁজে গিয়ে দেখি জায়গাটায় লোকের ভিড়। ব্যাপার বুঝতে আর বাকি রইল না। কাছে গিয়ে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম।

সেইখানেই শুয়ে আছে অবধলাল। সারা গায়ে কম্বল জড়ান, কেবল মুখটুকু বেরিয়ে আছে। রাত্তিরে কখন মারা গিয়েছে কে জানে! আমি আস্তে সরে এলাম। প্রভাসে নিখরচায় দরিদ্রদের সৎকার করবার জন্য কয়েকটা সমিতি আছে, তারাই খবর পেলে এসে যা

করবার করবে। হাতের খাবারগুলো পথের একটা ষাঁড়কে খাইয়ে দিলাম।

অবধলালের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে একটা ব্যাপাবে অবাক লেগেছিল। আমি চোখের সামনে অনেক মানুষকে মরতে দেখেছি। সাধারণত মৃত্যুর পর নিতান্ত কঠোর স্বভাবের মানুষের মুখও শান্ত ও সমাহিত হয়ে আসে। কিন্তু কম্বলের তলা দিয়ে বেরিয়ে থাকা অবধলালের মুখ দেখে চমকে উঠেছিলাম। মৃত্যুতে তার মুখ যেন ক্রূরতার স্থিরচিত্র হয়ে আছে। চিরনিদ্রার প্রশান্তি সেখানে নেই।

দিনদুই পরে আমি সেখান থেকে চলে আসি। অবধলালের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবে এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এর একটা উপসংহার আছে, যদিও আমি তা তখনো জানতাম না।

সমগ্র উত্তরভারত ভ্রমণ করে এই ঘটনার মাসছয়েক বাদে বাড়ি ফিরছি। কাশী দর্শন করে মোগলসরাই স্টেশনে এসে বসে আছি হাওড়া ফেরার গাড়ি ধরব বলে। ট্রেনের তখনো ঘণ্টা তিনেক দেরি, ভাবলাম বড় খিদে পেয়েছে, স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে কোনো দোকান থেকে পুরি-হালুয়া খেয়ে নিই। স্টেশন থেকে বেরুচ্ছি, দেখলাম লোকজনের ভিড় বাঁচিয়ে এককোণে প্ল্যাটফর্মের ওজনের কলের ওপর রক্তাম্বর পরা একজন সাধু বসে আছেন। মেরুদণ্ড সোজা করে ঋজু হয়ে থাকার ভঙ্গিটি বড় চেনা মনে হল। কাছে গিয়ে দেখি বিন্ধ্যাচলের সেই সাধুজী। আমার চিনতে সময় লাগলেও আমি প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি কিন্তু বললেন, আরে, বাঙালীয়া! তুমি কোত্থেকে?

বাড়ি ফিরছি সাধুজী। সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

সাধুজী আমাকে দেখে খুশী হয়েছেন বোঝা গেল। পাশের জায়গা দেখিয়ে বললেন, এখানে বোসো। তোমার সঙ্গে কথা বলি।

বসছি সাধুজী, তার আগে কিছু খাবার কিনে আনি।

উনি খুশী হয়ে বললেন, বহোৎ আচ্ছা। ক্যা লাওগে?

দেখি কী পাওয়া যায়।

ঠোঙায় করে কচুরী তরকারী জিলিপি আর মাটির ভাঁড়ে জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ নিয়ে এলাম। সাধুজী খুব আনন্দ করে খেলেন। স্টেশনের কল থেকে খাবার জল এনে দিলাম ওই ভাঁড়েই।

সাধুজী চলেছেন উল্টোদিকে, দিল্লীতে। সেখান থেকে যাবেন হরিদ্বার। মাস দুই থেকে আবার ফিরবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খবর কী বাঙালীয়া? কী করছ এখন?

বললাম, কিছুই না। সাধন ভজন আমার হবে না সে তো আপনিই বলেছিলেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছি।

সাধুজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, তোর সিদ্ধি হবে না। কিন্তু অনেকখানি ক্ষমতা পাবি। এখনো দেরি আছে, আরো দু-বছর পরে সদ্‌গুরুর সঙ্গে দেখা হবে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে যেতে বললাম, সাধুজী, আপনি অবধলালের খবর জানেন? সে বেচারী মারা গিয়েছে।

সাধুজী বিশেষ চমকালেন না। বললেন, অবধলাল? হ্যাঁ, সে মারা গিয়েছে বটে। তার যক্ষ্মা হয়েছিল। মাস ছয়েক আগে প্রভাসতীর্থে মারা গিয়েছে, তাই না?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। অবধলালের মৃত্যুর সংবাদ তো সাধুজীর জানবার কথা নয়। তার মারা যাবার সময় আমি ছাড়া আর পরিচিত কেউ ছিল না। তাহলে ইনি কী করে সে খবর পেলেন?

সাধুজী বললেন, বোসো আমার পাশে। কথা আছে।

বসলাম। সাধুজী কানের কাছে মুখ এনে পরের আধঘণ্টা ধরে এক অদ্ভুত কাহিনী বলে গেলেন।

উনি বললেন—বেটা, অবধলালের মরা ছাড়া উপায় ছিল না। লোকটা খুব শয়তান ছিল।

বললাম, জানি। অবধলাল মারা যাবার আগে নিজের মুখে আমাকে বলেছে। আপনি কী করে জানলেন?

ওর হাবভাব দেখে আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। তুমি আমাকে কেবলমাত্র আপনভোলা সন্ন্যাসী ভেবো না, লোকচরিত্র আমি খুবই ভাল বুঝি। একজন মানুষ, সে সংসার ত্যাগ করে ধর্মে দীক্ষা নিতে এসেছে, তার হাবভাব আর মুখচোখ অমন হবে কেন? নিষ্ঠুরতা আমি পছন্দ করি না। আমাদের তান্ত্রিক মতের সাধনা বাইরের অনভিজ্ঞ লোকের চোখে বোধহয় একটু বীভৎস আর নিষ্ঠুর দেখায়। কিন্তু বেটা, জানবে এই সাধনায় অমঙ্গল বা বীভৎসতা কিছু নেই। কিছু লোভী আর সুযোগসন্ধানী লোক ক্ষমতা পাবার জন্য তন্ত্রের নিম্নশাখার সাধনা করে এক ধরনের সিদ্ধাই পায়। তারাই আমাদের সবার নাম খারাপ করেছে। একই তলোয়ার দিয়ে হত্যাও করা যায়, আবার দেশের স্বাধীনতা রক্ষাও করা যায়। হত্যা করলে সেটা হত্যাকারীরই দোষ—তলোয়ারের নয়।

যাক এসব কথা। মোটের ওপর আমি অবধলালকে ভেতর অবধি চিনে ফেলেছিলাম। তবু পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্য আমি আশ্রম থেকে নেমে লোকালয়ে এসে খোঁজ খবর করি। মনে আছে তো, সেই যে আমি একবার দশ-বারো দিনের জন্য আশ্রম থেকে বাইরে ছিলাম? খোঁজ নিতেই বুঝতে পারলাম অবধলাল লোকটা একেবারে পাষণ্ড। যেখানে যাই, যাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ আর তাকে ভাল বলে না। ওর নিজের গ্রামের জাঠেদার নেহাল সিংয়ের মেয়েরও নাকি সর্বনাশ করতে গিয়েছিল। বুঝলাম ধর্মকে ভালবেসে লোকটা আমার কাছে দীক্ষা নিতে আসেনি। এসেছে কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা লাভ করবার জন্য। সিদ্ধাই পেলে সেটাকে কাজে লাগিয়ে অবধলাল আবার মানুষের সর্বনাশ করবে। লোকটা জন্ম অপরাধী, রক্তের মধ্যে পাপের বীজ রয়েছে। এই ধরনের মানুষ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক দুষ্টক্ষতের মত। কিন্তু অবধলাল বোকা নয়, সে আঁটঘাট বেঁধে কাজ করেছে। আইন তাকে ছুঁতে পারবে না। তাহলে একটা নৃশংস খুনী কোনো শাস্তি না পেয়ে ঘুরে বেড়াবে?

বললাম—সাধুজী, খুনের ব্যাপার আপনি কী জানেন?

উনি কিছু না বলে কেবল হাসলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন—সমাজ তো মানুষেরই সৃষ্টি, মাঝে মাঝে তাই সমাজরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে হয়।

বললাম—সাধারণ মানুষের ধারণা সাধু-সন্ন্যাসীরা সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন উদাসী ভবঘুরে। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে বোঝা যায় মানবসমাজ সম্বন্ধে আপনি ভাবেন।

সাধুজী সামান্য উত্তেজিত হয়ে বললেন, তুমি কী বলছ বাঙালী? একজন সাধু কী

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নাকি? সমাজ রক্ষা না পেলে আমাদের সাধুগিরি একদিনও টিকবে? সমাজের কাছে সন্ন্যাসীর অনেক ঋণ, সেই ঋণ কিছুটা মেটাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

সাধুজী হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে থেমে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম কীভাবে?

গাঢ় গলায় সাধুজী বললেন, খুব সহজে। আমি অবধলালকে ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা দিয়েছিলাম।

তন্ত্রের গূঢ় ব্যাপার সব তখনো আমি জানি না। অবাক হয়ে বলেছিলাম, তাতে কী হল?

উনি বললেন—ও, তুমি তো আবার এ পথে নতুন। শোনো, তান্ত্রিক দীক্ষা নেবার সময়-অসময় আছে। কোনো লগ্নে দীক্ষা হলে মানুষ সাধনার পথে দ্রুত এগিয়ে যায়, আবার কোনো অশুভলগ্নে দীক্ষা হলে তার মারাত্মক ফল হতে পারে। শাস্ত্রে ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা দিতে বারবার নিষেধ করা আছে, কারণ তাতে দীক্ষিত শিষ্যের মৃত্যুযোগ উপস্থিত হয়।

আপনি জেনেশুনে এমন করলেন?

শান্ত চোখে সাধুজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঘরে বিষাক্ত সাপ ঢুকলে তুমি লাঠি দিয়ে মারো না?

উত্তর দিতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়াতে জিজ্ঞাসা করলাম অবধলাল যে প্রভাসতীর্থে ছ-মাস আগে মারা গিয়েছে আপনি কী করে জানলেন? কেউ খবর দিয়েছিল আপনাকে?

এই সময়েই প্ল্যাটফর্মের কুলি হাঁকতে লাগল—দিল্লী মেল আসছে।

সাধুজী দিল্লী যাবেন এবং ট্রেন ধরবেন। তিনি পুঁটুলি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্টেশনে যাত্রীর ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। বুঝলাম আমার প্রশ্নের উত্তর আজ আর পাওয়া হল না। বললাম—আবার কবে দেখা হবে সাধুজী?

উনি বললেন—কী জানি! যদি পরমাত্মার ইচ্ছে থাকে আমাদের দেখা হোক, তাহলে তিনিই আমাদের মিলিয়ে দেবেন। আচ্ছা, চলি। ভাল থেকো।

সেই ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

তারানাথ থামল।

কিশোরী চিরকালের অবিশ্বাসী, অথচ সে-ই তারানাথের গল্পের সবচেয়ে ভক্ত। সে বলল—ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা এবং যক্ষ্মা হওয়া, এ দুটো তো কাকতালীয়ও হতে পারে?

তারানাথ যেভাবে তার দিকে তাকাল তাতে এটা সত্যযুগ হলে কিশোরী তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যেত।

পরিস্থিতি সামলাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললাম—কিশোরী, এটা তোমার অন্যায়। উইলিং সাস্‌পেনশন অফ ডিস্‌বিলিফ মনে আছে তো? সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো গল্প শোনার সময় তোমার সেটাকে প্রয়োগ করতে হবে। গল্পও শুনবে আবার ফ্যাঁকড়াও বাধাবে তা হবে না।

তারপর তারানাথের দিকে ফিরে বললাম—যাক, ওসব যেতে দিন। আজ জমিয়ে একটা গল্প বলুন।

তারানাথ বলল—এতক্ষণ কী বললাম?

ও তো গেল ভূমিকা। তাছাড়া কেমন মেঘ করে এসেছে দেখছেন তো? এখন বেরুলেই

ভিজতে হবে। আপনি নিশ্চয় দুর্যোগের মধ্যে আমাদের পথে বের করে দিচ্ছেন না?

বলতে বলতে অঝোরে বৃষ্টি নামল। আমরা গুছিয়ে বসলাম গল্পের লোভে। তারানাথ একটা পাসিং শো ধরাল।

বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের আর তারানাথের একটা গভীর যোগাযোগ আছে। ঘন বর্ষার দিনে তারানাথের গল্প শোনবার জন্য আমি আর কিশোরী ব্যাকুল হয়ে উঠি, আবার আমরা এলেই ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দুদিক দিয়েই সত্য।

পাসিং শো-তে মৌজ করে টান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তারানাথ বলল—কলকাতা শহরে বর্ষার রূপ ঠিক টের পাওয়া যায় না। এই মধ্য কলকাতায় মট্‌স্‌ লেনে বসে কী দেখছি? চারদিকে ঘিঞ্জি বসতি, ঝুপঝাপ করে জল পড়ে রাস্তাঘাটে প্যাচ্‌পেচে কাদা হচ্ছে, ময়লা জল ছিটিয়ে পথ দিয়ে গাড়ি ছুটেছে—সব মিলিয়ে ভোগান্তির একশেষ। বর্ষায় কলকাতার কোনো মানুষ খুশী থাকে দেখাতে পারো? অথচ বর্ষার মত সুন্দর ঋতু আর হয়? এই হচ্ছে মাছ ধরার সময়, ভূতের গল্প বলাব সময়, মুড়ি আর গরম গরম বেগুনি খাবার সময়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিশোরী বলল—কলকাতা শহরে ওসব তো স্বপ্ন। এখানে মাছই বা ধরবেন কোথায়, আর ভূতই বা পাবেন কী করে? কলকাতা শহর থেকে গাড়ি-ঘোড়ার গোলমালে আর ইলেকট্রিক আলোর দৌরাত্ম্যে ভূতেরা বহুদিন হল বিদায় নিয়েছে।

তারানাথ হেসে বলল—আমিও তো সেই কথাই বলছি। পল্লীগ্রামে বর্ষার দিনে টোকা মাথায় দিয়ে কখনো পুকুরপাড়ে কচুবনের মধ্যে বসে মাছ ধরেছ?

আমি আর কিশোরী মাথা নাড়লাম।

তাহলে জীবনে তোমরা একটা বড় সুখের থেকে বঞ্চিত আছ। অল্প বয়েসে আমাদের গ্রামের উত্তরদীঘিতে মাছ ধরতে যেতাম। সঙ্গে সুগন্ধি চার, দু-তিনখানা নানা আকারের ছিপ। দুটোতে হুইল লাগান, তাতে তিনশো হাত করে শক্ত মুগার সুতো। তাছাড়া পিঁপড়ের ডিম, মোটা মোটা কেঁচো, ভাত আর ময়দা একসঙ্গে মাখা—আরো কত কী! দীঘির ধারে একটা কচুবন ছিল মাছ ধরার পক্ষে আদর্শ জায়গা, আমার খুব প্রিয়। সেখানে গিয়ে চার ছড়িয়ে টোপ ফেলে নিথর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম। টোকা আর চারপাশে কচুপাতার ওপর টিপ টাপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ হত। পুকুরধারের ঝুপসি গাছপালার ছায়া পড়েছে জলে। মনে কেমন একটা প্রশান্তি। মাছ পেলাম কিনা কে তার খোঁজ রাখে? ওই বসে থাকাটাই আসল নেশা, মাছ ধরার আনন্দ।

এইরকম বর্ষার দিনে অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। আমার বয়েস তখন বছর ছাব্বিশ-সাতাশ। দীক্ষা হয়নি তখনো, তবে সংসারে মন বসেনা। ঘুরে ঘুরে বেড়াই আর প্রকৃত ক্ষমতাশালী তান্ত্রিক সাধকের খোঁজ করি। বীরভূমের শ্মশানে মাতু পাগলীর সঙ্গে দেখা হবার গল্প তো তোমাদের আগেই বলেছি? এই ঘটনা তার কিছুদিন পরের। এমনই এক বর্ষণমুখর দিনে এর শুরু। শুনতে চাও তো বলতে পারি। তবে এ গল্প ভূতের নয়। সাধারণ অর্থে অপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিকও নয়। এটা যে কিসের গল্প সে বিচার তোমরাই করো। শুনবে? বলব?

নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। গল্প শুনব বলেই সমস্ত কাজ ফেলে এসে হাজির হয়েছি। আমি আর কিশোরী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম।

তারানাথের মেয়ে চারি এই সময়ে আমাদের জন্য চা নিয়ে এল। তারানাথ

বলল—নাও শুরু কর, চায়ে চুমুক দিয়ে তারানাথ গল্প আরম্ভ করল।

মানুষ পয়সা খরচ করে দূর দূর দেশে বেড়াতে যায়, কিন্তু হাতের কাছের দ্রষ্টব্যগুলোই তার দেখা হয়না। আমারও কিছুটা তাই হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষের কত পাহাড় জঙ্গল ঘুরেছি, কত সাধুসন্ত দেখেছি, কিন্তু ঘরের পাশে তারাপীঠ কখনো যাওয়া হয়নি। যাবো বলে দু-একবার মনস্থিরও করেছি, কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনো কারণে যাওয়া আটকে গিয়েছে। লোকে বলে মা তারা না টানলে নাকি তারাপীঠ দর্শন হয় না। সেবার মা তারাই টানলেন কিনা জানি না, একদিন ভোর রাত্তিরে তারাপীঠ যাবো বলে লুপ লাইনের ট্রেন থেকে রামপুরহাট স্টেশনে নেমে পড়লাম। দুবরাজপুর আর ইলামবাজারে একটু কাজ ছিল, তা সেরে পৌঁছলাম তারাপীঠে। ভারতবর্ষের ধর্মস্থানগুলোতে অবাঞ্ছিত লোকজনের উপদ্রব বড় বেশি। এখানেও তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। পাণ্ডা, পাণ্ডার দালাল, চোর, গাঁটকাটা, সাধারণ সুযোগসন্ধানী, ব্যবসাদার, কুচরিত্রা মেয়েমানুষ—এরা থিকথিক করছে পথেঘাটে। সরল বিশ্বাসী নিরীহ যাত্রীদের পকেটের ভার লাঘব করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তের চোখে পীঠস্থানের একটা আলাদা রূপ আছে, বাইরের চেহারা দিয়ে যার বিচার হয় না। আমার কাছেও তারাপীঠ তার সেই গূঢ় সত্তাটি মেলে ধরল। দিনে এবং রাত্রিতে বেশির ভাগ সময়টা আমি মহাশ্মশানে গিয়ে বসে থাকতাম। মহাশ্মশান কাকে বলে জানো তো? যেখানে চিতাগ্নি কখনো নেভে না—সব সময়েই কোনো না কোনো দল সৎকার কার্য করছে। লোকে ভয় পায় কেন জানি না। কিন্তু শ্মশান অতি পবিত্র জায়গা। অতি গর্হিত পাপকাজও যে অনুষ্ঠান করেছে, সেও এখানে সংকৃত হয়ে তার ইহজীবনের সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে সদ্গতি লাভ করে। সম্রাট ও ভিখিরী, বোকা ও বুদ্ধিমান, সরল ও সাবধানী, উদার ও কুটিল—সবাইয়ের শেষ মিলনস্থান এই শ্মশান। জীবদ্দশায় সমাজে যার যা প্রতিপত্তি থাক, মৃত্যুতে সবাই সমান। অবশ্য এসব কথা কারো অজানা নয়, কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তা শক্তি আমাদের চোখে এমন মায়ার অঞ্জন পরিয়ে রেখেছে যে, শ্মশানের বাইরে এসে কোলাহলমুখর প্রাত্যহিক জীবনটায় প্রবেশ করলে আবার সব ভুল হয়ে যায়। মানুষ আবার লোভ করে, ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়, পরস্পরকে ঠকায়। যেন মৃত্যু কখনো আসবে না, যেন এই রকমই চিরকাল চলবে। অবশ্য একদিক দিয়ে এ ভালই, সৃষ্টি রক্ষার জন্য এই মোহিনী মায়ার প্রয়োজন আছে। সবাই দার্শনিক হয়ে সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লে সমাজ বাঁচতো কী করে?

মহাশ্মশানে বসে সামনে নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইসব ভাবতাম। তারাপীঠ বড় পবিত্র জায়গা, কিছুদিন আগেও এখানে সাধক বামাক্ষ্যাপা সশরীরে বিচরণ করেছেন। এখানকার মহিমা অন্য তীর্থের মত সবটাই ধোঁয়াটে পৌরাণিক গালগল্প দিয়ে তৈরি নয়।

আমি যে ধর্মশালায় উঠেছিলাম, একদিন সকালে সপরিবারে এক ভদ্রলোক সেখানে এসে উঠলেন। ভদ্রলোকের আচার-ব্যবহার ও পোশাক দেখে তাঁকে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের বলে মনে হয়। স্ত্রীর পরিচ্ছদে এবং অলঙ্কারে বাহুল্য না থাকলেও ভদ্রমহিলা একটি স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, ব্যবহারে বনেদীয়ানা পরিস্ফুট। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই ভারি সুন্দর দেখতে, কিন্তু বর্তমানে দুজনেরই মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। বোঝা যায় এঁরা নিছক তীর্থদর্শনে আসেন নি, এসেছেন দেবীর কাছে নিজেদের বিপদের অবসান প্রার্থনা করতে। কী একটা পর্ব উপলক্ষে সে সময়ে তারাপীঠে বড্ড ভিড়, অন্য কোথাও জায়গা না পেয়ে এই পরিবার আমি যে ধর্মশালায় ছিলাম সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সঙ্গে রয়েছে একটি বছর সাতেকের ছোট ছেলে।

দুদিন পর দেখি তাঁরা জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন, অর্থাৎ চলে যাবাব উদ্যোগ। ঘরে বসেই শুনলাম ধর্মশালার ম্যানেজার এসে বলছেন—তাহলে আজই চললেন?

পরিবারের কর্তার ক্লিষ্ট গলা—হ্যাঁ, আর থেকে কী করব বলুন? ওদিকেও তো কাজকর্ম রয়েছে—

মায়ের পুজো দিয়েছেন তো?

তা দিয়েছি। ছেলের মঙ্গলেব জন্য যা করার তা কিছুই বাদ দিইনি। এখন আমার অদৃষ্ট।

মাকে ডাকুন, মা সব ঠিক কবে দেবেন।

এসব কথাবার্তা শুনে একটু বিস্মিত হলাম। সংসার কবলেই সংসারের গ্লানি কিছুটা মানুষকে স্পর্শ করে। রোগ-শোক, মামলা, ভ্রাতৃবিরোধ, অসাফল্য এগুলো সাধারণ সংসারী লোককে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আমাকে বীরভূমের মাতু পাগলী সামান্য কিছু ক্ষমতা দিয়েছিল তোমরা জানো। বলেছিল, যদি অপব্যবহার না করিস, তাহলে এই ক্ষমতা দিয়ে সারাজীবন করে খেতে পারবি। তার বলেই কিনা জানিনা, আমি মানুষের দিকে তাকানোমাত্র তার গুরুতব বিপদের কথা টের পাই। যার ভয়ানক বিপদ আসন্ন তার চারদিকে শরীর ঘিরে একটা কালো ছায়া গড়ে ওঠে। তোমরা টের পাবে না, কিন্তু আমি দেখতে পাই। তাছাড়া আসন্ন বিপদগ্রস্ত লোকের কাছাকাছি এলে আমার মনের ভেতর কোথায় যেন একটা বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে ওঠে। আজ পর্যন্ত এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। বিস্মিত হলাম এই কাবণে যে, ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমি বিপদের কোনো পূর্বাভাস টের পাইনি। তাহলে ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে ওঁর ছেলের? ফুটফুটে ছেলেটিকে এমনি দেখে তো বেশ সুস্থ বলেই মনেই হয়।

একটু পরে দেখি ভদ্রলোক আমার ঘরের সামনে দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন। ডেকে বললাম, একটু শুনবেন?

তিনি থমকে দাঁড়িয়ে একটু অবাক হয়ে আমাব দিকে তাকালেন।

আমায় বলছেন?

হ্যাঁ, একটু ভেতরে আসবেন?

ভদ্রলোক আমাকে আদৌ চেনেন না, তিনি যে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছেন তা বুঝতে পারলাম।

হেসে বললাম—আমাকে আপনি চেনেন না। আমার নাম তারানাথ চক্রবর্তী। ম্যানেজারের সঙ্গে ছেলের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, তার কিছু অংশ কানে গেল—তাই ডেকে আলাপ করলাম। কী হয়েছে আপনার ছেলের?

ভদ্রলোক কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। আমি কোনদিনই রক্তাম্বর পরিনি, তখনো পূর্ণ তনুদীক্ষা হয়নি বলে গলাতেও রুদ্রাক্ষের মালা ছিল না। নিতান্তই সাধারণ লোকের বেশ। উনি বললেন, আপনি কী, মানে—জ্যোতিষ বা ওই ধরনের কিছু চর্চা করেন?

ওই সামান্য একটু-আধটু। সঙ্গে যে বাচ্চাটি এনেছেন, সেটিই কী আপনার ছেলে? ওকে দেখে তো অসুস্থ বলে মনে হয় না—ওর কী হয়েছে?

ভদ্রলোক ঘরের আর একটু ভেতরে এসে বললেন, বসব?

তক্তাপোষে পাতা কম্বলের একপ্রান্ত দেখিয়ে বললাম, বসুন। আমার ঘরে অন্য কোনো বসার জায়গা নেই।

উনি বসলেন। বললেন, আপনি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। তবু আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে আমি ঠাকুরমশাই বলে ডাকব। এক একজন মানুষকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়, মনে বিশ্বাস জন্মায়, আপনি সেইরকম মানুষ ঠাকুরমশাই। আপনাকে আমি ঘটনাটা খুলে বলি। জানিনা আপনি এর কোনো সুরাহা করতে পারবেন কিনা, কিন্তু আপনাকে বললে আমার মনটা হাল্কা হবে।

আমাব নাম বিজয়কৃষ্ণ বসু, হুগলীতে আমাব একটা ছোট্ট জমিদারী আছে। ঠাকুরদা জমিদারীর পত্তন করেছিলেন, বাবা বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়ে তাকে স্থায়িত্ব দেন। আমরা দুই ভাই, এক বোন। দিদি বড়, আমাদের ছোটবেলাতেই দিদির বিয়ে হয়ে যায় মুর্শিদাবাদে। জামাইবাবু সেখানে ব্যবসা করেন। আমার ভাই এখন কোথায় আছে জানি না।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

বছরদশেক আগে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। আমাদের বংশের রত্ন ছেলে ছিল। আমি তো পড়াশুনো বেশি করিনি, বাপ মারা যেতে কাজকর্মের ভার সমস্ত আমার ওপরে পড়েছিল। কাজ চালাবার মত মোটামুটি লেখাপড়াটা জানি। ভাই কিন্তু খুব পড়াশুনা করত। এমনিতে সে অবশ্য আই. এ.-র পর আর কলেজে যায় নি, কিন্তু বাড়িতে তার নিজস্ব লাইব্রেরী ছিল —সারাদিন সেখানে বসে লেখাপড়া করত। একদিন সকালে উঠে দেখি, সে নেই। বিছানা তেমনি পরিপাটি—মানে রাত্তিবে কেউ শোয়নি। বাড়িতে কোনো মনোমালিন্য হয়নি —তেমন মানুষই সে ছিল না। কোথায় গেল, কেন গেল, কে জানে। বিয়ে-থাওয়া করেনি, তার জন্য সেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার কেউ ছিল না। এক আমিই যা মনে করে রেখেছি।

আমার দুই ছেলে। এটি ছোট। বড়টি বাড়িতে রয়েছে চিন্তামণির কাছে। চিন্তামণি আমাদেব বহুদিনেব কর্মচাবী, আমিও ছোটবেলায় তার কোলেই মানুষ হয়েছি। আমার ছেলেরা তাকে ঠাকুমার মত ভালবাসে।

সমস্যাটা আমার বড়ছেলে অমলকৃষ্ণকে নিয়ে। সে এমনিতে খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী, ক্লাশেব পড়ায় ফার্স্ট হয়। গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসে। অনেকটা তার কাকার ধারা পেয়েছে। আজ মাস তিনেক হল সে যেন কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে।

বললাম—অস্বাভাবিক মানে?

মানে, এমনিতে চোখে পড়বার মত কিছু নয়। হয়তো বসে কথা বলছে। একপ্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাঝখানে এমন একটা বাক্য বলল যার সঙ্গে আলোচ্য প্রসঙ্গের কোনো সম্পর্কই নেই। নয়তো রাত্তিরে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে ঘোরের মধ্যে অদ্ভুত সব কথা বলতে লাগল। মিনিট দুয়েক, তারপরেই শুয়ে আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ছে। জেগে উঠে তার আর কিছু মনে থাকছে না। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। কলকাতায় বড় বড় ডাক্তার দেখালাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কলকাতার ডাক্তাররা অসুখটা সম্বন্ধে কী বললেন?

তাঁরা বললেন ওর কিছু হয়নি। ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ, মানসিক ভারসাম্যহীনতারও কোনো লক্ষণ নেই। ওষুধপত্র কিছু দিলেন না, বললেন—বিভিন্ন কারণে এমন হতে পারে, ব্যাপারটা সাময়িক, আপনিই সেরে যাবে।

সারল?

না। জলপড়া, ঝাড়ফুঁক সবই করা হয়েছে, লাভ কিছুই হয়নি। তাই ভাবলাম—মায়ের স্থানে এসে ছেলের নামে পুজো দিই, যদি মা ভাল করে দেন।

আমি তন্ত্রসাধনায় বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু ডাক্তারী সম্ভাবনাকে বাদ দিতে পারি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ছেলের মাথায় কখনো কোনো চোট লেগেছিল কী?

বিজয়বাবু বললেন, না। ডাক্তাররাও একথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

চিরকালই অদ্ভুত ঘটনা আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। বিজয়বাবু আজই বাড়ি চলে যাচ্ছেন, আমিও কাল বা পরশু রওনা হয়ে পড়ব। খামোকা ওঁদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে হতে লাগল ছেলেটিকে একবার দেখার। একটু ভেবে বললাম, বোসমশাই, একটা কথা বলব?

বিজয়কৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—না, মনে করব কেন? বলুন কী বলবেন?

আপনার ছেলেটিকে আমি একবার দেখতে চাই। যদি দু-একদিনের জন্য আপনার বাড়ি অতিথি হই—

কথা না শেষ হতেই বিজয়কৃষ্ণ খুশী হয়ে বললেন, বিলক্ষণ! এ তো আমার বিশেষ সৌভাগ্য! ভাগ্যের জোর না থাকলে ব্রাহ্মণ অতিথি পাওয়া যায় না। তাছাড়া যদি আপনার দয়ায় অমল ভাল হয়ে যায়।

সে বিষয়ে আমি কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। আমি ওঝাও নই, সিদ্ধ সাধকও নই। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি, এইমাত্র।

তাতেই হবে, তাতেই হবে। যারা আগ বাড়িয়ে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সাতকাহন প্রচার করে বেড়ায়, তাদের ওপর আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই। অনেককে তো দেখলাম। আমরা কিন্তু এক্ষুনি রওনা হচ্ছি, আপনার অসুবিধে নেই তো?

কিছুমাত্র না। আমাব সম্বলের মধ্যে এই পুঁটুলি, হাতে করে পা বাড়ালেই হল—

বেশ, তৈরি হয়ে নিন তাহলে।

যে স্টেশনে আমরা নামলাম সেখান থেকে বিজয়কৃষ্ণ বসুব গ্রাম মাইল ছয়েক। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা কবছিল, তাতে চড়ে আমরা বওনা দিলাম। মাইল ছয়েক পথ যেতে বেশি সময় লাগল না। বেশ সুন্দর গড়নের বিরাট দোতলা বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে এসে গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নামতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিজয়বাবুকে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল ছিলেন তো বাবু? পথে কষ্ট হয় নি?

আমরা ভাল আছি। এদিকে সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ। বাবু। চলুন, ভেতরে চলুন—

বিজয়কৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমাদের নায়েবমশাই, বিশ্বনাথ পালিত।

বৃদ্ধ নায়েব আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে বিজয়কৃষ্ণ বললেন—ঠাকুরমশাই ক'দিন আমাদের অতিথি হয়ে থাকবেন। ওঁর জন্য ভাল একটা ঘর গুছিয়ে দিন।

কেতাদুরস্ত অভিজ্ঞ নায়েব আর কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে বললেন—যে আজ্ঞে। ঠাকুরমশাই আমার সঙ্গে আসুন।

বিজয়কৃষ্ণ বললেন—আপনি বিশ্রাম সেরে স্নান করে নিন ঠাকুরমশাই। তারপর আপনাকে ভেতর বাড়িতে ডেকে পাঠাচ্ছি।

জমিদার বাড়িতে অতিথির আদর যত্নই আলাদা। সুগন্ধি তেল মেখে স্নান সেরে বেরুনো মাত্র চাকর কোঁচানো ধুতি আর চাদর নিয়ে এগিয়ে এল। সেগুলো পরামাত্র আর একজন চাকর এসে বলল, ঠাকুরমশাই, আসুন—পাশের ঘরে একটু জলখাবারের আয়োজন হয়েছে। সে ঘরে গিয়ে তো আমার চক্ষুস্থির। ফুলতোলা পশমের আসন পেতে জায়গা করা হয়েছে। ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার বগীথালায় থরে থরে সাজানো নানা ফলমূল কাটা। পাশে তিন চারটে বাটিতে কাঁচাগোল্লা, পান্তুয়া আর লালচে ঘন ক্ষীর।

চোখ কপালে তুলে বললাম—এত খাওয়া কী সম্ভব?

চাকরটা হাত জোড় করে বলল—আজ্ঞে যৎসামান্য। আপনি বসুন ঠাকুরমশাই, আর কিছু লাগলে আমাকে বলবেন। কর্তা বলে দিয়েছেন আপনার যেন কোনো অসুবিধে না হয়।

খুবই অসুবিধে হল। অত খেলে কার না হয়!

খেয়ে উঠতেই ভেতর বাড়ি থেকে ডাক এল।

বাইরের দিকে, যেখানে আমাব থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে কাছারি ঘর, অতিথিশালা, বৈঠকখানা ইত্যাদি অবস্থিত। এসব পেরিয়ে ঠাকুরদালান। মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন, একদিকে মূল ঠাকুর ঘর, তার লোহার গুল বসানো দরজায় বর্তমানে তালা ঝুলছে। পুজোর দালান পেরিয়ে অন্দরমহল। সেখানে চওড়া বারান্দার ধারে সারি সারি ঘর, ঘরের দরজার ওপর শিংওয়ালা হরিণের মাথা, দেয়ালে ভাল কয়েকটি অয়েল পেন্টিং। একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ, আমাকে বললেন—আসুন ঠাকুরমশাই, এই ঘরে আসুন।

ঘরটি চমৎকার সাজান। একদিকে বিরাট সেকেলে কারুকার্য করা খাট, তার ওপরে পুরু গদি। সেই খাটেব ওপর চুপ করে বসে আছে বছর বারো বয়েসের একটি ছেলে। তারাপীঠে দেখা বিজয়বাবুর ছোটছেলের সঙ্গে তার চেহারার মিল অতি স্পষ্ট। বুঝলাম এই হচ্ছে অমল।

বিজয়কৃষ্ণ বললেন—প্রণাম কর বাবা, ইনি ঠাকুরমশাই।

অমল এসে আমাকে প্রণাম করতে তাকে ধরে কাছে টেনে আনলাম। আর যাই হোক, এ ছেলের অদূর ভবিষ্যত কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। মাতু পাগলীর সংস্পর্শে এসে আর মধুসুন্দরী দেবীর সাধনা কবে আমি সামান্য যা কিছু ক্ষমতা লাভ করেছিলাম, তার মধ্যে এটি একটি। কারো আশু বিপদের সম্ভাবনা থাকলে তার কাছাকাছি এলেই আমি টের পাই। অমল নিরাপদ, কিন্তু ঘটনাটা কৌতূহলজনক।

বিজয়কৃষ্ণের স্ত্রীও এই সময় এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি আমার দিদির বয়েসী, পরিচয়ও আগেই তারাপীঠে হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমার সামনে আসতে তিনি কোনো সঙ্কোচ করলেন না। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে তিনি খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালেন।

অমলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। ছেলেটি বুদ্ধিমান এবং গ্রামের তুলনায় বেশ সপ্রতিভ। সব প্রশ্নেরই সে ঠিকঠাক জবাব দিল, উত্তরের মধ্যে কোনো জড়তা বা অসংলগ্নতা নেই। শেষে বললাম, তুমি বই পড়তে খুব ভালবাস, না অমল?

হ্যাঁ।

কী ধরনের বই পড়তে তোমার বেশি ভাল লাগে?

অমল বইয়ের প্রসঙ্গে উৎসাহিত বোধ করল, খুশীর সঙ্গে বলল, সবরকম বই। তবে ভূতের গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার গল্প পড়তে সব চাইতে ভাল লাগে। নাড়ু আর আমি বড় হয়ে গোয়েন্দা হব, আমরা ঠিক করে ফেলেছি।

বললাম, নাড়ু কে?

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, নায়েবমশাইয়ের ছেলে। ওরই বয়েসী।

অমল আবার বলল, আমাদের আতসী কাঁচ আছে, টুপি আছে, নোটবই আছে। একতলায় বাবার বৈঠকখানার পাশে অফিস হবে। সেখানে মক্কেলরা এসে বসবে। জায়গাটায় পাহাড় আছে, পাশেই ছোট্ট নদী।

শেষের দুটো বাক্য অমল একসঙ্গে বলে গেল বটে, কিন্তু শুনলেই বোঝা যায় বক্তব্য প্রসঙ্গের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। বিজয়কৃষ্ণ চমকে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করলেন। তাঁর স্ত্রী শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন খাটের বাজু।

আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে অমলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় পাহাড় আছে অমল? কোন্ নদীর কথা বলছ?

অমল অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, কোন পাহাড়?

যেটার কথা তুমি এক্ষুনি বললে।

আমি? আমি তো কোনো পাহাড়ের কথা বলিনি!

ভাল করে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালাম। অভিনয় করে সবাইকে বোকা বানাচ্ছে নাকি?

নাঃ, অমলের সরল মুখে তঞ্চকতার কোনো ছায়া নেই। সে আস্তে আস্তে আমাকে বলল, আমার কী হয়েছে কাকাবাবু? আমি নাকি আজকাল আবোলতাবোল কিসব বলি?

এত মায়া লাগল। বললাম, তোমাব কিচ্ছু হযনি। ছোটরা অনেকসময় অনেক কিছু বলে, বড়রা যার মানে বোঝেনা।

বাবা আমাকে কলকাতায ডাক্তাবেব কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার আমার অসুখ ধরতে পারেনি।

বললাম, তোমাব অসুখই হয়নি তো ডাক্তার ধরবে কী করে? যাও, খেলা করো। মন খাবাপ কোরো না।

সে বাইবে যেতে বিজযকৃষ্ণের স্ত্রী ব্যাকুল হযে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার ছেলে ভাল হযে যাবে তো ঠাকুবমশাই? আপনি নিজেই তো শুনলেন—

বললাম—বৌঠান, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখুন। তিনি সর্বমঙ্গলময়, সব কিছু ঠিক করে দেবেন।

বিজয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা কবলেন, আপনি কিছু বুঝলেন ওর কী হয়েছে?

না। তবে একটা কথা বলি, শুনে হযতো কিছুটা আশ্বস্ত হবেন। তারাপীঠে ঘটনার বর্ণনা শুনে মনে হয়েছিল এটা বোধহয় প্রেতের আবেশ হওয়ার ব্যাপার। কিন্তু এখন বুঝছি তা নয়।

তাহলে?

তাহলে যে কী, তা আমি এখনো জানি না। আমাকে আর একটু সময় দিন। কয়েকদিন কিন্তু আপনার এখানে আমাকে থাকতে হবে।

ব্যস্ত হয়ে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, বটেই তো! আপনি থাকবেন বইকি। যতদিন ইচ্ছে থাকুন। শুধু আমার খোকাকে—

পুরুষমানুষের গলা কান্নায় বুঁজে এলে আমার ভয়ানক অস্বস্তি হয়। আমি বিজয়বাবুর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম।

একটু সামলে তিনি বললেন, আমরা তাহলে এখন কী করব? আপনি বলে দিন।

আপনাদের কিছু করতে হবে না। অমলকে এখন জানানোর প্রয়োজন নেই আমি কেন এখানে এসেছি। কয়েকদিন আমাকে ঘটনাটা বুঝতে দিন। অমল আবার যখনই ওইরকম করবে তক্ষুনি আমাকে খবর দেবেন, কোনো ভুল না হয়।

আজ্ঞে না, ভুল হবে না।

বিজয়কৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে তাঁর বাড়ি আমাকে দেখালেন। তাঁর গৃহসজ্জার মধ্যে একটি মৃদু

রুচিশীলতা রয়েছে, অর্থকৌলীন্যের রূঢ় দম্ভ নেই। সবচেয়ে শেষে বারান্দার পশ্চিম কোণের ঘরে এসে ঢুকলাম আমরা। ঘরটা বইয়ের আলমারী দিয়ে সাজানো। আসবাবের কোনো বাহুল্য নেই, বইয়ের প্রাচুর্য্য অন্য সব না-থাকাকে পূর্ণ করে দিয়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, আমার ভাই সহায়কৃষ্ণের ঘর।

এগিয়ে তাকে সাজানো বইগুলো দেখতে লাগলাম। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অজস্র বই ভদ্রলোক পড়াশুনা করতে যে সত্যিই ভালবাসতেন তা বোঝা যায়। একটা জিনিস লক্ষ্য করে একটু অবাক লাগল। পরলোকতত্ত্ব এবং তন্ত্রসাধনার ওপরও বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ভাল বই-এর সংগ্রহ রয়েছে। বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার ভাই কী তন্ত্রের চর্চা করতেন নাকি? ও বিষয়ে কিছু বই রয়েছে দেখছি।

হ্যাঁ, ওটা আপনাকে বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে। তন্ত্র আর অন্যান্য রহস্যময় বিষয়—জ্ঞানের যে সব শাখা এখনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অতীত—সে বিষয়ে সহায়কৃষ্ণ পড়াশুনা করতে ভালবাসত। আপনিও সন্ন্যাসী মানুষ, এ ব্যাপারটা জানলে খুশী হতেন। আমার আগেই বলা উচিত ছিল।

সবিনয়ে জানালাম, আমি সন্ন্যাসী নই, এবং আমাকে না জানানোতে কোনো ক্ষতি হয়নি।

বইগুলো নামিয়ে দেখতে খুব ইচ্ছে হল, বিজয়কৃষ্ণকে বললাম, আমি এ ঘরে বসে দু-একটা বই একটু নেড়েচেড়ে দেখলে আপনার আপত্তি নেই তো?

মোটেই না। ওই চেয়ার টেবিল রয়েছে, যত ইচ্ছে বই নামিয়ে দেখুন। ভাই চলে যাবার পর এসব বই তো পড়েই রয়েছে।

আমাকে বসিয়ে রেখে বিজয়কৃষ্ণ বিষয়-সংক্রান্ত কী কাজে বাইরের কাছারিবাড়ির দিকে গেলেন। আমি বেছে বেছে কিছু বই নামিয়ে চেয়ারটা টেনে বসলাম।

সহায়কৃষ্ণের পড়াশুনাটা গভীর। সাধারণ পাঠকের অলস কৌতূহল নয়, তাঁর পঠিত বইগুলিও আজেবাজে গালগল্প বা ভৌতিক কাহিনী নয়। ভারতীয় তন্ত্রসাধনার ইতিহাস রয়েছে, হীনযান বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ধারাবাহিক পর্যালোচনা রয়েছে, ইংরেজীতে আরো কত বই রয়েছে, যেগুলো আমি ভাল বুঝতে পারলাম না। তোমরা তো জানো, আমি ইংরেজী লেখাপড়া বেশিদূর করিনি। দেখে বিস্মিত হলাম, সহায়কৃষ্ণ প্রতিটি বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন। পাতায় পাতায় মার্জিনে সুন্দর হস্তাক্ষরে নোট লেখা। ভদ্রলোকের ওপর শ্রদ্ধা হল। উৎসুক মানুষ দেখতে ভাল লাগে।

বইগুলো তুলে রাখতে গিয়ে নিচের তাকে একখানা মোটা কাপড় দিয়ে জড়ানো পুঁথির দিকে নজর পড়ল। সেখানা বের করে এনে টেবিলের ওপর রেখে আস্তে আস্তে কাপড়ের পট্টি খুলে ফেললাম।

জিনিসটা বহু পুরনো একখানা সংস্কৃত পুঁথি—তালপাতার ওপর খাগের কলমে লেখা। কালের প্রভাবে পোড়া চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি কালি বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তবু এখনো স্পষ্ট পড়া যায়।

বইখানা সম্মোহন, মৃতের আত্মার পুনরাবির্ভাব ঘটানো, নিজের চেতনার অংশকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা ইত্যাদি বিষয়ের গূঢ়তত্ত্বে পূর্ণ। এ বইয়ের মার্জিনে নোট লেখা সম্ভব নয়, কিন্তু কাপড়ের ভাঁজের মধ্যেই একটুকরো লম্বা কাগজ ছিল। তাতে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে অনেক কিছু লেখা—কিন্তু পড়তে পারলাম না, কারণ ভাষাটা ইংরেজী।

এ বই দিয়ে কী করছিলেন সহায়কৃষ্ণ? এ ঠিক পড়ে আনন্দ পাবার বই নয়। যারা

হাতে কলমে তন্ত্রের চর্চা করে একমাত্র তাদেরই এ বই কাজে আসবে।

জানালার বাইরে একটা ঝাঁকালো জামগাছ, তার সবুজ পাতায় রোদ্দুর এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে নানারকম চিন্তা করছি, এমন সময় হারাধন নামে বিজয়কৃষ্ণের খাস ভৃত্যটি ব্যস্ত হয়ে এসে বলল, ঠাকুরমশাই, একবার আমার সঙ্গে আসবেন? খোকাবাবুর আবার ওইরকম হচ্ছে। মা-ঠাকরুণ ভয় পেয়ে গিয়েছেন, আপনাকে ডাকতে বললেন।

বইখানা তাড়াতাড়ি কাপড়ে জড়িয়ে তাকে রেখে লোকটির সঙ্গে গেলাম।

আগের সেই ঘরটিতেই খাটের ওপর অমলকৃষ্ণ শক্ত হয়ে বসে রয়েছে। পদ্মাসনে ধ্যানে বসার মত তার দেহ ঋজু, চোখ স্থির, দৃষ্টি অনির্দেশ্য শূন্যে নিবদ্ধ।

আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন বিজয়কৃষ্ণ, খবর পেয়ে তিনিও কাছারিবাড়ি থেকে ছুটে এসেছেন। আমাকে দেখে তাঁর স্ত্রী ধরা গলায় বললেন—ঠাকুরমশাই, দেখুন, অমল আবার—

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বৌ-ঠাকরুণকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করলাম।

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে সব স্তব্ধ, তারপর অমল খুব স্বাভাবিক গলায় বলল—মাত্র দুশো মাইল। সূর্য যেদিকে ওঠে তার উলটো দিকে খোঁজ করবে। পাহাড় আছে, বন আছে, ঝর্ণা আছে।

জড়তাহীন স্পষ্ট কণ্ঠস্বর। বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপের ভঙ্গী নয়, যেন সামনে কারো সঙ্গে গল্প করছে।

ঝিক্ ঝিক, ঝিক ঝিক্, ঝিক ঝিক্, কু-উ-উ-উ—মুখ দিয়ে রেলগাড়ি চলার শব্দ করছে অমল। তার চোখ স্থির। দেহ দণ্ডবৎ ঋজু।

হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল অমল। একবার বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখি সে চোখ বুঁজে রয়েছে। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গভীর আর শান্ত হয়ে এল। অমল ঘুমিয়ে পড়ল।

বিজয়কৃষ্ণ আর তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

সহায়কৃষ্ণের ঘরে ফিরে এসে স্বামী-স্ত্রীকে দুটো চেয়ারে বসতে বলে নিজে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনারা অমলের বাবা-মা, স্বাভাবিক কারণেই আপনারা ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হবেন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি আশু অমঙ্গল অথবা বিপদ আগে থেকে টের পাই। আপনাদের পরিবারে অদূর ভবিষ্যতে তেমন কিছু ঘটবে না। বরং আনন্দিত হবার মত কিছু ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, এটা আপনি কিভাবে বলছেন?

বললাম—মনে হল, তাই বললাম। দেখবেন, কথাটা খেটে যাবে।

আর আমার ছেলের অসুখ?

আপনার ছেলের কোনো অসুখ নেই। তাকে ভাল করে দিয়ে তবে আমি এ বাড়ি থেকে যাব। আপনি ভাববেন না।

বিজয়কৃষ্ণ মানুষটা নরম ধাতের। আমার কথা শুনে তাঁর চোখে বোধহয় আবার জল এসে গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রী ধরা গলায় বললেন, আমাদের এর আগে এমন করে কেউ ভরসা দেয়নি ঠাকুরমশাই। যদি অমল সত্যি সেরে যায় আমাদের কৃতজ্ঞতার আর শেষ থাকবে না। ভগবান আপনাকে জয়যুক্ত করুন।

অমল সারবার আগেই বসু-দম্পতির কৃতজ্ঞতা বিপুল খাদ্যসম্ভারের রূপ নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে থালায় এবং বাটিতে সজ্জিত হয়ে দেখা দিল। বুঝতে পারলাম না বিজয়কৃষ্ণবাবু এবং তাঁর স্ত্রী আমাকে একজন ভোজনপটু খাদ্যরসিক ভেবেছেন, নাকি জমিদারবাড়িতে প্রতিদিন দুপুরে এইরকমই রান্না হয়ে থাকে। সরু বাসমতী চালের ঘি-ভাত, পাঁচরকম ভাজা, মাছের পুর দিয়ে পটলের দোলমা, ঘন মুগের ডাল, এক হাত লম্বা চিতলের পেটির তেলঝাল, রুই মাছের কালিয়া—এই কটি মাত্র পদ। আর খাবার শেষে এল ঘন দুধ আর পাকা সবরি কলা! আপত্তি করতে গেলাম, কেউ যেন শুনতেই পেল না। এই একটি বিষয়ে এ বাড়ির কর্মচারীরা ভারি অবাধ্য।

গুরুভোজনের পর নিজের ঘরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে 'ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ' কথাটা পালন করতে লাগলাম। মনও ভাল ছিল। আমার দৃঢ় ধারণা—অমলকৃষ্ণের অস্বাভাবিক আচরণের মূল রহস্যটা আমি ধরে ফেলেছি। কিন্তু স্থির নিশ্চয় না হওয়া অবধি বসু-দম্পতিকে মিথ্যে আশা দেওয়া উচিত হবে না। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরের দিন সকালে একটা ঘটনায় আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নিত্য জপ সারার পব কাছারিবাড়ির দিক থেকে বিজয়কৃষ্ণের ক্রুদ্ধ গলা শুনতে পেলাম। কাকে যেন তিনি খুব তর্জন-গর্জন করছেন। অপরের বৈষয়িক ব্যাপাবে আমার নাক গলানো উচিত নয়, তবু স্বভাব-মৃদু বিজয়কৃষ্ণ কিজন্য এত চটেছেন তা জানবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে এগিয়ে গেলাম।

দেখি কাছারির উঠোনে একজন খোঁচা দাঁড়িওয়ালা রোগা লোক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলছে—এবাবের মতন দযা করুন বাবু। নাযেবমশাইকে জিজ্ঞাসা করুন, আগে কখনো এমন হয়নি।

বিজয়কৃষ্ণ রেগে আগুন হয়ে বলছেন, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, তোমার সঙ্গেই আমি পাইক আর গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, গোলার সব ধান এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও। তোমার খাজনা তো আমি নিজের গাঁট থেকে সরকারে জমা দেব না।

লোকটির অনুরোধ-উপরোধে কোনো ফল হল না। সে ম্লানমুখে বিদায নিল। সঙ্গে গেল বিজয়কৃষ্ণের লোকজন।

অবাক লাগল এই দেখে যে, বৃদ্ধ নায়েবমশাই একটু দূরে মুখে সূক্ষ্ম হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ছিঃ। একটা মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হতে চলেছে। আর উনি হাসছেন!

আমার ধারণাটা বদলে গেল পরমুহূর্তেই।

পাইক-বরকন্দাজের দল চলে যেতে বিজয়কৃষ্ণ নায়েবমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন—আপনিই বা এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী করছেন? যান, নিজের কাজে যান।

নায়েব এগিয়ে এসে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমার একটা কথা বলবার ছিল।

কী কথা? চটপট বলুন, আমার দরকারী কাজ আছে।

আজ্ঞে, এই লোকটার ফসল যে বাজেয়াপ্ত করে আনতে বললেন, লোকটা কিন্তু সপরিবারে উপোস করে থাকবে।

তার আমি কী করব? খাজনা দেয় না কেন?

নায়েবমশাই অনুচ্চ, শান্ত গলায় ছেলেমানুষকে বোঝাবার মত করে বললেন, বরাবর এ লোক ঠিক সময়ে খাজনা চুকিয়ে এসেছে। এ বছর মেয়ের বিয়ে দিয়ে হাত খালি।

তাছাড়া আপনি বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, এর স্ত্রী আপনাকে ধর্মবাপ বলে ডাকে, বিশেষ শ্রদ্ধা করে। এই সেদিনও নিজের হাতে ক্ষীরের ছাঁচ করে মা-ঠাকুরণের হাতে দিয়ে গিয়েছে। বলেছে, আমার বাপের জন্য জলখাবার। সে মেয়েটি যদি শোনে তার ধর্মবাপ তার ছেলেপুলের সম্বৎসরের খোরাক কেড়ে নিয়েছে। তাহলে সে ভারি দুঃখ পাবে।

বিজয়কৃষ্ণ বিব্রত গলায় বললেন, সে কী! এ লোকটা কী সেই মেয়েটির স্বামী! আমার ধর্মমেয়ে?

নানান বিচিত্র গুণ না থাকলে বোধহয় নায়েবী করা যায় না। ভয়ানক গম্ভীর মুখে নায়েবমশাই বললেন—হ্যাঁ, এ আপনার ধর্মজামাই।

তাই তো! এখন কী করা যায়?

পাইকদের ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠাব কী?

চিন্তিত মুখে বিজয়কৃষ্ণ বললেন—না না, তা কী করে হয়? আইন হচ্ছে আইন। অমন করলে কাছারির মর্যাদা থাকবে না।

তারপর সামান্য ভেবে বললেন, একটা কাজ করুন, আমার লোকেরা যা করতে গিয়েছে করে আসুক। সে ফসল খাতায় জমা করে আপনি প্রজাকে ঋণমুক্তির চিঠি দিয়ে দিন। এবার ওই ফসলের বাজাবদর হিসেব করে মোট টাকাটা এক্ষুনি আমার ধর্মমেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। টাকাটা জমিদাবীর হিসেবে নয়, আমার নামে খরচ লিখবেন। এতদিন নাযেবী করছেন, অথচ বুদ্ধিটা আপনাব মাথায় এল না, এল আমার মাথায়। এখনো আমার কাছে অনেক কাজ শেখা বাকি আপনাব। যান, যা বললাম করুন।

বুদ্ধিমান নায়েব কথা না বাড়িযে 'যে আজ্ঞে' বলে প্রস্থান করলেন।

আমিও নিঃশব্দে সবে এলাম বটে, কিন্তু এই একটি ঘটনায় বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রের একেবাবে ভেতর অবধি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বেলা বারোটা নাগাদ নায়েবমশাই আমার কাছে এসে বসলেন।

আপনার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো ঠাকুরমশাই?

হেসে বললাম, তা একটু হচ্ছে।

নাযেবমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কী। আমাকে আগে বলেন নি কেন? কী ধরনের অসুবিধে? খাওয়াদাওয়ার কোনো—

ব্যস্ত হবেন না, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আসলে আমি ভবঘুরে মানুষ, এত যত্ন আর আদরে অভ্যস্ত নই, তাই বলছিলাম। যাক, অন্যান্য খবর কী বলুন? ফসলের টাকা ফেরৎ দিয়ে এলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা ওইরকমই শিবতুল্য মানুষ। কেবল রেগে গেলে কিছুক্ষণের জন্য আমরা সবাই চুপ করে থাকি, তখন ওঁকে কিছু বোঝান যায় না। রাগ পড়ে গেলে যা বোঝান যাবে মেনে নেবেন, বড্ড খেয়ালী মানুষ। আপনি তো একটা ঘটনা মাত্র দেখলেন, ওঁর খামখেয়ালীপনা দেখে দেখে আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। ওঁরা দু-ভাই এইরকম।

চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম, সহায়কৃষ্ণবাবুও কী খেয়ালী ছিলেন?

তাহলে আর বলছি কী? এমনিতে ছোটবাবু খুব ভাল লোক ছিলেন। শান্ত মানুষ, সারাদিন পড়াশুনো করছেন, চড়া গলায় কোনো কথা বলতেন না। হঠাৎ খেয়াল হল—বিলিতি গরু পুষবেন। বড়বাবু ভাইয়ের কোনো ইচ্ছেয় বাধা দিতেন না। বিলেত থেকে জাহাজে করে ছ-মাস বাদে ষণ্ডা ষণ্ডা চেহারার গরু এসে পৌঁছাল। সে কী স্বাস্থ্য গরুদের! গাবের মত লাল চোখে তাকালে বুকের মধ্যে হিম হয়ে যায়। একমাসের মধ্যে সবকটা

রাখাল ছোঁড়া পালাল। গরুদের খেতে দেবার, যত্ন করবার লোক পাওয়া যায় না। বড়বাবু একদিন ভাইকে ডেকে বললেন, আরম্ভ করেছিস কী? ভিটেয় গো-হত্যা ঘটাবি নাকি? শেষে উপায়ান্তর না দেখে গরুগুলোকে অর্ধেক দামে কলকাতার ফড়েদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হল। মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেল কয়েক হাজার টাকা।

সহায়কৃষ্ণের খেয়ালী চরিত্রের বিষয়ে নায়েবমশাই আরো যেন কীসব বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু আমার কানে তা ঢুকছিল না। আমি ভেতরে ভেতরে তখন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। অমলের অসুখটার একটা কারণ এবং তার সমাধান আমার মাথায় উঁকি দিতে শুরু করেছে।

সেদিন দুপুরে আহারাদির পর বসু পরিবারের একজন কর্মচারীকে বললাম—ওহে, বড়কর্তাকে একবার ডেকে দিতে পারো? বলবে যে ঠাকুরমশাই ডাকছেন।

দশমিনিটের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব। ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। বললেন, কী ব্যাপার ঠাকুরমশাই? কোনো খবর আছে?

বললাম, খবর কিনা জানি না, তবে আপনাকে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমার ধারণা আমি আপনার ছেলের অসুখের কারণ ধরতে পেরেছি।

চৌকির একপাশে বসতে গিয়েও আবার সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন বিজয়কৃষ্ণ।

কী, কী হয়েছে আমার ছেলের?

কিছুই হয়নি। আপনার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ।

অ্যাঁ? তার মানে?

বললাম, মানেটা এখন বলব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আর তিন-চারদিনের ভেতর অমল ভাল হয়ে যাবে। তবে তার জন্য একটা বিশেষ প্রক্রিয়া করা দরকার, আপনি তার অনুমতি দেবেন কী?

আশঙ্কিত মুখে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, কী প্রক্রিয়া?

আমি অমলকে সম্মোহিত করে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। এতে ওর শারীবিক কোনো ক্ষতি হবে না। এমন কী—জেগে উঠে, মানে সম্মোহিত অবস্থা কেটে গেলে ও কিছু মনেও করতে পারবে না। আপনি কী অনুমতি দেবেন?

বিজয়কৃষ্ণ আমার দিকে চেয়ে বললেন, সম্মোহন? মানে হিপ্‌নোটিজম?

হ্যাঁ।

আপনি সত্যি সত্যি হিপ্‌নোটাইজ করতে পারেন?

একটু হেসে বললাম, অবান্তর প্রশ্ন। আপনি রাজি কিনা বলুন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজয়কৃষ্ণ বললেন—রাজি। কখন এটা করবেন?

আজই রাত্তিরে। অমল কখন ঘুমোয়?

ও বেশী রাত্তির অবধি জাগতে পারে না, সাড়ে-আটটার মধ্যে ওকে খাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেই সময়টাই ভাল। স্বাভাবিক ভাবে ঘুমের সময় হলে তখন ওর চেতনা ততটা সক্রিয় থাকবে না, আমার কাজের সুবিধে হবে। ওকে এখানে আনার দরকার নেই, আমিই ওর শোবার ঘরে যাবো।

বিজয়কৃষ্ণের মুখ দেখে বুঝলাম অনেক প্রশ্ন তাঁর মনে ভিড় করে এসেছে, কিন্তু তিনি নিজেকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে জানেন। অকারণ কৌতূহল দেখিয়ে আমাকে বিব্রত করলেন না।

রাত আটটা নাগাদ বিজয়কৃষ্ণ নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। কাজের লোকদের আগেই বিভিন্ন অজুহাতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শোবার খাটে একা অমলকৃষ্ণ বসে। বিজয়বাবু বললেন—বাবা, এই দেখো ঠাকুরমশাই তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন।

আমি বললাম, কিন্তু আপনাদেরও যে বাইরে যেতে হবে। এঘরে আমি আর অমল ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

দরজার কাছে বিজয়বাবুর স্ত্রীও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চমকে উঠে বললেন, আমিও থাকতে পাবো না?

মায়া লাগল। মায়ের প্রাণ, ভাবছেন ওঁর ছেলেকে আমি কী না জানি করব। বললাম—থাকলে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাব। কাজ নষ্ট হবে।

বিজয়কৃষ্ণ হাজার হোক পুরুষ মানুষ, তিনি স্ত্রীর হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। অমল আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমার সঙ্গে গল্প করবেন? আপনি ভূতের গল্প জানেন?

জানি! একটু পরেই তোমাকে আমি দুটো বড় বড় গল্প শোনাব। তার আগে একটা ছোট্ট কাজ আছে। তুমি আরাম করে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড় তো। না, হাত মুঠো করে রাখবে না। চোখ বুজে খুব সুন্দব একটা দৃশ্য কল্পনা কর—যেমন ধরো, একটা নীল পাহাড়। পাহাড়টা এখান থেকে পশ্চিম দিকে। সে পাহাড়ের গা বেয়ে রুপোলী ঝর্ণা নেমে আসছে। কোনোদিকে মানুষজন নেই, কেবল পাখীব ডাক আর নিবিড় শান্তি। ঘুম পাচ্ছে নাকি তোমার? তাহলে জোর কবে জেগে থাকার চেষ্টা করো না, ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো।

অমলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মধুসুন্দরী দেবীর স্তব মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম। হে দেবী! অমলকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

পনেরো মিনিটের মধ্যে অমল শান্ত হয়ে এল। ঘুম নয়, আবার জাগরণও নয়, এমন একটা অবস্থায় সে এখন রয়েছে।

ঝুঁকে পড়ে বললাম, এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো অমল।

আধঘন্টা পর যখন অমলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আমার সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। হাতের আঙুল কাঁপছে থরথর করে। রঙ্গমঞ্চে বেশিরভাগ যাদুকর সম্মোহন বলে যা দেখান, তা একেবারে বাজে। নিজেদের লোকের সঙ্গে আগে থেকে ঠিক করা ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সম্মোহন অত্যন্ত কঠিন কাজ। শরীরের ও মনের অর্ধেক শক্তি ব্যয় হয়ে যায়।

বিজয়কৃষ্ণ এগিয়ে এসে আমাকে কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে বললাম, আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে পশ্চিমে যেতে পারবেন?

অবাক হয়ে ভদ্রলোক বললেন, পশ্চিমে? কেন? কোথায়?

বিহারের একটা ছোট্ট জায়গায়। সেখানেই অমলের অসুখের আসল কারণ লুকিয়ে আছে। কাউকে নেওয়া চলবে না, একা আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কী ব্যাপার ঠাকুরমশাই? আমাকে খুলে বলুন, আমার হাত-পা কাঁপছে।

স্বামী-স্ত্রীকে অভয় দিয়ে বললাম, উদ্বিগ্ন হবেন না, আপনাদের দুশ্চিন্তা করার সময় ফুরিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, একটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার ঘটতে চলেছে আপনাদের পরিবারে। তৈরি থাকুন।

আনন্দের খবর? কী ঠাকুরমশাই?

এখন বলব না। আনন্দের খবর হঠাৎ পেলে বেশি মিষ্টি লাগে। বৌঠাকরুণ, আর তিন-চারদিন ধৈর্য ধরে থাকুন। তার মধ্যেই আমরা নিশ্চয় ফিরে আসব।

অমল যাবে আপনাদের সঙ্গে?

না। আমরা একাই যাব। অমল আপনার কাছে থাক।

একদিন পর ভোরবেলা নাগপুর প্যাসেঞ্জার থেকে বিহারের যে অনামী, ছোট্ট স্টেশনটায় আমি আর বিজয়কৃষ্ণ নামলাম, সেটার অস্তিত্ব খুঁজে বার করতে আমাকেও টাইমটেবিল ঘাঁটতে হয়েছিল। ট্রেন চলে যাবার পর চারদিকে সুনিবিড় স্তব্ধতা। কাছে দূরে নীল পাহাড়শ্রেণী দিগন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্জন স্টেশনের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করে বিজয়কৃষ্ণ বললেন—এবার কোথায়?

সারারাত ট্রেনে তিনি আমাদের গন্তব্যস্থল ও যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন করেছেন। আমি ভাসা ভাসা উত্তর দিয়েছি। যদি আমার অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে খামোকা হাস্যাস্পদ হয়ে লাভ কী?

বললাম—আমরা ওইসব পাহাড়গুলোর মধ্যে একটাতে যাব।

কোনটাতে? পাহাড় তো অনেক—

যেটার ওপর সর্বমঙ্গলার মন্দির রয়েছে। আসুন, জিজ্ঞাসা করা যাক।

আধবুড়ো স্টেশনমাস্টার টিনের স্টেশনঘরে বসে একখানা খাতায় কী যেন লিখছিলেন। আমাদের দেখে হিন্দীতে বললেন, কী চাই?

জিজ্ঞাসা করলাম, মঙ্গলা পাহাড় এখান থেকে কতদূর?

ভদ্রলোক চশমা খুলে হাতে নিলেন। মঙ্গলা পাহাড়? যার ওপরে সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির রয়েছে?

হ্যাঁ। সেটা কতদূর?

তা প্রায় সতেরো মাইল। কেন, পুজো দিতে যাব্রেন নাকি?

বললাম—একরকম তাই।

এখানে নতুন?

এই প্রথমবার এলাম। কেন বলুন তো?

কোঁচার খুঁট দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করতে করতে স্টেশনমাস্টার বললেন—নতুন লোক হলে তো পথ হারিয়ে ফেলবেন। বনজঙ্গলের রাস্তা।

এবার বিজয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে কী?

এইবারে স্টেশনমাস্টারের নিষ্প্রভ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা পাওয়া যাবে। আমারই নিজের গাড়ি আছে, যদি চান দিতে পারি। গরু তো নয়, একেবারে পক্ষীরাজ—উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

দু-মিনিটে ভাড়ার কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। মাস্টারমশাই হেঁকে বললেন—রামদীন! আরে, এই ব্যাটা রামদীন! যা, বাবুদের মঙ্গলা পাহাড় থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। বিকেলের মধ্যে ফিরবি। বাবুরা সন্ধের ট্রেন ধরবেন।

বুনো আতা, আমলকী আর কেঁদগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন পার্বত্যপথে গাড়ি চলল। পথের সৌন্দর্যের দিকে বিজয়কৃষ্ণের নজর নেই। তিনি কেবলই ছটফট করছেন। তাঁর যা মনের অবস্থা, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় অনেকখানি চড়াই ভেঙে গাড়ি এসে দাঁড়াল মঙ্গলা পাহাড়ের চূড়ায়, মন্দিরের প্রাঙ্গণে।

আমরা নামলাম। পক্ষীরাজ দুজন বোধহয় রাজপুত্রদের পিঠে নিয়ে অভ্যস্ত, এ ধরনের মেঠো পরিশ্রমে বেজায় হাঁপিয়ে গিয়েছে। সামনে লোহাপাথরে তৈরি মন্দির, এখন তার দরজা বন্ধ। প্রাঙ্গণের অন্যদিকে একটা ছোট্ট পাতার কুটির। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। বিজয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন?

আসুন আমার সঙ্গে। এখনি দেখতে পাবেন।

কুটিরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলাম—সহায়কৃষ্ণবাবু, বাইরে আসুন।

এমনভাবে পরক্ষণেই সহায়কৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন, যেন আমার ডাকের জন্যই তিনি ভোর থেকে বসে আছেন। চেহারায় বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে অদ্ভুত মিল, কেবল এঁর মুখশ্রী আরো কমনীয়। যেন গতকালও দেখা হয়েছে, এমন সহজভাবে এগিয়ে এসে বিজয়কৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন, ভাল আছ দাদা? আমি তোমাকে আরো আগে আশা করেছিলাম।

এর পরের দশমিনিট বর্ণনা করার মত ভাষার জোর আমার নেই। হারানো ভাইকে সামনে দেখে বিজয়কৃষ্ণের বিস্ময়, আনন্দ, অশ্রু—না, সে এক মহামারী ব্যাপার। মোটের ওপর, সহায়কৃষ্ণকে নিয়ে আমরা সেদিনই সন্ধের ট্রেন ধরে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। সব ব্যাপার ভালয় ভালয় চুকে গেল।

কিশোরী বলল, অমলের কী হল?

তারানাথ বলল, সে সেরে গেল।

আমি বললাম, এটা একটা গল্পই হতে পারে না। কী হয়েছিল খুলে বলুন। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

তারানাথ বলল—এ গল্পে জটিলতা কিছুই নেই। খামখেয়ালী সহায়কৃষ্ণ চিন্তাপ্রক্ষেপের একটা পরীক্ষা করার জন্য হঠাৎ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে মঙ্গলা পাহাড়ে আস্তানা গেড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—দেখা যাক, আমার পরিবারের কারো সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারি কিনা। তাতে তিনি সফল হয়েছিলেন, অমলের কিশোর মনে অত দূর থেকেও সহায়কৃষ্ণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরই দূরাগত নির্দেশে অমল তাঁর আত্মগোপন করার জায়গাটার ঠিকানা দেবার চেষ্টা করত—যেটাকে আমরা অসুস্থতা বলে ধরে নিয়েছিলাম। তাকে সম্মোহিত করে প্রশ্ন করতেই সব বেরিয়ে পড়ল। সোজা গল্প।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল। কিশোরী ছাতা হাতে উঠতে উঠতে বলল—গাঁজাখুরি!

উত্তরে তারানাথ জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল—পাষণ্ড।

মাস্টারমশাই

ভাত ফুটেছে কিনা দেখবার জন্য হাঁড়ির ঢাকনাটা সরাতে গিয়ে আদিনাথের ডানহাতের বুড়ো আঙুল পুড়ে গেল।

একটা দিন এভাবে শুরু হলে মন খারাপ হয়ে যায়। ভোরবেলা উঠে আদিনাথ বাইরের ছোট্ট বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ কোনো সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্রবন্ধ, উপনিষদ গ্রন্থাবলীর বাংলা অনুবাদ থেকে কয়েকটি পাতা, রবীন্দ্রনাথের একখানি কবিতা। গতকাল ডিস্ট্রিক্ট্ লাইব্রেরী থেকে এনেছেন শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, আজ সকালে তার থেকে প্রথম আট-দশ পাতা পড়েছেন। লিখিত ভাষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বহুদিন আগে মৃত্যুর পরপারে চলে যাওয়া এই মানুষগুলি বইয়ের মাধ্যমে কেমন ফিসফিস করে পরবর্তী প্রজন্মের কানে কানে কথা বলেন। আজও মন বেশ ভাল ছিল। বই বন্ধ করে দেখেছিলেন উঠোনের সজনে গাছের ডালে পরিচিত চড়ুইপাখির ঝাঁক খেলা করছে। রোদ্দুর নেই, দিগন্ত থেকে নীলচে মেঘ উঠে আসছে আকাশ বেয়ে। কেমন যেন মনে হয়েছিল—আজ দিনটা ভাল যাবে।

তারপরেই এই ছন্দপতন।

নারকেল তেলে একটুকরো ন্যাকড়া ভিজিয়ে আদিনাথ আঙুলে পট্টি করে লাগালেন। তারপর ফ্যানেভাত আলুসেদ্ধ ডিমসেদ্ধ থালায় ঢেলে, কাপে একটু সরষের তেল নিয়ে খেতে বসে গেলেন। আঙুলের জন্য চামচ দিয়ে মেখে খেতে হচ্ছিল। ব্যাপারটা অসুবিধাজনক, সময়ও লেগে যায় অনেক। হাত দিয়ে খাওয়ার মত আরাম আর কিছুতে আছে!

বাইরে কে ডাকল—স্যার, স্যার আছেন নাকি?

—কে রে?

—স্যার, আমি সঞ্জয়—

—বোস, আমি খেয়ে আসছি।

পাঞ্জাবি পরে ঘড়ি-কলম-মানিব্যাগ নিয়ে বারান্দায় এসে আদিনাথ বললেন—কী ব্যাপার? চল্, যেতে যেতে কথা বলব, স্কুলের দেরি হয়ে গিয়েছে। তালাটা দিয়ে নি—

পথে বেরিয়ে সঞ্জয় বলল—স্যার, আমাদের রেজাল্ট কেমন হল?

—তা কী করে বলব? সামনের হপ্তায় ফল বেরুলে বোঝা যাবে।

—আপনি তো বোর্ডে যাতায়াত করেন, কিছু শোনেন নি স্যার?

আদিনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন—না, শুনিনি। আমি বোর্ডে যাই তোকে কী বলেছে? খাতা জমা দিতে হেড একজামিনারের কাছে দু-একবার যেতে হয়। সেখানে এসব নিয়ে আলোচনা হয়না। তুই কী নিয়ে পড়বি?

—পিওর সায়েন্স্ নেবার ইচ্ছে আছে স্যার। পরে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়বো। কিন্তু ভাল রেজাল্ট না হলে তো কোথাও ভর্তি হতে পারবো না। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম এবার মোটের ওপর সবার কেমন ফল হল—

—আমি সত্যিই জানি না। আর জানলেও বলতাম না।

নিরুৎসাহ হয়ে সঞ্জয় পিছিয়ে পড়ল। আদিনাথ লম্বা লম্বা পা ফেলে স্কুলে এসে হাজির হলেন। বিশেষ কেউ এখনো এসে পৌঁছয় নি। কেবল জানকী পণ্ডিত টিচার্স রুমে বেঞ্চির কোণে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় চুপ করে বসে রয়েছেন। আদিনাথকে দেখে বললেন—ভাল?

—হ্যাঁ। আপনি?

—ভাল।

অথচ জানকী পণ্ডিতকে দেখলেই বোঝা যায় সবটা ভাল নয়। কোথাও কী একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আগে আগে স্কুলে এসেই টেবিল থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলতেন, দেশের ক্রমাবনতি নিয়ে গরম গরম বক্তব্য রাখতেন। আজকাল প্রায় সারাদিনই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। শরীর বেশ ভালই—চোখে ছানি পড়েনি, দাঁতও মজবুত। অম্বলের ব্যাধি নেই, বহুমূত্র নেই। আসলে জানকী পণ্ডিতেব কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। এগারো ক্লাসের হায়ার সেকেণ্ডারি তো উঠে গিয়েছে কবেই। মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও আজকাল আর সংস্কৃত পড়তে হয় না। নিচের দিকে ক্লাস এইট পর্যন্ত সামান্য ব্যাকরণ, দু-একটা শ্লোক আর কাকশৃগালকথা গোছের গল্প পড়ানো হয়। তাতে ছাত্রেরও ভাষাজ্ঞান কিছুমাত্র বাড়ে না, আর পড়াতে পড়াতে জানকী পণ্ডিতেবও মনে হয়—দূর ছাই! এসব কী ভস্মে ঘি ঢালছি বসে বসে!

আদিনাথ বললেন—মন খারাপ?

—মন ভাল হবে কী করে বলুন? দেশের অবস্থা দেখেছেন? সব চলেছে বিজ্ঞান পড়তে, সব চলেছে বিজ্ঞান পড়তে—আরে, ভারতবর্ষের একটা ঐতিহ্য আছে, পৃথিবীতে কাব্য-সাহিত্য বলে জিনিস আছে—সবাই বিজ্ঞান পড়লে চলবে?

কথাটা আদিনাথেরও মনের কথা, কাজেই তিনি কী উত্তর দেবেন? আর্টস নিয়ে যে কেউ পড়েনা তা নয়, যারা খারাপ রেজাল্ট করায় সায়েন্স নিতে পারলো না, তারা পড়ে। তাবা মাথা নিচু করে আসে যায়, বাকিরা তাদের 'আহা বেচারা' করে। আগে পড়াশুনো ব্যাপারটা মধ্যে মানবিকতা ছিল, এখন সবটাই উপার্জনমুখী।

আদিনাথ বললেন—পণ্ডিতমশাই, যুগধর্ম মানতে হয়। আমাদের যুগ গিয়েছে, এখন মানুষ টাকাকড়ি আর পার্থিব ভোগসুখ ছাড়া কিছু চায় না। খারাপ লাগলেও সেটা আপনাকে মানতে হবে। উপায় কী?

স্কুল শুরু হয়ে গেল। অনেক মাস্টারমশাই আজ আসেন নি। প্রভিজনাল রুটিনে আদিনাথের তিনটে বাড়তি ক্লাস। আগে হত না, আজকাল পড়াতে পড়াতে ক্লান্তি আসে। অগণিত ছাত্রদের মধ্যে এমন একটিও উজ্জ্বল মুখ নেই যেদিকে তাকিয়ে পড়ানোর প্রেরণা পাওয়া যায়। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সবারই এক অনুরোধ—স্যার, কিছু সাজেশন দিন। দশটা কোশ্চেন লিখিয়ে দিলেই হবে—

—কেন রে, তোরা টেক্সট্ পড়ছিস না? তাহলে আর সাজেশন দিয়ে কী হবে? টেক্সট্ পড়লেই তো সব জানা হয়ে গেল—

—স্যার, সায়েন্স গ্রুপের সাবজেক্ট্‌গুলোর বড্ড চাপ, বাংলা-ইরিজি পড়ার সময় পাইনা—

—কেন, ওগুলো বুঝি সাবজেক্ট্ না?

—তা কেন স্যার, তবে নম্বর তুলতে হবে তো সায়েন্স দিয়েই—

বটেই। খুব সত্যি কথা। কেউ পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাবার জন্য তার প্রিয় বিষয়ের ওপর বেশি জোর দিলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

টিফিনে টিচার্স রুমে বসে আপনমনে পুরনো দিনের কথা ভাবেন আদিনাথ। ওই ওপাশের কোণটায় বসত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী। মজাদার লোক। সারাদিন নানা উদ্ভট গল্পের স্রোত বইয়ে দিত। বেচারা মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়েসে হঠাৎ মারা যায়। তাও দেখতে দেখতে হয়ে গেল আজ প্রায় বারো বছর। এর আগে হেডমাস্টার ছিলেন ব্রজেনবাবু। বেঁটেখাটো, কিন্তু পেটা শরীর, তেজী লোক। স্কুলের সমস্ত কাজ করেও নিজে সপ্তাহে দশ-বারোটা ক্লাস নিতেন। ছাত্রদের মধ্যে ডিবেট, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সমাজসেবার জন্য শ্রমদান—এসব চালু করেছিলেন।

ব্রজেনবাবুও আর বেঁচে নেই।

শিক্ষা বর্তমানে একটা পার্চেজেবল্ কমোডিটি হয়ে গিয়েছে। পড়তে অনেক টাকা লাগে, আর পড়লে অনেক টাকা হয়। 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই'—এ প্রবন্ধই সত্য।

প্রথম পিরিয়ডে নাইন বি-তে বাংলা কবিতা পড়াতে হবে। নামডাকার খাতাটা নিয়ে আদিনাথ ক্লাসে গেলেন। ছেলেরা গোলমাল করছিল, তাঁকে দেখে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

পড়াতে পড়াতে বাঁদিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে একটা খোলা মাঠ, মাঠের দিকে মাঝখানে একখানা তুঁতঝোপ। তার ওপাশে কৃষ্ণডাঙার বিল। জল বেশি গভীর নয়, কিন্তু ডিঙি চলে। আকাশ উপুড় হয়ে আছে বিলের ওপর। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেমন নেশা ধরে যায়। আদিনাথ নিজে যৌবনে কবিতা লিখতেন, যেমন প্রায় প্রত্যেক বাঙালী যুবকই লেখে। রবীন্দ্রনাথ বা বিহারী চক্রবর্তী হবার দুরাশা ছিল না, কিন্তু লিখতে ভাল লাগত। তারপর একটু একটু করে জড়িয়ে পড়লেন জীবনের জটিল পাকে, তবু ভাললাগাটা রয়েই গেল।

বৃথা। এই এত ছাত্র পড়ছে স্কুলে, কারো মধ্যে সাহিত্যের প্রতি তেমন ভালবাসা নেই। কেন এমন হল? যুগের ধর্ম? পেশা আর উপার্জনের প্রতিযোগিতায় হেরে যাবার ভয়? সে তো তাঁদের কৈশোরেও ছিল। বড় হয়ে উপার্জন করে খেতে হবে একথা তাঁরাও জানতেন, আর চাকরি কোনোদিনই পথেঘাটে ছড়িয়ে থাকত না। আসলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। আরো চাই, আরো চাই। আরো টাকা, আরো ভাল জামাকাপড়, আরো ভাল খাওয়া—কিন্তু যে বিশেষ গুণটি মানুষকে মানুষ করেছে, সেটির চর্চা করতে সবাই ভুলে গেল।

পিরিয়ডগুলো গতানুগতিকভাবে কেটে যায়। বিকেলে বাড়ি ফেরবার সময় নিখিলের চায়ের দোকানে একবার বসেন। কিছু বলতে হয়না, নিখিল জানে মাস্টারমশাই কী খাবেন। সে কম চিনি দিয়ে এককাপ চা আর একটা কাগজে মোড়া কেক এনে আদিনাথের সামনে রাখে। এই টিফিনে রাত দশটা অবধি চালিয়ে নেন। বয়েস বাড়বার সঙ্গে খিদেও কমে এসেছে।

বাজারের নিমাই সাধুখাঁ এসে পাশে বসে।—

—নমস্কার মাস্টারমশাই।

—নমস্কার।

—ভাল আছেন তো? আজকাল আর দেখতে পাই না—

—কেন, আমি তো রোজই নিখিলের দোকানে এ সময়টায় বসি।

—ও, তা হবে। আসলে নিজেও তো ব্যস্ত থাকি নানা কাজে—

কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করে নিমাই প্রকৃত বক্তব্যে এল।—একটা কথা ছিল মাস্টারমশাই—

আদিনাথ এবার উঠবেন। ছাতিটা হাতে নিতে নিতে বললেন—বলুন—

—আমার ছেলেটা তো ইংরিজিতে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় বারো পেয়েছে। কী আর বলব, বাড়িতে পিটিয়ে ছাতু করছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। আপনি ওকে একটু না দেখলে ও ক্লাসে উঠতে পারবে না মাস্টারমশাই—

আদিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কিন্তু আমি তো প্রাইভেট টিউশনি করিনা—·

—সে জানি মাস্টারমশাই। কিন্তু আমার ছেলেটাকে দেখতেই হবে। যত দক্ষিণা লাগে আমি দেব। ইংরিজি আর বাংলা—দুটোই আপনি পড়াবেন। আমি সন্ধেবেলা গাড়ি পাঠিয়ে দেব আপনার বাড়ি, পড়ানো হয়ে গেলে আবার আমার গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে। শুনুন, আমার ছেলে একটা গরু—সে আমিও জানি। বংশের ধাবা পেয়েছে। একটা পাশ দিলেই ও..৷ আমি ব্যবসায় বসিয়ে দেব। কিন্তু লোকে বলবে আমাব ছেলে একটাও পাশ নয়, সে আমার সহ্য হবে না। যা টাকা লাগে—

আপাতত মুক্তি পাবার জন্য আদিনাথ বললেন—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি, এখনই কিছু বলতে পারছি না। পরে জানাবো এখন—

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে আদিনাথ দেখলেন বারান্দার কোণে কাঠের বেঞ্চিতে কে বসে আছে। বললেন—কে রে? কী চাই?

একটি শ্যামবর্ণ, রোগা চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—আপনি আমাকে ডেকেছেন স্যার? মধু বলল আপনি আমার খোঁজ করছেন—

—কে, বিমল? ও, হ্যাঁ। তুই স্কুলে যাচ্ছিস না কেন? পরীক্ষা এসে গেল যে—

ছেলেটি মাথা নিচু করে বলল—আমি পরীক্ষা দেব না স্যার।

—পরীক্ষা দিবি না! কেন? কী হয়েছে তোর?

—স্যার, আমার বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। মায়ের অসুখ যাচ্ছে। তাঁর ওষুধে মাসে চারশো টাকা লাগে। বাবা যা পরিশ্রম করেন, তার চেয়ে আর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে শুধু খাওয়া-পরা কোনোরকমে চলে, মায়ের চিকিৎসা হয় না। আমি কালিপদ দাঁ-এর কাপড়ের দোকানে কাজ করছি স্যার গত দশদিন। তিনশো টাকা করে দেবে। পড়াশুনো আমার আর হবে না স্যার—

দরজা খোলা হল না। আদিনাথ বেঞ্চিতে এসে বসলেন বিমলের পাশে। ছাত্রের গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—বিমল, পরীক্ষা তোকে দিতেই হবে। তুই আমার সবচেয়ে গর্বের ছাত্র। স্কুলের মুখ রাখবি তুই। স্কুলে আয় কাল থেকে—

—কিন্তু স্যার—

—বুঝেছি। শোন, পরীক্ষা পর্যন্ত প্রতিমাসে তিনশো টাকা তুই আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। তোর মায়ের চিকিৎসা আটকে থাকবে না—

—না স্যার, আপনার টাকা আমি নেব না—

—ধার হিসেবে নে। বড় হয়ে শোধ দিস। টাকা বুঝে পাওয়ার জন্য আমি ঠিক বেঁচে

থাকব। আর হ্যাঁ, একটা চিঠি দিচ্ছি তোর হাতে। যাবার সময় বাজারে নিমাই সাধুখাঁর হাতে দিয়ে যাবি তো। বলবি, মাস্টারমশাই কাল থেকে আসবেন।

দুই বোন

রুমা

দিদিকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই আমার সেই গান-গাওয়া, অভিনয়-করা, পাড়ার যুবকদের মনে ঝড় তোলা আগুনের শিখার মত দিদি! যে কোনো বিচিত্রানুষ্ঠানে বা সমাজ সেবার কাজে সবচেয়ে প্রথমে দিদির খোঁজ পড়ত। সবাই জানত সোমাকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না। এই তো বছর পাঁচেক আগের একটা ছবি চোখের ওপর এখনও ভাসছে। পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী হচ্ছে, সবুজ পাড় বসানো আগুনরঙা শিফনের শাড়ি পবে স্টেজে দাঁড়িয়েছে দিদি। একটু চাপা রঙ হওয়া সত্ত্বেও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে দিদিকে। অল্পবয়েসী ছোকরার দল মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে জলতরঙ্গের মত সুরেলা গলায় দিদি আবৃত্তি করছে—'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে, কেমন করে সইব?' কবিতাটা দিদি আমাকে মুখস্থ করিয়েছিল, একটা কী অনুষ্ঠানে দুজনে মিলে আবৃত্তিও করেছিলাম। সোমা বলতে তখন সবাই অজ্ঞান।

. গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস একঘণ্টা দেরি কবে হাওড়ায় ঢুকেছিল। বিরাট লাইনের ল্যাজে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি পেতে পেতে আরও আধ ঘণ্টা। লোকজন একটু অবাক হয়ে আমাকে দেখে। জিনসের ভেতর শার্ট গুঁজে পরা মেয়ে চাকা লাগানো ব্যাগ নিজে টেনে আনছে, নিজেই টেনে তুলছে ট্যাক্সির বুটে—এসব দৃশ্য কলকাতার দিকে এখনো তত পরিচিত নয়। আমার নিজেরই ভাবলে অবাক লাগে, কয়েক বছর আগেও কী ছিলাম, আর এখন কী হয়েছি! হাঁটুর নিচে ঝুল ফ্রক পরা রোগামত কালো মেয়ে, বাংলা মিডিয়ম সাধারণ স্কুলের ছাত্রী, ইংরেজিতে কথা বলা দূরে থাক, আধখানা দরখাস্ত লিখতে গেলে ঘেমে উঠি। আর এখন? এই সেদিনও কোলাবা সোলালাইটস্-এর পার্টিতে মেজর ভার্গব হেসে বললেন, মিস মিত্র, আই উইশ এভরি লেডি ইন ইন্ডিয়া কুড বি লাইক ইউ—

দেশভাগের পর যে বিশাল জনস্রোত পূর্ববঙ্গ থেকে এপারে চলে এসেছিল, বাবাও তাদের মধ্যে একজন। তখনো আমরা দু বোন জন্মাই নি। প্রায় সবই ফেলে আসতে হয়েছিল, সামান্য যা কিছু আনতে পেরেছিলেন তাই দিয়ে বাবা কলকাতা থেকে মাইল পনেরো দূরে ছোট্ট একটুকরো জমি কিনে একখানা বাড়ি বানালেন। বাড়ি বলতে টিনের চাল, কঞ্চির বেড়া দেওয়া এইটুকু উঠোন—তবে পাঁচ ইঞ্চি পাকা গাঁথনির দেওয়াল। পরিবেশে বড় হওয়ার কোনো প্রেরণা ছিল না, শুধু খাওয়া-থাকা আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মে সামান্য কাজ পেয়েছিলেন, পরিশ্রমের তুলনায় মাইনে খুবই কম। সকাল সাতটায় বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন রাত ন'টায়। মা ছিলেন লক্ষ্মী। তাই অত সামান্য টাকাতেও ঠিকঠাক সংসার চালিয়ে দিতেন। মা উঠোনে মাচা বানিয়ে তাতে তুলে দিয়েছিলেন লাউ কুমড়োর লতা, বাড়ির পেছনে তিন হাত চওড়া জমিতে পুঁতেছিলেন বেগুন, ঢেঁড়স আর টম্যাটো গাছ। কত অল্প তেলে রান্না হত, তবু অমৃতের

মত ছিল মায়ের রান্না। এখন তো ভারতের সব প্রদেশের রান্না খাওয়া হয়ে গিয়েছে, বিখ্যাত কন্টিনেন্টাল ডিশ আর অচেনা নয়—কিন্তু এখনো মনে হয় মা-ই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল রাঁধুনী। আজ কতদিন পর মায়ের হাতের রান্না খাব।

হাওড়া থেকে সরাসরি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি এলাম। শেয়ালদা হয়ে ট্রেনে এলে খরচ বাঁচত, কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি মা-বাবার কাছে পৌঁছতে ইচ্ছে করছিল। তাছাড়া আমি চার হাজার টাকার ওপর মাইনে পাই, অফিসার্স মেসে খাওয়া বাবদ মাসে একশ পঁয়ত্রিশ টাকা দিতে হয়—এই টাকায় বাইরে কোনো ভাল হোটেলে দুটো লাঞ্চও হয় না। মেয়েদের হোস্টেলে থাকবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কাজেই আমাব কার্পণ্য করবার কোনো কারণ নেই। জীবনটা সুন্দরভাবে উপভোগ করবার জন্য প্রতিটি পয়সার হিসেব করে কষ্ট পাবার জন্য নয়। নিজের চরিত্র ঠিক রেখে, রুচির বিকার না ঘটিয়ে আনন্দ করে নিতে দোষ কী?

এতদিন পর আজও আমাদের পাড়ায় মোটব গাড়ি বিশেষ ঢোকে না। গাড়ি এলে বুঝতে হবে নতুন বর এসেছে, অথবা কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাড়ার মোড় থেকেই বাড়ির জানালায় জানালায় বউ-ঝিদের কৌতূহলী মুখ উঁকিঝুঁকি দেয়, বাড়ির ভেতব থেকে বাস্তার ধাবে দৌড়ে আসে ছেলেপুলের দল। রাজেন কাকা ছাতি মাথায় চটের ব্যাগ হাতে কোথায় যেন চলেছেন। তিনিও গাড়ির মধ্যে আমাকে চিনতে পারেন না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। আমার একটু লজ্জা করতে থাকে। এখানে ট্যাক্সি ছেড়ে হেঁটে গেলেই হত। কিন্তু এই এবড়ো খেবড়ো ইঁটের রাস্তায় ব্যাগের তলায় লাগানো চাকা ঘুরবে না।

গাড়ির আওয়াজ শুনে মা বেবিযে এলেন বাইরে, পেছন পেছন দিদি। কোলে দিদির বাচ্চা। এর জন্মের সংবাদ আমি চিঠিতে পেয়েছিলাম, আশীর্বাদ করে পাঁচশ টাকাও পাঠিয়ে দিযেছিলাম দিদির শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায। শ্যামবর্ণ, নাদুসনুদুস বাচ্চাটা মায়ের কাঁধে মাথা রেখে একটা প্লাস্টিকেব বাঁশির উলটো দিকটা চুষছে। মা এগিয়ে এসে আমাব হাত ধরলেন। কথা বলতে পারছেন না, গলা বুঁজে এসেছে, দু চোখ ভর্তি জল।

কিন্তু আমার মন খারাপ হয়ে গেল দিদিকে দেখে।

দিদি অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে আগের চেয়ে। মাতৃত্বের ধকল দিদির শরীরে এক ধরনের শৈথিল্য এনে দিয়েছে। এক হাতে দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই কেমন একটা হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাব, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। আহা, আমার সেই আগুনরঙা শাড়ি পরা, কবিতা-বলা দিদি—এখন মাধবপুরের নেতাজী কলোনীতে জামাইবাবুর ভাত রাঁধে। সিনেমা দেখতে গিয়ে বাচ্চা কাঁদলে পেছনের দর্শকদের বকা খায়, ছেলের অ্যা পরিষ্কার করে। কেন দিদি তুই প্রেম করতে গেলি? কী দরকার ছিল অত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করার?

মা একটু অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার ৰব করা চুল, ছেলেদের মত জামা প্যান্ট মায়ের চোখে বোধহয় একটু খাপছাড়া লাগছে। অবশ্য এইরকম পোশাকে আমার কয়েকখানা ছবি আমি ডাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সামনে দেখলে চমক লাগেই। আমাদের পাড়া এখনো সেই রকমই রয়েছে। বেশির ভাগই দরমার বেড়া আর টিনের চাল, দু একটা পাকা বাড়ি। ছোট্ট দিগন্তের মধ্যে ছোটখাটো স্বার্থের সংঘাত, যুবকদের সবুজ সংঘ আর বুড়োদের হরিসভা। নাঃ, এখনই স্নান সেরে শাড়ি পরে ফেলতে হবে।

মা বললেন, আয়, ভেতরে আয়। উঃ, তুই কত বদলে গিয়েছিস! মুখ হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হবি চল। নাকি একেবারে চান করে নিবি? তোর বাবার আজ খুব ইচ্ছে ছিল বাড়িতে থাকার, এতদিন পরে তুই আসছিস—কিন্তু এমন জায়গায় চাকরি করে যে দরকারে একদিন ছুটি চাইলে পাওয়া যায় না। তবে আজ বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি আসবে—

দিদি লজ্জা মেশানো গলায় বলল, ভাল আছিস সোমা? তুই যে একেবারে মেমসাহেব হয়ে গিয়েছিস! ওখানেও কী সব সময় প্যান্ট পরে থাকিস নাকি?

—ভাল আছিস দিদি? তোর এমন চেহারা হয়েছে কেন? কত রোগা লাগছে—

মা বললেন, বাচ্চা হতে গিয়ে বড় কষ্ট পেয়েছে, তুই তো জানিস। বাচ্চা হবার পরও আর বিশ্রাম নিতে পারল কই? নির্মল অবশ্য একটা কাজের লোক রেখেছে, তবু—

এই বাড়িতে আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে উঠেছি। দক্ষিণের ওই ঘরটা ছিল আমার আর দিদির। এখন যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে। সিনিয়র অফিসারদের তকতকে মেস, চওড়া বারান্দা, সেখানে তার দিয়ে বাঁধা টবে ঝুলছে অর্কিড আর ফিলোডেনড্রন—খোলামেলা পরিসরে সবার সঙ্গে সহজ মেলামেশা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই পুলে চলে যাই সাঁতার কাটতে। ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট, তারপর বেলা সাড়ে বারোটা অবধি ডিউটি। লাঞ্চের ব্রেক এরপরেই, দু ঘণ্টা। সাড়ে পাঁচটায় দিনের কাজ শেষ। বিকেলে আজকাল ড্রাইভিং আর মার্শাল আর্টের কোর্সে ভর্তি হয়েছি। তারপর রাত্তিরবেলা প্রায় রোজই ক্লাবে পার্টি থাকে, নয়ত ইউনিটের গাড়ি নিয়ে দলবেঁধে শহরে যাই সিনেমা দেখতে, কিংবা ভাল রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করতে। সঙ্গে পুরুষ সহকর্মীরাও থাকে, তারা মেয়েদের প্রতি ভদ্র ও সংযত ব্যবহার করে। অনেক মেয়ে কাজ করতে করতে পড়াশুনোও চালিয়ে যাচ্ছে, পরীক্ষার সময় স্টাডি লিভ পাওয়া যায়। আমিও ভাবছি পড়াটা আবার শুরু করব।

কত সুযোগ! কী বিরাট দুনিয়া!

দিদিটা বিয়ে করে বাচ্চা হয়ে সব কিছুর বাইরে চলে গেল।

আমাদের দুবোনের পুরনো ঘরের মেঝেতে বসে ব্যাগ খুলে বাচ্চাটার জন্য আনা জামাপ্যান্ট বের করে দেখাই। দিদি আর মা খুব খুশি হয়।

—সাইজে হবে তো রে? আমি কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে কিনেছি।

—খুব হবে। একটু বড়ই তো আছে, অনেকদিন পরতে পারবে।

জামাটা বাচ্চার গায়ের সঙ্গে ধরে দিদি মাপ বোঝার চেষ্টা করে।

দিদির জন্য এনেছি আমেরিকান জর্জেটের ওপর রেইনবো প্রিন্টের শাড়ি, চ্যানেল ফাইভ স্প্রে পারফিউম। দিদি তৃপ্তিমাখা মুখে জিনিস দুটো হাতে নেয়। মার জন্য এনেছি লালপাড় গরদের শাড়ি, ফিলিগ্রির কাজ করা রুপোর হার। দশ হাজার টাকার ব্যাংক ড্রাফটসুদ্ধু খামটা মায়ের হাতে দিয়ে বলি—বাবাকে দিও।

একটা কানায় কানায় ভরে ওঠা, পরিপূর্ণ আনন্দমাখা বাড়ি ফেরা। বার বার মনে পড়ে যায় ক'বছর আগের সেই দিনটা—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যেদিন দরখাস্ত করেছিলাম। ইন্টারভিউর ডাক আসবে তেমন আশা করিনি। কিন্তু সত্যি একদিন আমার নাম লেখা ব্রাউন পেপারের একখানা খাম এল দুপুরের ডাকে। ভুল করে ডেকেছে—নিতান্তই ভুল করে। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আমার মত সাধারণ মেয়ে কোথায় ভেসে যাবে! স্বপ্নের জগৎ কী কখনো বাস্তবে নেমে আসে?

চাকরির ট্রেনিং-এ প্রথমবার আসার সময় বাবা-মা ভয়ানক আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু সব বাধা অগ্রাহ্য করে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমি জানতাম আমাকে দাঁড়াতেই হবে। বাবার ছেলে নেই, দেশভাগের ধাক্কায় ভিত পড়ে যাওয়া এই সংসারের খুঁটিগুলো শক্ত করতে হবে আমাকেই।

তাছাড়া আমার নিজের স্বপ্ন—ভবিষ্যতের ছবি। সংসার দেখেও যা সফল করা যায়।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে দিদি আর আমি গল্প করি। টিনের চালে হঠাৎ ঝুপ করে শব্দ হয়, তারপর একটা খচখচ আওয়াজ চলে যায় চালের ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্তে। চমকে বলি, ওটা কী রে?

—ওমা, তুই ভুলে গেছিস! ও তো পুষু, রোজ দুপুরে পেয়ারা গাছের ডাল বেয়ে এসে ছাদে নামে, মনে নেই? এখনো রোজ আসে—

—পুষু এখনো বেঁচে আছে। খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছে তাহলে, বল?

বাচ্চাটা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে। দিদি ওপাশ ফিরে তাকে চাপড়াতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য আমাদেব গল্প স্থগিত হয়ে যায়। একটু পরে বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে দিদিও ঘুমিয়ে পড়ে।

এসব অঞ্চলে যে কোনো খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আমি যে বাড়ি এসেছি সেটা সমস্ত পাড়ায় বাষ্ট্র হ'য়ে গিয়েছে। বিকেলে বাবান্দায় বসে চা খাবার সময় সামনের রাস্তা দিয়ে অসীমকে কযেকবার যাতায়াত করতে দেখেই তা আরও ভাল করে বুঝলাম। বেচারী লজ্জায সরাসবি এদিক তাকাতে পারছে না। তিনবাবের বার যখন যাচ্ছে, আমিই উঠোনেব বেড়ার কাছে গিয়ে তাকে ডাকলাম—কী খবর?

যেন এইমাত্র আমাকে প্রথম দেখল এমনভাবে চমকে উঠে অসীম বলল, আরে তুমি! তুমি কবে এলে? ভাল আছো তো?

—আমি ভাল আছি। আজই এলাম। তুমি কেমন আছো?

—ভাল আছি। আমি তো কিছুদিন হল—

অযাচিত ভাবে সে আমাকে তার বর্তমান ব্যবসা এবং তাতে অভূতপূর্ব উন্নতির কথা সবিস্তারে জানাতে থাকে। তার আধময়লা পোশাক, না-কামানো দাড়ি আর চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের অভাব—এসবের সঙ্গে সে গল্প যে মিলছে না সে কথা তাকে আমি জানাই না। চলে যাবার আগে শেষ কয়েকমাস অসীমের সঙ্গে আমার একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দোষ নেই কারো, বয়েসটাই ছিল ওইরকম। দু একবার আড়ালে কথা বলারও সুযোগ হয়েছিল। একখানা উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠিও লিখেছিল অসীম। কৈশোরের সদ্যমুকুলিত চেতনার আয়নায় প্রথম ছায়া পড়েছিল অসীমের। তারপর আমার জীবন এগিয়ে এসেছে অনেকখানি, বদলে গিয়েছে আমূল—অসীম পড়ে আছে পুরনো পরিবেশের সেই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই।

কিছু করার নেই, দিনকাল কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার মায়া লাগে ওর জন্যে। আমি ওর কাল্পনিক ব্যবসা সম্বন্ধে আরও দু একটা প্রশ্ন করে নিজের উৎসাহ দেখাই। অসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমার দিকে একবারও তাকাতে পারে না। ওর সঙ্গে আমার যোগসূত্র চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

আজ সন্ধ্যের আগেই বাবা ফিরে এলেন। অন্যদিন নাকি বাড়ি আসতে আসতে রাত ন'টা হয়। বাবা অবশ্য আমাকে দেখে বিশেষ চমকালেন না, কারণ এখন আমি শাড়ি

ব্লাউজ পরে একেবারে মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েটি হয়ে বসে আছি। কেবল প্রণাম করার পর একবার বললেন, এ রকম ছোট করে চুল কেটেছিস কেন?

রান্নাঘর থেকে বাবার চা আমিই নিয়ে এলাম। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাবা বললেন, বোস এখানে, তোর সঙ্গে একটু কথা বলি—

—তুমি হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে নাও না বাবা, তারপর কথা বোলো'খন।

—না, তুই বোস। চা খেতে খেতে কথা বলি। অনেক কথা বলবার আছে—

চায়ে চুমুক দিয়ে বাবা একবার চারদিকে তাকালেন, তারপর বললেন, আমার ছেলে নেই, কিন্তু সে অভাব তুই পূর্ণ করেছিস। তুই আমার তিনটে ছেলেরও বেশি। রোয়াকে ওঠার জন্য সামনের সিঁড়িগুলো সিমেন্ট করা হয়েছে দেখেছিস? সে তোরই পাঠানো টাকায়। এবার যা দিয়েছিস তার সঙ্গে আমার জমানো কিছু মিশিয়ে ছাদটা ঢালাই করে ফেলব। তুই আমার মেয়ে না রুমা, তুই আমাব ছেলে।

স্টেশনে লাইনের ধারে সন্ধ্যেবেলা বাজার বসে। দিদিকে বললাম, চল দিদি, আমরা দুজনে বাজার করে আনি। যাবি?

বাচ্চাটাকে নিয়েই দিদির অসুবিধা। মা ছাড়া সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, আবার তাকে কোলে করেই বা দিদি কতক্ষণ ঘোরে? শেষে মা বললেন, অত ভাববার কিছু নেই, আমার কাছে রেখে যা। তোদের দুজনকে তো মানুষ করেছি—

তবু দিদি খুঁত খুঁত করতে থাকে। বাজারে যেতে আসতে অন্তত এক ঘণ্টা। তার মধ্যে যদি বাচ্চা কাঁদে?

বাবা-মা দুজনেই মাছ খেতে ভালবাসেন। একখানা বড় সাইজের গঙ্গার ইলিশ নিলাম, আর কিছু পাবদা। এ বাজারে তরি তরকারি ভাল পাওয়া যায় না, নইলে ইচ্ছে ছিল ফুলকপি নেবার।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর বাবাব ঘরে গিয়ে গল্প করতে বসলাম আমরা দু বোন। দিদি বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। বাবার মুখে খুশির ঔজ্জ্বল্য। একটু পরে রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে মাও এলেন। বাবা পবিবারের সবাইকে নিয়ে এইরকম জমিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন। মাকে বললেন, মশারির খুঁটটা খুলে দাও না।

আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, তোর কী এদিকে বদলি হবার কোনো সম্ভাবনা আছে?

—হতে পারে, তবে এখন নয়। এই তো বছর দেড়েক হল ট্রেনিং শেষ করে পোস্টিং হয়েছি, এখনই কী আর বদলী করবে? করলেও সেটা ভারতের যে কোনো জায়গায় হতে পারে—

—পশ্চিমবঙ্গে, মানে কলকাতার কাছে হবার চান্স নেই?

—আছে। তবে কম।

মা জিজ্ঞেস করলেন, চাকরি করতে করতে বিয়ে করা যায় তো? তেমন নিয়ম আছে?

—তা করা যায়। তবে ও নিয়ে আমি ভাবছি না।

—কেন, তুই বিয়ে করবি না?

—করব নাকি করব না এখনো কিছু ভাবিনি। পড়াশুনোটা তো আগে শেষ করি—

যে কোনো সাধারণ গৃহবধূর মত মায়েরও ধারণা চাকরি পাবার জন্যই মানুষ পড়াশুনো করে। আমি ভাল চাকরি পেয়ে গিয়েছি, তবু কেন পড়তে চাই মা বুঝতে

পারলেন না। বললেন, আবার কী পড়বি?

—স্পেশাল অনার্স দেব, এম.এ. দেব। তারপর প্রফেশনাল নানা রকম কোর্স রয়েছে, তার কোনো একটায় ভর্তি হব। আমার ইচ্ছে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শেখার, এই কোর্স কমপ্লিট করে আমার বন্ধু মীরা প্যাটেল চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছে। এখন সে হিলটন কমপ্লেক্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

বাবা চুপ করে শুনছিলেন, এবার বললেন, রুমা, তোর পাঠানো টাকায় সংসারের বিরাট উপকার হয় সত্যি কথা। এও সত্যি কথা যে, বিয়ে করলে তুই নিজের সংসার সামলে আর টাকা পাঠাতে পারবি না। পাঠালেও তোর বিয়ের পর তোর টাকা আমি আর নেব না। তবু বলছি, তুই বিয়ের ব্যাপারে আর দেরি করিস না। এই বয়েসটা পার হয়ে গেলে বিয়ের খুব অসুবিধা হয়—

বললাম, আচ্ছা, সে ভেবে দেখা যাবে। এখনি তো কিছু হচ্ছে না।

মা বললেন, ওখানে কী তোর নিজের কাউকে পছন্দ হয়েছে? তাহলে বল, তোর বাবা বরং গিয়ে—

হেসে বললাম, না, মা। তেমন কিছু নয়। আসলে বিয়ের কথা এখন আমি ভাবছি না।

অনেক রাত্তির অবধি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না। আজকাল কোনো এক জায়গায় বসে বেশিক্ষণ বিশ্রাম করতে পারি না, ঘুমও কমে গিয়েছে। মনে কেমন যেন একটা উদ্বেগ হয়—এই বুঝি আমাকে বাদ দিয়েই পৃথিবী এগিয়ে গেল অনেকখানি।

বাইরে রাস্তায় লোকের যাতায়াতের শব্দ ক্রমশ কমে আসতে থাকে। রাত্তির নিঃঝুম হয়ে পড়ে। ঘরের ছাদে পুষুর আলতো পায়ের আওয়াজ পাই।

আমার পাশে নিঃসাড় ঘুমিয়ে থাকে ক্লান্ত দিদি।

সোমা

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ জেগে গিয়ে আধোঘুমের মধ্যে অভ্যেসমত পাশে হাত দিয়ে দেখি বিছানায় খোকন নেই। বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কোথায় গেল খোকন? খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো কিছুটা বিছানায় এসে পড়ে। সেই আলোতে ভাল করে তাকিয়ে দেখি—না, খোকন নেই বিছানাতে।

তাড়াতাড়ি নামবার জন্য মশারি ধরে টানতে থাকি, মশারি খুব ভারী বলে মনে হয়। তখন ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে আবিষ্কার করি—খোকন খাট থেকে গড়িয়ে গিয়ে মশারিতে আটকে ঝুলছে। বেশ দোলনার মত লাগায় ঘুম ভাঙেনি। তাকে তুলে এনে ওদিকে পাশবালিশ দিয়ে শোয়াই, মশারি গুঁজে দিই ভাল করে। তারপর বিছানায় শুতে না শুতে আবার ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসতে থাকে। আজকাল আমার যে কী হয়েছে, কোথাও একটু বসলে অথবা বাচ্চাকে নিয়ে শুলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম পেতে থাকে। খাটুনিও কম যায় না। সর্বক্ষণের কাজের লোক রাখার মত সংসারের অবস্থা আমাদের নয়। তোলা কাজ করবার মাসি আছে, সে বাসন মেজে আর কাপড় কেচে দিয়ে চলে যায়। দুবেলা রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা সবই আমাকে করতে হয়। এর ওপর খোকনকে দেখাশুনো করা, সেটাই বা কম কী? স্নান করিয়ে খাইয়েই কী রেহাই আছে? চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে হয়—এই বুঝি পড়ে গেল, এই বুঝি কিছু মুখে দিল। ঘুম পাওয়ার আর দোষ কী? শ্বশুরবাড়িতে আমাদের দুজনের সংসার, এই যা একটা সুবিধে, সবাইকে নিয়ে থাকতে

হলে ঘুম দুদিনে কোথায় পালিয়ে যেত। বাড়ির বউয়ের যখন তখন ঘুম কী কেউ মেনে নেয়? অবশ্য ওর এক বুড়ো মেসোমশাই একবার বেড়াতে এসে আমাকে খোকার পাশে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন, আহা, থাক। ডেকো না। ইচ্ছেমত ঘুমিয়ে পড়তে পারে মানেই ওর মনে সুখ আছে। সুখী মানুষ ছাড়া কী নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে? ডেকো না—

কথাটা মিথ্যে নয়। খোকনের বাবা এমন কিছু বড় চাকরি করে না, মোটামুটি সংসার চলে যায় আর কী। মাসের উনিশ কুড়ি তারিখ থেকে বেশ টানাটানির মধ্যে চালাতে হয়। নিত্য প্রয়োজন মিটিয়ে বিলাসিতা করার মত তেমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, আমি বলব আমি খুব সুখে আছি। আসলে সুখ মনের একটা অবস্থা—শাক ভাত খেয়েও মানুষ সুখী হতে পারে। আবার রাজার ঐশ্বর্যের মধ্যেও অনেকে হয়ত দুঃখী। এত কথা আগে বুঝতাম না। ছোটবেলায় আমিও ভাবতাম সিনেমার নায়কের মত দেখতে বরের সঙ্গে বিয়ে হবে, দামি দামি পোশাক পরে মোটর গাড়িতে চড়ে বেড়াব। আরও সব কত ভাল ভাল জিনিস জীবনে ঘটবে। তারপরেই খোকনের বাবার সঙ্গে আলাপ হল পাড়ার একটা ফাংশনে। মিত্তিববাড়ির বড়ছেলের বন্ধু, ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল। আমার আবৃত্তি শুনে যেচে আলাপ করে। খুব সাহসী ছেলে, আলাপ হবার মাসখানেকের মধ্যে আমাদের বাড়ি এসে বাবাকে বলল, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই—

বাবা ঠাণ্ডা মাথাব লোক। প্রশ্ন করে বাড়ির খবর, বংশের ইতিহাস সব জেনে নিয়ে ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন—ফ্যামিলি তো ভালই, আমার আব কী আপত্তি থাকতে পারে? কিন্তু বাড়ি বাড়ি চা সাপ্লাই দেবার ব্যবসা করো বলছ—তাতে তো সংসার চালাতে পারবে না বাপু। তুমি বরং বছর দুয়েক সময় নাও। এই সময়টার ভেতর নিজেকে দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত করে তোল। আমি কথা দিচ্ছি, দু বছরের মধ্যে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।

সেই দু বছর খোকনের বাবা সত্যিই খুব কষ্ট করেছে। সকাল-বিকেল টিউশনি, দুপুরে নিজের চা সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, হন্যে হয়ে চাকরি খোঁজা, এরই মধ্যে আবার সন্ধ্যেবেলা টাইপ আর শর্টহাণ্ডের ক্লাস। তবে মানুষটার জেদ আছে। দু বছর ফুরোবার দেড় মাস আগে সত্যিই একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলল। বাবাও নিজের প্রতিশ্রুতি ভাঙলেন না। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

ভালই তো আছি। খাটতে হয় বটে, তবে আমার নিজের সংসার, খাটবো নাই বা কেন? কেউ তো আমার পায়ে শেকল পরিয়ে রাখে নি। খোকন হবার সময় খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, এখনো সেটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। একটু ক্লান্ত লাগে, ঘুম পায়। শরীর ঠিক হয়ে গেলে, খোকন একটু বড় হলে আমি ইচ্ছেমত ঘোরাঘুরি করতে পারব। আমার স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নেয় নি। বরং একটু কষ্টসৃষ্ট করে দুজনে মিলে সংসার চালানো, খোকনকে একটু একটু করে বড় হতে দেখা—এইসব আনন্দ কী আমি অন্য কোনোভাবে পেতাম? কথাটা আমি রুমাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু চিরকালই ও যা জেদী! নিজে যা বুঝবে সেটাই ঠিক, কারো পরামর্শ কানে তুলবে না। এখন নাকি ও আরো পড়াশুনো করবে, সম্ভব হলে বিলেত যাবে। বেচারি! আমি ছোটবেলায় যেমন স্বপ্ন দেখতাম, ওর সেই অবস্থাটা আর কাটল না। বিলেত গেলে কী সুখের সন্ধান পাওয়া যাবে? বা আরো বেশি মাইনের চাকরিতে? আকাশের নক্ষত্রগুলো তো বিলেতের থেকেও দূরে, আরো বেশি সুখ পেতে হলে তো তাহলে সেখানে যেতে হয়।

বাবাব বয়েস হচ্ছে, তিনি দেখে যেতে চান তাঁর দুই মেয়েই বিবাহিত, প্রতিষ্ঠিত। বাবাকে এটুকু শান্তি দেওয়া রুমার উচিত।

ছোট বোনটার জন্য মায়াও লাগে। কোথায় হাজার মাইল দূরে পড়ে আছে চাকরির জন্য। কষ্ট করে বাবাকে টাকাও পাঠাচ্ছে সাধ্যমত। ওকে দোষই বা দিই কী করে? সবাই তো আর খোকনের বাবার মত মানুষ নয়। বিয়ে করে জীবনের সব সখ আহ্লাদ ফুরিয়ে যেতেও দেখেছি মেয়েদের। বিয়ের সম্বন্ধ করার সময় বোঝা যায় না সে কেমন লোক। আমাদের পাড়ার মিতার কী হল? দিব্যি সুন্দর জামাই দেখে বিয়ে দিল তার বাবা, বেশ নামডাকওয়ালা পরিবারের ছেলে। আমিও বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। গরদের পাঞ্জাবি পরা, নিখুঁত ভাবে দাঁড়ি গোঁফ কামানো জামাই হাসিমুখে বন্ধুদের সঙ্গে রসিকতা করছে। সবাই দেখে ধন্য ধন্য করল। ওমা! এক বছরের মধ্যে দেখি মিতা বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। প্রথম প্রথম কেউ কিছু বুঝতে পারে নি, মেয়েরা তো বাপের বাড়ি এসে থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশীরা গুজগুজ ফুসফুস করতে শুরু করল, মিতা আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায় না কেন? জামাইকেও কই আর আসতে দেখা যায় না? শেষে জানা গেল মিতা বরাবরের মত চলে এসেছে। স্বামীর চরিত্র খারাপ, মাইনে পেয়ে পাড়ার এক বৌদির হাতে সব টাকা তুলে দেয়, কোনো কোনোদিন বাড়িও ফেরে না, সেই বৌদির বাড়িতেই রাত কাটায়, এই নিয়ে অশান্তি। এখন কোর্টে ডিভোর্সের মামলা চলছে। কাজেই কাউকে বিয়ের পরামর্শ দিতেও ভয় করে। কে জানে কী হতে কী হয়।

মাঝে মাঝে ভাবি, আমিই ভুল করছি না তো? দু দিন হল রুমা এসেছে, এই দু দিনে পাড়ার মানুষ ভেঙে আসছে রুমাকে দেখতে। সবার মুখেই প্রশংসা—আহা, এমন মেয়ে হয় না। লোকের কথা আর কী বলব, আমিই অবাক হয়ে নিজের বোনের দিকে তাকিয়ে থাকি। একদম বদলে গিয়েছে রুমা। ছোটবেলায় আমরা একই স্কুলে পড়তাম। ও ক্লাস ফাইভে, আর আমি এইটে। নিচের ক্লাস আগে ছুটি হয়ে যেত, খেলার মাঠের কোণায় রুমা চুপ করে বসে থাকত আমার জন্য। আমার ছুটি হলে ওকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতাম। সেই লাজুক, ভীতু মেয়েটা আজ লোকজনের সঙ্গে কেমন সমানে সমানে ইংরিজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলছে, বাড়ি থেকে কত দূরে রয়েছে একা। এতেই শেষ নয়, সে আরও পড়বে, আরও উন্নতি করবে, বিদেশে যাবে। যে শুনছে সে-ই তো প্রশংসা করছে। আজ হঠাৎ আমার মনে চিন্তাটা এল—অল্প বয়সে বিয়ে করে আমি বাচ্চা আর সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি, এদিকে ছোট বোন দিব্যি মুক্ত আনন্দে দুনিয়াটাকে উপভোগ করে নিচ্ছে। এই অবস্থায় আমার মনই কী তাহলে আমার অজান্তে নিজেকে সমর্থন করার জন্য কিছু বিরুদ্ধ যুক্তি খাড়া করেছে? আসলে রুমাই ঠিক, আর আমি ভুল?

চিন্তাটা আমাকে বেশ কষ্ট দিতে থাকে। আমার ভেতরেও সম্ভাবনা ছিল না এমন নয়। ক্লাস টেনে যখন পড়ি, 'রাজা রানী' নাটকে সুমিত্রার পার্টে আমার অভিনয় দেখে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রুপোর মেডেল দিয়েছিলেন। চেয়ারম্যানের খুড়তুতো ভাই কলকাতায় ফিল্মের লাইনে কী যেন কাজ করত, সে আমাকে অনুরোধও করেছিল ফিল্মে অভিনয় করতে। বাবা মত না দেওয়ায় সেটা আর হয়ে ওঠেনি। নৈহাটিতে একটা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় আমি ফার্স্ট হই। আকাশবাণী কলকাতার একজন ঘোষক ছিলেন বিচারক, তিনি নিজেও নামকরা আবৃত্তিকার। আমাকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি কোথায় আবৃত্তি শেখো?

উত্তর দিয়েছিলাম, কোথাও না। বাড়িতে নিজে নিজে অভ্যেস করি—

—বল কী! সে তুলনায় তোমার উচ্চারণ আর আবেগের প্রকাশ খুবই যথাযথ। একজন শিক্ষক থাকলে আরও ভাল হত, তাতে চট করে নিজের ত্রুটিগুলো বুঝে নিতে পারতে—

—আমার একজন শিক্ষক আছেন।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, সে কী! তুমি যে বললে কারও কাছে শেখো না?

হেসে বললাম, আপনার রেকর্ড চালিয়ে আমি প্র্যাকটিস করি। আপনিই আমার গুরু।

তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন আমার জবাবে, বলেছিলেন কলকাতায় তাঁর কাছে গিয়ে শিখতে।

হয় নি! যেমন আরও অনেক কিছুই না।

আমার বড় ভয় হয়। জীবনে আমি কাউকে কখনো ঈর্ষা করিনি। খুব ছোটবেলায়, তখন বোধহয় ক্লাস টু কিংবা থ্রিতে পড়ি, একজন বুড়ো মাস্টারমশাই সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে পড়াতে আসতেন। নাম ছিল কিশোরীবাবু। সব চুল পাকা, ঝাঁটার মত পাকা গোঁফ। তিনি পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে অনেক সদুপদেশও দিতেন। বলতেন, শোন, লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চরিত্রকেও উন্নত করতে হবে। আনন্দে থাকার সবচেয়ে ভাল উপায় কী জানো? কাউকে ঈর্ষা না করা। নিজের যতটুকু আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কারণ চাহিদার তো কোনো শেষ নেই, যতই বাড়াবে ততই বাড়বে—

মাস্টারমশাই বোধহয় আর বেঁচে নেই, তখনই বয়েস ছিল চুয়াত্তর পঁচাত্তর। কিন্তু তাঁর কথাগুলো মনে পড়ে যেতেই বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠল। না, না! আমি আমার ছোটবোনকে খুবই ভালবাসি, তার উন্নতিতে নিশ্চয় আমাব খুব আনন্দ হয়েছে। বাজে চিন্তা দূর করে দেওয়া উচিত মন থেকে। ওসব কথা আর ভাবব না।

কিন্তু জুতোর ভেতর থেকে পেরেক উঠে থাকলে মাঝে মাঝেই যেমন সেটা খচ্ খচ্ করে পায়ে লেগে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়, তেমনি আজ সকাল থেকে আমার মনটা খারাপ হয়ে রইল। নিজের মনের গতিও বোঝা খুব কঠিন, সজ্ঞানে যেটা প্রাণপণে অস্বীকার করতে চাইছি, মনের গভীর গোপনে সেইটেই হয়ত সত্যি। ছি ছি! এর চেয়ে লজ্জার কথা কী আছে!

খোকনের বাবার আজ দুপুরে এখানে খাওয়ার কথা ছিল। ছুটির দিন, আজ রাত্তিরটা এখানে থেকে কাল একেবারে এখান থেকেই অফিসে চলে যাবে এরকম বলে দিয়েছিলাম। না, আমার চিন্তা হচ্ছে। ওর শরীরটা ভাল নয়, মাঝে মাঝে কোমরের একটা ব্যথায় কষ্ট পায়। আজ বিকেলেও না এলে কাল পাড়ার কোনো ছেলে ছোকরাকে পাঠাতে হবে খোঁজ নেবার জন্য। এইসবের নামই পিছুটান, হয়ত এই জন্যেই যারা বড় কাজ করতে চায় তাদের বিয়ে করতে নেই। আমি নিজের ওপর ভয়ানক রেগে যেতে চাই—ভাবব না কারো কথা। আমি—আমি এখন বরং সঞ্চয়িতা পড়ব। শোবার ঘরের তাক থেকে আমার কুমারী জীবনে কেনা সঞ্চয়িতা নামিয়ে খুলে বসি। পনেরো মিনিট পরে অবাক হয়ে দেখি—পড়া হয় নি একটি লাইনও। পড়ব কী, কেবলই মনে হচ্ছে সত্যি যদি কোমরের ব্যথাটা বাড়ে তাহলে তো বেচারি নিচু হয়ে এক গ্লাস জলও গড়িয়ে খেতে পারবে না। আমি কী আজই চলে যাব বাবাকে বলে, নাকি—

—সোমা!

কার গলা? এভাবে তো ডাকে একজনই লোক। অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে দেখি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে খোকনের বাবা।

—ওমা! তুমি কখন এলে? টের পাইনি তো। দুপুরে এলেনা কেন? সবাই কত চিন্তা করছিল—

—সবাই চিন্তা করছিল, তাই না? আবার বহুবচন কেন? কী বই পড়ছ দেখি—

বই নিয়ে একটু কাড়াকাড়ি হল, তারপর বই খাটের কোন কোণায় পড়ে রইল কে জানে!

খোকনের বাবা আমাকে বেশ জুৎসই করে জড়িয়ে ধরে—নাঃ, লোকটা এক্কেবারে পাগল।

—ছাড়ো ছাড়ো। কী হচ্ছে! মা রয়েছেন পাশের ঘরে—

—মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন দেখে এসেছি। আর দোষটা কী হল, আমি কী পরপুরুষ নাকি? বর বউ সুযোগ পেলে অমন একটু আদর করেই থাকে—।

খোকনের বাবার দৃঢ় বাহুবন্ধনের মধ্যে আমার মুখে হাঁপ ধরে যায়।

কিচ্ছু হবে না আমার। এত অল্পে গলে যাওয়া লোকের কী কখনো কিছু হয়?

বিকেলের দিকে একটা মজার ঘটনা ঘটল।

রুমা কী সব জিনিস কিনবে, খোকনের বাবার সঙ্গে সে গিয়েছে বাজারের দিকে। আমি বারান্দায় বসে চুল বাঁধছি, এমন সময় নয় দশ বছরের রোগামত শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল—কাকিমা।

তাকে কাছে ডাকলাম।

—আমাকে খুঁজছ? কী চাই তোমার?

মেয়েটি লাজুক, চোখ নিচু করে বলল, মা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল। আমার মায়ের নাম আরতি।

—ও, আরতিদির মেয়ে তুমি? কী নাম তোমার?

—কঙ্কণা। আমাদের ইস্কুলের ফাংশানে কবিতা বলতে হবে, রবীন্দ্রনাথের 'লুকোচুরি'। মা বলে দিল আপনার কাছ থেকে শিখে নিয়ে যেতে—

বহুদিন পর বৃষ্টি হলে শুকনো মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ উঠে যেমন মনকে তৃপ্ত করে, তেমনি অনেকদিন আগের একটা ভুলে যাওয়া আনন্দের অনুভূতি সমস্ত চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল। বললাম, তুই একটা পাগল। সেসব কী আর আমার অভ্যেস আছে রে, কবে ছেড়ে দিয়েছি—

—না কাকিমা, পাড়ার সবাই তোমার নাম করে। আরও কত বাচ্চা সন্ধ্যের পর আসবে দেখো—তুমি এসেছ খবর পেয়েছে কিনা। মা আমাকে বলল, তুই তাড়াতাড়ি চলে যা। আমাকে কিন্তু আলাদা করে দেখাতে হবে—

মেয়েটিকে ঠিক আমার মত দেখতে—মানে, ওই বয়েসে আমি যেমন দেখতে ছিলাম।

খোকনকে মায়ের কোলে দিয়ে আসি। আমার চুল বাঁধা পড়ে থাকে, আমার কাপড় বদলানো হয় না। কারণ কঙ্কণাকে শেখাতে শেখাতেই পাপড়ি এসে পড়ে, তারপর মণিদীপা, তারপর চামেলি—আমার ঘর ভরে যায়। আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সপ্তর্ষি ও তার হারানো বিকেল

বহরমপুর পেরিয়ে কান্দীর পথে পড়তেই রাস্তার দুধারে বাড়িঘর আর গাছপালার চেহারা বদলে যেতে লাগল। মাটির রঙও এখানে সামান্য লাল। সপ্তর্ষির বাবা বুঝিয়ে দিলেন—মাটির সঙ্গে লোহা মেশানো রয়েছে বলে ওইরকম রঙ। এখান থেকেই নাকি রাঢ়বঙ্গের শুরু। রাঢ়বঙ্গ বলতে ঠিক কী বোঝায় সপ্তর্ষি জানে না, তবে সময়মত বাবাই নিশ্চয় বলে দেবেন। বাবা বেশ ভাল লোক, বাবার সঙ্গে বেড়াতে মজা লাগে।

দুপাশে ধু ধু মাঠ, মাঝখান দিয়ে কালো পিচের রাস্তা চলেছে সোজা। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে অজস্র তালগাছ। কোথাও আবার খোলা প্রান্তরের ভেতর তালগাছগুলো জড়াজড়ি করে একজায়গায় ভিড় করে রয়েছে। এখানকার তালগাছ দেখতে একটু যেন অন্যরকমের, গুঁড়িটা বেশ মোটা, আর মাটির একেবারে কাছ থেকেই প্রথমে কিছুটা বেঁকে তারপর সোজা উঠেছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দু-একটা বিরাট শিমুলগাছ, পাতা নেই, ডালগুলো লাল ফুলে ভর্তি।

বাবা হঠাৎ বললেন—বিকাশ, গাড়িটা এখানে একটু থামাও তো। এই বাঁদিকে—

পথের বাঁদিকে কয়েকটা বড় গাছের ছায়ায় কিছু লোক বিশাল দুটো উনুন জ্বালিয়ে কী যেন করছে। সেখানে গাড়ি থামতেই তারা অবাক হয়ে তাকাল। সপ্তর্ষিও অবাক। এতবড় উনুন আগে সে কখনো দেখেনি। উনুনের ওপর লোহার চাদর জুড়ে তৈরি বড় কড়াই চাপানো, সে কড়াইতে কী যেন জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। অত উঁচুতে নাগাল পাবার অসুবিধা বলে জ্বাল দেবার কাজে ব্যস্ত লোকদুজন দুটো প্যাকিংবাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে কাঠের হাতা নাড়ছে। চারদিকের বাতাসে একটা খুব চেনা চেনা মিষ্টি গন্ধ।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা কী করছে বলতে পারিস?

সপ্তর্ষি মাথা নাড়ল।

বাবা বললেন—আমারই অন্যায়। কলকাতায় চাকরি নিয়ে তোকে একেবারে শহুরে ছেলে বানিয়ে ফেললাম। কিন্তু এই হচ্ছে আসল দেশ, বুঝলি? শহরে আর কটা মানুষ থাকে? ওরা গুড় জ্বাল দিচ্ছে, বুঝেছিস? আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করছে। আয়, তোকে আখের রস খাওয়াই—

গুড়ওয়ালারা ভারি ভাল। নতুন মাটির ভাঁড়ে করে তিনজনকে পেটভরে রস খাওয়াল তারা। সপ্তর্ষির বাবা পয়সা দিতে গেলে কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোকটা মাথা চুলকে বলল—আজ্ঞে, আপনারা অতিথি, দু-ভাঁড় রস খেয়েছেন, ওর দাম দিতে হবে না—

—না না, সে কী কথা! সে হয় না—

সে কিছুতেই পয়সা নিতে রাজি হল না, বলল—আমাদের এমনি কত রস তো মাটিতে পড়েও নষ্ট হয়। আজ খোকাবাবু খেয়েছে, তার দাম নেবো? খোকাবাবুর নাম কী?

সপ্তর্ষির নামটা তারা ঠিক বুঝতে পারল না। তাদের ছেলেপুলেদের নাম গণেশ, রামু, কার্তিক এইসব হয়। তবু তারা হেসে বলল—বেশ নাম, ভাল নাম।

সপ্তর্ষির বাবা তাদের নমস্কার করে গাড়িতে এসে উঠলেন।

কান্দী শহরে না ঢুকে তারা বাসস্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে বাইপাস ধরে পাঁচথুপীর রাস্তায়

এসে পড়ল। এবার রাস্তা আরও সরু আর খারাপ। কিন্তু পথে যে জায়গাগুলো পড়ছিল তার নাম খুব সুন্দর। পুরন্দরপুর, গোকর্ণ। আর দশ-বারো কিলোমিটার গেলেই পাঁচথুপী।

পথে বেরুলে কত মজার ঘটনা দেখা যায়। যেমন গোকর্ণ ছাড়িয়ে কিছুদূর এসে হঠাৎ গাড়ি থামাতে হল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট ছাগলছানা তার মায়ের দুধ খাচ্ছে। সরু রাস্তা, পাশেই নাবাল জমি, ধানক্ষেত। এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। দু-তিনবার হর্ন দেওয়া হল, কিন্তু তারা নির্বিকার। বিকাশ নেমে তাড়া দেবার উদ্যোগ করছিল, সপ্তর্ষির বাবা বারণ করলেন—থাক, ওদের বিরক্ত কোরো না। বেশ লাগছে দেখতে। পেটভরে খেয়ে নিক বাচ্চাটা।

কিন্তু একটু বাদেই উলটোদিক থেকে আসা বড় একটা লরির এয়ার হর্নের বিকট আওয়াজে ভয় পেয়ে তারা দুজন ধানক্ষেতে নেমে গেল।

পাঁচথুপী ঠিক শহর নয়, আবার গ্রামও নয়। বসতির ভেতরে পথ ভাঙাচোরা, পথে ধুলো। বহুদিন আগে এখানে নাকি পাঁচটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। সেই কারণে নাম হয়ে পাঁচথুপী। বোধহয় পঞ্চস্তূপী থেকে। এখন অবশ্য আর স্তূপ নেই, তবে পোড়ামাটির সুন্দর মন্দির আছে একটা।

সেই পোড়ামাটির নবরত্ন মন্দিরের সামনেই রাস্তার ওপব কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ি দেখে তাঁরা এগিয়ে এলেন, সপ্তর্ষির বাবাও বললেন গাড়ি থামাতে।

মাঝারী গড়নের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন প্রৌঢ় মানুষ গাড়ির জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এই তো রেবতীবাবু। যাক, আপনি এসে গিয়েছেন, আর চিন্তা নেই—

সপ্তর্ষির বাবা হেসে বললেন—কেন, আমি আসব না এমন ভয় করেছিলেন নাকি?

—না দাদা, ঠিক তা নয়। আসলে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক তো, শহরের বড় বড় পণ্ডিতেরা আমাদের অনুষ্ঠানকে কতখানি গুরুত্ব দেবেন সেটা আমরা ঠিক করে উঠতে পারিনা। তবে আপনার ব্যাপার আলাদা, আমি সবাইকে বলেছি—দেখো তোমরা, রেবতীবাবু ঠিক সময়মত এসে যাবেন। চলুন দাদা, বিশ্রাম করে খেয়ে নেবেন। বিকেল চারটে থেকে সেমিনার। এটি ছেলে বুঝি? কী নাম খোকা? বাঃ বাঃ, বেশ—

একটা বিশাল বাড়িতে তাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। গল্পের বইতে এমন বাড়ির কথা পড়লেও বাস্তবে কখনো দেখেনি সপ্তর্ষি। সিংদরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথমে একটা বড় বাঁধানো চত্বর, ফুটবল খেলা যায় এত বড়। চত্বর পেরিয়ে রাধামাধবের মন্দির। তার সামনে নাটমন্দির, ভোগের ঘর। এসব পার হয়ে বাইরের মহল। মাঝখানে উঠোন ঘিরে তিনদিকে দোতলা বাড়ির ঘরগুলো দাঁড়িয়ে। কার্নিশে অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে, পলস্তারা খসে পড়ছে। একতলার টানা বারান্দার ওপরদিকে লোহার আঁকড়ি দিয়ে দুটো পুরনো পালকি ঝোলানো। এ দুটো মহল পার হয়ে তবে শুরু হয়েছে ভেতরের মহল। কতবার যে ডানদিকে-বাঁদিকে ফিরলো সপ্তর্ষি, কত অলিগলি পার হয়ে চললো, কত সরু সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠলো-নামলো তা মনে করে রাখা কঠিন। বাড়ির বর্তমান মালিক সুধীন্দ্রনারায়ণ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। এবার দোতলার একটা ঘরের সামনে থেমে তিনি বললেন—এইটেয় আপনারা থাকবেন। আপনার গাড়ির চালকের জন্য নিচে আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছি। লাগোয়া বাথরুমে জল দেওয়া আছে, হাত মুখ ধুয়ে নিন। দুপুরের খাবার এখানেই দেবে। কোনো অসুবিধে হলে বলবেন—

মেঝেতে সেকেলে পশমের আসন পেতে খাবার জায়গা হল। পরিবেশন করতে লাগলেন সুধীনবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে। মেয়েটি ভারি মিষ্টি দেখতে, নাম শ্রেয়া। বয়েসে সে সপ্তর্ষির চেয়ে কিছু বড় হবে। সুধীনবাবু পাশে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন। খেতে খেতে সপ্তর্ষির বাবা বললেন—কী বিরাট বাড়ি আপনাদের! অনেক পুরনো না?

সুধীনবাবু হেসে বললেন—হ্যাঁ, প্রায় তিনশো বছর।

—বলেন কী!

—তাই। তবে গত আশি-নব্বই বছরের মধ্যে আর মেরামত হয়নি। মেরামত করবার সঙ্গতিও নেই। সব আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে।

—কখানা ঘর আছে এ বাড়িতে?

—একশো চল্লিশটা।

রেবতীবাবু খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন—কটা?

—একশো চল্লিশটা। তবে এখন মাত্র চুরানব্বইটা ব্যবহার করা হয়।

—চুরানব্বইটা ঘর ব্যবহার করেন! লোক কজন আপনারা?

সুধীনবাবু বললেন—চারজন। হাসছেন? আসলে ঘরগুলো খুলে, ঝাঁট দিয়ে পরিচ্ছন্নও তো রাখতে হবে। ঘরের সব আলাদা আলাদা নাম আছে, জানেন?

—কী রকম?

—যেমন, এই যে ঘরটায় আপনি রয়েছেন, এটার নাম নীল ঘর। পাশেরটা সবুজ ঘর। তারপর আছে হলুদ ঘর। ফলের ঘর, খাটের ঘর, ফুলের ঘর, সেকালের কর্তাদের নামে নামে ঘর। আজ আর হবে না, কাল সকালে আপনাদের রাধামাধবের বিগ্রহ দেখাবো।

—এখনো পূজা হয়?

—রোজ। ওই একটা পুরনো রেওয়াজ বন্ধ হয়নি। তিনথালা অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। পূজারী আছেন, বংশানুক্রমিকভাবে তাঁরাই পুজো করে আসছেন।

খাওয়া দাওয়ার ঘন্টাখানেক পরে সুধীনবাবু সপ্তর্ষির বাবাকে সভার জায়গায় ডেকে নিয়ে চলে গেলেন।

সপ্তর্ষির ব্যাগে দু-তিনখানা বই ছিল। কোথাও বেড়াতে গেলে সে সঙ্গে পছন্দমত কিছু বই নেয়। একখানা বই নিয়ে সে বিছানায় আধশোয়া হয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বইয়ে কিছুতেই মন বসল না। পড়ন্ত বেলার রোদ্দুর খড়খড়িওয়ালা জানালা দিয়ে তার বিছানায় আর মেঝেতে এসে পড়েছে। রোদ্দুরের রঙটা কেমন যেন মন খারাপ করে দেয়, কবেকার সব ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ে। অনেক—অনেক আগেকার দিনের কথা। কিন্তু অতদিন আগের কথা কী করে মনে আসবে তার? তার তো মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস। তবু এই বাড়িটায় ঢোকামাত্র তার যেন কেমন অদ্ভুত মনের ভাব হচ্ছে, সামান্য জ্বর এলে যেমন একটা আরামদায়ক আলস্য ঘিরে ধরে।

নীল ঘর, খাটের ঘর, ফুলের ঘর। সুন্দর নামগুলো।

নির্জন, পুরনো বাড়িতে ঝিমঝিম করে ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। জানালার বাইরেই বাতাসে দুলছে বকুলগাছের ডাল। তার ছায়া পড়েছে মেঝেতে। এখনো আবহাওয়া ভাল, এরপর গরম বাড়তে শুরু করবে। সারাদিন হাঁসফাঁস গরমের পর বিকেলে ঝিলমিল দেওয়া বারান্দায় বসে আরাম করে বাদামের সরবৎ খাওয়া—আঃ।

হঠাৎ বিছানায় সোজা হয়ে বসল সপ্তর্ষি। আশ্চর্য তো। বাদামের সরবৎ কথাটা মাথায় এল কেন তার? বাদামের সরবৎ বলে সত্যি কিছু হয় নাকি? সে অন্তত কখনো খায়নি। তাহলে এমন একটা পানীয়ের নাম তার মনে এল কী করে? কোনো গল্পের বইতে পড়েছে কী? কে জানে!

দরজা দিয়ে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল—কী করছ? বই পড়ছ?

—হ্যাঁ। ভেতরে এসো, ওইখানে দাঁড়িয়ে কেন?

ঘরে ঢুকে খাটের এককোণে বসল শ্রেয়া। বলল—কেমন লাগছে আমাদের বাড়ি?

—খুব ভাল লাগছে। এতবড় বাড়ি আমি আগে কখনো দেখিই নি। শহরে আমাদের বাড়িতে মাত্র তিনটে ঘর, তাও ছোট ছোট। এমন মাঠও নেই। তোমরা কত মজায় থাকো—

—ঠিক বলেছ, কলকাতায় যেতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করল—তুমি কলকাতায় গিয়েছ?

—বছরে দুবার যাই, ভবানীপুরে আমার মামাবাড়ি।

শ্রেয়া বেশ পড়াশুনো করে, এ ব্যাপারটা সপ্তর্ষির বেশ ভাল লাগল। তার হাতের বইটা দেখিয়ে শ্রেযা জিজ্ঞেস করল—কী বই ওটা?

—অবনীন্দ্রনাথের রচনাসংগ্রহ, 'নালক' বলে লেখাটা পড়ছি। তুমি বই পড়তে ভালবাস?

—হুঁ-উ। বাবা অর্ডার দিয়ে ডাকে বই আনিয়ে দেন। আমি অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' পড়েছি। তুমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'চাঁদের পাহাড়' পড়েছ?

উৎসাহে সোজা হয়ে বসে সপ্তর্ষি বলল—'পড়েছি। উঃ, দারুণ বই! জানো, বড় হয়ে আমিও ওইরকম আফ্রিকায় অ্যাডভেঞ্চার করতে যাব। বাওবাব গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে থাকব আর পায়ে হেঁটে কালাহারি মরুভূমি পার হব। হীরের খনিও আবিষ্কার করব'—

শ্রেয়া বলল—আমিও যাব। বড় হয়ে।

সপ্তর্ষি একটু সন্দেহের চোখে তাঁর দিকে তাকাল। মেয়েরা কী এরকম অ্যাডভেঞ্চারে বের হয়? সচরাচর তো শোনা যায় না। তারপরেই তার মনে হল—হতেও পারে। মেয়েরা তো আজকাল অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে উঠছে, আফ্রিকায় যেতে বাধা কী?

শ্রেয়া বলল—চল, তোমাকে প্যাঁচা দেখিয়ে আনি। যাবে?

—প্যাঁচা? কোথায়?

—ভেতরমহলের দালানের কার্নিশে। এসো দেখাচ্ছি—

—আমাদের দেখলে উড়ে পালাবে না?

—নাঃ। ওরা দিনের বেলা দেখতে পায়না তো, সেজন্য চুপচাপ বসে থাকে। এসো—

আবার অনেক অলিগলি পেরিয়ে, অনেক সরু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে ওরা দোতলার তিনদিক ঘেরা একটা ছাদমত জায়গায় এসে পৌঁছল। তিনদিকের দেয়াল ওপরে উঠে চওড়া কার্নিশে শেষ হয়েছে। তারই একজায়গায় আঙুল তুলে নির্দেশ করে শ্রেয়া বলল—ওই দেখো।

দেখে সপ্তর্ষি অবাক। কার্নিশের ওপর একটু অন্ধকারমত কোণ বেছে নিয়ে পাশাপাশি চার-পাঁচটি প্যাঁচা গম্ভীরমুখে বসে আছে। এত কাছ থেকে এর আগে আর কখনো প্যাঁচা দেখেনি সপ্তর্ষি। লোকে খারাপ চেহারার সঙ্গে তুলনা করতে 'প্যাঁচার মত' বলে কেন তা

সে বুঝতে পারল না। এরা তো বেশ সুন্দর দেখতে। সপ্তর্ষি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তারাও অকুতোভয়ে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্রেয়া বলল—এরা কিন্তু সব লক্ষ্মীপ্যাঁচা, জানো? বাড়িতে থাকলে মঙ্গল হয়—

এইসময়ে শ্রেয়ারই বয়েসী আর একটি মেয়ে ভেতরবাড়ির দরজা দিয়ে ছাদে এল, শ্রেয়াকে দেখে বলল—এই যে, তুই এখানে, এদিকে আমি সারাবাড়ি খুঁজছি। লাইব্রেরীতে যাবিনা?

শ্রেয়া সপ্তর্ষির দিকে ফিরে বলল—ও আমার বন্ধু কুন্তলা। আমরা দুজন একটু লাইব্রেরীতে যাব মায়ের জন্য বই বদলে আনতে। কিছুক্ষণ একা থাকো, কেমন? অসুবিধে হবে না তো?

—না না, তুমি যাও। আমি বরং তোমাদের বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি—

—দেখো, হারিয়ে যেও না—

শ্রেয়া আর তার বন্ধুর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা পায়রা ডেকে উঠল—বাক্ বাক্ বাকুম্। বিকেলের রোদ্দুর মিলিয়ে আসছে একটু একটু করে। ছাদের ওধার দিয়ে যে সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেল, সেটা দিয়ে নামলে কোথায় পৌঁছানো যায়? দেখা যাক।

কয়েক ধাপ নেমে প্রথম বাঁকের পরেই আবছা আলো-আঁধারি। হাতড়ে হাতড়ে সাবধানে নামতে গিয়ে সপ্তর্ষির মনে হল—নাঃ, এ সিঁড়িটা বরাবরই বিপজ্জনক রইল। সেবার তো সে পা ফসকে পড়েই যাচ্ছিল, নেহাৎ বৃন্দাবন ধরে না ফেললে একেবারে মুখ থুবড়ে—

অন্ধকারেই সিঁড়ির মাঝামাঝি দেয়াল ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সপ্তর্ষি।

কবে সে এ বাড়িতে পা ফসকে পড়ে যাচ্ছিল! বৃন্দাবনই বা কে?

ভয়ের একটা অনুভূতি গুলি পাকিয়ে বুক বেয়ে গলার কাছে উঠে আসছে। চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বুক ঢিপ-ঢিপটা কমলে অবশ্য তার মনে হল—এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? ইস্কুলে মাস্টারমশাইরা বলেন—'সপ্তর্ষি, তুমি বড় কল্পনাপ্রবণ।' এত পুরনো বাড়ি দেখে মনে মনে সে নানারকম কল্পনা করতে শুরু করেছে, এছাড়া অন্য কারণ কিছু নেই।

আবার সে নামতে আরম্ভ করল। একতলার লম্বা একটা বারান্দায় সিঁড়ি শেষ হল। মেঝেতে পুরু ধুলো আর চামচিকের নাদি পড়ে আছে। এই মহলে লোকজন কেউ বাস করে না। সারি সারি তালাবন্ধ ঘর, কবজায় মরচে ধরে রয়েছে। কারা বাস করত এইসব ঘরে?

একটু এগিয়ে সরু একটা গলি। কিছু না ভেবেই সপ্তর্ষি ডানদিকের বাঁক নিল। কেন, তা সে জানে না। গলির পরে নাটমন্দির। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে বিশাল কাঠের দরজায় শেষ হয়েছে। দরজায় সিঁদুর আর চন্দনের দাগ। ওঃ, এটাই তাহলে রাধামাধবের মন্দির। হ্যাঁ, এ জায়গাটা রোজ পরিষ্কার করা হয়। ধুলোময়লা নেই। নাটমন্দিরের ছাদ এক-জায়গায় ভেঙে পড়েছে। সেখান দিয়ে আসা পড়ন্ত, ম্লান আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছে চারদিক।

—ছোটকর্তা যে!

চমকে ফিরে তাকাল সপ্তর্ষি।

একজন খুব বুড়ো মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন নাটমন্দিরের ওপাশের বারান্দায়। খাটো ধুতি পরা, খালি গা, টকটকে রঙ। বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি আর লম্বা সাদা চুলে মানুষটাকে মানিয়েছে খুব ভাল!

মানুষটি আবার বললেন—খবর কী ছোটকর্তা? দেখতে এলেন বুঝি সব কেমন আছে?

সপ্তর্ষির ভয় কেটে গিয়েছে, সে বলল—আপনি কে?

—আমি রামগতি। রামগতি ভট্টাচার্য। অনেকদিন তো হল, আপনি সব ভুলে গিয়েছেন, হেঃ হেঃ হেঃ। আসুন, আসুন—

বুড়োমানুষেরা এমন সব কথা বলে যার কোনো মানে হয় না। কী ভুলে গিয়েছে সে? তাকে ছোটকর্তা বলেই বা কেন ডাকছেন এ ভদ্রলোক? তবে লোকটি বেশ ভাল, কেমন আপন মানুষের মত।

সে পায়ে পায়ে নাটমন্দির পার হয়ে রামগতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রামগতি সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হুঁ, নব কলেবর। তা ভাল, ভাল—

রামগতির পায়ে সেকেলে বউলওয়ালা খড়ম, গলায় সাদা ধপধপে মোটা পৈতে। সপ্তর্ষি বুঝল ইনিই সেই পুরোহিতমশায়, যাঁর কথা শ্রেয়াব বাবা বলছিলেন। সে জিজ্ঞাসা করল—আপনি বুঝি এইখানেই থাকেন?

একগাল হেসে রামগতি বললেন—আব কোথায় যাব ছোটকর্তা? সবাই চলে গেল, আমিই কেবল একা পড়ে রইলাম। আব কোথাও যেতে ইচ্ছেও করেনা। বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছে কিনা বাড়িটার ওপরে!

বিকেলের ছাযা আরও ঘন হয়ে এসেছে। খিলানেব ওপর কয়েকটা পায়রা উড়ে এসে বসল।

সপ্তর্ষি বলল—সন্ধ্যেবেলা রাধামাধবের পুজো হবে না?

—হবে। আরতি হবে, তারপর শীতল ভোগ দিয়ে ঠাকুরের শয়ন দেওযা হবে।

—আপনি কোন ঘরে থাকেন?

রামগতি বললেন—ভোগের ঘরের পাশে আমার সেই পুরনো ঘরখানাতেই। আসুন না কেন—

খড়মের খটাখট শব্দ তুলে রামগতি এগিয়ে চললেন। মন্দির বাঁয়ে রেখে সরু গলিটা কিছুদূর এগিয়ে যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে একটা ভেজানো দরকার সামনে দাঁড়ালেন। হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে অল্প আলোতে চোখে পড়ে দেয়ালের ধারে খাট, মেঝেতে কুশাসন পাতা, তার সামনে গঙ্গাজলের পাত্র, কোশাকুশি। সন্ধ্যেবেলা আহ্নিক করবেন রামগতি, তার জোগাড় করা আছে। ঘরে ঢুকে একটা জলচৌকি সপ্তর্ষিকে এগিয়ে দিলেন তিনি, নিজে বসলেন কুশাসনে।

ঘরের মধ্যেটায় যেন একশো কী দুশো বছর আগেকার বাতাস থমকে আছে। আবহাওয়ায় প্রায় মিলিয়ে আসা মৃদু ধূপের গন্ধ। দুশো বছরের ওপার থেকে কাদের যেন খুব চেনা গলার আওয়াজ আবছা কানে আসে। কারা যেন খুব ভালবাসত, খুব আপন ছিল—এই বাড়িটায় থাকত তারা।

বাইরের দালানে পায়রার ডানার ঝটপট শব্দে বৈকালী নির্জনতা আরও গাঢ় হয়ে আসে।

সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করল—বাড়ির এদিকটাতে তো কেউ থাকে না। আপনার ভয় করেনা একা থাকতে?

রামগতি হেসে বললেন—নাঃ, ভয় করবে কেন? এ আমার চেনা জায়গা, ছোটবেলা থেকে এখানে বড় হয়েছি। তাছাড়া রাধামাধব যেখানে রয়েছেন সেখানে আর ভয় কী?

—আপনি কী করেন সারাদিন?

—পাহারা দিই। সারাদিন, সারারাত্তির।

অবাক হয়ে সপ্তর্ষি বলল—সে কী! কী পাহারা দেন আপনি?

রামগতি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন—সবকিছু। এই বাড়িঘর, মন্দির, ভাঙা পালকি, খসে পড়া কড়িবরগা, ফেলে আসা দিনগুলো—সেগুলোকেই বেশি করে পাহারা দিতে হয়, নইলে পালিয়ে যাবে কিনা।

পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এ কথাগুলো সপ্তর্ষির খুব ভাল লাগল।

রামগতি আবার বললেন—আর সেই জিনিসটা তো রয়েইছে, সেটাও পাহারা দিতে হয়।

এই কথাটা রামগতি বললেন প্রায় ফিসফিস করে, তাঁর গলার স্বরে রহস্যের ছোঁয়া।

কিসের কথা বলছেন রামগতি? সপ্তর্ষি জিজ্ঞাসা করল—কোন জিনিসটা?

—হেঃ হেঃ হেঃ, ছোটকর্তা সব ভুলে গিয়েছেন। আপনিই তো লুকিয়ে রাখবার জন্য আমাকে দিয়েছিলেন। মেজকর্তার তখন মতিগতি ভাল নয়, তাঁর হাতে পড়লে কী হয় ঠিক নেই—তাই আমাকে দিলেন।

সপ্তর্ষি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে রামগতি বললেন—মনে পড়ছে না? আচ্ছা, আসুন—

খড়মের শব্দ তুলে আবার অন্ধকার গলিপথ পার হতে লাগলেন রামগতি। নাটমন্দিরের পেছনে ভোগের ঘরের ঠিক পাশ দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে যেন মাটির তলায়। বৃদ্ধ পুরোহিত সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চললেন। একটু ইতস্তত করে সপ্তর্ষি তাঁকে অনুসরণ করল। এখানে বোধহয় বাতাস চলাচল করেনা, কেমন ভ্যাপসা গন্ধ পরিবেশে। সিঁড়ি নেমে শেষ হয়েছে একটা ছোট্ট চৌকো ঘরে। কিছু নেই সেই ঘরে, কেবল কোণের দিকে ইঁট দিয়ে গাঁথা বেশ বড় একটা চৌবাচ্চা। রামগতি চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—এই যে, এটার নিচেই আমি আর আপনি রাত্তিরবেলা লুকিয়ে ফেলেছিলাম মূর্তিটা। জগদ্ধাত্রী মূর্তি। ওপরে আবার ইঁট পেতে মশলা দিয়ে গেঁথে দিয়েছিলাম। ঠিক এই কোণটাতে—

কাঁপা গলায় সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করল—কিসের চৌবাচ্চা এটা?

—গঙ্গাজলের। নিত্যপূজার গঙ্গাজল বহরমপুর থেকে পেতলের বড় বড় পনেরো কুড়িটা জালায় ভর্তি করে গরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়ে নিয়ে আসা হত। বছরে একবার, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, চৌবাচ্চার পুরনো জল বের করে, পরিষ্কার করে, আবার নতুন জল ভর্তি করা হত। ওই অক্ষয় তৃতীয়ার রাতেই তো আমরা মূর্তিটা লুকোলাম—

সপ্তর্ষি বলল—গরুর গাড়িতে কেন, বাসে আনলে তো তাড়াতাড়ি হয়—

এবার রামগতি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাস কী?

ব্যাপারটা সপ্তর্ষির কেমন যেন লাগল। যতই সেকেলে মানুষ হোন না কেন, বাস দেখেন নি তাও কী হতে পারে? পাঁচথুপী থেকেই তো রোজ কত বাস ছাড়ে।

রামগতি বললেন—চলুন ছোটকর্তা, ওপরে যাই। জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে ভালই করলাম, আপনি তো সব ভুলেই গিয়েছিলেন—

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে অন্ধকার গলির বাঁকে দাঁড়িয়ে রামগতি বললেন—আসি তাহলে?

সপ্তর্ষি বলল—আবার যদি কখনো আসি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়ে রামগতি বললেন—সে কথা বলা যায় না, সে বলা মুশকিল। আচ্ছা—

তাঁর খড়মের আওয়াজ মিলিয়ে গেল বাঁকের ওধারে।

একা একা ফিরে চলল সপ্তর্ষি। তার চারদিকে নামছে মন খারাপ করে দেওয়া সন্ধ্যা।

সে রাত্তিরে যতবার তার ঘুম ভাঙল সে শুনতে পেল লক্ষ্মীপ্যাঁচার ডাক।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে গরম গরম আটার লুচি আর আলুচচ্চড়ি দিয়ে দারুণ ব্রেকফাস্ট হল।

সুধীনবাবু বললেন—তাড়াতাড়ি ঝোলভাত করে দিচ্ছি, আপনারা খেয়েদেয়ে রওনা হন—

সপ্তর্ষির বাবা বললেন—না ভাই, তার উপায় নেই। বিকেল পাঁচটার মধ্যে আমার বাড়ি পৌঁছাতে হবে। সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে—

—বেশ, তাহলে চা খেয়ে নিন, তারপর আপনাদের রাধামাধবের বিগ্রহ দেখিয়ে আনি।

আবার সেই নাটমন্দির, ভোগের ঘর, চকমিলানো দালান। রেবতীবাবু ভাবপ্রবণ কবিপ্রকৃতির মানুষ, প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবারের ভদ্রাসন দেখে তিনি ভারি খুশি। বললেন—সত্যি, এসব দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। শিক্ষিত আর ধনী দেশ হলে জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে এ বাড়ি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। কই, মন্দির তো বন্ধ দেখছি—

সুধীনবাবু বললেন—তাই তো! পুরোহিত আজ দেরি করছে কেন?

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের ধুতি পরা চাদর গায়ে লোক নাটমন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকে বলল—এই যে সুধীনদা, একটু দেরি হয়ে গেল আজ—

সুধীনবাবু তাকে বললেন—নাও, তাড়াতাড়ি মন্দির খোলো, এঁরা বিগ্রহ দেখবেন—

তারপর সপ্তর্ষির বাবার দিকে ফিরে বললেন—এই হচ্ছে দুর্গাগতি, বর্তমান পূজারী।

দুর্গাগতি মন্দিরের তালা খুলছে, সপ্তর্ষি আশ্চর্য হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। এই লোকটা বর্তমান পূজারী। তাহলে গতকাল বিকেলে যার সঙ্গে পরিচয় হল সেই রামগতি কে? রামগতি আর দুর্গাগতি—নামদুটোও তো বাপ-ব্যাটা কিম্বা দুই ভাইয়ের বলে মনে হচ্ছে।

কথা বলতে বলতে রেবতীবাবু আর সুধীন্দ্রনারায়ণ একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সপ্তর্ষি দুর্গাগতিকে জিজ্ঞাসা করল—আপনার বাবা রামগতি ভট্টাচার্য এখন কী আর পুজো করেন না?

বিশাল তালায় চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে দুর্গাগতি চমকে তার দিকে তাকিয়ে বলল—রামগতি আমার বাবা না তো, আমার ঠাকুর্দার বাবা। তিনি আর কী করে পুজো করবেন? তিনি তো মারাই গিয়েছেন আজ একশো বছরের ওপর। তুমি তাঁর নাম কী

করে জানলে? ওঃ, বুঝেছি—সুধীনদা গল্প করেছেন।

সপ্তর্ষি আস্তে করে সেখান থেকে সরে এল।

বলে কী লোকটা! একশো বছরের ওপরে মারা গিয়েছে মানে? কাল তাহলে সে কার সঙ্গে গল্প করল?

বাবা এখনো কথা বলছেন সুধীনবাবুব সঙ্গে। সপ্তর্ষি চট করে নাটমন্দিরের ওপাশ দিয়ে সরু গলিটায় গিয়ে পড়ল। এই সকালবেলাতেও গলিটা আবছা অন্ধকার। একটু এগিয়ে রামগতির ঘর। সে ঘরের ধুলো-ময়লা পড়ে আছে কতদিনের। এ দরজা অন্তত বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে কেউ খোলেনি।

কিন্তু এই ঘরটার মধ্যে বসে গতকাল বিকেলে সে রামগতির সঙ্গে কথা বলেছে।

সপ্তর্ষির আর একটুও ভয় করছে না। বরং খুব মহৎ কিছু, সুন্দর কিছুর মুখোমুখি হলে মনে যে শান্ত আনন্দের ভাব জাগে, তাই জাগছে।

মন্দিরের সামনে ফিরে আসতে আসতে সপ্তর্ষি শুনতে পেল সুধীনকাকা এখনো তার বাবাকে পুরনো দিনের গল্প শোনাচ্ছেন। তিনি বলছেন—সেকালের মানুষগুলো সবদিক দিয়েই বড় হত, কী চেহাবায়, কী মনে। আমার প্রপিতামহের আমলে আমাদের এক কর্মচারী ছিল, তার নাম বৃন্দাবন। শুনেছি সে নাকি একবার আমাদেব বাড়ি ডাকাত পড়লে কেবল লাঠি ঘুরিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল। এজন্য কিছু পুরস্কার দিতে যাওযা হয়েছিল, সে নেয়নি। বলেছিল—আজন্ম এ বাড়িতে আছি, মববও এখানে। ও নিয়ে করব কী? রাখব কোথায?

বৃন্দাবন! এই নামটাই সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কাল তার মনে এসেছিল।

চারদিকে তাকাল সপ্তর্ষি। এই বিরাট বাড়িটার সঙ্গে একদিন তাব খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর ঘরে ঘবে বাস করত তার প্রিয়জনেরা। ভাগ্য আজ তাকে এখানে এনে তার চোখেব সামনেব আবরণ সরিয়ে দিয়েছে। গল্পের বইতে এমন ঘটনা পড়েছে সপ্তর্ষি। বাস্তবেও হয় তাহলে।

সুধীনকাকাদের অবস্থা এখন পড়ে গিয়েছে। এ সময় যদি বেশ কিছু টাকা হাতে পান তাহলে বাড়িটা মেরামত করতে পারেন, শ্রেয়ার খুব ভাল বিয়ে দিতে পারেন—আরও কত কী ভাল কাজে লাগাতে পারেন।

চৌবাচ্চার নিচে গাঁথা রয়েছে মূর্তিটা। রামগতি বলেছিলেন—ধাতুর তৈরি। কী ধাতু? সোনা? রুপো? যাই হোক না কেন, তার দাম অনেক—অনেক হবে। জিনিসটা ন্যায্যত সুধীনকাকার প্রাপ্য। আর কতদিন ওটা পড়ে থাকবে ওখানে?

মূর্তিটার সন্ধান সে বলে দিলে হৈ চৈ হবে, সবাই তাকে প্রশ্ন করবে, বিরক্ত করবে। কিন্তু সুধীনকাকার খুব উপকার হবে। অবশ্য সুধীনকাকাকে বলে দেওয়া যায় তিনি যেন সপ্তর্ষির নাম কাউকে না বলেন।

বিগ্রহ দেখবার জন্য তার বাবা তাকে ডাকছেন।

সে এগিয়ে গেল। তারপর সুধীন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল—কাকা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

ঠিকানা

প্রেমময় যেন আমাদের অফিস ছেড়ে রিটায়ার করে চলে গিয়েছেন বেশ কয়েকবছর আগে। তাঁর একটা বিদায় সম্বর্ধনাও আমরা সবাই মিলে আয়োজন করেছিলাম। তারপর যা সচরাচর হয়ে থাকে 'আপনাকে কী ভোলা যায়?' বা 'মাঝে মাঝেই দেখা হবে' প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্রেমময় সেনকে শতকরা একশো ভাগ ভুলে গেলাম। এটাই স্বাভাবিক। এরকমই হয়।

হঠাৎ অ্যাকাউন্টসের বিমলবাবু এসে বললেন—আনন্দ, প্রেমময় সেনকে মনে আছে?

তা আছে। কেন, তাঁকে নিয়ে কী হল আবার।

—ভদ্রলোকের প্রভিডেন্ট ফান্ড আর এটা সেটা মিলিয়ে শ'চারেক টাকা পাওনা রয়ে গিয়েছে, এতদিন বাদে ডিরেক্টর সাহেবের মনে হয়েছে ওটা দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কর্মচারীদের কাছে বেশ একটা চমকপ্রদ জেশ্চার—মানে রিটায়ার হয়ে গেলে পুরানো কর্মচাবীর পাওনা টাকা এ কোম্পানী মিটিয়ে দেয় এই আর কী।

—তাতে?

—তাতে এই যে, প্রেমময়বাবুর ঠিকানা খুঁজে তোমাকেই টাকাটা দিয়ে আসতে হবে। ঠিকানা জানো?

—উঁহু। ভদ্রলোক হাওড়ায় ভগ্নীপতিব বাড়ি থেকে চাকরী করতেন। রিটায়ার করে নিশ্চয় নিজের বাড়ি চলে গেছেন।

বিমলবাবু দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কী ভাবলেন তারপর বললেন—বাড়ির ঠিকানা জানো না?

—না।

—তাহলে টাকাটা নিয়ে যাও আজই। কাল অফিসে না এসে একেবারে বাড়ি থেকে সোজা হাওড়া চলে যাও। দেখো প্রেমময়বাবুর ভগ্নীপতি ঠিকানা দিতে পারেন কিনা। বোধ হয় পারবেন।

—আর এদিকে?

—এদিকে আমি বড়বাবুকে বলে অন ডেপুটেশন কাল তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। ভেবো না—

পরের দিন সকাল আটটায় ভেতরে এগারো নম্বর মধুসূদন বিশ্বাস লেনের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। ভগ্নীপতি লোকটা নিশ্চয় চাকরী-বাকরী করে—এর পরে এলে দেখা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক কী?

দরজা খুললেন এক মহিলা।

—কী চাই?

—দুলালবাবু—

—আমার স্বামী।

—আছেন?

—আছেন।

—একটু দেখা করতে পারি কি?

—পারেন। বসুন।

বসলাম। দেওয়ালে অবশ্যম্ভাবী তারাপীঠের মা-কালী, প্যারিস প্লাস্টারের চাকতিতে রামকৃষ্ণ সারদামণি এবং হ্রদ-নৌকো-সূর্য-ডুবছে ছবিঅলা ক্যালেন্ডার। বেতের চেয়ারের ফাঁকে ছারপোকা। কামড়াচ্ছে।

গামছাপরা লোমশদেহ মধ্যবয়েসী দুলালবাবুর প্রবেশ।

—কিছু মনে করবেন না। অফিসে যাব, স্নান করতে যাচ্ছিলাম। কী দরকার?

—প্রেমময় সেন আপনার শ্যালক?

—হ্যাঁ। তিনি এখন এখানে থাকেন না।

—কোথায় থাকেন?

—জানি না। জানবার আগ্রহ নেই।

জটিল ব্যাপার। বললাম—আজ্ঞে?

—ঠিকই বলছি। দশ বছর আমার এখানে থেকেছে, খেয়েছে, একটা পয়সা ঠেকায় নি। কথা ছিল রিটায়ারমেন্টের সময়ে থোক কিছু দিয়ে যাবে। কোথায় কী? সর্বস্ব নিয়ে কাল আসছি বলে ভোঁ ভাঁ। আমি মশাই স্বীকারই করিনা যে সে আমার আত্মীয়।

—ও। আচ্ছা, আসি তাহলে। বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না—

দুলালবাবু বড্ডই লোমশ, কিন্তু লোক ভাল। বললেন—কানাঘুষোয় শুনেছি সে থেকে তার খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন ছিল। সেখানে একবার খোঁজ নিতে পারেন।

—ঠিকানা?

—উত্তরপাড়া। দশনম্বর শ্যামসাগর মুখার্জী রোড।

দশ নম্বর। কড়া নাড়লাম। মহিলা। বসবার ঘর। কেঠো চেয়ার। ছাড়পোকা নেই। দেওয়ালে সন্তোষী মা এবং একটি পুরুষ্টু টিকটিকি।

—বলুন?

—আপনি প্রেমময়বাবুর ভাই?

—কত পান?

—অ্যাঁ?

—আপনার কী মুদিখানা? না লন্ড্রী? না মিষ্টির দোকান? একবছর ছিল, সব দোকানে আমার নাম করে ধার খেয়ে রেখেছে। ফ্যামিলি প্রেস্টিজের দায়ে আমি মিটিয়ে চলেছি।

—আজ্ঞে না, আমার তেমন কোনো ব্যাপার নয়। কেবল ঠিকানাটাই চাইছিলাম—

—ঠিকানা জানিনা। তবে দেশের বাড়িতে এক বার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

—কোথায়?

—বাউরিয়া স্টেশনে নেমে দু-মাইল গ্রামের ভিতরে ঢুকতে হবে। বাউরিয়ার নাম শুনেছেন? উলুবেড়িয়ার আগে।

ঠিকানা নিলাম। বেলা সাড়ে-এগারোটা। আজ সেরেই ফেলি।

বাউরিয়া স্টেশন। রিকসাওয়ালা বলল দেবপুর গ্রামে যেতে সে ভাড়া নেবে দু'টাকা। আজকের খরচ সবই কোম্পানির এক্সপেন্স শীটে তুলে দেব। কাজেই রিকসা নিলাম।

দেবপুর গ্রামে পৌঁছে আমার ঘোরতর সন্দেহ হল প্রেমময় সেনের খুড়তুতো ভাই যথার্থ ঠিকানা দিয়েছেন কিনা। প্রথমত জিজ্ঞাসা করার মত ভারিক্কী কাউকে কাছাকাছি দেখতে পেলাম না। একেবারে অজ পাড়াগাঁ। একটা বড় দোকান বা অন্য কিছুও নেই যেখানে কারো খোঁজ করা যায়। দ্বিতীয়ত যেসব ক্রীড়ারত দু-একটি বাচ্চাকে প্রশ্ন করলাম, তারা ভ্যাবলার মত হ্যাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোম্পানির খরচ আজকের মত এখানেই থামিয়ে দেব কিনা, এমন সময় পেছন থেকে গম্ভীর গলায় কে বলল—মশায় কী কাউকে খুঁজছেন?

দৈববাণী।

ফিরে তাকিয়ে অবশ্য খুব শ্রদ্ধা হল না। রোগা মত, উস্কো খুস্কো চুলওয়ালা, আধময়লা জামা কাপড় পরনে, লালচোখ নোংরামত একজন লোক। যাই হোক, এ অন্তত নাবালক নয়।

বললাম—এ গ্রামে কী প্রেমময় সেন বলে কেউ থাকেন? তাঁর ঠিকানাটা—

লোকটা হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—বুঝেছি, আমার সঙ্গে আসুন—

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চেহারা খবিশ হলেও লোকটা দেখছি খবরাখবর রাখে। কথাটাও শেষ করতে দিল না, পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল—জানি, আসুন।

যেতে যেতে বললাম—বাঁচালেন আপনি! কেউই বলতে পারছিল না ঠিকানাটা—

লোকটা হেঁড়ে গলায় বলল—খুব সোজা, মানুষের ঠিকানা জানার চেয়ে সোজা আর কী আছে?

—তা তো ঠিকই। তবু তো কেউ বলতে পারল না—

—জানে সবাই, খেয়াল রাখেনা।

তারপরেই সেই দুপুরের রোদেজ্বলা দিনে এক বিরাট প্রান্তরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার পথপ্রদর্শক। প্রান্তরের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণ নদী। একটা ম্লান শিমুল গাছ। প্রান্তরেব উদাস প্রসারে চিতা জ্বলছে এখানে ওখানে, ধোঁয়ার সাময়িক স্তম্ভ সোজা উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। ঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে পারার গৌরবে উজ্জ্বল মুখে পথপ্রদর্শক একটি হাত প্রান্তরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বলল—ঠিকানা। সবার।

ইস্কাপনের বিবি

অলৌকিক ঘটনার মধ্যে যে ভূত থাকতেই হবে এমন কোনো মানে নেই। যা সচরাচর ঘটে না অথবা ব্যাখ্যার অতীত, এমন ঘটনাকেও অলৌকিক বা অপ্রাকৃত বলে লেবেল মেরে দেওয়া যায়। আমার জীবনে এরকম কিছু অভিজ্ঞতা আছে, একটি এখন বলা যাক—অন্যগুলি সময়ান্তরে পত্রস্থ করা যাবে। এটিকে অলৌকিক না বলে অদ্ভুত সমাপতনের কাহিনী বলা যেতে পারে। অন্তত সেইভাবে এর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু সমাপতনের চেয়ে অলৌকিক আর কী আছে?

বৈশাখের খর রৌদ্রময় দুপুর। তখন এম. এ. পড়ি। রবিবার বা অন্য কী কারণে ইউনিভার্সিটি ছুটি ছিল। আমি বাইরের ঘরে শীতলপাটি পেতে শুয়ে পুশকিনের 'কুইন্ অফ্ স্পেড্স্' পড়ছিলাম। কয়েকদিন আগে গ্রোলিয়ার সোসাইটির 'গেটওয়ে টু দি গ্রেট

বুকস্'-এর সেট কিনেছিলাম—তারই একটা খণ্ডে রয়েছে গল্পটা। এই রুশ গল্পটিই আমার কাহিনীর মূল উপজীব্য। বিখ্যাত ভয়ের গল্প। দুপুরে শুয়ে শুয়ে পড়ছি, বাইরে কড়া রোদ্দুর এবং গরম বাতাস, রীতিমত দিনের বেলা যাকে বলে। অথচ বার বার আমার ঘাড়ের কাছে শির-শির করছিল, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল একটু বাদে বাদেই।

রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে ঘণ্টাদুয়েককে শেষ করে ফেললাম। তখন বেলা পড়ে আসছে। আমার হাতে সময় নেই বেশি, পরিচিত এক ভদ্রলোকের বিয়েতে বরযাত্রী যাবার নেমন্তন্ন আছে, তার জন্য তৈরি হতে হবে। তখনো মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে গল্পের রেশ, আবিষ্ট মন নিয়ে দাড়ি কামাতে বসলাম।

আমার অলৌকিক ঘটনার এখানেই শুরু। কিন্তু তখন আমি কিছু বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম পরে। যেভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল সেভাবেই বলি।

সেদিন রাত্তিরে বরযাত্রী গিয়ে তোফা খাওয়া-দাওয়া করি এবং সবাই মিলে হৈ হৈ করতে করতে ফিরি। এর একটা উপসংহার আছে—সেটা শেষে বলবো, কারণ সেটা পরেরই ঘটনা।

সে বছরই শীতকালে এক বন্ধুর গাড়িতে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। গ্রামের দিকে বেড়াবার চিরদিনই খুব শখ ছিল। বন্ধু ও বন্ধুর বৌ এবং আমার মাসতুতো ভাই। কলকাতা থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে একটা গ্রামে সারাদিন কাটিয়ে ফিরছি আমরা। দুপুরে সতরঞ্চি বিছিয়ে দুধের মত সাদা-ফুল-ফোটা সজনে গাছের নিচে বসে বাড়ি থেকে আনা লুচি-তরকারি খাওয়া হয়েছে, নদীতে নৌকো চড়ে বেড়ানো হয়েছে—সবমিলিয়ে একটা সার্থক দিন।

শীতের বেলা চটপট ফুরিয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে এল। আমরাও আর দেরি না করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। বন্ধু আর তার বৌ সামনে, আমি আর ভাই পেছনে। সে সময় আমার একটা ছাইরঙা টুইডের কোট ছিল, কোটটা পরে চুরি হয়ে যায়—সেটা পায়ের ওপর দিয়ে বিছিয়ে দু'ভাই আরাম করে বসে সিগারেট টানছি। জানালার কাচ তোলা, ভেতরে বেশ একটা নিরাপদ উষ্ণতা। বন্ধুর বৌ ভাল গান করে। সে একখানা টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলো। গান থামতে বন্ধু আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, তারাদাস—এবার তুই একটা গল্প বল। ভূতের গল্প হওয়া চাই। কী শীত পড়েছে দেখেছিস? ভূতের গল্প দারুণ জমবে।

আমি গল্প বলতে ভালবাসি। ঠাকুরদা কথক ছিলেন, বোধহয় সেজন্যই আমার রক্তে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গল্প বলবার প্রবণতা আছে। যখন ইস্কুলের ছাত্র, মাস্টারমশায়রা প্রায়ই আমাকে ডেকে ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গল্প বলতে বলতেন।

বললাম, ঠিক আছে, তোদের একটা দুর্দান্ত ভূতের গল্প শোনাচ্ছি। পুশকিনের 'কুইন্ অফ্ স্পেড্স্' পড়েছিস?

বন্ধু বলল—না।

—তাহলে সেটাই বলি, শোন।

হু হু করে ছুটেছে গাড়ি। গ্রাম্য রাস্তা, যদিও পিচ দিয়ে বাঁধানো। শীতের রাত্তির—পথে লোকজন চোখে পড়ে না। দু' ধারে বড় বড় চটকা গাছের সারি। নতুন সিগারেট ধরিয়ে গল্প শুরু করলাম।

এক ছিল আশী বছর বয়েসের বুড়ি। টাকা-পয়সার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বুড়ি বিয়ে করেনি। একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাব। সে জুয়াড়িদের বলে দিতে পারতো কোন তাসের ওপর বাজি ধরলে তারা জিতবে। হারম্যান বলে এক জুয়াড়ি, বয়েসে যুবক, একদিন গভীর রাত্তিরে বুড়ির পরিচারিকার সাহায্যে বাড়িতে ঢুকে বুড়িকে চেপে ধরলো, বলো কোন তাসের ওপর বাজি ধরলে আমি জিতবো। বুড়ি বলবে না কিছুতেই। হারম্যান তখন ক্ষিপ্ত হয়ে নানারকম নির্যাতন শুরু করলো—সহ্য না করতে পেরে বুড়ি মারা গেল। হারম্যান গেল পালিয়ে। তিনদিন পরে কবর থেকে বুড়ির মৃতদেহ উঠে গিয়ে হাজির হল হারম্যানের ফ্ল্যাটে—তিনটি তাসের নাম বলে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পরের দিন সেই তিনটি তাসের ওপরে বাজি ধরল বেচারা জুয়াড়ি। দুটোতে সে জিতল। তিন নম্বর তাসটি হওয়া উচিত ছিল রুহিতনের দুই—কিন্তু উল্টে দেখা গেল সেটি ইস্কাপনের বিবি। শুধু তাই নয়, ইস্কাপনের বিবির মুখের বদলে সেখানে যেন বুড়ির মুখ আঁকা—তার দিকে তাকিয়ে ক্রূর হাসি হাসছে৷ পাগল হয়ে গেল বেচারা হারম্যান।

গল্পটা পুরোপুরি শেষ করতে পারলাম না, তার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। রাস্তার বাঁদিক থেকে একটা লোক, সমস্ত দেহ তার সাদা চাদরে ঢাকা, দৌড়ে এসে উঠলো পথের ওপরে গাড়ির একেবারে ঠিক সামনে! তখন আব কিছু কবার ছিল না, তবু বন্ধু হুর্নের ওপর হাত চেপে হ্যাঁচকা দিয়ে স্টিযাবিং ডানদিকে এক টানে যতটা ঘোরানো সম্ভব ঘুরিয়ে নিল এবং একই সঙ্গে ব্রেকও কষলো। কিছু ফল হল না, বাঁদিকের হেড-লাইটের কাছে লোকটার গায়েব সঙ্গে লাগল ধাক্কা। ছোট্ট ফিয়াট গাড়ি, ওই ধাক্কাতেই দুলে উঠে থেমে গেল। লোকটা ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশে।

আমরা মূর্তির মতো বসে আছি। ভাই আমার হাত চেপে ধরেছিল, টের পেলাম তার হাত ঘেমে উঠছে। আমার হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এসে লাফাচ্ছে। বন্ধুর বৌ সীটে হেলান দিযে এলিয়ে পড়েছে।

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়নি, গিযার নিউট্রাল করে বন্ধু স্টিয়ারিং মুঠো করে বসে, এই শীতেও তার কপালে ঘাম। সাদা চাদরে ঢাকা মানুষটা ধাক্কা লেগে পথের ধারে সেই যে চিত হয়ে পড়ে আছে, আর ওঠেনি। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, কী করবি এখন?

বন্ধু বলল, লোকটাকে তুলে নিই, সামনে যে হাসপাতাল পাবো তাতে দিয়ে দেবো—

সায় দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ লোকজনের উত্তেজিত গলার আওয়াজ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম অনেকখানি দূরে একটা ছোট্ট বাজার মত জায়গা থেকে জন-পঞ্চাশেক মানুষ হৈ হৈ করতে করতে দৌড়ে আসছে। তাদের হাতে লাঠিসোঁটা পাথর ইত্যাদি। বন্ধুর নার্ভ ফেল করল। লোকটিকে তুলে নেবার জন্য আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। গ্রাম্য জনতা ক্ষিপ্ত হলে পিতার অনুরোধও কর্ণপাত করে না। সঙ্গে বৌ রয়েছে। হুশ্ করে সে গাড়ি চালিয়ে দিল। মাইল দুই পথ নীরবে কেটে যাওয়ার পর বন্ধু ভাঙা গলায় বলল, কী গল্পই শুরু করেছিলি, ভাই, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

আপত্তি করতে গিয়ে থেমে গেলাম। আমি হাঁচি-টিকটিকি ইত্যাদি মানি না। তবু মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছিল। গল্পটা বলতে বলতেই তো দুর্ঘটনা ঘটলো। ভারি অপয়া গল্প তো!

কোনো স্মৃতিই বেশিদিন মানুষের মন অধিকার করে থাকে না। 'ইস্কাপনের বিবি'

সম্বন্ধে মনে যে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আস্তে আস্তে ভুলে গেলাম।

এর মাস কয়েক পরের কথা।

আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে তুমুল আড্ডা জমে উঠেছে। সে সময় প্রায় রোজই বিকেলে মুড়ি জিলিপি সিগারেট সহযোগে রাত দশটা পর্যন্ত সাহিত্যের বৈঠক হত বাড়িতে। বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ্‌ করে, একজন স্বরচিত কবিতা শুনিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। জানালা দিয়ে ভেজা হাওয়া আসছে হু হু করে।

হঠাৎ স্বপন বলল—কবিতা রাখ্‌ দিকিনি। বর্ষার দিন, কেমন অন্ধকার করে এসেছে—বরং তারাদাস একটা ভূতের গল্প বলুক। জমবে।

কবি তার কাগজপত্র পুরে ফেললো। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম, তোরা 'কুইন্‌ অফ্‌ স্পেডস্‌' পড়েছিস কেউ?

স্বপন বলল, না। ভূতের গল্প?

—জব্বর ভূতের। শুনবি?

—শুরু করে দে—

বললাম, এ গল্পের একটুখানি ব্যক্তিগত ভূমিকা আছে।

—কী সেটা?

—গল্পটা ভয়ানক অপয়া, জানিস? বলতে শুরু করলেই কিছু না কিছু একটা ঘটে যায়। একবার মোটরে বেড়াতে বেড়াতে—

অ্যাক্‌সিডেন্টের কথাটা ওদের বললাম। ওরা হেসে উড়িয়ে দিল। সুজিত বলল—এটা একটা কোইন্‌সিডেন্স, কাকতালীয় ব্যাপার। কিছু না, আপনি শুরু করুন। একটা সিগারেট ধরিয়ে কান খাড়া করে শুনি।

সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে সুজিত বলল—যাঃ!

—কী হল?

—সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। আনতে হবে।

স্বপন উঠে পড়ে বলল, একটা ছাতা দে কেউ, আমি নিয়ে আসছি। গল্প যেন শুরু না হয়, আমি এলে তারপর—

স্বপন ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। আমি গল্পটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছি, সুজিত একটা কাঠি দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কবি বন্ধু অপঠিত বাকি কবিতাগুলোর শোকে চুপ করে বাইরে তাকিয়ে আছে—এমন সময় স্বপন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা! ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে।

আমরা লাফিয়ে উঠলাম—কী রে? হয়েছে কী?

—সাংঘাতিক ব্যাপার। তোদেব এই গলির সামনে একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে! এক্ষুনি হল আমার সামনে। লোকে ঠাসা একটা পঁচাশী নম্বর বাস উল্টে গিয়েছে একেবারে। উঃ! কী দৃশ্য! অনেক লোক মরেছে রে!

আমার মাথায় বিদ্যুতের মত নামটা খেলে গেলো—'ইস্কাপনের বিবি'! বলিওনি। নাম করেছিলাম শুধু।

গল্প মাথায় ওঠে, আমরা দৌড়ে বেরিয়ে যাই চেনাশুনো কেউ দুর্ঘটনায় পড়লো কিনা দেখতে।

ভয়াবহ দৃশ্য। অনেক লোক জড়ো হয়েছে ইতিমধ্যেই, তারা টেনে বার করছে

আহতদের দেহ। একটু আগের সজল বাতাসে স্নিগ্ধ সুন্দর বিকেল এখন কাতর আর্তনাদে কটু হয়ে উঠেছে। তবে একটা ভাগ্যের কথা, মারা যায়নি কেউ। ওটা স্বপনের অতিশয়োক্তি।

আশাকরি সেদিনের সেই লোকটিও মারা যায়নি।

দিন কেটে যেতে থাকে।

এম. এ. পাশ করে বেরুই। মাস্টারী পেয়ে যাই একটা ইস্কুলে। বন্ধুরাও যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত—সেই আড্ডা আর বসে না।

প্রায় দু'বছর নিরুপদ্রবে কাটাই। এর মধ্যে মনে পড়েনি গল্পটার কথা। কোনো বিপত্তিও ঘটেনি। দু'বছর অনেক সময়। দুটো বড় দুর্ঘটনার কথা আমি প্রায় ভুলে এসেছিলাম।

সেদিন এইট্‌থ্ পিরিয়ড্ অবধি ক্লাস ছিল, ক্লান্ত হয়ে নৈহাটি লোকালে ফিরছি ইস্কুল থেকে। ক্লান্ত বটে কিন্তু মনে ফুর্তি আছে। আজ মাইনে পেয়েছি। নিজে উপার্জন করার একটা মাদকতা আছে, অন্তত চাকুরীজীবনের প্রথম দিকে এটা থাকে। পথে বেরিয়ে লোকেদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় সবাই জানে আমি আজ মাইনে পেয়েছি।

আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। শ্যামনগর থেকে ট্রেন ছাড়তেই কামরায় লাফিয়ে উঠলো একটা লোক। গায়ে খাকি শার্ট, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ—বইয়ে ঠাসা। লোকটাকে চিনি কলেজ জীবন থেকেই। ট্রেনের কামরায় বই ফিরি করে। আমাকে দেখে এতদিন বাদেও চিনতে পারলো লোকটা, এগিয়ে এসে বলল, কী বাবু, সব ভাল তো? অনেকদিন বাদে দেখা—কী করেন এখন?

—এখানেই একটা ইস্কুলে পড়াই। তুমি ভাল আছো?

—হ্যাঁ বাবু। বই নেবেন নাকি? ভাল বই আছে—

—কী বই?

—আছে তো অনেকরকম, তবে আপনি এইখানা নিন—

একটা চক্‌চকে ল্যাকারিং করা মলাটের বই ব্যাগ থেকে টেনে বের করলো সে।

—এইটে নিন্। পুশকিনের গল্প আছে বারোটা। ভূতের গল্প ভালবাসেন বাবু? এর মধ্যে 'ইস্কাপনের বিবি' বলে একটা—

ইস্কাপনের বিবি!

বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো! এতদিন পরে আবার! আজ না জানি কী হয়! ট্রেনটা উল্টে যাবে না তো? কী রকম অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে না চাকায় চাকায়? বড্ড যেন দুলছে।

লোকটা বলল, কী বাবু, নেবেন?

শুকনো গলায় কোনোমতে বললাম, না।

ইছাপুরে নেমে যাবো কী? নেমে বাকি রাস্তা রিক্‌সায় চলে যাবো? এ গল্পের নামই যথেষ্ট। দু'বার যা প্রমাণ পেয়েছি, তাতে আর এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করবার সাহস নাই।

লোকটা ইছাপুরে নেমে অন্য কামরায় চলে গেল, আমি নামতে পারলাম না। পা যেন পাথরের মত। ভারী হয়ে আছে। আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলাম, এক সময় ব্যারাকপুরের প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো গাড়ি।

হাঁফ ছেড়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। পৌঁছতে পারবো এমন আশা ছিল না। গলা

শুকিয়ে কাঠ, একটা সিগারেট এক্ষুনি খেতে হবে। ট্রেন চলে গিয়ে প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে এলে আস্তে আস্তে চায়ের স্টলের সামনে এসে দাঁড়ালাম।—রাজাদা, একটা উইল্‌স্ ফ্লেক—

সিগারেট ধরিয়ে বুকভরা ধোঁয়া টানলাম। পকেটে হাত দিলাম পয়সা দেবার জন্য।

মানিব্যাগ নেই! আমার সারা মাসের মাইনে সুদ্ধু!

বিহ্বল হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, মুখের অবস্থা দেখে রাজাদা বলল, কী হল? পকেটমার নাকি?

কোনোক্রমে বললাম, হ্যাঁ।

চেনা লোক, বলল, আরে তাতে কী? পরে দিয়ে দিও।

তাতে যে কী তা আমিই জানি। সমস্ত মাস মরুভূমির মত সামনে পড়ে। শুধু নামটা শুনেছিলাম, তাতেই এই। বইখানা হাতে নিলে বোধহয় প্রাণ যেত।

এর কিছুদিন বাদে একটা খবর পাই। সবচেয়ে আগে যে ঘটনা বলে শুরু করেছিলাম—তার জের। আমি জানতাম না, এখানেও ইস্কাপনের বিবি ক্ষমা করেনি। সেই যে ভদ্রলোক, যাঁর বিয়ের দিন দুপুরে আমি গল্পটা প্রথম পড়ে বরযাত্রী যাই—তাঁর দাম্পত্যজীবন এখন ভয়ানক অসুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজ রাত্তিরে ঝগড়া কথা কাটাকাটি এমন কী প্রহার পর্যন্ত গড়িয়েছে। বাড়ির লোক জোড় করে ধরে প্রেশার বেড়েছে কিনা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, চিকিৎসক বলেছেন অসুখটা জটিল, মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

হায়! কেন সেদিন আমি ও গল্পটা পড়েছিলাম।

অপঘাতে মৃত্যু হওয়ায় বিশ্বসংসারের ওপর চটে আছে নাকি বুড়ি? গল্পের মাধ্যমে কারো সঙ্গে আলাপ হলেই তার ক্ষতি করবার চেষ্টা করে?

অথবা সবটাই হয়তো কতকগুলো কাকতালীয় ঘটনার সমাহার। কে জানে কোনটা ঠিক।

কিন্তু এক দিক দিয়ে ভালো হয়েছে। 'ইস্কাপনের বিবি' আমার তূণে এখন এক অমোঘ অস্ত্রে পরিণত। কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে অথবা মর্মান্তিক অপমান করলে আমি তাকে গল্পটা শুনিয়ে দেবো। শত্রুরা সাবধান!

আর নিজের জীবনের প্রতি যদি কোনোদিন বিতৃষ্ণা আসে, তাহলে কাউকে কিচ্ছুটি না বলে রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর আরাম করে বিছানায় শুয়ে গল্পটা পড়তে পড়তে আমি ঘুমিয়ে পড়বো। এর চেয়ে সহজ আর কী আছে?

সহোদরা

বাথরুমের স্নান করবার সময় হঠাৎ নিজের হাতদুটোকে কেমন যেন শ্রীহীন বলে মনে হল মানসীর। মাত্র বছর তিনের আগেও গায়ের চামড়া বেশ মসৃণ ছিল—এখন সেই সতেজ, চকচকে ভাবটা কমে গিয়েছে। দিদির বিয়ের সময় ছাদে প্যান্ডেলের কোণে দীপক তার হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেছিল—হাতে কী মাখন মেখেছো নাকি?

জীবনে সেই প্রথম পুরুষের ভালবাসার স্পর্শ, সেই অদ্ভুত আশ্চর্য শিহরণ! পরের দিন বিয়ে, প্যান্ডেলে তখনো ইলেকট্রিক আলো লাগানো হয়নি। চাঁদোয়ার নিচে ছায়ামদির অন্ধকারে নিজেকে প্রথম নারী হিসেবে আবিষ্কার। সে সব দিন অতীতের গর্ভে মিলিয়ে গিয়েছে কবেই। দীপক কী একটা ট্রেনিং নেবার জন্য বোম্বাই গিয়েছিল, সেখানেই চাকরি পেয়ে স্থায়ী হয়েছে। বেশ উন্নতিও করেছে সবাই বলে, দেশে ফেরবার নাকি ইচ্ছে নেই। অথচ দীপক বলেছিল—

মা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলছেন—তাড়াতাড়ি কর, অমিতার ওখান থেকে ডেকে গেল যে! বাচ্চাটা কাঁদছে—

স্নান সেরে বেরিয়ে ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু আঁকবার পেনসিল দিয়ে কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ এঁকে নিল মানসী। ভেজা চুল এখন বাঁধা যাবে না। থাক, শুকোলে দিদির ওখানে একটা হাতখোঁপা করে নেবে।

—মা, আমি বেরুচ্ছি তাহলে। ফিরতে কিন্তু রাত-হবে—

মণিমালা বললেন—এমন সাদামাটা কাপড় পরে যাচ্ছিস কেন? সেখানে আজ কত লোক আসবে, জামাইয়ের আত্মীয়রা—একটা ভাল শাড়ি পরে যা না বাপু—

—না মা, থাক। এখন বাচ্চা সামলাতে হবে, এখন ভাল কাপড় পরে কী করবো? লোকজন আসতে শুরু করার আগে দিদির কাছ থেকে চেয়ে নেবো এখন—

পাড়ার মধ্যেই চার-পাঁচটা বাড়ি বাদ দিয়ে অমিতা আর তরুণ থাকে। ভালবাসে বিয়ে হয়েছিল ওদের। গলিটা যেখানে গিয়ে বড়রাস্তায় পড়েছে, সেই মোড়ের মুখে তরুণের বিরাট দোকান। কয়েকটা বড় কোম্পানির রান্নার তেল, মাথায় মাখবার তেল, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদির সে একমাত্র স্টকিস্ট এই শহরে। ছোট দোকানদারেরা তার থেকে মাল নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। দোকানের সামনে দিয়ে সাদা স্কার্ট পরে দুই বিনুনি দুলিয়ে ইস্কুলে যেত অমিতা। তরুণের বাবা তখনো বেঁচে। কাউন্টারে বসে তরুণ কেনাবেচা করত, কিন্তু ক্যাশবাক্স ছিল বাবার দখলে। একটু-আধটু কথাবার্তা থেকে ক্রমে তরুণ আর অমিতার ব্যাপারটা রীতিমত ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যেতে তরুণের বাবা পরিস্থিতি নিজের হাতে নিলেন। তিনি বেঁচে থাকতে বিয়ে হয়নি। একদিন শেষরাত্তিরে স্ট্রোক হয়ে তিনি পরপারে রওনা দিতে ব্যবসার ভার এসে পড়ল একমাত্র ছেলে তরুণের ওপর। কালাশৌচ কাটতেই বিয়ে হয়ে গেল। জাতে-কাঠে মেলে না বলে মণিমালাও একটু আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু অমিতা-মানসীর বাবা ভবশঙ্কর ক্লিষ্ট হেসে বলেছিলেন—বড়লোক পাত্র, নিজে যেচে মেয়ে নিতে চাইছে. এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া করবে? আমার তো চাকরি ফুরিয়ে এল, জমানো টাকাও এমন কিছু নেই যা দিয়ে ভাল ঘরে-বরে মেয়ে দিতে পারি। এখন ভেবে দেখো—

ভবশঙ্করের রিটায়ারমেন্টের পরে সংসারে দুর্দৈব ঘনিয়ে এল। মণিমালা কঠিন অসুখে পড়ে প্রায় চারমাস হাসপাতালে রইলেন, সংসারে সঞ্চয় অর্ধেকের ওপর নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর এক বন্ধুর পরামর্শে বাকি টাকা নিয়ে পাথুরে কয়লার ব্যবসায় নামলেন ভবশঙ্কর। আটমাসের মধ্যে সে ব্যবসা উঠে গেল, সঙ্গে গেল সঞ্চয়ের বাকি অর্ধেক। সে বছর মানসী ক্লাস ইলেভেনে উঠেছে, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। ছোটভাই অনিল নাইনে পড়ে। দুই ছেলেমেয়েকে পড়ানোর সামর্থ্য রইল না ভবশঙ্করের। মানসী নিজেই একদিন গোপনে মাকে বলল—মা, আমি আর পড়বো না। তোমরা বরং ভাইকে পড়াও, ও লেখাপড়া শিখে দাঁড়িয়ে গেলে সংসারের আর কষ্ট থাকবে না। বাবার ওপর খামোকা চাপ তৈরি করে লাভ কী? বাবাকে বোঝাও তুমি—

ভবশঙ্কর আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু সে অসহায় মানুষের অক্ষম আপত্তি। মানসীর পরামর্শমতই কাজ হল। গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস দুঃখ করে বলেছিলেন—কিছু মনে করো না, তোমার ভাইয়ের চাইতে তোমার ক্যারিয়ারই ভাল ছিল। পড়া ছেড়ে ভাল কাজ করলে না। তবে তোমাদের অসুবিধেও আমি বুঝি। কী আর করবে বল, এমন দেশে জন্মগ্রহণ করাও দুর্ভাগ্য—

বর্তমানে অনিল বি. কম. পাশ করে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে বসে আছে। শিক্ষিত বেকারদের একজন। বছরখানেক আগে বাথরুমে পড়ে গিয়ে ভবশঙ্করের পা ভেঙেছিল। চলাফেরা করার মত পায়ের জোর আর ফিরে পান নি। মন তো আগেই ভেঙেছে। আজকাল তিনি সারাদিনই প্রায় বাবান্দায় আরামকেদারায় চুপ করে বসে থাকেন। সকালে অনিলকে দিয়ে পাশের চৌধুরীবাড়ি থেকে খবরের কাগজখানা আনিয়ে দ্রুত পড়ে নেন। নটার সময় চৌধুরীবাবু অফিসে বেরুনোর আগেই সেটা আবার ফেরৎ পাঠাতে হয়।

তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে যে এই সঙ্কটের সময় অমিতা আর জামাই তরুণ অনেক সাহায্য করেছে তাঁদের। অনিলের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে চাল, ডাল, গণেশমার্কা তেলের টিন। তরুণের বাড়ির কাজের লোক বাজার করে ফেরবার সময় মাঝে মাঝে তরি-তরকারী আর মাছও নামিয়ে দিয়ে যায়। জামাইয়ের সংসাবে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য উথলে পড়ছে। অমিতা লেখাপড়ায় তেমন ভাল ছিল না। পাড়ার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আবৃত্তি করেনি কখনো, শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণও পড়া নেই। সে এইসবই চেয়েছিল—এই প্রাচুর্য, ভাল খাওয়া-পরা, সংসারখরচের পরেও হাতে উদ্বৃত্ত কিছু টাকা। তবে প্রাপ্তিতে কোনো খাদ নেই। গতবছর একটি ছেলে হয়েছে অমিতার। ঠিক আদর্শ, সুখী পরিবার যাকে বলে—তাই।

বাপেরবাড়ি একই পাড়ায়, কাজেই রোজ যাতায়াত করতে বাধা নেই। তোয়ালে জড়িয়ে একদিন ছেলেকে নিয়ে এ বাড়িতে গল্প করতে এল অমিতা। বাড়ির বড়মেয়ে, এমনিতেই আদরে মানুষ হয়েছে, তার ওপরে এখন আবার বড়লোকের বাড়ির বৌ—মণিমালা দেখলেন সে নিজের ছেলেকে একেবারেই সামলাতে পারে না। তার একঘণ্টা অবস্থিতির মধ্যে ছেলে দুবার তোয়ালে ভেজালো, একবার দুধ তুললো। আনাড়ি হাতে ছেলের পরিচর্যা করতে গিয়ে অমিতা ঘেমে অস্থির। মানসী হেসে বলল—আমাকে দে দিদি, ওই জাঙিয়া আর শুকনো তোয়ালেটাও দে। তুই মার সঙ্গে কথা বল, আমি খোকনকে দেখছি—

মানসীর গুণে মুগ্ধ অমিতা যাবার সময় বলে গেল—মাঝে মাঝে আমার ওখানে গিয়ে একটু ধরিস না রে খোকনকে, আমি একা পেরে উঠি না। তারপর ছুটির দিন আবার সারাক্ষণই তোর জামাইবাবুর বন্ধুরা আসছে তাদের ফ্যামিলি নিয়ে, কী যে করবো ভেবে পাই না—

মানসী গিয়েছিল।

সেই শুরু। আস্তে আস্তে ছেলের দেখাশুনো এবং সংসারের বেশ কিছু কাজের দায়িত্ব মানসীর ওপর ছেড়ে দিল অমিতা। বাড়িতে সবসময়ই ভিডিও প্লেয়ারে 'তেজাব' বা 'শত্রু' চলছে। আসছে জামাইবাবুর বন্ধুরা। চা করতে করতে রাঁধুনী মেয়েটা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই অমিতা বেরিয়ে যাচ্ছে বিউটি পার্লারে। কোনোদিন ফেসিয়াল মাস্ক্ নিচ্ছে, কোনোদিন বা থাকছে ব্লিচিং-এর ডেট। তোয়ালে, কাঁথা আর ফিডিং বট্‌ল্ নিয়ে জড়িয়ে পড়বার মেয়েই নয় অমিতা—তার ধাতেই পোষায় না। বাচ্চাটাও আজকাল মানসীকে চেনে বেশি, মায়ের কোলে দিলেই কেঁদে ওঠে।

মানসী প্রায় সারাদিনই দিদির বাড়ি থাকে, দুপুরেও খেয়ে নেয় ওখানেই। কেবল রাত্তিরে শুতে আসে বাড়িতে। মণিমালা ব্যাপারটা তেমন পছন্দ না করলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। বলতে গেলে তরুণ আর অমিতাই সংসারটা চালাচ্ছে। নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হলেও বাস্তবকে মেনে না নিয়ে উপায় কী? অনিল চাকরির খোঁজে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায় চারদিকে, ফেরে অনেক রাত্তিরে। ভবশঙ্কর স্থবির, পঙ্গু—সবরকম হিসেবের বাইরে। কাজেই পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হয়।

কিন্তু মণিমালার তো হিম হয়ে বসে থাকলে চলে না। মানসীর বয়েস বেড়ে চলেছে। প্রথম যৌবনের যে কোমল লাবণ্য পৃথিবীর যে কোনো সাধারণ মেয়েকেও কিছুদিনের জন্য সুন্দরী করে তোলে, সেই লাবণ্যের আভা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। চেনাশুনো দু'একজনকে বললেন মানসীর জন্য পাত্রের খোঁজ করতে। পরপর কয়েকটা যোগাযোগ হল। কিন্তু সবারই এক কথা—দেনাপাওনার ব্যাপার পরে, মেয়ে অন্তত বি. এ. পাশ হওয়া চাই।

একদিন সকালে মানসী দিদির বাড়ি যাবে বলে বেরুচ্ছে, মণিমালা বললেন—কটা দিন নাই বা গেলি অমিতার কাছে। ও নিজে একটু ছেলের যত্ন করা শিখুক। এভাবে কী চিরকাল চলবে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া তোর চেহারাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন বিশ্রাম কর দেখি—

উত্তরে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী বলল—কাল রেশন আনার দিন না? অনিলকে পাঠিয়ে দিও দশটা নাগাদ, আমি জামাইবাবুকে বলে রাখবো।

মানসী বেরিয়ে গেলে মণিমালা আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে খাটে বসে পড়লেন। পায়ে যেন আর কোনো জোর নেই, বুকের ভেতরটা মিশ্র আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে। নিতান্ত স্পষ্ট ব্যাপারেও যতক্ষণ একটা আড়াল থাকে ততক্ষণ বেশ চলে, কিন্তু ছলনার সেই স্বচ্ছ আড়ালটুকু কেটে গেলে বিশ্বসংসারে মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। মেয়ের উত্তাপহীন কথা কয়েকটির আঘাতে বাস্তব প্রেক্ষাপটের ওপর থেকে আবরণ খসে পড়ল।

আজ অমিতা আর তরুণের বিবাহবার্ষিকী। সত্যিই হয়তো একটু ভাল সাজগোজ করে

বেরুনো উচিত ছিল মানসীর। কিন্তু আজকের উৎসবে নিজের স্থান কোথায় তা সঠিকভাবে সে বুঝে গিয়েছে। দিদির বাড়িতে এমন খাওয়াদাওয়া মাসে চার-পাঁচদিন লেগেই থাকে। প্রথম প্রথম সে খুশি হয়ে নিজের প্রিয় শাড়িটি পরে মনের মত করে সেজে সবার সঙ্গে সহজভাবে মেশবার চেষ্টা করেছে। হয়নি। একটু পরেই দিদি বলেছে—যা তো মানসী, রান্নাঘরে একটু দাঁড়া। বিনুর মাকে বলবি আর দুটো সিটি পড়লে গ্যাস অফ্ করে কুকারের ঢাকনা খুলে দিতে—

জমাট গল্পের আসর থেকে মানসী উঠে রান্নার তদারক করতে গিয়েছে। সেখান থেকে খোকনের কান্না শুনে শোবার ঘরে। সে লক্ষ্য করেছে, দিদি তাকে আজকাল জামাইবাবুর অবিবাহিত বন্ধুদের সামনে বেশিক্ষণ থাকতে দেয় না। কোনো কাজের অজুহাতে পাঠিয়ে দেয় ভেতরে।

মাসখানেক আগে মণিমালা একদিন সকালে এলেন বড়মেয়ের বাড়ি। তরুণ একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। সদ্য বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে সে লুঙ্গি পড়ে খালিগায়ে দিনের প্রথম সিগারেটটি মৌজ করে টানছিল। শাশুড়িকে দেখে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে সে এগিয়ে এল।—কী হয়েছে মা? আপনি এত সকালে? বাবার শরীর ভাল তো?

—তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল বাবা—

—আসুন, আসুন। ভেতরে এসে বসুন—

জামাইয়ের আচরণ সত্যিই খুব ভাল, ত্রুটি ধরবার কোনো উপায় নেই। ধীরভাবে সব শুনে তরুণ বলল—সত্যিই তো, মানসীর বিয়ের বয়েস হয়েছে। আপনাদের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। আচ্ছা আমি আমার পরিচিতদের সবাইকে বলে দিচ্ছি সম্বন্ধ জোগাড়ের চেষ্টা দেখতে। আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে—

মণিমালা হাতের মধ্যে ধরে থাকা ভাঁজকরা একটুকরো কাগজ জামাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—চৌধুরীবাবুদের খবরের কাগজখানা রোজ পড়তে আনেন মানসীর বাবা—তাতে গতকাল এইদুটো বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। তুমি একবার পড়ে দেখো তো, মনে হয় মানসীর সঙ্গে খাপ খাবে—

পড়া হয়ে গেলে কাগজটা মণিমালার হাতে ফেরৎ দিয়ে তরুণ বলল—ভালই তো মনে হচ্ছে। চিঠি লিখে দেখা যেতে পারে।

—তুমিও বরং লিখে দাও না চিঠিদুটো?

—আমি? আসলে হয়েছে কী মা, এসব গুরুগম্ভীর সামাজিক চিঠি লেখা আমার মোটেই আসে না। বাবা বরং একটা মুসাবিদা করে দিন, আমি নকল করে ডাকে ফেলে দেবো—

আজকাল ভবশঙ্করের হাত কাঁপে, চোখেও ভাল দেখতে পান না। তবু মোটা কাঁচের চশমা লাগিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে একটা খসড়া করে দিলেন পরদিনই। জামাই ব্যস্ত মানুষ, কখন সময় করে উঠতে পারবে ঠিক নেই, তাই অনিলকে দিয়ে দুটো নকল করালেন চিঠির। দিনতিনেক বাদে অমিতা বাপেরবাড়ি এলে তার হাতে দিয়ে বললেন—জামাইকে বলিস একবার দেখে নিয়ে যেন ডাকে দেয়। তোদের ঠিকানাই দিলাম, উত্তর এলে জামাইকেই তো যোগাযোগ করতে হবে—

আজ একমাস ঘুরে গেল, কোনো উত্তর এল না। এদেরও হয়ত বি. এ. পাশ মেয়ে চাই।

স্বামীর বন্ধুদের সামনে বেশিক্ষণ থাকতে না দিলেও খাবার সময় পরিবেশনের জন্য মানসীকে ডেকে আনে অমিতা। নিজে না বসলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করে, কাকে কী দিতে হবে বলে দেয়। আজও তাই হল। খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পাশে বসে সেলাই করে রুমালে ফুল তুলছিল মানসী। অমিতা দরজার কাছে এসে বলে গেল—বিনুর মাকে বল্ তো চট্ করে আরো দশ-বারোখানা ফ্রাই ভাজতে। ভাজা হলেই নিয়ে চলে আসবি, কেমন?

কিছুক্ষণ বাদে ফ্রাইয়ের পাত্র হাতে খাবারঘরে ঢুকতেই টেবিলের ওদিক থেকে তরুণের এক অতিথি বলে উঠল—এই যে, এদিকে একটা দাও তো—

হঠাৎ মানসীর মাথার মধ্যেটা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখ থেকে নেমে গেল মুহূর্তে। কিছুই নয় হয়ত ব্যাপারটা, জামাইবাবুর বন্ধুরা তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেই পারে। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি দিয়ে সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল লোকটি কী ভেবে তাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছে। তরুণ বা অমিতা কিছু বলবার আগেই বিজয় সেন সামলে দিল পরিস্থিতি। সে মানসীকে চেনে। বক্তার দিকে তাকিয়ে সে বলল—ওহো, তোমার সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হয়নি। এ হচ্ছে মানসী, তরুণের শ্যালিকা। ভারি ভাল মেয়ে। ওর আদরযত্নের লোভেই তো তরুণের নেমন্তন্নে এত সহজে রাজি হই—

তখনকার মত প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। মানসী আবার খোকনের ঘরে ফিরে এসে রুমালের কাজ নিয়ে বসে গেল। কিন্তু কাজ যেন এগোয় না—সবুজ সুতোর বদলে ভুল করে নীল সুতোর ফোঁড় পড়ে, আঙুলে ছুঁচ বিঁধে যায়। কাকে সে দেবে এই রুমাল? উদ্দেশ্যহীন কাজের সার্থকতা থাকে না।

অতিথিরা বিদায় হবার পর মানসীকে নিয়ে খেতে বসল অমিতা আজ মানসীর খিদে নেই। সামান্য ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অমিতা। বলল—আর একটু ডাল দিয়ে মাখ না ভাতগুলো—

—না দিদি, খিদে নেই একদম।

—কেন রে, কী হয়েছে?

—শরীরটা ভাল নেই—

অমিতা একবার বোনের দিকে তাকাল, বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করল সত্যিই তার শরীর খারাপ হয়েছে কী না। তারপর বলল—তুই আজ এমন একটা শাড়ি পড়ে এলি কেন বল তো? লোকজনের সামনে একটু সেজেগুজে থাকতে হয় তো!

মানসী মনে মনে বলল—তুইও তো কাপড়টা বদলে নেওয়ার কথা বলতে পারতিস দিদি, আমি তো এসেছি অনেকক্ষণ।

কিন্তু সে মনে মনেই, বাইরে মানসী মুখ নিচু করে বসে রইল।

অমিতা আবার বলল—কথাটা বললাম বলে রাগ করিস না যেন। তুই আমার আদরের বোন, আমার ইচ্ছে করে না তোকে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে?

খোকন ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল পাশের ঘরে। মানসী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল—আমি দেখছি, তুই ব্যস্ত হোস না—

—তোর খাওয়া হোল না।

—বললাম তো, আমার খিদে নেই—

সন্ধ্যের পর তরুণ আর অমিতা দুজনেই ও-বাড়িতে গেল ভবশঙ্কর আর মণিমালাকে প্রণাম করতে। তরুণের হাতে মিষ্টির হাঁড়ি, অমিতার হাতে ভাজা ফ্রাই ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ার। মানসী এ বাড়িতে রয়ে গেল খোকনকে দেখাশুনো করবার জন্য।

মণিমালা অমিতার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে বললেন—জন্ম জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে থাকো, শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে একশো বছর পরমায়ু হোক—

কিছুক্ষণ আগে ভবশঙ্কর উঠে দেয়াল ধরে ধরে হেঁটে গিয়ে শোবার ঘরে বসেছেন। সেখানে গিয়ে প্রণাম করলো মেয়ে-জামাই। আশীর্বাদ করে ভবশঙ্কর বললেন—খোকাকে আনলি না কেন?

অমিতা বলল—ওর গা-টা একটু গরম হয়েছে বাবা। রাস্তায় বেরুলে আবার হয়ত ঠাণ্ডা লেগে যাবে। মানসীকে বসিয়ে রেখে এসেছি—আজ আর বসবো না, পরে আসবো এখন—

—মানসীর বিয়ের ব্যাপারটা একটু উদ্যোগ নিয়ে খোঁজখবর কর। তোরাই এখন আমার ভরসা, আমি তো কাজের বাইরে হয়ে গিয়েছি। সম্বন্ধ এল দু-একটা?

—না বাবা। তোমার লেখা সে চিঠিগুলোরও কোনো উত্তর পেলাম না। সবাই চায় পরমাসুন্দরী, সবাই চায় উচ্চশিক্ষিতা—দেনাপাওনার দিক তো আছেই। সাধারণ মেয়েদের কী তাহলে বিয়ে হবে না?

—দেখ একটু ভাল করে। বয়েসও তো বেড়ে চলেছে। এরপর—

—তোমার জামাই চারদিকে বলে রেখেছে বাবা। ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে—

নিজের সামর্থ্য শূন্যের ঘরে। বসে বসে দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই। কাজেই বড়মেয়ের কথায় ভারি স্বস্তি বোধ করেন ভবশঙ্কর। ওরা যখন বলছে, তখন নিশ্চয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

হেমন্তকালে রোদ্দুরের রঙ বদলাতে শুরু করলে কেন যেন মানসীর মন-কেমন করে, পুরনো দিনের কথা মনে আসে। সেই বাবার হাত ধরে রথের মেলা দেখতে যাবার দিন, দায়হীন চিন্তাহীন ছোটবেলার ফেলে আসা দিন। আর কখনো তারা এ জীবনে ফিরে আসবে না। কথাটা মনে হলেই ক্ষতির অনুভূতিতে বুকের মধ্যে কেমন একধরনের চাপধরা কষ্ট জেগে ওঠে।

আজকাল অবশ্য এই আধা শহরে তেমন করে আর হেমন্ত টের পাওয়া যায় না। তবু সেদিন দুপুরে ঘুমন্ত খোকনের পাশে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত একটা উড়ন্ত চিল দেখতে দেখতে মানসীর মনে হল—আচ্ছা, ওই অতদূরে উঠলে পৃথিবীটাকে কেমন দেখায়? একবার চোখ বুঁজে সে কল্পনা করবার চেষ্টা করে—নীচে কোথায় পড়ে রয়েছে শহরের বাড়িঘর, ঠিক যেন কয়েকটা দেশলাইয়ের বাক্স। তার মধ্যে বাস করে মানুষ, নিজেদের লোভ ঈর্ষা চাহিদা নিয়ে। এত ওপর থেকে দেখলে সমস্ত ব্যাপারটা এত তুচ্ছ বলে মনে হয়।

দীপক বলেছিল চিঠি লিখবে। বলেছিল তার জন্য অপেক্ষা করতে। ওসব কেবল কথার কথা। দীপক এখন যে জগতে বাস করে সেখানে তার মত একজন সাধারণ মেয়ের স্থান কোথায়? কিন্তু আশ্চর্য হয়ে মানসী দেখে—এই রূঢ় সত্য আবিষ্কার করেও তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই, বেদনার দংশন নেই। দুঃখ আর ক্ষোভ আসে আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভাব থেকে। আকাঙ্ক্ষার উৎস শুকিয়ে গেলে আর কোনো দুঃখ থাকে না।

তবু সে কী কামনার রঙীন জগৎ থেকে নিজেকে সত্যি সত্যি সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নিতে পেরেছে? তাহলে মাঝে মাঝে বুকের ঠিক কেন্দ্রে অমন একটা অদ্ভুত শূন্যতার অনুভূতি হয় কেন? ঠিক যেন একটা বড় হলঘরের মত বিশাল ফাঁকা, সেখানে বড় বড় থামের চারধারে পাক খাচ্ছে উদাস হাওয়া। পরিবেশে হারানো মানুষের ফিসফিস কণ্ঠস্বর।

দেয়ালের ইলেকট্রনিক ঘড়িতে সুরেলা আওয়াজে তিনটে বাজলো।

আলস্য কাটিয়ে উঠে পড়লো মানসী। আর আধঘণ্টার মধ্যেই খোকনের ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠবার সময় বিছানা ভিজিয়ে ফেলা খোকনের স্বভাব। অয়েলক্লথটা গেল কোথায়? সেটা এবার ঘুমন্ত খোকনের নিচে গুঁজে দেওয়া দরকার।

খাটের একদিকে ভাঁজকরা তোয়ালেগুলো রাখা আছে। তার মধ্যে অয়েলক্লথ নেই। আলনাতেও না। তোষকের নীচে নেই তো? অনেকসময় দিদি গুঁজে রাখে। চাদর আর তোষকের তলায় নেই। কী ভেবে ডানলোপিলোর নরম গদিটাও উলটে দেখলো মানসী। অয়েলক্লথ নেই, কিন্তু কতগুলো খাম এলোমেলো পড়ে আছে। কিসের খাম এগুলো? ডাকটিকিট আঁটা আছে, কিন্তু পোস্ট করা হয়নি। ভাল করে দেখবার জন্য মানসী একখানা খাম হাতে তুলে নিল।

তার বিয়ের সম্বন্ধের চিঠিগুলো—বাবা খসড়া করে দিয়েছিল!

একখানা চিঠিও দিদি ডাকে দেয়নি, এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

খামটা রেখে দিয়ে তোষক চাদর আবার ঠিক করে পেতে রাখলো মানসী। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার এখন খুব দুঃখ পাওয়া উচিত, উপন্যাসের নায়িকার মত বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা উচিত। কিন্তু তার বদলে মনের ভেতর বেশ একটা প্রশান্তি অনুভব করলো সে—একটা নিশ্চিন্ত হওয়ার অনুভূতি। উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা মানুষকে কুরে কুরে খায়। তার চেয়ে এই ভাল।

জানালার পাশের নিমগাছটায় সোনালী রোদ। ঝিরঝিরে বাতাস খেলা করছে পাতায় পাতায়। ছোট্ট একটা টুনটুনি পাখি এসে বসলো গাছের ডালে। এমন বিকেলে কোথায় যেন চলে যেতে ইচ্ছে করে।

বেশ দিনটা আজ। বেশ সুন্দর।

পরের দিন সকালে দিদির বাড়ি ঢুকতে গিয়ে শুনলো ওপাশের ঘবে জামাইবাবু দিদিকে বলছে—আর একহপ্তা বাদে কিন্তু রওনা, এবার জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করো। তোমার অনেকদিনের শখ মুসৌরী দেখবার, এখন ওদিকে ওয়েদারও খুব ভাল। এজেনসীর লোক কাল টিকিট দিয়ে গিয়েছে—

দিদি বলছে—মানসীর টিকিটও করেছো তো? আমি কিন্তু বাপু বেড়াতে গিয়ে ছেলে ধরে বসে থাকতে পারবো না। কাজে সাহায্য করার একজন লোক না থাকলে সব আনন্দই মাটি। আমরা বেড়াতে বেরুলে ও হোটেলে বাচ্চাটা নিয়ে থাকতে পারবে, বুঝলে না?

—আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সে জানি। মানসীর টিকিটও করা হয়েছে—

এবার একটু কেশে জানান দিয়ে বাড়িতে ঢুকলো মানসী।

আধঘণ্টাখানেক পরে, মানসী বড় লাল প্লাসটিকের গামলায় খোকনের স্নানের জন্য গরম আর ঠাণ্ডা জল মেশাচ্ছে, অমিতা বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—সামনের হপ্তায় আমরা মুসৌরী বেড়াতে যাচ্ছি, বুঝলি? তোর জামাইবাবু কাল টিকিট করে এনেছে। তুইও যাবি কিন্তু আমাদের সঙ্গে। তোকে ছাড়া আমরা এখন কোনো আনন্দ করার কথা

ভাবতেই পারি না—

অমিতার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মানসী বলল—জানি তো দিদি। আমি তোর আদরের বোন। আমাকে ফেলে তুই বেড়াতে যাবি কী করে?

ক্রীড়াভূমি

বাউন্ডারি হতে পারত, হল না। পল্টু ঠিকই দেখতে পেয়েছিল বলটা তীরবেগে তার দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ থেকে জোর করে চেপে রাখা হাঁচিটা সে আটকাতে পারল না। প্রবল হাঁচির বেগে সামনে নুয়ে পড়তে পড়তে সে অনুভব করল তার ডান পায়ে লেগে বলটা দিক পরিবর্তন করে মাঠের ডান কোণে বড় নর্দমার দিকে চলে যাচ্ছে।

পুরো দলটা হাঁ হাঁ করে দৌড়ল বলের পেছন পেছন। যারা ফিল্ডিং করছিল তারা তো বটেই, যারা ব্যাটিং-এর আশায় প্যাভিলিয়নে—অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা জড়ো করার লোহার চৌকো বাক্সের ওপর বসেছিল তারাও। একটা বাউণ্ডারি বরং হতে দেওয়া যায়, সেটা এমন কিছু ব্যাপাব নয়, নিজেরা ব্যাটিং করার সময় সামলে নেওয়া যাবে, কিন্তু বড় নর্দমায় বল পড়লে সর্বনাশ! নর্দমা কিছুটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, কিছু অংশ কাঁচা। বেশ গভীর। তলায় জমে থাকা থকথকে নাম না-জানা ময়লা ওপর দিয়ে বয়ে যায়। দুর্গন্ধ কালচে জল। সেখান থেকে বল উদ্ধার করা বেশ গোলমেলে ব্যাপাব। এইজন্যই দুবার কেউ বল মেরে নর্দমায় ফেললে তাকে আউট ধরা হবে এমন একটা স্থানীয় নিয়ম রাখা হয়েছে। কিন্তু আউট হলেই বা লাভ কী, কাউকে না কাউকে তো নর্দমায় নামতে হবে বলটা তোলার জন্য।

খারাপ ঘটনা ঠেকানো খুব কঠিন। বল গড়িয়ে গিয়ে নর্দমায় পড়ল।

পনেরো-ষোলোজন খেলোয়াড় এসে দাঁড়াল নর্দমার ধারে। তারা সবাই সুভাষনগর কলোনীর ছেলে। কারো পরনে তেলচিটে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি, কারো বা ডোরাকাটা ইজের, খালি গা। হাতে-পায়ে খড়ি ফুটে উঠেছে। বয়েস সবারই এগারো থেকে তেরো-চোদ্দর মধ্যে।

নান্টু সুবলকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল—যা, তুলে আন—

—বা রে, আমি কেন। তুমি নিজে নাম্ না—

—পরশু আমি দুবার নেমেছি, এবার তোর পালা।

—যা-যাঃ, তোর কথায় নাকি? আমিও তার আগের দিন তিনবার নেমেছি। আজ বরং মাকাই নামুক—

মাকাই উদাসীনভাবে বলল—আমার বয়ে গিয়েছে। তোরা পারিস তো নাম্, নইলে বল পড়ে থাকুক ওখানে, আজকের মত খেলা শেষ। বাড়ি যা—

যাদের ব্যাটিং বাকি তারা এ কথায় রুখে দাঁড়াল।—ইয়ার্কি নাকি! বল তুলে আমাদের ব্যাটিং দিয়ে তারপর যাবি। আমরা এতক্ষণ ধরে খাটান দিই নি?

পৃথিবীর অন্যত্র যা হয় এখানেও তাই হল। দলের সবচেয়ে নিরীহ আর ছোটখাটো চেহারার তিনুর দিকে তাকিয়ে সবাই বলল—তাহলে নেমে পড় তিনু, যা—

তিনু পায়ে পায়ে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল—না না, সেকি! আমি নয়—

সে বেশি পেছোবার আগেই আবু তাকে ধরে আস্তে করে নর্দমায় নামিয়ে দিল। তিনু নিরীহ এবং রোগা। সে হাত-পা ছুঁড়ে নর্দমার মধ্যে পড়ে গেল। তরল পাঁকের ভেতর অকস্মাৎ বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হওয়ায় যে বিচিত্র শব্দ হল সেটা ছেলের দলের কাছে খুব মজার মনে হওয়ায় তারা একসঙ্গে সবাই হেসে উঠলো। ভোম্বল বললো—শব্দটা তুই করলি নাকি রে তিনু?

লজ্জায়, অসহায় রাগে এবং অপমানে তিনু কাঁদতে আরম্ভ করল।

এবার অবশ্য ব্যাপারটা আর বেশিদূর এগুলো না। ছোটদের বা বড়দের, উভয় দলেই কিছু সদস্য থাকে যারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঘটনার ওপর নজর রাখে, ঘটনাটা ঘটতে দেয় এবং তারপরে মাঠে নেমে গোলমাল থামিয়ে নাম কেনে। কোমর অবধি নোংরা জলে দাঁড়িয়ে তিনুকে কাঁদতে দেখে টাবু, মঙ্গল, ভন্টা, বেঁটেপাঁচু ইত্যাদিরা—'এই ভাই, কী হচ্ছে!' 'না, এ কিন্তু উচিত নয়', 'তোদের কিন্তু বড্ড ইয়ে'—বলতে বলতে তিনুকে নর্দমার গহ্বর থেকে উদ্ধার করে সিমেন্টের বাঁধানো জায়গাটার ওপর বসিয়ে দিল। সে বেচারার কোমরের নিচে থেকে তরল ময়লায় লিপ্ত। সে কাঁদতেই লাগল।

ছোটদের খেলা নিয়ে ঝগড়া গোলমাল ইত্যাদি হয়েই থাকে, তা সাধারণত খেলার মাঠেই মিটে যায়। এখানে একটু অন্যরকম হল—ঝগড়াটা বাড়ি পর্যন্ত গড়ালো, এবং বেলা এগারোটা নাগাদ সমস্ত সুভাষনগর বিবাদে জড়িয়ে পড়লো।

এর কারণ তিনুর ভাল নাম তিনকড়ি দাস, আবুর নাম শেষ আব্বাস, ভন্টার নাম নিখিলচন্দ্র পাল, মাকাইয়ের নাম তাজরুল হক—এভাবে সমস্ত খেলোয়াড়দের দলটাই প্রায় দুভাগে বিভক্ত। ছোটরা তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না।

তিনুর বাবা নারাণ দাস কাঠের কাজ করে। আজ তার বিশ্রামের দিন। খোলার ঘরের সামনে দড়ির চারপাইতে শুয়ে সে বিড়ি খাচ্ছিল। ছেলেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরতে দেখে সে বলল—কী হয়েছে রে, কাঁদছিস কেন?

তিনু বাবাকে আনুপূর্বিক ঘটনা খুলে বলল।

নারাণ জিজ্ঞাসা করল—কে তোকে নর্দমায় ফেলেছে বললি? আবু? জাফরের ছেলে?

—হ্যাঁ। আমার কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে গিয়েছিল—

জাফর, অর্থাৎ আবুর বাবার একটা হারকিউলিস সাইকেল আছে। নারাণের নিজের সাইকেলটা রোডমাস্টার। জাফর মাঝেমাঝেই চায়ের দোকানে বসে নারাণকে শুনিয়ে শুনিয়ে হারকিউলিসের গুণগান করে, এর তুলনায় রোডমাস্টার সাইকেল যে কিছুই নয় তাও প্রচার করে থাকে। নারাণ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—কী! জাফরের ছেলের এত বড় সাহস! দাঁড়া, হচ্ছে আজ—

সুভাষনগরে অনেক সরু সরু গলি আছে। তারই একটায় জাফরের বাড়ি। নারাণ গলির মুখে এসেই দেখলো জাফর তার হারকিউলিস চড়ে কাজে যাচ্ছে। সে রাস্তার মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—এই! নামো এখানে! শালা, একটা ভাঙা সাইকেল চড়ে বেড়াও বলে কী নবাব হয়েছো নাকি?

জাফর নারাণের মত রোগাপটকা নয়, ডাকাবুকো বলে তার খ্যাতি আছে। তার ওপর আজ কাজে বেরুবার মুখে তার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সেও তিরিক্ষি মেজাজে বলল—কেন রে নারাণ? নামবো কেন? তোর বাপের জমিদারী নাকি যে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছিস?

উত্তরে রাগে দিশা হারিয়ে নারাণ সাইকেলের সামনের চাকায় একটা লাথি মেরে বলল—আগে নাম্ শালা, তারপর কথা বল—

একটি নিটোল এবং চমৎকার ঝগড়া পাকিয়ে উঠল। হাতাহাতি অবশ্য বাধল না, কারণ নারাণ জানে লড়াই বাধলে সে ডাহা হেরে যাবে, আর জাফর তার সাইকেল থেকে নামলই না। এক পা প্যাডেলে আর এক পা মাটিতে রেখে সে ঝগড়া চালিয়ে গেল।

ঝগড়ায় উৎসাহ দেবার জন্য সব এলাকাতেই কিছু লোক থাকে। বিরোধের তীব্রতা কমে এলে তারা দু-পক্ষকেই যথাসাধ্য অনুপ্রেরণা দেয়। তেমন কয়েকজন চারপাশে জড়ো হয়েছিল। একজন বলল—জাফর ভাই, তুমি যাই বলো, তোমার ছেলে আবু যে তিনুকে নর্দমায় ফেলে দিয়েছে—এটা সে ভাল কাজ করেনি।

জাফর লাল চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তিনুটা আবার কে?

—তিনু হল এই নারাণের ছেলে। আহা, বেচারা কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছে।

জাফর হুঙ্কার দিয়ে বলল—বেশ করেছে। আবু ফেলেছে ব্যাটাকে, আমি বাপকে ধরে নর্দমায় ফেলে দেব। এতবড় সাহস—শালা আমার সাইকেলে লাথি মারে!

আরও কিছুক্ষণ উষ্ণ মতবিনিময়ের পর জাফর হঠাৎ সাইকেল ঘুরিয়ে নিজের ঘরের সামনে ফিরে গেল। সাইকেলখানা একটা খুঁটির গায়ে ঠেসিয়ে রেখে বসবার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত পুরনো একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে হুস হুস করে বিড়ি খেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় সমাজসেবক পল্টু কর্মকার এসে তার পাশে বসল।

—কী হয়েছে জাফরদা? শুনলাম নারাণের সঙ্গে নাকি তোমার—

জাফর লালচে চোখ তুলে বলল—কিছু হয়নি, তুমি কাটো—

মান-অপমানবোধ থাকলে সমাজসেবা করা যায় না। পল্টু আদৌ না চটে নরম গলায় বলল—তোমার মেজাজ গরম হওয়ার আর দোষ কী! কিছু মনে কোরো না জাফরদা, এদিকটায় তোমাব আত্মীয়স্বজনরাই তো দলে ভারি। এমনভাবে যদি ব্যাঙে লাথি মেরে যায়—দেখে এলাম নারাণ দলবল নিয়ে কী পরামর্শ করছে। জানের চেয়ে মান বড় মনে রেখো—

সন্দিগ্ধ চোখ তুলে জাফর বলল—পরামর্শ করছে?

—হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম।

—কত লোক?

—ওদিককার সব্বাই। যাক, তুমি কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে থাকো। রাগের মাথায় কিছু করে বোসো না। সহ্য করা অবশ্য খুবই কঠিন—আজ শুনলাম তোমার সাইকেলে লাথি মেরেছে, কাল কী করে—

জাফর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। পল্টু গেল নারাণের কাছে।

নারাণ মূলত নিরীহ মানুষ। একবার ঝগড়া করেই তার সবটুকু তেজ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সেও একখানা চারপাইতে এলিয়ে পড়ে বিড়ি টানছিল। পল্টু বিষণ্ণমুখে তার পায়ের কাছে বসে বসল—নারাণ ভাই, এমন করে শুয়ে থাকলে তো চলবে না। জানি তুমি ঝামেলা চাও না, তোমাকে তো দেখছি বরাবর। কিন্তু মনে রেখো, জানের চেয়ে মান বড়। এদিকে তো আমরাই সংখ্যায় বেশি—আমরা অবশ্য শান্তি বজায় রেখে ভাই-ভাই হয়ে থাকতে চাই, কিন্তু ব্যাঙে লাথি মেরে গেলেও কী চুপ করে থাকতে হবে? তাছাড়া ওদিকে যা দেখে এলাম—

পিটপিট করে তাকিয়ে নারাণ বলল—কী দেখে এলে?

—জাফরের বাড়ির সামনে পরামর্শ সভা বসেছে—

—কারা কারা আছে দেখলে?

—ওদিককারী সব্বাই। তা হোক, আমরাও কী মরে গিয়েছি? তুমি ওঠো, যাকে যাকে পারো খবর দাও—আমিও জানাই সবাইকে—

ক্ষীণজীবী, নিরীহ নারাণ উত্তেজনায় উঠে বসে বলল—আমরা তাহলে কী করব পল্টু?

দম নিয়ে বুক ফুলিয়ে পল্টু উত্তর দিল—লড়ব। মনে রেখো, আমরা ঝামেলা চাই না, সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাই। কিন্তু মান-ইজ্জতের জন্য আমরা জান দিতে পারি। পারি কিনা?

মোহগ্রস্তের মত নারাণ বলল—পারি।

নিশ্চিন্ত হয়ে পল্টু এবার নিজের লোকজনের কাছে গেল। সুভাষনগরের একেবারে পূর্বপ্রান্তে ডুমুর গাছটার তলায় কমল আর পাঁচু বসে আছে। তাদের কাছে গিয়ে পল্টু বলল—সব ঠিক আছে। আমি দেখছি যাতে এগারোটা নাগাদ ব্যাপারটা শুরু হয়ে যায়। তোরা দলের সবাইকে নিয়ে কলোনী থেকে বেরুবার পথগুলো আটকে হল্লা করবি—যাতে শুরু হবার অন্তত একঘণ্টার মধ্যে কেউ গিয়ে পুলিশকে খবর দিতে না পারে।

ক্ষয়ে যাওয়া কালো দাঁত বের করে কমল হাসল।—ডোন্ট পরোটা কমলদা, দেখো না কী করি! তুমি শুধু বাধিয়ে দাও গুরু—

—যা, লোকজন নিয়ে তৈরি থাক।

ক্লাবঘরে আট-দশজন ছেলে গুলতানি করছিল। ওধারে চারজন ঠকাস্ ঠকাস্ করে ক্যারাম পিটছে, চায়ের গ্লাস নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে কয়েকজন। হন্তদন্ত হয়ে পল্টু ক্লাবঘরে ঢুকেই জোরগলায় হেঁকে বলল—খেলা বন্ধ করো। এদিকে এসো সব, একটা জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে—

একটু উঁচু টুলে বসল পল্টু। তার চারদিকে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল।

—শোনো, ক্লাবঘর বন্ধ করে তোমরা এখুনি আমার সঙ্গে চলো। পাড়ায় অন্য সব ছেলেদের খবর দিতে হবে। আধঘণ্টার মধ্যে একটা শান্তিবাহিনী গঠন করা দরকার। বিপদ ঘনিয়ে এসেছে—

অবিনাশ জিজ্ঞেস করল—শান্তিবাহিনী কেন? কী হয়েছে?

—সুভাষনগরে একটা মারপিট বাধবে, সেটা রুখে দিতে হবে—

—মারপিট? কাদের সঙ্গে কাদের?

পল্টু কর্মকার বিষণ্নভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে একটু চুপ করে থেকে, তারপর মুখ তুলে বলল—ব্যাপার গুরুতর। শোনো, বলছি—

ঘটনার না-জানা ফাঁকফোকর নিজের সুবিধামত ভরাট করে আনুপূর্বিক সমস্ত কথা বলল পল্টু, তারপর বলল—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম থামাতে, কিন্তু কোনো ফল হল না। দুই পক্ষের মাথা এখন গরম। কিন্তু আমরা তো আমাদের চিরকালের ঐতিহ্য নষ্ট হতে দিতে পারি না, শান্তি আমাদের রক্ষা করতেই হবে, যে কোনো মূল্যে। খবর দাও, তৈরি হও, আমার সঙ্গে চলো—

প্রথমদিকে কিছু লুঠপাট হবে পল্টু জানে। হোক, সেদিকে সে তাকাবে না। ভাগেও

তার প্রয়োজন নেই। আরও মূল্যবান জিনিসে তার লোভ। সে জিনিসের নাম ক্ষমতা, নেতৃত্ব। গোলমাল থামিয়ে সে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে চায়।

এত পরিশ্রম করেছে সে, ঠিক সময়ে বাধবে তো মারপিট?

পৌনে এগারোটা থেকে পরপর সব কাগজের অফিসে ফোন করতে লাগল পল্টু—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব সিরিয়াস অবস্থা। ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টার পাঠালে ভাল হয়। ব্যাপারটা একটু ইয়ে ধরনের মোড় নিয়েছে আর কী! অবশ্য বিশিষ্ট সমাজসেবী পল্টু কর্মকার—না, লালটু নয়—পল্টু, তিনি তাঁর শান্তিবাহিনী নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন গোলমাল থামাবার। আমরা ভয় পাচ্ছি তাঁর জীবনও বিপন্ন না হয়। আমি? আমি এই অঞ্চলেরই মানুষ, আপনাদের কাগজ পড়তে ভালবাসি। যাতে খবরটা মিস্ না করেন সেইজন্য—না না, আর কোনো কাগজে ফোন করব না। করি নি—

সওয়া এগারোটায় বাচ্চাদের ছোট্ট খেলার মাঠে দুই পক্ষ মুখোমুখি হল। যে মাঠে সকালে বাচ্চারা ক্রিকেট খেলছিল। এবার বড়দের খেলা।

দুই পক্ষেরই হাতে কিছু না কিছু হাতিয়ার। কারো হাতে লোহার রড, কারো হাতে লাঠি, কেউ এসেছে ছেলের ক্রিকেট খেলার উইকেট নিয়ে। কারো হাতে বা সাইকেলের চেন। মাঝে মাঝেই আরও নতুন লোক এসে নিজেদের দলের সঙ্গে নিঃশব্দে যোগ দিচ্ছে। ক্রোধ, সন্দেহ আর উত্তেজনায় পরিবেশ বিদ্যুতায়িত হয়ে আছে। দুই পক্ষের কেউই ঠিকঠাক কিছু জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে কোনোভাবে তারা অপমানিত হয়েছে, তাদের জীবন ও সম্মান বিপন্ন।

দুইদলের মাঝখানে কুড়ি-বাইশ গজ ব্যবধান। ওই ব্যবধান অতিক্রম করে এখুনি কিছু মানবসন্তান লিপ্ত হবে সংঘর্ষে। বাতাসে কী বারুদের গন্ধ?

জাফরের হাতে মোটা লোহার রড। বিকট হুঙ্কার দিয়ে সে এগুতে যাবে, এমন সময় একটা রোগামত, লুঙ্গি পরা লোক ছুটে এসে জাফরের পাশে যে ছিল তার কানে কানে কী বলল। সে লোকটা লাঠি হাতে নিয়েই দল ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেল দ্রুতপদে। জাফর বিস্ময় ও বিরক্তি নিয়ে তাকাল সেদিকে। রোগামত লোকটি পরপর সবার কানে কী যেন বলছে ফিসফিস করে, শোনামাত্র দল ছেড়ে সবাই কোথায় যেন ছুটে যাচ্ছে। ওদিকে অপর পক্ষেও তাই। একজন মানুষ এসে তাদের কানে কানে কী বলছে। দেখতে দেখতে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। সবাই বাড়ি যাচ্ছে—চালের বাতা থেকে, মাদুরের তলা থেকে কী কাগজ বের করে থলে হাতে ছুটে যাচ্ছে বিশেষ একদিকে। ওই তো জাফরও যাচ্ছে, ওই তো নারাণ। সবাই, সবাই—

মারপিট আর হবে না। রেশনের ডিউ স্লিপের প্রতিশ্রুত গম আর চিনি এসে গিয়েছে।

বিকেলে আবার বাচ্চাদের ম্যাচ শুরু হল খেলার মাঠে।

দুই দশক

শরতের পড়ন্ত রোদ্দুরে তেমন ঝাঁঝ নেই। ঋতু ক্রমেই হেমন্তের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। বিকেলের এই সময়টা হোটেলে থাকতে ভাল লাগে না। ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে এসে হোটেলের পেছনের ঝাউবনের মধ্যে বসে আছে বিজয়। পনেরো বছরের ছেলে প্রতীপ ঝাউপাতা ছাওয়া মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে অ্যাস্‌টেরিক্‌স্‌ ইন ব্রিটেন পড়ছে। আর একটু বাদে বাদে আপনমনেই হেসে উঠছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দূরে সমুদ্রের ভেতরে তাকিয়ে রয়েছে বিজয়, দেখছে বেলাভূমির কাছাকাছি জলের ঘোলা রঙ কী করে ক্রমে নীল হয়ে শেষে দিগন্তের কাছে ফিকে সবুজ জেড পাথরের মত হয়ে গিয়েছে। প্রায় মাইল দেড়েক দূরে সাদা পালতোলা একটা নৌকো ডান থেকে বাঁদিকে চলেছে। নৌকোটার পাল টাঙাবার মাস্তুলে কোনো ধাতুদ্রব্য পেরেক দিয়ে আঁটা আছে বোধহয়, সূর্যের আলোয় সেটা মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠছে।

পাইনাস লঞ্জিফোলিয়ার পাতায় ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। চারদিকে সুগভীর শান্তি। শুধু পরিবেশের থেকে উঠে আসা শান্তি নয়, জীবনের কাজ সুচারুভাবে শেষ করে আনায় যে স্বস্তির ভাব আছে—এটা তাই। চল্লিশের ওধারে বয়েস না গেলে এই অনুভূতি হয় না।

বিজয়ের ছেচল্লিশ চলছে।

অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল জীবনের। আজকের দিনটার মতই তারও দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। এখন অপরাহ্ণ। রোদ্দুর আছে বটে—কিন্তু তেজ নেই।

হঠাৎ প্রতীপ বলে উঠল—ওটা কী বাবা গাছের গায়ে?

ছেলে অ্যাসটেরিক্‌সের বই উল্টো করে বুকের ওপর রেখে কাছের একটা পাইনের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে, জমির একটু ওপরে।

বিজয় ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল।

মাটি থেকে দশ-বারোহাত ওপরে গাছের গুঁড়িতে খোদাই করে কী যেন লেখা। এখান থেকে ভাল পড়া যাচ্ছে না। সম্ভবত ইংরেজী দুটো অক্ষর।

বই নামিয়ে রেখে প্রতীপ চোখ সঙ্কুচিত করে আধশোয়া হয়ে লেখাটা পড়বার চেষ্টা করছে।

বিজয় তাকিয়ে দেখল নৌকোটা বাঁদিকে অনেকদূর চলে গিয়েছে। কারা যায় ওইসব দূরের নৌকোয় সাদা পাল তুলে? কোথায় যায়? ধীর, স্বচ্ছন্দ গতি—যেন পৃথিবীর সবটুকু সময় ওরা ঝুলিতে ভরে বেড়াতে বেরিয়েছে। এদিকে তার সূর্য কেবলই মধ্যগগন অতিক্রম করে যায়। যেমন এই কুড়িটা বছর হঠাৎ কীভাবে কেটে গিয়েছে সে এক্ষুনি টের পেল।

ছেলে তার দিকে তাকিয়ে বলল—ইংরেজিতে লেখা রয়েছে B, A, এর মানে কী বাবা?

নৌকোটার দিকে চোখ রেখে বিজয় বলল—কী জানি বাবা, কারো নাম-টাম হবে হয়তো। ধর—ব্রজেন অধিকারী, কিংবা বিকাশ আঢ্য, আরো কত হতে পারে।

—অত ওপরে উঠে নাম লিখল কেন বাবা? কী করে উঠল?

—আহা, এটা অনেকদিন আগে লেখা, বুঝতে পারছিস না? গাছটা তো আর

চিরকালই এত লম্বা ছিল না, তখন লেখা। তারপর গাছটা একটু একটু করে বড় হয়েছে, লেখাটাও উঠে গেছে উঁচুতে—

কিশোরদের মন বেশিক্ষণ একটি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না। সৈকতে চার-পাঁচজন ছেলে জোয়ারের জলে ভেসে এসে আটকা পড়ে যাওয়া গোটাকয়েক কিং-ক্র্যাব দাঁড়া ধরে ঝুলিয়ে আনছিল, প্রতীপ 'একটু দেখে আসি' বলেই দৌড়ে ঢালু বালিয়াড়ি বেয়ে নেমে গেল সেদিকে।

গাছটা চিরকাল এতবড় ছিল না। কুড়ি বছর আগে ঠিক এইখানে—

আজ কত তারিখ? তাহলে কী—

বিজয় অবাক হয়ে গেল। এমন সমাপতনও ঘটে। আজই তো চৌঠা অক্‌টোবর, উনিশশো আশি সাল। কাঁটায় কাঁটায় কুড়ি বছর পূর্ণ হল আজ।

দূরে বেলাভূমিতে চারজন কিশোর উচ্ছল হয়ে উঠেছে আনন্দে। ওর মধ্যে একটি তার ছেলে। কোথায় ছিল ওই কিশোর কুড়ি বছর আগে? একবার সুনন্দার কথা ভাবল বিজয়, প্রতীপের মা। সে আসতে চাইল না। ওবেলা দু-ঘণ্টা ধরে সমুদ্র-স্নানে শরীর ভারী হয়ে এসেছে। সে এখন সুখের ঘুমে মগ্ন হোটেলের ঘরে। কোথায় ছিল সুনন্দা কুড়ি বছর আগে?

কুড়ি বছর আগে একটি আগুনের শিখা তার বুকের মধ্যে বসন্তের হাওয়ায় কাঁপতো। সেই শিখার নাম আরতি।

কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রথম কয়েকবছর অধ্যাপনা করেছিল বিজয়। তারপর আই. এ. এস. হয়ে এই জাঁদরেল চাকরীটা পায়। এখনো মাঝে মাঝে ঋতু পরিবর্তনের সময় যখন উলটো-পাল্‌টা হাওয়া দেয়, ম্লান হলুদ রোদ এসে পড়ে ঘাসে, তখন মন-কেমন-করা অনুভূতির সঙ্গে বিজয় উপলব্ধি করে শৈশবদিন আর ফিরবে না।

উনিশশো ষাট সালের পুজোয় বাবা মার সঙ্গে আরতি বেড়াতে এল সমুদ্রের ধারে। বিজয়ের কাছে কোলকাতা তেতো হয়ে উঠল। সপ্তমীর দিন রাত্তিরে একটা ছোট ঝোলায় দু-একখানা জামা-প্যান্ট নিয়ে সে রওনা হল আরতিরা যেখানে আছে সমুদ্রের ধারের সেই ছোট্ট শহরটির দিকে।

অষ্টমীর দিন বিকেলে বিজয় আরতিকে আবিষ্কার করে ফেলল। মা আর বাবার সঙ্গে সে বেড়াচ্ছিল সাগরবেলায়। পরনে গাঢ় হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি। ভাল করে না তাকালে হলুদ বালির সৈকতের ওপরে আরতিকে প্রায় দেখাই যায় না।

আরতিরা বোধহয় অনেকক্ষণ থেকেই বেড়াচ্ছিল। বিজয় দেখল আরতির বাবা-মা ক্লান্ত হয়ে বালির ওপরে বসে পড়েছেন। আরতি বসবার উদ্যোগ করছে। বিজয় একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। আরতি ওর মুখোমুখি, কিন্তু ওর বাবা-মা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অর্থাৎ বিজয়ের দিকে পেছন করে বসে আছেন।

জাহাজডুবি হওয়া নাবিকের সেমাফোর সিগনাল করার মত বড় করে দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে নাড়ল বিজয়। ব্যাপারটা চোখে পড়ার মতই। আরতি ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই বিজয় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকার ভঙ্গি করল। আরতির চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল ওকে দেখে। বিজয় পেছনে বেলাভূমির প্রান্তে ঝাউবনের দিকে নির্দেশ করে নিজে সেদিকে হাঁটতে শুরু করল।

আরতি বুদ্ধিমতী মেয়ে, নিশ্চয় তার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পেরেছে। কিন্তু প্রেমিকের

আশংকা বড় সাংঘাতিক। কুড়ি-বাইশ পা হেঁটে সে পেছন ফিরে তাকাল আরতি কী করছে দেখবার জন্য। দেখল আরতি ঝাউবনের দিকে নির্দেশ করে বাবা-মাকে কী বলছে। বাব মাথা হেলিয়ে সম্মতি দেবার ভঙ্গি করলেন। আরতি তার দিকে হেঁটে আসতে লাগল।

এই গাছগুলো তখন নতুন পোঁতা হয়েছে। গাছের ছায়ায় আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আভাস আরতি এসে বাঁ হাতটা গাছের গুঁড়িতে রেখে বলল—তুমি এখানে?

—আসতে নেই? মানুষ তো যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে—

—হঠাৎ এখানেই?

—শুনলাম তুমি এখানে আছো। পৃথিবীর আর কোনো জায়গা ভাল লাগলো না বিশ্বাস করো, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল।

আরতি হেসে বলল—তুমি একটা পাগল। অমন করে হাত নাড়ছিলে, যদি বাবা দেখে ফেলত?

—দেখতে পেতেন না। মানুষের কি মাথার পেছন দিকে চোখ থাকে? তাছাড়া উনি আমাকে চেনেন না, হঠাৎ তাকালে এমন ভান করতাম যেন তোমার পেছনে কাউকে ডাকছি।

—তুমি পারোও।

—তা পারি।

দু-জনেই থেমে যেতে পাইনের পাতার ফাঁকে বাতাসের আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আরতিব কপালে বালির ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসার পরিশ্রমে দু-এক ফোঁটা ঘাম। বিজয় গাছের গুঁড়িতে রাখা আরতির হাতের দিকে তাকিয়েছিল। আরতির অনামিকায় একটা সবুজ পাথরের আংটি। কে এক সন্ন্যাসী ওর ছোটবেলায় দিয়েছিলেন পাথরটা। বলেছিলেন সারাজীবন পরতে। পাথরটা ধারণ করার পর থেকেই নাকি আরতি পড়াশুনোয় খুব ভাল হয়ে যায়। কাজেই পাথরটা রয়ে গেছে।

আরতি বলল—কথা বল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে বলে ডাকলে নাকি আমাকে?

—কেন, এমনি পাশাপাশি দাঁড়াতে ভাল লাগছে না?

—লাগছে। কিন্তু আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে—

—সেকি! কেন?

—বাবাকে বলেছি দশমিনিটের মধ্যে ফিরবো। দেরি হলে বাবা খুঁজতে আসবেন।

সম্ভাবনাটা প্রীতিপ্রদ নয়। বিজয় বলল—শোনো, কাল বেলা চারটে নাগাদ আসবে এইখানে? আমি অপেক্ষা করবো।

সুন্দর ভঙ্গিতে ঠোঁটদুটো একজায়গায় জড়ো করে আরতি বলল—উঁ-উ-ম্, তারপর কেউ দেখতে পেয়ে বাবাকে গিয়ে বলুক আরকি, যে, আপনার মেয়েকে দেখে এলাম ঝাউবনের মধ্যে একটা হুমদোপানা লোকের সঙ্গে প্রেম করছে।

—এই, ইয়ার্কি না—আসবে কালকে?

—আসবো।

আরতি চলে গেলে বিজয় পকেট থেকে ছুরি বের করে গাছের গুঁড়িতে নিজের আর আরতির নামের আদ্যক্ষর দু-টি মনোযোগ দিয়ে খোদাই করল অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিন এসেছিল আরতি। নবমীর চাঁদ যখন ঝাউপাতার ফাঁক দিয়ে স্নিগ্ধ আলো ফেলেছে ওদের গায়ে, তখন আরতি ব্যস্ত হয়ে বলল—আর না, এবার আমি যাই—

বিজয় বলল—আজকের এই আশ্চর্য সন্ধ্যেটা আমি কোনোদিন ভুলবো না। আচ্ছা, আজ থেকে বছর কুড়ি বছর পরেও কী আমরা এমনি ভালবাসবো দু-জনকে?

—বাসবো।

—কুড়ি বছর অনেক বড় কথা আরতি।

—আমার ভালবাসা আরও বড় কথা।

—তাহলে প্রতিজ্ঞা করো, আজ থেকে কুড়ি বছর পরে এই তারিখে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা দু-জনে এইখানে এসে দেখা করবো? আছে সাহস এই প্রতিজ্ঞা করার?

আরতি হাসল। বলল—আছে। কারণ আমি জানি কুড়ি বছর পরে আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। তুমি মনে রেখো তারিখটা—

আজ কুড়ি বছর পূর্ণ হল। জীবনের আরও অনেক অমোঘ ঘটনার মত আরতির সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। আরতি এখন এক মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসারের বৌ। অফিসার মশাই সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। এখন তারা কোথায় আছে কে জানে।

আচ্ছা, এক্ষুনি যদি ওদিকের ওই গাছগুলোর ওপাশ থেকে আরতি বেরিয়ে এসে কুড়ি বছর আগের মত পাইনের ডালে তার হাত রেখে দাঁড়ায়, বলে—এই যে দেখো—আমি আমার কথা রেখেছি?

বিজয় যদিও এসেছে, কিন্তু এর জন্য সে কোনো গৌরব দাবি করতে পারে না। কারণ তারিখটা এবং সমস্ত ঘটনাটা তার মনে ছিল না। এখানে এসে এই মাত্র মনে পড়েছে।

নাকি অবচেতন মনের কোনো আশ্চর্য ক্রিয়া এ বছর ঠিক এই তারিখটিতে তাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে? ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভুলে গেলে কী ঘণ্টা বাজে না?

বেলা পড়ে আসছে। ঠিক এই সময়েই তো কুড়ি বছর আগে—হ্যাঁ, ঠিক এই রকম ঝিকিমিকি বেলায়।

বুকের ভেতর কেমন উৎসাহের জোয়ার এল বিজয়ের, ধমনীতে রক্তের পূর্বপরিচিত কল্লোল। যেন এখনো সে প্রথম যৌবনেই পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখুনি তার প্রেয়সী আসবে কথামত দেখা করতে। ফুলের গন্ধ ভাসিয়ে আনছে হাওয়া।

সে কী মনে রাখেনি? কুড়ি বছর কী এতই বিপুল সময়?

সূর্য অস্ত গিয়েছে। সৈকতে আলো থাকলেও ঝাউবনের ভেতর ছায়া ছায়া ভাব। মাথার ওপরে ছুঁচের মত পাইনপাতার ফাঁকে নবমীর চাঁদ। মচ করে শুকনো পাতার ওপর শব্দ হতেই বিজয় চমকে পেছন ফিরে তাকালো।

হোটেলের দিক থেকে এক ভদ্রমহিলা এসে ঢুকেছেন ঝাউবনে। একা। পেছন থেকে আকাশের আলো আসছে বলে ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঠিক তেমনই উচ্চতা, তন্বী শরীর ঘিরে শাড়ি, হেঁটে আসার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি। বিজয়ের হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল।

পরক্ষণেই হাসি পেল তার। এখনো কী আরতি তেমনি তন্বী থাকবে? চেহারা বদলাবে না একটুও?

ভদ্রমহিলা তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জোরে ডাকলেন—রথী, মিঠু—এসো, আর খেলা নয়।

সৈকতের ওপর ক্রীড়ারত দুটি কিশোর ছুটে এল এদিকে। পেছন পেছন প্রতীপ আসছে। ছেলে কাছে আসতে বিজয় বলল—তুই হোটেলে চলে যা। মাকে ঘুম থেকে তোল। আমি একটু বাদে আসছি—

—তুমি এখানে কী করবে বাবা?

—এখানে কিছুই করবো না। ওই ওদিকে একটু কাজ আছে। সেরে আসি—

আকাশে নক্ষত্র ফুটে ওঠা অবধি অপেক্ষা করে বিজয় বুঝল হয় আরতি ভুলে গিয়েছে—যাওয়াই স্বাভাবিক—নয়তো মনে থাকলেও সে আসেনি।

অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতি বদলে গেল। এবার সমুদ্রের বুক থেকে নোনা গন্ধ মাখা হাওয়া ছুটে আসছে হু হু করে। বুকের গোপনে একটা কী রকম যেন কষ্ট, পরিচিত কেউ চিরদিনের জন্য দূরে চলে গেলে যে রকম কষ্ট হয়।

বিজয় কী সুনন্দাকে বিয়ে করে সুখী হয়নি? হয়েছে। সুনন্দার মত প্রেমময়ী গৃহিণী পাওয়া ভাগ্যের কথা। বিজয় বুকে হাত রেখে বলতে পারে একদিনের জন্যও সে সুনন্দার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

তবু কেন আজ তার মন কেমন করছে? কেন মনে হচ্ছে আরতি এলে বেশ হত?

নাঃ, এবার ঝাউবন থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। সন্ধ্যেবেলা একরকম সবুজ রঙের বিষাক্ত সাপ বেরোয় এখানে। হাইওয়ে যেখানে এসে শহরে ঢুকছে, সেখানে একটা কফি বার আছে। বেশ ভাল এস্‌প্রেসো বানায় ওরা। বরং বেড়াতে বেড়াতে এক কাপ কফি খেয়ে আসা যেতে পারে। জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে যখন একা থাকতে ভাল লাগে। এখনই হোটেলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ছুটির মরশুম। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত দেশের লোক এই শহরে ছুটি কাটাতে এসেছে। রাস্তার দু'ধারে পার্ক করা নানা মডেলের গাড়ি। সুবেশ-সুবেশা নর-নারী বেড়াচ্ছে রাস্তায়। বাচ্চা কিছু ছেলে পুঁতির মালা, ঝিনুকের খেলনা, শাঁখের আংটি—এসব নিয়ে ফেরি করছে ভ্রমণার্থীদের কাছে।

কফি বারের সামনে রথদোলের ভিড়। বিজয় একবার ভাবল কফি না খেয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু তারপর কী মনে করে একটাকার একটা নোট পকেট থেকে বের করে হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেল। দুটো ছোকরা অনর্গল কাগজের কাপে ভর্তি কফি এনে সারি দিয়ে রাখছে কাউন্টারে। সবাই তার হাতে টাকা দিয়ে একটা করে কাপ তুলে নিচ্ছে। তাকে নোটটা দিল বিজয়। কাউন্টার এখন একদম খালি। ছেলেটি বলল—জাস্ট এ মিনিট স্যার—

ছেলেটি ও তার সহকারী দু'হাতে চারটি করে কাগজের কাপ অদ্ভুত কৌশলে এনে রাখতেই বিজয় একটা তুলে নিল, এপাশ-ওপাশ থেকে সবাই তুলে নিচ্ছে। ভিড় বাঁচাতে একটু দূরে এসে কফিটা আস্তে আস্তে শেষ করল বিজয়। কাপটা ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দুটো টান দেবার পর হঠাৎ তার মাথায় একটা কথা বিদ্যুৎচ্চমকের মত খেলে গেল।

একটু আগে সে একটা খুব প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটতে দেখেছে, কিন্তু সেইমুহূর্তে তার মস্তিষ্ক সেটা গ্রহণ করেনি।

সে যখন কফির কাপ তুলে নিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই তার ডানদিক দিয়ে আর একটি হাত কফির কাপ নিল। সে হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করছিল একটা পরিচিত সবুজ পাথরের আংটি।

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অস্থির হয়ে ভিড়ের মধ্যে তাকাল বিজয়। না, যে ছিল সে আর এখন নেই ওখানে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক মেয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছে, গল্প করছে সঙ্গী পুরুষদের সঙ্গে—কিন্তু তাদের কেউই আরতি নয়।

সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের গাঢ় হলুদ আলোয় উচ্চকিত হয়ে আছে পরিবেশ। তার মধ্যে কোথাও সে নেই।

কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে আলোর বৃত্তের বাইরে আধো আলো আধো অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল বিজয়।

নেই—নেই। কোথাও নেই।

অথচ একটু আগেই সে দেখেছে ঈষৎ হরিদ্রাভ একটি অনামিকায় সবুজ পাথরের আংটি। সে তো ভুল হবার নয়।

একটা ক্রিম রঙের ফিয়াট স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করল। পেছন থেকে চালকের বাঁদিকে বসে থাকা একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। ওই কী আরতি? ওই যে অনেকটা দূরে একজন দীর্ঘদেহী পুরুষের সঙ্গে গ্যালাক্সি হোটেলের দিকে হেঁটে চলেছে মেয়েটি, স্বল্পালোকে যাকে স্বপ্নপারের দেশের ছায়াছবি বলে মনে হচ্ছে—সে কী আরতি? অথবা ওদিকে যে—

আস্তে আস্তে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল বিজয়। নবমীর চাঁদ হলুদ আর বিবর্ণ হয়ে ঝুলে পড়েছে আকাশে। ম্লান জ্যোৎস্নায় সাদা ঢেউয়ের চূড়াগুলো যেন প্রণাম করতে ছুটে আসছে পায়ের কাছে। তার পেছনে শহর, পেছনে কোলাহল ও সুন্দর পোশাক পরা নর-নারী, জীবনের নানা সমস্যা ও বিচিত্র সমাধান। আর সামনে অবিরাম গর্জনশীল সাগর ম্লান চন্দ্রালোকে শুয়ে থাকা জনহীন সৈকত। কী শান্তি। কী নির্জনতা।

ভালই হয়েছে দেখা হয়নি। কুড়ি বছর অনেকটা সময়। পুরনো ছবির মত অতীতের আরতি চিরজীবী হয়ে থাক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল বিজয়।

বড়বাবু

ইন্দুমাধব ধনী বটে, কিন্তু মদ খান না। মাঝে মধ্যে কোনো পার্টিতে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে সেখানে একটা লিমকা হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। কেউ কড়া পানীয়ের জন্য অনুরোধ করলে বিনীত হেসে বলেন, না ভাই, ডাক্তারের বারণ।

তেষট্টি বছর বয়েসেও ইন্দুমাধবের চেহারা বেশ সুন্দর রয়েছে। সবল, লম্বা শরীর, ফর্সা রঙ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। মাসে একদিন নারাণ নাপিত বাড়িতে এসে তাঁর চুল কেটে দিয়ে যায়। এ ব্যাপারেও তিনি রক্ষণশীল, পাড়ায়-পাড়ায় আজকাল কত এয়ার কন্ডিশনড্ সেলুন হয়েছে, সেখানে আরামদায়ক চেয়ার, সুন্দর টেবিল আর আয়না, চুল-দাড়ি কাটা হয়ে গেলে গায়ে আবার ফিস ফিস করে শিশি থেকে সুগন্ধি স্প্রে করে দেয়। স্মার্ট, ছোকরা কর্মচারীরা খদ্দেরকে 'স্যার' বলে ডাকে। কিন্তু তাঁর ওসব জায়গায় যেতে ভাল লাগে না। একতলার বারান্দায় গায়ে মোটা লংক্লথের চাদর দিয়ে বসে চুল কাটানোর মত আরাম আর কী আছে? তাছাড়া নিজের পাড়ার সেলুনের কাচের জানালায় বড় বড় করে লাল অক্ষরে 'শীততাপ নিয়ন্ত্রিত' কথাটা দেখে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবাই কী একই ভুল করবে? কেন রে বাপু, 'শীতাতপ' লিখতে কী হয়?

কিছুদিন আগে কাঁচি দিয়ে জুলফি ঠিক করতে-করতে নারাণ বলেছিল, বড়বাবু, একবার হালকা কলপ করে নিন, সব চুল বেমালুম কালো হয়ে যাবে। খুব ভাল কলপ এসেছে বাজারে। করবেন?

খোঁচা লেগে যাবার ভয়ে মাথা কাত করে রেখেই গলার মধ্যে শব্দ করে চাপা ধমক দিলেন ইন্দুমাধব, বাজে বোকো না। বয়েস হচ্ছে, চুল তো পাকবেই। তা বলে খোকামি করব নাকি?

ধমক খেয়ে হে-হে করে হাসল নারাণ, বাবুর আবার বয়েস! কী এমন বয়েস হয়েছে আপনার?

ইন্দুমাধব নারাণকে আর একটা ধমক দিলেন বটে, কিন্তু কথাটা শুনতে বেশ লাগল।

সত্যিই তো, এমন কী বুড়ো হয়েছেন তিনি? দেহের চামড়া কোথাও শিথিল হয়নি, পরিশ্রম করবার ক্ষমতাও অটুট রয়েছে। হৃদযন্ত্রে দুর্বলতা নেই। রক্তে চিনি নেই।

কেবল কয়েকদিন ধরে কেমন একটা অস্থিরতা তাঁকে বিরক্ত করছে। ঠিক শারীরীক নয়, বরং মনের অস্থিরতা বলা যেতে পারে। ব্যবসা করছেন, ব্যস্ত রয়েছেন জীবনের নানা ছোটবড় কাজে, কিন্তু মন ভরছে না। প্রত্যহের ছককে অতিক্রম করে সকলের জীবনেই একটা বাড়তি জায়গা থাকে—বাড়তি অবসর। কেউ বাগান করে, কেউ সখের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করে, কেউ পাহাড়ে চড়ে, কেউ বা শুধুই হুল্লোড় করে কাটায়। ইন্দুমাধবের নেশা হল ব্যতিক্রমী কিছু করার। অন্য কেউ করে না এমন কিছু। পশুক্লেশ নিবারণ দিয়ে শুরু করেছিলেন। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর ক্লেশ একসঙ্গে দূর করা সম্ভব নয় বলে বেড়াল দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। দুজন কর্মচারী সারাদিন পাড়া-বেপাড়ার বেড়াল ধরে চিরুনি দিয়ে তাদের লোম আঁচড়ে চুনোমাছ আর ভাত মেখে খেতে দিত। মাসদুয়েকের মধ্যে সমস্ত বাড়ি পাটকিলে, সাদা-কালো আর পাঁশুটে বেড়ালে ভরে গেল। গিন্নী প্রভাবতী অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে গিয়ে দুবার বেড়ালের লেজ মাড়িয়ে আঁচড় খেলেন। অশান্তি এড়াবার জন্য ইন্দুমাধব স্থির করলেন বেড়াল তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলে কী হবে, বেড়ালেরা তখন আরামে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারা তাড়ালেও যেতে চায় না। শেষে বড় দেখে একটা কুকুর পোষায় মার্জার সমস্যার সমাধান হল। কুকুরের দাপটে এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ফাঁকা। এর কিছুদিন বাদে ভেতরে-ভেতরে নতুন কিছু করার তাগিদটা আবার মাথাচাড়া দিতে একখানা বড় দেখে টেলিস্কোপ কিনে বাড়ির ছাদে বসালেন ইন্দুমাধব। গ্রহ-নক্ষত্র দেখবেন। কী একটা পত্রিকায় মহাশূন্যসংক্রান্ত ছবিওয়ালা প্রবন্ধ পড়ে জিনিসটা মাথায় এল। সখ হওয়াতে কিছু বইও কিনে পড়লেন। বাব্বা! এত কাণ্ডকারখানা রয়েছে আকাশে! সৌরজগতের গঠন, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ এসব বিষয় তিনি মোটামুটি জানতেন। কিন্তু নীহারিকা, বড় বড় তারকাপুঞ্জের ছবি দেখে, আলোকবর্ষ বা পার্সেক-এর মত বিপুল দূরত্বের কথা জানতে পেরে তাঁর আগ্রহ ভয়ানক বেড়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল হল দূরবীন ব্যবহার করতে গিয়ে। যা দেখতে চান সেদিকে দূরবীনের মুখ ঘুরিয়ে ফোকাস করার চাকা ঘোরালে যে কাজ মিটল এমন নয়। ব্যাপারটা বেশ কঠিন। এতবড় জিনিস চাঁদ, তাকে দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে আনতেই তাঁর ঘাম ছুটে গেল। যন্ত্র সামান্যতম নড়লেই দেখার জিনিস সরে সরে যায়। কী বিপদ!

পরামর্শের জন্য নামকরা একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপককে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে আনলেন। তিনি এসে ব্যাপার দেখে খুব খুশি। বললেন, বাঃ বিজ্ঞানচেতনা যে

জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তা দেখে বড় ভাল লাগে। বিশেষ করে আপনার মত মানুষ, সারাদিন কত ব্যস্ত থাকেন—তা সত্ত্বেও এই আগ্রহ। বাঃ! আসুন, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—

অধ্যাপক মশাই ইন্দুমাধবকে দূরবীন ব্যবহার করা ভাল করে শিখিয়ে দিলেন, কয়েকটা রাশি ও নক্ষত্রমণ্ডলী চিনিয়ে দিলেন। কিন্তু ইন্দুমাধবের মন ভরল না। চাঁদের গায়ে বড় বড় গর্ত, বৃহস্পতির গোটাচারেক উপগ্রহ ছাড়াও ধোঁয়া ধোঁয়া আরও কীসব দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু বইয়ে দেখা পাতাজোড়া রঙিন সেইসব নীহারিকা, কোয়াসার—সেসব কোথায় গেল? এ যে বড্ড একঘেয়ে, কালো আকাশ আর গোটাকতক তারা। দূর!

তিনি বললেন, শুধু এই দেখতে পাব, আর কিছু না?

অধ্যাপক বললেন, একটু হতাশ হয়েছেন, তাই না? আসলে আপনি বিলিতি বইয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকার যে ছবি দেখেছেন সেগুলো কম্পিউটারে এনহ্যান্সড পিকচার। খালি চোখে তো ওই রঙ দেখতে পাবেন না। তাছাড়া ওইসব ছবি বিদেশের বৃহত্তম কোটি কোটি টাকা দামের দূরবীনে তোলা। এত ছোট যন্ত্রে—বুঝলেন না? আর আমাদের শহরের বায়ুমণ্ডলে যা ধোঁয়া আর ধূলো—আমাদের পরিভাষায় আমরা বলি 'অ্যাটমসফেরিক সুপ'—এ জিনিস ফুটো করে কিছু দেখা যায় না ভালভাবে। পৃথিবীর সব বড় দূরবীনই এই কারণে শহরের বাইরে কোনও পাহাড়ের ওপরে বা ওইরকম জায়গায় বসানো।

সবই বুঝলেন ইন্দুমাধব, কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবু যন্ত্রটা নিয়ে মাসতিনেক আকাশ পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন, বর্তমানে সেটি খাপে ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে।

এবার?

আবার সেই অস্থিরতা, আবার সেই কী-করি কী-করি ভাব।

মেয়ের বিয়ের পর থেকে একাকীত্বের বোধটাও খুব বেড়েছে। একমাত্র মেয়ে। অফিসে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? প্রভাবতী আজকাল বেশির ভাগ সময়টা পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকেন। ইন্দুমাধব নাস্তিক নন, কিন্তু সেভাবে আনুষ্ঠানিক কোনো ধর্মাচরণে তাঁর আগ্রহ নেই। গল্প-উপন্যাস পড়তেও তেমন ভাল লাগে না। তাহলে করেন কী?

সেদিনের রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে প্রভাবতী বললেন—তোমাকে কদিন যেন কেমন শুকনো দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—কই, কিছু না তো। ও এমনি।

—মেয়ে-জামাই আসবাব কথা সামনের হপ্তায়। আমি জামাইকে বলেছিলাম কয়েকদিন থাকতে। কিন্তু তার জরুরী কাজ আছে, সে বোধহয় থাকতে পারবে না। তুমি একটু বোলো যাতে মেয়েটাকে দিনদশেক রেখে যায়। ওর তো থাকা হয় না—

—সে বলব এখন। তোমার আজ বিকেলে আর মাথা ধরেনি তো?

—নাঃ। যাই বল বাপু, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে আমি অনেক ভাল আছি।

—ভালই তো। যার যে ওষুধ কাজে লাগে—

রাত্তিরে সামান্যই খান ইন্দুমাধব। দুখানা হাতে গড়া আটার রুটি, কিছু সব্জি, বড় একটুকরো মাছ কিংবা মসলা না দিয়ে রান্না করা মুরগির ঠ্যাং। খাওয়ার পর রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ।

বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার কিছু একটা শুরু করে ফেলা দরকার।

পুরনো বেনারসী শাড়ির একটা অভিনব সংগ্রহ গড়ে তুলবেন? কয়েকজন কর্মচারীকে

কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তারা সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে শাড়ি সংগ্রহ করবে। একশো, দুশো কী তিনশো বছরের পুরনো বেনারসী।

নাঃ, এ ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না।

বিছানায় শুয়ে অনেক রাত্তির অবধি চিন্তা করলেন ইন্দুমাধব। কিছু মাথায় এল না।

পরের দিন অফিসে যাওয়ার পথে ড্রাইভার হরিপদ বলল—পেছনের চাকাদুটোয় হাওয়া কম লাগছে। একবার চেক করে নিই বড়বাবু? সামনেই পাঁচুর দোকান—

—তাড়াতাড়ি কর, সাড়ে-দশটায় লাহিড়ী এসে বসে থাকবে।

চাকায় হাওয়া ভরে পাঁচু জানালার কাছে এসে বলল—নমস্কার বাবু, ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ পঞ্চানন?

—ভাল না বাবু, মেয়েটার অসুখ। এদিকে কাজে না এলেও পেট চলে না—

—কী হয়েছে তোমার মেয়ের? জ্বর?

—জ্বরের কী আমরা পরোয়া করি? জ্বর হলে তো বেঁচে যেতাম। আমাদের রামলাল ডাক্তারের মিক্সচার আর পুরিয়া খুব কাজে দেয়, একশিশি খেলেই যে কোনো জ্বর ছুটে পালায়। অনেক সময় তাও লাগে না বাবু, দুদিন উপোস করে শুয়ে থাকলেই সেরে যায়। এ তা নয়। বলছে মাথায় ব্যথা, পড়াশুনো করতে পারে না, মাথাব্যথা শুরু হয়। কর্পোরেশনের ইস্কুলে পাঁচ ক্লাসে পড়ে। আজ আট-দশ দিন ইস্কুলে যেতে পারছে না—

—ডাক্তার দেখাওনি?

—দেখিয়েছি বাবু। ওই রামলাল ডাক্তার। লাল-নীল সব বড়ি দিল, বলল মাথায় ব্যথা হলে খেতে। খেলে তখনকার মত কম থাকে, আবার বাড়ে। এখন বলছে বড় ডাক্তার দেখাতে। এখানে যা রোজগার করি তাতে পেটই চলে না, তার বড় ডাক্তার! কী যে করি বাবু—

সামান্য একটু চিন্তা করলেন ইন্দুমাধব, তারপর বললেন—তুমি তো আমার বাড়ি চেনো?

—আজ্ঞে চিনি।

—আজ সন্ধে সাড়ে-ছ'টায় মেয়েকে নিয়ে আসতে পারবে একবার?

অবাক চোখে তাকিয়ে পাঁচু বলল—যাব, নিশ্চয় যাব। বাবু, বাবু আপনি—

ইন্দুমাধব বললেন—চলো হরিপদ, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অফিসে বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যেই বিকেল চারটে নাগাদ ইন্দুমাধব অরিন্দম বসুকে ফোন করলেন।

—কে, ডাক্তার? তোমার চেম্বার শেষ হচ্ছে কখন?

—তা হতে হতে ছ'টা। কেন?

—সাড়ে-ছ'টা নাগাদ একবার আমার বাড়ি আসতে পারবে?

—কেন? কী হল আবার? বউদির মাইগ্রেইনটা বেড়েছে নাকি?

—না, আমাদের কিছু নয়। একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখতে হবে।

—ঠিক আছে, আসছি, কফি আর মাছভাজা যেন তৈরি থাকে—

সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে এলেন ইন্দুমাধব। প্রভাবতী বললেন—আজ এত তাড়াতাড়ি যে? ব্যাপার কী?

—কেন, তাড়াতাড়ি ফেরায় তুমি খুশি হওনি বুঝি? আচ্ছা, কাল থেকে আবার দেরি করে ফিরব। কেমন?

—ওমা, ও আবার কী কথা? আমি বুঝি তাই বললাম? বেশ মানুষ তুমি—

প্রৌঢ় বয়েসের দাম্পত্যালাপ ভারি মিষ্টি। দুজনে চোখে চোখে তাকিয়ে হেসে সেটুকু উপভোগ করলেন। তারপর ইন্দুমাধব বললেন—ডাঃ বসুকে আসতে বলেছি সাড়ে ছ'টায়, সেজন্য চলে এলাম—

শঙ্কিত মুখে প্রভাবতী বললেন—ডাক্তারবাবুকে? কেন? তোমার কী শরীর খারাপ?

—না না, অন্য একজনকে দেখবার জন্য। চেনা লোক, আমার গাড়ির কাজ-টাজ করে। গরিব মানুষ। তার মেয়েকে একবার দেখাব—

প্রভাবতী স্বামীর খেয়ালখুশির ব্যাপার ভাল করেই জানেন। তিনি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

ডাক্তারবাবু আসার আগেই পাঁচু এল তার মেয়েকে নিয়ে। খবর পেয়ে ইন্দুমাধব নিচে নামলেন। বসবার ঘরের দরজার কাছে সসঙ্কোচে গায়ে গায়ে লেগে বাপ আর মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচু কাজের পোশাক ছেড়ে একটু ভদ্রস্থ গোছের প্যান্ট আর শার্ট পরে এসেছে। কিন্তু তার কনুইয়ের কাছে এখনো বেশ কিছুটা তেল-কালি লেগে আছে। তার মুখে বোকা বোকা কৃতজ্ঞ হাসি।

পাঁচুর মেয়েকে দেখে ভাল লাগল ইন্দুমাধবের। ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, মুখের গড়ন মিষ্টি। আধময়লা একটা ছিটের ফ্রক পরে আছে মেয়েটা, পায়ে সস্তা রবারের চটি। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন সামান্য একটু ঘষামাজা করলেই এই মেয়েকে আর চেনা যাবে না।

ইন্দুমাধব বললেন—বোসো পঞ্চানন। এই বুঝি মেয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু—

আঙুল দিয়ে মেয়েকে সামান্য ঠেলে দিল পাঁচু। মেয়েটা এগিয়ে এসে ইন্দুমাধবকে প্রণাম করল। তিনি বললেন—হয়েছে হয়েছে, কী নাম তোমার?

—অলকা।

—বাঃ, সুন্দর নাম।

ইন্দুমাধব লক্ষ্য করলেন মেয়েটার মুখ শুকনো, ক্লিষ্ট। চোখের কোণ বসা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী এখনো মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

অলকা ওপরে-নিচে মাথা নাড়ল।

—ভয় নেই, সেরে যাবে।

অলকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দুমাধব তার হাত ধরে নিজের পাশে বসালেন। পাঁচু দাঁড়িয়েই ছিল, তাকে বললেন—বোসো না ওই চেয়ারটায়, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ব্যস্ত হয়ে দরজার পাশে রাখা কাঠের চেয়ারখানায় পিঠ সোজা করে বসল পাঁচু।

পৌনে সাতটায় অরিন্দম বসু এলেন।

—সরি, একটু দেরি হয়ে গেল, রাস্তায় যা জ্যাম! কই, পেসেন্ট কই?

—এই যে, এই মেয়েটি। এর নাম অলকা। দেখো তো ভাল করে ওর কী হয়েছে—

অলকাকে দেখে ডাঃ বসু একটু অবাক হলেন, পাশ ফিরে একবার চেয়ারের ওপর উটের ভঙ্গিতে বসে থাকা পাঁচুকেও দেখলেন, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার মেয়ে?

'আপনি' শুনে পাঁচু তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মেয়ে—

—কী সিমটম, মানে কী কষ্ট ওর?

—আজ্ঞে, সব সময় মাথা ব্যথা করে, ছটফট করে, ইস্কুলে যেতে পারে না—

অলকা বলল—বমি হয়।

পাঁচু অবাক হয়ে বলল—বমি হয়? কই, বলিসনি তো—

—আজ সকালে হয়েছে। তুমি তখন কাজে।

ডাঃ বসু বললেন—ঠিক আছে, এদিকে সরে এসো তো খুকি।

মিনিট পনেরো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করার পর ডাঃ বসু বললেন—এর চোখটা একবার দেখিয়ে নিতে হবে। এমনিতে তো কোনও কারণ পাচ্ছি না। সে রিপোর্ট পেলে পরবর্তী স্টেপ ভাবব—

ইন্দুমাধব বললেন—কাকে দেখালে ভাল হয়? তুমি রেফার করে দাও, আমি দেখছি—

—এর বাবা পারবে? কে নিয়ে যাবে?

—পঞ্চানন না পারে আমি ব্যবস্থা করব। তুমি লিখে দাও—

তারপর পাঁচুর দিকে তাকিয়ে বললেন—মেয়ের চোখ দেখাতে হবে। কাল এই সময়ে ওকে আবার আমার এখানে নিয়ে এসো। আমার লোক সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আনব। বুঝেছ?

পাঁচু আবার বোকার মত হেসে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়, তারপর মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

অরিন্দম বসু বললেন—লোকটি কী আপনার কর্মচারী নাকি?

—না, কর্মচারী নয়। এমনি চিনি—

—তাহলে?

ইন্দুমাধব হেসে বললেন—তাহলে কী? এমনি কিছু করতে নেই কারো জন্য? পরিচয় বা আত্মীয়তা থাকতেই হবে এমন কোনো শর্ত আছে নাকি? বেচারি গরিব লোক, ওর মেয়ের চিকিৎসা করানোর সাধ্য নেই, আমি করে দিচ্ছি, ব্যস। এর মধ্যে আর কথা কী? তুমি হয়তো যুক্তি দেখাতে পারো—কতই তো লোক আছে আমাদের দেশে, তাদের সবার জন্য কী আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারব? না, তা পারব না। তবে যতটুকু পারি, ততটুকু অন্তত করি—

একটা নিশ্বাস ফেলে ডাঃ বসু বললেন—ভাল। গুড আইডিয়া।

পরের দিন অলকার চোখ দেখানো হল। চোখের ডাক্তার বললেন—অপটিক নার্ভের ওপর প্রেসার আছে বলে মনে হচ্ছে। ই ই জি করান।

মাখনছাড়া টোস্ট, চিনিছাড়া চা আর ছানা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে ইন্দুমাধব চোখের ডাক্তারের রিপোর্ট পড়লেন। তাঁদের রাস্তার মোড়েই নানারকম ডাক্তারি পরীক্ষার একটা কেন্দ্র হয়েছে। দুপুরে অফিস থেকে ছোকরা সেক্রেটারি বিনয় সেনকে পাঠিয়ে অলকার ই ই জি করানোর ব্যবস্থা করলেন। পরের দিন সকালে বিনয় সেন রিপোর্ট নিয়ে অফিসে এল। আগ্রহ করে খাম খুলে পড়লেন বটে ইন্দুমাধব, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কঠিন কঠিন সব ডাক্তারি শব্দ। এ কী ভাষা? ইংরেজি, না হিব্রু?

বিকেলে একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়ে নিজেই চলে গেলেন অরিন্দম বসুর চেম্বারে। ডাঃ বসু রিপোর্ট দেখে বললেন—নাঃ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। চোখের নার্ভের ওপর প্রেসার আছে ঠিকই। কিন্তু কারণ বোঝা যাচ্ছে না। আরও টেস্ট করতে হবে—

—কী টেস্ট?

ডাঃ বসু বিপন্ন মুখ করে বললেন—আমার ভারি ইয়ে লাগছে। এদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা তেমন কিছু নয়—কোনো বড় হাসপাতালের আউটডোরে বরং টিকিট করে যদি দেখিয়ে নেয়, তাতে সময় লাগবে বটে—কিন্তু সাধারণ লোক তো সেভাবেই চিকিৎসা করাচ্ছে। এ সব পরীক্ষায় বড্ড খরচ—

ইন্দুমাধবের বিগত কয়েকদিনের অস্থিরতা কেটে গিয়েছে। তিনি করবার কাজ খুঁজে পেয়েছেন। ডাক্তার বসুর কথায় চোয়াল শক্ত করে বললেন——ডাক্তার, আমি খরচের কথা জিজ্ঞেস করিনি। আমি জিজ্ঞেস করছি—কী পরীক্ষা? কোথায় হবে? লিখে দাও—

কথা না বাড়িয়ে অরিন্দম বসু বললেন—বেশ। ব্রেনের সি. টি স্ক্যান করিয়ে আনুন। রিপোর্ট দেখে তারপর কী করা উচিত ভাবব।

—কোথায় করালে ভাল হয় লিখে দাও।

রোজ রোজ লোক পাঠিয়ে বাড়ি থেকে মেয়েটাকে ধরে আনা অসুবিধা। রোগী হাতের কাছে না থাকলে চিকিৎসা হয় না। ডাঃ বসুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসে ইন্দুমাধব বললেন—হরিপদ, এখন কী পঞ্চাননকে ওর কাজের জায়গায় পাওয়া যাবে?

—যেতে পারে বাবু। সাতটা অবধি তো থাকে।

—চলো দেখি একবার।

একমুঠো ছেঁড়া চট দিয়ে পঞ্চানন হাতের কালি মুছছিল, গাড়ি দেখে সে প্রায় দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। ইন্দুমাধব জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কাজ হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ বড়বাবু। কেন? গাড়ির কোনো কাজ করে দিতে হবে?

—না। আমি তোমার বাড়ি যাব। চলো, তাড়াতাড়ি করো।

পাঁচু গত দু-তিনদিনের ঘটনায় অবাক হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝেছে যে, ইন্দুমাধবকে কোনো প্রশ্ন না করে তাঁর কথামত চলাই ভাল। সে গাড়িতে উঠে সামনের সিটে হরিপদর পাশে বসল।

পাঁচুর প্রদর্শিত পথে গাড়ি চালিয়ে মিনিট পঁচিশ বাদে হরিপদ পূর্ব কলকাতার যে বসতির সামনে তাঁকে হাজির করল, তার চেহারা দেখে ইন্দুমাধবের প্রথমে মনে হল নিজে না এসে কাউকে পাঠালেই বোধহয় ভাল করতেন। পরমুহূর্তেই সে ভাব দমন করে গাড়ি থেকে নেমে পাঁচুকে বললেন—কই, কোথায় তোমার ঘর? নিয়ে চলো—

গায়ে গায়ে লাগা খোলার চালের শ'খানেক বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই জনবসতি। সরু পায়ে চলার পথ কোথাও টালিপাতা, কোথাও কাঁচা। আব্রু বাঁচাবার জন্য প্রায় সব বাড়ির দরজায় ছেঁড়া শাড়ি বা চটের পর্দা টাঙানো। অর্ধোলঙ্গ ক'টি শিশু ছুটোছুটি করে খেলা করছে। বাতাসে বাসি প্রস্রাবের গন্ধ।

দুটো বাঁক ফিরে নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচু ডাকল—অলকা, অলকা রে! দেখে যা কে এসেছে—

ঘরের মধ্যে থেকে পাঁচুর শ্যামলা রঙের রোগা বউ বেরিয়ে এসে ইন্দুমাধবকে দেখে থতমত খেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পেছনে এল অলকা, সে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে রইল। পাঁচু তার বউকে বলল—বুঝলে তো, ইনিই বড়বাবু—যিনি খুকির চিকিচ্ছে করাচ্ছেন। খুব বড় মানুষ, খুব ভাল মানুষ—

তারপর ইন্দুমাধবের দিকে ফিরে বলল—আপনাকে যে কোথায় বসতে দিই বড়বাবু—

ইন্দুমাধব বললেন—ওসব কথা এখন ছাড়ো। তোমার বউয়ের নাম কী?

—কমলা।

ইন্দুমাধব পাঁচুর বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—শোনো কমলা, তোমার মেয়েকে আমি কিছুদিনের জন্য আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, তোমার আপত্তি নেই তো? ওর চিকিৎসা করতে হবে। সে চিকিৎসা এখানে রেখে সম্ভব নয়। ভয় নেই, অলকা আমার কাছে ভাল থাকবে—

পাঁচু বলল—না বড়বাবু, আপনার কাছে আবার ভয় কী? নিয়ে যান আপনি—

ইন্দুমাধব ধমক দিয়ে বললেন—তুমি চুপ করো! তোমার সঙ্গে কথা বলছি না। কী হল কমলা, বলো তোমার কী মত?

পাঁচুর বউ বলল—ও তো আপনারই মেয়ে। নিয়ে যান—

—বেশ, ওকে তৈরি করে দাও তাহলে। তোমরা রোজ গিয়ে ওকে দেখে আসতে পারো। সেটা উচিতও, নইলে ওর মন খারাপ হবে।

পাঁচু ঘরের মধ্যে থেকে একখানা তেপায়া কাঠের গোল টুল বের করে গলিতে পেতে দিয়ে বলল—বসুন বাবু, আমরা মেয়েটাকে একটু গুছিয়ে দি—

অলকার জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে পাঁচু আর তার বউ পড়ল বিপদে। কী কী জামাকাপড় দেওয়া যায় মেয়ের সঙ্গে? কিসে করেই বা দেওয়া যায়? জামাকাপড় ছাড়া আর কী মেয়ের প্রয়োজন হতে পারে?—হলুদ আর লাল রঙের ফ্রকদুটো দাও গো, চিরুনি আর ফিতে দিয়েছ? পিচবোর্ডের বাক্সটায় ভরে দাও পাউডার, নেলপালিশ আর দাঁতের মাজন। দেরি কোরো না, বড়বাবু বসে রয়েছে বাইরে—

ইন্দুমাধব কাঠের টুলে বসে ঘামছিলেন। এদিক-ওদিক থেকে অনেক কৌতূহলী মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বেঁটেপাঁচুর ঘরের সামনে টুলে বসে সুটপরা বাবু। ব্যাপার কী রে? ব্যাপার কী?

শেষে অধৈর্য হয়ে ইন্দুমাধব ডাক দিলেন—পঞ্চানন, কী হল? দেরি কেন?

—এই যে বড়বাবু, হয়ে এল। কাপড়চোপড় গুছিয়ে দিচ্ছি একটু—

—কী দিচ্ছ দেখি, এদিকে আনো।

সলজ্জ মুখে পাঁচু একটা কাম্বিসের ব্যাগ আর পিচবোর্ডের বাক্সটা নিয়ে আসে বাইরে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে ইন্দুমাধব বললেন—এইজন্য দেরি করছ তুমি! কিছু গোছাতে হবে না, তুমি মেয়েকে দাও আমার সঙ্গে। ওর যা দরকার হবে আমি কিনে দিচ্ছি—

অলকা মেয়েটা ভারি অদ্ভুত। এই বয়েসের ছেলেমানুষ মেয়ে বাবা-মাকে ছেড়ে অচেনা কোনো লোকের সঙ্গে কোথাও যেতে সচরাচর রাজি হয় না। সে কিন্তু বিনা আপত্তিতে এসে গাড়িতে উঠল। হরিপদ তাকে সামনে বসাতে যাচ্ছিল, ইন্দুমাধব বললেন—ঠিক আছে, ও আমার সঙ্গে বসবে।

বাড়ি যাবার পথে গাড়ি থামিয়ে ভাল রেডিমেড পোশাকের দোকান থেকে অলকাকে বেশ কিছু জামাকাপড় কিনে দিলেন ইন্দুমাধব, বালিকার উপযোগী কিছু সাজের জিনিসও দিলেন। সেগুলো আঁকড়ে ধরে অলকা বড় বড় চোখ করে বসে রইল তাঁর পাশে। গাড়ি চড়া, এত দামি পোশাক পাওয়া—এসব তার জীবনে আর কখনো ঘটেনি। অলকার আনন্দিত বিস্ময়, পাঁচু আর তার বউয়ের বিহ্বল কৃতজ্ঞতা—এগুলো খুব মৃদু একটা

তৃপ্তির উপলব্ধি ছড়িয়ে দিচ্ছিল ইন্দুমাধবের মনে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আজ তোমার মাথা ধরেনি?

—না। রোজ ব্যথা করে না। কাল করবে।

—আর করবে না। আমি তোমাকে খুব ভাল ডাক্তার দেখাব, তোমার কষ্ট সেরে যাবে।

বাড়িতে রান্না করে আর প্রভাবতীর খুচরো কাজকর্ম করে দেয় শান্তি নামে একটি মেয়ে। ঠিক হল অলকা একতলায় শান্তির সঙ্গে শোবে। ইন্দুমাধব স্ত্রীকে বললেন—মেয়েটাকে একটু ভাল করে খাওয়াও তো। ওর ম্যালনিউট্রিশন আছে, রোগ কেবল ওষুধে সারে না।

রাত্তিরে খাওয়ার সময়ে নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করলেন ইন্দুমাধব। সরু সাদা বাসমতী চালের ভাত, ঘন অড়রের ডাল, দু-টুকরো বড় বড় কাটা রুই মাছ, পটলের তরকারি, দু-খানা রাজভোগ আর সবশেষে একগ্লাস দুধ। ইন্দুমাধব ভেবেছিলেন—ছোট মেয়ে, একটু বকাবকি করে খাওয়াতে হবে। কিন্তু অলকা তাঁকে সে অবকাশ দিল না। আশৈশব জমিয়ে রাখা বুভুক্ষা নিয়ে সে সব খেয়ে ফেলল।

ইন্দুমাধবের কিনে দেওয়া পোশাক পরে তার চেহারারও আশ্চর্য পরিবর্তন হল। ফুটফুটে সুন্দর মুখখানা, চোখে সারল্য দামি পোশাকে তাকে মনে হচ্ছে এবাড়িরই মেয়ে।

ব্রেনের স্ক্যানিং হয়ে গেল দুদিনের ভেতর। রিপোর্ট দেখে অরিন্দম বসু বললেন—একটা কথা বলি, আপনি কী যতদূর চিকিৎসা করতে হয় করাবেন?

ইন্দুমাধব বললেন—মানে? আমি কী ইয়ার্কি করছি নাকি?

—তা নয়। আমি কী বলতে চাই শুনুন। আমি আপনার পারিবারিক চিকিৎসক, আমাকে দেখানো বা দু-একটা টেস্ট করানো—তা সে যাই খরচ হোক না কেন—সে এক ব্যাপার। আর এ যা বুঝছি, এর চিকিৎসা ঠিকভাবে করতে হলে তা বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়বে। এখন আপনি যা বলেন—

—কী হয়েছে মেয়েটির?

—রিপোর্ট ভাল নয়। মনে হয় ইনট্রা-ক্র্যানিয়াল গ্রোথ আছে—মানে মাথার ভেতরে টিউমার গোছের। তবে এ ব্যাপারে আমি এক্সপার্ট অথরিটি নই। ওকে এক্ষুনি কোনো ভাল নিউরোসার্জনের কাছে পাঠাতে হবে। তিনি আরও কয়েকটা পরীক্ষা করতে বলতে পারেন। ডায়াগনোসিস কনফার্মড হলে সে টিউমার সার্জিক্যালি রিমুভ করতে হবে। কলকাতায় করা যায়, সাউথ ইন্ডিয়াতেও হতে পারে। এখন ভাবুন—

—সব মিলিয়ে কী রকম খরচ হতে পারে?

—যদি অপারেশন অবধি যেতে হয়, তাহলে—সবকিছু নিয়ে কম করে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। এটা কিন্তু আমি খুব কম করেই ধরলাম—

ইন্দুমাধব বললেন—বেশ, তুমি নিউরোসার্জেনকে কেস রেফার করো—

অরিন্দম বসু ইন্দুমাধবের দিকে তাকালেন। বললেন—তাহলে অল দি ওয়ে?

—অল দি ওয়ে।

রেফারেন্সের চিঠি লিখতে লিখতে ডাঃ বসু বললেন—মেয়েটা ভাগ্যবান।

অলকার যে ভাগ্য সত্যিই ভাল সেটা অস্বীকার করতে পারল না কেউ। ইন্দুমাধবের নিজের অফিসেও ঘটনাটা রটে গেল ড্রাইভার হরিপদর মাধ্যমে—লাখ টাকা খরচ করে

পাঁচু মিস্তিরির মেয়ের চিকিৎসা করাচ্ছেন বড়বাবু। পাঁচুরও কপাল, মেয়েরও কপাল। আর বড়বাবু দেবতুল্য লোক। অফিসের এই গুঞ্জন আর ফিসফাসটা বুঝতে পারলেন ইন্দুমাধব।

মৃদু তৃপ্তির বোধ মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ডাঃ বসুর মারফত জানল কেউ কেউ। তারা অনেকে ফোন করে ইন্দুমাধবের মানবপ্রেমের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

যেদিন সন্ধেবেলা অলকাকে নিউরোসার্জেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন দুপুর থেকে তার আবার ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। বমি হল পরপর তিন-চারবার। প্রভাবতী ভয় পেয়ে স্বামীকে ফোন করলেন। ইন্দুমাধব বললেন—ডাঃ বসু ব্যথা বাড়লে যে ওষুধটা খাওয়াতে বলেছিলেন সেটা দিয়ে দাও। ভয় নেই কিছু। আজই তো বড় ডাক্তার দেখবে। আমিও তাড়াতাড়ি ফিরছি—

—পরের মেয়ে, ভয় করে—

—কিছু ভয় নেই। ওষুধটা দাও।

বড় ডাক্তার অলকাকে দেখে বললেন—হ্যাঁ, মাথায় টিউমার আছে।

ইন্দুমাধব নিজে গিয়েছিলেন অলকাকে নিয়ে। তিনি বললেন—তাহলে এখন?

—ব্রেনের কয়েকটা ছবি তুলতে হবে, গ্রোথ লোকালিটি পিনপয়েন্ট করার জন্য। একটা ফুল ব্লাড পিকচার চাই। আরও রুটিন কিছু পরীক্ষা আছে, সে সব করতে হবে—

—অপরাশেন কোথায় হবে?

—কলকাতায় করাতে পারেন, আমিই করে দেব। কিছুদিন আগে অবধি সবাই সাউথ ইন্ডিয়ায় যেত। আমরা আজকাল চ্যালেঞ্জ করে এখানে আরও ভাল কাজ করছি। তাছাড়া পরে কোনো কমপ্লিকেশন দেখা দিলে আপনাকে বারবার সাউথে ছুটতে হবে। কেন তা করবেন? এখানে কী ভাল ডাক্তার নেই?

—মেয়েটি সেরে যাবে তো?

—দেখুন, সামান্য অ্যাপেনডিক্স কাটারও রিস্ক আছে, আর এ তো ব্রেন সার্জারি। তবে আমার মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে। বাচ্চা মেয়ে, ওর জীবনীশক্তিও ওকে সেরে উঠতে সাহায্য করবে।

ইন্দুমাধব বললেন—বেশ, আপনিই করুন তবে। সব ঠিক করে দিন—

সেদিন রাত্তিরে খেতে বসে পাঁচু তার বউকে বলল—মুখ অমন অন্ধকার কেন?

—মেয়ের জন্য মন কেমন করছে। হ্যাঁগো, আমাদের মেয়ের জন্য এত করছে কেন তোমার বাবু?

—বাবু ভাল লোক, তাই। ভাল লোক নেই দুনিয়ায়? তাহলে এখনো দিন রাত হচ্ছে কী করে?

আলু ঝিঙে কুমড়ো আর পেঁয়াজ দিয়ে তরকারিটা আজ জব্বর রেঁধেছে বউ। ভাল লাগায় তিনখানা রুটি বেশি খেয়ে ফেলল পাঁচু। কিন্তু তার বউয়ের আজ খিদে নেই। সে একটু একটু রুটি ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে।

আদর করে পাঁচু বলল—খাচ্ছিস না কেন, খা—

শঙ্কিত চোখ তুলে বউ বলল—আমার মেয়েটাকে নিয়ে নেবে না তো বড়বাবু?

আশঙ্কার একটা শিহরণ বুকের কাছে পাকিয়ে ওঠে, তবু পাঁচু হেসে বলে—তুই একটা

পাগল! বড়বাবু কী করবে অলকাকে নিয়ে? খা, খেয়ে নে—

প্রায় এই সময়েই ইন্দুমাধব আর প্রভাবতীর সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসে ছিল অলকা। এই কদিনে তার প্রাথমিক বুভুক্ষার সরল প্রকাশ কমে এসেছে। এখন তার পেটে আর সর্বদা খিদে খিদে ভাব থাকে না, ভাল খাবার দেখলেই লোলুপ হয়ে ওঠার ব্যাপারটাও স্তিমিত হয়ে এসেছে। যেমন আজ বিকেলে সে যে পরিমাণ জলখাবার খেয়েছে তাতে তার এখন আর বিশেষ খিদে নেই। কিন্তু ইন্দুমাধব তাকে জোর করে একগ্লাস দুধ খাওয়াচ্ছেন। এ পরিবারের খাওয়ার টেবিলে এখন তাকে বেশ মানায়।

ইন্দুমাধব বললেন—অলকা, ডাক্তারবাবু বলেছেন তোমার একটা ছোট্ট অপারেশন করতে হবে। তাহলে আর মাথার ব্যথা হবে না। তুমি ভয় পাচ্ছ না তো?

অলকা মাথা নাড়ল। তার বয়েসে মৃত্যুভয় থাকে না, উদ্বেগের কালো ছায়া থাকে না। সে জিজ্ঞাসা করল—ব্যথা লাগে?

—না। তুমি জানতেই পারবে না।

অলকা একটু একটু করে চুমুক দিয়ে দুধ খেতে লাগল। ব্যথা না লাগলে তার আপত্তি নেই।

পরের দিন পাঁচুকে অফিসে ডাকিয়ে আনলেন ইন্দুমাধব। বললেন শোনো, শুক্রবার অলকাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হচ্ছে। তার চার-পাঁচদিনের মধ্যে অপরাশেন হবে। তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে তো?

—আমি আর কী বলব বড়বাবু? আপনি যা ভাল বোঝেন, সবই তো আপনি করছেন—

—আমার বোঝার ব্যাপার নয় এটা। তুমি ওর বাবা, তোমার মত ছাড়া অপরাশেন হতে পারে না। অপারেশনের আগে 'বন্ড সই' করতে হবে। বন্ড বোঝো? লিখে দিতে হবে তোমার সম্মতিতে ডাক্তারবাবু অপারেশন করছেন। সে বন্ডও তোমাকেই সই করতে হবে।

পাঁচুর মুখ একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বলল—এতে ভয় আছে বড়বাবু?

—দেখ পঞ্চানন, মিথ্যে বলে লাভ নেই। মাথার অপারেশন কঠিন জিনিস, তবে যিনি করবেন তিনি ভারতবিখ্যাত লোক। আশা করা যায় অলকা ভাল হয়ে উঠবে—

—আর অপারেশন না করলে? ওষুধে সারে না?

—না। তা যদি সারত তাহলে আমি এত ঝামেলা আর খরচের মধ্যে যেতাম? আমার টাকার দাম নেই? এখনি অপারেশন না করলে ছ-মাসের মধ্যে অলকা পঙ্গু হয়ে পড়বে। তারপর যদি কিছুদিন বাঁচেও সে কষ্ট তোমরা চোখে দেখতে পারবে না। এখন ভেবে দেখো—

ফ্যাকাশে মুখে পাঁচু বলল—না না, অপারেশন হোক, হোক—

—ঠিক আছে। ভর্তির দিন আমার সঙ্গে যাবে। সময় বলে দেব—

সেদিন সন্ধের পর মেয়েকে দেখতে এসে অবাক হয়ে গেল পাঁচুর বউ।

ফলসা রঙের ফ্রক পরে আছে অলকা, পায়ে বাড়িতে পরার চপ্পল, মুখে খুব হালকা প্রসাধন—শান্তি সাজিয়ে দিয়েছে। অলকা চলাফেরাও করছে যেন অন্যভাবে। মাকে দেখে সে এসে হাত ধরে টেনে বলল—এসো মা, তোমাকে মাছ দেখাই, কাচের বাক্সে জল দিয়ে রাখা রঙিন মাছ—

অ্যাকোয়ারিয়াম রয়েছে ভেতরের প্যাসেজে। অলকা হাত ধরে টানলেও পাঁচুর বউ

বসবার ঘরের বাইরে যেতে চাইল না। দেখতে পেয়ে প্রভাবতী বললেন—যাও না, ভেতরে যাও। মেয়ে বলছে—

রঙিন মাছ দেখল অলকার মা, রঙিন টিভিতে একজনকে বলতে শুনল—জাপান থেকে আনা কারিগরি প্রযুক্তি দেশকে এগিয়ে দেবে আগামীকালের প্রান্তে। দেখল অদ্ভুত অদ্ভুত সব আসবাব, দেয়ালে মানে বোঝা যায় না এমন ছবি, দেখল এ বাড়িতে মেয়ের স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

এ কার মেয়ে? বুকের ভেতরে আশঙ্কা, ঈর্ষা আর কান্না ঠেলে উঠছে টের পেল পাঁচুর বউ।

শুক্রবার নার্সিং হোমে ভর্তি হল অলকা। নিউরোসার্জন বুধবার অপারেশনের তারিখ দিলেন।

সকাল সাড়ে সাতটায় অপারেশন শুরু হবার কথা। পাঁচু আর তার বউ সাড়ে ছ'টা থেকে এসে এনকোয়ারির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সওয়া সাতটায় ইন্দুমাধব এলেন। তাদের দেখে বললেন—দাঁড়িয়ে কেন? বোস ওই সোফায়।

তারা দুজন জড়সড় হয়ে বসল। এর আগে দুদিন তারা মেয়েকে দেখতে এসে নার্সিং হোমের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। দুধের মত সাদা বিছানা মেয়ের, ঝকঝকে পরিষ্কার দানা মোজাইকের মেঝে, লাগোয়া বাথরুম, দরজা-জানালায় দামি মোটা কাপড়ের পর্দা, মেয়ের মাথার কাছে টুলে বসে অল্পবয়েসী সুন্দরী সেবিকা। রাজপুরীর মত ঘরে শুয়ে তাদের মেয়ে—যেন রাজকন্যা।

সবকিছু সম্ভব হয়েছে ওই বড়বাবুর জন্য। মেয়ের প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছেন উনি। বড়বাবুর জয় হোক।

রবারের চাকা লাগানো ট্রলি ইনজেকশনের প্রভাবে আধো ঘুমন্ত অলকার দেহ বহন করে ঢুকে গেল অপারেশন থিয়েটারে। সার্জন অটোক্লেভে নির্বীজ করা পোশাক আর গ্লাভস পরে তৈরি। দুজন ও. টি. নার্স অলকাকে তুলে দিল টেবিলে। পেন্টোথাল সোডিয়ামের ছুঁচ শিরায় ফোটাবার আগে অ্যানেসথেটিস্ট ডাঃ পট্টনায়ক অলকার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। অলকার সমস্ত চুল কমিয়ে দেওয়া হয়েচে, তার চোখে অনির্দেশ্য শূন্য দৃষ্টি। সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে করে চোখ বুঁজে ফেলল।

অপারেশন হয়ে গেল ভালভাবেই। নিউরোসার্জনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত করে অলকা দ্রুত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে লাগল। অপারেশনের বারোদিন পর নার্সিং হোম থেকে ছুটি হয়ে গেল অলকার। ডাক্তারবাবু বলে দিলেন—এখনো মাসখানেক ওকে খুব যত্নে রাখতে হবে। নিয়মমত পুষ্টিকর খাওয়া, ঠিকমত ওষুধপত্র দেওয়া—এই আর কী। মাসখানেক পরে থেকে ও একদম নর্ম্যাল লাইফে ফিরে যেতে পারবে। অ্যাজ বিফোর—

সবকিছুর শেষ অবধি দেখেন ইন্দুমাধব। অলকাকে তিনি নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। নার্স ঠিক করলেন তার দেখাশুনো করার জন্য। নিয়মমত ওষুধ। নিয়মমত খাওয়া। ত্রুটি নেই কিছুর।

ইন্দুমাধবের ক্লাবের বন্ধুরা অনেকে তাঁর বাড়িতে এসে অলকাকে দেখে বলে গেল—লাকি ইয়াং লেডি। নাঃ, তোমার হার্ট আছে ইন্দু—

ফোন এল কত! পথেঘাটে নেমন্তন্নে কত লোক অভিনন্দন জানাল তাঁর মানবিকতার জন্য।

সন্ধেবেলা পাঁচু আর তার বউ এসে ভয়ে ভয়ে দূর থেকে মেয়েকে দেখে। কাছে যেতে

ভরসা পায় না। অকস্মাৎই কোনো জাদুবলে অলকা তাদের পরিচিত আবেষ্টনীর সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে উন্নত মেঘলোকের প্রান্তে। এখানে চলা হালকা পায়ে, বলা হালকা গলায়। এখানে ধপধপে বিছানায় ঘুমন্ত মেয়ের শরীরে খেলা করে মৃদু নীলাভ আলো। দুঃখ নেই, অশ্রু নেই, ক্ষুধা নেই, তেলকালির ছোপ নেই প্রতিদিনের জীবনে। আহা, ঘুমোক অলকা—ঘুমোক।

সেদিন অফিসে কাজ করতে করতে ছোটবেলার বন্ধু সুহাস ভদ্রের টেলিফোন পেলেন ইন্দুমাধব।

—হ্যালো, ইন্দু? কী খবর তোর? আছিস কেমন?

—কেটে যাচ্ছে ভাই। তোর খবর কী?

—ভাল। শোন, তুই তো খেয়ালি লোক, নানান সখ তোর। একজন লোকের সঙ্গে আলাপ করবি?

—কে সে? কী করে?

—টেরাকোটা জানিস? পোড়ামাটির কাজ? এ সেই টেরাকোটার ভাল একজন শিল্পী। ইউ. পি.-র দিকে খুব নাম করেছে। বিদেশেও ওর কাজ এক্সপোর্ট হয়। ওর তৈরি কিছু কাজ ঘরে রাখতে পারিস। পাঠাব একদিন?

—টেরাকোটা! নতুন ব্যাপার বটে। ইন্দুমাধব বললেন—পাঠিয়ে দে। দুপুরের দিকে অফিসে আসতে বল—

দুদিন বাদেই এসে হাজির হল প্রমথেশ কুমার। টেরাকোটা শিল্পী। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, বহু পকেটওয়ালা ব্যাগি জামা আর জিনস্ পরনে, উসকো খুসকো চুল, চোখে ঝকঝকে দৃষ্টি। সে কফি খেতে খেতে ইন্দুমাধবকে তার শিল্পকীর্তির ছবি দেখাল। বলল—এসব তো জাস্ট বাজারি কাজের ছবি। আপনার জন্য আমি অন্য জিনিস ভেবেছি—

—কী?

—আপনার লিভিং রুমের মাপ কী?

মনে মনে হিসেব করে ইন্দুমাধব বললেন—তা টোয়েন্টিফাইভ বাই থার্টি ফিট হবে।

—গুড। আপনার লিভিং রুমের চারদিকের দেয়ালে গ্লেজড্ টেরাকোটার প্যানেল বসিয়ে নিন। প্যানেলে আপনার ফ্যামিলির ইতিহাস বসিয়ে দিচ্ছি। যতদূর আপনি জানেন নিজের পরিবারের কাহিনী তা আমাকে বলুন। পুরনো ছবি দেখান, ইম্পর্ট্যান্ট ঘটনা মনে করুন। আমি প্রথমে স্কেচ করে দেখাব, তারপর আপনি অ্যাপ্রুভ করলে কাজে হাত দেব। দিল্লিতে একজন মার্চেন্টের বাড়িতে করেছি। জিনিসটা নতুন—বাড়ির চেহারাই একদম বদলে দেয়। আপনি করালে ইন্ডিয়াতে সেটা সেকেন্ড কাজ হবে—

রক্তে নতুন উত্তেজনার নড়াচড়া টের পেলেন ইন্দুমাধব। বললেন—কত খরচ পড়বে?

—নাথিং ইউ ক্যান নট অ্যাফোর্ড। এমন কিছু না। একবার খরচ করলে সারাজীবন থাকবে।

—তবু?

—লাখের মধ্যে। দু-চার হাজার কমবেশি।

ইন্দুমাধব বললেন—বেশ। কাজের অর্ডার কিন্তু পাবেন আমি স্কেচ অ্যাপ্রুভ করলে—

—সার্টেনলি। সে তো আমিই বলছি।

পরের সাত-আটদিন ইন্দুমাধব রাত জেগে বসে বসে পরিবারের পুরানো ইতিহাস নোট করলেন, খুঁজে বের করলেন বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পুরনো ফোটোগ্রাফ। তাঁর বাড়ি হবে ভারতে দ্বিতীয়, কলকাতায় প্রথম।

এরই মধ্যে অরিন্দম বসু একদিন অলকাকে পরীক্ষা করে বললেন—বাঃ, একদম ভাল হয়ে গিয়েছো তুমি। এবার স্কুলে যাওয়া শুরু করতে পারবে। বাবা এলে বোলো আমি বাড়ি যাবার অনুমতি দিয়েছি।

একদিন পাঁচু এসে নিয়ে গেল তার মেয়েকে। প্রভাবতী নিজে অনেক জিনিস ভরে দিলেন তার ব্যাগে। নগদ একহাজার টাকা দিলেন পাঁচুর হাতে। পাঁচু লজ্জিত হয়ে বলল—এ আবার কেন?

—নাও ওটা, ফল-দুধ কিনে দিও মেয়েকে—

—একবার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না?

—না। বড়বাবুর সঙ্গে এখন দেখা হবে না। দিল্লি থেকে টেরাকোটা শিল্পী এসেছে, তিনি জরুরী কথা বলছেন তার সঙ্গে।

অলকা অবশ্য একবার ওপরে গেল। ব্যালকনিতে মাঝখানে টেবিল রেখে কথাবার্তা বলছেন ইন্দুমাধব আর প্রমথেশ কুমার। টেবিলে ছড়ানো অজস্র নকশা। অলকা বলল—আমি যাচ্ছি।

ইন্দুমাধব প্রথমে খেয়াল করলেন না। অলক আবার বলল—বাবা এসেছে নিতে। আমি বাড়ি যাচ্ছি—

এবার মুখ তুলে অন্যমনস্কভাবে ইন্দুমাধব বললেন—ও আচ্ছা। ঠিক আছে। পরে বাবাকে দেখা করতে বোলো—

কেউ গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল না। অনাড়ম্বরভাবে অলকার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

নিজেদের বাড়ির গলিতে পা দিয়েই অলকা বলল—ইস্ কী বিশ্রী গন্ধ! না বাবা?

পাঁচুর বুকের মধ্যে যেন একটা ভারী কিছু দুলছে, ধাক্কা দিচ্ছে পাঁজরে। পা আর চলে না।

পাঁচুর বউ এসে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। মায়ের গায়ে কেমন একটা অপ্রীতিকর ময়লা ময়লা গন্ধ। মেয়ে কাঠ হয়ে রইল। অলকার শক্তভাব টের পেল মা। আস্তে করে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে তেপায়া টুলের ওপর বসাল।

পাড়ার সবাই দেখতে এসেছে অলকাকে। তার পরনে দামি পোশাক। মুখে উন্নত জীবনযাত্রার ঔজ্জ্বল্য।

ছোট্ট ঘর, এত লোক। গরম লাগছে অলকার। একবার সে সাম্প্রতিক অভ্যাসমত ওপরে তাকাল। না, পাখা নেই।

গরম ভাত আর মুগের ডাল রেঁধেছে পাঁচুর বউ। মুচমুচে করে ভেজেছে চাপিলা মাছ। ডাক্তার বলেছে রোজ মাছ আর দুধ খাওয়াতে। এখন কদিন চিন্তা নেই। হাজার টাকা আছে হাতে।

মাছভাজা খেতে গিয়ে অলকা বলল—টম্যাটো সস ছাড়া মাছভাজা ভাল লাগে না। ওখানে রোজ খেতাম।

সারারাত ভ্যাপসা গরমে ছটফট করল অলকা।

হাতপাখা নাড়তে নাড়তে অনেক রাত্তিরে পাঁচু তার বউকে বলল—তুই ঠিক বলেছিলি বউ, আমি আগে বুঝতে পারিনি। আমাদের মেয়েকে বড়বাবু চুরি করে নিয়েছে।

গ্রামোফোনের ঢাকনা

অন্য অনেক ভাগ্যবান বালকের মত আমার শৈশব কোলকাতায় কাটেনি। নিতান্ত অকুলীন এক গ্রামের গন্ধমাখানো শহরে আমি মানুষ হয়েছি এবং স্কুলের পাশ দিয়েছি। আমি প্রথম বায়োস্কোপ দেখি কোলকাতায় এসে কলেজে পড়বার সময়। সে বছরই বারকয়েক গাড়িচাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যাই। শহরে চলাফেরা করা রপ্ত হতে সময় নিয়েছিল।

শহর আমার ভাল লাগেনি। এখানে কোথায় মেঘান্ধকার বাদলা দিনে মাঠের ওপারে তাকিয়ে জানালায় বসে থাকার আনন্দ? এখানে গড়ের মাঠে কী খেজুর গাছ আছে? সে খেজুর গাছে কী কুয়াশামাখা শীতসকালে হরিশ গাছি রস পাড়তে ওঠে?

এখানে কী বোষ্টমকাকা রোজ সকালে ভৈরবীতে ঈশ্বরের নাম করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে যায়?

বোষ্টমকাকার আসল নাম কী ছিল আমি জানি না। অনেকদিন আগে, আমি তখন রামনগর মাইনর ইস্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ি, এক সুন্দর শরৎকালের সকালে বোষ্টমকাকা আগমনী গান গেয়ে আমাদের শিশিরভেজা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। টঙা-টঙ্ একতারা বাজিয়ে খোলামেলা গলায় চুড়ো করে ঝুঁটিবাঁধা লোকটা নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে গাইছিল—যাও যাও গিরি আনিতে উমারে—

মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ঘুমজড়ানো চোখে গান শুনতে শুনতে দেখছিলাম সামনের বড়ো মাঠটায় আস্তে আস্তে কাঁচা সোনার মত ফুটে উঠছে ভোরবেলাকার রোদ্দুর। টি-টি করে ডাকতে ডাকতে প্রান্তর পেরিয়ে যাচ্ছে টিয়ার ঝাঁক সবুজ বিদ্যুত-এর মত। প্রকৃতি, সঙ্গীত—এসব অনেক বড়ো কথা। আমার শিশুমনে শুধু গেঁথে গিয়েছিল সেই সেদিনের সকাল, সামনে পুজো আসছে—তার আনন্দ, আর তার সঙ্গে অক্ষয় হয়ে গিয়েছিল বোষ্টমকাকার ঝুঁটি আর একতারার টঙা-টঙ্।

প্রত্যেকবছর পুজোর আগে বোষ্টমকাকা এসে আগমনী গান শুনিয়ে যেত। পুজো এগিয়ে এলেই আমি রোজ ভোরে উঠে তাকিয়ে থাকতাম প্রান্তরের বুক চিরে দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া পথটার দিকে। যখন গ্রামের ছেলেবুড়ো সবার মনে উৎসবের রঙ পাকা হয়ে ধরে এসেছে, রায়বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা দো-মেটে হয়ে গেছে—তখনই একদিন মাঠের মাঝখান দিয়ে গ্রামে আসার রাস্তায় বেজে উঠতো বোষ্টমকাকার একতারা। ভেসে আসতো দরাজ গলার গান—'নয়নে অমিয় ঢালা, মা আমি তোর অবোধ ছেলে'—

এক ছুটে পার হয়ে যেতাম উঠোন, মাঠের ধারে যেখানে হিমে জড়িয়ে থাকা ঘাস সকালের হাওয়ায় কাঁপছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রেলের সিটির মত চিৎকার করে ডেকে উঠতাম—বোষ্টমকাকা!

আমাকে দেখে একগাল হেসে সে ঝুঁটি দুলিয়ে একতারা ধরা হাত ওপরে তুলে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসতো—'ফেলে তোর কোলের ছেলে—কী বলে তুই যাস মা চলে?'

মা জিজ্ঞেস করতো—ছেলে, তোমার নাম কী?

—বোষ্টমের আর নাম কী মা?

—সে কিগো? বোষ্টমের নাম থাকে না? তুমি জাত বোষ্টম?

দুঃখী দুঃখী মুখ করে সে বলতো—কই আর হতে পারলাম! সব ভেক্ গো মা, সব ফাঁকিবাজি!

সে নাম বলতো না, বলতো না সে কোথায় থাকে। তবু সে সারাবছর আমার বুকের মধ্যেই থাকতো।

বোষ্টমকাকা আমার ছোটবেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই ট্রামবাসের ঘর্ঘর—যান্ত্রিক জীবনের অসহ্য কোলাহল, ওজনদরে জীবনের খুশির দিনগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া—এইসব নিতান্ত জাগতিক গ্লানির মধ্যে মাঝেমাঝে সদানন্দ সেই মানুষটির কথা ভাবি। এখনো কী কোথাও শরতের মাঠে মাঠে তার আগমনী গান তরল আনন্দের মত ঝরে পড়ে না?

যদি একবার আমার সেই সুদূর শৈশবে ফিরে যেতে পারতাম!

সেদিন কলেজে বেরুবার সময় আয়নায় দেখলাম রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। চিক্‌চিক্ করছে একগাছা পাকা চুল। যাঃ! বুড়ো হয়ে গেলাম। একবার তাকালাম স্বরচিত পুস্তকের রাশির দিকে। নাঃ! ফসলও কিছু কম তুলিনি। সাহিত্য পুরস্কারও দু'একটা পাওয়া গেছে। চুল কী বৃথাই পাকে?

প্রথমেই ছিল অনার্স ক্লাস। পড়ালাম ম্যাক্‌বেথ্। ছেলেরা, মনে রেখো, বার্নামের জঙ্গলও একদিন উঠে এসেছিল ডানসিনেনের দুর্গে। এমন অসম্ভব উপায়েও অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষীর পতন হয়। আর নৈতিক পাপ সম্বন্ধে সাবধান! একবার হাতে রক্ত লাগলে নট্ অল্ দি পারফিউম্ অব্ অ্যারাবিয়া ক্যান সুইটেন্ ইয়োর হ্যান্‌ড্‌স্—

দুপুরে কমনরুমের চা। আড্ডা। নিখিলবাবু ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—প্রিন্‌সিপাল-এর চারিত্রিক দোষ দেখা দিয়েছে। অমরবাবু ছোকরা লেকচারার ললিত বোসের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। মাইনে বাড়াবার গণ-আবেদনপত্রে সই দিলাম। এইভাবে পরম পবিত্রতার সঙ্গে সারাটা দিন কাটিয়ে যখন অবসন্ন হয়ে কলেজ থেকে বেরুচ্ছি, একটি ছেলে ডাকলো—স্যার—

বোধহয় সেকেন্ড ইয়ারের ছেলে। মুখ চিনি। বললাম—কী?

—স্যার, আমি পার্ক সার্কাসে থাকি। বলে ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভাল মজা! ও পার্ক সার্কাসে থাকে এ কথাটা জানাবার জন্য আমাকে দাঁড় করালো নাকি? একটি বিরক্ত হয়ে বললাম—তাতে কী?

ছেলেটি অপ্রতিভ হয়ে বললো—স্যার, আমাদের বাড়িতে একটু যাবেন? আমাদের বাড়ির সবাই আপনার লেখার খুব ভক্ত। আপনাকে একবার দেখতে চায়।

এমন অনুরোধ অনেকেই করে থাকে। বললাম—যাবো এখন একদিন—দেখি, সামনের হপ্তায় যদি—

—আজই যাবেন স্যার? আমার মামা এসেছেন টাকি থেকে। টাকি কলেজে পড়ান। থিসিস্ লিখছেন। আপনার ভক্ত। আজ গেলে ভাল হয় স্যার।

চাপে পড়ে গেলাম তাদের বাড়ি। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার। সবাই এসে ঘিরে ধরলো

আমাকে। দু'জন বিনুনী দোলানো মেয়ে অটোগ্রাফ নিলো। কখন লিখি, কবে থেকে লিখি, কেমন করে প্লট পাই—এসব জটিল প্রশ্নের পর ছাত্রের মামা আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন।

বেশ অমায়িক মানুষ। সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন—ওখানে মায়ের সামনে অসুবিধে হচ্ছিলো, না? ধরুন এবং ধরান—

খোসগল্পে কিছু সময় কাটলো! সিগারেটের ডগায় ছাই জমে উঠেছে, টেবিলের ওপর রাখা ছাইদানিতে ছাই ঝাড়তে গিয়ে কিছু কাগজপত্রের মধ্যে খোলা একটি বইয়ের পাতায় বিবর্ণ একটি ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একজন মানুষের ছবি। এ ছবির মানুষকে আমি চিনি। পরক্ষণেই ছবির ওপর ঝুঁকে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলাম—বোষ্টমকাকা।

ছাত্রের মামা অবাক হয়ে বললেন—কিছু বললেন? এ ছবি আগে কোথাও দেখেছেন নাকি? খুব রেয়ার ছবি কিন্তু।

বললাম—কার ছবিটা?

—ইনি বৈষ্ণবাচার্য দীননাথ। একটি বিশেষ শাখার বৈষ্ণবদর্শনের উদ্গাতা—বৈষ্ণবদর্শনই আমার থিসিসের সাবজেক্ট্—

—কোথায় থাকতেন?

—এঁর জীবন খুব রহস্যময়। কিছু জানা যায় না। মোটামুটি প্রায় একশো বছর আগে এর মৃত্যু হয়।

—কত বছর?

—একশো তো বটেই।

আমার মনের ভেতরে একটা বহু পুরনো গ্রামোফোনের ঢাকনা খুলে কার অদৃশ্য হাত তাতে একখানা রেকর্ড চাপিয়ে দিচ্ছিলো। মনের ভেতরে সকাল হচ্ছিল মাঠের প্রান্তে। সকালের হাওয়ায় হাওয়ায় দশদিকে ছুটে যাচ্ছিল গানের সুর—যাও যাও গিরি আনিতে উমারে।

বন্ধু

নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় একজন অপরিচিত লোককে বসে নির্বিকার মুখে বিড়ি টানতে দেখে রামুর ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। চড়া গলায় সে জিজ্ঞাসা করল—এই! তুই কে রে? তোর নাম কী?

উদাসীন ভঙ্গিতে বিড়ি টানতে টানতে লোকটা আড়চোখে একবার দেখে নিলো, তারপর বলল—আমার নাম লখাই। কেন?

—আমার জায়গায় বসেছিস কেন? ভাগ্—পালা।

লখাই শান্তভাবে বিড়ি খেয়ে যেতে লাগল।

—এই, শুনলি? ভাগ্ এখান থেকে। এখানে আমি থাকি—

হেলান দিয়ে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে লখাই বলল—কেন রে? এটা কী তোর বাবার জায়গা?

এরপর স্বাভাবিক নিয়মে যা হয় তাই হল। রামু হাতের লাঠিটা মুঠো করে বাগিয়ে

অশ্রাব্য গালাগাল করতে করতে তেড়ে গেল। কিন্তু তার জন্মাবধি সরু লিকলিকে পা-টা নিয়েই হয়েছে মুশকিল। দৌড়নোও যায়না, কাউকে তাড়া করে ধরাও যায়না। লখাই চট্ করে একটু বাঁয়ে সরে গিয়ে তার ঘাড়ে মারল এক রদ্দা। সামলে উঠে দাঁড়াবার আগেই কোমরের শিরদাঁড়ার কাছে এক গুঁতো। প্লাটফর্মের পাথরে বাঁধানো খরখরে মেঝেতে মুখ ঘষে গেল।

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে রামু বুঝল সে হেরে গিয়েছে, এবং তাকে এখন অন্য জায়গার সন্ধানে বেরুতে হবে। শালার রোগা পা-টা! চিরজন্ম এখানার জন্য তাকে মার খেতে হচ্ছে।

ইস্টিশানের ওভারব্রিজ যেখান থেকে শুরু তার নিচে কেমন সুন্দর জায়গাটা। আজ তিন বছর ধরে সে আরামে রয়েছে এখানে। গেল!

কিন্তু কী করবে সে? পঙ্গুত্বের অভিশাপে সে নিতান্তই অসহায়।

তবু রাগ থাকতেই পারে। গায়ের জোরে যেখানে কার্যোদ্ধার হবে না সেখানে বুদ্ধির জোর প্রয়োগ করা যেতে পারে। রামু তক্কে তক্কে থাকে, সুবিধেমাফিক পেলে সে লখাইকে বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবে।

শ্যামনগর কালীবাড়ির সামনে পৌষমেলা বসেছে। একমাস ট্রেনে খুব ভিড়। অফিস টাইমের গাড়িগুলো চলে গেলে মেলার যাত্রীরা ছেলে-বৌয়ের হাত ধরে দলে দলে ইস্টিশনে আসতে থাকে। এরাই লক্ষ্মী। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা পয়সা দেয় না। কেউ বা দাঁত খিঁচিয়ে মারতে আসে। কিন্তু যারা মেলায় যাচ্ছে তারা পুণ্যঅর্জনের আশায় পকেটে বা আঁচলের খুঁটে কিছু পাঁচ-দশ পয়সার খুচরো নিয়ে বেরোয়। এরাই রামুর মত মানুষদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ দুপুরে দুখানা গাড়িতে কাজ করে সে দেড়টাকা উপার্জন করল। বটতলার দোকান থেকে একটা কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি আর নিজের তোবড়ানো টিনের মগে কুড়ি পয়সার চা কিনে এসে বসল স্টেশনের সামনের ছোট্ট ঘাসে ভরা মাঠটায়। বুড়ো রামধারী গল্প করে, অনেকদিন আগে সাহেবদের আমলে এইখানে নাকি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি সার দিয়ে দাঁড়াতো। এখন রিকসাওয়ালারা দুপুরের ঝোঁকে টোয়েন্টি-নাইন খেলে। সেখানে বসে রুটি চিবোতে চিবোতে রামু ঠিক করলো—নজর রাখতে হবে ব্যাটা কখন কাজে বেরোয়। সেই সময় ওর জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দিয়ে আমি আবার সেঁদিয়ে বসে থাকবো। এই এত ঢিল জোগাড় করে রাখতে হবে, এবার তাড়া করলেই দূর থেকে ছুঁড়ে মারবো, কাছে ঘেঁষতেই দেবো না। এখন কী রয়েছে ব্যাটা? দেখে আসতে হয়—

প্ল্যাটফর্মে ঢুকে এগুতে গিয়েই বিপদে পড়ে গেল রামু। ঠিক তক্ষুনি একটা ট্রেন এসে থেমেছে। বহু লোক উঠছে নামছে, ধাক্কাধাক্কি ভিড়—একটা হৈ-চৈ ব্যাপার। এর মধ্যেই হঠাৎ রব উঠলো—ছিনতাই! পকেটমার! ধর ধর! কে কার পকেট মেরেছে ভগবান জানে, কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই রামু দেখল একজন ষণ্ডামত লোক তার চুলের মুঠি চেপে ধরেছে। এসব ক্ষেত্রে জনতা উত্তেজনা চায়, চুরি করে দৌড়ে পালাতে পারবে কিনা ঠিক নেই তেমন লোক যে পকেট মারেনা সে কথা শোনার ধৈর্য তাদের থাকেনা। এক মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল, বীর জনতা সঙ্গে সঙ্গে গায়েব। চোর পেটাবার জন্য কে ট্রেন ফেল করে? কিন্তু সেই এক মিনিটের মধ্যে রামুর চোখে ফুলে, কান ছিঁড়ে, দাঁত নড়ে যা হবার হয়ে গেল।

রাত্রিরে নামল ঝমঝম্ বৃষ্টি। রাত এগারোটা। লোডশেডিংয়ে সব অন্ধকার। বিকেলে

গায়ের ব্যথা নিয়ে কাজ করতে পারেনি রামু, ফলে খাওয়া হয়নি। থাকার জায়গাটাও গেছে। বিশু পানওয়ালার বন্ধ দোকানের করোগেট টিনের ছাদের সামান্য আড়ালের তলায় একটা নেড়ি কুকুরের সঙ্গে শুয়ে রামু গামছা সামনে মেলে ধরে ছাঁট থেকে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ অন্ধকারে কে হাত ধরল তার। প্রথমে রামু ভয় পেয়েছিল, আবার বোধহয় মারবে। তারপরেই নরম গলা ভেসে এল—ভয় নেই, আমি লখাই—

লখাই! অন্ধকারে রামুকে একা পেয়েছে, নিশ্চয়ই খুব মারবে!

কিন্তু লখাই বলল—চল, আমার সঙ্গে চল। আমি জানতাম না তুই ল্যাংড়া। নে, আমাকে ধরে ওঠ—তোর বাসাটা বেশ বড়, আমাকে একটু থাকতে দিস পাশে। খাওয়া হয়েছে? পুরিতরকারি এনে রেখেছি, গিয়ে খাবি চল—

ম্যাডাম

খুব ভোর থেকেই বাড়িতে উৎসবের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অদ্ভুতভাবে, সিনেমার জন্য লেখা বাংলা উপন্যাসে এরকম হয়ে থাকে। বাস্তবেও যে হয় তা কে জানত!

দিন পনেরো আগেকার কথা। সন্ধেবেলা ওরিয়েন্টাল ভ্যারাইটি কর্নার-এ মাসকাবারি বাজার করতে গিয়েছিল ইন্দ্রাণী। হিসেব করে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে সব জিনিসপত্র ভরে রওনা দেওয়ার সময় মনে পড়ল টুথপেস্ট নেওয়া হয়নি। কাউন্টারের লোকটি পাকা বিক্রেতা, সামান্য থমকে যাওয়া দেখেই জিজ্ঞাসা করল—দিদি, আর কিছু?

—হ্যাঁ, টুথপেস্ট নিইনি।

—আসুন দিদি, দিয়ে দিচ্ছি। এই নিন, সুপার ফ্ল্যাশ—নতুন বেরিয়েছে, খুব চলছে বাজারে। বড় সাইজের টিউব দিই?

তার হয়ে কোনো জিনিস অন্য কেউ পছন্দ করে দিক এটা ইন্দ্রাণীর ভাল লাগে না। সে বলল—না, এটা নয়, আমি মর্নিং স্মাইল নেব—

—কেন দিদি? এটা খারাপ কী? দেখুন না ব্যবহার করে—

দোকান থেকে বেরুবার দরজার কাছে দুজন লোক গত দশ-বারো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করছে। একেবারে হাঁ করে সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে এমন নয়। জিনিস দেখার ভান করে অপাঙ্গে তাকাচ্ছে। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হলেও, ইন্দ্রাণীর চেহারা এখনো বেশ সুন্দর রয়েছে। সেজেগুজে বেরুলে মানুষ তাকিয়ে দেখে। এসব মুগ্ধ দৃষ্টি তার মন্দ লাগে না। অসভ্যতা করলে অবশ্য অন্য কথা। এ লোকদুটোকে অসভ্য বলে মনে হচ্ছে না। বেশ ভদ্র চেহারা। তারা দেখছে বুঝতে পেরে ইন্দ্রাণী নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গেল।

বিক্রেতা আবার বলল—তাহলে সুপার ফ্ল্যাশ দিই দিদি?

টিভিতে থান্ডার ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনে যে মহিলাকে রোজ সন্ধেবেলা খবরের আগে দেখা যায়, তাঁকে দারুণ ভাল লাগে ইন্দ্রাণীর। কোনো দোকানদারই তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বাজে জিনিস গছিয়ে দিতে পারে না। গুঁড়ো সাবানের মহিলাটির

মত দৃঢ় গলায় ইন্দ্রাণী বলল—না। আমাদের পরিবারের সকলে একমাত্র মর্নিং স্মাইল ব্যবহার করে।

অকস্মাৎ তার ব্যক্তিত্ব এবং গলার স্বরের পরিবর্তনে বিক্রেতা কেমন অবাক হয়ে তাকাল, তারপর বলল—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি আপনার পছন্দসই জিনিসই নিন—

দাম মিটিয়ে রাস্তায় এসে খালি রিকশার জন্য এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ইন্দ্রাণী। এমন সময় পাশ থেকে কে একজন মার্জিত গলায় বলল—এক্সকিউজ মি, আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পারি?

চমকে উঠে ইন্দ্রাণী দেখল ওরিয়েন্টাল ভ্যারাইটির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই দুজন লোকের মধ্যে একজন নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতজোড় করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নির্জন জায়গা হলে সে ভয় পেত, দিনকাল খারাপ পড়েছে, কার মনে কী আছে কে জানে। কিন্তু এটা বড় রাস্তা, বাজার অঞ্চল, পথে গাড়িঘোড়া আর লোকজনের ভিড়। কাজেই গুঁড়ো সাবানের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সে বলল—বলুন।

—আপনার বাড়ি কী কাছেই? আমাকে যদি দয়া করে ঠিকানাটা বলেন। আপনার এবং আপনার স্বামীর সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই—

খবরের কাগজে যাদের দুষ্কৃতকারী বলে, তাদের কথাবার্তায় ধরন তো ঠিক এরকম নয়।

—আমার বাড়িতে যাবেন? কিন্তু—আমি তো আপনাকে চিনি না। কী ব্যাপার বলুন তো?

লোকটার কথাবার্তায় বেশ একটা সহজ আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আছে। সে বলল—না, আমাকে আপনি চেনেন না। আমার নাম প্রীতম চৌধুরি, আমি এশিয়া পাবলিসিটির প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। আমাদের কোম্পানি বিজ্ঞাপন তৈরি করে। সবরকম বিজ্ঞাপন—খবরের কাগজে, পত্রিকায়, টিভিতে। আপনি টিভি দেখেন নিশ্চয়?

ইন্দ্রাণী বলল—দেখি।

—ইউনিভার্সাল কাটার মেশিনের বিজ্ঞাপনটা দেখেছেন? ওই যে, যেটায় কুচি কুচি করে আলু কেটে পাত্রে রেখে বৈশালী রায় বলেন—'আমার পাত্রও পূর্ণ, জীবনও পূর্ণ। ইউনিভার্সালের দৌলতে।' বৈশালী রায়, যিনি এ বছর মিস ক্যালকাটা হয়েছেন। ওই বিজ্ঞাপনটা আমাদেরই।

এই বিজ্ঞাপনটি ইন্দ্রাণীর খুব প্রিয়। বিয়েবাড়ি যাওয়ার মত সাজগোজ করে একজন সুন্দরী মহিলা রান্নাঘরে মেশিন দিয়ে কুচকুচ করে আলু কাটছেন —উঃ, ভাবতেই ভাল লাগে। এবার সে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে লোকটির দিকে তাকাল।

প্রীতম চৌধুরী স্মিত হেসে বলল—কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একটা নতুন হাউসহোলড্ প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন বাজারে আনছি। তার জন্য একজন গৃহবধূ দরকার। আপনার পার্সোনালিটিটা একেবারে পারফেক্ট—আমি দেখছিলাম কীভাবে আপনি দোকানদারকে কাবু করে নিজের পছন্দসই জিনিস বেছে নিলেন। আর মাপ করবেন—আপনার চেহারাটাও সুন্দর খাপ খেয়ে যাবে। অভিনয় করতে আপনার আপত্তি নেই তো?

গত পাঁচ-সাত বছরে বিভিন্ন মেয়েদের কাগজে পড়া সমস্ত ফিচারগুলো ইন্দ্রাণীর মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। রঙিন ছবি, ফ্যাশন প্যারেড, আধুনিক গৃহবধূদের

জীবনচর্যা কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নারী প্রগতি সংসদের সম্পাদিকা আকাশলীনা দেবী কী উপদেশ দেন—আহা! পরম কাম্য স্বপ্নের জগৎ। সে কী সেই জগতে প্রবেশ করতে চলেছে? না, অভিনয়ে তার কোনো আপত্তি নেই। কী করতে হবে তাকে? উত্তরে প্রীতম চৌধুরী বলল—আপনার স্বামীর পারমিশনটা কিন্তু প্রয়োজন। ওঁকে কখন বাড়িতে পাওয়া যাবে?

—এতক্ষণে উনি বাড়ি ফিরেছেন। আপনারা কী আজই কথা বলতে চান?

—অবশ্যই। ঠিকানাটা দিয়ে আপনি এগিয়ে যান, আমরা আসছি।

ইন্দ্রাণীর স্বামী অমলেন্দু একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরি করে। রোজগারপাতি ভালই। বাড়িতে ছত্রিওয়ালা পালঙ্ক, তক্তপোশ, কাঁসার বগিথালা এ সব বাতিল করে বক্স খাট, সোফা-কাম-বেড, মেলামাইনের সিক্সটিন-পিস ডিনার সেট এসে গিয়েছে। বছর বছর বোনাস পেলে ভি সি পি, পফ্, হাই-ফাই সাউন্ড সিস্টেম—এসব হয়। বর্তমানে কাপড় ধোয়ার কল আনবার পরামর্শ চলছে। কিন্তু সে কিঞ্চিৎ নিরীহ, একটু ভালমানুষ গোছের। মহিলাদের আধুনিকতার আলো দেওয়ার জন্য যত পত্রিকা বাজারে আছে, পুরুষদের জন্য তেমন কিছু নেই। কিছু বিজ্ঞাপন ছাড়া। সে সব বিজ্ঞাপনের চৌকস পুরুষমানুষদের মত অমলেন্দু কার্ট্রিজ রেজর দিয়ে দাড়ি কামিয়ে, ভি আই পি গেঞ্জি পরে, ডেনিম সুগন্ধি মেখে, লাখানির জুতো পায়ে দিয়ে, হন্ডা বাইকে চেপে অফিসে যায় না, কিংবা দুপুরে চুল ফাঁপানো তরুণী সেক্রেটারির সঙ্গে তাজ টি-ব্যাগ দিয়ে তৈরি চা খেতে খেতে গল্প করে না। সে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সাধারণ পোশাক পরে। কলাইয়ের ডাল আর পোস্ত তার খুব প্রিয়। শরীর রোমশ হলেও বাড়িতে সে খালি গায়ে থাকা আরামদায়ক মনে করে।

তবু তো সে আধুনিক যুবকই। স্ত্রীর কাছে খবরটা শুনে সে খুশি হল। হলে তো খুবই ভাল কথা। তা, বিজ্ঞাপনটা কীসের?

সেটা ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছে। অসুবিধে নেই, একটু বাদে কোম্পানির লোক এলে জেনে নেওয়া যাবে এখন। মিনিট চল্লিশ পরেই প্রীতম চৌধুরি এসে হাজির। সাদা রঙের মারুতি থাউজ্যান্ড থেকে নেমে সে সপ্রতিভভাবে বসবার ঘরে ঢুকল।

সংক্ষিপ্তভাবে পরিচয়ের পালা শেষ করে প্রীতম বলল—মিস্টার সেন, আপনার ওয়াইফের কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয় শুনেছেন। আমরা একটা বিজ্ঞাপনের ছবি করছি। 'কমফর্ট' নামে কোম্পানির কথা শুনেছেন তো? যারা ফোম-ম্যাট্রেস, কার্পেট ইত্যাদি তৈরি করে? তারা বাজারে একটা নতুন ফুঁ দিয়ে ফোলানো হাওয়া-বালিশ ছাড়তে চলেছে। তার অ্যাড্-ক্যাম্পেনটা আমরা হাতে নিয়েছি। ত্রিশ সেকেন্ডের ছবি—না, অবাক হবেন না, ত্রিশ সেকেন্ড অনেকখানি সময়। আপাতত প্রাইম টাইমে নেটওয়ার্কে দেখানো হবে। আমরা সিস্টেমের বাইরে থেকে প্রকৃত গৃহবধূকে দিয়ে কাজটা করাতে চাইছি। আপনার আপত্তি নেই তো?

অমলেন্দু বলল—না না, আমার কেন—সে তো খুব, মোস্ট ইয়ে—

—তবে এখানে সই করুন। ম্যাডাম, আপনারও একটা সই—

অমলেন্দু ফর্মটা হাতে নিয়ে বলল—সই কীসের?

—ওটা জাস্ট একটা ফর্ম্যালিটি। আপনারা যে রাজি আছেন তার প্রমাণ।

দুজনে সই করে দিল। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে পুরতে প্রীতম বলল—শুটিং কিন্তু আপনাদের এই বাড়িতেই হবে।

ইন্দ্রাণী একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—আমাদের বাড়িতে! এখানে শুটিং হবে?

—কেন হবে না? আমরা কোনো আর্টিফিসিয়াল সেট-আপ চাইছি না। তাছাড়া আপনি প্রফেশনাল নন, নিজের বাড়ি ছাড়া অসুবিধে বোধ করবেন। বারো তারিখে আপনার কোনো প্রবলেম নেই তো? ওদিন সকালে নটার মধ্যে আমরা এসে যাব। বাই দি ওয়ে, আপনাদের বাড়ির ভেতরটা একটু ঘুরে দেখতে পারি?

অমলেন্দু বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন না।

প্রীতম জুতো না খুলেই কেমন অসঙ্কোচে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এল। অমলেন্দুর সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল। জুতো খুলে ঘরে ঢোকার নিয়মটা তাদের বাড়িতে এখনো রয়ে গিয়েছে। যাক্, অতিথি সম্বন্ধে বিরূপ ভাবতে নেই। যার যেমন অভ্যেস।

বাড়ি দেখে প্রীতম খুশি। ঠিক আছে, দারুণ কাজ চলে যাবে।

রাত্তিরে খেতে বসে অমলেন্দু বলল—বারো তারিখে তো দেখছি খুব হইচই হবে। কালকেই অফিসে একটা ছুটির দরখাস্ত করে রাখব? তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে, না?

—হচ্ছে তো। দু-একজন বন্ধুবান্ধবকে একটু খবর দিয়ে রাখব, বুঝলে?

সন্ত্রস্ত হয়ে অমলেন্দু বলল—সে কী! কেন?

—কেন আবার, এত মজার একটা কাণ্ড সেদিন, সবাই দেখবে না? আমার বন্ধু কুন্তলা সেদিন বলছিল বিজ্ঞাপনের মেয়েরা আসলে সবাই মডেল আর পেশাদার অ্যাকট্রেস। তাছাড়া, দীপা, রাগিণী, অন্তরা এদের খুব শুটিং দেখার শখ। আমাদের আলোচনা হয় তো এ নিয়ে। ওদেরও বলব। ও হ্যাঁ—ভাল কথা, ভেতরের বারান্দায় সিমেন্টের চটা উঠে আছে আজ কত বছর, তোমার তো হুঁশই নেই। ওটা বারো তারিখের মধ্যে মেরামত করিয়ে নাও না—

—ওটা থাক ইন্দ্রাণী। ওটুকু জায়গায় কারও চোখ পড়বে না।

—করিয়েই নাও না কেন, খুঁত রেখে লাভ কী?

একটু ইতস্তত করে অমলেন্দু বলল—মারা যাওয়ার আগে দিন সকালে মা হলুদ বাটা শেষ করে নোড়াটা হাতে নিয়ে বারান্দার ধারে আসছিলেন ধোওয়ার জন্য। ওইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। নোড়াটা ছিটকে পড়ে সিমেন্টের চটা উঠে যায়। ওটা থাক বরং, জীবনে কতকিছুই তো ঠিকঠাক মেরামত হয় না। ভাঙা জায়গাটা দেখলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে।

আনন্দে উত্তেজনায় ইন্দ্রাণীর সেদিন রাত্তিরে ভাল ঘুম এল না। বারো তারিখে সকাল সাড়ে আটটা থেকে ইন্দ্রাণীর নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করল। প্রথমে কুন্তলা। সে বলল—হ্যাঁরে, এখনো আসেনি?

—না ভাই, ঠিক নটায় আসবে বলেছে। কালও ওর অফিসে ফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছে। মনে তো হয় পাংচুয়ালি আসবে। ওমা! এই তো রাগিণীও এসে পড়েছে!

পেছনে রাগিণীর স্বামী রূপক। সে হেসে বলল—বৌদি, আমিও কিন্তু চলে এলাম। আমাকে আপনি বলেননি অবশ্য—কিন্তু আমারও খুব শুটিং দেখার শখ—

—বাঃ, আসবেন বৈকি। বসুন ভেতরে এসে। তোদের জন্য একটু কফি বসাই—

তারপর দীপা। তারপর ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির লোকেরা। তারপর অগণ্য অতিথিবৃন্দ। এদের মধ্যে অনেকেই এমনিতে তাদের কোনো খোঁজখবর রাখে না। সুখেও না, দুঃখেও না। কিন্তু ফিলমের শুটিং! নাঃ, সে কী ছাড়া যায়? হোক বিজ্ঞাপন, শুটিং তো।

ইন্দ্রাণীও খুব উৎফুল্ল। সে নিজেকে রীতিমত ইম্পর্ট্যান্ট বলে বোধ করছে।

কফি শেষ হতে না হতে বাড়ির সামনে তিনখানা ভ্যান এসে থামল। প্রীতম চৌধুরী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল—নমস্কার ম্যাডাম, আপনি রেডি? একী! এঁরা কারা?

ইন্দ্রাণী আমতা আমতা করে বলল—এঁরা আমার আত্মীয় আর বন্ধুরা।

—এঁরা সবাই এখানে কেন?

প্রীতম আজ যেন একটু বদলেছে। হালকা একটা ভদ্রতা করছে বটে, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ পেশাদারি লোক। জোরালো গলায় কথা বলছে, চটপট চলছে ফিরছে।

ইন্দ্রাণী বলল—এঁরা আপনার কাজ দেখতে এসেছেন।

—ওঃ, থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু এত লোক ভিড় করলে কাজের অসুবিধে হবে। এনি ওয়ে, এঁরা আপনার গেস্ট। আপনাদের বলছি, আপনারা সর্বদা ক্যামেরার পেছনে থাকবেন, এবং অন্তত পাঁচ ফুট পেছনে থাকবেন। আচ্ছা, আমরা কাজ শুরু করছি তাহলে। ম্যাডাম, মেক-আপের জন্য একটা ছোট আর আলাদা ঘর দরকার। আছে?

অমলেন্দু বলল—দেড়তলায় আমাদের ঠাকুরঘর—

—ঠাকুরঘর? সেখানে বোধহয় সুবিধে হবে না—

—মানে, একসময় ওটা ঠাকুরঘর ছিল, এখন পুরনো জিনিসপত্র রাখা হয়। কোনো অসুবিধে হবে না, ওটা ব্যবহার করুন।

ততক্ষণে সবাইকে অবাক করে ইউনিটের কর্মীরা ক্যামেরা, ট্রাইপড, সাউন্ড রেকর্ডার, তারের কয়েল, রিফ্লেক্টার ইত্যাদি ঘরের মধ্যে বয়ে আনতে শুরু করেছে। একজনের হাতে একগোছা বিভিন্ন রঙের হাওয়া-বালিশ। বর্তমানে সেগুলো না-ফোলানো অবস্থায় ভাঁজ করে রাখা আছে। বড় সাইজের ভি আই পি সুটকেস হাতে মেকআপম্যান ঘরে ঢুকে বললেন—কই, সব রেডি? চলুন চলুন, কার মেকআপ হবে? আপনি? আসুন ম্যাডাম—

ঠাকুরঘরে মেকআপ নিতে যাওয়ার সময় ইন্দ্রাণী আড়চোখে দেখে গেল সবাই তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকাবে না-ই বা কেন? সবাই তাকে কেমন 'ম্যাডাম' বলছে!

নিচে দক্ষযজ্ঞ। খাট টেনে সরিয়ে জানালার দিক থেকে দেওয়ালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, রান্নাঘর নানান তৈজস দিয়ে ঢেলে সাজানো চলেছে—সব জিনিস শুটিং-এর লোকেরাই এনেছে। কী নেই ওই তিনটে ভ্যানে!

বসবার ঘরে থুতনিতে হাত রেখে প্রীতম চৌধুরী তীক্ষ্ণ চোখে দেওয়ালগুলো নজর করে দেখছিল। এবার সে অমলেন্দুকে বলল—এই ঘরটাও একটু বদলে নিচ্ছি, কেমন? ওদিকের ওই ল্যান্ডস্কেপখানা চলে যাবে। কিন্তু এ দেওয়ালের ছবিটা—ওহে, ওটা নামাও তো—

একজন কর্মী এগিয়ে যেতেই অমলেন্দু বলল—এক মিনিট, প্লিজ। কোন ছবিটা?

—ওই যে, সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বুড়োমানুষের ছবি। ওটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। আমরা একটা মডার্ন অ্যাড করতে চলেছি তো, এটা গতির যুগ—আধুনিক চিন্তাভাবনার যুগ। ওখানে একটা অন্য কিছু—

—ওটা আমার বাবার ছবি।

মুহূর্তের জন্য একটু থতমত খেয়েই তারপর গলায় বিশেষ উৎসাহ এনে প্রীতম বলল—ওঃ, আই অ্যাম সরি, জানতাম না। তবে আমরা কিন্তু ওঁর প্রতি কোনো অসম্মান

দেখাচ্ছি না। উইথ্ এভ্‌রি রেসপেক্ট টু হিম, আমরা ছবির স্বার্থে কিছুক্ষণের জন্য ওটা সরিয়ে রাখছি মাত্র। আই হোপ আই হ্যাভ ইয়োর কনসেন্ট?

—দেখুন, যা ভাল বোঝেন—

প্রয়াত কর্তার ছবি নামাতে দেওয়ালে একটা ওই মাপের চতুষ্কোণ দাগ বেরিয়ে পড়ল। প্রীতম চৌধুরী বলল—এহে হে, এ দাগটার কী করা যায়? রঙ দিয়ে টাচ-আপ করলে তো সমস্ত ঘরটাই করতে হয়। বিশু, দেখো তো, প্রপ ভ্যানে বোধহয় মাইকেল জ্যাক্‌সনের একটা বড় পোস্টার আছে, সেটা ওখানে লাগিয়ে দাও—

বাইরে পাওয়ার ভ্যান থেকে জেনারেটর চলার আওয়াজ আসছে। লম্বা স্ট্যান্ডের ওপর বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্যের আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। খাট সরাতে যে সব পুরনো জিনিস বেরিয়ে পড়েছিল, তা স্তূপ করে রাখা হয়েছে সিঁড়ির নিচে। সাপের মত মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে মোটা তার। ওই কে যেন তাতে হোঁচট খেল। প্রোডাকশন ম্যানেজার চেঁচিয়ে বললেন—পাঁচ ফুট পেছনে!

ঠাকুরঘর থেকে রূপসজ্জা নিয়ে নেমে এল ইন্দ্রাণী। সব চোখ তার ওপর। বুঝতে পেরে সে নামছে যেন মেঘে ভর করে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। এ তার ড্রেসিং টেবিলে গুছিয়ে রাখা মেকআপ বেস, লিপস্টিক, আই শ্যাডো আর ক্রিমের সাজ নয়, এ একেবারে পাকা লোকের হাতে গড়ে দেওয়া শুটিংয়ের সাজ।

প্রীতম চৌধুরী হেঁকে বললেন—ক্যামেরা রেডি? সাউন্ড? শুরু করছি কিন্তু। সব শটের মাত্র একটা করে মনিটর নেব, সিঙ্গল শিফটে নামাতে হবে। এই বিশু, বালিশ ফোলানো হয়েছে? প্রেস করে দাও। ম্যাডাম, আপনি এদিকে আসুন। আমি সিকোয়েন্সগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দিই। প্রথম দৃশ্যে আপনি রান্না করছেন, আপনার পরিশ্রম হচ্ছে, ঘাম হচ্ছে। রান্নার পাত্র নামিয়ে রেখে আপনি শোয়ার ঘরে যাচ্ছেন সামান্য বিশ্রাম নিতে। প্রথম দৃশ্য শেষ। পরের দৃশ্যে বিছানায় রাখা হাওয়া-বালিশে শরীর এলিয়ে দিয়ে আপনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবেন—ক্লান্ত হলেই আমার চাই 'কমফর্ট'। দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ। তৃতীয় দৃশ্যে বসবার ঘরে গ্লাস টপ্ টেবিলে রাখা ফুলদানিতে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ফুল সাজাতে সাজাতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলবেন—মরসুমি ফুলের মতই হরেক রঙে পাওয়া যায়—আমার প্রিয় 'কমফর্ট'। বুঝেছেন? প্রতি শটের আগে আবার বলে দেব। আসুন, এবারে মনিটর, তারপরেই ফাইনাল টেক।

হাজার হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে উঠল। ঘরের মধ্যে কোথাও কোনো অন্ধকার রইল না। স্বপ্নের জগৎ, সুগন্ধ আর ঈষৎ নেশা নেশা ভাবের জগৎ, রঙিন পত্রিকার ধরা-না-দেওয়া পৃথিবীর চিরকাম্য পরিবেশ। হাই ব্যান্ড ইউম্যাটিক ক্যামেরার প্রায় শব্দহীন চলন, ক্যামেরার পেছনে দক্ষ আলোকচিত্রীর ঝুঁকে থাকা শরীর, এ আলো নিভে ও আলো জ্বলে ওঠা। ম্যাডাম হাসুন। ম্যাডাম বাঁ দিকে ফিরুন। ম্যাডাম, সরি আপনার লিপ গ্লস ফেড করে গেছে, একটু মেরামত করে দেব।

আলো সরিয়ে, ক্যামেরা নাড়িয়ে তিনটে শট নিতে বিকেল কাবার। কাজের শেষে প্রীতম চৌধুরী হাসিমুখে ইন্দ্রাণীর কাছে এসে বলল—চমৎকার হয়েছে আপনার কাজ। এটা যদি কাইন্ডলি আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে ভারি খুশি হব।

একটা চেক বাড়িয়ে ধরেছে সে। উল্টোদিক থেকেও চেকের রাশিটা পড়া যাচ্ছে। দেড় হাজার।

--না না, এ আবার কেন! এ কিন্তু বড়—

—কিচ্ছু নয় ম্যাডাম। এটা আপনার প্রাপ্য। প্লিজ নিন—

পেশাদার মানুষেরা কোথাও দেরি করে না, কোথাও গল্পে আটকে থাকে না। ইউনিটের লোকেরা শুটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলতে শুরু করেছে। অমলেন্দু বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছিল। বারান্দার ধারে বসে একজন ছোকরা কর্মী ভালভ্ খুলে হাত দিয়ে চেপে 'কমফর্ট' বালিশের হাওয়া বের করছিল। বাতাস বেরিয়ে বালিশ চুপসে আসার সময় কেমন একটা ফুস্-স্-স্ করে শব্দ হচ্ছে। অমলেন্দুর মনে হল ওই শব্দটার সঙ্গে ফুরিয়ে যাওয়ার, শেষ হয়ে যাওয়ার কী একটা সম্বন্ধ রয়েছে।

ইউনিট চলে গেল। অতিথিরাও। বাড়িঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে। এ সমস্ত গুছিয়ে বাড়িটা আবার বাসযোগ্য করতে হবে। ইন্দ্রাণী এসব কাজ বিশেষ পারে না, অমলেন্দুকেই করতে হবে।

পরের দিন শুরু হল যথাযথ। স্বামী-স্ত্রী ঘুম ভেঙে জেগে উঠল তাদের মধ্যবিত্ত সংসারে। মশারির ফুটো, হায়ার-পারচেজ স্কিমে কেনা স্কুটারের কিস্তি, মাসকাবারি সঙ্কট নিয়ে যে সংসার।

সাড়ে নটার সময় অফিস যাওয়ার জন্য কলাইয়ের ডাল আর লাউছেঁচকি দিয়ে ভাত খাচ্ছিল অমলেন্দু। পরিবেশন করছিলেন ম্যাডাম।

ইন্দুমাধবের রত্নভাণ্ডার

॥ এক ॥

রাতের অতিথি

বর্ধমান শহর প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত এমন বেশি কিছু হয়নি, দশটা সাড়ে-দশটা হবে। কিন্তু আজ দু-দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে অঝোরধারে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। এমন দিনে আর কে বাইরে থাকে? সমস্ত পৃথিবীই যেন ঘুমোবার উদ্যোগ করছে।

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে একটি দোতলা বাড়ি, বেশ পুরনো। হালকা ছাই রঙের দেওয়াল জলে ভিজে কালচে দেখাচ্ছে। বাড়ির কর্তা বিনয়কৃষ্ণ সেন সরকারি চাকরি করতেন, সদ্য অবসর নিয়েছেন। স্বাস্থ্য ভালই আছে। একধরনের মানুষ আছে যারা চাকরি থেকে অবসর নেবার পর কেমন যেন ধাক্কা খায়, দশটা-পাঁচটার রুটিন থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। বিনয়কৃষ্ণ সে দলে নন। অবসর পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। বর্তমানে প্রচুর ডিটেকটিভ বই পড়েন আর ইচ্ছে হলে পাণ্ডুয়াতে এক বন্ধুর পুকুরে মাছ ধরতে যান। খুশিয়াল মেজাজের লোক।

খাটের পাশের ছোট্ট টেবিলে প্রিয় লেখকের বইখানা রেখে শোবার আগে বাথরুমে যাচ্ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ। আঃ, এমন ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি! এবার মশারী গুঁজে পাশবালিশ জড়িয়ে পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে আবার পড়তে শুরু করবেন। যতক্ষণ ইচ্ছে পড়া যেতে পারে। সকালে উঠেই অফিসে দৌড়োতে হবে সে চিন্তা তো আর নেই।

বারান্দা দিয়ে যাবার সময় বাইরে রাস্তার ওপর একটা গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলেন। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে কানে এল শব্দটা।

জি.টি. রোডের ওপরে বাড়ি, কাজেই গাড়ি থামবার কিম্বা তার দরজা বন্ধ হবার শব্দ বিনয়কৃষ্ণের কাছে নতুন কিছু নয়। আজন্ম শুনে আসছেন। কিন্তু আজ এই দুর্যোগে পথে গাড়িঘোড়া একেবারেই কমে গিয়েছে। মাঝেমধ্যে হয়তো বা একখানা ট্রাক গোঁ গোঁ করে ছুটে যাচ্ছে। এ গাড়িটা তো মনে হচ্ছে বাড়ির সামনে থামলো।

বাথরুমে থাকতে থাকতেই বিনয়কৃষ্ণ নিচে সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন।

তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

এত রাতে কে? গাড়ির শব্দের পরই কড়া নাড়া। বর্ষার রাতে গাড়ি করে তাঁর বাড়িতে আসতে পারে এমন কাউকে মনে করতে পারলেন না।

শোবার ঘর থেকে নির্মলা ডেকে বললেন—কে কড়া নাড়ছে গো?

কী জানি, বুঝতে পারছি না।

উঠে এসে নির্মলা বললেন—দরজা খুলতে যাচ্ছ নাকি?

মাথা চুলকে বিনয়কৃষ্ণ বললেন—তা, ধরো—খুলতে তো হবেই—

কেন, খুলতে হবেই কেন? এত রাতে—দিনকাল ভাল নয়। আগে ডেকে দেখো। চেনা না হলে খোলার দরকার নেই।

বিনয়কৃষ্ণ বেঁচে গেলেন। স্ত্রীর কাছে পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে নিচে নামবার উদ্যোগ করছিলেন, এখন আর সে ভয় রইল না। গত সপ্তাহে যে থ্রিলারখানা শেষ করেছেন—'বোবা রাতের আবছায়া'—তাতে নায়ক মাঝরাতে দরজা খুলে একেবারে খুনীর মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। সদ্য পড়া বই, মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে।

কিন্তু সদর দরজায় কড়া যে নড়েই চলেছে। একটা কিছু তো করতে হয়।

বিনয়কৃষ্ণ বললেন—নিচে গিয়ে দেখি, বুঝলে? তেমন দেখলে দরজা না খুললেই চলবে। শহরের ওপর এমন কিছু কেউ ডাকাতি করবে না, তাছাড়া বলতে গেলে এখন সন্ধে রাত।

চলো, আমিও সঙ্গে যাই।

বিনয়কৃষ্ণর পৌরুষ আবার মাথাচাড়া দিল। স্ত্রীলোককে দেহরক্ষী হিসেবে তিনি ভাবতেই পারেন না। বললেন—না না, থাক্। তুমি নয়—আমি একাই যাচ্ছি।

তারপর চারদিক তাকিয়ে বললেন, ছাদের দরজায় সেই ভাঙা খিলটা কোথায় গেল বলতো? দাও দেখি, হাতে নিয়ে নামি।

রান্নাঘরের দো-ছত্রির ওপর থেকে নির্মলা খিলটা এনে দিলেন।

অচেনা লোক হলে দরজা খুলবে না কিন্তু।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার কাছে এসে বিনয়কৃষ্ণ বেশ জোর গলায় বললেন—কে? কী চাই?

ভদ্র, মার্জিত গলায় উত্তর এল—দরজাটা দয়া করে খুলবেন? ভয় নেই, আমি নিতান্তই বিপন্ন পথিক—

এক একটা গলা শুনলে কণ্ঠস্বরের মালিকের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। এই সাবলীল, সরল গলার স্বর শুনে আর যাই হোক লোকটাকে চোর ডাকাত মনে হয়না।

তবু বিনয়কৃষ্ণ ইতস্তত করতে লাগলেন।

বাইরে থেকে আবার তাগাদা এল—বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেলাম মশায়, দয়া করে একটু ভেতরে আসতে দিন—

বিনয়কৃষ্ণর মনের গোপনে কোথাও একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা আছে। সম্ভবত অনেক ডিটেকটিভ বই পড়ার ফল। গল্প জমে উঠলে নিজেকে সেই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে কল্পনা করে উত্তেজনা বোধ করেন। আস্তে আস্তে তিনি দরজার ভারী ছিটকিনিতে হাত দিলেন। দেখাই যাক না কী হয়!

পেছনে একটা কেমন শব্দ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন নির্মলা নেমে এসে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে মূকাভিনয় করে দরজা খুলতে বারণ করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিনয়কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন—দরজা খুলবেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচাপাকা ব্যাকব্রাশ করা চুল, চোখে মোটা টর্টয়েজ শেলের চশমা। লম্বা, দোহারা গড়ন। একহাতে একটা অ্যাটাচিকেস, অন্যহাতে মাথার ওপর ছাতা ধরে আছেন। কিন্তু ছাতায় বৃষ্টি মানছে না, এরমধ্যেই ভিজে গেছেন। দরজার পাশেই রাস্তার ধারে পার্ক করা ক্রীম রঙের অ্যাম্বাসাডারটাও দেখতে পেলেন বিনয়কৃষ্ণ।

তিনি কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক বললেন—ধানবাদ থেকে বেরিয়েছি, যাবো কোলকাতায়। শহরে ঢোকবার পথে পেছনের অফ সাইড টায়ারে কী ফুটে গেল কে জানে! একদম ফ্ল্যাট টায়ার যাকে বলে। কোনোমতে এই পর্যন্ত এসেছি। একটু বৃষ্টি না কমলে তো চাকা বদলাতে পারবো না। গাড়ির মধ্যেই বা কতক্ষণ বসে থাকা যায়? আপনার বাড়িটা দেখে ভাবলাম—

ভদ্রলোক বিনয়কৃষ্ণের দ্বিধান্বিত মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর হেসে বললেন—আমার অ্যাটাচিতে জাস্ট কিছু জামাকাপড়, কয়েকটা বই, টুথব্রাশ, আর একবাক্স চুরুট আছে। বোমাটোমা কিছু নেই। আর এই ছাতাটা—এটাকে ঠিক অস্ত্র বলা যায় কিনা—

লজ্জা পেয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন—না না, সেকি কথা! আসুন, আপনি ভেতরে আসুন—

নির্মলা আবার ওপরে চলে গিয়েছেন। একতলাতে বসবার ঘরে ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন বিনয়কৃষ্ণ। ঘরে পুরনো আমলের কিছু বেতের সোফা আর টেবিল ছাড়া দুটো তাকে রয়েছে বিনয়কৃষ্ণর বইপত্র।

ছাতা বন্ধ করে দরজার কোণে দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াতেই বইগুলোর দিকে তাঁর নজর পড়ল।

বাঃ, এ তো অনেক বই দেখছি! বই পড়ার নেশা আছে নাকি?

বিনয়কৃষ্ণ আমতা আমতা করে বললেন—ওই আর কী। নেশা বলতে কিছু না, আজেবাজে থ্রিলার কিছু আছে। রিটায়ার্ড লাইফ, বই পড়েই—

ভদ্রলোক শেল্‌ফের কাছে গিয়ে বই দেখতে দেখতে বললেন—বই কখনো আজেবাজে হয় না। থ্রিলার তো কী হয়েছে, আমি নিজেও খুব থ্রিলার পড়ি। বই পড়ার অভ্যেস হচ্ছে আসল কথা—আরে! আপনার তো ফাদার ব্রাউনের অমনিবাস রয়েছে দেখছি। রাইডার

হ্যাগার্ডের কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌। বাব্বা! পাঁচকড়ি দে কোথা থেকে জোগাড় করলেন? এই তো শার্লক হোমসের কেস বুক—এসব আজেবাজে বই?

বিনয়কৃষ্ণ কুণ্ঠিতভাবে বললেন—এককালে ইংরেজি বই খুব কিনতাম। এখন যা দাম হয়েছে! দুশো পাতার বই আড়াই পাউন্ড দাম। রিটায়ার করার পর পেনসনই ভরসা—

সোফায় বসে অ্যাটাচি খুলে চুরুটের বাক্স বের করতে করতে ভদ্রলোক বললেন—ছেলেপুলে?

নেই। হয়নি।

লম্বা, সরু আর সবুজ রঙের একটা চুরুট তুলে নিয়ে দুই আঙুলে কানের কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ঠোঁটের ফাঁকে লাগিয়ে ভদ্রলোক বিনয়কৃষ্ণকে বললেন—চলবে একটা?

চুরুট তো খাই না, সিগারেট—আচ্ছা, দিন, দেখি ট্রাই করে—

হাত বাড়াতে গিয়ে খেয়াল হল খিলটা তখনো ধরে আছেন। লজ্জা পেয়ে সেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে একটা চুরুট নিয়ে ধরালেন।

বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন?

যেন ভদ্রলোকেরই বাড়ি।

বিনয়কৃষ্ণ বসে চুরুটে মৃদুমন্দ টান দিতে লাগলেন। প্রথমে একটু কাশি, তারপর সয়ে গেল।

ভদ্রলোক দুই পা সামনে ছড়িয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বললেন—আমাব নাম ইন্দুমাধব চট্টোপাধ্যায়। পেশায় মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার ছিলাম। সঙ্গে নানা ব্যবসাও করতাম। তবে মন দিয়ে ঠিকঠাক কিছুই করা হয়নি। সারাজীবন ঘুরে বেড়িয়েছি এখানে-ওখানে। এখন ভাবছি কোলকাতায় পৈতৃক বাড়িতে শেষজীবনটা কাটাবো। ইদানীং বছর তিনেক ধানবাদে কাটিয়েছিলাম। এবার চাটিবাটি গুটিয়ে বরাবরের মত কোলকাতায় ফিরছি—

ফ্যামিলি বুঝি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন?

ফ্যামিলি? ফ্যামিলি তো নেই। আমি বিয়েই করিনি।

ও।

কিছুক্ষণ চুরুটে টান দিয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন—আজ রাতে বৃষ্টি ধরবে বলে মনে হচ্ছে না। আজকে এখানেই থেকে যান। কাল বরং চাকা বদলে রওনা দেবেন।

কান পেতে বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ শুনে ইন্দুমাধব বললেন—তাই তো মনে হচ্ছে। বেশ, রাত্তিরটা কাটিয়েই যাই—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

না, আপত্তি আর কী? আপনার তাহলে শোয়ার ব্যবস্থা—

কিচ্ছু প্রয়োজন নেই। আমি এই সোফাতেই দিব্যি কাটিয়ে দেবো।

কিন্তু সে রাত্তিরে দুজনের কারোরই শেষ পর্যন্ত শোয়া হল না। ইন্দুমাধব কথায় কথায় নিজের জীবনের গল্প আরম্ভ করলেন। কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন, কত অদ্ভুত জিনিস দেখেছেন, লোকালয় থেকে বহুদূরে কতদিন জঙ্গলের মধ্যে বা পাহাড়ী উপত্যকায় তাঁবু ফেলে রাত কাটিয়েছেন। সেই গল্প।

বুঝলেন মশাই, আসলে এই ভবঘুরে জীবনটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, সে কারণেই আর সংসার করে ওঠা হল না! একটা রাত্তিরের কথা খুব মনে পড়ে, সেদিন হঠাৎ এক আশ্চর্য অনুভূতি হয়েছিল। না, অলৌকিক বা ওই ধরনের কিছু নয়। সিংভুম জেলার

একজায়গায় ইউরেনিয়াম পাওয়ার সম্ভাবনা আছে শুনে সরকার থেকে আমাদের একটা দলকে পাঠিয়েছিল প্রসপেকটিং করতে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে এক উপত্যকায় তাঁবু ফেলে আছি। এক রাত্তিরে, তখন একটা কী দেড়টা হবে, তাঁবু থেকে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য বেরিয়ে এসে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দূর পাহাড়শ্রেণীর ওপর চাঁদ ঝুঁকে পড়েছে, এখুনি অস্ত যাবে। তার বিবর্ণ, অপার্থিব আলোয় সমস্ত উপত্যকা আর বনভূমিকে রূপকথার দেশ বলে মনে হচ্ছে। মাথার ওপর ঝকঝক করছে এক আকাশ নক্ষত্র। ঘুমন্ত পৃথিবীর ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে উদাস, নৈর্ব্যক্তিক আকাশ। কালাঝোড় রেঞ্জের অরণ্যে কোথাও বুনো হাতি ডাকছে, রাত্রির শান্ত বাতাসে ভর করে তীক্ষ্ণ শঙ্খধ্বনির মত শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে পরিবেশে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অমন কত রাত্তির তো বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছি, কিন্তু সেই বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ বুঝতে পারলাম—এ জীবন বেছে নিয়ে ভুল করিনি। ঘর-সংসার, নিয়মবাঁধা জীবন বা ছেলেপুলে মানুষ করা এসব আমার জন্য নয়।

শুনতে শুনতে বিনয়কৃষ্ণর নতুন ধরানো চুরুটে দেড় ইঞ্চি ছাই জমে গেল।

ইস! ঠিক এই জীবন তিনিও চেয়েছিলেন। কিছুই করা হল না।

রাত ফুরিয়ে গেল। সকালে বৃষ্টিও কমে এল অনেকটা। ভোরের আলোয় চট্‌পট্‌ গাড়ির চাকা বদলে ফেললেন ইন্দুমাধব। বিনয়কৃষ্ণ বললেন—রাত্তিরে কিছু দিতে পারিনি আপনাকে। বসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান—

চা? তা বেশ তো, হোক না।

একটু পরে চায়ের কাপ হাতে নিচে এসে দেখলেন ইন্দুমাধব খোলা অ্যাটাচিকেসের সামনে বসে ছোট্ট নোটবুকে কী যেন লিখছেন। তাঁকে দেখে বললেন—এই যে, চা এসে গিয়েছে। সকালে এককাপ চায়ের মত কিছু নেই—

খোলা অ্যাটাচিতে জামাকাপড়ের ওপর একটা মোটা ইংরেজি বই রয়েছে। বিনয়কৃষ্ণ সেদিকে তাকিয়ে আছেন দেখে ইন্দুমাধব বললেন—একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না?

একটু অবাক হয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন—না, কী বলুন?

কাল আপনি আশ্রয় না দিলে আমাকে সারারাত গাড়ির মধ্যে হাত-পা মুড়ে বসে কাটাতে হত। আপনি বেশ উদার এবং সাহসীও বটে। অনেকেই অত রাত্তিরে অচেনা লোককে দরজা খুলে ভেতরে ডেকে আনত না। আপনার আর আমার রুচিরও মিল আছে। আমরা দুজনেই বই পড়তে ভালবাসি। কোলকাতার বাড়িতে আমার একটা লাইব্রেরীও আছে। তাই ভেবেছিলাম যে—আপনার উপকারের প্রতিদান বলে ভাববেন না—এই বইটা যদি আপনাকে উপহার দিই রাগ করবেন না তো? যে বই পড়তে ভালবাসে তাকে বই দিয়ে আনন্দ আছে।

ইংরেজি বইটা বাড়িয়ে ধরলেন ইন্দুমাধব—নিন, আপনার নাম লিখে দিয়েছি। এটা মর্টিমার হুইলারের জীবনী, জাকেত্তা হক্‌স্-এর লেখা। মর্টিমার হুইলার বুঝলেন তো? বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ। থ্রিলারের মতই ভাল লাগবে পড়তে। নিন—

সঙ্কোচের সঙ্গে বইখানা হাতে নিলেন বিনয়কৃষ্ণ। মলাট উলটে চমকে উঠে বললেন—একি! এর দাম তো এগারো পাউন্ড! নতুন বই—এত দামের বই আমাকে দিচ্ছেন কেন?

ক্লিক করে অ্যাটাচি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে উঠে ইন্দুমাধব বিনয়কৃষ্ণর কাঁধে হাত রেখে অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, এক বইখোরের কাছ থেকে আর এক বইখোরের প্রতি উপহার। দামটা কিছু নয়—আপনার ভাল লাগলেই দাম সার্থক। আচ্ছা, চলি—

ইন্দুমাধব চলে যাবার পর বিনয়কৃষ্ণর কাছে সব যেন কেমন অর্থহীন আর বিরস মনে হতে লাগল। ঘরে এসে বইখানা যত্ন করে তুলে রাখলেন শেল্‌ফে। রাত্তিরে শোনা রোমাঞ্চকর গল্পের স্মৃতি হিসেবে ছাইদানিতে প্রচুর ছাই আর পোড়া চুরুটের গোড়া পড়ে আছে।

কী সুন্দর জীবন! বাধাহীন, পিছুটানহীন—তারাভরা আকাশের নীচে কেমন তাঁবু খাটিয়ে থাকা! এ জীবনে আর হবে না। সময় ফুরিয়ে এসেছে, কোমরে বাত দেখা দিয়েছে, বই পড়তে গেলে রিডিং গ্লাস লাগে। ওয়ার্নিং এসে গিয়েছে। এ জীবনে কিছুই হল না।

কিন্তু টিপ টিপ বৃষ্টিঝরা মেঘলা দুপুরে গাছগাছালি ঘেরা বন্ধুর পুকুরে বসে মাছ ধরতে ধরতে মনটা ভাল হয়ে গেল বিনয়কৃষ্ণর। কেমন সুন্দর এই মেঘে ঢাকা আবছা আলোর দুপুর, কচুবনে টুপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ। চারদিকে নিবিড়, প্রগাঢ় শান্তি।

এই কম কী? এই বা ক'জনের হয়? বেশ আছেন তিনি, ভাল আছেন।

॥ দুই ॥

রহস্যময় চিঠি

লম্বা ঘাসবনের মধ্যে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল গণ্ডারটা। হঠাৎ ঠাহর করা যায় না। কেবল একটু জোরে বাতাস বইলে ঘাসবন ফাঁক হয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট কী চার-পাঁচটা পাখি তার গায়ে বসে চামড়ার বর্মের খাঁজ থেকে পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

বাতাস ঘুরে যাওয়াতেই বোধহয় গণ্ডারটা মানুষের উপস্থিতি টের পেল। যে হাতির ওপর থেকে ছবি তোলা হচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপরই যেন ভাল করে দেখবার জন্য ঘাসবন ভেঙে এগিয়ে আসতে লাগল।

বাবু! বাবু!

হর্ষ বাঁড়ুজ্যের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। বোতাম টিপে সুপার এইট প্রজেকটার বন্ধ করে এগিয়ে গিয়ে জানালা থেকে ভারী পর্দা সরিয়ে দিতেই ঘরে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল।

দরজা খুলে হর্ষ রাগী গলায় বললেন—কী চাই?

নকুল কুড়ি-বাইশ বছর এ বাড়িতে কাজ করছে, সে কর্তার রাগের বিশেষ পরোয়া করেনা। সে জানে কর্তার রাগতে দু মিনিট, ঠাণ্ডা হতেও দু মিনিট।

আপনার ভাগ্নে এসে বসে আছে। এখানে নিয়ে আসবো?

হর্ষর কপাল থেকে বিরক্তির রেখা মিলিয়ে গেল।

কে, প্রকাশ? যা—এখানে নিয়ে আয়।

একমিনিট পরে একটি সুদর্শন ছিপছিপে চেহারার যুবক এসে ঘরে ঢুকল।

কেমন আছো মামা?

অ্যাজ এভার। ভাল থাকাটা আমার নিয়ম জানিস তো? সিক্সটিতে শেষ জ্বর

হয়েছিল—তিনদিনের জন্য। এই পঁচিশ বছর ভাল আছি। তুই কেমন আছিস বল—

প্রকাশের মুখ গম্ভীর। সে বলল—পরশু অবধি ভাল ছিলাম।

কেন, আজ নয় কেন?

ইন্দুকাকা একটা চিঠি দিয়েছেন। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

প্রকাশ বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে হর্ষর হাতে দিল।

হর্ষ বাঁড়ুজ্যে চিঠিটা নিয়ে বললেন—ইন্দুকাকা? মানে আমাদের ইন্দুদা? বাব্বাঃ, বহুদিন পরে ওঁর খবর পাওয়া গেল। কী লিখেছেন? আসছেন নাকি?

পড়ে দেখো।

প্রকাশ টেবিল থেকে এককপি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল।

হর্ষ সোফার হাতলে বসে চিঠির ভাঁজ খুললেন।

স্নেহের প্রকাশ,

অনেকদিন বাদে কোলকাতার বাড়িতে এসেছি। কিন্তু এ যাত্রা তোমাদের কারো সঙ্গে দেখা করবো না। সত্যি বলতে কী, আত্মীয়-স্বজনের আকার-প্রকার দেখে তাদের জন্য বিশেষ প্রাণের টানও অনুভব করি না। এর মধ্যে তুমিই যা একটা মানুষ। যাক গে, কাজের কথা বলে নিই।

আমি ধনী নই, কিন্তু কাজের ও নানা ছোটখাটো ব্যবসার সূত্রে কিছু টাকা উপার্জন করেছিলাম। সে-সব টাকা ও কোলকাতার বাড়িটা আমি কোনো সৎ কাজে দান করে যাবো, আত্মীয়স্বজন কাউকে একপয়সাও দেবো না। কিন্তু তোমার সততা, নির্লোভ স্বভাব এবং বিদ্যার্জনের স্পৃহার জন্য তোমাকে আমি ভালবাসি। সারাজীবন ধরে কিছু দামী মণিমুক্তো আমি কিনে রেখেছি। এর বাজারদর প্রায় লাখখানেক টাকা। এখনই এগুলি তুমি পেতে পারো—তবে এক শর্তে। এগুলি কোথায় আছে তা আমি জানাবো না, তোমাকে বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজে নিতে হবে। পেলেই তোমার, আর না পেলে ধরে নিতে হবে তুমি এর যোগ্য নও। সেক্ষেত্রে কিছু আশা কোরো না।

এ চিঠি যখন তুমি পাবে তখন আমি কোলকাতার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। কাজেই দেখা করার চেষ্টা কোরো না। সময় হলে আমি নিজেই দেখা দেব।

আশীর্বাদ নিও। ইতি—

তোমার কাকা
শ্রী ইন্দুমাধব চট্টোপাধ্যায়

চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে হর্ষ প্রকাশের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর কপালে আবার চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

কী বুঝলে মামা?

প্রথমে হর্ষ উত্তর দিলেন না। তারপর বললেন—চিরকেলে ইন্দুদা। খামখেয়ালীপনার চূড়ান্ত। তুই কী করবি ভেবেছিস?

প্রকাশ উজ্জ্বল চোখ তুলে বলল—আমি জীবনে কখনো টাকাপয়সার লোভ করিনি, তুমি তো জানো। কাকার এই অদ্ভুত চরিত্রের জন্যই তাঁকে আমি ভালবাসি। কিন্তু হীরেমুক্তোর জন্য না হোক, এ চিঠির মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ আছে সেটা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। জিনিসগুলো পেলে বরং কাকাকে দিয়ে দেবো, ওগুলোও তিনি সৎকাজে দান করবেন। কিন্তু আই অ্যাকসেপ্ট্ দি চ্যালেঞ্জ।

হর্ষ খুশি হয়ে বললেন—ভাল কথা, তা আমার কাছে কী চাস?

পরামর্শ।

যেমন?

বুদ্ধি খাটিয়ে লুকোনো জিনিস খুঁজে বের করতে হলে কিছু সূত্র চাই। অথচ ইন্দুকাকা সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেননি। তাহলে?

হর্ষ বাঁড়ুজ্যে চামড়া-আঁটা সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—সেটা অবশ্য একটা কথা। ইন্দুদা নিশ্চয় আশা করেন না যে, আমরা ম্যাজিক জানি। সূত্র চাই। একটা কাজ করবি?

প্রকাশ আগ্রহের সঙ্গে বলল—কী?

অ্যাসপ্যারাগাস স্যাণ্ডুইচ খাবি?

প্রকাশ হেসে ফেলে বলল—তুমি পারো মামা। অ্যাসপ্যারাগাস কোত্থেকে জোগাড় করলে?

কোলকাতায় সব পাওয়া যায়। খাবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলেই হয়।

দরজার কাছে গিয়ে হর্ষ চেঁচিয়ে বললেন—নকুল, দুজনের জন্য কফি দিবি।

প্রজেকটার দেখিয়ে প্রকাশ বলল—নতুন কোনো ছবি তুলেছ নাকি? কী দেখছিলে?

আর বলিস না। গত মাসে জলদাপাড়ায় গিয়েছিলাম না? হঠাৎ ঘাসবনের মধ্যে দেখি এক গণ্ডার। সুন্দর আলো, ব্যাকগ্রাউন্ড চমৎকার। ষাট ফিট ফিলিম এক্সপোজ করেছি। এমন সময় গণ্ডারটা টের পেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আরও পনেরো ফিট—তাব পরেই মাহুতটা টেনশন সহ্য করতে না পেরে হাতি ঘুরিয়ে ভাগতে শুরু করল। আঃ, এমন সুন্দর হচ্ছিল! সব মাটি, ব্যাটা মাহুতের জন্য। লিলি-লিভার্ড ফুল!

প্রকাশ হাসি পেলেও চুপ করে রইল। মাহুতটাকে সে মনে মনে দোষ দিতে পারল না। এক্ষেত্রে সবাই পালাত। কেবল গণ্ডার এগিয়ে এসে হর্ষমামার শার্টের কোণ চিবোতে শুরু করলেও তিনি শান্তমনে গণ্ডারের ক্লোজআপ নিয়ে যাবেন।

নকুল এসে স্যাণ্ডুইচ আর কফি দিয়ে গেল।

খেতে খেতে হর্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কলেজ কেমন চলছে?

ভালই।

ছাত্ররা আজকাল পড়তে-টড়তে চায়?

কফিতে চুমুক দিয়ে প্রকাশ বলল, খুবই কম। বেশির ভাগই চায় যাহোক করে পাশ করে যেতে। শিখতে চায় কম ছাত্রই।

হুঁ। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। আমিও খেয়াল করছি, গত পনেরো-কুড়ি বছর ধরে অ্যাকাডেমিক জগতে একটা স্টেডি ডিক্লাইন চলেছে। এরকম চললে কিছুদিনের মধ্যেই জাতটা উচ্ছন্নে যাবে। তোর খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ।

তবে যা, বেরিয়ে পড়।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল—সে কী! কোথায়?

ইন্দুদার বাড়িতে একবার গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আয়।

সেখানে গিয়ে কী হবে? কাকা তো বলেই দিয়েছেন এই চিঠি যখন আমি পাবো তখন তিনি কোলকাতায় থাকবেন না।

হর্ষ একটু ভেবে বললেন—ইন্দুদার বাড়ি দেখাশুনো করে যে লোকটা তার নাম যেন কী?

বনমালী।

তার সঙ্গে তো দু-একটা কথা বলতে পারবি। যা একবার—

বেশ, একবার দেখেই আসি।

প্রকাশ উঠে দরজার দিকে রওনা দিয়েছে, পেছন থেকে ডেকে হর্ষ বললেন—শোন, একটা কথা—

কী?

ওখানে কী হল আমাকে টেলিফোনে জানাবি। তোর আসার প্রয়োজন নেই।

কেন?

ইন্দুদা কাজের ভার তোকেই দিয়েছেন, আমাকে নয়। এ কাজে তোর কারো সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। একাই করবি। একান্ত ঠেকে গেলে আমাকে জানাস। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে যা করা উচিত করবো।

প্রকাশ হাসল। বলল—আর একটা চ্যালেঞ্জ? বেশ, তাই হবে।

চক্রবেড়িয়া রোডের একটু পুরনো ফ্যাশানের একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল প্রকাশ। দোতলা বাড়ি। এ বাড়ি যখন হয়, তখনো কোলকাতায় জমির জন্য এতটা হাহাকার পড়ে যায়নি। কাজেই ঘরগুলো বেশ বড় বড়, ওপরে বল্লমের মত ফলা লাগানো লোহার গেট। দোতলার জানলাগুলো সব বন্ধ। বাইরে থেকে দেখলেই মনের মধ্যে একটা 'কেউ নেই, কেউ নেই' ভাব হয়।

গেট খুলে ঢুকতেই নজরে পড়ে এক বুড়োকে। হাঁটুর ওপরে ধুতি, খালি গা। উবু হয়ে বসে সে খুরপি দিয়ে বাগানের মাটি খোঁচাচ্ছে।

বনমালীদা, কেমন আছ? ইন্দুকাকা কোথায়?

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে খুশি মুখে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, প্রকাশদাদা যে! ভাল আছ তো? কতদিন দেখিনি! বাবু তো নেই—

ভাল আছি বনমালীদা। তুমি ভাল তো? কাকা কোথায় গেছেন?

বাবুকে তো জানোই, বলে কী যায় কখনো? কবে ফিরবে তাও কিছু বলে যায়নি। তবে তোমার জন্য একটা চিঠি রেখে গিয়েছে—

প্রকাশ আশ্চর্য হয়ে বলল, চিঠি? আমার জন্য? কাকা কী করে জানলেন আমি আসবো?

তা তো জানি না। বলে গেল, প্রকাশ এলে তার হাতে দিস।

আর যদি আমি না আসতাম, তাহলে?

বনমালী একটু বিষণ্ণ মুখে মাথা চুলকোল, তারপর হঠাৎ খুশি হয়ে বলল, তাহলে আমি গিয়ে চিঠিটা তোমাকে দিয়ে আসতাম।

প্রকাশ হেসে বলল, আচ্ছা, দাও চিঠিটা—

বনমালী একতলার কোণের দিকে নিজের ঘর থেকে একটা সাদা খাম এনে প্রকাশের হাতে দিয়ে বলল, একটু বসবে? সরবৎ করে দেব? বাগানের গাছে খুব ভাল লেবু হয়েছে।

না বনমালীদা, আজ নয়। কাকা এলে একদিন আসবো।

চিঠিটা তখনই খুলে দেখার খুব ইচ্ছে হলেও সে ইচ্ছে দমন করে, প্রকাশ হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। নিরিবিলি এককোণের টেবিল খুঁজে বসতেই হাফপ্যান্ট পরা ছোকরা বয় এসে বলল, কী দেবো স্যার?

কফি দাও।

আর ডবল ডিমের মামলেট?

প্রকাশের মজা লাগল।

তুমি তো বেশ ভাল সেলসম্যান দেখা যাচ্ছে। না, আমার পেট ভরা। একটু আগে অ্যাসপারাগাস স্যাণ্ডুইচ খেয়েছি। অ্যাসপারাগাস জানো?

না স্যার।

তবে যাও, শুধু কফি আনো। আর ভবিষ্যতে মামলেট বলবেনা, ওটাকে অমলেট বলে।

ছেলেটা কফি দিয়ে যেতে প্রকাশ পকেট থেকে খাম বের করে চিঠি খুলল। তারিখ, সম্বোধন ও স্বাক্ষরহীন চিঠি, বা চিঠি বলা যায় কী? ভাষাটা এইরকম—

আপাত অসংবদ্ধতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত। ভরসা হারিও না। লক্ষ্ণৌয়ের ভদ্রলোক বাঘের গল্প করছিলেন। শুনে হেসে উঠলেন ইরাণের রাজা। সবচেয়ে বড় কাজ কী? সেখানে মুসা পার্দাসিয়াকা যা হলে পুরোপুরি হয়—তত। কোথায়? পাখি। একটাই মাত্র। জনবুল এ পাখিটা দেখেছে। উপহার সম্বন্ধে কথা হোক।

চিঠিটা একবার পড়ল প্রকাশ। দু'বার, তিনবার। তারপর ভাঁজ করে পকেটে রেখে মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকিয়ে রইল।

এ আবার কী সমস্যা! কোথায় লক্ষ্ণৌ আর কোথায় ইরাণ! তাছাড়া বাঘের গল্প শুনে সেখানকার রাজা হেসেই বা উঠবেন কেন? কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কী? দানধ্যান, পড়াশোনা, সমাজসেবা, গবেষণা করা? পাহাড়ে চড়া? দূর—ঐসবের সঙ্গে মণিমুক্তোর সম্পর্ক কী?

মুসা পার্দাসিয়াকা কাকে বলে? জনবুল কে?

ভাবতে ভাবতে মাথাগরম হয়ে শেষ পর্যন্ত খিদে পেয়ে গেল। ছোকরা বয়টাকে ডেকে প্রকাশ বলল, ডবল ডিমের মামলেট আর কফি।

ছোকরাটা চোখ পিটপিট করে বলল, অমলেট।

প্রকাশ রেগে বলল, যা যা, মেলা ফাজলামি করে না।

ছেলেটা হেসে চলে গেল।

একটা পাখি যদি কোথাও বসে থাকে, তাহলে প্রকাশ দেখলেই বা কী আর জনবুল দেখলেই বা কী? হঠাৎ কেউ বাঘের গল্প করবে কেন?

খাবার এল।

অমলেট খাচ্ছে না তো, যেন ভিজে ন্যাকড়া চিবোচ্ছে। কফির স্বাদ যেন ডিস ধোয়া জল।

মাথার মধ্যে তাজ্জিম মাজ্জিম করছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিল চুকিয়ে রেঁস্তোরা থেকে বেরুল প্রকাশ।

রেস্তোরাঁর দরজার ঠিক সামনে এক ভদ্রলোক মানিব্যাগ খুলেছেন, কিছু কিনবেন বলে। হঠাৎ হাত ফসকে কিছু খুচরো ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। প্রকাশ অবাক হয়ে ভাবছে, এই খুচরোর আকালের দিনে লোকটা এত চেঞ্জ পেল কোথায়—তারমধ্যেই ছুটে এসেছে কটা ভিখিরি ছেলেমেয়ে, পয়সা কুড়িয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। কয়েকজন পথচারী দাঁড়িয়ে তাদের ধমকাচ্ছে। বেশ ভিড় হয়ে গেল জায়গাটায়। লোকজন ঠেলে বেরিয়ে এসে প্রকাশ সামনেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ড্রাইভারকে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে চোখ বুঁজে আরাম করে এলিয়ে বসল বটে, কিন্তু তার আপাতশান্ত শরীরের ভেতর বেগে কাজ করতে লাগল ভয়ানকভাবে জেগে ওঠা মনটা।

শুধুমাত্র বাঘের গল্প শোনাবার জন্য লক্ষ্মৌ থেকে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন ইরাণের রাজার কাছে? এটা একটা কথা হল?

বাড়ি ফিরে জামা খোলবার সময় মনে হল কাকার চিঠিটা আলমারিতে তুলে রাখা যাক।

জামার পকেট থেকে খামটা বের করে অবাক হয়ে গেল প্রকাশ।

এটা তো সে খাম নয়। এ খাম কী করে তার পকেটে এল?

কাকার চিঠিভরা খাম ছিল সাদা রঙের, এটা হালকা নীল।

দ্রুতহাতে খাম খুলে ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করল প্রকাশ। অত্যন্ত বদখত হস্তাক্ষরে তাতে লেখা—মৃত্যুর পথে পা বাড়িও না। সাবধান!

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে প্রকাশ হাসতে শুরু করল। অধ্যাপক হলেও সে ক্ষীণজীবী নয়। তাকে দেখে ব্যায়ামবীর বলে মনে হয় না বটে, কিন্তু তার শরীর রীতিমত সবল। সখ করে কিছুদিন জুডো আর ক্যারাটেও শিখেছিল। এত সহজে সে ভয় পাবার লোক নয়।

হাসি থামলে সে হর্ষ বাঁড়ুজ্যের ফোন নম্বর ডায়াল করল।

হর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মামা, আমি প্রকাশ বলছি। তোমার পরামর্শে উপকার হয়েছে। ইন্দুকাকা বাড়িতে নেই বটে, কিন্তু বনমালীদার কাছে তিনি আমার জন্য একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। সেটা পেয়েছি।

বটে! সে চিঠিতে কী আছে?

ধাঁধা।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ মামা। ওটা ঠিক চিঠি নয়। পড়লে মনে হচ্ছে আবোলতাবোল কয়েকটা বাক্য। সম্ভবত এটাই রত্ন উদ্ধারের পথে প্রথম সূত্র।

হুঁ। এক কাজ কর, তুই আজ বিকেলে চিঠিটা নিয়ে আমার কাছে আয়। ধাঁধা তুই-ই ভাঙবি, আমি হেল্প করবো না। তবে ব্যাপারটা একবার দেখতে চাই।

যাবো মামা। তবে অরিজিন্যাল চিঠি আর আমার কাছে নেই। হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

অপর প্রান্তে সামান্য স্তব্ধতা। তারপর বিস্মিত গলায় হর্ষ প্রশ্ন করলেন—হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। কী রকম?

ইন্দুকাকার ওখান থেকে বেরিয়ে একটা দোকানে কফি খেতে ঢুকেছিলাম। সেখান থেকে যেই বেরিয়েছি, কেপমারী গ্যাং-এর কায়দায় খুচরো পয়সা পথে ছড়িয়ে ভিড় জমিয়ে আমার পকেট থেকে কে বা কারা চিঠিটি তুলে নিয়েছে।

সেকি রে! যাঃ, এখন কী হবে?

প্রকাশ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, খুব একটা অসুবিধা হবে না। মামা, তুমি কী ভুলে গেছ, আমার প্রায় আইডেটিক মেমরি আছে। দশ লক্ষে একজনের এমন থাকে কিনা সন্দেহ। কোনো কিছু বার দুই পড়লেই আমি মনে রাখতে পারি, আর এই চিঠিটা একে ছোট—তাতে তিনবার পড়েছি। তুমি চিন্তা কোরো না মামা, একটা কপি তৈরি করে সন্ধের সময় তোমার কাছে যাবো।

সাবধানে থাকিস। এসব রাহাজানি কাণ্ড আমার ভাল লাগছে না।

॥ তিন ॥

পাঠোদ্ধার

হর্ষ বলছিলেন, জিনিসটা হবে এক ধরনের থ্রি-টায়ার ইটালিয়ান পাই গোছের। সস্‌প্যানে কুকিং মিডিয়াম দিয়ে প্রথমে আলুসেদ্ধর একটা স্তর, তারপর মাংসের কিমার একটা স্তর, তারপর আবার আলুসেদ্ধ আর কিমা। এইভাবে তিনটে লেয়ার হয়ে গেলে আস্তে আস্তে ওপর থেকে ফেটানো ডিম ঢেলে দিতে হবে। অমলেট জড়ানো পাই—কী হল, তোর কী হল?

প্রকাশ অসহিষ্ণুভাবে বলল—আচ্ছা মামা, তুমি আমার ব্যাপারটায় আর একটু সিরিয়াস হতে পারো না?

হর্ষ যথার্থ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, কোন ব্যাপারটায় বল তো?

এই চিঠির ব্যাপারটা।

ওঃ, ওটা!

হর্ষ নিশ্চিন্তে সোফায় গা ঢেলে দিয়ে বললেন—ওটা তো হয়ে গেছে।

প্রকাশের চোখ বড় বড় হয়ে গেল—হয়ে গেছে মানে?

মানে, ইন্দুদা কী বলতে চেয়েছেন সেটা আমি বুঝেছি। চিঠিটা সাজেস্টিভ ক্রিপটোগ্রামে লেখা। প্রতি শব্দের প্রথম অক্ষর নেওয়া বা অলটারনেটিভ শব্দের শেষ অক্ষর নেওয়া—ওসব কিছু নয়। বাক্যের অর্থ যে অনুষঙ্গ আনছে তার ভেতরেই মানে লুকিয়ে আছে।

যেমন?

হর্ষ খুব ঠাণ্ডা চোখে প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—ব্যস, আমি আর কিছু বলবো না। নিজে চেষ্টা কর গে। তুই পারবি। যেটুকু বললাম ততটুকুই আমার বলা উচিত হয়নি।

বাড়ি এসে রাত্তিরের খাওয়া সেরে পড়ার টেবিলে ল্যাম্প জ্বেলে বসল প্রকাশ। আজ এস্‌পার নয় ওস্‌পার। মামা এক ঘণ্টায় পেরে গেল আর সে সারা রাত্তিরে পারবে না? পারতেই হবে।

চাইমিং ক্লকে রাত এগারোটা বাজল।

বারোটা। একটা।

চোখ জ্বালা করছে প্রকাশের। কাগজের ওপর সাজানো কালো অক্ষরগুলো এঁকেবেঁকে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

দূর! কী লিখেছে ইন্দুকাকা! কিছুমাত্র যদি কোনো মানে হয়!

লক্ষ্মৌয়ের ভদ্রলোক। ইরাণের রাজা। জন বুল। একটা পাখি।

কী যেন একটা আবছা আদল পাওয়া যাচ্ছে—ঠিক জায়গাটার ওপর হাত রাখা যাচ্ছে না। কী সেটা? কী?

রাত দুটোর সময় টেবিলে মাথা রেখে আলতো ঘুমে তলিয়ে গিয়ে একটা স্বপ্ন দেখল প্রকাশ।

জাব্বাজোব্বা আর গলায় মুক্তোর ঝালর পরা—মাথায় পাগড়ী ইরাণের শাহ একটা বনের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছেন। তাঁকে তাড়া করেছে এক বিশাল বাঘ। দৌড়োতে দৌড়োতে ইরাণের শাহ চিৎকার করছেন—মুঝে শের খা ডালা! মুঝে শের খা ডালা।

চমকে জেগে উঠল প্রকাশ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত দুটো দশ।

হয়েছে! এই ব্যাপারটাই তার অবচেতনে ভেসে বেড়াচ্ছিল, অথচ সে ঠিক ধরতে পারছিল না।

লক্ষ্মৌয়ের ভদ্রলোক বাঘের গল্প করলে নিশ্চয় মাতৃভাষায় করবেন—অর্থাৎ উর্দুতে। উর্দুতে বাঘকে বলে—শের। আর ইরাণের রাজার উপাধি শাহ। দুয়ে মিলিয়ে হয়—শেরশাহ।

পরের বাক্যটা কী? উত্তেজনায় বুক কাঁপছে প্রকাশের।

'সবচেয়ে বড় কাজ কী?'

কার কাজ? শেরশাহের? অবশ্যই গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড। এটাই শেরশাহের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এপর্যন্ত হল। তারপর?

মুসা পার্দাসিয়াকা।

মুসা তো ইতিহাসে মোজেসকে বলে। ধর্মগুরু মোজেস।

ড্রয়ার থেকে নোটবই বের করে একটা নম্বর খুঁজে বের করল প্রকাশ, তারপর রিসিভার তুলে দ্রুত আঙুলে ডায়াল করতে লাগল।

পনেরো-ষোলোবার রিং হবার পর রিসিভার তোলার শব্দ। ওপারে তার সহকর্মী ইতিহাসের অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের ঘুম জড়ানো গলা—হ্যালো, কে?

আমি প্রকাশ। শোন ত্রিদিব, মুসা পার্দাসিয়াকা কী মোজেসের পুরো নাম?

অ্যাঁ, কী বলছিস?

প্রকাশ প্রশ্নটা আবার করল।

কী ব্যাপার বল তো? রাত দুটোর সময় এসব কী?

ব্যাপার আছে। পরে বলবো। আগে এটা বল।

না। মোজেসকে মুসা বলে বটে, কিন্তু তার পরেরটা তো কোনো প্রাণী বা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম বলে মনে হচ্ছে। তুই বরং নির্মল কুণ্ডুকে ফোন কর, ও বলে দেবে। নম্বর জানিস তো? কিন্তু প্রকাশ, এত রাত্তিরে এসব আজগুবি কথা—

ততক্ষণে প্রকাশ লাইন কেটে নির্মল কুণ্ডুর নম্বর ডায়াল করছে।

মাত্র একবার রিং হতেই নির্মল কুণ্ডুর স্পষ্ট গলা—হ্যালো।

কে, নির্মল নাকি? কী ব্যাপার, কোলে ফোন নিয়ে বসে আছিস মনে হচ্ছে। ঘুমোসনি?

না, পড়াশুনো করছি। নার্ভ ইমপালসের ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টির ওপরে একটা ভাল বই হাতে এসেছে। এমনিতেও কোনো লেখাপড়া জানা লোকের রাত তিনটের আগে শোওয়া উচিত নয়। আমি প্রত্যেক দিনই তিনটেয় ঘুমোতে যাই।

উঠিস কখন?

সকাল ন'টায়। স্বাভাবিক মানুষের ছ'ঘণ্টা বিশ্রাম যথেষ্ট।

এত বেলায় ওঠা কী ভাল?

কে বলেছে নয়? আমার রুটিন তো ঠিকই আছে, কেবল চব্বিশ ঘণ্টার ছকের মধ্যে দিয়ে ওটাকে অন্যভাবে বিন্যস্ত করে নিয়েছি। স্বয়ং বিজ্ঞানী দার্শনিক রেনে দেকার্তে দুপুরবেলা ঘুম থেকে উঠতেন। যাকগে, কিজন্য ফোন করছিস বল।

মুসা পার্দাসিয়াকা কী জানিস?

সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের উত্তর—জানি।

কী?

কলা।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল, কলা?

হ্যাঁ। যাকে ইংরেজিতে ব্যানানা বলে। কলার অনেক রকম জাত বা স্পিসিজ আছে। তার একটা হল মুসা পার্দাসিয়াকা। এটা ওই জাতের কলার বৈজ্ঞানিক নাম। ভাষাটা ল্যাটিন।

থ্যাঙ্ক ইউ।

নির্মল আর কিছু বলবার আগেই প্রকাশ ফোন ছেড়ে দিল।

কলা! পুরোপুরি হয় কটা হলে? দশটা? একডজন? পনেরোটা? ষোলোটা?

ষোলোটাই তো বটে! লোকে তো ষোলোকলা পূর্ণ হবার কথাই বলে।

প্রথমে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড। তারপর পাওয়া যাচ্ছে ষোলো। অর্থাৎ ষোলো নম্বর গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড বোঝানো হচ্ছে। দারুণ!

তিনটে বাজতে পাঁচমিনিট বাকি।

প্রকাশ দুই হাতে নিজের চুল খামচে ধরেছে।

জন বুল কে? কোনো ঐতিহাসিক রাজপুরুষ? নাঃ, কিন্তু নামটা শোনাশোনা লাগছে।

আচ্ছা, এখানেও লক্ষ্মৌয়ের ভদ্রলোকের ব্যাপারটা প্রয়োগ করা যায় তো? জন বুল যেই হোক, সে ইংরেজ। কাজেই তার মাতৃভাষা নিশ্চয় ইংরেজি। কাজেই পাখি দেখে জনসাহেব বলবে—বার্ড।

কিন্তু পাখি শুধু নয়, সূত্রে আছে—একটা পাখি। জন বুলের ভাষায়—এ বার্ড।

কোনো মানে হচ্ছে না।

'ওয়ান বার্ড' হতে পারে বটে। তাতেও কিছু দাঁড়াচ্ছে না।

হঠাৎ প্রকাশের মাথায় আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল।

ইন্দুকাকা সূত্রে 'একটা পাখি' লেখেন নি, লিখেছেন 'পাখি একটাই'। আক্ষরিক অনুবাদ করলে কী পাওয়া যায়?

বার্ড এ? নাঃ, মানে হয় না।

বার্ড ওয়ান?

হয়েছে! বার্ডওয়ান।

ইংরেজিতে বর্ধমান শহরকে বার্ডওয়ান লেখে বটে। জন বুল তাই বলবে।

বর্ধমান শহরে ১৬ নম্বর গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে খোঁজ নিতে বলা হচ্ছে। পাওয়া গেছে!

চাইমিং ক্লকে রাত তিনটে বাজল।

শেষ বাক্যটা কী? 'উপহারের বিষয়ে কথা হোক।' এটা তো বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা চিঠির শেষ কথা। অর্থাৎ আগে বর্ধমানে ওই ঠিকানায় পৌঁছে তারপর উপহারের বিষয়ে কথা বলতে হবে—কাকা হয়তো এই বলতে চেয়েছেন। আপাতত কোথায় যেতে হবে তা তো বোঝা গেল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে শরীর টানটান করে হাই তুলল প্রকাশ। বহুদিনের ভেতর এত রাত অবধি জাগেনি, চোখের মধ্যে জ্বালা করছে। কিন্তু মনের ভেতর কঠিন কাজ যথাযথভাবে শেষ করার আনন্দ।

খুব ইচ্ছে করছে হর্ষমামাকে খবরটা জানাতে। এত রাত্তিরে ফোন করা কি উচিত হবে? সামান্য দ্বিধা করে প্রকাশ হর্ষ বাঁড়ুজ্যের নম্বর ডায়াল করল। কয়েকবার রিং হবার পর মামার ঘুম থেকে ওঠা গলা—বল প্রকাশ, কবে যাবি?

তার মানে, তার মানে—তুমি বুঝতে পেরেছো আমি ফোন করছি?

অবশ্যই। ধাঁধার উত্তর বের করে ফেলেছিস তাও বুঝতে পেরেছি, নইলে এত রাত্তিরে ফোন করতিস না—বর্ধমান তো?

হ্যাঁ। গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড।

রাইট। ষোলো নম্বর। পরশু সকালে যাবো, আমার গাড়িতে। রেডি থাকিস—ছ'টার সময় তোকে তুলে নেবো।

॥ চার ॥

রহস্য ঘনীভূত

দক্ষিণেশ্বরের পাশ দিয়ে বিবেকানন্দ সেতু পেরিয়ে গাড়ি দিল্লী রোডে এসে পড়ল। স্পীডোমিটারের কাঁটা ষাট থেকে সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে চলাচল করছে। বৃষ্টি হচ্ছে না বটে, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। এইরকম মেঘচাপা আলোয় পৃথিবীকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। দিল্লী রোডের দু-পাশে সবুজ গাছপালা আর ফাঁকা মাঠ দেখে প্রকাশের মন খুশি হয়ে উঠল। সে বলল, মামা, কোলকাতা থেকে না বেরুলে টের পাওয়া যায় না পৃথিবীটা এত সুন্দর। শহরে থাকতে থাকতে আমাদের সৌন্দর্যের বোধটাই শুকিয়ে যেতে চলেছে।

হর্ষ বাঁড়ুজ্যে বললেন—শহরের কারাগারকে কবি কীট্স্ 'সিটি পেন্ট' বলেছেন। সে কতদিন আগের কথা ভাব—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। তখন রেল ছিল না, ইলেকট্রিক ছিল না, লোকসংখ্যা কম ছিল, এত কলকারখানা ছিল না, কিন্তু তখনো শহরকে কীট্সের কারাগার বলে মনে হয়েছে। বিখ্যাত শিল্পী পল সেজান্-এর নাম শুনেছিস তো?

হুঁ। দি কার্ড প্লেয়ার্স যাঁর আঁকা।

হর্ষ বাঁড়ুজ্যে চকিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার ভাগ্নেকে দেখে নিয়ে বললেন, বাঃ, তুই নিজের সাবজেক্টের বাইরেও কিছু কিছু খবর রাখিস দেখা যাচ্ছে। তা, সেজান্ একবার

দুঃখ করে তাঁর বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন—'জানো ভাই, তুমি আর আমি ছোটবেলায় যে পার্কে খেলা করতাম, সেখানে কিছুদিন হল ইলেকট্রিক বাতি লাগিয়েছে। জায়গাটার সৌন্দর্য একদম মাটি!'

প্রকাশ বলল, কিন্তু বিজ্ঞানকেও তো মানুষের প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্যরক্ষার খাতিরে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে থামিয়ে রাখা কী খুব যুক্তির কথা হবে?

হর্ষ বাঁকা চোখে প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর বিজ্ঞানের জন্য সৌন্দর্যকে কচুকাটা করা খুব যুক্তির কথা, না কী?

প্রকাশ চুপ করে রইল।

আসলে কী জানিস, ব্যাপারটা সত্যিই একটা বড় সমস্যা। প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। ইউ গেট নাথিং আউট অফ্ নাথিং। বিদ্যুৎ, কলকারখানা—এসব পেতে হলে কিছু কিছু গাছপালা কাটা পড়বেই, ফাঁকা জমিতে ফ্যাক্টরি উঠবেই। উপায় কী? দরকার যেটা, তা হল একটা ভারসাম্য রক্ষা করা। কোনটা আমাদের একান্ত প্রয়োজন আর কোনটা নয়, তাও ঠিক করে নিতে হবে। যেমন ধর—ওষুধের কারখানা খুবই দরকার, কিন্তু রেফ্রিজারেটরের কারখানা একটা কম হলেও ক্ষতি নেই।

প্রকাশ বলল, আমার তো মনে হয় মোটর গাড়ির কারখানা বন্ধ করে দিয়ে বাইসাইকেলের কারখানা বাড়ানো উচিত।

হর্ষ হেসে বললেন, মন্দ বলিসনি। তবে এ যুগে গতির প্রয়োজন আছে। নইলে পিছিয়ে পড়তে হবে।

তা কেন? যেখানে গতি দরকার, যেমন মহাকাশ গবেষণায় বা পুলিশ মিলিটারীর কাজে—সেখানে রকেট, প্লেন বা মোটরগাড়ি থাকুক, কিন্তু সাধারণ মানুষ শান্ত, জীবনযাপনে অভ্যস্ত হোক। ভেবে দেখো মামা, পৃথিবীর সব বড় বড় শিল্পকীর্তি যন্ত্রযুগের আগে সৃষ্টি হয়েছে। শেকসপীয়ারের নাটক, দান্তের কবিতা সব মোমবাতির আলোয় লেখা। তারপর উন্নতি অনেক হয়েছে। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রকৃত লাভ যোগ হয়েছে কতটুকু? লোহালক্কড় দিয়ে কী হবে, প্রাণে গান না থাকলে?

হর্ষ বাঁড়ুজ্যে বিস্ময়ের সুরে বললেন, তুই এ নিয়ে বেশ চিন্তা-ভাবনা করিস দেখা যাচ্ছে।

তারপর স্বর বদলে বললেন, মোটরগাড়ি আবিষ্কার না হলে আর একটা জিনিস হতে পারত না।

কী মামা?

পেছনের নীল রঙের গাড়িটা আমাদের ফলো করতে পারত না।

প্রকাশ চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখল অনেক দূরে একটা নীল প্রিমিয়ার গাড়ি আসছে বটে। সে বলল, ওটা যে আমাদের ফলো করছে এমন তো নাও হতে পারে। হয়তো এমনি কেউ—

না। আমি স্পীড কমিয়ে বাড়িয়ে দেখলাম, ওরাও তাই করে একটা সমান দূরত্ব বজায় রেখে পেছনে আসছে। দেখবি?

হর্ষ অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি বাড়ালেন।

পেছনের গাড়িটা প্রথমে পিছিয়ে পড়ল, তারপরে গতি বাড়িয়ে আবার এগিয়ে এল। হর্ষ বললেন, দেখলি?

তাতেও কিন্তু ফাইনালি প্রমাণ হয় না গাড়িটা আমাদের পিছু নিয়েছে। হাইওয়েতে যারা গাড়ি চালায় তাদের অনেকে এরকম খেলা করতে ভালবাসে। এও হয়তো তাদের একজন।

হর্ষ দৃঢ় গলায় বললেন, না। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে গাড়িটাকে প্রথম লক্ষ্য করি। আবার দেখি ডানলপের ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে। এখন গত সাত-আট কিলোমিটার ধরে আঠার মত পেছনে লেগে রয়েছে। আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস—

কী?

যারা তোর পকেট থেকে চিঠিটা তুলে নিয়েছিল তাদের অস্তিত্বের কথাটা তোর খেয়াল থাকছে না। না প্রকাশ, ইট ইজ টু মাচ্ অফ এ কোইন্সিডেন্স। একসঙ্গে এতগুলো কাকতালীয় ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রকাশ আর একবার পেছনে তাকাল।

গাড়িটা সমান দূরত্বে ঠিক চলে আসছে।

হর্ষর দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বলল, এখন কী করা?

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে ভুরু কুঁচকে রয়েছেন হর্ষ, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। সমস্যায় পড়লে এটা করা তাঁর অভ্যেস।

একটু ভেবে হর্ষ বললেন, শোন, বর্ধমানের আগে শক্তিগড় পড়ে, জানিস তো? শক্তিগড়ের নোড়া পান্তুয়া বিখ্যাত। শক্তিগড়ে ঢুকেই বাঁদিকে রাস্তার ওপরে ল্যাংচা মহল নামে দোকান, সেখানে আমরা থামব। দেখি পেছনেব গাড়িটা কী সিদ্ধান্ত নেয়।

নোড়া পান্তুয়া কী?

হর্ষ বাঁড়ুজ্যে মুহূর্তে একেবারে বদলে গেলেন। উৎসাহিত গলায় বললেন, নোড়া পান্তুয়ার নাম শুনিস নি? তুই কী রে? ল্যাংচা চিনিস তো? ছোট ছোট কালো পাশবালিশের মত দেখতে—তারই বড় ভাই আব কী! প্রায় বাটনা বাটা নোড়ার মত সাইজ, তাই নাম নোড়া পান্তুয়া—

প্রকাশ বলল, এত যে নাম, জিনিসটার বৈশিষ্ট্য কী?

হর্ষ উত্তেজনায় যেন কেমন হয়ে গেলেন। বৈশিষ্ট্য! তুই বলছিস কী! পান্তুয়া করা কত কঠিন জানিস? এ তোর কোলকাতার লেডিকেনী নয়—সেগুলো তো সান্-ট্যান করা সাহেবের মত হাল্কা ব্রাউন রঙের। এ হচ্ছে কুলীন নিগ্রোর মত কুচকুচে কালো আর মোটা ছালওয়ালা পান্তুয়া। আশ্চর্য কারিগর বটে! অত মোটা ছাল করতে গেলে অনেকক্ষণ ভাজতে হয় নিশ্চয়—তবুও ভেতরটা অমন তুলতুলে রাখে কীভাবে? তাছাড়া কোলকাতার দোকানে দু-নম্বরী ছানা দিয়ে পান্তুয়া বানায়, ভাজলে তো আর বোঝা যাবে না—সেই সুবিধেটা আছে। শক্তিগড়ে কখনো তা করেনা। এক নম্বর দানাদার ছানা দিয়ে—যাক, অত কথায় দরকার কী? এই এক্ষুনি শক্তিগড় আসবে, একেবারে খেয়ে দেখবি।

প্রকাশ মনে মনে হাসল। মামা বটে একটা অদ্ভুত লোক। যেই রান্নাবান্নার কথা উঠেছে, অমনি সব কিছু ভুলে সেই গবেষণা শুরু করে দিয়েছে।

বর্ধমানের কয়েক কিলোমিটার আগে শক্তিগড়। হর্ষ বললেন, প্রকাশ, আধ কিলোমিটার সামনে বাঁদিকে দুটো বাঁশের ওপর খাটানো সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছিস? ওটাই ল্যাংচা মহল।

রাস্তার ধারেই দোকান। গাড়ি থামতে একটা ছোকরা চাকর দৌড়ে এসে চারপাই পেতে দিল। মাথার ওপরে বেশ বড় একটা কী গাছ। নিবিড় শান্তি জায়গাটার। চারপাইতে বসে হর্ষ রুমাল বের করে সবে কপালের ঘাম মুছতে শুরু করেছেন, এমন সময় নীল প্রিমিয়ারটা হুস করে বেরিয়ে চলে গেল। ড্রাইভার ছাড়াও একজন লোক আছে গাড়িতে, কিন্তু অত জোরে যাওয়ায় কারো মুখই দেখা গেল না।

হর্ষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে তাকালেন।

দোকানের মালিক ভারি বিনয়ী। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মোটাসোটা প্রৌঢ় লোক। লালচে চোখ। হাতজোড় করে বলল, কী দেবো বলুন।

হর্ষ বললেন, নোড়া পান্তুয়া, আবার কী।

আজ্ঞে, ওজনে দেবো, না পিস-এ দেবো?

হর্ষ হেসে বললেন, না না, ওজনে নয়। পিসেই ভাল।

পান্তুয়াগুলো সত্যিই উৎকৃষ্ট। ছানার গন্ধই অন্য রকম। খেতে খেতে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে হর্ষ বললেন, কেমন বুঝছিস?

দারুণ!

খেয়ে নে, এমন আর পাবিনা।

ফেরবার সময় কিলো দুই নিয়ে যাব।

দাম মিটিয়ে আবার বর্ধমানের দিকে রওনা হওয়া গেল।

বর্ধমান শহর।

শহরে ঢুকেই একটা দোকানের সামনে নীল গাড়িটা পার্ক করা আছে, কিন্তু তাতে কোনো লোক নেই। হর্ষ বললেন, দেখলি, ব্যাটারা ঘাপটি মেরে কোথাও থেকে আমাদের দিকে নজর রেখেছে।

থেমে খোঁজ করবে মামা?

আদৌ না। আমরা টের পেয়েছি সেটা জানাবার দরকার কী? শত্রু অসতর্ক হলেই আমাদের সুবিধে।

কিন্তু এরা কারা? কী চায়?

হর্ষ বললেন, তোর পকেট থেকে যারা চিঠিটা বের করে নিয়েছিল এরা সেই লোক। কোনোভাবে এরা ইন্দুদার মণিমুক্তোর কথা জানতে পেরেছে, সেগুলো হস্তগত করতে চায়। কিন্তু চিঠি চুরি করে লাভ হয়নি, ইন্দুদার তৈরি ধাঁধা ভাঙবার ক্ষমতা এদের নেই। তাই আমাদের ওপর নজর রেখেছে। এরা জানে সংকেতলিপির মানে বুঝতে পারলে আমরা মণিমুক্তোর খোঁজ শুরু করব, আর আমাদের ওপর নজর রাখলে বিনা পরিশ্রমে সহজেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

এ তো চিন্তার কথা হল।

তা একটু হল ঠিকই। তবে সে কথা ভেবে এখন লাভ নেই। বোধহয় এই বাড়িটাই—আয়, জিজ্ঞাসা করে দেখি।

একটু পুরনো ধরনের দোতলা বাড়ি, হালকা ছাই রঙে চুনকাম করা। হর্ষ দরজার কড়া নাড়লেন।

দোতলা থেকে মহিলাকণ্ঠে সাড়া এল—কে?

হর্ষ বললেন, আমরা কোলকাতা থেকে আসছি, একটু প্রয়োজন ছিল।

দাঁড়ান, আসছি

কিন্তু দরজা খোলবার আগেই প্রকাশ চেঁচিয়ে উঠল—মামা!

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে হর্ষ দেখলেন নীল গাড়িটা বেশ জোরে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দেখলে?

হুঁ। ব্যাটারা পেছন পেছন এসে কোথায় ঢুকছি দেখে গেল। কাউকে দেখতে পেয়েছিলি?

প্রকাশ চিন্তিতমুখে বলল, গাড়ি চালাচ্ছে জোয়ানমত একটা লোক, গোল মুখ। সাদা জামা গায়ে। পাশের লোকটাকে দেখতে পাইনি।

যে গাড়ি চালাচ্ছিল তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবি?

পারব।

কথাবার্তা আর এগুনোর আগে দরজা খুলে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। মধ্যবয়স্কা, লম্বা গড়নের চেহারা। আটপৌরে শাড়ি পরনে।

কোথা থেকে আসছেন?

হর্ষ একটু কেশে বললেন, আমরা কোলকাতা থেকে আসছি। বাড়ির কর্তার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

ভদ্রমহিলার চোখে সন্দেহের ছায়া খেলে গেল দেখে হর্ষ তাড়াতাড়ি বললেন, ওঁর এক বন্ধু একটা কাজে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। যে কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন সেটা ভুল করে ফেলে এসেছি। কেবল বাড়ির নম্বর মনে আছে—

মৃদুস্বরে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট গলায় ভদ্রমহিলা বললেন, কর্তার নাম জানেন না, পরিচয়ও নেই মনে হচ্ছে—এতদূর চলে এলেন?

শুধু এই কাজে না তো, আমরা যাচ্ছি ধানবাদে। যাবার পথে একটু খবর নিয়ে যাচ্ছি আর কী। ধানবাদে আমরা দাদা থাকেন, তাঁর কাছেই যাবো।

ভদ্রমহিলার মুখ থেকে কিছুটা ছায়া কেটে গেল।

ধানবাদে আপনার দাদা—কত বয়েস বলুন তো? উনিই কী সেদিন রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে ছিলেন? তাঁর কাছে যাচ্ছেন?

খণ্ড মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করে হর্ষ হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, আপনি দাদাকে চেনেন দেখছি। কী করে চিনলেন? কী নাম বলুন তো?

নাম? দাঁড়ান, নাম হচ্ছে—ইন্দুমাধব চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশের চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা বলে চলেছেন, সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ওঁর গাড়ি খারাপ হয়ে রাত্তিরটা আমাদের বাড়িতে ছিলেন। বেশ ভাল লোক—উনিই বুঝি—

হর্ষ চোখের পাতাটি না কাঁপিয়ে বুদ্ধদেবের মত মুখ করে মিথ্যে কথা বলতে পারেন।

হ্যাঁ, ইন্দুদা তো এখন ধানবাদে নেই। ওঁর বাড়ির থেকে কয়েকটা জিনিস আনতে যাচ্ছি। উনি বললেন, যাচ্ছিস যখন, বর্ধমানে ষোল নম্বর বাড়িতে একটু খোঁজ করে যা। আপনাদের খুব প্রশংসা করলেন।

লজ্জা পেয়ে কর্ত্রী বললেন, না না, সে কিছু না। কর্তা তো এখন বাড়ি নেই। ওঁর খুব মাছ ধরার নেশা কিনা, ছিপ নিয়ে চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছেন। ফিরবেন সন্ধেবেলা।

চৌধুরীদের পুকুর কোথায়? কাছেই?

হ্যাঁ, চৌধুরীদের বাগানবাড়ি বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

হর্ষ বললেন, ভাল কথা। আমরা তাহলে একবার দেখা করে আসি। কী যেন নাম কর্তামশাইয়ের?

গিন্নি আধুনিকা নন। অর্ধেক মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, বিনয়কৃষ্ণ সেন।

হ্যাঁ, বিনয়বাবুই তো বটে, এখন মনে পড়েছে। দিদি, আমার গাড়িটা এখানে রইল, একটু হেঁটে বেড়িয়ে আসি।

অলিগলি দিয়ে মিনিট পনেরো হেঁটে চৌধুরীদের পাঁচিল ঘেরা বাগানবাড়িতে পৌঁছানো গেল। শ্যাওলাধরা পুরনো আমলের পাৎলা টালির মত ইঁট দিয়ে তৈরি পাঁচিল। বুড়ো বুড়ো ঝুপসি আম-কাঁঠাল গাছভর্তি বাগান। সেই বাগানেরই মাঝখানে দীঘিটা। সমস্ত পরিবেশে একটা প্রাচীন যুগের গন্ধ মাখানো। ছায়াচ্ছন্ন পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রকাশ বলল, মামা, এমন জায়গায় এলে আমার পুরনো দিনগুলোর জন্য খুব মন কেমন করে, জানো। আমার জন্মের আগে—তোমার জন্মের আগে, একশো-দেড়শো বছর আগের দিনগুলো—যখন এই বাগানবাড়ি নতুন তৈরি হয়েছে, এই গাছগুলো ছোট ছিল, সেসব দিনের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে। আমি মনে মনে ঐ যুগের লোক, এই কোলাহলে পূর্ণ নিজের যুগটা আমার একদম পছন্দ হয় না।

হর্ষ বললেন, আমারও। তবে যুগের সঙ্গে তাল না রেখে তো উপায় নেই। নইলে পিছিয়ে পড়তে হবে। পৃথিবীকে তুই যেমন দেখতে চেয়েছিলি, আর পৃথিবীটা আসলে যেমন—এই দুয়ের মধ্যের ফাঁকটা শিল্প দিয়ে ভরে তুলতে হয়। এই জন্যই শিল্পের মর্যাদা। প্রকৃত শিল্প হচ্ছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সন্ধান। বাস্তবে কোথাও তার অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে।

প্রকাশের খুব জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল পান্তুয়া তৈরিও একটা প্রকৃত শিল্প কিনা, কিন্তু তার আগেই ওরা পুকুরপাড়ে পৌঁছে গেল।

গাছপালার ছায়ায় চারদিক অন্ধকার। এমনিতেই মেঘলা দিন। এরই মধ্যে একটা বড় আমগাছের তলায় বসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বই পড়ায় মগ্ন। দুটো ছিপ পাশাপাশি পুকুরে ফেলা রয়েছে। কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। পাশে একটা ছোট টিফিন ক্যারিয়ার, একটা জালের ব্যাগ।

হর্ষ ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বললেন, বিনয়দা, ডানদিকের ছিপে মাছ খাচ্ছে।

বিনয়কৃষ্ণের রিফ্লেক্স খুব মজার। তিনি চমকে উঠেই কথাটা কে বলেছে না দেখে আগে ছিপ শক্ত করে ধরে হ্যাঁচকা টানে আড়াইশো গ্রামটাক ওজনের একটা চারাপোনা তুলে ফেললেন।

হর্ষ বললেন, মৃগেল মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, মৃগেল।

তারপর বিনয়কৃষ্ণ পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে আগন্তুক দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা?

একটু বসব আপনার পাশে? মিনিট পনেরো কথা বলতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন না। দাঁড়ান, একটু বসবার ব্যবস্থা করে দি।

বিনয়কৃষ্ণ গোটাকতক আসশেওড়ার ডাল ভেঙে ভেজা মাটির ওপর পেতে দিলেন।

এবার বসুন। কী ব্যাপার বলুন তো।

আমি আসছি কোলকাতা থেকে, আমার নাম হর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ হচ্ছে প্রকাশ, আমার ভাগ্নে। আচ্ছা, ইন্দুমাধব চট্টোপাধ্যায় নামে কাউকে কী আপনি চেনেন?

বিনয়কৃষ্ণ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, ইন্দুমাধব? না, এমন নামের কোনো—ইন্দুমাধব—

কয়েকদিন আগে বৃষ্টির দিনে যিনি আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।'

বিনয়কৃষ্ণের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, হ্যাঁ, চিনি বৈকি। আসলে ওঁকে এত ভাল লেগেছিল যে, ওঁর ব্যক্তিত্বটাই শুধু মনে আছে। নামটা মনে পড়ছিল না। কী হয়েছে ওঁর? ভাল আছেন তো?

উনি ভাল আছেন। আমরা একটা সমস্যায় পড়ে এসেছি। নে, প্রকাশ, এবার বল—কাজটা তোরই করার কথা।

আধঘণ্টা ধরে প্রকাশ সমস্ত ঘটনা খুলে বলল বিনয়কৃষ্ণকে। মণিমুক্তো, চিঠির ধাঁধা ও তার পাঠোদ্ধার, রেস্তোরাঁর সামনে ভিড় জমিয়ে পকেট থেকে চিঠি চুরি—সব। শুনতে শুনতে বিনয়কৃষ্ণ সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চোখে প্রকৃত আগ্রহ এবং উৎসাহ ফুটে উঠল। প্রকাশ বক্তব্য শেষ করতে তিনি বললেন, ওঃ, এ যে একেবারে সত্যিকারের রোমাঞ্চ কাহিনী! জানেন, সারাজীবন কেরানিগিরি করে কাটিয়েছি। সাধারণ বি. এ পাশ, বাবাও অকালে মারা গেলেন, মা বেঁচে, ঘাড়ে তিন অবিবাহিতা বোন এবং কিছু দেনা। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে যা হয়, চাকরীতে ঢুকতে হল। দেনা শোধ করলাম, বোনেদের বিয়ে দিলাম। বুড়ি মায়ের অনুরোধে নিজেও সংসার পেতে বসলাম। সবই হল, বুঝলেন—কিন্তু ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছিলাম তা চিরদিনের জন্য মিলিয়ে গেল। ইস্কুলে পড়বার সময় একবার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের তিব্বত ভ্রমণের গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ওইরকম দুঃসাহসী ভ্রমণকারী হব। শার্লক হোমস আর ফাদার ব্রাউনের গল্প পড়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা হতে চেয়েছিলাম। আর এই শেষ বয়সে এসে দেখছি, রিটায়ার্ড কেরানি হয়েছি।

একটু দম নিয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, তাই সেদিন ইন্দুবাবুর মুখে তাঁর জীবনের গল্প শুনে ভারি হিংসে হচ্ছিল, ঠিক যেন আমার স্বপ্নের জীবনটা। আর এখন প্রকাশবাবুর কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই তাহলে একটা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

প্রকাশ বলল, আমাকে 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলুন।

বেশ, তাই হবে। তুমি বয়সে আমার সন্তানতুল্য। কিন্তু দোহাই তোমাদের—এ ব্যাপারটা থেকে আমাকে বাদ দিও না। ভাগ্যক্রমে যখন জড়িয়ে পড়েছি তখন শেষ অবধি একসঙ্গে থাকতে চাই।

হর্ষ মানুষ চেনেন। বিনয়কৃষ্ণর উৎসাহদীপ্ত মুখ দেখে ভেতরের সবল তাজা মানুষটাকে হর্ষ এক মুহূর্তে চিনতে পারলেন। তিনি আন্তরিক গলায় বললেন, বেশ তো। বাদ দেব কেন? দরকার হলে আপনি আমাদের সঙ্গে কোলকাতায় চলুন না।

বিনয়কৃষ্ণ এত খুশি হলেন যে সঙ্গে সঙ্গে ছিপটিপ গুটিয়ে নিয়ে বললেন, চলুন, বাড়ি যাই। জানি না ভাল দেখাচ্ছে কিনা, কিন্তু যখন নেমন্তন্ন করলেন, তখন রিফিউজ করবো না। আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। এখন আমার বাড়িতে দুটো খাবেন চলুন।

হর্ষ বললেন, না না, থাক। আবার আমাদের জন্য আপনার স্ত্রী অসুবিধায় পড়বেন।

বেলাও তো হল—আমরা বরং হোটেলে—

বাঃ হোটেলে খেতে যাবেন কেন? অসুবিধে কিছু হবে না, এই তো চার-পাঁচখানা রুই আর মৃগেলের ছানা ধরেছি। ফ্রেশ মাছ। মুগের ডাল আর মাছ ভাজা, কেমন?

হর্ষর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি বললেন, সোনামুগ না ঘোড়ামুগ?

সোনামুগ মশাই, সোনামুগ। গ্রামের দিকে আমার সামান্য কিছু চাষের জমি আছে। ভাগে দিয়ে কিছু চাল আর ডাল পাই। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, কোলকাতায় এমন ডাল পাবেন না।

হর্ষ খুশি হয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন। ছোটবেলায় রান্নাঘর থেকে সোনামুগ ভাজার গন্ধ ভেসে আসত, আঃ! আজকাল বিয়েবাড়িতে পর্যন্ত এত বড় বড় দানার মঠের ডাল দিয়ে চালিয়ে দেয়। চলুন, খাব আপনার বাড়িতে।

বাগান থেকে বেরুবার পথে হাঁটতে হাঁটতে হর্ষ বললেন, বিনয়দা, ধাঁধার শেষ লাইনটা খেয়াল করেছেন তো? উপহারের বিষয়ে কী কথা হতে পারে? ইন্দুদা কী আপনাকে কোনো উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন?

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ, তা তো দিয়েছেনই। আমি ভেবেছিলাম সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন বোধহয়। উনি আমাকে একখানা ইংরেজি বই প্রেজেন্ট করেছেন।

তাই নাকি? কী বই?

মর্টিমার হুইলারের জীবনী। ভাল বই। অর্ধেক পড়ে ফেলেছি।

একটু দেখবেন বইটা?

অবশ্য। চলুন বাড়ি যাই।

বাড়ি ফিরে বইটা নেড়েচেড়ে দেখে হর্ষ কিছু বুঝতে পারলেন না। প্রকাশের হাতে দিয়ে বললেন, দেখ তুই।

সাধারণ বাঁধানো ইংরেজি বই। ওপরেব জ্যাকেটে মর্টিমার হুইলারের প্রৌঢ় বয়েসের হাসিমুখের ছবি। মোটা অ্যান্টিক কাগজে ছাপা শ'চারেক পাতার বই। দাম দশ পাউন্ড পঁচানব্বই পেন্স। আর কিছু আবিষ্কার করা গেল না।

হর্ষ বললেন, লেখিকা জাকেত্তা হকস্ নাট্যকার জে. বি. প্রিস্টলির স্ত্রী, হুইলারের বান্ধবী ছিলেন।

বিনয়কৃষ্ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে বসেছিলেন, এবার বললেন, কিছু বোঝা গেল?

হর্ষ বললেন, নাঃ। প্রকাশ, কিছু বুঝলি?

না মামা।

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, তাহলে এত কাণ্ডের মানে কী?

প্রকাশ বলল, মামা, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। এটা পুরো ধাঁধার একটা অংশ মাত্র। ইন্দুকাকা নিশ্চয় আবার যোগাযোগ করবেন, তখন পুরো ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তবে বইটা আসল জিনিস সন্দেহ নেই।

হর্ষ বললেন, বিনয়দা, আপনি তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, এই বইটাও সঙ্গে নিয়ে নিন। ওটার দরকার হতে পারে।

খাওয়াদাওয়া সেরে বেরুতে বেরুতে বিকেল গড়িয়ে গেল। বিনয়কৃষ্ণ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় শেল্‌ফ থেকে হুইলারের জীবনীখানা ঝোলায় পুরে নিলেন।

মেঘে ঢাকা দিন, রোদ্দুর নেই।

শহর ছাড়াতেই বোঝা গেল বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কোলকাতা পৌঁছতে খুব রাত্তির না হোক, সন্ধে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু হর্ষ শক্তিগড়ের নোড়া পান্তুয়া কিনে নেবার কথা ভোলেন নি। একই খদ্দের একদিনে দুবার সচরাচর আসে না, দোকানের মালিক খুব খুশি। পান্তুয়ার হাঁড়ি প্যাক করা হচ্ছে, হর্ষ বললেন, কী বিনয়দা, চলবে? দু-একটা হয়ে যাক—

বিনয়কৃষ্ণ মানুষটা বেশ সরলসোজা, অকারণ লজ্জার ধার ধারেন না, বললেন, আমি রাজি আছি। বর্ধমানের লোক বলে ভাববেন না রোজ শক্তিগড়ের পান্তুয়া খাই।

শক্তিগড় ছাড়িয়ে দশ-পনেরো কিলোমিটার যেতে ছায়া আরো গাঢ় হয়ে এল। হর্ষ হেডলাইট জ্বালবার জন্য সুইচে হাত রেখেছেন, ঠিক তক্ষুনি দ্রুত ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

রাস্তার ঐ অংশটা একেবারে নির্জন বাড়িঘর লোকালয় কিচ্ছু নেই। একটা ছোট্ট বাঁক ফিরেই হর্ষ বিস্ময়সূচক শব্দ করে গাড়ির গতি কমিয়ে আনলেন।

সামনে কুড়ি-পঁচিশ গজের মধ্যে একটু তির্যকভাবে প্রায় সমস্ত রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে নীল প্রিমিয়ার।

বাধ্য হয়ে হর্ষকে গাড়ি থামাতে হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল দুজন ষণ্ডামার্কা লোক। হর্ষর পাশে একজন দাঁড়াল, আর একজন ওদিকের জানালায় প্রকাশের পাশে। প্রকাশ দেখল দুজনেরই হাতে রিভলবার রয়েছে। প্রকাশের দিকে যে দাঁড়িয়েছিল, সে চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, বইটা, শিগগির।

ঝট করে দরজা খুলে ধাক্কা দিলে লোকটাকে ছিটকে ফেলা যেতে পারে। প্রকাশ ভেতর থেকে দরজা খোলার হাতলে আস্তে হাত রাখল। তার মুখ নির্বিকার।

হর্ষ শান্ত গলায় বললেন, ঠিক আছে প্রকাশ, টেক ইট ইজি। বিনয়দা, বইটা দিয়ে দিন।

বিনয়কৃষ্ণ স্নায়ুর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন দেখে প্রকাশের ভাল লাগল। ভদ্রলোক সারা জীবন নিরীহ কাজ করেছেন—বোমা, বন্দুক বা ছিনতাই-এর সঙ্গে নিশ্চয় কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু নাকের ডগায় রিভলবারের নল দেখেও তিনি দু'বার চোখ পিটপিট করলেন মাত্র। তারপর হর্ষ বাঁড়ুজ্যের কথা শুনে ঝোলার মধ্যে থেকে বইটা বের করে বাড়িয়ে ধরলেন। প্রকাশের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা বিনয়কৃষ্ণের হাত থেকে বই নিল—রিভলবার না নামিয়ে এবং চোখ না সরিয়ে। অপর লোকটি নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল। হঠাৎ হুশ্-স্-স্ আওয়াজে চমকে উঠে প্রকাশ হর্ষর দিকে তাকাতে হর্ষ ম্লান হেসে বললেন, দে আর গিভিং মি এ ফ্ল্যাট টায়ার।

এপাশের লোকটা কর্কশ গলায় বলল, শাট-আপ, নো টকিং।

চাকায় হাওয়া শেষ। লোক দুটো দৌড়ে নিজেদের গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করা হয়নি সম্ভবত। ওরা দরজা বন্ধ করার আগেই গাড়ি দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে এল।

লিখতে অনেকক্ষণ লাগলেও সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে।

একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে হর্ষ গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, ব্যাটারা শিক্ষিত গুণ্ডা! আবার ইংরিজি বলে! যারে প্রকাশ, বুট থেকে স্টেপনি বের করে গড়িয়ে নিয়ে আয়। খাটিয়ে ছাড়ল।

জ্যাকে গাড়ি তুলে চাকা ঘুরিয়ে দেখা গেল কোথাও কাটা দাগ নেই। হর্ষ বললেন, বুঝলি ব্যাপার? টায়ার কাটেনি, চাবি-টাবি কিছু দিয়ে ভালভে চাপ দিয়ে বাতাস বের করে দিয়েছে।

হুইল রেঞ্জ দিয়ে হর্ষ চাকার নাট খুলছেন, প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, এরা কারা মামা?

হর্ষ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, গুণ্ডা।

মিনিট দশেক বাদে চাকা বদলে হর্ষ আবার স্টিয়ারিং-এ এসে বসলেন। বললেন, লোকগুলোর সাহস খুব। যত অল্প সময়েই কাজ সারুক, অন্য গাড়ি এসে পড়তে পারতো। যেমন আমাদের চাকা বদলাবার সময় কত গাড়ি গেল দেখলি তো? খুব রিস্ক নিয়েছে যাহোক।

পেছনের সিট থেকে বিনয়কৃষ্ণ অস্ফুটস্বরে বললেন, আশ্চর্য! খুব আশ্চর্য!

হর্ষ পেছনে তাকিয়ে বললেন, কোনটা আশ্চর্য বিনয়দা?

এখন না। আর একটু ভাবি। পরে বলব।

হর্ষ গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

আবার ধাঁধা

পরের দিন সন্ধেবেলা প্রকাশ হর্ষ বাঁড়ুজ্যের ড্রইংরুমে বসে চা খাচ্ছিল। হর্ষ চা শেষ করে সোফায় হেলান দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বিনয়কৃষ্ণ দুপুরে বেরিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং থেকে একগাদা থ্রিলার আর ভূতের গল্পের বই কিনে এনেছেন। সেগুলো সেন্টার টেবিলে থাক দিয়ে সাজানো রয়েছে। বর্তমানে তিনি একটা মোটা বইয়ে নাক ডুবিয়ে বসে।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে প্রকাশ বলল, অত মনোযোগ দিয়ে কী পড়ছেন? ওটা কী বই?

বই থেকে মুখ তুলে বিনয়কৃষ্ণ যেন প্রথমটা বুঝতেই পারলেন না কোথায় আছেন, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, এটা? এটা সুপারন্যাচারাল গল্পের একটা অম্‌নিবাস। ই. এফ. বেনসন-এর 'কাস্টিং দি রুনস্‌' পড়ছি, বুঝলে? আহা, কী দুর্দান্ত গল্প। সাহেবরা লেখে ভাল। এ গল্পটা থেকে অন্তত তিনজন বাঙালী লেখক প্লট মেরেছে—আমি নিজে পড়েছি। দাঁড়াও, একটু পড়ে নিই—

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থেকেই হর্ষ বললেন, এই লোকগুলো কোনো উপায়ে ইন্দুদার মণিমুক্তোর সন্ধান জেনেছে। এরা ইন্দুদার পূর্বের কর্মসূত্রে পরিচিত কেউ হতে পারে। কিন্তু সবটা ধাঁধা এরা ভাঙতে পারছে না—ফলে আমাদের ওপর চড়াও হয়ে বুদ্ধির ঘাটতিটা পুষিয়ে নিচ্ছে।

প্রকাশ হেসে বলল, তাতে আমাদের আর এমন অসুবিধে কী হবে? ও বইয়ের কপি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে আছে নিশ্চয়। বইটা দিয়ে কী করতে হবে সেটাই আসল কথা।

হর্ষ বললেন, যুদ্ধের সময় গোপন তথ্য আদানপ্রদান করবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়। ব্যবস্থাটা খুব নিরাপদও বটে। কোনো বইয়ের মধ্যে গোপন কথাটা লুকোনো আছে জেনেও লাভ নেই—যতক্ষণ পর্যন্ত না শব্দের সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই বইটা শত্রুর হাতে পড়েছে বটে, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। তারা ওটা কোনোভাবেই কাজে লাগাতে পারবে না।

তা না হয় হল। কিন্তু আমরাই বা কী করব?

আমরা অপেক্ষা করব। এখানেই ইন্দুদার পাঠানো সঙ্কেত সূত্র শেষ হয়ে যেতে পারে না। আবার চিঠি আসবে। যতদিন না আসে আড্ডা দিয়ে আর ভালমন্দ খেয়ে কাটানো যেতে পারে।

আবার বই থেকে মুখ তুলে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, আপনি মশাই অদ্ভুত লোক। ব্যাটাছেলে এত রান্না জানে তা কখনো দেখিনি, মেয়েরা এ ব্যাপারে লজ্জা পাবে আপনার কাছে। এদিকে নিজে তো খান এতটুকু—

হর্ষ খুশিমনে হাসলেন। ঠিক বলেছেন। হরেকরকম রান্না ভালবাসি বটে, কিন্তু বেশি খেতে পারিনা। আমি হলাম ভোজনরসিক, ভোজনপটু নই।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। বিনয়কৃষ্ণ পড়ে চলেছেন, প্রকাশ কী একটা বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে, হর্ষ চিৎপাত হয়ে সোফায় পড়ে।

পত্রিকা রেখে প্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখন আসি মামা, ওবেলা একবার আসব বরং—

আসিস। কোকোসন্দেশ হবে, খেয়ে যাস।

পথে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বাসের জন্য দাঁড়ালো প্রকাশ। তাদের বাড়িব দিকে যাওয়ার বাস আর আসে না। বাসস্টপের উল্টোদিকের দোকানগুলোব সাইনবোর্ড মুখস্থ হয়ে গেল, সামনের রাস্তা দিয়ে সাড়ে চারশো লরী টেম্পো আর প্রাইভেট গাড়ি চলে গেল। কিন্তু বাসও আসে না, ট্যাক্সিরও পাত্তা নেই। মাঝে মাঝে এমনি হয়। আবার একসঙ্গে হয়তো তিনটে বাস এসে হাজির হবে।

দূর—এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয়! প্রকাশ ঠিক করল, সে হেঁটেই বাড়ি চলে যাবে। আজ না হয় রেলগাড়ি, বাস, ট্যাক্সি এসব হয়েছে। একশো বছর আগেও লোকে বিশ-পঞ্চাশ মাইল অকাতরে হেঁটে যেত। যন্ত্রের ওপর নির্ভরতা না বাড়ানো ভালই। এইসব গুরুতর বিষয় চিন্তা করতে করতে প্রকাশ অনেকখানি পথ চলে এল।

সামনে একটা পানের দোকান। প্রকাশের পানের কোনো নেশা নেই। তবে মাঝে মধ্যে ছুটির দিন ভাত খাবার পর সখ করে একটা-আধটা খায়। সে দাঁড়িয়ে পড়ে দোকানীকে বলল, ভাই মিঠাপাতা দিয়ে একটা পান বানিয়ে কাগজে মুড়ে দাও তো। গুঁড়ো খয়ের ভাজা সুপুরি, ছোট এলাচ, চমন বাহার দেবে।

পানওয়ালা পান বানাচ্ছে, প্রকাশের চোখ পড়ল দোকানের বিরাট আয়নাটায়। পেছনের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুপুরবেলা, রোদও বেশ উঠেছে আজ, পথে বিশেষ লোক চলাচল নেই। কেবল ছাই রঙের শার্ট আর ঘিয়ে রঙের প্যান্ট পরা একটা লোককে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ কী মনে হতে প্রকাশ আয়নার মধ্যে দিয়ে ভাল করে লোকটার দিকে তাকাল। একে কী সে কোথাও—কেন যেন—

হ্যাঁ, তাই তো। হর্ষর বাড়ির সামনে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একে সে দেখেছে, এই ছাই রঙের জামা আর ঘিয়ে রঙের প্যান্ট। ডানগালে একটা বড় আঁচিল আছে, সেজন্যই বিশেষ করে মনে পড়লো। উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে সিগারেট টানছিল।

কোনো সন্দেহ নেই যে, লোকটা তাকে অনুসরণ করছে।

এদেরই দলের কেউ তাকে বেনামী চিঠি লিখে ভয় দেখিয়েছিল। এরাই গতকাল জি. টি. রোডে বিনয়বাবুর কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়েছিল। এরা কারা? কী চায়?

অথবা হয়তো সে-ই ভুল করছে। ছাইরঙা জামা গায়ে লোকটা হয়তো নিতান্ত নিরীহ পথিক, তার পেছন পেছন আসছে সেটা কাকতালীয় হতে পারে। প্রকাশ একটু পরীক্ষা করে দেখবে ঠিক করল। এখন বেলা দুপুর। রাস্তায় বহু লোকজন, ভয় কী?

পানের মোড়ক পকেটে পুরে প্রকাশ সহজভাবে আবার হাঁটতে শুরু করল। দোকান ছেড়ে আসবার সময় সে আর একবার আয়নায় তাকিয়ে দেখছিল, লোকটা সামান্য পেছনে একটা ঘড়ির দোকানের শো-কেসে সাজানো ঘড়ি দেখছে মনোযোগ দিয়ে। আপাতত তার সেখান থেকে নড়বার কোনো কারণ নেই। এবারও সে পেছন পেছন এলে বুঝতে হবে তার কোনো বদমতলব আছে।

মিনিট তিনেক সোজা হেঁটে হঠাৎ প্রকাশ থেমে গিয়ে আবার উল্টো হেঁটে আসতে লাগল।

হ্যাঁ, লোকটা আঠার মত লেগে আছে পেছনে।

প্রকাশ আচমকা তার দিকে হেঁটে আসতে শুরু করায় লোকটা স্পষ্টত হকচকিয়ে গেল। কী করবে ঠিক করতে না পেরে রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল।

প্রকাশ সরাসরি লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, নাম কী আপনার?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে লোকটা বলল, অ্যাঁ, আমাকে বলছেন?

আপনাকেই। কী নাম?

দিলীপ বসু।

গত আধ ঘণ্টা ধরে রাস্তায় ঘুরঘুর করছেন কেন?

লোকটা বস্তুত চমকে গেছে। বলল, অ্যাঁ? এ কী বলছেন এসব?

ন্যাকামি করবেন না। কথার জবাব দিন।

আমি কোলকাতার বাইরে থাকি, মধ্যপ্রদেশে। তাই শহর দেখে বেড়াচ্ছি। কেন, কী হয়েছে?

কোলকাতায় কোথায় উঠেছেন?

আমি? ইয়ে—শেয়ালদার কাছে একটা বোর্ডিং হাউসে।

প্রকাশ চোখ পাকিয়ে বলল, আবার মিথ্যে কথা।

লোকটা চোখ পিটপিট করে বলল, না, না, সত্যি।

গালের আঁচিলটা সত্যি না মিথ্যে?

দিলীপ বসু গালের দিকে হাত তুলতে গিয়েই নামিয়ে নিল। সত্যি। আসল আঁচিল। তারপর কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, আমাকে নিয়ে এরকম করছেন কেন?

প্রকাশ আর বেশীদূর এগুলো না। বলা যায় না, লোকটা যদি সত্যিই দিলীপ বসু হয় আর নিরপরাধ হয়, তাহলে বাড়াবাড়ি করলে সে বিপদে পড়ে যেতে পারে।

কটমট করে দিলীপ বসুর দিকে একবার তাকিয়ে প্রকাশ হাঁটতে আরম্ভ করল। মোড়ের মাথায় এসে বাঁক ফেরবার সময় একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল লোকটা তখনো তার দিকে বোকা বোকা মুখ করে তাকিয়ে আছে। অবশ্য তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। সরল চেহারার অধিকারীর কুচক্রী হতে আটকায় না—এরকম সে বহুবার দেখেছে। কিন্তু

তার কিছুই করার নেই। কেবলমাত্র সন্দেহজনক হাবভাব বলেই সে পুলিশ ডেকে লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে বলতে পারে না। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো অপরাধ নয়, আর পথে হাঁটতে গেলে কারো না কারো পেছনে তো থাকতেই হবে। মরুক গে যাক।

প্রকাশ সাধারণত দিনে ঘুমোয় না। কিন্তু রোদ্দুরে হেঁটে এসে ক্লান্ত লাগার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, আজ খেয়েদেয়ে পান মুখে দিতেই তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

ঘুম ভাঙতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল। দিনের আলো আর নেই বললেই চলে। আজ সন্ধ্যেবেলা অন্য কিছু করবার নেই, বরং হর্ষ তাঁর কাছে যেতে বলেছিলেন, সেখানেই যাওয়া যেতে পারে। কোকোসন্দেশ খাওয়ার জন্য না হলেও আড্ডা দেবার জন্য বটে।

দুপুরের কাণ্ড শুনে বিনয়কৃষ্ণ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

বলেন কী মশাই। আপনি তক্ষুনি কাছের কোনো দোকান থেকে আমাদের টেলিফোন করলেন না কেন? আঃ, দারুণ বুদ্ধি বার করেছিলেন তো? যেতে যেতে আচমকা উল্টোদিকে হেঁটে আসা, অ্যাঁ? বাঃ, বাঃ—হ্যাড্‌লী চেজের 'মিশন টু ভিয়েনা'র নায়ক দুঃসাহসী ডন্ মিক্‌লেমও ঠিক এমনি করেছিল। অবশ্য তাকে ফলো করছিল একজন প্রফেশনাল গুণ্ডা—থ্রিলারের ভাষায় যাদের বলে ট্রিগার-হ্যাপি গান্‌ম্যান। আর এই লোকটা—কী নাম যেন বললেন? দিলীপ বসু? একে খুব একটা পাকা লোক বলে মনে হচ্ছে না—নভিস্। নইলে এমন করে ধরা পড়ত না—

কথা বলতে বলতে বিনয়কৃষ্ণ থেমে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে কী ভাবতে লাগলেন।

হর্ষ লক্ষ্য করে বললেন, কী ভাবছেন বিনয়দা? কী হল?

বিনয়কৃষ্ণ যেন আপনমনেই বললেন, আবার একটা! নাঃ, ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলল।

প্রকাশ বলল, কী হয়েছে খোল্‌সা করে বলুনই না।

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ, এটা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। গতকাল সন্ধেবেলা যে গুণ্ডারা আমার বইটা কেড়ে নিল, সে বিষয়ে কেউ কোনো আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেন নি?

প্রকাশ মাথা নাড়ল। কিন্তু হর্ষ শান্ত গলায় বললেন, আমি করেছি।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে হর্ষর দিকে তাকিয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, আপনার নজরে পড়েছে? জানতাম এটা আপনার মাথায় খেলবে। কী বলুন তো?

বইটা।

রাইট্! বইটা। গুণ্ডাগুলো বইয়ের কথা জানলো কী করে? আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে অবধি আপনিই তো জানতেন না কিসের খোঁজে বর্ধমান যাচ্ছেন—বা ইন্দুমাধববাবু আমাকে কী উপহার দিয়েছিলেন। তাহলে?

হর্ষ বললেন, আর কিছু?

হ্যাঁ, আরও আছে। গুণ্ডারা আপনার গাড়ি টায়ার কাটেনি কেন?

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল, তাতে কী?

তাতে এই, চাবি দিয়ে ভাল্‌ভ টিপে হাওয়া বের করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। গুণ্ডাদের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। যে কোনো সময় অন্য গাড়ি এসে পড়তে পারে,

ধরা পড়ার আশঙ্কা। তার চেয়ে ঝট্ করে ছুরি দিয়ে একটানে টায়ার কেটে দেওয়া অনেক সোজা, এবং তাতে সময়ও বাঁচে। গুণ্ডারা এরকম রিস্ক নিল কেন?

হর্ষ অস্ফুট স্বরে বললে, ভেরি গুড্ অবজারভেশন।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, আর এখন কী হল?

বিনয়কৃষ্ণ সোজা তীক্ষ্ণ চোখ তুলে প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে যে লোকটা দুপুরে ফলো করছিল যেন বড্ড বেশি নভিস্। নিজেকে প্রকট করে তোলার জন্যই যেন তার চলাফেরা। যারা লক্ষ টাকা দামের মণিমুক্তো কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়, তাদের পক্ষে আর একটু প্রফেশনাল হওয়া স্বাভাবিক। সব ঘটনাগুলো যেন কেমন মিলছে না।

হর্ষ বললেন, কিন্তু বিনয়দা, গুণ্ডার দলেও দু-একটা বোকাসোকা লোক কী থাকতে পারে না?

তা পারে। সেক্ষেত্রে তেমন লোককে তারা গুরুতর কাজে পাঠাবে না। এক চড় মারলে যে চোদ্দপুরুষের নাম গড়গড় করে মুখস্থ বলতে থাকবে তেমন লোককে কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করতে দেয়?

ঠিক। তাহলে?

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, বুঝতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটায় কী একটা গোলমাল আছে।

প্রকাশ বলল, অবশ্য দিলীপ বসু প্রকৃতই দিলীপ বসু হলে আর কোনো প্রব্লেম থাকে না।

তা থাকে না। কিন্তু এটাও মন মানতে চাইছে না। কারণ কাকতালীয় ঘটনা খুব বেশি ঘটলে তখন আর তার কাকতালীয়ত্ব থাকে না, সেটাই স্বাভাবিক ঘটনাক্রম ধরে নিতে হয়। আর তাছাড়া তেমন হলেও কেবল আজকের ঘটনাটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বাকি দুটোর কী হবে? তোমার কাছে কোনো যুক্তি আছে?

প্রকাশ চুপ করে রইল।

একটা ব্যাপার অবশ্য হতে পারে।

হর্ষ এবং প্রকাশ দুজনেই বিনয়কৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে দেখল, তাঁর চোখ চকচক করছে। প্রকাশ বলল; কী সেটা?

এখন বলব না। না খাটলে তোমরা হাসবে। সময় যাক, ব্যাপার-স্যাপার আর একটু দেখি, তারপর বলব।

কোকোসন্দেশ এল।

বই বন্ধ করে বিনয়কৃষ্ণ সন্দেশের থালার দিকে সরে এসে বললেন, নাঃ আগে সন্দেশ খেয়ে নিই। 'যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্যং' সেই শ্লোকটা জানেন তো? যারা নিশ্চিতকে ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পেছনে দৌড়োয়, তাদের নিশ্চিত-অনিশ্চিত দুটোই ফসকে যায়। আমি বাবা গডাঢরচন্দ্র, আমি টামাকও খাবো, ডুডুও খাবো—দেখি একটু এগিয়ে দিন তো।

প্রকাশ হেসে বলল, ই. এফ. বেনসন দারুণ জমছে, না?

ওফ। সেজন্যেই তো তুলে রেখে দিলাম, বাকিটা রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়বো।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানো?

কী?

বই জিনিসটা পড়লেই শেষ হয়ে যায়। ভাল বই ফুরিয়ে যাওয়ার মত কষ্ট আর নেই।

ভাল বলতে ঠিক কী বোঝায়?

সন্দেশ খেতে খেতে দু-সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, যে বই অন্তত দুবার পড়তে খারাপ লাগে না।

হেসে ফেলে হর্ষ বললেন, ভাল বলেছেন। বেশ দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

না মশাই, রসিকতা করে বলিনি। আজকাল বাজারে ভাল বই খুঁজে পাওয়া দায় হয়েছে। কারণ ভাল বই আর লেখা হয় না।

প্রকাশ বলল, বলেন কী! এত বই সারা পৃথিবীতে বেরুচ্ছে প্রতি বছর, তাদের মধ্যে কতগুলো আবার মাসের পর মাস বেস্টসেলার লি থাকছে, লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হচ্ছে। তবু একথা বলছেন?

একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গি কবে বিনয়কষ্ণ বললেন, অল বোগাস। আমি অমন বই দু-চারখানা পড়ে দেখেছি—রাবিশ। ছোটবেলায় শেখা সেই ইংরেজি ইডিয়ম মনে আছে? নাইন ডে'জ ওয়ান্ডার? এ হচ্ছে তাই।

দুবার পড়া যায় না?

একবাবই পড়া যায় না।

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, আসলে হয়েছে কী জানেন? আমি হয়তো ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কারণ আমি সাহিত্যেব ছাত্রও ছিলাম না, আর সময় কাটিয়েছি কিছু হাল্‌কা উপন্যাস পড়ে—কিন্তু আমার মনে হয় ভাল লেখার দিন বোধহয় ফুবিযে গিয়েছে।

হর্ষ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, এবার সোজা হয়ে বললেন, একথা কেন বলছেন বিনয়দা? তাঁর গলায় আগ্রহের আভাস।

বলছি কারণ আছে। মানুষের জীবন একদম বদলে গিয়েছে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে। ইলেকট্রিক আলো, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, চাঁদে যাওয়ার রকেট, অ্যাটমবোমা—এসব একটা জীবনেই দেখলাম। আমরা ছোটবেলায় লণ্ঠনের আলোয় পড়াশুনো করেছি, রিঠের জল দিযে ধুতি কেচে পরে ইস্কুল গিয়েছি, ন্যাকড়ার বল দিয়ে ফুটবল খেলেছি, শ্রদ্ধা করবার জিনিসকে শ্রদ্ধা করেছি, ভূতের গল্প শুনে ভয় পেয়েছি, সরস্বতী পুজোর ভোর রাত্তিরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফুল চুরি করতে বেরিয়েছি—আরও কত কী, কত কী—সে জীবনে আনন্দ ছিল, সারল্য ছিল, এমন কী—হয়তো বড্ড বেশি কথা বলছি—মহত্ত্বও ছিল। আর এখন? সমস্ত বদলে গিয়েছে। বাচ্চারা টাই পরে বুট পরে ইংরিজি ইস্কুলে পড়তে যায়, কথাসরিৎসাগর-এর গল্প পড়েনি, কিন্তু 'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস্' মুখস্থ বলতে পারে। কেউ কারোকে কিছুর ভাগ দেয় না, কেউ কারোকে ভালবাসে না—শুধুই আরও টাকা উপার্জনের জন্য, আরও ওপরে ওঠার জন্য দৌড়ে চলেছে। কোথায় গেল সেই মোমের আলো, সেই মানুষে মানুষে ভালবাসাবাসির নরম দিন। ভেবে দেখুন হর্ষবাবু, মানুষের যা কিছু শিল্পসংস্কৃতি সবই সেই যুগে সৃষ্টি। এই ভয়ানক তাড়াহুড়ো আর জগৎজোড়া অবিশ্বাসের মধ্যে কী আর সাহিত্য হয়? মাঝে মাঝে ভাবি—

শান্ত স্বভাব বিনয়কৃষ্ণ ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা বলে ফেলে বোধহয় নিজেই অবাক হয়ে থেমে গেলেন।

হর্ষ খুব আস্তে বললেন, বিনয়দা, আপনার নতুন রূপ দেখতে পেলাম। খুব সত্যি কথা

বলেছেন, ঠিক কথা বলেছেন। আপনি সাহিত্যের ছাত্র নন, তাতে কী? উপলব্ধি থেকে সত্যলাভ হয়। সেই সত্য আপনি অনুভব করেছেন।

লজ্জিতমুখে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, অমন করে বলবেন না। আমি খুব সাধারণ লোক। উপলব্ধি অনেক বড় কথা, সে আমার নেই। তবে এ কথা ঠিক, আমি মানুষকে ভালবাসি, হারিয়ে যাওয়া সহজ দিনগুলোকে খুব ভালোবাসি।

তারপর হর্ষর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অসহায় গলায় বললেন, আর ফিরবে না, জানেন? সেসব দিন আর ফিরবে না।

হর্ষ টেবিলের ওপরে একটা পেপারওয়েট দু-আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, খুব খারাপ লাগে ভাবতে, কিন্তু আপনি যা বলছেন তা সত্যি। যুগের গতিকে ফেরানো দুঃসাধ্য, এভাবেই সব চলবে—ক্রমেই আরও দ্রুত গতিতে আরও বড় ধ্বংসের দিকে। আমাদের হতে কিছু নেই—কোনো ক্ষমতা নেই। অনেক বড় মহাপুরুষ কেউ এলে হয়তো পারবেন, নইলে এই শেষ।

মাথার ওপরে পাখাব বেয়ারিংটা কট্‌কট্‌ আওয়াজ করছে।

হর্ষ নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন। ঘর স্তব্ধ।

বিনয়কৃষ্ণ আস্তে করে বললেন, সেটা ভাবতে খুব খারাপ লাগে হর্ষবাবু। পৃথিবী এভাবে শেষ হয়ে যাবে?

আমারও ভাল লাগে না বিনয়দা, কিন্তু বাস্তব এ ই। এলিয়ট তাঁর কবিতায় বলেছেন, নট্‌ উইথ্‌ এ ব্যাং, বাট্‌ এ হুইমপার—ঠিক তাই।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

আপনার কী মনে হয়?

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, আমার ধারণা দিন ক্রমে আরও খারাপ হবে, তারপর একটা বড়রকমের ওলটপালটের মধ্যে দিয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই গোলমালে অনেক কিছু ভেসে যাবে, অনেক মানুষ মারা পড়বে--কিন্তু যুগান্তরের মুহূর্তে তা তো হয়েই থাকে, বলুন? আমি নিজেও যদি না থাকি ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার সন্ততিরা যেন ভালভাবে বাঁচে। ভাল দিন আসছে, হর্ষবাবু। ছোটবেলায় পড়া আরও একটা ইডিয়ম মনে পড়ে যাচ্ছে—নাইট ইজ ডার্কেস্ট বিফোর ডন।

হর্ষ বললেন, আশাবাদ ভাল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

এ ধরনের সংলাপের কোনো নির্দিষ্ট সমাপ্তি থাকে না। মানুষ যেমন সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করতে পারে, তেমনই এও বোঝে যে এর কোনো সমাধান তার হাতে নেই। তাই বালির ওপরে গড়িয়ে যাওয়া জলরেখার মত হঠাৎ একসময় কথা ফুরিয়ে যায়। একটু বাদেই বিনয়কৃষ্ণ বই পড়তে শুরু করলেন, হর্ষ আবার চিত হয়ে পড়লেন সোফায়।

প্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসি মামা। কাল একবার আসবো।

বাড়ি ঢোকবার মুখে চিঠির বাক্সের চৌকোনা কাচের মধ্যে দিয়ে একটা সাদা খামের কিছুটা অংশ দেখতে পেল প্রকাশ।

এই খামটা কি যাওয়ার সময়ে সে দেখেছে?

না, যতদূর মনে পড়ে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে চিঠির বাক্সে একবার উঁকি দিয়েছিল। বাক্সে তখন কিছু ছিল না। তার মানে এই সময়ের ভেতর কেউ এটা বাক্সে ফেলে গিয়েছে।

লেটার বক্স খুলে খামটা বের করল প্রকাশ। দামী, পুরু কাগজের সুদৃশ্য খাম। ওপরে তার নাম লেখা। ইন্দুকাকার হস্তাক্ষর।

সে খামটা নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল।

জামাকাপড় না খুলেই পড়ার টেবিলে এসে আলো জ্বালিয়ে বসল প্রকাশ। খাম খুলে চিঠিটা বের করল।

কিন্তু এ তো চিঠি নয়। এ কী জিনিস! অর্থবোধক কিছুই লেখা নেই তাতে। শুধু পরপর কতগুলো ইংরেজি অক্ষর সাজানো রয়েছে। বার দুই-তিন চোখ বুলিয়ে প্রকাশ আদ্যোপান্ত কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। হতাশ হয়ে টেবিলে পাতা সাদা কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তাতে লেখা—

EMOCSAHDNESYENRUOJRUOYDNAECA
LPEHTTISIVNEVELEDNADERDNUH
ENOEGAPTAENILHTNEVELEEHT
NIDROWHTNEETXISEHTDNIF

সব্বোনেশে ব্যাপার! বুদ্ধি খাটিয়ে এ থেকে কী অর্থ বের করবে সে! যাহোক একটা সূত্র তো চাই। যেমন, গতবার ইন্দুকাকা যে ধাঁধা দিয়েছিলেন তাতে অন্তত ঝরঝরে বাংলা ভাষায় কয়েকটা লাইন লেখা ছিল। মানে না বুঝতে পারলেও কিছুকে অবলম্বন করে চিন্তা শুরু করার সুযোগ ছিল। কিন্তু এটা নিয়ে সে করে কী? এ তো দেখলে মনে হয় বাঁদরে টাইপ করা শিখছে।

টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে জামাকাপড় বদলাতে গেল প্রকাশ। এখন সে এ নিয়ে আর ভাববে না। তার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে—ভারাক্রান্ত মস্তিষ্কে উদ্ভাবনী শক্তি খেলে না।

বর্ষাকালে হঠাৎ এক একদিন আকাশ খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। সেদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে পিটার মেথিয়েসেন-এর 'স্নো লেপার্ড' পড়তে পড়তে ঘুম এসে যাওয়ায় বেড-সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল প্রকাশ।

অন্ধকারে একটু চোখ সয়ে যাবার পর প্রকাশ দেখতে পেল জানালার বাইরে দুটো উঁচু বাড়ির ফাঁকে ঝকঝকে কালো আকাশে অজস্র নক্ষত্র ফুটে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল অনেকদিন সে কোলকাতার আকাশে নক্ষত্র দেখেনি।

জীবনটা ভালোই। জীবনটা সুন্দর। সুখ বা দুঃখ মনের একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র। যেহেতু আরও ভাল-র কোনো শেষ নেই, তাই নিজের অবস্থায় সুখে থাকাই সুখের মূলমন্ত্র। এই নক্ষত্রভরা আকাশ তার সন্ধান দেয়।

॥ ছয় ॥

পথের শেষ

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার ছবি দেখেছিলাম, সত্যি সত্যি চোখে দেখলাম এই প্রথম। হর্ষবাবু, লোকে যে বলে এর পাতায় বাচ্চা ছেলেকে শুইয়ে রাখা যায়, কথাটা কী সত্যি? ডুবে যাবে না?

বোটানিক্যাল গার্ডেনের মেন গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়েই ডানদিকের একটা পুকুরে

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার বিশাল বিশাল পুজোর পরাতের মত কানাতোলা পাতা ভেসে রয়েছে। বিনয়কৃষ্ণ দেখে খুব খুশি।

হর্ষ বললেন, তা, ছোটখাটো একটি শিশুকে বোধহয় শুইয়ে রাখা সম্ভব। কোথায় যেন এরকম একটা ছবিও দেখেছি বলে মনে পড়ছে। কিন্তু বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে ডুবে যাবে।

কেন?

তাতে শরীরের সমস্ত ওজনটা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে। শুয়ে থাকলে পাতাজুড়ে ওজন ভাগ হয়ে ছড়িয়ে থাকবে, বুঝলেন না? ভারি সুন্দর পাতা, না বিনয়দা? এ হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদ। ওদেশের জলবায়ু অনেকটা আমাদের মত হলেও এখানে এর তেমন বাড় নেই।

বিনয়কৃষ্ণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন কিছুটা আপন মনেই বললেন, দক্ষিণ আমেরিকা খুব জঙ্গলে ভরা, তাই না? আমাজন নদীর দুধারে মধ্য ব্রেজিলের যে জঙ্গল আছে আজও তার ঠিকঠাক ম্যাপ তৈরি হয়নি। সেই জঙ্গলে এই গাছ হয়। ওখানেই তো ফসেট হারিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে আর পাওয়া যায়নি। ওসব জায়গায় যে কী যেতে ইচ্ছে করে!

হর্ষ বললেন, আসুন বিনয়দা, কোথাও ছায়ায় বসে একটু চা খাওয়া যাক।

কাছেই একটা সুন্দর ঘন বাঁশঝাড়। কেউ কাটে না এখানে, সোনালী রঙের পাকা বাঁশ ঝক্‌ঝক্ করছে। তার পাশের ঘাসে বসা গেল।

ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে মাথার ওপরে গাছের পাতায়। একটা ছায়াচ্ছন্ন সুনিবিড় শান্তিতে সমস্ত পরিবেশ ডুবে রয়েছে। এই তো কয়েক পা হেঁটে গেলেই শিবপুরের বড় রাস্তা, মোটরগাড়ির শব্দ, লোকজনের কোলাহল—অথচ এখানে বাইরের আওয়াজ বিশেষ এসে পৌঁছায় না। চারদিকে গাছপালার ঘন সবুজ আর অলস স্তব্ধতা।

ফ্লাস্ক থেকে কাগজের কাপে কফি ঢেলে এগিয়ে দিতে দিতে হর্ষ বললেন, ফসেটের কথা কী বলছিলেন? ব্রেজিলের জঙ্গলে কী হয়েছিল?

কফিতে চুমুক দিয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, পেরু, ইকোয়েডর এসব দেশের সীমানা নির্ণয়ের ব্যাপারে পাকা সার্ভেয়ার হিসেবে ফসেট খুব নাম করেছিলেন। সেন্ট্রাল ব্রেজিলের মাত্তো গ্রোসো অঞ্চল খুব অরণ্যসঙ্কুল, সার্ভে করতে করতে স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে ফসেট শুনেছিলেন ওই অরণ্যের গোপনে বসবাসকারী এক অদ্ভুত জাতির গল্প। তারা সভ্যতার কাছাকাছি কখনো আসে না। তাদের দেশের রাস্তা সোনা দিয়ে মোড়া, বিশাল বিশাল পাথরে তৈরি অট্টালিকায় তারা বাস করে। ফসেটের সহকারীরা এসব গালগল্প হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু ফসেট জানতেন উপজাতিদের এ ধরনের কাহিনীর মূলে কিছু সত্য থাকেই। সার্ভের কাজ শেষ হলে ফিরে এসে আমেরিকার দু-তিনটি সংবাদপত্রে ফসেট তাঁর অরণ্য-অভিজ্ঞতার কথা লেখেন, সে লেখায় উপজাতিদের কাছে শোনা গল্পটির কথাও উল্লেখ করেন। আমেরিকা হচ্ছে হুজুগের দেশ। নর্থ আমেরিকান নিউজপেপার অ্যালায়েন্স, বা সংক্ষেপে NANA বলে একটি সংস্থা ফসেটকে ডেকে বলল, মাত্তো গ্রোসোর অরণ্যের ওই অদ্ভুত রহস্যময় জাতির সন্ধানে তুমি যদি একটা অভিযান চালাও, তাহলে তার সমস্ত খবর আমরা ছাপতে রাজি আছি। তোমাকেও মোটা টাকা দক্ষিণা দেব। কিন্তু একটা শর্ত থাকবে—এই অভিযানের কাহিনী তুমি আমাদের সংস্থার কাগজ ছাড়া অন্য কোথাও লিখতে পারবে না। রাজি?

ফসেট রাজি হলেন। টাকার জন্য নয়, কারণ ফসেট তখন খ্যাতি এবং অর্থ দুই-ই পেতে শুরু করেছেন। আসলে তাঁর রক্তে ছিল অ্যাড্ভেঞ্চারের নেশা—এমন সুযোগ কী তিনি ছাড়তে পারেন? লোকজন জোগাড় করে ফসেট মাত্তো গ্রোসোর অরণ্যে ঢুকে পড়লেন। ব্যস্, সেই শেষ। আর কেউ কোনোদিন তাঁর সন্ধান পায়নি। ব্রেজিলের জঙ্গল ফসেটকে গ্রাস করে ফেলল। জঙ্গলে ঢোকবার আগে স্ত্রীকে লেখা তাঁর শেষ চিঠি অভিযানের একজন কর্মী রিও-ডি জেনিরোতে এসে ডাকে দেয়। এ চিঠিই সভ্যজগতের সঙ্গে ফসেটের শেষ যোগাযোগ।

প্রকাশ বলল, খোঁজাখুঁজি করা হয়নি?

হয়নি আবার! তিনজন শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রী সহ ত্রিশ-চল্লিশজনের একটা দল বাতাসে মিলিয়ে গেল আর খোঁজাখুঁজি হবে না! NANA সংস্থা থেকেই সন্ধানকারী দল পাঠানো হয়েছিল, তারা কয়েকমাস ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেয়।

হর্ষ বললেন, গেল কোথায় লোকগুলো?

কেউ জানে না। কারো কারো মতে ফসেট অরণ্যের মধ্যে ওই নাম-না-জানা বাসিন্দাদের আস্তানায় পৌঁছে এমন আশ্চর্য কিছু দেখেছিলেন যার ফলে আর সভ্যজগতে ফিরে আসতে চাননি।

প্রকাশ হেসে বলল, এতো দানিকেনের বইয়ের মত শোনাচ্ছে।

বিনয়কৃষ্ণ প্রকাশের দিকে একবার তাকালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, প্রকাশ, দানিকেনের তত্ত্ব সত্যি কী মিথ্যে জানিনা, কারণ আমার তত পড়াশুনো নেই। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি, মনটাকে বেশ খোলামেলা রাখবে। পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নেই।

হর্ষ বললেন, এ কথাটা আমি মানি। জে. বি. এস হ্যালডেনের কী একটা লেখাতে যেন সেদিন পড়ছিলাম, ট্রুথ ইজ নট অনলি স্ট্রেঞ্জার দ্যান ইউ ইমাজিন। ইট ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ইউ ক্যান ইমাজিন। এই 'ক্যান' শব্দটা খেয়াল করবেন। কিছুই কী অসম্ভব? আর এই রহস্যের বোধ না থাকলে তো জীবনটাই মাটি।

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, সত্যি, জীবনটা কী সুন্দর, না? আমি মশাই সামান্য চাকরি আর ঘরসংসার করে জীবন কাটালাম। সাবমেরিনেও চাপিনি, দক্ষিণ মেরুতে গিয়েও পেঙ্গুইনের গলা চুলকে দিইনি। তবুও এ জীবনটা কী সুন্দর কেটেছে বলে মনে হয়। আহা, এই শেষদিক থেকে যদি আবার শুরু করতে পারতাম।

হঠাৎ প্রকাশ নড়ে বসে বড় বড় চোখ করে বিনয়কৃষ্ণের দিকে তাকাল। কোনো কারণে সে যেন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কী বললেন? শেষ থেকে শুরু? তাই তো। এটা তো ভাবিনি।

হর্ষ সোজা হয়ে বসলেন—কী ভাবোনি?

কালকে আর একটা ধাঁধা এসেছে ইন্দুকাকার কাছ থেকে। সেটার উত্তর পেয়ে গেলাম মনে হচ্ছে! এই দেখো—

পার্স থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে হর্ষর দিকে এগিয়ে দিল সে। হর্ষ নিয়ে চোখ বোলালেন। এ আবার কী পাগলামি?

আমারও তাই মনে হচ্ছিল। কাল অনেক রাত অবধি ভেবে ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারিনি। এইমাত্র সমাধানটা পেয়ে গেলাম।

হর্ষর হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে বিনয়কৃষ্ণ দেখছিলেন, বললেন, সমাধান পেয়ে গেলে? এই হিজিবিজির?

পেলাম। আপনার কথাতেই পেলাম।

কী রকম?

ওই যে বললেন, 'শেষ থেকে শুরু'। সেটাই সূত্র। লেখাটা একবার শেষ লাইনের শেষ অক্ষর থেকে উলটো দিকে পড়ে যান তো। শব্দগুলো ভাগ করা নেই। কাজেই একটু অসুবিধে হবে।

উত্তেজনায় বিনয়কৃষ্ণ ঘাসের ওপর উবু হয়ে বসেছেন। এবার ধরে ধরে পড়তে আরম্ভ করলেন—Find this, না, 'দিস' নয়, the—তাহলে কী হল? Find the six ten —নাঃ, সিক্স টেন না, sixteenth—দাঁড়াও বাপু, হড়বড় করো না। উঃ, মজা বটে!

মিনিট তিনেকে সবটা পড়া হয়ে গেল। হর্ষ পকেট থেকে নোটবই বের করে পুরো ব্যাপারটা লিখে নিলেন। সবটা দাঁড়ালো—

Find the sixteenth word in the eleventh line at page one hundred and eleven, visit the place and your journey's end has come.

প্রকাশ প্রায় চিৎকার করে বলল, মামা, বুঝতে পারছো তো? মানে সেই জাকেত্তা হকস্-এর বইটা! সেইটা দরকার। তার মানে ইন্দুকাকা ভেবেচিন্তেই বইটা বিনয়কৃষ্ণবাবুকে উপহার দিয়েছিলেন। তখন থেকেই ধাঁধার ব্যাপারটা মাথায় ঘুরছিল।

বুঝলাম। কিন্তু বইটা যে এখনই একবার প্রয়োজন।

কোনো অসুবিধে হবে না মামা। এখনো অনেক বেলা আছে, চলো, একবার বাড়ি হয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের রিডিং রুমের কার্ডটা নিয়ে যাই। লাইব্রেরী খোলা পেয়ে যাবো। চলুন বিনয়বাবু—

লাইব্রেরীতে বইয়ের নাম আর কল্ নাম্বার লিখে দিয়ে তিনজন বসে আছে উদ্‌গ্রীব হয়ে। হর্ষ তর্জনী দিয়ে কাঠের ওপর দাদরা তাল বাজাচ্ছেন। বিনয়কৃষ্ণর চোখ চক্‌চক্ করছে, মাঝেমাঝেই একটা চৌকো কৌটো থেকে ভাজা মশলা বের করে মুখে পুরছেন।

বই এল।

তিনজনে ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের ওপর। কম্পমান উত্তেজিত হাতে বই খুললেন বিনয়কৃষ্ণ। সব বিষয়ে তাঁকে এগিয়ে রাখাটা হর্ষ আর প্রকাশের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। কিছুটা তাঁর বয়েসের জন্য, কিছুটা তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য।

বই খুলে কিছুক্ষণ দ্রুত পাতা উল্টে কেমন বিহ্বল হয়ে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, কিন্তু এ কী!

হর্ষ বললেন, কী হয়েছে?

ষোলো পাতায় কোনো একশো এগারো নম্বর লাইন নেই!

হর্ষ হাসলেন। তা কী করে থাকবে? কোনো পাতাতেই কী একশো এগারো লাইন থাকতে পারে?

তবে? তবে?

আপনি উত্তেজিত হয়েছেন বিনয়দা। ঠাণ্ডা হোন। ষোলো পৃষ্ঠার একশো এগারো নম্বর লাইন নয়, একশো এগারো পৃষ্ঠার এগারো নম্বর লাইনের ষোলো নম্বর শব্দ। নিন, বের করুন।

আঙুল বুলিয়ে একজায়গায় এসে থেমে গিয়ে বিনয়কৃষ্ণ মুখ তুলে তাকালেন। শব্দটা হচ্ছে 'Library'!

লাইব্রেরী?

হ্যাঁ।

প্রকাশ বলল, তার মানে? কীসের লাইব্রেরী? কোথায়? আমরা তো লাইব্রেরীতেই বসে আছি। তাহলে এর মানে কী? ভাল করে একবার দেখুন তো?

—দেখেছি। শব্দটা লাইব্রেরীই বটে।

প্রকাশ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ভাল। ভাবলাম এবার বুঝি সব ধাঁধা কেটে গিয়ে আলো দেখতে পাবো। এত কাঠখড় পুড়িয়ে কী বেরুলো? না—লাইব্রেরী। এই তো লাইব্রেরীতে বসে আছি। এখানে কী?

হর্ষ মৃদুস্বরে বললেন, লাইব্রেরী পৃথিবীতে আরও আছে। মাত্র এই একটাই নয়।

তো?

তো এই, আমার মনে হয় ইন্দুদার কাছ থেকে শেষ নির্দেশ এখনো আসেনি। অপেক্ষা করো, ইন্দুদা বোকা নন।

তাহলে আর জার্নিস এন্ড হোল কোথায়?

কোনো একটা লাইব্রেরীতে পথের শেষ—সে কথা বলেছেন, কোনটায় তা তো বলেন নি। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

বিনয়কৃষ্ণ পুলকিত মুখে বারবার বলতে লাগলেন—বেশ মাথাখানা, বেশ ভাল। কেমন ইন্‌স্টলমেন্টে রহস্য পাঠাচ্ছেন। বিদেশ হলে কোনো না কোনোদিকে নাম করে ফেলতে পারতেন।

বই ফেরৎ দিয়ে ওরা তিনজন বাইরে এল। হর্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কী আমাদের সঙ্গে যাবি?

না মামা। তোমরা বাড়ি যাও। আমার একটু কাজ আছে, সেটা সেরে আমিও বাড়ি ফিরে যাব। কাল দেখা হবে।

এক পুরনো বন্ধু অসুস্থ, কিছুদিন ধরেই তার কাছে যাবার কথা ভাবছে প্রকাশ। কিন্তু যাবো যাবো করে আর যাওয়া হয়ে উঠছে না। আজ সন্ধেয় তার কাছে যাবে ঠিক করে একটা চলতি বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

সাতটা নাগাদ বাড়ি এল প্রকাশ।

লেটারবক্সে সেই অবশ্যম্ভাবী সাদা খাম পড়ে আছে।

সম্ভবত শেষ নির্দেশ এল।

এবারও খামটা সরাসরি খুলে ফেলল না প্রকাশ। বিনয়বাবুই ঠিক বলেছেন। এরকম রোমাঞ্চকর মজাদার ঘটনা মানুষের জীবনে তো কমই ঘটে। ফুরিয়ে গেলে তো ফুরিয়েই গেল। পরে খুলবে খামটা।

সত্যি, জীবনটা একটু অন্যরকম হলে মন্দ হত না। ব্রেজিলের অরণ্য, ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পাতা বাতাসে উল্টে যাওয়া, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের বনানীতে বহুবর্ণ ম্যাকাও পাখির ডাক, পাহাড়ের ঢালুতে তাঁবু খাটিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি কাটানো—নাঃ, সে সব আর হল না।

কিন্তু বড় ইচ্ছে করে। স্বপ্নে সে যায় সেই অলৌকিক বনভূমিতে।

। সাত

প্রাপ্তি

পরের দিন বিকেলের দিকে মামাবাড়ি যাবে ঠিক করেছিল প্রকাশ, কিন্তু ইন্দুমাধবের চিঠি পাবার পর সকালেই গিয়ে হাজির হল।

হর্ষর বাড়িতে দৃশ্য একই। বিনয়কৃষ্ণ সোফায় পা গুটিয়ে বইতে নাক ডুবিয়ে রয়েছেন, হর্ষ বাঁড়ুজ্যে স্ক্রু ড্রাইভার হাতে নিয়ে সুপার এইট প্রোজেক্টারের ছোটখাটো কী মেরামতে ব্যস্ত। প্রকাশকে দেখে হর্ষ বললেন, সকালে যে?

কথা না বলে প্রকাশ পকেট থেকে খামটা বের করে এগিয়ে দিল।

চটাস্ করে বই বন্ধ করে এগিয়ে এলেন বিনয়কৃষ্ণ। —এসে গেছে? দেখি—

চিঠির ভাঁজ খুললেন হর্ষ। সাদা, মোটা কাগজে ইন্দুমাধবের হস্তাক্ষরে গোটা গোটা করে লেখা—

শল্য। আদি-বিরাট। বিরাট।
সভা-আদি।
আদি-বন। আদি। বিরাট।
কর্ণ। আদি।
সভা। আদি-সৌপ্তিক। আদি-সভা।
শল্য।
সভা। আদি-কর্ণ। আদি।
আদি-কর্ণ।
সভা-উদ্যোগ।

হর্ষ বাঁড়ুজ্যে গলার মধ্যে একধরনের অসহায়তাসূচক শব্দ করলেন।

কিন্তু বিনয়কৃষ্ণর চোখ জ্বলছে। তিনি একদৃষ্টিতে লেখাটা দেখছেন।

কিছু বুঝলেন বিনয়দা?

অ্যাঁ?

এর মাথামুণ্ডু কিছু ধরতে পারলেন?

বিনয়কৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তিনি আঙুলে কর গুণে গুণে কী যেন হিসেব করছেন। হর্ষ আর প্রকাশ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটির চওড়া কপাল, ধারালো চোখ, দৃঢ় ওষ্ঠ অথচ শান্ত ভাবভঙ্গী দেখলে আন্দাজ করা যায় ইনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। অথচ অবস্থাবৈগুণ্যে এঁকে সারাজীবন একঘেয়ে নীরস কাজ করে কাটাতে হয়েছে। এখন সুযোগ পেয়ে ভেতরের মানুষটা বেরিয়ে এসেছে।

বিনয়কৃষ্ণর ধ্যান ভাঙানো উচিত নয় মনে করে হর্ষ প্রকাশের দিকে ফিরে অন্য কথা পাড়লেন। বললেন, আমাদের দলটা কিন্তু খুব জমে উঠেছে। তোর, আমার আর বিনয়দার দলটা। এটাকে ভাঙতে দেওয়া উচিত নয়, বুঝলি? ভাবছি, মাঝে মাঝে এরকম অ্যাড্‌ভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়লে কেমন হয়?

প্রকাশ হেসে বলল, রহস্য রোমাঞ্চ আর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ক্লাসিক্যাল যুগটা চলে গিয়েছে মামা। এখন আর গোপন অপরাধ বড় একটা হয় না, বন্দুক-টন্দুক নিয়ে বড় বড়

ডাকাতি হয়। তাতে তোমার আমার কিছু করবার নেই।

হর্ষ একটু ভেবে বললেন, এ ধারণাটা বোধহয় ভুল। শার্লক হোমস্‌ও একবার ওয়াট্‌সনকে দুঃখ করে বলেছিলেন যে, প্রকৃত বুদ্ধিমান অপরাধীর সংখ্যা কমে আসছে। কিন্তু তারপরেও হোমসের কতগুলো গল্প লেখা হয়েছিল ভাব তো?

মামা, তুমি গল্প আর সত্যিতে এক করে ফেলছো।

না। শুধু এটা বলতে চাচ্ছি যে, এমন অপরাধের পরিকল্পনা যদি একজন ভদ্রলোক লেখকের মাথায় এসে থাকে, তাহলে একজন বুদ্ধিমান অপরাধীর মাথাতেও আসতে পারে। বাধা কী?

তা বটে।

হর্ষ বললেন, বোমা, বন্দুক ওসব আসুরিক ব্যাপার। শুধুই গায়ের জোর। বুদ্ধিমত্তার কোনো পরিচয় নেই। একটা পাঁচ বছরের নির্বোধ শিশুও বন্দুকের ঘোড়া টিপে পৃথিবীর সবচেয়ে বলবান লোককে নিমেষে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারে। তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। আমরা অন্য ধরনের ক্রাইমের সন্ধানে থাকবো। শুধু ক্রাইমই বা কেন, যে কোনো মজাদার চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হলেই চলবে। তুই রাজি তো? বিনয়দাকেও দরকার পড়লেই খবর দিয়ে আনিয়ে নেবো।

বোধহয় নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে বিনয়কৃষ্ণ একবার মুখ তুলে এঁদের দিকে তাকালেন। বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে হর্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন---একটু কাগজ আর একটা কলম দিন তো।

সাইড টেবিল থেকে প্যাডটা আর পকেট থেকে সেফার্স-এর বল পয়েন্ট কলম বের করে এগিয়ে দিলেন হর্ষ।

এক কী দেড় মিনিট ধরে আস্তে আস্তে কী যেন লিখলেন বিনয়কৃষ্ণ। তারপর প্যাডের প্রথম পাতাটা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে বললেন—প্রথম ন'টা হলেই হয়ে যায়। ওখানেই একটু আটকাচ্ছিল। আসলে শূন্যের তো দরকার নেই। বাঃ, দারুণ লোক! এঁকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

হর্ষ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি কী এ ধাঁধাটাও ভেঙে ফেলবেন নাকি?

হ্যাঁ।

এর মধ্যেই?

একটু বেশি সময়ই লেগে গেল। মুখে মুখে হয় না। গুলিয়ে যায়। ওই জন্যেই তো কাগজ-কলম চেয়ে নিলাম।

দেখি তো ধাঁধাটা।

হর্ষ ইন্দুমাধবের পাঠানো কাগজটা হাতে নিয়ে আবার অনেকক্ষণ দেখলেন। কাছে সরে এসে প্রকাশও পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

একটু বাদে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রেখে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে হর্ষ বললেন, নাঃ, আমার মাথায় স্ট্রাইক করছে না। প্রকাশ কিছু বুঝলি?

না মামা। তবে চেষ্টা করলে কী হয় বলতে পারি না। কিন্তু বিনয়বাবু যখন এর সমাধান করেই ফেলেছেন, আর খাটতে ভাল লাগবে না।

হর্ষ বললেন, বিনদা, ঝেড়ে কাশুন। আমরা সারেন্ডার করছি।

খুশিতে পা নাচাতে নাচাতে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, আমি বয়সে প্রবীণ তো, সেখানেই আমার জিত।

কী রকম?

মহাভারত পড়েছেন?

প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে না পেরে হর্ষ একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, তা পড়েছি। কেন বলুন তো?

পড়েছেন, কিন্তু সেভাবে পড়েননি। গল্পটা আদ্যোপান্ত জানেন, কিন্তু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারবেন না।

হর্ষ বললেন, পারব।

পারবেন? আচ্ছা, বলুন তো, মহাভারতে কটা পর্ব?

আঠারোটা।

বিনয়কৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, বেশ, পর পর নাম বলে যান।

হর্ষ থতিয়ে গেলেন। পর পর? ইয়ে--সে হচ্ছে গিয়ে—

বিনয়কৃষ্ণ আবার হাসলেন। শান্ত হাসি। লজ্জার কিছু নেই। শতকরা নব্বই ভাগ নিশ্চিত ছিলাম, আপনি পারবেন না। কারণ শতকরা নব্বই জনই পারবে না। আমি পারব। এতে অবশ্য আমার বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। আসলে ছোটবেলা থেকে সেই ভাবেই রামায়ণ মহাভারত পড়তে অভ্যস্ত হয়েছি। এটা যুগের পার্থক্য, বয়েসের পার্থক্য।

প্রকাশ বলল, মহাভারতের সঙ্গে এ ধাঁধার কী সম্পর্ক?

সবটাই। বুঝিয়ে দিচ্ছি, ভাল করে শুনুন। মহাভারতের প্রথম ন'টি পর্বের নাম যথাক্রমে আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব এবং সৌপ্তিকপর্ব। নম্বর হিসেবে সাজালে আদিপর্ব হল এক, বনপর্ব তিন, কর্ণপর্ব আট—এরকম। এবার ধরুন, আপনি ইংরেজিতে লিখতে চান—An ass কেমন? ইরেজি বর্ণমালায় A হল এক নম্বর অক্ষর, N চোদ্দ নম্বর, A মানে আবার এক, S হচ্ছে উনিশ, ডাবল্ S মানে দুবার উনিশ। তাহলে যদি আমি ইচ্ছে করি, An ass কথাটাকে এভাবে লিখতে পারি—

1 / 14 / 1 / 19 / 19

বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারবে আমি কী লিখতে চাইছি।

এবার ধাঁধাটা দেখুন। দাঁড়ি দিয়ে এক একটা পর্ব আলাদা করা আছে। প্রথম পর্বে লেখা—শল্য। শল্যপর্ব হচ্ছে ন-নম্বর অধ্যায়। ইংরেজিতে ন-নম্বর অক্ষর হচ্ছে—I, কেমন? পরের পর্বে রয়েছে আদি-বিরাট। আদি এক, বিরাট চার। একের পিঠে চার দিলে হয় চোদ্দ, চোদ্দ নম্বর অক্ষর কী?

প্রকাশ কর গুনতে লাগল। বিনয়কৃষ্ণ হেসে বললেন, আমাকেও কর গুনতে হচ্ছিল।

প্রকাশ বলল, এন্।

হ্যাঁ। তারপর বিরাট, মানে চার, মানে ডি। আই. এন. ডি বেরুল। এইভাবে করে যাও, দেখবে পুরো কথাটা হচ্ছে INDUMADHAB'S LIBRARY—নাও, এবার নিজেরা করে দেখো।

কঠিন কাজ যথাযথ শেষ করার তৃপ্তি মুখে ফুটিয়ে বিনয়কৃষ্ণ ভয়ানক বেগে পা নাচাতে লাগলেন।

হর্ষ প্রকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইন্দুদার বাড়িতে একটা লাইব্রেরী আছে না?

আছে। বেশ রেয়ার কিছু বইয়ের কালেকশন রয়েছে।

ধাঁধাতে তো আমাদের ইন্দুমাধবের গ্রন্থাগারে যেতে বলা হচ্ছে। একবার যেতে হয়।

কখন?

এখনই। আর দেরি কিসের?

কিন্তু ইন্দুকাকার বাড়ি তো বন্ধ। কাকা তো কোলকাতায় নেই। গিয়ে কী হবে?

হর্ষ বললেন, গিয়ে দেখা যাক, একবার খোঁজও তো নেওয়া যাবে। বিনয়দা কী বলেন?

অবশ্য, অবশ্য। চলুন, ঘুরে আসা যাক। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এ রহস্যের সমাধান ঘনিয়ে এসেছে।

হর্ষর গাড়িতে ইন্দুমাধবের বাড়ির দিকে যেতে যেতে বিনয়কৃষ্ণ বললেন, এই শেষ ধাঁধাটা কিন্তু খুবই সোজা। ছোটবেলায় আমরা ইস্কুলের বন্ধুরা মিলে অক্ষরের বদলে নম্বর বসিয়ে পরস্পরকে গোপন চিঠি লিখে মজা করতাম। এও তাই। কেবল ধাঁধাটা একটু বদলে দেওয়া হয়েছে।

লাল আলোয় গাড়ি আটকেছে পথের মোড়ে। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে দিকে তাকিয়ে ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ। তাঁর মুখে একটু বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, হর্ষভাই, বড় ভাল কাটল আপনার কাছে এই কটা দিন। জীবনে যা চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি, তার স্বাদ কিছুটা উপভোগ করলাম আপনার এখানে। ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করব না। কিন্তু যাবার সময়টা বড়ই মন খারাপ হচ্ছে।

আলো সবুজ হয়ে গিয়েছিল। ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি দিতে দিতে হর্ষ বললেন, আরও কিছুদিন থেকে যান না বিনয়দা।

না ভাই, উপায় নেই। এ ব্যাপারটার শেষ দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো। আপনার বৌদিকে একা রেখে এসেছি, বাড়িতে তো আর কেউ নেই। অসুখ-বিসুখ হলে—বুঝলেন না?

একটু থেমে বললেন, তবে আবার আসবো। ওই যে বললেন না, আমরা একটা ক্রাইম ডিটেকশন ক্লাব বানাবো। মজার কোনো ঘটনার সন্ধান পেলেই খবর দেবেন। দৌড়ে চলে আসবো।

আর কিছুটা গিয়েই ইন্দুমাধবের বাড়ি।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাশ অবাক হল।

একতলা, দোতলার সব জানালা দরজা খোলা। বাতাসে উড়ছে ফুলকাটা পর্দা। বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই বাড়ির ভেতর থেকে ডালে ফোড়ন দেবার গন্ধ ভেসে এল।

এসব লক্ষণ দেখলেই বোঝা যায় বাড়িতে লোক এসে গিয়েছে।

হর্ষ চাপা গলায় বললেন—ইন্দুদা এসে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

কেবল বিনয়কৃষ্ণ অবাক হলেন না। বললেন—আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল উনি হয়তো এসে গিয়েছেন।

হর্ষ জিজ্ঞাসা করলেন—ইন্দুদার লাইব্রেরী কোনদিকে জানো?

জানি। বারান্দা ঘুরে দক্ষিণদিকের শেষ ঘরটা—একতলাতেই।

এসো আমার সঙ্গে, আসুন বিনয়দা।

লাইব্রেরীর দরজায় মেরুন রঙের মোটা পর্দা ঝুলছে। ভেতরে পাখা চলছে নিশ্চয়। কারণ পর্দার তলাটা কাঁপছে। হর্ষ থেমে গিয়ে প্রকাশকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—তুমি আগে যাও।

প্রকাশ ঢোকবার আগেই ভেতর থেকে ইন্দুমাধবের ভারী গলা শোনা গেল—এসো প্রকাশ, হর্ষও এসেছো নাকি?

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো প্রকাশ। পেছনে বাকিরা।

বেশ বড় ঘর। হালকা বাদামী রঙের প্লাসটিক পেন্ট করা দেয়াল। সবগুলো জানালাতেই দেয়াল জুড়ে স্লট্ অ্যান্ড অ্যাঙ্গলের তৈরি বই রাখার র‍্যাক—তাতে অজস্র বই। কিছু বাঁধানো, কিছু সদ্য কেনা। সমস্ত ঘরের বাতাসে কেমন একটা বই-বই গন্ধ। মেঝেতে কয়ের কার্পেট। ঘরের ঠিক মাঝখানে বড় একটা টেবিল, তাতেও স্তূপীকৃত বই। চার-পাঁচখানা চেয়ার।

টেবিলের ওপাশে বড়সড় গদিমোড়া চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে আছেন ইন্দুমাধব, দুহাতের আঙুলগুলোর মাথা পরস্পর ছুঁয়ে আছে।

বিনয়কৃষ্ণ তাকালেন। সেই টর্টয়েজ-শেলের চশমা, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চিবুক, ধারালো চোখ। সেই বৃষ্টির রাতে বর্ধমানে যেমন দেখেছিলেন।

ইন্দুমাধব সোল্লাসে বললেন—আরে! বিনয়বাবু এসেছেন দেখছি। এটা আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। যাই হোক, বসুন। বোসো হর্ষ, বোসো প্রকাশ। তোমাদের জন্যই সকাল থেকে অপেক্ষা করছি।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল, আমাদের জন্য! আপনি জানতেন আমরা এখন আসবো?

নিশ্চয়। হোয়াট্ এলস্? শেষ যে সঙ্কেতলিপি পাঠিয়েছি, সেটা ভাঙতে একজন মধ্যমবুদ্ধির লোকের যে সময়টা লাগতে পারে, তা দেবার পর এখানে বসে অপেক্ষা করছি। এখানেই তো আসতে বলেছিলাম তোমাকে, তাই না?

প্রকাশ একবার ঢোক গিয়ে বলল, উত্তর বের করতে কিন্তু বিনয়বাবু আমাকে সাহায্য করেছেন। এ কৃতিত্ব আমি একা নিতে পারি না।

ইন্দুমাধব একটু থমকালেন। তারপর হাসিমুখে একবার বিনয়কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, তা হোক! যে লেখে, সেও তো মাঝে মাঝে ডিক্সনারি বা রেফারেন্স বই-এর সাহায্য নেয়—তাতে কী তার কৃতিত্ব কমে? তাছাড়া তুমি বেশ ব্যক্তিগত সাহসেরও পরিচয় দিয়েছ।

কী রকম?

ইন্দুমাধব বললেন, এই যেমন—ধরো—এসো রামগোপাল।

এঁরা তিনজন তাকিয়ে দেখলেন, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে রামগোপাল নামে লোকটি।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রকাশ বলল, মামা! বিনয়বাবু! এই লোকটাই সেদিন গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে আমাদের দিকে রিভলভার ধরে দাঁড়িয়েছিল। ধরুন একে—

প্রকাশ তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই রামগোপাল চেঁচিয়ে উঠল—ওরে বাবারে! ও ইন্দুদা, বাঁচান।

প্রকাশ আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাকা ডাকাতরা কী এমন অসহায়ের মত চেঁচায়? তাছাড়া এ লোকটা ইন্দুমাধবকে চেনে দেখে যাচ্ছে। এসব কী ব্যাপার?

ইন্দুমাধব হো হো করে হাসলেন। হাসলে তার বুকের ভেতরটা অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। মন স্বচ্ছ না হলে এমন হাসি হাসা সম্ভব না।

হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছতে মুছতে ইন্দুমাধব বললেন, বোসো রামগোপাল, বোসো। প্রকাশ, তুমি ওকে আর কিছু বোলো না। ও আসলে খুব ভাল লোক, দারুণ অভিনয় করে।

অভিনয় করে!

হ্যাঁ। এ পাড়াতেই ওদের একটা থিয়েটার পার্টি আছে। আমি সে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক—

রামগোপাল হেসে বলল, উনি আমাদের মোটা চাঁদা দেন।

ইন্দুমাধব বললেন, আমারই কথায় ওরা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে তোমাদের গাড়ি আটক করেছিল। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি করেছিলাম স্বীকার করি—কিন্তু তোমার সাহস পরীক্ষা করবার জন্য এ ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি মাথায় এল না, তা কী করবো।

বিনয়কৃষ্ণ অস্ফুট গলায় বললেন, ওঃ, বইয়ের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই ভাবি, রাস্তায় গাড়ি আটকে এরা বই চায়, বইয়ের কথা জানলো কী করে।

ইন্দুমাধব বললেন, ওটা আমার একটু ভুল চাল হয়েছিল।

বিনয়কৃষ্ণ বললেন, ওটাই একমাত্র নয়। গাড়ির টায়ারটা না কেটে কেবল ভালভ্ থেকে হাওয়া বের করে দিয়েছিল দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। অত সময় নিলে তো ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

তা বটে। কিন্তু মিছিমিছি হর্ষর গাড়ির চাকাটা কাটতে মায়া হল। আজকাল টায়ারের যা দাম! অবশ্য সব ব্যাপার বুঝিয়ে লেখা আমার একটা চিঠি ওদের কাছে ছিল। তেমন বেকায়দায় পড়লে বা হঠাৎ লোকজন জমা হয়ে গেলে সে চিঠি ব্যবহার করতে বলে দিয়েছিলাম।

রামগোপাল বলল, ভাগ্যিস্ দরকার হয়নি।

হর্ষ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনি পারেনও ইন্দুদা! এত খরচ করে এমন কাণ্ড কেউ করে? তা, মণিমুক্তোর কথা কী যেন লিখেছিলেন, সে সব কোথায়?

ইন্দুমাধব হতাশ ভঙ্গি করে বললেন, ও, সেটা তো বুঝতে পারোনি, না? প্রকাশ কিছু বুঝেছো?

প্রকাশ মাথা নাড়ল।

আরে, মণিমুক্তো হচ্ছে এইসব বই। দুষ্প্রাপ্য, দামী সব বই জোগাড় করে রেখেছি এখানে। এর চেয়ে দামী মণিমুক্তো আর কী হতে পারে আমি তো অন্তত জানি না। লাখখানেকের কথাটাও মিথ্যে লিখিনি। এগুলো এই মুহূর্তে বিক্রি করে দিলেও অন্তত একলাখ টাকা পাবেই। এসব আর কাকে দেব তোমাকে ছাড়া? নেবে তো?

প্রকাশ কিছু বলবার আগেই বিনয়কৃষ্ণ ওপাশ থেকে বললেন, নিয়ে ফেলো হে, নিয়ে ফেলো। টাকার চেয়ে এ জিনিস দামী।

ইন্দুমাধব আবার বললেন, সারা জীবন অনেক কষ্ট করে এগুলো জমিয়েছি। এসব বই নষ্ট হয়ে গেলে মরেও শান্তি পাবো না। আমার বিশ্বাস, তোমার কাছে এরা যত্ন পাবে।

তুমি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখো।

হর্ষ বললেন, সেদিন দুপুরবেলা যে বোকাটে লোকটা প্রকাশকে অনুসরণ করছিল সেও কী আপনার লোক ইন্দুদা?

বটেই, বটেই। ওর নাম ভাস্কর সেন। এই থিয়েটার দলেরই সদস্য। শুনলাম ধরা পড়ে গিয়েছিল। ভাল অভিনয় শেখেনি আর কী—

প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে লিখিতভাবে এই বইগুলো দিয়ে গেলাম। এই নাও—

ড্রয়ার থেকে গোল করে পাকানো একটা কাগজ বের করে প্রকাশের হাতে দিলেন ইন্দুমাধব। এতে সাক্ষীর সই-টই সবই করানো আছে। আমার মৃত্যুর খবর পেলেই তুমি এসে বইগুলো নিয়ে যাবে। দেখে নাও।

কাগজটা খুলে প্রকাশ দেখতে লাগল।

একটু কেশে নরম গলায় বিনয়কৃষ্ণ বললেন, ইন্দুবাবু, ইয়ে, হয়েছে কী—আমার বইখানা ডাকাতরা—না, ডাকাত না, ওই ওঁবা নিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানা কী ফেরৎ পেতে পারি? আমার পড়া হয়নি—

ও হো, তাই তো। সেটা তো দিতে হবে। এই নিন।

টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে এগিয়ে ধরতেই বিনয়কৃষ্ণ খপ্ করে সেখানা নিয়ে কাঁধের ঝোলায় পুরে ফেললেন।

হর্ষ বললেন, কিন্তু ইন্দুদা, একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। এর জন্য এত তাড়াহুড়ো করার কী দরকার ছিল? ধীরে সুস্থে করলেও তো চলত। আপনি তো এখনো বহুদিন বাঁচবেন—

ইন্দুমাধব অবাক হয়ে হর্ষ বাঁড়ুজ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, আরে! আসল কথাটাই বলিনি বুঝি? আমি তো আর বেশিদিন বাঁচবো না। আমার তো ক্যান্সার হয়েছে—অ্যাডভান্সড্ স্টেজ। কী যেন বলে—হ্যাঁ, লিম্ফোসারকোমা। আর মাস ছয়েক বড়জোর, ডাক্তার বলেছে। এটাই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, অ্যাঁ? আসল কথাটাই—

যেন খুব একটা মজার কথা বলেছেন, এমনভাবে ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন ইন্দুমাধব।

মানুষটার হাসি খুব সুন্দর। বুকের ভেতরটা অবধি পরিষ্কার দেখা যায়।

অমলের ইচ্ছে-বুলেট

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অমল দেখল মা আর বাবা তখনো ফেরেন নি। বিকেলের খাবার ঢাকা দেওয়া আছে টেবিলে। জুতো খুলে বইপত্র সোফায় রেখে বেসিনে হাত ধুয়েই অমল খেতে বসে গেল। খাওয়া হলে সে ছাদে গিয়ে তার প্রিয় গাছগুলোয় জল দেবে।

খাবারের প্লেটের ওপর তারের জালের ঢাকনাটা সরাতে গিয়ে অসাবধানে বেশ জোরে তার হাত লেগে গেল পাশে রাখা জলের গ্লাসে। গ্লাসটা ভর্তি, একটা স্টিলের ঢাকা চাপা দেওয়া আছে মুখে। গ্লাসটা কাত হয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল টেবিলের ধারে, জল ছড়িয়ে পড়ল টেবিলময়। অমল চেঁচিয়ে উঠল,—এই! পড়িস না, পড়িস না!

এটা একটা কথার কথা, গ্লাসটা তো পড়বেই। কিন্তু পড়ল না। টেবিলের একদম কিনারায় গিয়ে সামান্য একটু ঠেকে থেকে ঝুলে রইল শূন্যে। অমল জানে কোনো কিছু শূন্যে ঝুলতে পারে না, ভারকেন্দ্র নষ্ট হয়ে পড়ে যাবেই যাবে।

শিশু বা কিশোরদের মন বড়দের চেয়ে অনেক বেশি নমনীয়। অমল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বটে, কিন্তু তার চোয়াল ঝুলে পড়ল না, কিংবা ভয়ে সে আঁতকে উঠলো না। কিশোরদের জগতে কোনো কিছুই সম্ভাব্যতার বাইরে নয়। ভয় না পেয়ে বরং সে বিস্ময় কাটিয়ে জিনিসটা সত্যিই, না তার চোখের ভুল তা পরীক্ষা করার জন্য দৃঢ় গলায় বললো—উঠে আয়, উঠে আয়। যেখানে ছিলি সেখানে চলে আয়।

আশ্চর্য! গ্লাসটা দুবার নড়ে টেবিলের কানায় প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর আপনা-আপনি পিছলে পিছলে খাবারের থালার পাশে এসে নিশ্চল হয়ে গেল।

অমল খুব বুদ্ধিমান ছেলে। সে বুঝতে পারল খুব অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার সে সম্মুখীন হয়েছে। কোনো অজ্ঞাত, রহস্যময় কারণে বাইরের জগতের নিষ্প্রাণ বস্তুর ওপর সে তার মনের কর্তৃত্ব খাটাতে পারছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল এইচ্. জি. ওয়েল্সের এই ধরনের একটা গল্পও সে পড়েছে। বাস্তব জীবনেও তাহলে এমন হয়!

চট্ করে চারখানা লুচি, আলুর দম আর মোহনভোগ খেয়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলল। এখন একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতে দারুণ লাগবে। নিচু হয়ে একটা জলের বোতল বার করতে গিয়ে সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখাই যাক্ না, তার এই নতুন পাওয়া শক্তিটা কতদূর সত্যি।

ফ্রিজের দরজাটা খুলে রেখেই সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, তারপর বলল,—অ্যাই জলের বোতল, লাফিয়ে আয় তো দেখি আমার হাতে।

অমলের মনে একটু সংশয় ছিল, এবার হয়তো কিছুই ঘটবে না। প্রথমবারের ঘটনাটা হয় তার চোখের ভুল, নয়তো তালেগোলে কিছু একটা ঘটে গেছে। কিন্তু তার সংশয় দূর করে ফ্রিজের থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতলটা বেরিয়ে এসে অন্তত চার ফিট্ শূন্যে পাড়ি দিয়ে তার হাতের মধ্যে চলে এল।

নাঃ, ব্যাপারটাকে তো আর মনের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সত্যিই সে একটা আশ্চর্য ক্ষমতার মালিক হয়েছে।

জল খেয়ে বোতলটাকে অবশ্য সে আকাশে উড়ে ফ্রিজে ফিরে যেতে বলল না। হাতে করে গিয়ে রেখে এল। এখন তার অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে পড়তে যাওয়ার কথা। মা-বাবা এবং তার কাছে এই ফ্ল্যাটের তিনটে চাবি থাকে। সে ঢুকছেও নিজের চাবি ব্যবহার করে। এবার সে অঙ্কের বই আর খাতা বগলে নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় ফের চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গলির মোড় পর্যন্ত হেঁটে মনে হল,—দূর! আজ আর পড়তে গিয়ে কাজ নেই। বরং গোলদিঘির পাড়ে একটা বেঞ্চিতে বসে একটু চিন্তা করা যাক্।

পায়ে পায়ে হেঁটে মহাবোধি সোসাইটির উল্টোদিকের গেট দিয়ে গোলদিঘিতে ঢুকতে গিয়ে একটা চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার ওপারের একটা খাবারের দোকানে একটা গোলমাল হচ্ছে। চাকা লাগানো একধরনের ঠেলাগাড়িতে করে আজকাল চাওমিন, ফ্রেঞ্চটোস্ট, এগরোল বিক্রি হয়, এটা সেই ধরনের দোকান। গিঁট দিয়ে লুঙ্গি পরা, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, কালো মুশ্‌কো চেহারার দোকানদার রোগা প্যাংলা চেহারার ছেঁড়া জামা পরা একটা দশ বারো বছরের ছেলেকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে। ছেলেটার চেহারা দেখলে মনে হয় ফুটপাতের বাসিন্দা। মজা দেখে চারদিকে বেশ একটা জমাট ভিড় জমে উঠেছে। কিন্তু লোকটাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না। বিনা পয়সায় মজা যতক্ষণ চলে, ততক্ষণই লাভ।

অমল এগিয়ে গিয়ে ভিড়-এর একটু বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে জিজ্ঞেস করল,—কী হয়েছে এখানে? মারছে কেন ছেলেটাকে?

উত্তরে লোকটা বলল,—বেশ করছে। এই ধরনের ছেলেপুলেকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া উচিত। কি করেছে জানো? ওই যে পাঁউরুটি সাজানো আছে দেখছ? ওখান থেকে দুটো রুটি চুরি করে পালাচ্ছিল হারামজাদা। অবশ্য ধরাও পড়ে গিয়েছে। এখন থেকে কঠিন শাস্তি না দিলে এরা তো বড় হয়ে ডাকাতি করবে—!

অমলের মনটা প্রথমে বিষণ্ণ, পরে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বা রে! ছেলেটা বুঝি চুরি করতে ভালবাসে বলে চুরি করেছে? দেখেই তো বোঝা যায় ও খুব গরীব, হয়তো আজ সারাদিন খেতে পায়নি। হয়তো ওর বাবা-মা নেই। খিদের জ্বালায় রুটি চুরি করেছে বলে এমন করে মারবে?

হঠাৎ অমল ঠিক করে ফেলল, এখানে সে তার নবলব্ধ শক্তি প্রয়োগ করে দেখবে। সে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে দোকানের মালিকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে লোকটাকে জোরে একটা ধাক্কা দিল। লোকটা আর একখানা চড় কষবার জন্যে হাত তুলেছিল, হঠাৎই কেমন যেন বেসামাল হয়ে পেছন দিকে খানিকটা ছিট্‌কে গেল। দোকানদারের মুখে প্রথমে একটু না-বোঝা বিস্ময়ের ভাব। তারপরেই সে হুঙ্কার দিয়ে বলল,—দেখলেন মশাই আপনারা সবাই, ব্যাটা আমাকে ধাক্কা দিল! এতবড় সাহস! আজকে তোকে আমি—

জনতার মতিগতি কখন যে কোনদিকে যায় বোঝা মুশকিল। এতক্ষণ যারা দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়ে একটি অসহায় দরিদ্র ছেলের নির্যাতন উপভোগ করছিল, এখন তারাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—না, না, ও মোটেই আপনাকে ধাক্কা দেয় নি!

এমন কি যে লোকটা অমলের প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটার মার খাওয়াই উচিত ছিল বলেছিল, সেও এখন জোর গলায় বলল,—কী বলছ তুমি? ওর ওই রোগা চেহারা, ও তোমাকে ধাক্কা দেবে কি?

অমল খুব মজা পেয়ে গেছে। কেউ বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা আসলে সে-ই ঘটাচ্ছে।

সৎ কাজে একটু আধটু লুকানো শক্তি প্রয়োগ করতে বাধা কি! দোকানদারকে লক্ষ্য করে সে আর একখানা ইচ্ছে-বুলেট ছুঁড়ল। দোকানদার ফের এক ধাক্কায় পিছিয়ে গেল কিছুটা। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চোখে জনতার দিকে তাকিয়ে সে বলল—দেখলেন তো! আবার ধাক্কা দিল।

জনতা এবার পাল্টা হুংকার দিয়ে উঠলো—কক্ষনো নয়! ও তো ওই কতদূরে দাঁড়িয়ে আছে। ও ধাক্কা মারবে কি করে?

লোকটা মিথ্যে কথা বলছে ভেবেই হোক, বা ছেলেটার জন্যে সহানুভূতি জাগার জন্যেই হোক, এবার জনতার মধ্যে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। ভাবটা এমন, গরীব ছেলে, ক্ষিদে পেয়েছে তাই নিয়েছে। একটা রুটির কতই বা দাম? তাই বলে রোগা ছেলেটাকে অমন করে মারা কি উচিত?

একজন লোক যতই নিষ্ঠুর বা শক্তিশালী হোক না কেন, একদল মানুষের কাছে তাকে মাথা নিচু করতেই হয়। গজগজ করতে করতে দোকানদার ফিরে গেল নিজের কাজে। জনতাও একটু একটু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। অমল মনে মনে ঠিক করে ফেলল, তার এই শক্তির কথা সে কাউকে জানাবে না। বরং চেষ্টা করবে যদি এটাকে আরও বাড়ানো যায়। বড় হয়ে সে চেষ্টা করবে এই শক্তি দিয়ে পৃথিবীর বড় বড় সমস্যা মেটাবার। এ তো একটা চুনোপুঁটি মানুষ। এর চেয়ে বড় বড় দোকানদার, কিংবা যারা বড় বড় ব্যবসা করে, বা দেশ চালায়, নিজেদের স্বার্থে মানুষের ক্ষতি করে, তাদের সে দেখে নেবে।

কিছুদূর হেঁটে এসে পিছনে তাকিয়ে এগরোল বানানোয় ব্যস্ত দোকানদারটাকে তাক করে একখানা জবরদস্ত রকমের ইচ্ছে-বুলেট ছুঁড়লো। ফের অদৃশ্য ধাক্কা খেয়ে পাংশুমুখে লোকটা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আজ রাত্তিরে নিশ্চয় ওর ঘুম হবে না।

গোলদিঘিতে ঢুকে বসবার জন্যে একটু নিরালা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে অমল দেখল একটা ঝোপের পাশে লুকিয়ে বসে রোগা ছেলেটা পাঁউরুটি খাচ্ছে।

ভাগশেষ

প্রহ্লাদ মাছওয়ালার দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াল নরেন। কাটাপোনা, চারাপোনা, খোকা ইলিশ, ম্যাকারেল ইত্যাদি গেরস্থপোষা আটপৌরে মাছের পাশে একদিকে কলাপাতার ওপর যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে আট-দশটা মাঝারি সাইজের গলদা চিংড়ি। খুব বড় নয়, আবার একেবারে ছোটও নয়, দেখলে লোভ হয়, আবার ভয়ও হয়। সে নিজে গলদা চিংড়ি যে খুব পছন্দ করে এমন নয়, বস্তুত সে মাছ জিনিসটাই বিশেষ ভালবাসে না। কিন্তু কমলা মাছের ভক্ত, ছেলেরাও। গোটাছয়েক চিংড়ি নিয়ে বাড়িতে ঢুকলে উৎসব শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু—

কিন্তুটাই গোলমেলে। পৃথিবীর অন্য সবকিছুর মতই এখানেও সাধ আর সাধ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কত দাম চাইবে প্রহ্লাদ? দুশো টাকা কিলো? আড়াইশো? নাঃ, অত চাইবে না বোধহয়, ততবড় মাছ নয়। নরেন কি একবার জিজ্ঞেস করবে? কিন্তু দরাদরি করবার পর নিতে না পারলে নিজেকে খুব ছোট লাগে, মনে হয় বাজারসুদ্ধ লোক বুঝি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

প্রহ্লাদ বলল—মাছ নেবেন মাস্টারমশাই? ম্যাকারেলটা টাটকা আছে—

নরেনের দৌড় চারাপোনা বা ম্যাকারেল অবধি, কোনোদিন শখ করে কাটা রুই বা ইলিশ। তবে সে কালেভদ্রে। সাহস করে সে জিজ্ঞেস করল—চিংড়িগুলো বেশ টাটকা। কত করে নিচ্ছ?

প্রহ্লাদ একটু অবাক হয়ে তাকাল, তারপর বলল—একদম টাটকা, মোকামের মাল না বাবু, আজ সকালে মাধবপুরের ভেড়ি থেকে ধরা। দাম তো নিচ্ছি তিনশো পঁচিশ, তবে আপনার কথা আলাদা। আপনি পুরোপুরি তিনশো দেবেন। দেব?

নরেনের গলা শুকিয়ে এসেছে। সে বলল—না, থাক।

—সব মিলিয়ে কিলোখানেকও হবে না মাস্টারমশাই, নিয়ে যান। আজকাল তো চিংড়ি প্রায় আসেই না। দিয়ে দিই?

দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়েছে প্রহ্লাদ, কলাপাতা থেকে মাছ তুলে পাল্লায় রাখছে। ব্যস্ত হয়ে নরেন বলল—না প্রহ্লাদ, আজ এমনিই—মানে—

সে বলতে যাচ্ছিল—আজ আমাদের বাড়িতে পুজো আছে, নিরিমিষ খেতে হয়। আজ মাছ নেব না—

কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। এখনো। সে যাহোক কি একটা অজুহাত দেখিয়ে ফিরে চলে আসছিল, পেছন থেকে প্রহ্লাদ ডাকল—মাস্টারমশাই!

নরেন ঘুরে দাঁড়াল। প্রহ্লাদ ডাকছে—শুনে যান, ও মাস্টারমশাই—

নরেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—কি?

মাছগুলো পাল্লায় ওঠাতে ওঠাতে প্রহ্লাদ বলল—নিয়ে যান। দুশ চল্লিশ টাকা কেনা দাম, তাই দেবেন। এখন দিতে হবে না, অত টাকা নিয়ে কে আর বাজারে আসে। পরে যখন হোক দেবেন। নিন, ধরুন—ঠিক আটশো গ্রাম আছে—

প্লাস্টিকের ব্যাগে মাছগুলো যত্ন করে বেঁধে দিচ্ছে প্রহ্লাদ। নরেন বলল—তুমি মানুষটা ভাল প্রহ্লাদ, এখনো পাথুরে ব্যবসাদার হয়ে যাওনি—

—না মাস্টারমশাই, সবার সঙ্গে কি আর এমন করি? না, তাই করলে চলে?

—তা হলে আমার সঙ্গে করলে কেন? আমার সঙ্গে কিসের খাতির?

—আজ্ঞে, আপনিও খুব ভাল লোক।

নরেন একটু হেসে বলল—কি করে জানলে? আমার সঙ্গে কতটুকু মিশেছ তুমি?

—আমার ছেলে বলেছে মাস্টারমশাই, শিবদুলাল—আপনার ছাত্র। বলেছে আপনি নাকি ভাল করে পড়ান, অন্যদের মত ইস্কুলের পরে বাড়ি গিয়ে প্রাইভেটে পড়বার জন্য চাপ দেন না।

নরেন লজ্জা পেয়ে বলল—থাক প্রহ্লাদ, ও কথা বাদ দাও। সবাই ভাল—

প্যাকেটটা বেঁধে প্রহ্লাদ বলল—ব্যাগটা খুলুন, ভরে নিন। দাম আস্তেব্যস্তে দিলেই হবে, তাড়াহুড়ো নেই কিছু—

চটপট বাজার সেরে ফেলল নরেন। গলদা চিংড়ি কেনার পর আর পুঁইশাক লাউ ঝিঙে বা পাতিলেবু কেনবার মেজাজ থাকে না। তাছাড়া বাড়ি গিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে বাজার ঢালবার পর কমলার উজ্জ্বল মুখ সে এখনই দেখতে পাচ্ছে। আর দেরি করা যায় না।

প্রপিতামহের আমলের পুরনো বিবাট বাড়ি। পুজোর দালান, দেউড়ি, বৈঠকখানা পার হয়ে বড় উঠোন। তারপরে ভেতর বাড়ি। একতলা দোতলা মিলিয়ে পনেরো-ষোলখানা

ঘর। কিন্তু বেশিরভাগ ঘরই বসবাসের যোগ্য নয়। ছাদ দিয়ে জল পড়ে, কার্নিশে বিশাল বটগাছ, তার ঝুরি নামবার বয়স হল প্রায়। দেয়ালের পলস্তারা খসে পড়ছে। ঠাকুরবাড়ির দু-তিনটি ঘরের ছাদ ভেঙে পড়বার উপক্রম, বাঁশের খুঁটির ঠেকা দিয়ে কোনোমতে সামলানো আছে। এতগুলো ঘর, নরেনের প্রয়োজন মাত্র দুটো কি তিনটে। বাকিগুলো ভাড়া দিলে সংসারের অনেকখানি সুরাহা হয়। কিন্তু এই অবস্থায় তো কেউ ভাড়া নেবে না, আগে সারিয়ে দিতে হবে। পয়সা কোথায় সারাবার? বাপ-ঠাকুরদা সস্তার আমলে মনের আনন্দে বিশাল বাড়ি করে গিয়েছেন। তাঁরা কি জানতেন তিনপুরুষ পরে এমন দুর্দিন আসছে?

রান্নাঘরে বসে ফ্যান গালবার জন্য ভাতের হাঁড়ি উপুড় করে রাখছিল কমলা। স্বামীকে দেখে বলল—হল বাজার? কি কি আনলে? এ কি! থলে তো একেবারে হাল্‌কা, বাজার করো নি?

—করেছি। খুলেই দেখো না। আজ শুধু মাছ আর ভাত—

দরজার পাল্লায় একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে নরেন স্ত্রীর হাসিমুখ দেখতে পেল। মাছগুলো প্যাকেট থেকে মেঝেতে ঢেলে সে বিস্মিত আনন্দে তাকিয়ে আছে। আহা, রোজ যদি সে বাজার করে বৌকে এমন খুশি করতে পারত!

—ওমা! আজ বাজারে উঠেছে বুঝি? বেশ সাইজ তো, আজকাল এমন সাইজের গলদা তো দেখাই যায় না! কত করে নিলো? মাসের শেষে হঠাৎ এত খরচ করলে যে?

—দাম জেনে তোমার কি হবে? খুশি হয়েছ তো? যাও, ভাল করে রান্না করো দেখি। কি করবে?

—আধমালা নারকেল আছে। মালাইকারি করি, কি বলো? আর ঠ্যাংগুলো দিয়ে ঝালচচ্চড়ি—

—ছেলেরা কোথায়? ওদের ডেকে দেখাও, আনন্দ পাবে—

—বেরিয়েছে সব কোথায়। আসুক, দেখাব এখন। চা খাবে একটু?

চায়ের প্রস্তাবটা আনন্দের অভিব্যক্তি, এ সময় নরেন চা খায় না কমলা জানে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু কিছু বোঝাপড়া থাকে যা সম্পূর্ণ নীরব, দীর্ঘ একত্রবাসে একটা মানসিক সংযোগ তৈরি হয়ে যায়। সেটা বুঝে নরেন বলল—চা? করো না একটু, খাওয়া যাক—

কিছুক্ষণ পরে চায়ের কাপ হাতে কমলা এসে দাঁড়াল। বারান্দায় রাখা শতরঞ্চি ঢাকা তক্তাপোশে বসে খবরের কাগজ দেখছিল নরেন। আজ রবিবার, ইস্কুলের তাড়া নেই। নরেন বলল—বোস না, তুমিও খাও একটু—

—আর করিনি, তোমার জন্যই এক কাপ বানিয়েছি।

—আমার থেকেই খাও। তুমি অর্ধেক, আমি অর্ধেক। বোসই না—

নরেন একচুমুক, কমলা একচুমুক করে চা খাওয়া হল। ছেলেরা বাড়ি নেই। প্রৌঢ়ত্বের পথে অগ্রসর দম্পতির একটু গোপন ভাব বিনিময়। কমলা প্রত্যেকবারই চুমুক দিয়ে স্বামীর হাতে কাপ ফেরত দেওয়ার সময় চোখে চোখে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রের হাসি হাসছিল। কিছুই না হয়তো, এক কাপ চা দুজনে ভাগ করে খাওয়া। তবু এই একটা জীবনের ছোট্ট আনন্দ।

কাপ নিয়ে চলে যেতে যেতে কমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—ওঃ তোমার সেই জিতেন নায়েক এসেছিল। তুমি বাজারে গিয়েছ শুনে বলল আবার ঘণ্টাখানেক পরে আসবে—

নরেন ব্যস্ত হয়ে বলল—ঘণ্টাখানেক? তার মানে তো—

এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো লোকটাকে এড়ানো যায়। কিছুক্ষণ কোনো বন্ধুর বাড়ি আড্ডা দিয়ে খাওয়ার আগে বাড়ি ঢুকলেই হবে। একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে চটি পরে যেই রওনা দিয়েছে নরেন, অমনি বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। নাঃ, নিশ্চয় অন্য কেউ। ছেলেরা ফিরেছে, কিংবা ধোপা-বৌ কাপড় নিতে এসেছে। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একঘণ্টা পরেই কি জিতেন আসবে?

দুরু দুরু বুকে দরজা খুলল নরেন।

জিতেন নায়েক!

—আরে, কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি নরেনদা? আমি অলরেডি একবার এসে ঘুরে গিয়েছি। বৌদি বলেছেন তো? একটু কথা ছিল—

বিপন্ন মুখে নরেন বলল—এসো জিতেন। না, কোথাও যাচ্ছিলাম না। এই তো এলাম বাজার থেকে। এসো, বোসো।

বারান্দার তক্তাপোশটা সামান্য মচমচ করে। জিতেন সাবধানে বসল। তার পরনে ফুল আঁকা কাপড়ের শার্ট আর জিনসের প্যান্ট। শার্টের বুকপকেটের ওপর লেখা 'ব্রুট', প্যান্টের কোমরের কাছে চামড়ার তাপ্পির ওপর লেখা 'স্যাভেজ', পায়ে নর্থ স্টার জুতো। তার চোখেমুখে ভাবভঙ্গিতে সফল মানুষের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। কথা বলছে কাঁধ নাচিয়ে, মাঝে মাঝেই বলছে 'নো প্রব্লেম' কিংবা 'ওকে', গন্ধওয়ালা রুমাল বের করে মুখ মুছছে। এমন লোকের কাছে কিছুক্ষণ বসবার পর নিজেকে কেমন ছোট ছোট লাগতে থাকে।

জিতেন বলল—তারপর নরেনদা? কিছু ঠিক করলেন?

আমতা আমতা করে নরেন বলল—না, মানে—এখনো ভেবে উঠতে পারিনি। আর কিছুদিন—

—ভাবার কি আছে বলুন তো? আমার প্রস্তাবের প্র্যাকটিক্যাল দিকটা বিবেচনা করুন। এই বাড়ির যা অবস্থা তাতে মোটামুটিরকম মেরামত করতেও আপনার কমপক্ষে সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকা খরচ হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা যা, বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, তাতে এত টাকা ক্যাশ বের করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে আমার কাছ থেকে নগদে চার লাখ টাকা নিন, দেড় লাখের রসিদ সই করলেই হবে। আট থেকে দশ মাস অন্য কোথাও বাস করুন, আমিই বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি। কটা ঘর লাগবে, দুটো? তিনটে? তার ভাড়াও নাহয় আমিই দেব। এবার এই জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে তাতে একখানা বড় ফ্ল্যাট দিচ্ছি আপনাকে। সব লিখিত পড়িত, নো মুখের কথা। ওকে?

নরেন সেই শ্রেণীর লোক যারা মুখের ওপরে কাউকে 'না' বলতে পারে না, ফলে তাদের জীবনে নানা সমস্যা এসে হাজির হয়। সে বলল—আচ্ছা, আর একটু ভাবি। সামনের হপ্তায় বরং—

—বেশ তো। এতদিন অপেক্ষা করলাম, আর এক সপ্তাহে কি এসে যাবে? তবে কি জানেন নরেনদা, এখন এইসব বড় বাড়ির যুগ চলে গিয়েছে। এখন হচ্ছে ফ্ল্যাটের যুগ। লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, তাদের থাকার জায়গা চাই। ফ্যামিলি ভাগ হয়ে যাচ্ছে, বাবা-মা, ছেলে-বৌ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এদের জন্য ফ্ল্যাটের চাহিদা বেড়েই চলেছে। এই চাপ বেশিদিন নিতে পারবেন না, চারতলা কি পাঁচতলা বাড়ি এখানেই উঠবেই। অচেনা

কাউকে না দিয়ে আমাকে দিলেই তো ভাল হয়, তাই না? আমাকে আপনি ছোটবেলা থেকে দেখছেন--

ঠিকই। বছর পাঁচ-ছয় আগেও জিতেন গলির মোড়ে চায়ের দোকানে বসে সারাদিন উদ্দেশ্যহীন আড্ডা দিত। বিবর্ণ প্যান্ট, কলার ছেঁড়া শার্ট আর হাওয়াই চটি পরা জিতেনের চেহারা স্পষ্ট মনে পড়ে। হায়ার সেকেন্ডারিতে ইংরেজিতে ব্যাক পাওয়ার পর লেখাপড়া আর এগোয়নি। মাঝে কি একটা কনট্র্যাকটরির ফার্মে কিছুদিন কাজ করার সূত্রে জিতেনের উন্নতি আরম্ভ হল। এখন জিতেন মারুতি থাউজ্যান্ড চড়ে ঘোরে, বৈষয়িক কথাবার্তা বলে লাখের মাপকাঠিতে, যেমন নরেন বলে একশো কি হাজারের মাপে।

দুপুরে খাওয়ার সময় যেন একটা পারিবারিক উৎসবের আবহাওয়া। দুই ছেলে চিংড়ির ঠ্যাং চুষে চুষে খাচ্ছে। প্রথমবারের ভাত ফুরিয়ে এল, আবার ভাত নিয়ে তারা মালাইকারি খাবে। সুখাদ্য রোজই হয় না বটে, কিন্তু কমলার রান্নার হাত এখনো বজায় আছে। নরেন আজকাল আর বেশি খেতে পারে না, কিন্তু কমলা ভাল কিছু রাঁধলে সে ভারি খুশি হয়।

খাওয়াদাওয়ার পর একটা বই নিয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল নরেন। ঘুম ভাঙল কমলার ডাকে।—শুনছ, ওঠো, দেবু এসেছে। ওঠো—

ঘুমের আমেজ কাটিয়ে বিছানায় উঠে বসল নরেন, বলল—কোন দেবু? কুসুমপুরের?

—হ্যাঁ গো। অনেকক্ষণ এসেছে, তুমি শোয়ার পরেই। ও নিজেই বলল কাকাবাবুকে এখন ডাকবেন না, বিকেলে কথা বলব এখন—

—আমি শোয়ার পরেই এসেছে? খেয়ে এসেছিল কি? জিজ্ঞাসা করেছিলে? ও তো যা লাজুক, হয়তো বলবেই না—

কমলা হাসল। বলল—তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, আমি খাইয়ে দিয়েছি।

—ভাত ছিল? ডাল তরকারি?

—ও কুলিয়ে গিয়েছে। আমার দুখানা মাছ ছিল, একটা ওকে দিলাম। কি খুশি হয়ে খেলো যদি দেখতে—

নরেন কমলার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি খেয়েছ? সত্যি বলো—

কমলা হেসে বলল—যদি না-ই খেয়ে থাকি তো কি হয়েছে? একবেলা না খেয়ে থাকলে মানুষ মরে না। ভাত তো করেই নেওয়া যেত, অত বেলায় আর ইচ্ছে করল না। রাত্তিরে বরং মজা করে খাবো।

নরেন হাসল। কমলা বলল,—হাসছ যে?

—হাসছি তোমার বাবা-মায়ের কথা ভেবে।

—তার মানে?

—তাঁরা তোমার নাম রেখেছিলেন কমলা। সার্থক নাম। কমলা মানে লক্ষ্মী, জানো তো?

—আহা, ঢঙ। যাও, ছেলেটা বসে আছে বাইরের চৌকিতে।

বনগাঁ থেকে দত্তফুলিয়ার রাস্তায় কুসুমপুর একটি ছোট গ্রাম। নরেনের মামা নিঃসন্তান ছিলেন, মারা যাওয়ার সময় তিনি তাঁর সম্পত্তি পছন্দমত ভাগ করে দিয়ে যান। নরেনের ভাগে পড়েছিল কুসুমপুরের একটা আম-কাঁঠালের বাগান। নরেন আদৌ বৈষয়িক লোক নয়, জমিজমা দেখাশোনা করা তার কর্ম না। সে কয়েকবার কুসুমপুরে যাতায়াত করে

দেবুর বাবাকে খুঁজে বের করেছিল। গরিব লোক, কিন্তু সৎ। চমৎকার মিষ্টি কথাবার্তা বলে। বাগানটার তত্ত্বাবধান সে-ই করে, ফড়েদের কাছে জমা দেয়, টাকাকড়ি বুঝে নেয়। শতকরা চল্লিশ টাকা নরেনকে দিতে হবে এরকম একটা মৌখিক চুক্তি আছে বটে, কিন্তু সে টাকা নরেন কখনো চায় না। মরসুমের শেষে ফল পাড়ার সময়ে হয় নরেন গিয়ে কিছু আম-কাঁঠাল নিয়ে আসে, নয়তো দেবু বা তার বাবা পৌঁছে দিয়ে যায়। দেবু ছেলেটি ভাল, এখন সে বনগাঁ কলেজে বি. এ. পড়ে। মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশ ভাল ফল করেছিল। নিরক্ষর, গ্রাম্য পিতামাতার সন্তানের পক্ষে এটা গৌরবের বিষয়। ছেলেটা দাঁড়ালে ওদের আর কষ্ট থাকবে না।

আজ কেন এসেছে দেবু? এখন তো ফলপাকুড় পৌঁছে দেওয়ার সময় নয়।

বারান্দায় চৌকিতে বসে দেবু খবরের কাগজ পড়ছে। নরেনকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। তার পরনে খয়েরি রঙের প্যান্ট আর বাড়িতে কাচা সাদা জামা।

—ভাল আছেন কাকা?

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেবু। নরেন বলল—থাক, থাক, হয়েছে। বোসো। কেমন আছ তোমরা? হঠাৎ এ সময়ে?

নরেন চৌকির একদিকে বসল। দেবু লজ্জিতমুখে বলল—একটা খুব জরুরি দরকারে এলাম। আমার কিছু টাকার দরকার—

নরেন দেবুর দিকে তাকাল। যারা টাকা ধার চায়, বা কোনোরকম সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের চেহারায় একটা সলজ্জ সঙ্কোচ থাকে। দেবুও মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

নরেন একটু অবাক হল। এর আগে দেবু কিংবা তার বাবা কখনো টাকা ধার চায়নি। এই কি তবে শুরু? নিজে না এসে ছেলেকে পাঠাল কেন?

—টাকা কি হবে? কত টাকা? তোমার বাবা এলেন না কেন?

—বাবা জানেন না আমি এখানে এসেছি, জানলে আসতে দিতেন না। কিন্তু আমারও এমন দরকার—

—তোমার দরকার? বাবার নয়?

—না। আমার কলেজের মাইনে বাকি পড়েছে অনেক। সামনেই পরীক্ষা, ফিসও জোগাড় হয়নি। দিন সাতেকের মধ্যে সব টাকাটা জমা দিতে না পারলে আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। এমন কোনো আত্মীয় নেই যে, হঠাৎ এত টাকা বের করতে পারে। ভাবতে ভাবতে মনে হল আপনার কথা। আপনি যদি—

নরেন একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল—বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কত টাকা দরকার তোমার?

মনে মনে হিসেব করে দেবু বলল—বাকি মাইনে আর ফিস নিয়ে প্রায় সাড়ে চারশ টাকা—

—তোমার বাবার ব্যবসা কেমন চলছে? উনি দিতে পারবেন না টাকাটা?

দেবু সন্তর্পণে বসল চৌকির ওপাশে। বলল—বাবার কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। জানেন তো, আজকাল গরুর গাড়ির চল প্রায় উঠেই গিয়েছে। দু-একখানা যাও চলে তারা কেউ আর কাঠের চাকা লাগায় না, মোটরগাড়ির পুরনো রবারের চাকা লাগায়। তাতে খরচও কম, চলেও অনেকদিন। গত ছমাসে বাবা মাত্র দুখানা চাকা বানিয়েছেন, তার মধ্যে একখানা

বিক্রি হয়েছে, একখানা খদ্দের নেয়নি, পড়ে আছে।

নরেনের বুকের মধ্যে একটা বিষণ্ণ সুর বাজছে। যুগের বদল এমন সব সমস্যা নিয়ে আসছে যার কোনো প্রতিকার নেই। সত্যিই তো, কি করবে দেবুর বাবা? গরুর গাড়ি জিনিসটাই উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে, তার চাকা কে কিনবে?

নরেন বলল—ঠিক আছে। তুমি এখানে থাক আজ। এত বেলায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না। কাল টাকা দেব তোমাকে। দুপুরে খেয়ে যেও।

চুপ করে বসে আছে ছেলেটা, ওর চোখে জল।

নরেন উঠে কাছে গিয়ে দেবুর কাঁধে হাত রেখে বলল—মন খারাপ কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা নিশ্চয় অন্য কাজ খুঁজে নেবেন—

জলভরা চোখে তাকিয়ে দেবু বলল—বাবা তো অন্য কাজ জানেন না। তিন পুরুষ ধরে আমাদের বংশের এই ব্যবসা। বাবা এবার বসে যাবেন।

যুগের পরিবর্তনে একজনের পেশা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অমোঘভাবে। এর আর কি সান্ত্বনা হয়? একটু চুপ করে থেকে নরেন বলল—ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে—

সেদিন অনেক রাত্তিরে নরেন এসে বারান্দার চৌকিতে বসল। ঘরে কেমন যেন গরম লাগছে, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। একটু বসা যাক এখানে।

ওই যে উঠোন। ওই উঠোনে সে ছোটবেলায় খেলা করেছে। তার বাবাও। ওপাশের দরজা দিয়ে বেরুলেই পুজোর দালান। তার ইস্কুলে পড়ার সময় বাড়িতে শেষ দুর্গাপূজা হয়েছিল। তখনই অবশ্য অবস্থা পড়ে এসেছে। বাবার জেদে নমো নমো করে পুজো সারা হয়। আর হয়নি। ঠাকুরের সামনে শানের ওপর বসে ঠাকুমা অষ্টমীর দিন ফল কাটছিলেন, পেতলের বিশাল পরাতে একশো আটটা প্রদীপ জ্বালিয়ে সাজিয়ে রাখছিলেন। সব প্রদীপ নিঃশেষে নিভে গিয়েছে।

কত স্মৃতি, কত হাসি-গান-কান্নার ইতিহাস। একমাত্র তার কাছে ছাড়া যার কোনো মূল্য নেই। এবার ঘণ্টা বাজছে, প্রবল বাতাসের মুখে মুঠো খুলে ছেড়ে দিতে হবে সযত্নসঞ্চিত খড়কুটো। কে জানে আর নতুন করে কেউ কোথাও বাসা বাঁধবে কি না। জিতেনের কোনো দোষ নেই, ও জমিদারের পেয়াদা মাত্র। জমিদারের নাম মহাকাল। উদাসীন, নিষ্ঠুর, অপ্রতিহতগতি। নিজেকে তার রবি ঠাকুরের দুই বিঘা জমি-র উপেনের মত মনে হয়। সে এবং তার প্রতিবেশী এবং পৃথিবীর যেখানে যত ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বেঁচে থাকা মধ্যবিত্ত মানুষ আছে, যাদের বাঁচা নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাশালী আর পয়সাওয়ালা দৃশ্য-অদৃশ্য ভিন্নগোত্রীয় মানুষেরা, সবাই তাই। সবারই শান্তির ঘরে মাঝে মাঝে জমিদার এসে উঁকি দেয়, নামমাত্র দামে কিনে নেয় সাধের, আহ্লাদের দু বিঘে জমি।

ওদিকের ঘরে ঘুমের মধ্যে কি যেন বলছে দেবু। বাতাসে কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ।

কমলা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।—এখানে বসে যে? হঠাৎ দেখি বিছানা খালি—

নরেন সস্নেহে স্ত্রীর হাত ধরে বসায়। ম্লান জ্যোৎস্নায় প্রথম প্রণয়রাত্রির মধুগন্ধ। নরেন ঠিক করে ফেলেছে সে লড়বে, সে ছেড়ে দেবে না তার অধিকার। হারবে, কিন্তু লড়বে। যতদিন পারে।

অনেক, অনেকক্ষণ বসে থাকার পর নরেন বলল—চলো কমলা, ঘুমোতে যাই।

দোলনা

প্রদ্যুম্ন রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওষুধ কিনতে গেছে ফ্র্যাঙ্ক রস্-এ, গাড়িতে একা বসে জনস্রোত দেখছিলেন হৈমন্তী। শরীর ভাল যাচ্ছে না—ডাক্তার বলেছে সাবধানে থাকতে। প্রদ্যুম্ন ভাল ছেলে, মাকে যত্ন করে। শিবনাথ যখন মারা যান প্রদ্যুম্ন তখন তিন বছরের শিশু। সেই থেকে কঠিন দায়িত্বের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে বহন করে তিন বছরের শিশুকে আজ ছাব্বিশ বছরের করেছেন হৈমন্তী। প্রদ্যুম্ন তার প্রতিদানে হৈমন্তীর বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সন্তান অনেকের হয়—কিন্তু তাদের কজন একান্তই মায়ের? প্রদ্যুম্ন বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে বৃহত্তর অর্থে, গাড়ি কিনেছে, মাকে সুখী করেছে।

হৈমন্তী হাজার মুখের ভিড়ে অন্যমনে তাকিয়েছিলেন, চোখের সামনে অবিরত জ্বলছিল-নিভছিল রঙিন আলোর বিজ্ঞাপন। হঠাৎ গাড়ির দরজায় একজন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সের মানুষ এসে দাঁড়িয়ে স্বজনকে সম্বোধন করার স্বরে বলল—কাকিমা, চিনতে পারেন?

হৈমন্তী অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। পঞ্চান্ন বছরের ক্লান্ত মস্তিষ্ক মুখটিকে সঠিকভাবে সঠিক পটভূমিতে উপস্থাপন করতে পারছিল না।

—কে বাবা?

মানুষটির মুখ আরও নম্রমধুর হল—আরও ঘনিষ্ঠ।

—কাকিমা, আমি নরেন—মৌপাহাড়ীর নরেন—

মৌপাহাড়ী! নরেন! হৈমন্তীর মাথার মধ্যে যেন অনেক পুরনো ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে যাবার শব্দ। কোথায় যেন একটা বিরাট চাকা, যা কেবল এতদিন সামনেই ঘুরেছে, এবার পিছিয়ে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে পেছন দিকে। অনেকগুলো ধূসর পর্দা সরে গিয়ে সামনে যেন মৌপাহাড়ীতে তার শ্বশুরবাড়ির রোয়াক—বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে কি শিবনাথের পায়ের শব্দ? শোয়ার ঘরের কুলুঙ্গিতে এখনো কি কৌটোয় উপচে পড়ছে লক্ষ্মীর পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুর? কাঁপা কাঁপা হাতে সে মানুষটির হাত ধরলেন হৈমন্তী—বাবা নরেন, ভেতরে আয় গাড়ির, বোস।

শিবনাথ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে বলল—চট্ করে দশটা টাকা দাও, দই-এর বায়নাটা দিয়ে আসি। আজ না বললে আর দিতে পারবে না।

ফোড়ন দেওয়া তরকারীতে জল ঢেলে হৈমন্তী বলল—এই অবেলায় আর বেরুতে হবে না—একদম খেয়ে তারপর যেখানে হোক যাবে—

—তাহলেই হয়েছে। মেয়েমানুষের যত কাণ্ড। সোমবার অন্নপ্রাশন, আজ শনিবার। আজ বায়না না দিলে অত দই কি করে তারা দেবে?

হৈমন্তী বিচারালয়ে রায় দেওয়ার সুরে বলল—তা বলে না খেয়ে তোমাকে বেরুতে দিচ্ছিনে—

হতাশ শিবনাথ ঘরে এসে ছেলেকে আদর করতে লাগল—আমার প্রদ্যুম্ন, আমার পদু, আমার পুনু, আমার হনু—

বাইরে থেকে হৈমন্তী রাগতস্বরে বললে—ওকি আদরের ছিরি? আমার খোকনকে তুমি কক্ষনো অমন বিচ্ছিরি নামে ডাকতে পাবে না।

—ছেলে আমার না? শুধু তোমার?

—আমারই তো—.

—আচ্ছা এসো, দুজনে মিলে ওকে ডাকি। যার কাছে যাবার জন্য ও হাত বাড়াবে, ছেলে তার—

হৈমন্তী রেগে বলল—পারিনা বাপু তেতপ্পর বেলায় তোমার সঙ্গে সখের খেলা খেলতে—

শিবনাথ হেসে স্নান করতে গেল।

বাসন্তী রৌদ্রে উজ্জ্বল এক সুন্দর দিনে প্রদ্যুম্নর অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। সমস্ত মৌপাহাড়ীর লোক পাত পেড়ে খেয়ে গেল শিবনাথের বাড়ি। সবাই খুশি, সবাই খুব আপ্যায়িত। বাড়ির উঠোনে একটা আমের চারা পুঁতে দিয়েছিল শিবনাথ, বলেছিল—দেখো হৈমন্তী, এই শিশু বৃক্ষ তোমার খোকার সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে উঠবে। আজ থেকে তিরিশ বছর পরে এই গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাবে প্রদ্যুম্নর ছেলে, আমরা বুড়োবুড়ি বারান্দায় বসে দেখবো; তখন কি মনে পড়বে আজকের কথা?

সস্নেহে হৈমন্তীকে বুকের কাছে টেনে এনেছিল শিবনাথ।

নদীর ধার থেকে খোকাকে কোলে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে হৈমন্তী। পথের ধারে সোমবাবুর বাড়ি। বড় গরীব মানুষ সোমবাবু। রেলে সামান্য কি কাজ করেন। সংসার চলে কি চলে না। সোমবাবুর ভালমানুষ বৌ সমস্ত ঝক্কি নিজের ঘাড়ে নিয়ে সংসার চালিয়ে দেয় কোনোমতে। বৌটা রোগা, সারাবছরই ভুগছে একটা না একটা অসুখে। গতমাসে টাইফয়েড্ থেকে উঠে চেহারা যেন একেবারেই ভেঙে গেছে। ফর্সা, নতমুখী, নম্রস্বভাবা বৌটি কাউকে দোষ দেয়না। নিজেকে নীরবে ক্ষয় করে, নিজের রুগ্ণ স্বাস্থ্যের ইন্ধনে প্রজ্জ্বলিত রাখে সংসারের চুল্লী। ছেলে আছে একটা, নাম নরেন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস। সে বোধহয় রুগ্ণা, অসহায়া মায়ের দিকে তাকিয়ে বোঝে, দিতে দিতে মায়ের শরীরে আর কিছু নেই—মাও আর নেই বেশিদিন। কৈশোরের অবুঝ করুণায় মায়ের পাশে পাশে থাকে সর্বক্ষণ। বসে থাকে আঁচল ধরে মায়ের পাশে। সোমবাবুর বৌ বারান্দায় বসে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া সিদ্ধেশ্বরডুংরির ওপরে জ্বলজ্বলে তারাটিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আবিষ্কার করে চোখ দিয়ে কখন ঝরে পড়েছে দুফোঁটা জল। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে বলে—আমি মরে গেলে ঐ রকম একটা তারা হয়ে যাবো। ঐ তারাটা দেখছিস? ঐ রকম। হ্যাঁরে, আমি মরে গেলে আমাকে মনে পড়বে তোর?

চতুর্দিকে ঘনায়মান অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ভয়গুলো যেন কাছে এগিয়ে আসে আরও। নরেন মুখ লুকোয় মায়ের বুকে।

হৈমন্তীর রাস্তায় পড়ে সোমবাবুর বাড়ি। সোমবাবুর বৌ ডাকল—ও দিদি, কোথায় গিয়েছিলে? একটু শুনে যাও—

সোমবাবুদের বারান্দায় উঠতে উঠতে হৈমন্তীর বুকে হঠাৎ ধড়াস্ করে উঠল—এই যাঃ, সোমবাবুদের যে খোকার ভাতে নেমন্তন্ন করা হয়নি!

সোমবাবুর বৌ বলল—কোথায় গিয়েছিলে গো? নারেন, যা বাবা, কাকিমার জন্য একটা আসন নিয়ে আয়—

—কেমন আছো ভাই? দাদা কেমন?

লজ্জিত হৈমন্তী অস্পষ্টস্বরে কি একটা উত্তর দেয়।

—তোমাকে ডাকলাম ভাই একটা কারণে। খোকার জন্য একটা জামা তৈরি করে রেখেছিলাম দেবো বলে, তা তোমার তো আর দেখাই পাওয়া যায় না, তো দেবো কি! আজ নিয়ে যাও ভাই—দেখো তো খোকার গায়ে হয় কিনা!

দরিদ্র ঘরের সামান্য পুঁজি থেকে সযত্নে বাঁচানো এইটুকু সঞ্চয়। হৈমন্তীর বুকটা কেমন মুচড়ে উঠল। আহারে! গরীব বলে কেউ ওদের মানে না, ডাকে না সমাজের কোনো উৎসবে। বেচারী রুগ্ন মানুষ, কত কষ্টে তৈরি করে রেখেছিল জামাটা, ভেবেছিল হৈমন্তী কি আর তার খোকার ভাতে তাকে ডাকবে না! ছিঃ! ছিঃ! খুব অন্যায় হয়েছে হৈমন্তীর।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় সুন্দর সাদা এক জামা মেলে ধরলো সোমবাবুর বৌ। রুপোলী জরির কাজ করা তাতে। প্রদ্যুম্নকে কোলে নিয়ে জামাটা পরিয়ে দিলো।—বাঃ! কি সুন্দর লাগছে দ্যাখো খোকাকে! নরেন, দেখে যা; এই দ্যাখ তোর ছোট্ট ভাই!

হৈমন্তী বলল—আসছে রবিবার ভাই তুমি আমাদের ওখানে দুপুরে খাবে, কেমন? যাবে তো ভাই?

সোমবাবুর বৌ যেন কেমন সাদা হয়ে গেল—না! না! সেকি কথা ভাই? খোকাকে এইটুকু দিয়েছি বলে কি তুমি—না, না, এমনি আশীর্বাদ করি—খোকা তোমার কোল জুড়ে থাকুক—

হঠাৎ মুখ নামিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো সোমবাবুর ফর্সা, ভালমানুষ বৌ।

নরেন হেসে বলল—দেখেই চিনেছি, এ ঠিক কাকিমা। আমি এখন কাঠের ব্যবসা করছি কাকিমা। মৌপাহাড়ীতেই। ব্যবসার কাজে কোলকাতা এসেছিলাম। মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বড় হব—আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই কাকিমা, আজ আমার দশটা ট্রাক, প্রাইভেট গাড়ি, ছ-সাতটা জঙ্গল শালের। কিন্তু আসল ব্যাপারে যে ফাঁকি, কার জন্য করলাম এসব?

ফিস্ ফিস্ করে হৈমন্তী বললেন—তোর মা?

মাথা নিচু করে নরেন বলল—নেই—

গাড়ির হ্যান্ডেল ধরে বিস্মিত প্রদ্যুম্ন বলছে—ইনি কে মা?

হৈমন্তীর মাথার ভেতরে কেবলই উল্‌টে যাচ্ছে অনেক পুরনো ক্যালেন্ডারের পাতা। জনসমুদ্রের ঢেউ মিলিয়ে গিয়ে, হতাশার ধূসর পর্দা সরে গিয়ে, তার ওপরে ফুটে উঠছে একটি ছাব্বিশ বছরের যুবক আমগাছ। তার ডালে দুলছে দোলনা—দুলছে সামনে-পেছনে।

আবার তারানাথ

এক একদিন তারানাথকে পাণ্ডিত্যে পায়।

দিনটা বর্ষার। আর মেঘলা আকাশ দেখলেই কিশোরী আর আমি কীসের যেন আকর্ষণে তারানাথের বাড়ি গিয়ে হাজির হই। আমাদের এই প্রাত্যহিক নিতান্ত পরিচিত জগতটার বাইরে এক আশ্চর্য দুনিয়ার কথা সে আমাদের শোনায়, যেখানে সম্ভাব্যতা এবং অসম্ভাব্যতার মাঝখানে সীমারেখাটা খুব অস্পষ্ট, দেখা যায় কি যায় না। আলাপের প্রথম দিকে আমি আর কিশোরী আড়ালে হাসাহাসি করেছি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারানাথের এমন কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা দেখেছি যার পরে অবিশ্বাস জীইয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আজও তেমন এক ঘটনা ঘটল।

তারানাথের বাইরের ঘরে বসে আড্ডা হচ্ছে। চারি, তারানাথের কন্যা, আজ কয়েকদিন হল বাপের বাড়ি এসেছে, থাকবে দিনদশেক। তাকে আমরা খুব ছোট দেখেছি, লেসের ডিজাইনের ছবি এনে দেওয়ার জন্য বায়না করত। চারি পুরনো দিনের মত তেল দিয়ে মাখা চাল-কড়াইভাজা আর চা দিয়ে গিয়েছে। চায়ে চুমুক দিয়ে তারানাথ তৃপ্তির সঙ্গে বলল—আঃ! তারপর সামনে রাখা পাসিং শো-র প্যাকেট থেকে একখানা সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়ে হাওয়ার দাপটে পরপর তিনটে দেশলাই কাঠি নষ্ট করে ফেলল। বাদলার সঙ্গে আজ জোর বাতাস দিচ্ছে, কাঠির মাথায় আগুন থাকছে না।

কিশোরী চিরকালই বেফাঁস কথা বলতে পটু। হঠাৎ সে বলে ফেলল—আপনি তো কতরকম প্রক্রিয়া জানেন, বাতাস থামিয়ে দিতে পারেন না? সিগারেটটা তাহলে ধরতো—

তন্ত্রমন্ত্র তারানাথের নিজের কর্মক্ষেত্র, বিশ্বাসের ক্ষেত্র। এসব নিয়ে রসিকতা তার একেবারেই পছন্দ নয়। সে কিশোরীর দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিপাত করে বলল—করা যায়ই তো! কতটুকু জানো তুমি এসবের?

—কি করে?

—সে তোমার মত মূর্খকে বলে লাভ কি? কামাখ্যাতন্ত্রে আছে—'ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যঃ প্রত্যয় কারকম্, যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোঽপি স্থিরায়তে।'

—ও তো একটা সংস্কৃত শ্লোকমাত্র। বাতাস থামান দেখি—

তারানাথ মাঝেমাঝে খুব রেগে যায় এবং সে রেগে গেলেই আমরা একটা না একটা অদ্ভুত কিছু দেখতে পাই। কিশোরীর কথা শুনে সে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল, এবং অনুচ্চস্বরে দ্রুত কি একটা দুর্বোধ্য মন্ত্র বলে গেল।

সে মুখ ফেরাতে কিশোরী বলল—কই, কিছু হল না তো?

তারানাথ বলল—সন্তান গর্ভে এলে পরের দিনই কি প্রসব হয়? অপেক্ষা করো।

আশ্চর্য ব্যাপার, মিনিটখানেকের মধ্যেই বাতাসের দাপট কমতে কমতে একদম স্থির হয়ে গেল। সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে প্রশান্তমুখে দেশলাই জ্বালল তারানাথ।

হয়তো কিছুই নয়, হয়তো তখন বাতাস এমনিতেই থেমে যেত, কিন্তু তারানাথের আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ আচরণ দেখলে একটু গা শিরশির না করে পারে না।

সিগারেট আধাআধি শেষ করে তারানাথ মৃদু হেসে বলল—বাড়বে। অপেক্ষা করো,

আবার জোর বাতাস উঠবে। এসব প্রক্রিয়াকে বলে স্তম্ভন, যখন-তখন বা অকারণে করতে নেই। নেহাৎ তোমরা আমাকে রাগিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা ঘটালে—

বললাম—কেন, করলে কি ক্ষতি হয়?

—হবে আবার কি? প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে যা ক্ষতি হতে পারে তাই হয়।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করল—স্তম্ভন প্রক্রিয়া দিয়ে আর কি কি করা যায়?

ছাইদানি হিসেবে ব্যবহৃত নারকেলের মালায় দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিয়ে তারানাথ বলল—সবই করা যায়। তন্ত্রের একটি ব্যাপক প্রক্রিয়ার নাম স্তম্ভন। ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারলে এর দ্বারা সবকিছু করা সম্ভব, সমস্ত জগৎ সাধকের হাতের মুঠোয় চলে আসে। এই যে তুমি এত কথা বলছ, স্তম্ভনের মাধ্যমে তোমার মুখ বন্ধ করা যায়। শুনবে? শোনো—'পুষ্যার্কে মধুবন্দাকং গৃহীত্বা প্রক্ষিপেদ্ বুধঃ, সভামধ্যে চ সর্বেষাং মুখস্তম্ভং প্রজাপতে।' বুঝলে?

কিশোরী ম্লান মুখে বলল—আজ্ঞে না।

—পুষ্যানক্ষত্রে সূর্যের অবস্থানকালে হাতে যষ্টিমধুর মূল নিয়ে সভার ভেতর নিক্ষেপ করলে সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। সংস্কৃত শেখো, একটু সংস্কৃত শেখো।

—কিন্তু এ তো খুব সহজ কাজ। যষ্টিমধু মুদিখানাতেই পাওয়া যায়, আর পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য কখন থাকবে সেটা পঞ্জিকা দেখে যে কেউ বলতে পারে, তাহলে সবাই কেন চেষ্টা করে দেখে না?

তারানাথ বলল—আসল ব্যাপারটাই তুমি ভুলে যাচ্ছ। এই সমস্ত প্রক্রিয়াই তোমাকে করতে হবে একটি গোপন বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে। সে মন্ত্র গুরু তোমাকে দেবেন। এজন্যই উপযুক্ত গুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে তন্ত্রসাধনা করা যায় না। তা নইলে তো সবাই যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াত। যাও না, কোনো মেয়েকে আকর্ষণ করবার জন্য কোঁচবকের বাঁদিকের ডানার পালক হাতে নিয়ে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্তিরে লোকবসতির বাইরে নিমগাছের তলায় বসে দশ হাজার বার জপ করো—'হ্রীং কালিকাটয় বিদ্মহে আকর্ষিণ্যে ধীমহি তন্নঃ কালিকা প্রচোদয়াৎ।' রাত্রির প্রথম প্রহর থেকে ব্রাহ্মমুহূর্তের মধ্যে জপ শেষ করতে হবে। ওই সময়ের ভেতর দশ হাজার বার জপ করতে যদিও বা পেরে ওঠো, তাতে কোনো লাভ হবে না। জপ শেষ করে নিশ্চিন্তমনে সে মেয়ের সঙ্গে রসের কথা বলতে যাও, তার বাড়ির লোক ডেকে সে তোমাকে ঠ্যাঙানি খাওয়াবে। কারণ গুরুর কাছে তোমার আসল শিক্ষা হয়নি। শুধু মন্ত্রে এসব হয় না। বশীকরণের আগমশাস্ত্রোক্ত পন্থা শুনবে? এই শোনো—'গৃহীত্বা মালতীপুষ্পং পট্টসূত্রেণ বর্তিকা—'

এবার আমি বললাম—যথেষ্ট হয়েছে ঠাকুরমশাই। আজ আর সংস্কৃত শুনলে একেবারে ক্ষেপে যাব। বরং একটা ভাল গল্প শোনান। মানে, আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া কাহিনী।

তারানাথ বলল—গল্প আর আসে না। মনে শান্তি না থাকলে কি আর আড্ডা জমে? জিনিসপত্রের দাম কি রকম হু হু করে বাড়ছে দেখেছ? আজ সকালে বাজারে গিয়েছিলাম, তা দেখলাম রোজকার খাওয়ার মত মাঝারি চাল চার আনা সের। সরষের তেল ন'আনা, আলু চার পয়সা, পটল ছ'পয়সা। একখানা গঙ্গার ইলিশ পছন্দ হয়েছিল, দাম বলল বারো আনা। ভেবে দেখো একবার। অমন একখানা ইলিশ পাঁচ-সাত বছর আগেও ঐ বাজারেই চার আনা সাড়ে চার আনায় কিনেছি। এ যুদ্ধ কবে থামবে বলতে পারো?

হিটলার বা চার্চিল আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন না, সুতরাং কিশোরী আর আমি চুপ করে থাকলাম।

তারানাথ বলল—মাছের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। অনেকরকম কাণ্ড জীবনে দেখেছি। বীরভূম-এর শ্মশানে মাতু পাগলীর সঙ্গ পেয়েছি, বরাকর নদীর চরে পোড়া শোলমাছের নৈবেদ্য দিয়ে সারারাত জপ করে মধুসুন্দরী দেবীর দেখা পেয়েছি, গুরুর আদেশে শবসাধনা পর্যন্ত করেছি। এসব গল্প তো কিছু কিছু বলেছি তোমাদের, কিন্তু একবার একটা কাণ্ড দেখেছিলাম যা সত্যিই অদ্ভুত।

কিশোরী বলল—মাছের বিষয়ে কি বলছিলেন যে?

—ঘটনাটা শোনো, তাহলে বুঝতে পারবে। এককালে আমার খুব মাছ ধরার নেশা ছিল তা তোমাদের বলেছি বোধ হয়। ভাল কোনো পুকুর বা দীঘির সন্ধান পেলে অমনি দৌড়োতাম। বড় বড় মাছ শিকারীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে চার বানাতাম, টোপ সংগ্রহ করতাম। বাড়ির বাইরের দিকে ছিল আমার শোয়ার ঘর। এ আমার গ্রামের পৈতৃক বাড়ির কথা বলছি। তখনো বিয়ে করিনি, কিন্তু সাধন-ভজনের জীবন শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্ষার শুরু থেকেই আমার সে ঘর একাঙ্গী, মেথির গুঁড়ো ইত্যাদির গন্ধে ভরপুর হয়ে থাকত। কৌটোয় কৌটোয় থাকত চিনির রসের গাদ, পিঁপড়ের ডিম, বোলতার চাক—এইসব। বড় মাছ ধরে খুব পেট ভরে খাব এই উদ্দেশ্য নিয়ে মাছ ধরতাম না, কোনো ভাল মাছ শিকারীই সেজন্য মাছ ধরে না। আসলে শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি, পুকুরের চারধারের পরিবেশ, এসবই হল মূল কথা। নইলে অত খেটে চারই বা বানাতাম কেন? গুরুর কাছে আকর্ষণী মন্ত্র শেখা ছিল, সে মন্ত্র উচ্চারণ করে মাছ ধরতে বসলে মাছেরা ছুটে এসে টোপ ছাড়াই খালি বড়শি গিলে খাবে। কালিকাতন্ত্রে আছে—মানুষা সুরদেবাশ্চ যক্ষোরগরাক্ষসাঃ, স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব আকৃষ্টা স্তে বরাঙ্গনে।

কাতর গলায় কিশোরী বলল—ঠাকুরমশাই! গল্পটা।

তারানাথ হেসে বলল—ও, তোমাদের দুজনেরই তো সংস্কৃতে ভীতি। যাক, গল্পটাই শোনো। সে বছর আমাদের গ্রামের একজন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ মাছ ধরিয়ের পরামর্শে চারের সব মশলা মেখেছিলাম সরষে ফুলের মধু দিয়ে। প্রবীণ ভদ্রলোক বলেছিলেন—বাবা তারানাথ, তোমাকে যা বলে দিলাম তাতে ছিপ ফেলে বসবার অবকাশ পাবে না, দলে দলে মাছ ছুটে আসবে। আর অনেক কিছু তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব। কাউকে এসব বলিনি কখনো। কিন্তু এবার বুঝতে পারছি বয়েস হয়ে আসছে, পৃথিবীতে খুব বেশিদিন আর বাকি নেই। আমার সব অভিজ্ঞতা কাউকে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বাজে লোককে বিদ্যা দিতে ভাল লাগে না। কিছুদিন ধরে লক্ষ করে দেখছি, তোমার মধ্যে বড় মাছ শিকারীর আসল গুণটা আছে। তোমাকেই সব দিয়ে যাব—

অবাক হয়ে বললাম—আসল গুণ? কি গুণ কাকা?

তিনি বললেন—নিস্পৃহতা। বড় মাছ ধরিয়ে একজন বড় শিল্পী, সে খাওয়ার জন্য মাছ ধরে না। মাছ ধরার আয়োজন আর আনন্দই তার কাছে বড়। সেদিন চৌধুরীদের পুকুরে তোমার ছিপে একটা সের দুয়েকের মৃগেল বেধেছিল। দেখলাম তুমি মুখ থেকে বড়শি খুলে মাছটাকে আবার জলে ছেড়ে দিলে। তুমি বুঝতে পারোনি, আমি দীঘির পারের জঙ্গলে বাসকপাতা তুলতে গিয়ে ব্যাপারটা দেখেছিলাম। খুব আনন্দ হল, বুঝলাম তুমি নিস্পৃহ, তোমার হবে—

লজ্জিত হয়ে বললাম—ও কিছু না কাকা। দেখলাম ছোট মাছ, এখনো অনেকদিন বাঁচবে, খামোকা ওর জীবনটা শেষ করি কেন?

—ওইটেই তো আসল কথা। অন্য কেউ হলে নাচতে নাচতে নিয়ে যেত।

গ্রাম সম্পর্কের সেই কাকা মাছধরা বিদ্যায় আমাকে বেশ পাকা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ বহুদিন হল তিনি দেহরক্ষা করেছেন, আমার প্রথম যৌবনেই। এখনো তাঁর কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা কেমন করে। ওসব মেজাজী, সৎ, মজাদার লোক আজকাল আর দেখা যায় না। যুগটাই একেবারে বদলে গেল হে! এখন সব ছোট মাপের মানুষ। ব্যাপ্তিহীনতা কলির লক্ষণ।

সরষেফুলের মধু জোগাড় হল হঠাৎই, বিশেষ চেষ্টা করতে হল না। আমাদের গ্রামে সে বছর দুজন মানুষ এল ছিটকাপড়, তুলো জমানো কম্বল, বাচ্চাদের রেডিমেড জামা এসব বিক্রি করতে। তারা বিহারের লোক। গ্রামে কেউ তাদের থাকার জায়গা দিতে রাজি হল না। মানুষের স্বভাব বড় অদ্ভুত। যেহেতু তাদের ভাষা ভাল বোঝা যায় না, যেহেতু তারা আটার লেচি দুহাতে থাবড়ে মোটা রুটি গড়ে শুধু আচার দিয়ে খেয়ে নেয়, যেহেতু তাদের পোশাক পরার ধরন অন্যরকম, কাজেই ধরে নেওয়া হল তারা ভাল লোক নয়। মোটঘাট নিয়ে বেচারারা বিপদে পড়ল।

আমার বাবা চিরদিনই পরোপকারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। খবরটা শুনে তিনি আমাকে বললেন—যা তো, লোকদুটোকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আয়। চাকরি বা ভিক্ষে না করে মাল কাঁধে বিদেশে ব্যবসা করতে বেরিয়েছে, তাদের তো সাহায্য করাই উচিত। যা, নিয়ে আয়—

লোকদুটো আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে ঢাকা দালানে আশ্রয় পেয়ে বর্তে গেল। এবার তাদের ব্যবসা জমে উঠল খুব। মানুষের নির্লজ্জতারও সীমা নেই। যাদের তারা আশ্রয় দেয়নি, বিদেশি বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের কাছ থেকেই সস্তায় কাপড়চোপড় কেনবার জন্য তারা ভিড় করে এল। ব্যবসায়ী দুজন আমাদের বাড়ির উঠোনেই কাঁঠালতলায় জিনিসপত্র নিয়ে বসতো।

একদিন বিকেলের দিকে দাঁড়িয়ে তাদের বেচাকেনা দেখছি, খদ্দেরপত্রও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। কারণ গ্রামে তো আর শহরের মত বিজলী বাতি নেই, সন্ধের থেকে নেহাৎ কাজ না থাকলে যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শিবু এসে হাজির। শিবুর বয়েস সতেরো-আঠারো হবে, গরু চরায়, জন খাটে। তাকে বলেছিলাম সরষেফুলের মধু জোগাড় করে দেবার জন্য। বললাম—কি রে? পাওয়া গেল?

—না ঠাকুর। যা পাচ্ছি তা সরষেফুলের বলে বিশ্বাস হয় না। আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, আপনাকে বাজে জিনিস দিয়ে কি নরকে যাব?

কি আর করি! বললাম—আচ্ছা, খোঁজ রাখ। পেলে বলিস—

বিহারী লোকদুজন আমাদের কথা শুনেছিল। তাদের মধ্যে যে বয়েসে বড় তার নাম দুধনাথ। সে উঠে এসে আমাকে বলল—কি হয়েছে বাবুজী?

—ও কিছু না। আমার একটা জিনিস দরকার, পাচ্ছি না। তাই—

—সরষেফুলের মধু?

আমি অবাক হয়ে বললাম—হ্যাঁ। তুমি বাংলা জানো নাকি?

দুধনাথ হেসে বলল—হ্যাঁ বাবু। অনেকদিন বাংলাদেশে ব্যবসা কবছি। তা বাবুজী,

আমি আপনাকে সরষেফুলের মধু দিতে পারি। আমার কাছে আছে। নেবেন?

—তা নিতে পারি। কিন্তু তুমি পেলে কোথায়?

—আমাদের বিহারের দেহাতে খুব সরষের চাষ হয়। ক্ষেতের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে যে মৌচাক হয় তাতে কেবল সরষে ফুলের মধুই থাকে। আমরা একটা বোতল ভর্তি করে সবসময় সঙ্গে রাখি। সর্দি-কাশি ছাড়াও অন্য অনেক অসুখে খুব কাজ দেয়। এই দেখুন—

মালের গাঁঠরীর ভেতর থেকে খুঁজে দুধনাথ একটা বোতল বের করল। উজ্জ্বল সোনালী রং-এর তরল পদার্থে বোতলটা ভর্তি। ছিপি খুলে এগিয়ে দিয়ে দুধনাথ বলল—শুঁকুন।

শুঁকলাম। উগ্র ঝাঁজের সঙ্গে মেশানো একটা মধুর গন্ধ।

দুধনাথ বলল—একটা শিশি আনুন বাবু, ঢেলে দিচ্ছি।

বাড়ির ভেতর থেকে একটা মাঝারি শিশি এনে দিতে তাতে ভর্তি করে মধু ঢেলে দিল দুধনাথ। বলল—নিন।

—এর জন্য কত দাম দেব ভাই?

—ভাই বললেন তো? ব্যস, ওতেই হয়ে গেল। দাম কিছু দিতে হবে না। তাছাড়া এ তো আমার বিক্রির জিনিস নয়।

আপত্তি করে বললাম—না না, তা কেন! মধু বেশ দামি জিনিস। বিনা পয়সায় তুমি দেবে কেন?

—বাবুজি, আপনি ছাড়া এ গ্রামের কেউ আমাদের আশ্রয় দেয়নি। সব জায়গায় কি ব্যবসা করা যায়?

দুধনাথ কিছুতেই দাম নিল না। তখনো জানিনা তার দেওয়া মধু মাছের চার বানানোর চেয়েও আমার অনেক বেশি জরুরি কাজে আসবে। ভাগ্যদেবতাই বোধহয় দুধনাথ আর তার ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নইলে যে ঘটনা আজ তোমাদের বলতে বসেছি সেটা ঘটতই না।

পুজোর আর মাসখানেক বাকি। মাঝেমাঝে মেঘ কেটে শরতের গভীর নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ছে, সঙ্গে উজ্জ্বল সোনালী রোদ্দুর। আবার মাঝেমাঝে চারদিক কালো করে ঘন মেঘ এসে দিনের বেলা অন্ধকার ঘনিয়ে তুলছে। এমনি এক ঘোর বর্ষার দিনে খবর পেলাম খলসেমারি গ্রামের চাটুজ্যেদের দীঘির। চাটুজ্যেরা সেই গ্রামের জমিদার। অন্তত দেড়শো বছরের পুরনো দীঘি। তাতে কিলবিল করছে মাছ। গায়ে শ্যাওলা জম্মে গেছে এমন বিশাল রুই-কাতলারও নাকি অভাব নেই। খবরটা দিল আমাদের গাঁয়েরই কালো হালদার। তারই মাধ্যমে যোগাযোগ করে একদিন মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম খলসেমারির দিকে।

চাটুজ্যেরা অতি অমায়িক ভদ্রলোক। বনেদি জমিদার বংশ, এখন আর আগের অবস্থা নেই বটে, কিন্তু পুরনো ঐতিহ্য আর আতিথেয়তা এখনো বংশগৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশাল তিনমহলা বাড়ি, ঠাকুরদালান। পূর্বের জাঁকজমক নেই, কিন্তু দুর্গোৎসব প্রতিবছর হয়ে চলেছে। বাড়ির কর্তা অবিনাশ চাটুজ্যে নিজে আমাকে দীঘির ধারে বসাতে নিয়ে গেলেন। জমিদারবাড়ির পর একটা বড় আমবাগান, তার পরেই দীঘি, দেখেই মনে বড় আনন্দ হল। নিথর কালো জল, একদিকে বাঁধানো ঘাট, বাকি তিনদিকে গাছপালা আর ঝোপজঙ্গল। একটা বর্ষাকোকিল ডাকছে কোথায় বসে। এমন নির্জন পরিবেশে মাছ ধরে

আনন্দ আছে।

বললাম—বাঃ, বেশ দীঘি। মাছ কি রকম? বড়শিতে ঠোকরায়?

অবিনাশ চাটুজ্যে বললেন—প্রচুর মাছ। প্রতিবছর বাড়ির কাজে কর্মে বা আত্মীয়দের মেয়ের বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনে জাল ফেলা হয়। আবার প্রতিবছরই বেশ কিছু মাছ ছাড়া হয়, যাতে পুকুর খালি না হয়ে যায়। কিন্তু—

অবিনাশবাবু চুপ করে গেলেন।

বললাম—কিন্তু কি?

—গতবছর থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি। এর মধ্যে প্রয়োজনে দুবার জাল ফেলতে হয়েছিল। দেখা গেল পুরনো বড় মাছ সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছে। নতুন যে মাছ ছাড়া হয়েছিল, তাদেরও অর্ধেকের খোঁজ নেই।

—এটা তেমন কোনো সমস্যা নয়। নিশ্চয় মাছ চুরি যাচ্ছে। বরং পাহারা বাড়িয়ে দিন, কড়া নজর রাখুন—

অবিনাশবাবু বললেন—চুরি যাচ্ছে বলে মনে হয় না। বাড়ির কাছে পুকুর, দিনে হোক রাতে হোক জাল ফেলে মাছ চুরি করতে গেলে ধরা পড়ে যাবেই। ছিপ দিয়ে আর কটা মাছ ধরবে? আর তাতে তো ধরা পড়ার সম্ভাবনা আরও বেশি।

—ভোঁদড় বা উদ্‌বেড়ালে খেয়ে যেতে পারে।

—তারাই বা কটা খাবে? তাছাড়া পাঁচ কি দশসেরি মাছ ভোঁদড়ে ধরবে না। ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। যাই হোক, আপনি বসে যান—

ঘাটের দিকে না বসে দীঘির উলটোদিকের কোনায় একটু ঝোপমত জায়গা দেখে বসলাম। মাথার ওপরে আম আর কাঁঠালের পাতায় বর্ষার ভেজা হাওয়া বেধে শিবশির শব্দ হচ্ছে। চারদিকে ঘেঁটু আসশেওড়া কালকাসুন্দে আর কচুর ঝাড়। মাঝে মাঝে বাতাস থেমে গিয়ে হালকা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নামছে। সঙ্গে ছাতা ছিল, একটা লাঠি মাটিতে পুঁতে ছাতা খুলে সেই লাঠির সঙ্গে বেঁধে দিলাম, ভেজার ভয় রইল না।

সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিয়ে টোপ গেঁথে পাড় থেকে দশ-বারো হাত দূরে বড়শি ছুঁড়ে দিলাম। তারপর প্রথমবার চার ছড়াতে যেতেই একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করলাম। চার জলে পড়তেই দীঘির জল হঠাৎ যেন কেমন একটু কেঁপে উঠল। আমি যা বলছি ভাল করে বুঝে দেখো, জলে কিছু ছুঁড়ে ফেললে জল সামান্য কাঁপেই, একটু ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ে। এ তা নয়। সমস্ত দীঘির জলই একসঙ্গে কেমন যেন কেঁপে উঠল। মানুষ শিউরে উঠলে যেমন হয়।

প্রথমে ঘটনাটাকে তেমন আমল দিইনি। ভেবেছিলাম হঠাৎ সামান্য বাতাস উঠে বুঝি ওইরকম হয়েছে। কয়েকখানা আসশেওড়ার ডাল ভেঙে নিয়ে সেগুলো বিছিয়ে গুছিয়ে বসলাম। চমৎকার মেঘান্ধকার দিনটা। মাথার ওপর গাছের পাতা থেকে বাতাসের ঝাপটায় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে গায়ে। পাশে কচুগাছের ডাঁটি বেয়ে একটা বেনে-বৌ পোকা উড়ছে। এমন পরিবেশে মনে বেশ শান্তি আর আনন্দ থাকা উচিত। মাছ ধরতে বসার প্রথমদিকে সেটা ছিলও। কিন্তু একটু পর থেকেই মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। মেঘে ঢাকা আকাশের জন্য পরিবেশ যতটা অন্ধকার হওয়া উচিত, তার চেয়েও যেন বেশি কালো হয়ে এসেছে। আমার সামান্য কিছু ক্ষমতা আছে এসব বোঝবার তোমরা জানো, মধুসুন্দরীদেবী আমাকে দান করেছিলেন। আমার মনে হল এই দীঘিটা,

দীঘির পাড়টা অশুভ কোনো কিছুর প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাতাসে কেমন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ পেতে শুরু করলাম।

কিশোরী বলল—কীসের গন্ধ? পচা বা ভ্যাপসা গন্ধ?

—না। সে তোমাদের ঠিক বোঝাতে পারবো না। পরিচিত ভাল বা খারাপ কোনো গন্ধের সঙ্গেই তার মিল নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল পরিবেশে কি যেন একটা ছোট্ট বদল ঘটেছে। চারদিকে তাকালাম। নাঃ, সবই তো ঠিক আছে। কেবল—

কেবল বর্ষাকোকিলটা আর ডাকছে না।

এই দীঘি এবং তার চারপাশে কোনো অশুভ প্রভাব ক্রিয়া করছে এবিষয়ে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। মহাডামর তন্ত্রে বলে অমানুষী কোনো অমঙ্গলজনক প্রভাব থেকে পশুপাখিরা দূরে থাকতে চায়। জায়গাটা যে ভাল নয়, নিজেদের সহজাত ক্ষমতা দিয়ে তারা সেটা মানুষের আগেই বুঝতে পারে।

এক্ষেত্রে যা করা উচিত তা করে রাখলাম। মহাডামর তন্ত্রের তৃতীয় পটল-এ সাধকের আত্মরক্ষার নিয়ম বর্ণিত আছে। মনে মনে দ্বাদশবার গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে তারপর আত্মরক্ষার জন্য ডামরতন্ত্রে উল্লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করে দেহবন্ধন করে নিলাম। এখানে যে অশুভ প্রভাবই কাজ করুক না কেন, সে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অবিনাশবাবু মিথ্যে কথা বলেননি, দীঘিতে সত্যিই প্রচুর মাছ। চারেরও গুণ আছে বলতে হবে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফাৎনা দুচারবার কেঁপে উঠে একেবারে নিতলি হয়ে গেল। তামাক ধরাতে যাচ্ছিলাম, হুঁকো কলকে ফেলে রেখে ছিপ চেপে ধরলাম। কর্‌কর্‌ শব্দ করে দ্রুতবেগে হুইল উল্টোদিকে ঘুরে যেতে লাগল। টান দেখে বুঝলাম অন্তত সাত কি আটসের ওজনের মাছ বড়শি গিলেছে। বড়শি মুখে নিয়ে মাছটা পুকুরের নানাদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল, আমিও খেলতে দিলাম। এসময়ে কখনো টান দিতে নেই, বা হুইল গোটাবার চেষ্টা করতে নেই। তেমন বড় মাছ হলে এক ঝটকায় বড়শি ছিঁড়ে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। ছোটাছুটি করবার সময় মাছটা একবার জলের ওপরে ঘাই দিল। বাঃ, বেশ বড় মাছ।

তারপরেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘাই দিয়ে মাছটা আবার ডুব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমার সুতো ঢিলে হয়ে গিয়েছে, ছিপে বা হুইলে আর কোনো টান নেই। অবাক হয়ে হুইল ঘুরিয়ে সুতোর ডগা কাছে এনে দেখি বড়শি ছেঁড়োনি, ফাতনাও ঠিক আছে। তাহলে মাছটা গেল কোথায়? বড় মাপের ভাল বড়শি, ও জিনিস মুখে নিয়ে অতক্ষণ ছোটাছুটি করায় বিঁধেছেও নিশ্চয় মোক্ষমভাবে। ঝট্‌কা দিলে ছিঁড়তে হয়তো পারে, কিন্তু খুলে যাবে না। তাহলে?

যাই হোক, আবার টোপ গেঁথে ছুঁড়ে দিলাম দীঘির জলে, আবার একমুঠো চারও ছড়িয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দীঘির জলে আবার সেই অদ্ভুত কাঁপন। এবার আর কাঁপন না বলে আলোড়ন কিম্বা আন্দোলনই বলা উচিত। সমস্ত দীঘি জুড়ে যেন একটা বিক্ষোভের ঢেউ উঠলো। খারাপ কাঁচওয়ালা চশমা পরে এদিক ওদিক তাকালে সব যেমন উঁচুনিচু আর ঢেউখেলানো লাগে, দীঘির জলও তেমনি দেখাতে লাগল। বাতাসে সেই গন্ধটা তীব্রতর হয়ে উঠল। এবার বড়শি ফেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তলিয়ে গেল ফাৎনা। সত্যি, মাছ আছে বটে এ দীঘিতে। শক্ত করে দুহাতে ধরে রইলাম ছিপগাছা। আগের মতই খেলতে লাগল এ মাছটাও।

এবার আমি শক্ত করে ছিপ ধরে আছি, যাতে হঠাৎ ঝটকা লেগে হাত থেকে ছিপ ফসকে না যায়। আহা, আগের অতবড় মাছটা পালিয়ে গেল!

একাগ্রমনে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারলাম চারদিকে অন্ধকার যেন আরও বেশি করে ঘনিয়ে এসেছে। আকাশ ঢাকা পড়েছে আরও গভীর কালো একখানা মেঘের চাদরে। বাতাস থেমে গিয়েছে। স্তব্ধ প্রকৃতি কি এক অনৈসর্গিক ঘটনার জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে রয়েছে।

হঠাৎই আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে পনেরো-কুড়ি হাত দূরে মাছটা একবার ভেসে উঠল। আর সেই সঙ্গে দুটো কালো, লোমশ, বীভৎস হাত জল থেকে উঠে এসে মাছটাকে ধরে ফেলল। আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি, আমার সামনেই হাতদুটো মাছটার মুখের থেকে বড়শি খুলে সেটাকে ছেড়ে দিল জলে। সুতো আবার ঢিলে হয়ে গেল।

সুতো গোটাবো কি, আমি তখন অবাক হয়ে দেখছি কাণ্ডখানা। মাছটা ছেড়ে দিয়ে হাতদুটো নিষ্ফল ক্রোধে বারবার মুঠো হতে আর খুলতে লাগল। সে হাতে বড় বড় বাঁকা নখ। মানুষের হাত সে নয়, পরিচিত কোনো পার্থিব প্রাণীরও নয়। এই দুনিয়াতে এমন অনেক প্রাণী বাস করে যারা অশুভ শক্তির প্রতীক। তাদের চোখে দেখা যায় না, যদি না তারা ইচ্ছে করে দেখা দেয়। মহাডামর তন্ত্রে এদের কথা আছে। এরা বুদ্ধিহীন, আবেগহীন, ভয়ানক নিষ্ঠুর। তেমনই কোনো এক জীব এসে বাসা বেঁধেছে এই দীঘির জলে। অবিনাশবাবুর মাছ চুরি যাবার কারণ এবার বুঝতে পারলাম। এই জীবটাই মাছ খেয়ে ফেলে।

অপার্থিব প্রাণীটা আমার ওপর রেগে গিয়েছে। আমার ধরা মাছ খুলে দিয়ে, নখওয়ালা হাত মুঠো করে সে সেই রাগ প্রকাশ করছে, কিন্তু দেহবন্ধন করা থাকায় আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না। রাগের কারণটাও ধরতে পারলাম। আমি তাকে আশ্রয়চ্যুত করতে চলেছি।

কিশোরী বলল—কিভাবে?

—সরষে ফুলের মধু দিয়ে মাখা চার প্রাণীটা সহ্য করতে পারছিল না। সরষে বা তার ফুলের মধু প্রেতবিতাড়নী কর্মে লাগে। দুধনাথ খাঁটি মধু দিয়েছিল ঠিকই। ভাবলাম সজ্জন, অতিথিবৎসল অবিনাশবাবুর একটা উপকার করে যাই। দীঘির চারদিকে ঘুরে মুঠো মুঠো চার ছড়িয়ে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের ভেতর থেকে একটা জমাট অন্ধকারের স্তূপের মত কি একটা জিনিস উঠে ঘন মেঘের ভেতর মিলিয়ে গেল।

বাতাস আবার বইতে শুরু করল, পরিবেশে ভেজা লতাপাতার স্বাভাবিক গন্ধ ফিরে এল। আমি আবার জমিয়ে মাছ ধরতে বসে গেলাম।

বর্ষাকোকিলটা আবার ডাকতে শুরু করেছে।

হারানো খেলনা

আকাশ বাড়ি ফিরে দেখল মা তখনো আসেন নি। মায়ের এরকম প্রায়ই দেরি হয়। তার মানে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে মুখার্জিদাদুর কাছ থেকে চাবি চেয়ে আনতে হবে। ইস্. বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। ওঠবার সময় জিজ্ঞাসা করে নিলেই হত মা ফিরেছেন কিনা। নইলে বইপত্তর নিয়ে কোথায় বসে থাকবে সে? খিদেও পেয়েছে বেশ। মিটিংয়ে আটকে গিয়ে থাকলে মায়ের ফেরার কোনো ঠিক নেই। মাসের মধ্যে চার-পাঁচদিন এমন হয়। আর বাবা তো রোজই রাত নটায় ফেরেন।

চাবি চেয়ে এনে দরজায় লাগিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে আকাশ শুনল ভেতরে ফোন বাজছে। ঘরে ঢুকে সোফার ওপর স্কুলের ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে বুককেসের পাশে আখরোট কাঠের টেবিলে রাখা ফোন থেকে রিসিভার তুলে কানে লাগাল আকাশ।

মায়ের ফোন। সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। হঠাৎ অফিসে মিটিং-এর নোটিশ দিয়েছে। মায়ের ফিরতে সন্ধে হবে। সে যেন খাবার খেয়ে নেয়।

মাখন লাগিয়ে চার টুকরো রুটি খেলো আকাশ। ফ্রিজে মিষ্টি রাখা থাকে, তার থেকে বেছে দুটো রসকদম্বও খেলো। তারপর কয়েকখানা গল্পের বই নিয়ে বুকের তলায় ফোমের বালিশ দিয়ে ডিভানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আজ মঙ্গলবার, টিউটোরিয়ালে পড়তে যেতে হবে না। তবে সন্ধেবেলা পড়তে বসতে হবে। কালকের হোমওয়ার্ক করে রাখতেই তো দু ঘণ্টা লাগবে।

কমিকস্ দুটো সে সরিয়ে রাখল। ভাল ভাল বই আগে শেষ করে লাভ কি? একটার নাম—মনস্টার ফ্রম দি ফোর্থ প্ল্যানেট, আর একটা হল 'রিচি রিচ্'। আঃ, কাল আর পরশু দারুণ কাটবে। আজ বাকিগুলো দেখা যাক।

বাকি চারটে বই-ই বাংলা। বাংলা বই পড়তে তার তত ভাল লাগে না। কেমন যেন জোলো জোলো মতন। থ্রি ইনভেস্টিগেটর্স সিরিজের নায়ক জুপিটাব জোনস্-এর মত একটাও চরিত্র আছে বাংলা বইয়ে? হার্ডি বয়েজদের মত? কিন্তু ইস্কুলের বন্ধু দেবাঞ্জন তাকে মাঝে মাঝেই দু-চারটে বাংলা বই ধরিয়ে দেয়, বলে—'পড়ে দেখ। খুব ভাল লাগবে।' তাছাড়া বাবাও প্রতিবছর কিছু বাংলা বই নিয়ম করে তাকে কিনে দেন। বাড়িতে তো কাচের বুককেসে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—এঁদের রচনাবলী রয়েছেই। কিন্তু বইয়ের সামনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানারকম ছোটখাটো হাতের কাজ সাজানো থাকার জন্য সে বই নামিয়ে দেখা যায় না। আকাশ মোটামুটি ধরে নিয়েছে ওগুলো সাজিয়ে রাখারই জন্য। বাবা বলেন বটে—'বাংলা ক্লাসিক পড়, বুঝলে? নইলে মাতৃভাষাটাও শিখতে পারবে না, আর সাহিত্যের বোধও জন্মাবে না', কিন্তু বাবা নিজে বইপত্র বড় একটা পড়বার সময় পাননা, অফিস থেকে ফাইল সঙ্গে আসে, অনেক রাত অবধি তিনি সে-সব দেখেন। বাড়িতে ইংরেজি খবরের কাগজ নেওয়া হয়। সে নিজে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, সেখানে বন্ধুদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলাই নিয়ম।

এই চারখানা বই গতসপ্তাহে বাবা তাকে এনে দিয়েছেন। বিশেষ করে দুটো বই সম্বন্ধে বলেছেন—এ দুটো বাংলা সাহিত্যের ল্যান্ডমার্ক। মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

দুটোই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। একটার নাম 'আম আঁটির ভেঁপু', অন্যটার 'চাঁদের পাহাড়'। আকাশ বিভূতিভূষণের নাম শুনেছে। সত্যজিৎ রায় এঁরই লেখা নিয়ে ফিলিম বানিয়েছিলেন। সেই অপু-দুর্গার গল্প। বইটার নাম 'পথের পাঁচালী'। একদিন রাত্তিরে টিভিতে দেখিয়েছিল। কিছুটা দেখার পর তার ঘুম পেয়ে যায়। একটা বাচ্চা ছেলে, তার চেয়েও ছোট, সে গ্রামে থাকে, পাঠশালায় পড়ে, তার বাবা গান আর নাটক লেখে—এ জিনিস রাত জেগে দেখবার কি আছে সে ভেবে পায় না। খালি বাঁশবন আর মাঠ, তার ওপর আবার সাদাকালো ফিলিম। 'আম আঁটির ভেঁপু' নাকি ওই বইখানারই ছোটদের সংস্করণ। 'চাঁদের পাহাড়' নামটা অবশ্য বেশ, অনেকটা সায়েন্স্ ফিকশনের মত। এ বইটা এখন থাক, পুজোর ছুটিতে পড়া যাবে। অন্য বইটা খুলে সে পড়তে শুরু করল। লেখাটা বেশ ভাল গড়গড় করে পড়া যায়, কিন্তু গল্পের সব জায়গা সে ঠিক বুঝতে পারে না। আকাশ কখনো গ্রাম দেখেনি, গ্রামের পরিবেশ কেমন তাও সে জানে না। নোনাফল কাকে বলে? কড়িখেলা ব্যাপারটাই বা কি? কড়ি তাদের বাড়িতে অনেকগুলো আছে, তার জন্মের আগে বাবা আর মা পুরীতে বেড়াতে গিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু তা দিয়ে খেলা হয় কি করে? গুরুমশায় মুদির দোকানে বসে পড়ান কেন? একবার গ্রামে বেড়াতে গেলে বেশ হয়, এসব সে জেনে আসতে পারবে।

মানুষের আশা ভাগ্যদেবতা সর্বদা পূর্ণ করেন না। কিন্তু আকাশের প্রার্থনা সফল হল। পুজোর ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ হবার কয়েকদিন আগে রাত্তিরে খাবার টেবিলে বসে বাবা বললেন—একটা মজার নেমন্তন্ন পেয়েছি, বুঝলে?

মা বললেন—মজার নেমন্তন্ন মানে?

—আমার ছোটবেলার এক বন্ধু—তার নাম রঞ্জিত, সে তাদের গ্রামের বাড়িতে পুজো দেখতে যাওয়ার জন্য বলছে। অনেকদিনের পুরনো পুজো। এখন অবস্থা পড়ে গিয়েছে, রঞ্জিতরাও তিন ভাই শহরে চাকরি করে, কেবল বড়ভাই দেশের বাড়িতে থেকে জমিজমা দেখাশুনো করেন। তবু পুজোটা এখনো হয়। আগের জাঁকজমক নেই, ভাইয়েরা মিলে কিছু কিছু টাকা দিয়ে বংশের ঐতিহ্যটা বজায় রাখার চেষ্টা আরকি। প্রত্যেক বছরই যেতে বলে। আমার আর হয়ে ওঠে না।

আকাশ ভেবেছিল মা বোধহয় যেতে চাইবেন না। কিন্তু মা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন—বেশ তো, চল, এবার বরং গ্রামের পুজোই দেখে আসা যাক। কোথায় রঞ্জিতবাবুর বাড়ি?

—খুব দূর নয়, কলকাতা থেকে শ-খানেক কিলোমিটারের মধ্যে। গ্রামের নাম এলাজানি। গাড়ি নিয়ে যাব ভাবছি, নইলে ট্রেন থেকে নেমে আবার বাস ধরতে হবে। কি বলো?

মা কিন্তু বললেন—না, আমরা ট্রেনে-বাসেই যাব। নইলে আর গ্রামে বেড়ানো কি হল?

পুজো এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের প্রাথমিক উৎসাহ অনেক কমে গেল। তার বন্ধুরা কত ভাল ভাল জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছে—তিরুপতি, কোবালম, এলিফ্যান্টা, খাজুরাহো। আর সে যাচ্ছে এলাজানি নামের একটা গ্রামে! বন্ধুরা শুনে বলবে কি!

রওনা দিয়ে কিন্তু তার মন ভাল হয়ে গেল। শেয়ালদা থেকে কয়েকটা স্টেশন ছাড়াবার পরই দুদিকে বড় বড় মাঠ। ট্রেনের ভিড়ও অনেক কমে গেল। ঘণ্টাখানেক বাদে ট্রেন

থেকে নেমে বাসস্ট্যান্ডে যাওয়া হল। যে বাসটা ছাড়বার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটায় ভিড় হয়ে গিয়েছে, বসবার জায়গা নেই। পরের বাস ছাড়বে আধঘণ্টা বাদে। বাবা তাতেই যাওয়া ঠিক করলেন। পরের বাসে জানালার ধারে বসবার জায়গা পাওয়া গেল। আকাশের বেশ মজা লাগছিল। বাস আবার এরকম হয় নাকি? রঙ চটা, হ্যান্ডেলগুলো মরচে ধরা, বডি এখানে-ওখানে তুবড়ে গিয়েছে, সিটের গদি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে নারকোলের ছোবড়া। চলবার সময় এত কাঁপে যে, মনে হয় এই বুঝি কলকব্জা সব খুলে পড়ে যাবে। তাদের স্কুলের বাস কত ঝকঝকে, লম্বা, লাক্সারি কোচ। মোটা, নরম গদি।

দেখতে দেখতে বাস ভর্তি হয়ে গেল। যাত্রীরা প্রায়ই সবাই গ্রাম্য লোক, কারো আবার খালি গা। চটের বস্তা, হ্যারিকেন, কাপড়ের পোঁটলা, গলায় দড়ি বাঁধা কাচের বোতল, কোলে কাজল-পরা বাচ্চা নিয়ে ডুরে শাড়ি পরা বৌ, এসব নিয়ে তারা বাসে উঠেছে।

রাস্তা সরু, হেলতে দুলতে চলেছে বাস। পথের ধারে মাঝে মাঝে গ্রাম, তারপর আবার মাঠ, আমবাগান, কাঁঠালবাগান। খোড়ো বাড়ির উঠোনে কাদের একটা কোমরে ঘুনসি পরা ন্যাংটো বাচ্চা মুখে আঙুল পুরে অবাক হয়ে তাদের বাসের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশে একটা সাদা ছাগলছানা মনোযোগ দিয়ে কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে। কাঁঠালগাছ সে চিনতো না, একটু আগে বাবা চিনিয়ে দিয়েছেন।

—এলাজানি! এলাজানি ইস্টপ্!

কন্ডাকটরের হাঁক শুনেই বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—একটু ঘণ্টি মেরে দেবেন ভাই, আমরা এখানে নামব—

তাদের নামিয়ে বাস চলে যেতেই প্রথম যে জিনিসটা আকাশকে বিস্মিত করল তা হচ্ছে চারদিকের অদ্ভুত নির্জনতা। এতক্ষণ বাসের মধ্যে থাকায় বোঝা যায়নি, এবার আকাশ অবাক হয়ে অনুভব করল চারদিকে কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না। দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া পরিবেশ একেবারে স্তব্ধ। কানে যেন কেমন তালা ধরে যায়। কলকাতায় তাদের বাড়িতে ছুটির দিন দুপুরেও আওয়াজের বিরাম নেই। নিচের রাস্তা থেকে বাস আর গাড়ির হর্ন, লোকজনের চিৎকার, পাম্প চলার শব্দ, পাশের ফ্ল্যাটে বুকুনদের বাড়ি থেকে কমপ্যাক্ট্ ডিস্কে মাইকেল জ্যাকসনের গান—সে একেবারে তাজ্জিম-মাজ্জিম ব্যাপার! এখানে তো বেশ মজা! নিজের কানের মধ্যে রক্ত চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু গ্রামটা কোথায়? এ তো দেখা যাচ্ছে ধু ধু মাঠের ভেতর তারা দাঁড়িয়ে।

ফাঁক ফাঁক করে সরু কাঠের তক্তা লাগানো তিনচাকা ভ্যান চালিয়ে এক ছোকরা আসছে পথ দিয়ে, আকাশের বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাই, এলাজানি গ্রাম কতদূর?

—এলাজানি? এই বাস থেকে নামলেন বুঝি? বাবু কি কলকাতা থেকে আসছেন?

অনভিজ্ঞ হলেও আকাশের বেশ মজা লাগলো। শহরে এসব অবান্তর কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে?

বাবা বললেন—হ্যাঁ ভাই, কলকাতা থেকেই আসছি। এলাজানি কতদূর?

লোকটি ভ্যান থামিয়েছে বটে, কিন্তু সিটে বসেই কথা বলছে। উত্তরে সে বলল—ভ্যানে যেতে হবে বাবু। তা, মিনিট কুড়ির পথ। সবাই হেঁটেই যায়, কিন্তু মালপত্তর নিয়ে আপনারা কি পারবেন? উঠুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। পাঁচ টাকা ভাড়া।

কথাটা সত্যি। দুটো সুটকেশ নিয়ে কুড়ি মিনিট—মানে প্রায় এক কি দেড় কিলোমিটার

পথ হাঁটা যাবে না। বাবা বললেন—এখানে রিকসা পাওয়া যায় না?

—এই তো রিকসা। এখানে একেই রিকসা বলে—

সবাই মিলে ভ্যানে ওঠা হল। আকাশ আর তার বাবা বসল পা ঝুলিয়ে। মা পা মুড়ে মাঝখানে বসলেন। ভ্যান পিচের রাস্তা ছেড়ে কাঁচা পথে নামল।

বাঁশঝাড় আর হাঁটুসমান ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ চলেছে। পথের ধারে পুকুরে ভেসে বেড়াচ্ছে হাঁস। বাতাসে সবরকম গাছপালা মিশিয়ে কেমন একটা তেতো তেতো গন্ধ। কোথাও বাড়ির উঠোনে বসে পাটকাঠি বেঁধে আঁটি করছে খাটো ধুতি পরা গেরস্ত। হঠাৎ বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে পাখির ডাক ভেসে এল—ঘুঘু—ঘু—

এ পাখি অবশ্য চিনিয়ে দিতে হয় না। ডাকেই নামের প্রমাণ।

তারপরেই এলাজানি মুখুজ্যেবাড়ি। যাত্রা শেষ।

রঞ্জিত মুখুজ্যে ভারি খুশি। খবর পেয়েই তিনি দৌড়ে এলেন, পরনে গরদের কাপড়, গায়ে চাদর। বোধহয় পুজোর কাজ করছিলেন। আকাশের বাবার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন—অনিমেষ! সত্যি এলি তাহলে! আমি ভেবেছিলাম অন্যবারের মত এবারেও শেষপর্যন্ত আর আসবি না। আসুন বৌঠান, এসো খোকা, কি নাম তোমার? বাঃ বাঃ, বেশ। চল অনিমেষ, আগে ঠাকুর দেখবি, না হাতমুখ ধুবি?

আকাশ অবাক হয়ে বাড়িটা দেখছিল। প্রাচীন, বিশাল বাড়িটা। যেখানে চুনবালি খসে গিয়েছে সেখানে গাঁথুনির পাতলা ইঁট দেখা যাচ্ছে। কার্নিশে বট আর অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। কত ঘর বাড়িটায়! কজন লোক থাকে এ বাড়িতে?

প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকেই শান বাঁধানো চৌকো বিরাট উঠোন, তার এক দিকে পুজোর মঞ্চ। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সেই মঞ্চে রয়েছে দুর্গাপ্রতিমা। ঠাকুরের গড়ন দেখে আশ্চর্য হল আকাশ। তাদের কলকাতার ঠাকুরের মত নয়। কেমন টানা টানা তেরচা চোখ, পেছনে চালচিত্র, তাতে হর-পার্বতী গণেশ কার্তিক লক্ষ্মী আঁকা। উঠোনে অনেক লোকজন আর ছেলেপুলের ভিড়। তারা সবাই এখানে খিচুড়ি ভোগ খাবে।

বিকেলের মধ্যে চার-পাঁচজন সমবয়েসী ছেলের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল আকাশের। তারা সবাই এই গ্রামেই থাকে। ঠেসে খিচুড়ি খেয়ে তাদের সঙ্গে বেড়াতে বের হল আকাশ। সুনীল তারই মত ক্লাস সেভেনে পড়ে, জসাড় হাই স্কুলে। হেঁটে যেতে হয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আকাশ বলল—তোমাদের স্কুলে কম্পিউটার আছে?

সুনীল বলল—না তো! তোমাদের আছে?

—আছে বই কি। দুটো। ক্লাশ নাইন থেকে আমাদের প্রোগ্রামিং শেখাবে।

—আমাদেরও তাহলে আসবে। শহরে সবকিছু আগে আসে, আমাদের পরে।

স্কুলে কম্পিউটার না থাকুক, আকাশ দেখল এরা অনেক কিছুতেই তার চেয়ে বেশি পারদর্শী। তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে যাচ্ছে, এক লাফে পার হয়ে যাচ্ছে পাঁচ হাত চওড়া জলের নালা, হঠাৎ হঠাৎ এক ছুটে চলে যাচ্ছে মাঠের অপর প্রান্তে এবং তারপরও একটুও হাঁপাচ্ছে না। দলের অন্য একজন ছেলে তিনু বলল—এসো, টিপ টিপ খেলা যাক, খেলবে?

আকাশ বলল—সেটা কি খেলা?

—একটা টিনের কৌটো মাটিতে বসিয়ে পনেরো হাত দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে তাতে লাগাতে হবে। প্রত্যেকে দশটা ঢিল ছুঁড়তে পারবে। যে সবচেয়ে বেশি বার কৌটোতে

লাগাতে পারবে সে জিতবে।

—বেশ তো, খেলা যাক। কিন্তু কৌটো কই?

তিনু বলল—যা তো মাধব, মুখুজ্যেকাকাদের বাড়ি থেকে একটা কৌটো খুঁজে নিয়ে আয়—

কৌটো এনে বসানো হল। তিনু মেপে পনেরো হাত দূরে মাটিতে একটা দাগ দিয়ে বলল—নাও, এবার সবাই নিজের নিজের ঢিল জোগাড় কর—

ঢিল সংগ্রহ করার পর সেগুলো বাছাই করা হল। যাতে সবার মোটামুটি একই সাইজের ঢিল হয়, নইলে যে বড় বড় ঢিল বেছেছে তারই লাগবার সম্ভাবনা বেশি।

জিতলো সুনীল, দশের মধ্যে নটা ঢিলই সে ঠঙাঠঙ কৌটোয় লাগিয়ে দিল। তিনুর আট, মাধবের ছয়। আকাশের মাত্র দুই। কিন্তু একটা জিনিস তার খুব ভাল লাগল, খেলায় হারজিত নিয়ে কেউ কাউকে বিদ্রূপ করল না। বরং সুনীল বলল—তোমাদের কলকাতায় প্র্যাকটিস করার মত জায়গা আছে? একমাস প্র্যাকটিস করলে দেখবে দশটায় দশটা লাগছে।

একটু মজা লাগল আকাশের। কলকাতায় তার বন্ধুদের সঙ্গে সে স্ক্র্যাব্‌ল্ কিম্বা ভিডিও গেম খেলে। ক্যাসেট চালিয়ে লায়ন কিং বা বেবিজ ডে আউট দেখে, নিকো পার্কে বেড়াতে যায়। তারা কি এ খেলা খেলতে চাইবে?

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যেতেই কানে এল পাখির ডাক। আর স্তব্ধতা। বাড়িতে হলে এই সময়টায় কানে আসে জলের পাম্প চলার চাপা গুম্ গুম্ শব্দ আর পাশের ফ্ল্যাট থেকে ব্রেকফাস্ট টিভি প্রোগ্রামের হাসি-হুল্লোড়। আর তাছাড়া বাতাসেও কেমন একটা নতুন তাজা গন্ধ।

একটু পরেই ঢাক বাজতে শুরু করল, শুরু হল অষ্টমীর পুজো। বেলা দশটার মধ্যে অঞ্জলি দিয়ে সবাই মিলে বারান্দায় শালপাতা নিয়ে জলখাবার খেতে বসে গেল। বাড়িতে তৈরি গরম আটার লুচি আর বোঁদে। সুনীল, তিনু ওরাও চলে এসেছে খুব সকালেই। এ জিনিসও নতুন তার কাছে। কলকাতায় হলে বিনা নিমন্ত্রণে এমন আসত কেউ? এখানে যেন গ্রামের সবাই, বিশেষ করে ছেলেপুলেরা, ধরেই নিয়েছে সারাদিন পুজোবাড়িতে কাটাতে হবে।

জলখাবার খাওয়া হলে আকাশ বলল—আজ খেলা হবে না?

সুনীল বলল—হ্যাঁ। আজ আমরা ডাংগুলি খেলব।

আকাশ ডাংগুলির নাম শুনেছে, কিন্তু কখনো খেলেনি বা কাউকে খেলতে দেখেনি। সে বলল—আমি জানি না যে? কখনো খেলিনি—

—আরে, খুব সোজা জিনিস। দু মিনিটে শিখিয়ে দেব, চলে এসো—

খেলাটা সত্যিই সোজা, আর খুব মজার। একটা বিঘতখানেক লম্বা কাঠের গুলির দুদিক কেটে ছুঁচলো করা হয়েছে, মাঝখানটা মোটা। আর একটা একহাত মত লম্বা ডাণ্ডা দিয়ে তার একদিকে মারলেই গুলিটা লাফিয়ে ওঠে। শূন্যে থাকা অবস্থাতে ডাণ্ডা দিয়ে সেটাকে জোরে মারতে হয়। এক একজন তিনবার চান্‌স্ পায়। তিনবারে গুলিটা যতদূরে গিয়ে পড়ে সেই দূরত্বটা ওই লম্বা ডাণ্ডা দিয়ে মাপা হয়। তাছাড়া 'খাটান' আছে। ভারি মজার ব্যাপার।

ডাংগুলি খেলতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করল আকাশ।

এই খেলায় তার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে।

টিপ টিপ খেলায় সে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি, কিন্তু কিছুক্ষণ খেলা চলবার পরেই সে ডাংগুলিতে একজন বিশারদ হিসেবে গণ্য হতে লাগল। তার খেলা দেখে সুনীল অবাক হয়ে বলল—তুমি যে বললে আগে কখনো ডাংগুলি খেলো নি?

—খেলিনিই তো।

—সত্যি?

—সত্যি।

—বাব্বাঃ! তুমি তো একেবারে চ্যাম্পিয়নের মত খেলছো!

শত উপদেশ বা বিদ্রূপেও যে কাজ হয় না, সামান্য প্রশংসায় যা হয়। আকাশ দ্বিগুণ উৎসাহে খেলা শুরু করল। আসলে সত্যিই তো সে নিজেও জানত না যে, সে এত ভাল খেলতে পারবে। মানুষের মধ্যে এক একটা বিশেষ গুণ লুকিয়ে থাকে, উৎসাহে বা প্রশংসায় সেটা প্রকাশিত হয়।

দুপুরে খাওয়ার পরে তিনু, সুনীল ওরা নদীর ধারে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আকাশ বলল—না ভাই, চলো আমরা বরং ডাংগুলি খেলি। ওরা নতুন বন্ধুর সম্মানে রাজি হয়ে গেল।

এরপর যে তিনদিন আকাশ এলাজানিতে ছিল, সকাল-দুপুর-বিকেল চড়কতলার মাঠে দল বেঁধে ডাংগুলি খেলেছে। তার নেশা ধরে গিয়েছিল।

শেষদিন, সেদিন একাদশী, পরের দিন ভোরে ওরা কলকাতায় ফিরবে, খেলার সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে আসছে। নিজের শেষ দান খেলছে আকাশ। ডাণ্ডা দিয়ে গুলির একপ্রান্তে মারতেই শূন্যে লাফিয়ে উঠছে গুলি। নিখুঁত মারে সেটাকে পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে পাঠাচ্ছে সে। তৃতীয়বার মারতেই প্রায় তার মাথাসমান লাফিয়ে উঠল কাঠের গুলি, গায়ের সমস্ত শক্তি সংহত করে আকাশ প্রাণপণ জোরে পেটাল সেটাকে। মাঠ পেরিয়ে ওপাশে আসশেওড়া আর ঘেঁটুগাছের ঝোপের ভেতর কোথায় গিয়ে পড়ল সেটা।

এবং আর পাওয়া গেল না।

দলের সবাই মিলে কত খোঁজাখুঁজি করা হল। এমন কিছু নিবিড় জঙ্গল নেই সেখানে। তবু পাওয়া গেল না। খেলা শেষ হয়ে গেল।

পরের দিন অত ভোরেই তার খেলার সঙ্গীরা তাকে বিদায় দিতে এল। আকাশ বুঝতে পারল এদের ছেড়ে যেতে তার বুকের মধ্যেটা কেমন করছে। কলকাতার বন্ধুদের চেয়ে এরা অনেক, অ-নেক ভাল। সামনের বছর আবার সে আসবে।

সুনীল বলল—আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে ভাই?

আকাশ বলল—হবে। সামনের পুজোয় আবার আমি আসব। নিশ্চয় আসব।

তারপর হেসে বলল—হারানো গুলিটা খুঁজে দিতে হবে না?

বাস যখন এলাজানি 'ইস্টপ' ছাড়িয়ে বহুদূর চলে এসেছে, তখনো আকাশ ভাবছে—কোথায় গেল গুলিটা? অত খুঁজলাম—

সামনের বছর সে আবার আসবে। ততদিন তার আনন্দ লুকিয়ে থাক ঘেঁটুগাছের আর আসশেওড়ার ঝোপে, এলাজানি গ্রামের চড়কতলার মাঠে।

জনার্দন

ছেলেটার চেহারা রোগাপানা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রঙ ময়লা। পরনে কলার ছেঁড়া চৌকো খোপকাটা শার্ট। পায়ে রবারের স্যান্ডেল, অর্থাৎ অতি সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের গড়পড়তা ছেলে, একবারের বেশি দু'বার কেউ তার দিকে তাকিয়ে দেখবে না। ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া চেহারায় কেবল চোখ দুটো উজ্জ্বল। টানা টানা, বড় বড়, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসম্পন্ন বা বিবেকানন্দের চোখের মত কিছু নয়, আসলে চোখে যেন একটা খুশি খুশি ভাব, যেন এইমাত্র একটা ভারি মজার খবর শুনেছে। চেহারার বাকি অংশে বা পোশাকে যে দারিদ্র্য এবং অসাফল্য প্রকট চোখে সেই খিন্নতার কোনো প্রতিফলন নেই। যেন শরীর আর জামাকাপড় অন্যের, দৃষ্টিটা তার নিজের।

বললাম—কি চাই ভাই? কোত্থেকে আসছ?

—আজ্ঞে আমার নাম জনার্দন। আমাকে রামবাবু পাঠালেন।

—কোন রামবাবু? ঢাকুরিয়ার? কি প্রয়োজন বলো তো?

ছেলেটি বারান্দায় পাতা মোড়ার ওপর বসে বলল—একটু বসি স্যার? সারাদিন ঘুরে ঘুরে বডি আর বডিতে থাকে না। আমি স্যার বই বাঁধাই। শুনলাম আপনার অনেক ভাল বই আছে, আমি সে সব ভাল করে প্ল্যাস্টিকের জ্যাকেট দিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া থাকলে স্পাইনে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেব। যদি লটে করান তাহলে সাইজ যেমনই হোক সব পাঁচ টাকা ফ্ল্যাট রেট। পছন্দ না হয় পয়সা দেবেন না। কুড়ি-পঁচিশখানা বই আগে করে দেখুন না স্যার। আপনার কাজটা স্যার, মিথ্যে কথা বলব না, আমার বড়ই প্রয়োজন। বাড়িতে বুড়ি মা, ভাই, আমি, আমার বৌ আর ছেলে। পাঁচটি প্রাণী খেতে, দুবেলা দশখানা পাত। সল্ট আনতে পান্তা ভ্যানিশ। আমি আবার ইংরিজি একটু বেশি বলি, মাইন্ড নট স্যার—পেটে একটু বিদ্যে আছে কি না, ক্লাস এইট অবধি পড়েছিলাম তো। কিন্তু দেখুন স্যার, এত এডুকেটেড হয়েই বা হোয়াট রেজাল্ট? এই বই বাঁধিয়ে খাচ্ছি—অটোম্যাটিক মেশিনগান থেকে গুলি বেরুনোর বেগে ছেলেটি কথা বলে গেল। একটু বেশি বললেও তাকে ভাল লাগল আমার। কারণ ওই হাসি-হাসি চোখ, ফুর্তি-ফুর্তি মেজাজ। বললাম—ঠিক আছে, কবে থেকে শুরু করবে?

—কাল থেকে আসি স্যার? ছুটির দিন আছে, আপনিও কাজ দেখে নিতে পারবেন। আসবো স্যার?

—বেশ তো। এসো কাল থেকে।

পরের দিন সকাল ন'টায় জনার্দন এসে হাজির। আজও তার দাড়ি কামানোর সময় হয়নি। হাতে ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা একটা পুঁটলি, সঙ্গে একটি ছেলে, তার হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে পলিথিনের গোটানো রোল, হাতুড়ির মাথা ইত্যাদি।

বললাম—এসো হে। সঙ্গে এ ছেলেটি কে?

জনার্দন একগাল হেসে বলল—ভাই স্যার। ওন ব্রাদার, যার কথা কাল বলেছিলাম। যেখানে যাই ও সঙ্গে থাকে, কাজ শেখে। আর দুমাসের মধ্যে ও নিজেই আলাদা কাজে বেরুতে পারবে। তখন টুসাইড থেকে ইনকাম, সংসারে কতটা সুরাহা হবে ভেবে দেখুন

দিকি। আপনি বই-টই গুলো এই বাইরের ঘরের মেঝেতে বের করে দিয়ে বিশ্রাম করুন গে স্যার। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন। ফিয়ার নট, কাজে ফাঁকি পাবেন না। কটা বই দিচ্ছেন আজকে? একশো? ও তো সন্ধ্যে লাগবার আগেই হয়ে যাবে। মাঝে শুধু দুপুরবেলায় একটু টিফিন খেয়ে নেবো। না না, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি স্যার, নিজেদের ফুড নিজেই ব্রিং করি। এই যে পুঁটুলিটায় আটটা রুটি আর চাল-কুমড়োর তরকারি আছে। মা বানিয়ে দিয়েছে। সর্ষে ফোড়ন দিয়ে চালকুমড়োর ছেঁচকি খেয়েছেন কখনো স্যার! রুটি দিয়ে বেশ লাগে। বাইরের ফুড নেভার টেক স্যার। আমার এই ভাইটার আবার মাঝে মাঝে পেটে কেমন একটা ব্যথা ওঠে। বাইরের কোনো খাবারের বিষয়ে ওকে ডাক্তারের নো করা আছে। এই যে, এই বইগুলো স্যার? তাহলে কাজে বসে যাই?

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের ঘরে এসে দেখি প্রায় আধাআধি বই দুই ভাই মিলে 'জ্যাকেট' দিয়ে ফেলেছে। মোটা আর স্বচ্ছ পলিথিনের মলাট, ভেতরের দিকে সেলোটেপ দিয়ে আঁটা। বেশ দেখাচ্ছে তো বইগুলো। বর্তমানে দুই ভাই মুখোমুখি বসে মাঝখানে পাত্র রেখে টিফিন খাচ্ছে। পাশে একটা জলের বোতল। আগ্রহ করে খিদের মুখে তাদের এই অকিঞ্চিৎকর খাওয়া দেখে আমার কেমন যেন মায়া হল। বললাম—জনার্দন, দুটো ভাত খাবে? লজ্জা কোরো না। খাও তো বলো—

জনার্দন একগাল হেসে বলল—তা যদি দু এক গ্রাস হয় স্যার, তাহলে না করব না। আজকে স্যার বড্ডই ক্ষিদে পেয়েছে। আপনি বড় ভাল লোক। অন্য অন্য জায়গায় কেউ কেউ চা-বিস্কুট দেয়, কেউ আবার কিছুই দেয় না।

ভেতরে এসে স্ত্রীকে বললাম—বাইরে যে ছেলে দুটি কাজ করছে ওদের একটু ভাত খাওয়াতে পারো?

—ওমা, একথা আগে বলোনি কেন? সবার তো খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, ডিম আর আলুসেদ্ধ দিয়ে ভাতে ভাত করে দিলে হবে? সঙ্গে ঘি আর কাঁচালঙ্কা দিতে পারি।

বললাম—খুব হবে, চট করে চড়িয়ে দাও।

খেতে বসে দুই ভাই-এর কি আনন্দ। জনার্দন বারবার বলতে লাগল—ফুড ফ্রম্ হেভেন স্যার। আপনার স্ত্রী আজ থেকে আমার মাদার লাইক হলেন। তবে রোজ রোজ খাওয়াবেন না স্যার, আইশেম বলে তো একটা জিনিস আছে।

পরপর তিন সপ্তাহ ধরে ছুটির দিনে আমার বাড়িতে কাজ করে বহু বই বাঁধিয়ে ফেলল জনার্দন আর তার ভাই। তারপর হঠাৎ মাসখানেক আর তার দেখা নেই। ঠিকানাও সঠিক জানি না যে খোঁজখবর করবো। রামবাবুর কাছে একদিন খবর নেবো ভাবছি, এমন সময় এক রবিবার সকালে জনার্দন একা এসে হাজির। গালে সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে সেই পুরনো জামাটাই, হাতে খাবারের পুঁটলি, কাঁধে কাজের জিনিসপত্র ভরা ক্যানভাসের ব্যাগটা। মুখ তার শুকনো। চেহারায় শ্রম আর বিষণ্ণতার সুস্পষ্ট ছাপ। কেবল চোখদুটো উজ্জ্বল, হাসি-হাসি।

বললাম—ব্যাপার কি জনার্দন? এতদিন খবর নেই যে? আরও বহু বই বের করে রেখেছি তোমার জন্যে। আমার এক বন্ধু আমার কাছে তোমার কথা শুনে তোমাকে কাজ দেবেন বলেছেন। সেখানেও তোমার একবার গিয়ে দেখা করা দরকার। তা তোমার খবরই নেই। এই একমাস কোথায় ডুব মেরেছিলে?

জনার্দন বলল—স্যার, আমার ব্রাদার গন। ঐ যে পেটে ব্যথা হত না, সেটাই একদিন রাত্তিরে খুব বাড়ল। সঙ্গে বমি। পাড়ার ডাক্তার নিয়ে এলাম ধরে। আমি গরীব বলে ফি নেয় না আমার কাছে। ডাক্তার বলল সেই যে কি সাইটিস বলে সেই হয়েছে, তক্ষুনি অপারেশন না করলে ভয়ানক বিপদ। নার্সিং হোমে অনেক খরচ স্যার, টাকাপয়সা ওয়াটারের মত ফ্লো করে। তাই মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। কিন্তু স্যার কৃষ্ণ কিলস্, হু কিপ্স্? ভাই বাঁচল না স্যার। অপারেশন করার আগেই পেটের মধ্যে সেই কি সাইটিসের থলি ফেটে গিয়েছিল। এখন একেবারে একা হয়ে পড়েছি স্যার। মায়েরই কষ্ট বেশি, ওল্ড লেডি তো! আমার ও স্যার বড় আদরের ভাই ছিল। একটু সামলে নিয়ে আবার বেরুতে শুরু করেছি। কি করি বলুন, ইট তো মাস্ট, লিভ তো মাস্ট। দিন স্যার, বইগুলো দিন। কাজে বসে যাই।

শিবদাসের সত্যানুসন্ধান

সকাল নটা। মুখে পান ফেলে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে বিমলেন্দু স্ত্রীকে বললেন—আমার হাতঘড়িটা দাও তো। আজ দেরি হয়ে গেল, সাড়ে ন'টার মধ্যে অফিসে না পৌঁছতে পারলে মুশকিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজ মিটিং করবেন আমাদের নিয়ে। দেরি করা উনি একেবারে পছন্দ করেন না।

নিবেদিতা ঘড়ি এনে দিয়ে বললেন—এই নাও।

ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে বিমলেন্দু বললেন—এ তো রোজকার পরবার ঘড়িটা, ওমেগাখানা আলমারিতে তুলে রেখেছো তো?

—সেকি? সেটা তো কাল বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে তুমিই তুলে রাখলে!

উদ্বিগ্ন হয়ে বিমলেন্দু বললেন—আমি রাখিনি তো! ড্রেসিং টেবিলের ওপর ঘড়িটা রেখে তোমাকে বলেছিলাম আলমারিতে তুলে রাখতে। দেখো তো কোথায় গেল!

দুজনে মিলে প্রথমে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে, নিচে মেঝের ওপর, পরে ঘরের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। নাঃ, কোথাও নেই। ঘড়িটা উধাও হয়েছে।

অফিস যাবার আর সময় নেই। বিমলেন্দু ফোন করে ডেপুটি ম্যানেজারকে জানিয়ে দিলেন—বিশেষ কারণে আজ তিনি দপ্তরে যেতে পারছেন না। তারপর গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

তাঁর দুখানা হাতঘড়ি। একখানা এইচ. এম. টি.-র, সেটা সর্বদা ব্যবহার করেন। আর একটা ওমেগা, জেনিভ্ মডেলের। দামি জিনিস বলে রোজ সকালে দম দিয়ে স্টিলের আলমারির লকারে রেখে দেন। গতকাল এক সহকর্মীর মেয়ের বিয়েতে ওমেগাটা পরে গিয়েছিলেন। তারপর এই বিপত্তি।

নিবেদিতা স্বামীর মুখচোখ দেখে বললেন—অত ভাবছ কেন? সেদিনকার মত ব্লাড প্রেশার বেড়ে আবার কষ্ট পাবে। আর একটু খুঁজলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়—

বিমলেন্দু বললেন—দেখো, আমি ছেলেমানুষ নই। বাজে সান্ত্বনা দিও না। দামি জিনিস একবার চুরি গেলে আর কখনো পাওয়া যায় বলে শুনেছো?

—পুলিশে জানালে হয়না?

বিমলেন্দু রেগে বললেন—পুলিশ? সার্কাসের হাতি হারিয়ে গেলেও পুলিশ খুঁজে পাবে না, এমনি তাদের দক্ষতা। আর এ তো ছোট্ট একটা ঘড়ি। গতমাসে আমাদের থানার ও.সি.-র বাড়ির উঠোনের তারে শুকোতে দেওয়া তিনখানা শাড়ি, মায় বড়বাবুর বারান্দায় রাখা বুটজোড়া চুরি হয়ে গেল। কি করেছেন বড়বাবু? আজ পর্যন্ত চোর ধরা পড়েনি। পুলিশের কথা আমাকে বোলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—পাশের বাড়ির রমেশবাবুর মেয়ে বিকেলে শিবদাসের কাছে পড়তে যায় না? কি যেন নাম মেয়েটার? অর্পিতা? ওকে একটু ডাকো তো—

—কেন, তাকে দিয়ে কি হবে?

—দরকার আছে। ডাকো না তুমি—

মিনিট পাঁচের পরে অর্পিতা এসে বলল—আমাকে ডাকছেন কাকাবাবু?

তার পরনে ইস্কুলের ইউনিফর্ম, চুল ভেজা। স্কুলে যাবার প্রস্তুতি।

বিমলেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন—তুই বিকেলে শিবদাসের কাছে পড়তে যাস না?

—হ্যাঁ কাকাবাবু। কেন বলুন তো? কোনো খবর দিতে হবে?

—হ্যাঁ। ওকে বলবি তো কাল সকালে যেন একবার আমার বাড়ি আসে। কাল ছাব্বিশে জানুয়ারি, আমারও অফিস ছুটি, ওরও স্কুল বন্ধ। মনে করে বলবি, বুঝলি?

অর্পিতা চলে গেলে বিমলেন্দু আর নিবেদিতা বাড়ি-ঘর আর একবার খুঁজে দেখলেন। পাওয়া যাবে না জানতেন, তবুও দেখলেন। ক্লান্ত হয়ে বিছানায় বসে বিমলেন্দু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—অভিজিৎ কোথায়?

—সে তো সকালেই বেরিয়েছে। কোন এক বন্ধুর সঙ্গে কীসের ব্যবসা করবে, তাই দেখা করতে গিয়েছে তার সঙ্গে—

—ভালই। ছেলেটার একটা কিছু হওয়া দরকার। মিনতি মারা যাওয়ার সময় আমাকে বলে গিয়েছিল ভাগ্নের ভার নিতে। এমন দিনকাল—আজ দুবছর ছেলেটা রয়েছে আমাদের কাছে, এখনো ওর জন্য কিছু করতে পারলাম না।

নিবেদিতা বললেন—তুমি শিবদাস ঠাকুরপোকে ডাকলে কেন?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে বিমলেন্দু বললেন—এলেই দেখতে পাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, পিন্টু কোথায়? তাকে অনেকক্ষণ দেখছি না।

—পিন্টু রেশন তুলতে গিয়েছে। বিরাট লাইন পড়ে তো! তুমি কি—

কথার মাঝপথে থেমে গিয়ে নিবেদিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিমলেন্দু বললেন—আমি কি?

—তুমি পিন্টুকে সন্দেহ করছ না তো?

বিপন্নমুখে বিমলেন্দু বললেন—না না, তা কেন? তবে, বুঝতেই তো পারছ, পিন্টুর সুযোগ এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ছিল। মনে তো একটু হয়ে জাগেই—

—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ পিন্টু তার অসুস্থ দিদিমাকে দেখতে বেলঘরিয়া গিয়েছিল। আমরা আসার পর সে ফিরেছে, তাও অনেক রাত্তিরে। অত রাতে এ ঘরে সে ঢোকে না।

বিমলেন্দু বললেন—তোমার এ যুক্তিতে ফাঁক আছে। তবে এ আলোচনা আপাতত মুলতুবী থাক। প্রমাণ ছাড়া কাউকে সন্দেহ করা অন্যায়। আর একটা কথা, কাল সকালে শিবদাস না আসা অবধি পিন্টু আর অভিজিৎকে ঘড়ি হারানোর ব্যাপারে কিছু বোলো না—

—বলব না। যাও, জামাকাপড় বদলে এসো। অফিস যাওয়া তো হোল না, ছাদে গিয়ে বাগানের কাজ করি চলো।

নিবেদিতা ছাদে একটা বেশ সুন্দর বাগান করেছেন। পুজোর পরেই বসানো ডালিয়ার চারা এখন নধর হয়ে বেড়ে উঠেছে, নানারঙের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। ইয়েলো কুইন, ব্ল্যাক আউট, স্টার ব্লুম—কত রঙের ফুল! ছোট্ট একটা খুরপি হাতে স্ত্রীকে প্রসন্নমুখে কাজ করতে দেখে বিমলেন্দুর ভারি ভাল লাগল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে বাড়ি মাথায় করত। নিবেদিতা জাগতিক ক্ষতিকে কোনোদিনই বিশেষ গুরুত্ব দেন না। তার চেয়ে গাছের পরিচর্যা করা তাঁর কাছে অনেক বেশি আনন্দের।

সুইট উইলিয়ামের গোড়া খুঁচিয়ে দিতে দিতে বিমলেন্দুও ভুলে গেলেন সকালের ক্ষতি।

সেদিন স্বামী-স্ত্রীর এ নিয়ে আর কোনো কথা হোল না।

পরের দিন সকাল ঠিক নটার সময় কলিং বেল বেজে উঠল। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছিলেন বিমলেন্দু। পিন্টু এসে বলল—বাবু, শিবদাসকাকা এসেছেন।

—যা, এখানে নিয়ে আয়—

তারপর শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন—শোনো গো, শিবদাস এসেছে। চায়ের জল চাপিয়ে তুমিও এসো—

মোটা খদ্দরের খাটো ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি আর গায়ে বাদামী রঙের চাদর জড়ানো শিবদাসের আবির্ভাব হল বসবার ঘরের দরজায়। পায়ে দেশী মুচির তৈরি স্যান্ডেল।

দরজার কাছে চটিজোড়া খুলে ঘরে ঢুকলেন শিবদাস। পকেট থেকে রুমাল বের করে সশব্দে নাক ঝাড়লেন, বললেন—ওঃ, বড্ড ঠান্ডা লেগেছে—

বিমলেন্দু হেসে বললেন—শীতই বা কি, আর গ্রীষ্মই বা কি, তোমার তো ঠাণ্ডা লেগেই আছে। বোসো। চা দিতে বলি—

শিবদাস বিমলেন্দুর সামনে সোফায় বসে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে মেঝে থেকে পা তুলে ফেললেন, এবং চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন। তারপর বললেন—বলো কি ব্যাপার? জরুরী তলব কেন?

একটু চুপ করে থেকে বিমলেন্দু বললেন—তোমার পরীক্ষা নেব শিবদাস।

শিবদাস বিকট শব্দ করে হাঁচলেন। হাঁচতে গিয়ে কেশে ফেললেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন—পরীক্ষা! তুমি নেবে? আমার?

—হ্যাঁ। ছোটবেলায় সেই ইস্কুল থেকে তুমি ছিলে গোয়েন্দা গল্পের পোকা। অঙ্ক বইয়ের পেছনে 'হত্যা হাহাকারে' লুকিয়ে রেখে পড়তে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বলে এসেছ বুদ্ধি খাটালে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। আজ তোমাকে একটা সমস্যা দেব।

শিবদাসের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি উত্তেজিত গলায় বললেন—বিমল!

—কি?

—চায়ে একটু আদার রস দিতে বল বৌঠানকে। সর্দিও কমবে, মাথাও খুলবে—

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নিবেদিতা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন—আমাকে বলতে হবে না। আদার রস দিয়েই করে এনেছি। বাপ্‌রে, যা সর্দি।

বিমলেন্দু বললেন—বোসো নিবেদিতা। তোমারও থাকা দরকার।

চায়ে চুমুক দিয়ে চোখ বুঁজে শিবদাস বললেন—বলতে শুরু করো।

সমস্ত ব্যাপারটার বিবরণ দিয়ে বিমলেন্দু চুপ করলেন।

চোখ বন্ধ করে শিবদাস ঝিমোচ্ছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি!

বিমলেন্দু ডাকলেন—ও ভাই শিবদাস।

চোখ বন্ধ করে শিবদাস বললেন—বিরক্ত কোরো না।

স্বামী-স্ত্রী হতাশভাবে বসে রইলেন। মিনিটপাঁচেক বাদে চোখ খুলে শিবদাস জিজ্ঞাসা করলেন—পিন্টু কতদিন হল তোমাদের কাছে কাজ করছে?

বিমলেন্দু বললেন—বছর চারেক।

—বিশ্বাসী বলে মনে হয়?

বিমলেন্দু কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে নিবেদিতা বললেন—আজ পর্যন্ত পিন্টু কোনো অবিশ্বাসের কাজ করেনি। এমন কি, সবচেয়ে স্বাভাবিক যা, অর্থাৎ বাজার থেকে কিছু পয়সা এদিক-ওদিক করা—তাও না। তবে কি জানেন শিবুদা, খুব সৎ আর ভাল লোকেরও হঠাৎ মতিভ্রম হয়, তাই না?

সর্দির আক্রমণে ছল ছল চোখে নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বললেন—তুমি কি পিন্টুকে সন্দেহ করছ বৌঠান?

—না। মানুষের সাধারণ মনোবৃত্তির কথা বলছি।

—হুঁ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শিবদাস বললেন—আর অভিজিৎ?

বিমলেন্দু বললেন—ওকে তো তুমি চেনোই। মিনতি, মানে আমার বোনের ছেলে। একটা কিছু কাজ বা ব্যবসা করতে চায়। বোন মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে আমার কাছে আছে। ভাল ছেলে। বিড়ি-সিগ্রেটও খায় না—

—যে ঘড়িটা চুরি গিয়েছে সেটা ওমেগা কোম্পানির, না?

—হ্যাঁ।

—কেমন দাম হতে পারে বাজারে? আন্দাজ করতে পারো?

বিমলেন্দু বললেন—আন্দাজ করার দরকার হবে না। গত বছর ওটা অয়েল করতে দিয়েছিলাম রাধাবাজারের আনাম ওয়াচ কোম্পানিতে। তারাই বলল ও ঘড়ির বাজারদর এখন সাত থেকে আট হাজার টাকা। সেকেন্ডহ্যান্ড দাম। নতুন পাওয়া যায় না।

—পরশু সন্ধেবেলা কোথায় ছিলে, কি করেছ বলো।

—আমার এক সহকর্মীর মেয়ের বিয়ে ছিল। নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফিরেছি রাত সাড়ে-ন'টায়। ঘড়িটা খুলে শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে পোশাক বদলাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় পাশের বাড়ির রমেশবাবুর মেয়ে ডাকতে এল। মানে তোমার ছাত্রী—অর্পিতা। রমেশবাবুর স্ত্রীর হার্টের গোলমাল, মাঝে মাঝে শরীর খুব খারাপ হয়। পরশুও তেমন হয়েছিল, রমেশবাবু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন; মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের ডাকতে।

—গিয়েছিলে?

—অবশ্যই।

—দুজনে গিয়েছিলে না একা?

—দুজনেই। নিবেদিতাকে রমেশবাবুর স্ত্রীর কাছে রেখে আমি ডাক্তার মিত্রকে ডেকে নিয়ে আসি। কিছুক্ষণের ভেতরেই ভদ্রমহিলা সামলে ওঠেন। আমরা ফিরে আসি।

—বাড়িতে তালা দিয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—ডুপ্লিকেট চাবি আছে?

—আছে। পিন্টু আর অভিজিতের কাছে একটা করে চাবি থাকে।

—কতক্ষণ তোমরা রমেশবাবুর বাড়িতে ছিলে?

বিমলেন্দু বললেন—প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

—পিন্টু আর অভিজিৎ কোথায় ছিল?

—পিন্টু গিয়েছিল বেলঘরিয়ায়। দিদিমার অসুখ, তাঁকে দেখতে। অভিজিৎও বাইরে ছিল, দুজনেই ফিরেছে রমেশবাবুর বাড়ি থেকে আমরা ফেরার পর।

শিবদাস একটু ইতস্তত করে বললেন—একটা কথা বলছি, কিছু মনে কোরো না। ওদের দুজনের পক্ষেই কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এসে কাজটা সেরে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল।

বিমলেন্দু বললেন—টেকনিক্যালি তাই। তবে—

শিবদাস হেসে বললেন—জানি। ওই 'তবে'-টাই মুশকিল করে। একদিকে বিশ্বাসী কর্মচারী, অন্যদিকে নিজের ভাগ্নে। মনকে বোঝানো যায় না। কিন্তু কি করবে ভাই? শার্লক হোমস্ একবার বলেছিলেন—সবরকম সম্ভাবনাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে, যত অসম্ভব আর অবাস্তব বলেই মনে হোক না কেন, সেটাই সত্য। আচ্ছা, ঘড়ি চুরির ব্যাপারে তুমি পিন্টু বা অভিজিৎকে কিছু বলেছ নাকি?

—না, আমি তোমার সঙ্গে আগে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

—ভালই করেছ। আমি একবার ওদের সঙ্গে—এই যে বাবা পিন্টু, ভাল আছ তো? শুনলাম তোমার দিদিমার অসুখ, তা এখন কেমন আছেন?

পিন্টু বোধহয় মুদিখানায় গিয়েছিল, তার হাতে প্লাসটিক ক্যারিব্যাগে কয়েকটা কাগজের ঠোঙা। সে বলল—কাকাবাবু ভাল আছেন? হ্যাঁ, দিদিমাকে দেখতে গিয়েছিলাম কাল। অনেক বয়েস হয়েছে তো, এবার আর বোধহয়—

—সেইরকমই শুনছিলাম বিমলের কাছে। দিদিমা তো বেলঘরিয়ায় থাকেন, না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার ফিরতে তাহলে খুব অসুবিধে হয়েছে, কাল তো বেলঘরিয়ায় কি একটা গোলমালের জন্য সন্ধে থেকে অনেক রাত্তির অবধি ট্রেন বন্ধ ছিল—

পিন্টু অবাক হয়ে বলল—কাল? কই, বেলঘরিয়ায় কোনো গোলমাল হয়নি তো? আমার ফিরতে দেরি হয়েছে বটে, কিন্তু সে দিদিমার জন্য ডাক্তার-ওষুধ করতে গিয়ে—ট্রেন তো ঠিকই চলছিল—

—তাই? কে যেন বলছিল—বাজে কথা তবে। আচ্ছা, যাও, তুমি কাজে যাও—

পিন্টু চলে যেতে শিবদাস বললেন—বিমল, একবার অভিজিতের সঙ্গে কথা বলা যাবে? খুব ক্যাজুয়ালি ডাকা যায় কিনা দেখো, ডাকছি বলে বুঝতে না দিয়ে—

—দাঁড়াও, দেখছি।

গলা চড়িয়ে বিমলেন্দু ডাকলেন—অভিজিৎ, একবার শুনে যাও তো—

ভেতর থেকে সাড়া এল—যাই মামা।

একটু পরেই অভিজিৎ এসে দাঁড়াল।—কিছু বলছেন মামা?

—হ্যাঁ, ইয়ে—ঘণ্টাখানেক বাদে রমেশবাবুর স্ত্রী কেমন আছেন একবার খবর নিয়ে এসো তো। যদি প্রয়োজন হয় পরে আমিও একবার যাবো—

—আচ্ছা মামা।

তারপর শিবদাসের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাল আছেন শিবদাস মামা?

—হ্যাঁ বাবা, ভালই আছি। তবে বড্ড সর্দি লেগে আছে, এই আর কি। কাল তো শুনলাম রমেশবাবুর বাড়িতে বেশ বিপদ গিয়েছে। তুমি থাকলে মামাকে আর ব্যস্ত হতে হত না—

লজ্জিত মুখে অভিজিৎ বলল—আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে নাইট শোয়ে ফিল্‌ম দেখতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেল—

শিবদাস বললেন—তাতে আর কি? এই বয়েসেই মানুষ একটু আমোদ-আহ্লাদ করে। অন্যায় কিছু না করলেই হল। কি ছবি দেখলে কাল?

—ওই যে, অম্বুজ মৌলিকের 'এই জীবন' বলে ছবিখানা খুব নাম করেছে না? সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক নিজে পরিচালনা করেন, আবার নিজে অভিনয়ও করেন—

—হ্যাঁ জানি, অম্বুজ মৌলিকের এখন বাজারে খুব নাম। গত সপ্তাহে কি একটা পত্রিকায় 'এই জীবন'-এর সমালোচনা পড়ছিলাম, বেশ প্রশংসা করেছে। তবে লিখেছে—ধানক্ষেতে বাচ্চাদুটি খেলা করতে করতে গান গাইছে, এ দৃশ্যটা না দিলেই হত। ওটা একটু অস্বাভাবিক হয়েছে—

—ধানক্ষেতে গান? এমন কোনো দৃশ্য নেই তো! ছবিটা তো শহরের গল্প, কলকাতা শহরের। গানই নেই ছবিতে—

শিবদাস বললেন—তা হবে। অন্য কোনো ছবির সমালোচনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি বোধহয়—

—আমি যাই মামা? আমাকে একটু বেরুতে হবে, স্নান করে নিই—

—এসো বাবা, এসো—

অভিজিৎ চলে যেতে বিমলেন্দু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিবদাসের দিকে তাকালেন। শিবদাস তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন—গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি কি খরচ করেছ সংসারে, এবং কি বাবদ, তা পরপর বলে যাও—

বিমলেন্দু বললেন—তুমি কি আমার সঙ্গে মশকরা করছ?

—না।

—তাহলে এ প্রশ্নের সঙ্গে ঘড়ি-চুরির কি সম্বন্ধ?

—আছে। আমার মেথড সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে কথার উত্তর দাও।

বিমলেন্দু কটমট করে শিবদাসের দিকে তাকালেন, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ, বলছি। গতকাল সকালে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার আনার জন্য খরচ হয়েছে একশো পাঁচ টাকা। বাজার হয়েছে ছাপান্ন টাকার। তারপর—উম্‌-ম্‌-ম্‌, ও হ্যাঁ, মাদার ডেয়ারির দুধ এসেছে এক লিটার, মানে আট টাকা। তারপর আঁ্যা—বিকেলে কি যেন?

নিবেদিতা বললেন—ব্যস্, তারপরেই একেবারে বিকেল? তোমার হাতে সংসারের হিসেব থাকলে আর দেখতে হবে না, যা ভুলো মন—

—কেন, কিছু বাদ গেল নাকি?

—সকালে পিন্টু রেশন এনেছে একচল্লিশ টাকায়—

লজ্জিত গলায় বিমলেন্দু বললেন—তাই তো! আমি একেবারে—

—তাছাড়া দুপুরে টক দই এসেছে সাড়ে বারো টাকার।

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, টক দই—

—দিদিমার জন্য ওষুধ কিনে পাঠাতে হবে বলে পিন্টু নিয়েছে পঞ্চাশ টাকা—

—ঠিক। যাঃ, তাও ভুলে গিয়েছি—

শিবদাস বললেন—যাক্, আর মনে করবার প্রয়োজন নেই। তুমি একটা আদ্যন্ত অপদার্থ, গতকাল কি করেছ আজ মনে থাকে না। তা, বাঙালী আছ তো, না তাও নেই? বিয়েবাড়িতে কি পরে গিয়েছিলে? প্যান্ট-শার্ট, না ধুতি-পাঞ্জাবি?

—ধুতি-পাঞ্জাবি।

—সেগুলো কোথায়?

—সে তো রমেশবাবুর বাড়ি থেকে ফিরেই হ্যাঙারে করে আলমারিতে ঝুলিয়ে রেখেছি। আলনায় রাখলে ক্রাশ্‌ড্ হয়ে যায়। কেন বলো তো?

বিমলেন্দুর কথার উত্তর না দিয়ে শিবদাস নিবেদিতাকে বললেন—বৌঠান, আলমারিটা খুলুন গিয়ে। যদি খুব ভুল না করে থাকি তাহলে বিমলের পাঞ্জাবির পকেটে ঘড়িটা রয়েছে। যান, দেখুন তো। নইলে লজিক আর বিহেভিয়ারাল সায়েন্‌স্ মিথ্যা হয়ে যাবে।

এক মিনিটের মধ্যে ঘড়ি হাতে ফিরে এলেন নিবেদিতা। তাঁর মুখে হাসি। বিমলেন্দু এত অবাক হয়ে গেলেন যে, কোনো কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

শিবদাস বললেন—বেলঘরিয়ায় সেদিন সত্যিই কোনো গোলমাল হয়নি। পিন্টু দিদিমার জন্যই দেরি করে ফিরেছে। মিথ্যে বললে আমর প্যাঁচে ধরা পড়ত। আর 'এই জীবন' ছবির কোনো সমালোচনাও কোনো কাগজে বেরোয় নি এখনো। অভিজিৎ ছবিটা সত্যিই দেখেছে। নইলে অন্তত সামান্য দ্বিধা করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিত। আসলে তুমি জামাকাপড় বদলাবার সময় পাওনি, কেবল ঘড়িটা সবে খুলে টেবিলে রেখেছিল। প্রিয় জিনিসকে রক্ষা করার মনোবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক এবং অভ্যাসগত। রমেশবাবুর বাড়িতে যাবার সময়ে এই প্রবৃত্তিবশত ঘড়িটা তুলে পকেটে রেখেছিলে। কাজটা এত স্বাভাবিকভাবে এবং অন্যমনস্কতার সঙ্গে হয়েছে যে, নিজেও খেয়াল করনি। আর তাছাড়া তোমার মনে রাখার যা বহর দেখলাম—

ওঠবার জন্য চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়াতে জড়াতে শিবদাস বললেন—ভবিষ্যতে সামান্য ব্যাপারে আমার পরীক্ষা নেবার চেষ্টা করে আমাকে অপমান করবে না। বড় কিছু বাধাও দেখি, বড় কিছু বাধাও—

মানুষের গল্প

আজ কৃষ্ণনগর লোকালে খুব ভিড় ছিল। বাজার কামরায় ভয়ানক গুঁতোগুঁতি। পাঁচু, হরিপদ আর কাশী ঠেলে উঠতে পারে না এমন অবস্থা। তাতে সঙ্গে আবার তিনখানা বিশাল বিশাল বাজরা। বাদকুল্লার ভেন্ডাররা দরজার মুখে এমনভাবে মাল সাজিয়ে রেখেছে যে তার মধ্যে দিয়ে গলে ভেতরে ঢোকাই কঠিন, বাজরা ওঠানো তো পরের কথা। আজ 'ক্রসিং নেই', তাহেরপুরে গাড়ি এক মিনিটও দাঁড়াবে না। হুড়োহুড়ি করে মাল তুলতে গিয়ে কাশী নিজের এঁচোড়বোঝাই বাজারখানা বাদকুল্লার একজনের মালের ওপর চাপিয়ে দিল। কামরার ভেতর থেকে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা একজন দাঁত উঁচু খেঁকুরে লোক তেড়ে এল হাঁ হাঁ করে—দেখে রাখ শালা! ঢেঁড়সের ওপর কেউ এঁচোড় চাপায়?

কাশীও খিঁচিয়ে উঠে বলল—তো কি করব? ইচ্ছে করে এমনভাবে মাল রেখেছো যাতে আর কেউ উঠতে না পারে। আমরাও তো মাল বেচতে যাব না কি? আরাম চাই তো ম্যাটাডোর ভাড়া করে যাও না কেন?

—ভাড়া তোর বাবা দেবে?

এর উত্তরে কাশী লোকটির জন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করল।

দূর থেকে ভাল ঝগড়া হয় না। খেঁকুরে লোকটি উত্তেজিত হয়ে তরকারির বাজরা, ছিট-কাপড়ের গাঁটরি, মাছের ছানা ভর্তি মাটির হাঁড়ি এসবের মধ্যে দিয়ে বকের মত পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। কামরায় অন্য গুঞ্জন থেমে গিয়েছে। কোণের দিকে চারজন কামরায় উঠেই একমনে টুয়েন্টি নাইন খেলছিল, তারাও হাতের তাস উলটো করে ধরে এক বুক আশা নিয়ে তাকিয়ে রইল। অন্তত রানাঘাট পর্যন্ত একটা জমাট ঝগড়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে, এখন আর তাস খেলে সময় নষ্ট করে কি হবে?

কিন্তু মানুষের সব সুখের আশা পূর্ণ হয় না। এগিয়ে আসতে আসতে লোকটার লুঙ্গি একটা তরকারির ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে আসা কাঠিতে লেগে ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল। ফলে তৎক্ষণাৎ ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করল অন্য খাতে। লোকটা অবাক হয়ে একবার তার ছেঁড়া লুঙ্গি দেখল, তারপর চোখ গরম করে বলল—এখানে এই ঝুড়ি রেখেছে কোন শালা?

অগণিত ঝুড়ি আর বস্তার ভেতর থেকে একজন বিশাল দেহ মানুষ উঠে দাঁড়াল। প্রায় ছ-ফুটের কাছাকাছি লম্বা, কিছু না হোক পঞ্চাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, মাথায় এবং সারা গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বগিথালার মত মুখে লাল লাল চোখ আর বেড়ালের ল্যাজের মত একজোড়া গোঁফ। মানুষটির নাম বুনো রঘু। মেন লাইনের ভেন্ডাররা কেউ তাকে ঘাঁটায় না। পায়রাডাঙা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে টিউবওয়েল আছে সেটা পাম্প করে জল খেতে যাওয়ায় রঘুর হাতে পুরো লোহার হ্যান্ডেলটা উপড়ে খুলে এসেছিল। এখনো সেটা সেইভাবেই পড়ে আছে, রেল কোম্পানি আর মেরামত করেনি। বুনো রঘু এখনো বহুদিন মেল লাইনে প্যাসেঞ্জারি করবে। খামোকা বাজে খরচ করে কি লাভ? কোথাও কোনো গোলমাল হলে রঘু দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই সামনে যাকে পায় তাকে খানিকটা পিটিয়ে নেয়, তারপর গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করে। এমন লোককে কে ঘাঁটাবে? রঘু

দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ স্বরে বলল—ঝুড়িটা আমার। আমি রেখেছি। কি হয়েছে?

খেঁকুরে লোকটা পুরোপুরি মিইয়ে গিয়েছে। তবু এক কামরা লোকের চোখ এখন তার দিকে। মিন মিন করে সে বলল—তোমার ঝুড়ির কাঠিতে আমার লুঙ্গি ছিঁড়ে গেল—

থুঃ করে একটা কাঠের টুকরো মুখ থেকে ফেলে দিয়ে রঘু বলল—শেয়ালদা নেমে একটা নতুন লুঙ্গি কিনে নিও। কই, দেখি কোথায় ছিঁড়েছে? দূর! ও তো নীচের দিকে, কিছু দেখা যাবে না—

কামরাসুদ্ধ লোক খুব হাসতে লাগল। রঘুর সঙ্গে হাসা বেশ নিরাপদ।

একজন ছোকরা ভেন্ডার ভাব জমাবার জন্য বিড়ি এগিয়ে দেয় রঘুকে।—খাবে রঘুদা?

—লাল সুতো?

—না, সবুজ।

—রেখে দে, ও বাচ্চারা খায়। গলায় সেঁক লাগে না।

ছোকরা ভেন্ডার ম্লানমুখে তার বিড়ি আবার কৌটোয় পুরে ফেলল।

ইতিমধ্যে কালীনারায়ণপুরে এসে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। দরজার কাছে প্রহরী হিসেবে দু-তিনজন ভেন্ডার রয়েছে, চেনা এবং দলের লোক না হলে তারা আর কাউকে উঠতে দেবে না। চেঁচামেচি শুনে বুনো রঘু আবার উঠল।—কি হয়েছে রে রামা?

—দেখো না রঘুদা, বলছি জায়গা নেই—তবু জোর করে উঠবে।

দড়ির জাল দিয়ে ঢাকা বড় ঝুড়িতে উঁচু করে সাজানো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-কড়াই-বালতি নিয়ে একজন রোগাপানা নিরীহ চেহারার লোক কাকুতি মিনতি করছে। রঘু তাকে বলল—ঝামেলা কোরো না, পরের লোকাল ফাঁকা আসছে, পরের লোকালে যাবে—

লোকটা এ লাইনে বোধ হয় নতুন, বুনো রঘুকে চেনে না। সে তবু মাথায় বোঝা নিয়ে ফাঁক-ফোকর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। রঘু আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। দু'হাতে লোকটার মাথার ঝুড়ি ধরে নামিয়ে রাখল প্ল্যাটফর্মে, তারপর লোকটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে কয়েক পা হেঁটে তাকে বসিয়ে দিল লোহার ওজনকলের ওপর। সবাই হাসতে লাগল নতুন মজা দেখে।

ট্রেন ছাড়ল। বাজার কামরা থেকে একটা সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার উঠল—গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। রঘুদা, তাড়াতাড়ি করো—

বুনো রঘু দুম দুম করে ভারি পায়ে দৌড়ে এসে কামরায় উঠে পড়ল, মাল রাখার চওড়া বেঞ্চির ওপর নিজের জায়গায় জমিয়ে বসে হাতের তালুতে খানিকটা খৈনি ডলতে ডলতে বলল—শোন সবাই, গতকাল থেকে বৈঠকখানা বাজারে সবরকম কাঁচামালের ওপর কিলোতে দেড়টাকা দুটাকা করে দাম বাড়িয়েছে দোকানিরা। আমরাও আজ মাল বুঝে বাজরায় পনেরো থেকে কুড়ি টাকা দাম চড়াব। আগের দামে কেউ বেচবে না—

পাঁচু, হরিপদ আর কাশী উলটোদিকের দরজার কাছে ফাঁকফোকর খুঁজে বসে গিয়েছিল। রঘুর কথায় লাভের গন্ধ পেয়ে সে কান খাড়া করল। খেঁকুরে লোকটা সন্দেহ মেশানো গলায় বলল—কিন্তু এ নিয়ে গোলমাল হবে। কলকাতার ফড়েরা বেশি দাম দিতে চাইবে না। আমরাও তো আগে কিছু বলিনি—

রঘু চোখ গরম করে বলল—কোন শালা গোলমাল করবে? বলবি, আমার এই দর—কিনতে হয় কেনো, নইলে কাটো—

—যদি না কেনে?

ওর বাবা কিনবে। একদিন কাঁচামাল না তুললে কলকাতার বাজারের অবস্থা বুঝতে পারছিস? মোটকথা দর হেঁকে বসে থাকবি, টসকাবি না।

গোলমাল হলে তুমি একটু দেখো রঘুদা। আমরা তোমার কথাই শুনব।

খৈনি মুখে ফেলে রঘু বলল—কোং বিয়োডের সঙয় ওঘু টোদের পাশে দাঁড়ায়নি?

রানাঘাটের পর থেকেই বাজরা ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। এটাই শেষ অফিস গাড়ি। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা কাতারে কাতারে উঠে ভরিয়ে ফেলল কামরা। তারা দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য। এদিকের স্টেশন থেকে মাল উঠবে আবার সেই অফিস টাইম কেটে গেল তারপর। ভেন্ডাররা কেউ কেউ উদাসমুখে বিড়ি টানতে লাগল। কেউ বা ঝুড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। একদল বসে গেল পাত্তিতে দশ পয়সা বাজি রেখে ফিশ খেলতে।

হরিপদ কাশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বোম্বাইয়ের হিরোইনদের নাম বসিয়ে তৈরি একটা রগরগে আদিরসাত্মক গল্প শোনাচ্ছিল। গল্পটা সে তিন-চারদিন আগে পাঁউরুটিওয়ালা জগন্নাথের কাছে শুনেছে এবং এই ক'দিনে অন্তত দশ-বারোজন বন্ধুর কাছে বলে বেশ নাম কিনেছে। শুনে কাশী হেসে আকুল! হাসতে হাসতেই সে পাশ ফিরে গল্পটা পাঁচুর কানে চালান করতে গিয়ে চমকে উঠল। পাঁচু ডানহাত দিয়ে পেট চেপে ধরে চোখ বুজে কামরার দেয়ালে মাথা এলিয়ে রয়েছে। হরিপদও গল্প বলার ঝোঁকে এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এবার সে পাঁচুর কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বলল—কি হয়েছে তোর? এই পাঁচু—

—পেটে ব্যথা করছে হরিপদদা।

—কখন থেকে? কি খেয়েছিলি রাত্তিরে?

—ভাত, কুমড়োর তরকারি আর ডাল। সকালে চিঁড়ে ভিজিয়ে লেবু দিয়ে খেয়ে বেরিয়েছি। খাওয়ার জন্য হয়নি হরিপদদা, ব্যথাটা আজ মাস দুই ধরে মাঝে মাঝে হচ্ছে—

—ডাক্তার দেখাসনি?

—সিমহাটের হেলথ সেন্টারে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলল বায়ু আটকে অমন হচ্ছে। সেখানকার ওষুধ খেয়ে কদিন ভাল ছিলাম। আবার এই—

—শুয়ে থাক, চুপ করে শুয়ে থাক। কমে যাবে এখন—

ওরা ওর মধ্যেই একটু সরে সরে পাঁচুর শোবার ব্যবস্থা করে দিল। মিনিট কয়েক শুয়ে থেকেই পাঁচু উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে বলল—হরিপদদা, আমি বমি করব—

কাশী পেছন থেকে ধরে রইল, হরিপদ উলটোদিকের দরজার কাছ থেকে একটা বাজরা সরিয়ে কিছুটা ফাঁকা করল। পাঁচু মুখ বাড়িয়ে বমি করতে লাগল। পেটে বিশেষ কিছু ছিল না, মুখ দিয়ে সুতোর মত লাল বেরিয়ে দমকা বাতাসে উড়ে যেতে লাগল।

কামরায় বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে। সবাই মালের ওপর দিয়ে হুড়োহুড়ি করছে পাঁচুকে একবার দেখার জন্য। ট্রেন পেরিয়ে যাচ্ছে কাঁচড়াপাড়া।

পাঁচু আবার শুয়ে পড়েছে চিত হয়ে। কাশী বলল—একটু ভাল লাগছে এখন।

—নাঃ। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ওঃ বাবা!

পাঁচুর শরীরটা মুচড়ে উঠতে লাগল। তার চোখদুটো কেমন ঘোলাটে মতন হয়ে এসেছে। নাকের ফুঁপি ফুলে উঠছে। হরিপদ অভিজ্ঞ লোক, সে বলল—কাশী, এর রকম

আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চল, শেয়ালদায় নেমে এক হাসপাতালে নিয়ে যাই—

—আমাদের মালের কি হবে?

—দাঁড়া, দেখছি কি করা যায়।

সব ঠিক হয়ে গেল। ওদের গ্রাম থেকেই কিঙ্কর এসেছে বেগুনের বাজারা নিয়ে। সে কুলি দিয়ে কাশী, হরিপদ আর পাঁচুর মালও নিয়ে যাবে। বিক্রি করে ফেরার সময় একবার হাসপাতালে খোঁজ নেবে, যদি তখনো এরা থাকে। এই কষ্টটা করার জন্য এরা ঝুড়িপিছু দশটাকা করে কিঙ্করকে দেবে।

শেয়ালদা পৌঁছতে পৌঁছাতে পাঁচু আরও দু-তিনবার বমি করল। পাঁচুকে ট্রেন থেকে নামিয়ে প্ল্যাটফর্মে গামছা পেতে শুইয়ে দিয়ে হরিপদ একজন কুলিকে জিজ্ঞেস করল—ভাই, হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাবার কি ব্যবস্থা করি বলতে পারো?

স্টেশনের ডাক্তারখানা থেকে স্ট্রেচার পাওয়া গেল, আর বইবার জন্য দুজন লোক। স্ট্রেচার বিনা পয়সায়, যারা বইবে তাদের দিতে হবে দশ দশ কুড়ি টাকা। হরিপদ জিজ্ঞাসা করল—সরকারি ডাক্তারখানায় পয়সা দিতে হবে কেন?

যারা বইবে তাদের মধ্যে একজন বলল—স্ট্রেচার সরকারি, আমরা তো আর সরকারি লোক নই। আমরা বাইরে থেকে এসে ভাড়া খাটি। তোমাদের না পোষায়, তোমরা নিজেরা বয়ে নিয়ে যাও। সঙ্গে এদের লোক যাবে, তারা স্ট্রেচার ফেরত নিয়ে আসবে—

রাগের মাথায় একবার হরিপদ ভাবল তাই করবে। বেটারা মানুষের বিপদ থেকে ফায়দা লোটে! পরে ভেবে দেখল সেটা ঠিক হবে না। অভ্যেস নেই, যদি হাত ফসকে যায় হঠাৎ তাহলে পাঁচুটা মরেই যাবে। মাথায় করে এক কুইন্টাল ওজন সে যখন তখন বয়ে দিতে পারে, কিন্তু অমন হাতল ধরে সামনে-পেছনে—নাঃ, যাকগে কুড়িটা টাকা, আগে পাঁচুর প্রাণটা বাঁচুক।

রেলের ডাক্তারখানার লোকেরা সব চেনে। তারা রোগী নিয়ে হাজির করল হাসপাতালের এমার্জেন্সি রুমে। ওপাশে টেবিলের ওপর শোয়ানো একটা বছর বারো তেরোর ছেলের কেটে যাওয়া গাল সেলাই হচ্ছে। ছেলেটা চেঁচাচ্ছে ষাঁড়ের মতন। ছোকরা ডাক্তার নির্বিকারভাবে প্যাট প্যাট করে সেলাই করতে করতে ধমকাচ্ছে—চুপ কর, নইলে ঠোঁটসুদ্ধু সেলাই করে দেব—

এপাশে আর একটা বড় টেবিল। তার ওপর পাঁচুকে রাখা হল। ছোকরা ডাক্তারের মেজাজ ভারি গরম, বাচ্চাটার গাল সেলাই করে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল—এর কি হয়েছে? কে সঙ্গে এসেছে এ রোগীর?

হরিপদ বলল—আমরা ডাক্তারবাবু—

—কি হয়েছে এর?

—বলছিল পেটে ব্যথা। আমরা কাঁচামাল বিক্কিরি করতে আসি কেষ্টনগর লাইন থেকে। তা গাড়ির মধ্যেই ব্যথা উঠেছে সেই পায়রাডাঙা থেকে, বমিও করেছে দু-তিনবার—

—বমি করেছে?

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু।

পাঁচু ব্যথায় বেঁকে বেঁকে উঠছে। পেটে একটুখানি হাত দিয়ে দেখে নিয়ে ছোকরা ডাক্তার বলল—এর এখুনি অপারেশন করতে হবে। একে অন্য কোথাও নিয়ে যাও—

কাশী আর হরিপদ দু-জনেরই মুখ শুকিয়ে গেল। ব্যাপারটা যে এতখানি গুরুতর তা তারা বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাইয়ে ব্যথাটা একটু নরম পড়লে পাঁচুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এ আবার কি হাঙ্গামায় পড়া গেল।

হরিপদ জিজ্ঞাসা করল—ওর কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?

—কি হয়েছে বললে বুঝবে? অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে—বুঝতে পারলে কিছু? এখুনি অপারেশন না করলে বিপদ আছে—

—আপনি এখানেই ভর্তি করে নিন। এখানে হবে না অপারেশন?

—আমাদের হাসপাতালে বেড খালি নেই। আরও তো হাসপাতাল আছে, সেখানে নিয়ে যাও না। আর জি কর, ন্যাশানাল মেডিকেল—

হরিপদ অনুনয়ের সুরে বলল—কোথায় যাব ডাক্তারবাবু? আমরা কলকাতার লোক নই, কিছু চিনি না। এখানেই ভর্তি করে নিন—

ছোকরা ডাক্তার রেগে বলল—চেনাচেনির কি আছে? ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালের নাম বললেই নিয়ে যাবে। বেড না থাকলে আমি কোথায় ভর্তি করব।

এই সময় গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে আর এক ডাক্তার এসে হাজির।

—কি হয়েছে দিলীপ? কি কেস?

—দেখ না কাণ্ড। অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, সম্ভবত পেরিটোনাইটিস হয়ে গিয়েছে। বলছি অন্য কোথাও নিয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা করতে, তা শুনবে না—

দ্বিতীয় ডাক্তারটি প্রসঙ্গটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল—তোর ডিউটি অফ হবে কখন? বিকেলে ফ্রি আছিস?

—এই তো আর একটু পরেই, রিলিফ এলে কেটে পড়ব। কেন?

—প্রোগ্রাম আছে, পরে বলব। তিনটের সময় নিজের রুমে থাকিস।

পাঁচু টেবিলের ওপর কাত হয়ে শোবার চেষ্টা করতে করতে গোঁ গোঁ করে উঠল। কাশী কাছে গিয়ে বলল—কি হয়েছে, ও পাঁচু? কিছু বলবি?

পাঁচুর চোখ ঘোলাটে, ঠোঁটের কোণে ফেনা। সে বলল—জল খাব—

কাশী হরিপদর দিকে তাকিয়ে বলল—জল খেতে চাইছে হরিপদদা। বাইরে থেকে একটা ডাব কিনে এনে দেবে?

ছোকরা ডাক্তার শুনতে পেয়ে বলল—জল দেওয়া চলবে না, আগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করো গে যাও। এখন মুখ দিয়ে যা খাওয়াবে সব বমি হয়ে যাবে—রোগীর অবস্থা খুব খারাপ।

এমার্জেন্সি রুমের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে একজন চালাক চেহারার লোক ইশারা করে কাশী আর হরিপদকে ডাকছে। কাশী দেখতে পেয়ে হরিপদর গা ঠেলে বলল—ওই দেখো হরিপদদা—।

বাইরে যেতেই লোকটা বলল—এখানে কথা হবে না, একটু এদিকে এসো—

কয়েক পা সরে তার সবুজ শার্টের পকেট থেকে চার্মস বের করে ধরাল লোকটা। ঠোঁট ছুঁচোলো করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল—কি কেস? সার্জিকাল?

ওরা দুজন বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে মুঠো করে টান দিতে দিতে লোকটা বুঝদারের মত হাসল, বলল—গ্রামে বাড়ি, তাই না?

—হ্যাঁ, কৃষ্ণনগর লাইনে। আপনি কে?

—আমি? আমাকে সবাই নাড়ুদা বলে ডাকে। আমি—এই—মানুষের উপকার করে বেড়াই আর কি। তোমাদের কি অপারেশনের কেস?

হরিপদ বলল—হ্যাঁ, কিন্তু এখানে ভর্তি করতে চাইছে না।

নাড়ুদা অমায়িকভাবে হেসে বলল—নেবে নেবে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। একটু বাদেই এই ডাক্তারের ডিউটি বদলে যাবে, ততক্ষণ একটু ডুব দিয়ে থাক কোথাও। একে বললেও হয়, তবে একবার তোমাদের 'না' বলে দিয়েছে—একটু খারাপ দেখায়, বুঝলে না?

কাশী জিজ্ঞাসা করল—আপনি বললে পাঁচুকে ভর্তি করে নেবে?

—তা নেবে। আমরা সব লোকাল লোক, আমাদের সবাই ভয় পায়। মেলা তেন্ডাই-মেন্ডাই করলে পুরো ফোর্থ ক্লাস স্টাফ খেপিয়ে দেব। ব্যস্, অমনি হাসপাতাল বন্ধ। আমাকে কেউ অমান্য করে না। ভাল কথা, গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও দেখি—সব ব্যবস্থা করে আসি।

কাশী আর হরিপদ পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। নাড়ুদার সামনে নিজেদের ভেতর আলোচনা করবার সুযোগ নেই। কিন্তু বাইরের পৃথিবীটার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সংঘাতই যাদের কাছে জীবনের অপর নাম, তারা প্রয়োজনের সময় আপন গোত্রের মানুষের দিকে তাকালেই অনেক কথা বুঝে যায়।

নাড়ুদা বলল—ভয় নেই, নাড়ু একবার টাকা নিলে বেইমানি করে না—দাও টাকাটা। আর বিশ্বাস না হয় অন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারো কিন্তু সেখানেও আমার মত কারও সাহায্য না নিলে রোগী ভর্তি করতে পারবে না। যাবে? বলো তো আমিই, ট্যাকসি ডেকে এনে দিচ্ছি—

কোনো কথা না বলে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির ফাঁস আলগা করে কোমরের কাছে ঝোলানো ক্যাম্বিসের ছোট থলে থেকে টাকা বের করতে লাগল হরিপদ। টাকা হাতে পেয়ে নাড়ুদা বলল—চুপ করে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি—

কাশী এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল—টাকাটা মেরে দেবে না তো হরিপদদা?

—দিলে কি করবি? তবে যারা টাকা নিয়ে কাজ করে তাদের কথার ঠিক থাকে—

সত্যিই মিনিট পনেরোর মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। নাড়ুদা ওদের নিয়ে গেল দোতলায়, চশমা চোখে গম্ভীর চেহারার ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—পাঁচুগোপাল বারুই তোমাদের পেসেন্ট? তোমরা তার কে হও?

হরিপদ বলল—আজ্ঞে, আমরা কেউ হই না। এক গ্রামে আমাদের বাড়ি, এক গাড়িতে রোজ মাল বেচতে আসি কলকাতা। আজ গাড়ির মধ্যেই পাঁচুর ব্যথা উঠেছে—

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—মাল বেচতে আসো? কি মাল?

—কাঁচামাল। বেগুন, ঢেঁড়স, এঁচোড়, যে সিজিনের যা—

—তোমাদের ওদিকে তরি-তরকারি বেশ সস্তা, কি বলো? মাল বেচে লাভ হয়?

লাজুক ভঙ্গিতে ঘাড় চুলকে হরিপদ বলল—আজ্ঞে, তা সামান্য কিছু—

—তোমরাই ভাল আছ। টাটকা সবজিও খাচ্ছ, আবার বিক্রি করে মুনাফাও পাচ্ছ—

এ কথার বিশেষ কোনো উত্তর হয় না। হরিপদ চুপ করে রইল।

—এই পেসেন্টের এখুনি অপারেশন করতে হবে। বন্ড সই করবে কে? বন্ড বুঝলে? একজন নিকট আত্মীয়কে লিখে দিতে হবে যে রোগী মারা গেলে হাসপাতাল তার জন্য দায়ী নয়—

—পাঁচুর তো কেউ নেই। কেবল এক বুড়ি পিসি আছে। আমরা লিখে দিলে হবে না?

ডাক্তারবাবু বললেন—সই করতে পারো?

—না তো?

—তাহলে? আচ্ছা, টিপছাপ দিও এখন। লিখে দিচ্ছি তুমি পেসেন্টের খুড়তুতো ভাই। ঠিক আছে? এসো, এদিকে সরে এসো—

বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে হরিপদ জিজ্ঞাসা করল—পাঁচু ঠিক হয়ে যাবে তো? কি রকম বুঝছেন ডাক্তারবাবু?

—কিছু বলা যায় না, অবস্থা খুব খারাপ। এ তো একদিনে হয়নি, এতদিন কি বসে বসে ঘাস কাটছিলে? যাও, এই ওষুধগুলো এখুনি কিনে এনে ওয়ার্ড ইনচার্জের হাতে দাও—

অনেক ওষুধের নাম লেখা একখানা কাগজ ডাক্তারবাবু বাড়িয়ে ধরলেন।

নীচে এসে হরিপদ বলল—নাড়ূদা, সরকারী হাসপাতালে ওষুধ কিনে দিতে হবে কেন?

—এসব ওষুধ কোনো হাসপাতালেই থাকে না। থাকার কথা, কিন্তু থাকে না। যাও, কাছেই দোকান আছে, কিনে নিয়ে এসো। অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলেছে তো? ও প্রেসক্রিপশন আমার মুখস্থ আছে—আড়াইশো টাকা লাগবে।

ট্যাকসি থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে করে নামানো হচ্ছে এমার্জেন্সির সামনে। তাড়াতাড়ি ওষুধ এনে দাও, অপারেশন শুরু হল বলে—চার্মসের দগ্ধাবশেষ ছুঁড়ে ফেলে নাড়ূদা সেদিকে ছুটে গেল পরোপকারের তাড়নায়।

হরিপদ বলল—তোর কাছে কত টাকা আছে কাশী?

—শতখানেক হবে। তোমার?

—আমিও একশো এনেছিলাম, তার ভেতর সত্তর বেরিয়ে গেল এদের পেছনে। মুশকিল হল তো। চল, বৈঠকখানার দিকে যাই। এতক্ষণে মাল বেচা হয়ে গিয়েছে। আমাদের টাকা ছাড়াও কিছু ধার করতে হবে, কখন কি দরকার হয়—বুঝলি না?

বেশিদূর যেতে হল না, হাসপাতালের গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ওদের পুরো দলটা, কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে আছে। কিঙ্করই প্রথম চেঁচিয়ে উঠল—এই যে হরিপদদা—আমরা এখানে!

সব্বাই এসেছে। কিঙ্কর, পবিত্র, নেপাল, অমূল্য—এমন কি বুনো রঘু পর্যন্ত!

হরিপদ বলল—তুমি এসেছো রঘুদা!

রঘুর মুখ গম্ভীর। সে বলল—আসব না কি রে। পাঁচু আমার গাঁয়ের ছেলে নয় বটে, কিন্তু আজ দশ বছর একসঙ্গে যাতায়াত করছি। ডাক্তার কি বলল?

—ভাল নয়, পেট কাটতে হবে। আমরা ওষুধ কিনতে যাচ্ছিলাম—

কিঙ্কর এগিয়ে এসে বলল—তোমাদের টাকাটা নিয়ে নাও হরিপদদা। পাঁচুর টাকাটাও রাখো। আজ আমরা রঘুদার দরেই বিক্রি করেছি—

কোমরের গেঁজে থেকে টাকা বের করে দিল কিঙ্কর। হরিপদ গুনে নিয়ে কিছু টাকা

আলাদা করে বাড়িয়ে ধরে বলল—এই নে—

কিঙ্কর অবাক হয়ে বলল—কিসের টাকা হরিপদদা?

বলেছিলাম দেব, চারজনের মাল একা বিক্রি করলি—খাটনি তো কম না!

—ছিঃ হরিপদ দা! তুমি আমাকে এত ছোট ভাবলে? পাঁচুর অসুখ না হলে হাসিমুখে ও টাকা নিতাম, কিন্তু আজ নয়—

ওষুধ কিনে ওপরে পৌঁছে দিয়ে আসা হল। ঠিক হল এরা আজ কেউ বাড়ি যাবে না। প্রয়োজন হলে রাত্তিরে থাকবে। কিঙ্কর রাত আটটার লোকালে ফিরে গিয়ে সবার বাড়িতে খবর দেবে।

নাড়ুদা মাঝখানে একবার এসে দলটাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল। বোকাসোকা দু-একজন গ্রাম্য লোক নিয়েই কারবার ভাল চলে। কিন্তু এতবড় দল ভাল কথা নয়। এরাই অসুবিধা পেলে কিংবা রোগীর ভালমন্দ কিছু হলে ডাক্তার পেটায়, ভাঙচুর করে। নাড়ুদা হরিপদকে বলল—এই যে ভাই, তোমরা সবাই রইলে তাহলে। আমি চট করে বাড়ি থেকে দুটো ভাত খেয়ে আসি। চারটের সময় ভিজিটিং আওয়ার, তার আগেই চলে আসব এখন—

নাড়ুদার সঙ্গে ওদের আর কখনো দেখা হয়নি।

রঘু বলল—চল সবাই, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। রাস্তার ওপারে একটা দোকানে খুব ভাল আলুর দম করে। হাফ পাউন্ড পাঁউরুটি দিয়ে একপ্লেট আলুর দম—তারপর চা। চল—

কাশী ছেলেমানুষ, সে বলল—হোটেলে ভাত-তরকারি খেলে হত না রঘুদা?

—না। পাঁচু যদি—মানে পাঁচুর অসুখের জন্য কত টাকা দরকার হয় ঠিক কি? কলকাতার হোটেলে আট-দশজন মিলে খেতে কত লাগে জানিস?

ফুটপাথের ওপর উবু হয়ে দলটা বসে গেল। সামনের টিনের তোবড়ানো প্লেটে দু'টুকরো আলু আর কিছুটা তরল লাল রঙের ঝোল, হাতে পাঁউরুটি। রুটি ডোবালেই সাঁ সাঁ করে ঝোল টেনে নিচ্ছে। অর্ধেক রুটি শেষ হতে না হতে ঝোল শুকিয়ে কাঠ। রঘু বলল—আমাদের আরও এক হাতা করে ঝোল দাও হে—

দোকানি বলল—ঝোল আর হবে না।

—তা হলে আমরা শুকনো রুটি খাবো কি করে? ইয়ার্কি নাকি?

—আর এক প্লেট করে আলুর দম নাও, তাতে ঝোল থাকবে।

তর্কাতর্কি কিছুক্ষণ চলার পর রঘু হঠাৎ কথা থামিয়ে চোখ ছোট ছোট করে ফেলল, তারপর দোকানির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে লাগল। এরকম ক্ষেত্রে কি করতে হবে অন্যরা সবাই জানে। তারা কেউ রঘুর হাত, কেউ কোমর জড়িয়ে কাতর অনুনয় শুরু করে দিল—ছেড়ে দাও রঘুদা, তোমার পায়ে পড়ি—গেল হপ্তার মত কোরো না! ওঃ, সেদিন কি রক্তারক্তি! এ লোকটা তোমায় চেনে না তাই দুটো কথা বলে ফেলেছে। এই অমূল্য, ধর না চেপে ভাল করে—

রঘু নিঃশ্বাস আটকে রেখে শরীর ফুলিয়ে গলার মধ্যে বোবায় ধরার মত অদ্ভুত শব্দ করছে। দোকানির মুখ শুকিয়ে এসেছে। কিঙ্কর তাকে চুপিচুপি বলল—তুমি ভাই আর একটু ঝোল দিয়ে দিলেই পারতে। বড্ড গোঁয়ার লোক। পাড়ার একটা কুকুর ওর মুরগি খেয়েছিল। কুকুরটা এখন তিনপায়ে লেংচে বেড়ায়। শুধু হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল পা

খানা-

তা আমি কি দেবো না বলেছি নাকি? অমন কথাবার্তা একটু হয়েই থাকে, তাতে এত রাগ করলে চলে?

শুনে রঘু গোঁ গোঁ শব্দ করে এগিয়ে আসার জন্য একটা ঝটকা দিল। কিঙ্কর ব্যস্ত হয়ে বলল—না না, রঘুদা! ঝোল দেবে বলেছে, এই তো দিচ্ছে, তুমি বসো—

হাসিঠাট্টায় বেলা গড়িয়ে যায়। আদা, দারচিনি, এলাচ দেওয়া বড় বড় এক গ্লাস করে চা খেয়ে ওরা ফিরে আসে হাসপাতালে।

বেলা চারটের সময় ওরা সন্তর্পণে দোতলায় ওঠে। দলটাকে দেখে সিনিয়র মেট্রন ধমকায়—কি হল, এত লোভের ভিড় কেন এখানে?

আমাদের রুগী আছে—পাঁচু। পেটে অপারেশন হয়েছে—

—বেড নম্বর তেতাল্লিশ। দু-জন দু-জন করে যাও, বাকি সব অপেক্ষা করো বাইরে।

পাঁচুর বেডের পাশে দাঁড়িয়ে কাশীর গলা শুকিয়ে গেল। বেডের পাশে লোহার স্ট্যান্ড থেকে স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। হাতের শিরায় ছুঁচ ফোটানো, নাকে অক্সিজেনের নল। মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে রয়েছে, জ্ঞান নেই। ওয়ার্ডের ভেতর ওযুধপত্র, লাইজল, প্রস্রাব এবং রোগীদের গায়ের গন্ধ মিশে একটা অপ্রীতিকর মিশ্র ঘ্রাণ পাক খাচ্ছে। অজ্ঞান অবস্থার মধ্যেই পাঁচুর কেমন একটা হেঁচকি উঠছে মাঝে মাঝে। ব্যাপার দেখেশুনে প্রথমেই কাশীর মনে হল—যাঃ, পাঁচুটা আর বাঁচবে না।

ওরা বাইরে এসে মেট্রনকে বলল—দিদি, আমাদের রুগীর হেঁচকি উঠছে কেন?

—পেসেন্টের অবস্থা ভাল নয়। পেটের মধ্যে অ্যাপেনডিক্স ফেটে গিয়েছিল। তোমরা কেউ চলে যাবে না, নীচে অপেক্ষা করবে।

—পাঁচু বাঁচবে তো?

—আমি কি করে বলব? আমি কি ভগবান? যাও, নীচে গিয়ে বসো—

—হেঁচকি উঠছে, একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকলে হত না।

কটমট করে তাকিয়ে মেট্রন বলল—ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে ডাক্তারবাবু রাউন্ডে আসবেন। ভিড় কোরো না এখানে, সরো—

কাশীর কাছে মেট্রনের আচরণ কেমন যেন স্নেহহীন, নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। তাদের গ্রামের ছেলে, তাদের বন্ধু ভয়ানক অসুস্থ। এমন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে কি আর একটু মিষ্টি করে কথা বলা যেত না? বাতাসে বিশ্রী অসুখ অসুখ গন্ধ, পাঁচুর চেহারা আর মেট্রনের নীরস কথা—সব মিলিয়ে হাসপাতাল জায়গাটা তার মোটেও পছন্দ হয় না। এখানে আবার মানুষ আসে সারতে!

সন্ধে ছ'টা পনেরোয় পাঁচু মারা গেল।

হরিপদই ওপর থেকে খবরটা নিয়ে এল। তখন ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়েছে, জনস্রোত চলেছে বেরোবার গেটের দিকে। ওদের দল একজায়গায় জড় হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

কাশী অন্যমনস্কভাবে বলল—আমি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম পাঁচু বাঁচবে না। আমার মনে হয়েছিল—

রঘু জিজ্ঞাসা করল—পাঁচুর বাড়িতে কে কে আছে রে?

হরিপদ বলল—এক বুড়ি পিসি ছাড়া পাঁচুর আর কেউ নেই। বাড়ি ফাঁকা—

তা হোক, তবু আমরা তো আছি। গাঁয়ের ছেলেকে সাজিয়ে নিয়ে ফিরব। কিঙ্কর তুই গিয়ে হাটতলায় খবর দিয়ে সব দোকানিকে নিয়ে মোড়লের চালায় থাকতে বল, সবাই ঘাটে যাবো। বলবি কাল হাট বন্ধ থাকবে পাঁচুর জন্য। আর হ্যাঁ, তোর মাকে বলিস পাড়ার দু-একজন বৌ-ঝিকে নিয়ে পাঁচুর পিসির কাছে চলে যেতে—বুড়ি যদি আবার খবর পেয়ে হার্টফেল করে—

ডেথ সার্টিফিকেট পেতে পেতে ঘণ্টাদেড়েক। তারপর ওরা বেরুলো একখানা মাটাডোর ভ্যান ভাড়া করতে আর ফুল কিনতে। রঘু যেন হঠাৎ বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে পড়েছে। গাড়ি যে চালায়, ফুল যে বিক্রি করে, তারা এক পয়সাও দাম কমাল না। কিছু কম করার কথা বলতে অভদ্রের মত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সবাই প্রথমবার আশায় আশায় বুনো রঘুর দিকে তাকিয়েছিল। এবার রঘুদা ক্ষেপে উঠে তার ম্যাজিক দেখিয়ে দেবে। কিন্তু রঘু আস্তে আস্তে শান্ত গলায় বলল—দিয়ে দে হরিপদ, সব ফুল কিনে নে। আজ পাঁচু মারা গেছে, আজ আমরা কারও সঙ্গে ঝগড়া করব না, কারও মনে কষ্ট দেব না—

হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় আর আর্দালিরা জুটে গেল গন্ধে গন্ধে। পাঁচুর দেহ স্ট্রেচারে করে নামিয়ে ভ্যানে তুলে দেবার জন্য তারা চাইল একশো টাকা। হরিপদ বলল—একেবারে গলা কেটো না হে। একটা লোকের মৃত্যু হয়েছে। এই কি মুচকে টাকা আদায় করার সময়? পঞ্চাশ টাকা নাও এখন—

—হবে না। বডি নামাতে আমরা পার্টির কাছে দেড়শো টাকা চার্জ করি, তোমাদের কমিয়ে বলেছি—

বুনো রঘু বলল—দিয়ে দে হরিপদ, দিয়ে দে। মৃত্যু নিয়েই ওদের কারবার—

তারপর ভি. আই. পি. রোড, যশোর রোড হয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে অন্ধকার ফুটো করে ওদের নিয়ে গাড়ি চলল ফেরার পথে। কেউ বিশেষ কথা বলছে না, মাঝে মাঝে ধ্বক ধ্বক করে উঠছে বিড়ির আগুন। জীবনে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার যুদ্ধকে ওরা যেমন সহজভাবে মেনে নিয়েছে, মৃত্যুকেও ঠিক তেমনি করেই। শোক ওদের স্পর্শ করে, অভিভূত করে না। মৃত্যু সত্য, কিন্তু বেঁচে থাকাটা তার চেয়েও বড় সত্য।

হাওয়া আড়াল করে বিড়ি ধরিয়ে কাঠিটাকে অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে দিল রঘু। বিরোহী আর চাকদার মধ্যে রাস্তা খুব খারাপ। ভাঙাচোরা, বড় বড় গর্ত। গাড়ি লাফাচ্ছে, ঝাঁকুনি খাচ্ছে অনবরত। ঝাঁকুনিতে পাঁচুর মাথাটা গড়িয়ে পড়ছে বালিশ থেকে। মোটা মোটা লোমশ দুটি হাত দিয়ে রঘু সযত্নে মাথাটা আবার তুলে দেয় বালিশে, তারপর বিড়িতে বড় বড় গোটা দুই টান দিয়ে এদিকে ফিরে হরিপদকে বলে—ঘাটেই আজ রাত ফুরিয়ে যাবে। কাল পাঁচুর জন্য বন্ধ দেব। পরশু সাড়ে-সাতটার লোকাল ধরতে সব্বাই ইস্টিশানে চলে আসবি, বুঝলি? কাল ইরফানকে বলে দিবি বাজরা বেঁধে রেডি করে রাখতে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—সামনে মাসে হাটতলাতে যাত্রা হবে, রক্তের দাম নামে পালা। দু'খানা টিকিট জোগাড় করে রাখিস তো, তুই আর আমি যাব।

তাদের সঙ্গে

আমি যেখানে শুয়েছিলাম অন্য কেউ ছিল না। কেউ না। কেবল বহু ওপরে একটা সোনালী চিল দু'দিকে ডানা মেলে দিয়ে অথই শূন্যে বেড়াচ্ছিল। শীতের দিনের শেষ বেলার নরম রোদ্দুরে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম নদীর পাড়ে ঘাসের ওপরে। মনের মধ্যে কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ রোদ্দুরের নেশা। চারিদিকে বাবলা গাছ। গাছের ঝিরঝির পাতার মধ্যে দিয়ে হালকা হালকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দু একটা বনফুলের অথবা শ্বেত আকন্দের ঝোপ। আমি শহুরে মানুষ। এই পরিবেশ অনেক দিন বাদে আমার ভাল লাগছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা নামে। ক্রমে অন্ধকারে বনফুল আর শ্বেত আকন্দের ঝোপ মিলিয়ে আসতে থাকে। চিল নেমে আসে নিচে। আমি উঠি না। আমি চুপ করে শুয়ে শুয়েই দেখি কি ভাবে শীত সন্ধ্যার মায়াবী স্পর্শে অতি পরিচিত পৃথিবীর মুখকে বিদেশী রমণীর মত অচেনা করে দিচ্ছে।

এমন সময় তারা বেরিয়ে আসে এক এক করে।

বাবলা গাছের আড়াল থেকে, কুলঝোপের পেছন থেকে, অন্ধকারের মধ্যে থেকে তারা বেরিয়ে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। মৃদু গলায় ডাকে—অনিমেষ।

—কি?

—শুনতে পাচ্ছো?

—হ্যাঁ।

—এখনো সন্ধান করো?

—করি। করি বলেই তো আমি ওদের কারুর মত নই।

—আমাদের সঙ্গে যাবে?

—যাবো।

তারা আমাকে নিয়ে চললো। সেই নদী, বন, ঝর্না, প্রান্তর, মেঘ এবং গাছেদের আত্মার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আমি পরিচিত, অসুখী পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে চলে গেলাম।

তারায় তারায়

॥ এক ॥

পাহাড়চূড়ায় সূর্যাস্ত

সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। একটু পরেই সামনের অধিত্যকা ঢেকে যাবে নিবিড় অন্ধকারে। কিন্তু এখনো আলাদা আলাদা করে প্রতিটি শিলাখণ্ড বোঝা যাচ্ছে। গাছের পাতার নিবিড় সবুজ রঙ চেনা যাচ্ছে। পশ্চিম দিগন্ত হেলিওট্রোপ রঙে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সূর্যাস্তের এটা স্বাভাবিক রঙ নয়, কিন্তু আজ বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা খুবই কম, ফলে আলোর প্রতিসরণ ঘটেনি। কলকাতা থেকে চারশো আর কাছের ছোট্ট শহর থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরের এই পাহাড়-জঙ্গলে ধূলোবালি এমনিই কম। সেজন্যই সরকার এখানে এই মানমন্দির বানিয়েছে। চারদিকের অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ যেন ময়দানবের মায়াপুরী। যে রাস্তাটা সমতল থেকে এঁকেবেঁকে উঠে এসেছে, তার শেষ বাঁকটা না ফেরা পর্যন্ত আন্দাজ করা যায় না এমন একটা বিরাট ব্যাপার লুকিয়ে রয়েছে বনের পাতা-লতার আড়ালে।

দোতলার পশ্চিম দিকের একটি ঘরের জানালা দিয়ে সূর্যাস্তের প্রায় মিলিয়ে আসা রঙের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সিবাস্টিয়ান ভিনসেন্ট লাকরা। মাঝারি গড়ন, পুরু ঠোঁট আর কোঁকড়া চুল আদিবাসী উৎসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। চিবুকের গঠনে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, সঙ্গে বিষণ্ণতার ছায়া।

সামনের ওই অধিত্যকার পরে পাহাড়, তারপরে অরণ্য, নদী, ভূতধাত্রী পৃথিবীর অমেয় প্রসার। তাঁর দেশ, তাঁর বন্ধুদের দেশ, মানুষের দেশ। সেখানে শান্তি নেই। মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। ঘৃণা আর ঈর্ষা করছে। বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করছে নিজেদের নির্মাণ। যে প্রযুক্তি আর জ্ঞান দিয়ে বিশ্বজয় করা যেত, তা নিয়ে বিশ্ববিনাশ করছে। কিন্তু কারো কিছু এসে যায় না। সবাই বেশ ভাল আছে।

পেছনে টেবিলে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। জানালা থেকে সরে এসে রিসিভার তুলে কানে লাগালেন ভিনসেন্ট।

—হ্যালো।

—ভিনসেন্ট? একবার আসবে আমার ঘরে?

—আসছি স্যার।

ডুরালুমিনের রেলিং দেওয়া ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে ডানদিকের লম্বা প্যাসেজের একেবারে শেষে অধ্যক্ষের ঘর। দরজার ওপরে লেখা—মণিদেব রায়, অধ্যক্ষ। আঙুলের গাঁট দিয়ে নক্ করতে ভেতর থেকে ভারী গলার শব্দ—এসো।

ছোট ঘর। অধ্যক্ষ বলে দারুণ সাজানো বিশাল অফিস নয়। মাঝারি টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র, নক্ষত্রের চার্ট। পেছনে দেওয়ালের ধারে ফাইলিং ক্যাবিনেট। টেবিলের ওধারে মণিদেব বসে আছেন। রুলার দিয়ে বড় একটা ড্রইং শিটের ওপর লাইন টানছিলেন, ভিনসেন্টের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—বসো।

আরও দুটো লাইন টেনে রুলার আর পেনসিল রেখে দিয়ে মণিদেব চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন—কেমন আছ ভিনসেন্ট?

ভিনসেন্ট হাসলেন।—এটা কী রকম প্রশ্ন হল স্যার? রোজ দেখা হচ্ছে, একসঙ্গে কাজ করছি, শরীর খারাপ হলে জানতে পারতেন না?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মণিদেব। তারপর বললেন—সে কথা নয়। আমি কী বলছি তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। গত একবছর ধরেই তুমি অন্যমনস্ক—না, কাজের প্রসঙ্গে বলছি না—সে বিষয়ে তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই। ঝকঝকে সার্ভিস রেকর্ড। কিন্তু আগে তুমি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ছিলে, হো হো করে হাসতে, সহকর্মীদের সঙ্গে মিশে আমোদ-আহ্লাদ করতে। তোমার হলটা কী? এত বিমর্ষ কেন?

মণিদেব মানুষটি ভাল। তাঁর দিকে তাকালেই মনে হয় এই মানুষটিকে মনের সব কথা খুলে বলা যায়। সহৃদয় ব্যক্তিত্বের প্রভা মানুষটিকে ঘিরে রেখেছে। ভিনসেন্ট টেবিলের ওপরে রাখা কাঁচের চৌকো পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—কালকে রাত্তিরে ওয়ালর্ড নিউজ সার্ভিস শুনেছেন? রাত বারোটার খবরটা? ইউরোপে দু জায়গায় আবার কারা দুটো বড় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বহু নিরীহ লোকজন মারা পড়েছে—

—না, কাল রাত্তিরের খবর শোনা হয়নি। কেন, তাতে কী?

—গত কয়েক বছরে সমস্ত পৃথিবীতে এমন কত বোমা ফেটেছে ভাবুন তো? কত লোক পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? পরস্পরকে কষ্ট দিয়েছে? এমন হবার তো কথা ছিল না, হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতা আর মনুষ্যত্বের চর্চা করে শেষে কী আমরা এইখানে এসে দাঁড়ালাম?

মণিদেব সামান্য অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। ভিনসেন্ট একটু দম নিয়ে বললেন—আজ বড় চমৎকার সূর্যাস্ত হয়েছিল স্যার। আপনি যখন ফোন করলেন তখন জানালায় দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলাম। কিন্তু এত সৌন্দর্যের মধ্যে থেকেও মনকে কিছুতেই স্বাভাবিক অবস্থার ভেতর বেঁধে রাখতে পারছিলাম না। মনে পড়ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই লাইন—মাচ ইট গ্রিভস মাই হার্ট টু সি হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড অফ ম্যান। যেভাবে দিনকাল এগুচ্ছে, তাতে মানব সভ্যতা তো পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে স্যার। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার মন খারাপ। কিন্তু তা ব্যক্তিগত কারণে নয়।

মণিদেব বললেন—তুমি বড় অদ্ভুত মানুষ। এসব ঘটনা আমাদের সামনেও তো ঘটছে কিন্তু এসবকে পার্ট অফ দি গেম বলে মেনে নিতে হয়। তুমি একা কী করবে?

—একা কিছুই করতে পারব না। কিন্তু আমি কী একা? সারা দুনিয়ায় মানুষ কী এর বিরুদ্ধে জেগে উঠছে না? কেন এমন হচ্ছে সে বিষয়ে আমার একটা থিয়োরী আছে—

—থিয়োরী? কীসের থিয়োরী?

পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করছেন ভিনসেন্ট। কথা বলছেন না।

—কী হল? কিসের থিয়োরী?

—স্যার, বললে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আমি যা বলব তার পেছনে কতখানি যুক্তি আর কতখানি আবেগ, তা আমিও জানি না। আপনি বৈজ্ঞানিক, যুক্তির আলোয় জীবনকে দেখেন। আপনাকে—

মণিদেব বাধা দিয়ে বললেন—বলো।

অধ্যক্ষের দিকে সোজা তাকিয়ে ভিনসেন্ট বললেন—স্যার, আমার মনে হয় এ বিপদ পৃথিবীর বাইরে থেকে আসছে।

ঘরে স্তব্ধতা। দুজনেই চুপ করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

মণিদেব বললেন—এবার সত্যিই কিন্তু থিয়োরীর যথার্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কী বলতে চাইছ তুমি?

ক্ষীণ হেসে ভিনসেন্ট বললেন—আমি তো বললামই, আমার কথা শুনে আপনার বিশ্বাস হবে না। তবু বলতে শুরু করেছি যখন, শেষ অবধি বলি।

দরজায় আবার নক। মণিদেব বললেন—কে? ভেতরে এসো—

হাতে একতাড়া কাগজপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল বিমল শ্রীবাস্তব, মানমন্দিরের একজন জুনিয়র অ্যাস্ট্রোনমার।

—স্যার কী ব্যস্ত আছেন? পরে আসব?

—না, না। বল কী ব্যাপার। আমাদের এ আলোচনায় সময় লাগবে—

—স্যার, আজ কয়েকদিন ধরে আমরা মেষরাশির কাছাকাছি অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করছি, কিছু ছবিও তোলা হচ্ছে। এই ছবি আর রিপোর্ট আমাদের বাৎসরিক পত্রিকায় ছাপা হবে। কিন্তু স্যার—

—কী?

—আমাদের প্রধান দূরবীনে কোনো গোলমাল হয়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। সাতদিন পর্যবেক্ষণ চলছে, তার মধ্যে দু-দিন অঞ্চলটা ভাল দেখা গেল না। কেমন যেন আবছা, ঝাপসা। ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। দূরবীনের মিররে কোনো ময়লা জমেনি তো? একবাব কী পজিশন রিভার্স করে মিররের কাঁচটা পরীক্ষা করা হবে?

মণিদেব ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবলেন, তারপর বললেন—প্রথম দিকে ঠিক দেখা যাচ্ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একদম পরিষ্কার?

—হ্যাঁ। কোনো অসুবিধে হয়নি দেখতে।

—হুঁ।

ভ্রূ কুঁচকেই নিজের হাতের উল্টোপিঠে তাকিয়ে রইলেন অধ্যক্ষ। তারপর বললেন—ফিল্ডটা ঝাপসা আর আবছা দেখলে কবে?

বিমল শ্রীবাস্তব বলল—পর্যবেক্ষণের পঞ্চম আর ষষ্ঠ দিন।

—আর সাতদিনের দিন?

—সাতদিনের দিন—মানে গতকাল—আবার পরিষ্কার।

—এ থেকে তুমি নিজে কী সিদ্ধান্ত করলে?

—আজ্ঞে?

মণিদেব সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—মিররে যদি ময়লা থাকে সেটা তো নিজে থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে না। ইনস্ট্রুমেন্ট রিভার্স করে ঘসে মুছে ঠিক করতে হবে। একবার ঝাপসা, একবার ঝকঝকে—এরকম হতেই পারে না। তার মানে যন্ত্র ঠিক আছে, গোলমাল অন্য কোথাও। ঠিক আছে, এই প্রজেক্টটা এখন থামিয়ে রাখো। বরং হিমযুগের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখার কৌণিক গতির তুলনামূলক স্টাডির কাজটা করো, ওটাই

ছবি-টবি দিয়ে ছেপে দেব এখন। আর এ প্রবলেমটা নিয়ে আমি ভাবছি, পরে জানাবো—

বিমল শ্রীবাস্তব বেরিয়ে যেতে ভিনসেন্ট বললেন—সমাপতন একেই বলে। আমি আপনাকে এখুনি যা বলতে যাচ্ছিলাম, বিমলের প্রবলেম তাকেই সমর্থন করে।

—কী রকম?

—আমাদের ছায়াপথ নীহারিকা এই সৌরজগতটাকে নিয়ে নিজের গতিতে মহাশূন্য দিয়ে ভ্রমণ করছে, ঠিক তো?

—ঠিক।

—মহাশূন্য তো একেবারে ফাঁকা মহাশূন্য নয়, সমস্ত মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে ধুলো আর ধোঁয়ার মেঘ। অনেক সময় আমাদের পুরো সৌরজগতটা ওই ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে। পাতলা, হালকা ধুলো, কিন্তু মহাশূন্যে বিপুল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে বলে এর প্রভাব মহাজাগতিক ব্যাপারে কম নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্যার, এখন সৌরজগৎ ওই রকম একটা মেঘের মধ্যে দিয়ে চলছে।

ভিনসেন্ট থামলেন। মণিদেবের ভ্রূ দুটো কুঁচকে দ্বিতীয় বন্ধনীর মত দেখাচ্ছে। তিনি বললেন—তো?

—স্যার, আমার মনে হয় এই বস্তুপুঞ্জের এমন কোনো ক্ষতিকর বিষময় প্রতিক্রিয়া আছে যার জন্য এমন হচ্ছে।

দুই আঙুলে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরালেন অধ্যক্ষ। তারপর পেনসিলটা রেখে দিয়ে মাথার পেছনে হাত দিয়ে আবার চেয়ারে হেলান দিলেন।

—শ্রীবাস্তবের প্রবলেমটা কী ভাবে তোমার থিয়োরীকে সমর্থন করে?

টেবিলের ওপর দুহাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়লেন ভিনসেন্ট।

—মেঘের ঘনত্ব সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও কম, কোথাও বেশি। কোথাও ব' একেবারেই নেই। সেই জন্য ওরা কখনো ফিল্ডটা দেখতে পাচ্ছে, কখনো আবছা দেখছে। এটা দূরবীনের গোলমাল নয়। মিরর ঠিকই আছে।

মণিদেব বললেন—যদি আমি ধরেও নিই এমন একটা মেঘ আছে, এবং তার প্রভাবে মানুষের হিংসাবৃত্তি বেড়ে ওঠে, পৃথিবীর এত বড় বায়ুমণ্ডল ভেদ করে তার পদার্থকণা কী ভূপৃষ্ঠে পৌঁছবে?

—হ্যাঁ স্যার, পৌঁছবে। অনেক সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু মহাজাগতিক ধুলো, পুড়ে যাওয়া উল্কার অবশেষ কী নেমে আসে না? আর যেহেতু বহুদিন ধরে আমরা মেঘটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাই একবার ভূপৃষ্ঠে ওই ধূলিকণা পৌঁছে গেলে মূল উৎস স্থির থাকার কারণে সংস্পর্শটা বজায় থাকবে।

উদ্গ্রীব হয়ে মণিদেবের দিকে তাকিয়ে আছেন ভিনসেন্ট। মণিদেব কিছু না বলে চাকাওয়ালা একজিকিউটিভ চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর টেবিলের গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা মোটা একগাছা লাঠি ডানহাতে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করায় বোঝা গেল তাঁর ডান পা বাঁ পায়ের চেয়ে একটু ছোট। হাঁটতে যে খুব কষ্ট হয় তা নয়, তবে খুব দ্রুত হাঁটতে বা দৌড়তে পারেন না, লাঠি হাতে থাকলে সুবিধে হয়। এই শারীরীক সমস্যা নিয়ে অন্য সরকারি চাকরিতে ঢোকা কঠিন হত, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাজ দৌড়ঝাঁপের নয়, আর সরকারও সব বিষয়ে সর্বকালের রেকর্ড নম্বর পাওয়া, দেশবিদেশে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে বন্দিত বিশ্ববিদ্যালয়ের

উজ্জ্বলতম রত্নটিকে ছাড়তে চান নি। কাজেই মণিদেব সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটলেও তাঁর অধীনে কাজকর্মে দৌড়ে চলে।

বাইরে তাকালেন মণিদেব, যেমন একটু আগে ভিনসেন্ট তাকিয়েছিলেন। সন্ধে এখন অনেক গাঢ় হয়ে এসেছে, রঙ মুছে গিয়েছে পশ্চিম আকাশ থেকে। ঔজ্জ্বল্যের হিসেবে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। মানে গোধূলি আজকের মত শেষ। তাঁর জানালার পেছনে নিবিড় বন অন্ধকারে ঢাকা। কেবল ওপরে তাকালে নীলচে-কালো আকাশের পটে বনস্পতির সিলুয়েট দেখা যায়। রাত্রিচর কী পোকা ডাকছে কিটকিট করে। এই সন্ধ্যার প্রসন্নতায়, প্রকৃতির এই শান্ত একান্ত মুহূর্তটির কী এক বার্তা আছে, যা বুকের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে মনকে স্থির ও স্নিগ্ধ করে দেয়। কিন্তু এই শান্তির মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকি আছে। যদি ভিনসেন্টের কথা সত্যি হয়? যদি সত্যিই একটা কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মধ্য দিয়ে সমস্ত সৌরজগতটা ছুটে চলেছে এমন হয়? তাহলে কতদিন চলবে সেই বিপদ তা কেউ বলতে পারে না। কে জানে বিপুল মহাশূন্যের প্রসারে ছড়িয়ে থাকা বিষবাষ্পের ব্যাপ্তি কতখানি। আগামীকালও শেষ হয়ে গিয়ে পৃথিবী নির্মল, মুক্ত মহাকাশে বেরিয়ে আসতে পারে, আবার এক হাজার দুহাজার কী পঞ্চাশ হাজার বছরও চলতে পারে। হিংসা আর বিদ্বেষের আবহাওয়ায় বসে কী প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়? নাঃ দেখা যাচ্ছে ভিনসেন্টের থিয়োরী তাঁকে ভাবিয়ে তুলল।

ফিরে দাঁড়িয়ে মণিদেব বললেন—ভিনসেন্ট, যদি ধরেও নিই যে, তোমার বক্তব্য সঠিক, তাহলেও এটা বিরাট প্রশ্ন থাকে। এই মহাজাগতিক বিপদের বিরুদ্ধে কী প্রতিরোধ তুমি গড়ে তুলতে পারো?

অধ্যক্ষকে কিছুটা নিজের দলে আনতে পারার আনন্দে ভিনসেন্টের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—কলেরা বসন্ত পোলিও প্লেগ টাইফয়েড এসব রোগ এই সেদিনও পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াত। আমরা অসহায়ের মত দেখতাম, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা পড়ত। এই বিংশ শতাব্দীতেই শুধু প্লেগে যত মানুষ মারা গিয়েছে তার সংখ্যা দুটো বিশ্বযুদ্ধে মৃত লোকসংখ্যার চেয়ে বেশি। আর এখন? এখন আর কেউ খুব দুর্ভাগ্য না থাকলে এসব রোগে মারা যায় না। কী করে আমরা পারলাম এটা করতে? বলুন?

মণিদেব বললেন—দুটো কী একই জিনিস হল? বিজ্ঞানীরা ওসব অসুখের টিকা আবিষ্কার করেছেন, তারপর ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেন করে মানুষের শরীরে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে—

—রাইট! ঠিক বলেছেন স্যার! এক্ষেত্রেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

মণিদেব একটু বিস্মিত চোখে তাঁর সহকর্মীর দিকে তাকালেন। খুব জোর দিয়ে কথা বলছে মানুষটা, কিন্তু ঠিক বলছে কী?

সে দৃষ্টির অর্থ ভিনসেন্ট বুঝতে পারলেন, বললেন—স্যার, আমি কী আমার প্রতিরোধ-পরিকল্পনাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারি?

মণিদেব আবার ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। বললেন—বলো।

ভিনসেন্ট শুরু করলেন।

॥ দুই ॥

যুদ্ধের ছক

বীজাণুর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ কীভাবে এগিয়েছিল একবার ভেবে দেখুন স্যার। প্রথমদিকে তো আমরা জানতামই না এসব অসুখ মাইক্রোব নামে এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণীর আক্রমণে ঘটে। মহামারীকে আমরা দৈবদুর্বিপাক বা ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মেনে নিয়ে প্রকৃতির রহস্যময় শক্তিগুলির কাছে পুজো-আচ্চা বা প্রার্থনার মাধ্যমে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতাম। তারপর লুই পাস্তুর আবিষ্কার করলেন রোগসঞ্চারী বীজাণু। শুরু হল ব্যাধি জয় করার জন্য মানুষের অভিযান। এডওয়ার্ড জেনার টিকা দেওয়ার মূল তত্ত্বটি প্রচার করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজে যুদ্ধটা অনেকখানি জিতে গেল।

একটু থেমে ভিনসেন্ট বললেন—আমি সাহিত্যের ছাত্র নই, তবু কিছু বইপত্র পড়েছি। রবীন্দ্রনাথ আমার খুব প্রিয় কবি। তাঁর লেখা 'জুতা আবিষ্কার' মনে পড়ছে স্যার? ধুলো থেকে পা-দুটো মুড়ে রাখাই ভাল এবং সহজ বুদ্ধি। বীজাণুর ক্ষেত্রেও তাই। দুনিয়ার সব বীজাণু কী কোনোদিন আমরা মেরে শেষ করতে পারতাম? তার চেয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই তো ভাল। তেমনই আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গেও ভাবুন স্যার, সমস্ত জগতে যেখানে যত অন্যায় অসাম্য নিষ্ঠুরতা অমানবিকতা ঘটছে, তার প্রকৃত কারণ যদি মহাশূন্যে ছড়িয়ে থাকা বহুদূরব্যাপী কালো ধুলোর মেঘ হয়, তাহলে সেই অনন্ত শূন্যে আমরা আর কী ব্যবস্থা নিতে পারি? তার চাইতে মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টাই তো ভাল।

মণিদেব বললেন—ভাল হয়তো, কিন্তু সহজ নয়।

—সহজ যে নয় তাও আমিও জানি। কিন্তু বাঁচবার তো একটাই রাস্তা। আর কী উপায় আছে বলুন?

—এই বিপুল কাজ তুমি একা সামলাবে কী করে? কীভাবেই বা করবে? কোটি কোটি মানুষকে আলাদাভাবে ধরে বোঝানো কী সম্ভব?

—না স্যার, তা সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি মানুষের মনই বদলে দিই? যদি মানুষ আর হিংসা না করে, ধ্বংসের চিন্তা-করার ক্ষমতাই তার না থাকে?

মণিদেব বললেন—সাধারণ মানুষ বেশি দুষ্টুমি করে না, তাদের হাতে সে ক্ষমতাও নেই। পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে যে উঁচু পর্যায়ের লোকেরা, তাদের কাছে তুমি পৌঁছবে কী করে?

প্রশ্নটার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করলেন ভিনসেন্ট, তারপর বললেন—আমি জানি না স্যার। কাজে না নামলে সবকিছু বুঝতে পারব না—

—তাছাড়া এটা তো সময়সাধ্য ব্যাপারও বটে। তোমার একটা জীবন কেবল তোড়জোড় আর উদ্যোগ করতে কেটে যাবে। ভেবেছ?

উজ্জ্বলমুখে ভিনসেন্ট বললেন—হ্যাঁ স্যার, ভেবেছি। আমি জানি এ কাজ আমার জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারব না। কিন্তু কাজটা শুরু তো করে দিয়ে যেতে পারব। কিছু মানুষের মধ্যে তো আমরা চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে পারব। তারপর আমি থাকব না, কিন্তু কাজ এগোবে। এটা পাগলের স্বপ্ন বলে ভাবতে পারেন, কিন্তু মানুষ তো স্বপ্ন নিয়েই বাঁচে।

মণিদেব বললেন—কীভাবে কাজ শুরু করবে ভাবছ? একটা ক্লাব বা সংস্থার মত কিছু করবে? যেখান থেকে বক্তৃতা, প্রদর্শনী, প্রচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করে মানুষকে সচেতন করবে?

ভিনসেন্ট হাসলেন।—না স্যার, তাতে কোনো লাভ হবে না। শুকনো বক্তৃতা শুনে শুনে মানুষ বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা যা বলব তা সব মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাবে। সাধারণ লোক চমক ভালবাসে, বিশ্বাস করবার মত একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। তাদের সেই ভাবেই বোঝাতে হবে। সে ব্যবস্থার কথাও ভেবেছি স্যার। আমাকে বিশ্বাস করলে আমি যা বলছি তাও সবাই বিশ্বাস করবে। বাইরে থেকে চাপ দিয়ে কিছু হবে না।

—তোমাকে মানুষ বিশ্বাস করবে কেন? তুমি বললে—ওহে, পৃথিবীতে এত হানাহানি আর বিদ্বেষের কারণ সৌরজগৎ এখন একটা বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এসো আমরা সবাই ভাল হবার শপথ গ্রহণ করি—আর তোমার কথা শুনে সবাই সাধু সন্তের জীবন যাপন করতে লাগল, জিনিসটা বোধহয় এত সহজ নয়।

লজ্জিত মুখে ভিনসেন্ট বললেন—তার একটা ব্যবস্থা হয়েছে স্যার। এখনো আমি শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত নই বলে আপনাকে বলছি না, তবে জানালে আপনাকেই প্রথম জানাবো।

—কেন?

অবাক হয়ে ভিনসেন্ট বললেন—আজ্ঞে?

—আমাকেই প্রথম জানাবে কেন?

—ওঃ, স্যার, আমার পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে আপনিই সবচেয়ে ভাল লোক বলে আমার বিশ্বাস। সবচেয়ে দরাজ মন, বুদ্ধিমান আর মানবিক, তাই।

মণিদেব হাসলেন। বললেন—তুমি বোধহয় সফল হবে। আমাকে তো মিষ্টি কথা বলে এখনই অনেকটা ভিজিয়ে ফেললে—

—না স্যার, আপনার সম্বন্ধে যা বললাম তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—ঠিক আছে ভিনসেন্ট। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। কারণ মানবিকতার বিরুদ্ধে ভয়ানক সব অপরাধ পৃথিবী জুড়ে সংঘটিত হচ্ছে। তা তো আর মিথ্যে নয়। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো কিন্তু এখনো সব পাও নি। সেগুলো তোমার থিয়োরীকে শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড় করাবে। পেলে আমাকে জানিও। এনি ওয়ে, আমি তোমার সঙ্গে রইলাম। গুড লাক।

অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ভিনসেন্ট। যাদের অবজারভেশন ডিউটি আছে তারা ছাড়া বাকি সবার ছুটি হয়ে গিয়েছে। মানমন্দিরের লম্বা লম্বা করিডরগুলো ফাঁকা। মাঝে মাঝে মাথার ওপর অবজারভেশন টারেট থেকে দূরবীন অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য মোটর চলার মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। এবার বাড়ি যাবেন ভিনসেন্ট। বাড়ি বলতে কোয়ার্টার্স। বিয়ে করেন নি। পাহাড়ের নিচে গ্রাম থেকে বুধুয়া নামে একটি ছোকরা ছেলে এসে তাঁর ঘরদোর সাফ করে দেয়। দুবেলার রান্না করে রাখে। এতক্ষণে সে চলে গিয়েছে। টেবিলের ওপরে ঢাকা দিয়ে রাখা থাকবে রাত্রির খাবার। খুব কম খান ভিনসেন্ট। রাত্রির খাবার বলতে গোটাচারেক হাতে-গড়া চাপাটি আর কিছু একটা সব্জি। বুধুয়াও এখানেই খায়। তবে সে তার খাবার খেয়ে বাড়ি চলে যায়। বাইরে থেকে দরজা টেনে দিলেই ইয়েল

লক বন্ধ হয়ে যায়। ভিনসেন্ট চাবি দিয়ে খুলে ঢোকেন। অবশ্য এখানে চুরি হয়না। পাহাড়ের নিচে যে গ্রাম তার অধিবাসীরা সহজ সরল মানুষ। কাউকে ঠকাতে গেলে যে বুদ্ধির দরকার হয় সেই প্যাঁচালো বুদ্ধি তাদের নেই।

পাহাড় থেকে অর্ধেক নেমে অরণ্যের মধ্যেই একটুখানি সমতল জায়গায় তাঁর বাড়ি। মানমন্দিরের সব কর্মীদের জন্যই এ রকম ব্যবস্থা রয়েছে কাছাকাছি। পোস্টের আলো জ্বলছে। নিশ্চয় বুধুয়াই জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ভিনসেন্ট বিয়ে করেন নি, যেমন মণিদেবও না। তবু কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আসতে খারাপ লাগে না। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে একাকীত্বও রমণীয় হয়ে ওঠে। আর আছে বই। বই পড়তে ভালবাসলে আবার একাকীত্ব কী?

বাইরের পোশাক খুলে স্নান করলেন ভিনসেন্ট, তারপর হালকা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে বইয়ের শেলফের পাশে সোফায় এসে বসলেন। রোজই কাজের পর এইখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে তাঁর। আজ ক্যাক্সটনের স্টার অ্যাটলাসখানা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন।

দেওয়ালের ইলেকট্রিক ঘড়িতে সন্ধে সাতটা কুড়ি।

আর দশ মিনিট পরে তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর ধারণা সত্যি কিনা।

সাতটা পঁচিশ। ভিনসেন্ট উঠে গিয়ে বাড়ির অন্য সব আলো নিভিয়ে দিয়ে এলেন। কেবল সোফার পাশের টেবিলে একটা কম পাওয়ারের আলো রইল।

সাড়ে সাতটা।

হাত থেকে বই পাশে নামিয়ে রাখলেন ভিনসেন্ট। তাঁর মাথার পেছনে—মাথার পেছনে ঠিক নয়—কানের হাড়ের মধ্যে কেমন একটা মৃদু কম্পনের অনুভূতি জেগে উঠেছে। টানটান করে বাঁধা তারে টঙ্কার দিলে এমন কম্পন জাগে। একটানা নয়, কমে বেড়ে ঢেউয়ের ওঠাপড়ার মত কম্পন। কেমন একটা আরামদায়ক অনুভূতি—যেন তাঁর ঘুম পেয়ে যাবে। চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠছে।

বহু—বহুদূর অকল্পনীয় মহাশূন্যের ওপার থেকে কে বা কারা যেন অনুসন্ধানী সার্চলাইট ফেলেছে তাঁর চেতনার ওপর। তাঁর ভেতরটা সব কিছু তারা দেখে নিচ্ছে। তাঁর কোনো ভয়ের ভাব হচ্ছে না। যারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছে তাদের উষ্ণ এবং প্রীতিপ্রদ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ স্পষ্ট টের পাচ্ছেন ভিনসেন্ট। অনেকদিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাওয়ার মত। বাতাসে যেন প্রথম বর্ষণের পর ভেজামাটির গন্ধ, কেমন একটা আনন্দ। লাল-নীল স্বপ্নের ফানুস উড়ছে হাওয়ায়।

এখন বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ঘুমিয়ে পড়েছেন ভিনসেন্ট। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে শরীর এলিয়ে সোফায় বসে আছেন তিনি। পা দুটো সোজা করে সামনে ছড়ানো। পাশে খোলা পড়ে আছে নক্ষত্রের মানচিত্র।

কিন্তু তিনি মোটেই ঘুমোন নি। বরং তাঁর চেতনা দশগুণ বেড়ে উঠে উন্মুখ হয়ে আছে। কী ঘটবে এখন? কী?

ব্রহ্মাণ্ডের গভীর কোনো অবস্থান থেকে ভেসে এল আকাশবার্তা—স্বাগত, মানবসন্তান। তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি বুঝতে পেরেছো আমরা তোমাকে ডাকছি, এবং ঠিক কখন তোমাকে ডাকবো।

ভিনসেন্টও মনে মনে বললেন—স্বাগত। নমস্কার, বন্ধু।

কোনো বিশেষ ভাষা নয়, ভাবের প্রকাশের ভেতর দিয়ে তাদের বার্তার আদানপ্রদান

হতে লাগল।

—যেখান থেকে আমরা কথা বলছি, সেই জীবলোক তোমাদের সৌরজগৎ থেকে বহুদূরে। আলোর গতিতেও বার্তা পৌঁছতে লাগবে তোমাদের হিসেবে কয়েকশো বছর। কিন্তু এখনই সাবধান না করলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই অতিজাগতিক মাত্রার ভেতর দিয়ে এই বার্তা পাঠাচ্ছি। এতে অনেক শক্তি ব্যয় হয়। আমাদের জগতে মোট উৎপাদিত শক্তির এক চতুর্থাংশ ব্যয় হয়ে যায় একবার বার্তা প্রেরণে। কাজেই তাড়াতাড়ি যা বলার সেরে নিই।

তোমার উদ্যোগ যাতে সফল হয়, তোমাকে যাতে সবাই বিশ্বাস করে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কী করতে হবে তা এবার মনোযোগ দিয়ে শোনো—

পরের দশ মিনিট সেই দূরাগত দেহহীন কণ্ঠ কথা বলে গেল। বাহ্যত ঘুমন্ত ভিনসেন্ট একমনে নির্দেশ গ্রহণ করে তারপর বললেন—কিন্তু কখনো আমার প্রয়োজন হলে আমি কী করে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব, বন্ধু? আমাদের তো অত উন্নত বিজ্ঞান নেই।

—যখন তখন সামান্য কারণে যোগাযোগ কোরো না। তেমন প্রয়োজনে শুধু একান্ত করে আমাদের কথা ভেবো, আমরা বুঝতে পারব। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।

—টেলিপ্যাথি? তাহলে অত শক্তি খরচ না করে আপনারাও তো সেভাবেই বার্তা পাঠাতে পারেন।

—না, তা হয় না। তুমি একমনে ভাবলে আমরা একটা একটানা সিগনাল পাব, একটা বিশেষ কম্পনমাত্রায়। কিন্তু ওভাবে বার্তাপ্রেরণ করা যাবে না। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

—আর একটা কথা—

—বলো।

ভিনসেন্ট বললেন—বা ভাবলেন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট, বিশাল। সৃষ্টির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে কত গ্রহলোক, কত নীহারিকা। তাতে আবার হয়তো বাস করে কত অদ্ভুত প্রাণীর দল। ধূলিকণার মত এই এককোণে পড়ে থাকা পৃথিবীতে মানুষ নামে জীবটি চিরকালের জন্য মুছে গেল কিনা তার জন্য তোমরা এত চিন্তিত কেন, বন্ধু?

উত্তর নেই।

ভিনসেন্ট ডাকলেন—বন্ধু, বন্ধু।

না, সত্যিই সাড়া নেই। যোগাযোগের সূত্রে অনন্ত শূন্যতার ফাঁপা শব্দ।

কেন উত্তর দিল না নক্ষত্রপারের বন্ধুরা? কেন? কেন?

খুব গভীর ঘুম থেকে যেন আস্তে করে জেগে উঠলেন ভিনসেন্ট।

জানালা দিয়ে বাতাস এসে উল্টে দিচ্ছে খোলা পড়ে থাকা স্টার চার্টের পাতা। বুধুয়ার গ্রাম থেকে যে শতরঞ্চির মত বিভিন্ন রঙের চৌখুপি মার্কা বেড়ালটা রোজ খাবারের লোভে এসে শুয়ে থাকে, সেটা বুক-কেসের তলা থেকে বেরিয়ে একটা ডন দিয়ে হাই তুলল, তারপর খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে বাতাস শুঁকতে লাগল। জানালার হালকা নীল রঙের পর্দা উড়ছে হাওয়ায়।

কী ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করবার? অথবা পরিকল্পনাটা হয়তো আদৌ তাঁর নয়, অন্য নক্ষত্রলোকের প্রাণীরা তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। কবে তিনি জানতে পারবেন?

পরের দিন ভিনসেন্ট তাঁর বাল্যবন্ধু অমিতেশ গুপ্তভায়ার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। অনেকদিন পরে চিঠি দিলেন অমিতেশ। কী লিখেছেন তিনি? .

চিঠি খুললেন ভিনসেন্ট।

॥ তিন ॥

তৃতীয় নয়ন

রাজধানীর অল ইন্ডিয়া ইনসিটিউট অফ সায়েন্স আর আমেরিকার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্যোতিঃ-পদার্থবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও এম. এস. সি. পর্যন্ত ভিনসেন্ট কলকাতাতেই পড়াশুনো করেছেন। তাঁর বাবার কর্মস্থল ছিল কলকাতা। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই অমিতেশের সঙ্গে পরিচয় এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এম. এস. সি. পাশ করে অমিতেশ অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। বর্তমানে তিনি একটি নামী কলেজে ফিজিক্স পড়ান। ভিনসেন্ট চলে গেলেন বাইরে, ফেলোশিপ নিয়ে আরও পড়াশুনো করতে। কর্মজীবনে দুজনে দু-জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হলেও চিঠিপত্রের আদানপ্রদান রয়েছে। ভিনসেন্ট কোনো কাজে কলকাতা গেলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর আমন্ত্রণে অমিতেশ বছর দুই আগে একবার এখানে সপরিবারে বেড়িয়েও গিয়েছেন।

অমিতেশ লিখেছেন—

আশাকরি ভাল আছিস। বিয়ে থা তো আর করলি না যে, সকলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করব। এখনো এমন কিছু বয়েস হয়নি, বলিস তো পাত্রী দেখি।

একটা খুব জরুরি ব্যাপারে তোকে চিঠি দিচ্ছি। অনুরোধ করি, চিঠিটা শেষ অবধি পড়িস, মাঝপথেই আমি গাঁজা খাওয়া ধরেছি ভেবে ছিঁড়ে ফেলে দিস না।

মাসখানেক আগে নিজের স্টাডিতে বসে পড়াশুনো করছিলাম। তখন বেশ রাত। বাড়ির অন্য সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পরের দিন কেয়স থিয়োরির ওপর ক্লাস নিতে হবে, তাই একটু দেখে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল আমার দুই কানের পেছনে মাথার ভেতরে কেমন যেন সুড়সুড় করছে। প্রথমে ভেবেছিলাম পিঁপড়ে বোধহয়, হাত দিয়ে একবার ঝেড়েও ফেললাম। কিন্তু অনুভূতিটা রয়েই গেল। এরপরেই মনে হল—আমার যেন খুব ঘুম পাচ্ছে। খুব—খুব গভীর ঘুম। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই বুকের ওপর মাথা ঝুঁকে পড়ল আমার, হাতদুটো শিথিল হয়ে দুদিকে ঝুলতে লাগল। সেই সময় মনে হল কে যেন মৃদু গলায় আমার কানে কানে কথা বলছে। শব্দ করে নয়, তার কথা সরাসরি আমার মনের ভেতর ফুটে উঠছে।

অনেক অদ্ভুত কথা বলল সেই কণ্ঠ। মানবসভ্যতার আসন্ন সর্বনাশ, সমাজে ঈর্ষা হিংসা আর নিষ্ঠুরতার বৃদ্ধি। কী এক মহাজাগতিক কালো ধোঁয়ার মেঘের ভেতর দিয়ে আমাদের সৌরজগৎ নাকি এখন ছুটে চলেছে। সেই বস্তুপুঞ্জের প্রভাবে মানবমনের এই অবনতি। এই কণ্ঠের অধিকারীরা পৃথিবীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে। আমাকে তারা কিছু ক্ষমতা দিচ্ছে, যে ক্ষমতা বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করলে মানুষ আমার কথা বিশ্বাস করবে, আমাকে অমান্য করতে সাহস পাবে না। একদিনে সাফল্য আসবে না। এক প্রজন্মেও নয়। কিন্তু কাজ এখনই আরম্ভ করা প্রয়োজন। সব শেষে তারা বলল অবিলম্বে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তোকেও নাকি এ ব্যাপারে তারা আগেই নির্দেশ দিয়েছে।

আমি তো ভাই কিছুই বুঝতে পারলাম না। একবার মনে হল হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু স্বপ্ন আমরা দেখি নিজেরই অভিজ্ঞতা বা চিন্তার ওপর ভিত্তি করে। এমন স্বপ্ন গুছিয়ে দেখতে পারলে আমি তো লেখক হয়ে যেতাম। তাছাড়া শরীর এবং হাত পা শিথিল হয়ে পড়লেও আমার মন সজাগ ছিল। কাজেই ঘুমিয়ে পড়িনি এ কথাও ঠিক। তোর নামই বা কী করে স্বপ্নে শুনব, যদি সত্যিই কিছু একটা না ঘটে থাকে?

খুব ক্লান্ত লাগছিল। কোনোরকমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বৌকে এ ঘটনা জানাই নি। খামোকা ভয় পাবে। তাছাড়া কী দেখেছি বা শুনেছি সে বিষয়ে আমি নিজেই যখন নিশ্চিত নই।

সকালে উঠে ভাবলাম একবার ডাক্তার দেখিয়ে নিই। প্রেসার বেড়ে কিম্বা অন্য কোনো কারণে অমন হল কিনা। অনেকদিন থেকে আমাদের পরিবারেব সকলের চিকিৎসা করেন সমর বসাক। তাঁকে ফোন করলাম। ঘণ্টাখানেক বাদেই তিনি এলেন। স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন হঠাৎ ডাক্তারকে ডাকলাম কেন। তাঁকে যা হোক একটা স্তোক দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ডাঃ বসাক খুব ভাল করে আমাকে পরীক্ষা করে বললেন—অ্যাবসলিউটলি কোনো প্রবলেম নেই। আমাকে ডাকলেন কেন বলুন তো? প্রেসার, হার্ট—সবই ঠিক আছে।

বললাম—গতকাল রাত্রিতে—মানে, একটু কেমন যেন—হয়তো স্বপ্নই হবে—

ডাক্তার বসাক বললেন—নাইটমেয়ার? কী খেয়েছিলেন রাত্রিতে? রিচ্ কিছু?

—না, না। আমি রাত্রিতে খুবই হালকা খাবার খাই। ঠিক নাইটমেয়ার নয়—

ডাঃ বসাক হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। খুব লাইট। আপাতত তিনদিন শোয়ার আগে খান। এভরিথিং উইল বি অলরাইট।

বিদায় নেবার আগে বললেন—ভালই হয়েছে আজ ফোন করেছিলেন, আমাকে পেয়ে গেলেন। কাল থেকে সাতদিন আমি থাকছি না। ফ্যামিলি নিয়ে একটু নেপাল যাচ্ছি বেড়াতে—

ওঁর দিকে তাকিয়ে আমার কানের পেছনে সুড়সুড় করতে লাগল, কিছু কথা ভেসে উঠল মনে।

বললাম—ডাঃ বসাক, কাল আপনি কোথাও রওনা দেবেন না—

ডাঃ বসাক যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অবাক হয়ে বললেন—সে কী ! তার মানে?

আবার বললাম—মানে বলতে পারব না, আমিও জানি না। কিন্তু কাল আপনি কোথাও যাবেন না। গেলে ফল খারাপ হবে—

—সে কী। আমি তো আপনার কথা কিছুই—এদিকে আমার প্লেনের টিকিট কাটা, হোটেল বুক করা রয়েছে। এখন কী করে—তাছাড়া কেন?

ডাঃ বসাক আবার বসে পড়লেন। বললেন—আপনার কী হয়েছে ঠিক করে বলুন তো?

সেটা আমি বলতে পারলাম না। কারণ আমি নিজেই তো জানি না।

যাই হোক, আমার কথায় ডাঃ বসাক নিশ্চয় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বাড়ি ফিরে উনি ফোন করে জানালেন উনি নেপাল যাত্রা স্থগিত রেখেছেন।

দু'দিন পরে কাগজে ছাপা হল—দমদম থেকে কাঠমাণ্ডুগামী প্লেন তরাইয়ের জঙ্গলে ক্র্যাশ করেছে। সে খবর তো তুইও নিশ্চয় দেখেছিস।

সমর বসাক আমার কাছে এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গিয়েছেন, বারবার জানতে চেয়েছেন আমি কী করে এমন ভবিষ্যতবাণী করলাম। কী বলব তাঁকে!

সমর বসাকের কাছে কেউ কেউ ব্যাপারটা শুনে থাকবে। বেশ কিছু লোক আমাকে ফোন করে বিরক্ত করছে, বাড়িতে চলে আসছে। তাদের অবশ্য আমি অল্প কথায় বিদায় দিয়েছি। কিন্তু এখন আমি তোর পরামর্শ চাই। কেবল নক্ষত্রলোকের কণ্ঠ বলেছে বলেই নয়, এমনিতেও এই পরিস্থিতিতে আমি তোকেই চিঠি দিতাম। একজন বড় বৈজ্ঞানিক হিসেবে। তোকে আমি শ্রদ্ধা করি। তুই একবার কলকাতায় এলে খুব ভাল হয়। অনেকদিন তো আমার এখানে আসিস নি। কবে আসছিস জানিয়ে চিঠি দে। প্রীতি নিস, ইতি—

তোর চিরবান্ধব

অমিতেশ গুপ্তভায়া

চিঠি পড়া হলে আবার খামে ভরে রাখলেন ভিনসেন্ট।

ছকটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কী আশ্চর্য এই মহাবিশ্ব, মহা জীবন! আজ থেকে একমাস আগে যদি তাঁকে কেউ এমন একটা ঘটনার কথা বলত, তাহলে সেটা তিনি অবাস্তব আর গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেন। আজ তা সত্য।

সেদিনই মণিদেবের কাছে ছুটির আবেদন জমা দিলেন ভিনসেন্ট। মণিদেব জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ ছুটি নিচ্ছ যে? সামথিং টু ড় উইথ ইওর পীস প্রজেক্ট?

—বলতে পারেন স্যার। ফিবে এসে আপনাকে সব জানাবো।

—যাও, আমার শুভেচ্ছা রইল।

মানমন্দিরের একজন কর্মচারী কী কাজে শহরে যাচ্ছিল, তার হাতে অমিতেশকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন ভিনসেন্ট—ইনভাইটেশন অ্যাকসেপ্টেড। অ্যারাইভিং ফ্রাইডে।

* * *

শুক্রবার সন্ধেবেলা উত্তর কলকাতায় অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে কলিং বেল টিপলেন ভিনসেন্ট। দরজা খুলে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন অমিতেশ।

—কী রে, এত দেরি হল যে? কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি—

—কী করব ভাই, দেশের যা অবস্থা! ট্রেন আড়াই ঘণ্টা লেট, তারপর ট্র্যাফিক জ্যাম। হাওড়া থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এইটুকু আসতে লেগে গেল প্রায় একঘণ্টা—কেমন আছ বৌঠান?

অমিতেশের স্ত্রী মঞ্জুলা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন হাসিমুখে।

—তুমি কেমন আছ ঠাকুরপো? আমরা আর ভাল কী? তোমার বন্ধুর শরীরটাও তো মাঝখানে ভাল যাচ্ছে না, কী হয়েছে জানি না—লোকজন ফোন করছে, দেখা করতে আসছে। তোমার বন্ধুও খুলে বলে না কিছু—

ভিনসেন্ট হেসে বললেন—আমি এসে গিয়েছি, আর চিন্তা নেই। আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলে দেব। আপাতত এককাপ গরম চা খাওয়াও দেখি—

ভিনসেন্ট এলে সচরাচর যে ঘরে থাকেন সে ঘরেই তাঁকে নিয়ে গেলেন অমিতেশ। দক্ষিণের জানালা খুলে দিয়ে বললেন—নে, তোর প্রিয় ঘরেই তোর ব্যবস্থা করলাম। ঠিক

আছে তো? যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়, চা-খাবার আসছে।

রাস্তার পোশাক ছেড়ে পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে সোফায় এসে বসতে না বসতে মঞ্জুলা চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে পাঁপড়ভাজা আর সন্দেশ।

চায়ে চুমুক দিয়ে ভিনসেন্ট বললেন—বোসো বৌঠান। বুঝতে পারছি তুমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছ। ভয় পেয়ো না, যা ঘটছে তা সবার মঙ্গলের জন্যই ঘটছে। অন্তত এটুকু বলতে পারি, তোমার স্বামীর কোনো ক্ষতি হবার ভয় নেই। এবার শোনো।

যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় জিনিসটা বন্ধুপত্নীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন ভিনসেন্ট। সমস্ত কথা শুনে মঞ্জুলা বললেন—ঠাকুরপো, আমি সামান্য লেখাপড়া জানা মেয়ে। গ্র্যাজুয়েশনের পরে আর পড়া হয়নি। তুমি যা বললে তা অনেক উঁচু পর্যায়ের ব্যাপার, অত কথা বোঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। তবে তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, জানি তুমি থাকতে আমার স্বামীর কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিক তো?

—ঠিক। একেবারে ঠিক।

—আর মনের ক্ষমতার কথা কী বললে? সেটা ওর ক্ষতি করবে না তো?

ভিনসেন্ট হেসে বললেন—না বৌঠান। এ ক্ষমতা ওর নিজের নয়, ওকে মাধ্যম করে কাজ করছে অনেক বড় একটা শক্তি। তারা ওর ক্ষতি হতে দেবে কেন?

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলা বললেন—তোমার শক্তি আমাকে একটু দেখাবে না?

অমিতেশ বললেন—এ ব্যাপারটা নিয়ে বোধহয় খেলা করা উচিত হবে না। সময় আসুক, দেখতেই পাবে। তোমাকে বাদ দিয়ে তো কিছু হবে না—

তারপর গলা নামিয়ে বললেন—তুমিই তো আমার শক্তি।

'যাঃ' বলে মঞ্জুলা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

অমিতেশ বললেন—বৌকে যা বললি তা থেকে আবছামত একটা ধারণা হল বটে, কিন্তু অনেকটাই ধাঁধা রয়ে গেল। এবার গুছিয়ে সবটা বল দেখি। আর ইউ সিরিয়াস, না রূপকথার গল্প শোনাচ্ছিস?

—আই অ্যাম ডেড সিরিয়াস। নইলে এত সহজে ছুটি নিয়ে মজা করবার জন্য কলকাতায় আসতাম না। যাই হোক, আমি একঘেয়ে বকে যাওয়ার চেয়ে তুই আমাকে প্রশ্ন কর, আমি-তার উত্তর দিই, তাহলে তোর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে—

দুই প্রখর বুদ্ধিমান বন্ধু মুখোমুখি বসলেন। কথা হতে লাগল, রাত বাড়তে লাগল। ক্রমশ বিশ্বজোড়া এক বিশাল কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা অমিতেশের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

॥ চার ॥

যুদ্ধারম্ভ

পরের দিন সকালে দুই বন্ধু বসে চা খাচ্ছিলেন। বেলা আটটা কী সাড়ে আটটা হবে। হঠাৎ বাইরের দরজার বেল বেজে উঠল। অমিতেশ উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। বাইরে একজন সৌম্যকান্তি মধ্যবয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। পরনে কালোরঙের প্যান্ট আর হাল্কা ক্রিম রঙের শার্ট। চোখে মোটা ফ্রেমের মাইনাস পাওয়ারের চশমা। ডানহাতে একটা পাতলা ব্রিফ কেস।

—নমস্কার, আমি প্রফেসর অমিতেশ গুপ্তভায়ার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই—

অমিতেশ বললেন—নমস্কার। আমিই প্রফেসর গুপ্তভায়া। কী দরকার বলুন।

একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোক বললেন—আমি কী একটু ভেতরে আসতে পারি, বসে কথা বললে ভাল হয়।

অমিতেশ বললেন—আসুন।

সোফায় বসে ভদ্রলোক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভিনসেন্টের দিকে তাকালেন। অমিতেশ বললেন—উনি আমার বাল্যবন্ধু, একজন বিজ্ঞানী। নাম ভিনসেন্ট লাকরা। যা বলবার ওঁর সামনে বলতে পারেন—

একটা নিশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন—বেশ। আমার কোনোই আপত্তি নেই। কীভাবে আমার বক্তব্য শুরু করব জানি না। গত পরশু পর্যন্ত আমি আপনার নাম ঠিকানা কিছুই জানতাম না। অথচ গতকাল—

বাধা দিয়ে ভিনসেন্ট বললেন—আগে আপনার নামটা বলুন। কোথায় থাকেন আপনি, কী করেন। তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু গুছিয়ে বলুন। তাড়াহুড়ো কিছু নেই।

ভদ্রলোক চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাঁচ দুটো মুছলেন, তারপর আবার চোখে লাগালেন। দেখে মনে হয় কথা শুরু করতে দ্বিধা বোধ করছেন। হঠাৎ অমিতেশ সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন—বুঝতে পেরেছি। আপনি সঙ্কোচ বোধ করছেন আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করব কিনা, তাই তো? আচ্ছা, আমিই আপনার হয়ে শুরু করছি, দেখুন তো ঠিক বলছি কিনা। আপনার নাম সফিউল হায়দার, মধ্য কলকাতার কোনো একটা কলেজের পাঠাগারে সহ-গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন। আপনি ন্যাটা, বাঁ-হাত বেশি চলে। লেখেনও বাঁ-হাতে। আজ এখানে আসবার সময় ট্যাক্সিতে এসেছেন, মিটার উঠেছিল ছত্রিশ টাকা। সম্প্রতি, গতকাল রাত্রিতে, আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ পেয়েছেন। এবার বুঝতে পারছেন তো যে, সঠিক লোকের কাছেই এসেছেন? নিন, গতকাল রাত্রিতে কী হয়েছিল খুলে বলুন—

সফিউল হায়দার বিস্ফারিত চোখে অমিতেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

—আশ্চর্য। আপনি কী করে—মানে, আমাকে তো আজকেই প্রথম দেখলেন—নাকি?

—অবশ্যই। আমি আপনাকে আগে কখনো দেখিনি, আপনার দিকে তাকানোমাত্র এই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। কোনো চেষ্টা করতে হচ্ছে না। খবরের কাগজ পড়ার মত।

সফিউল হায়দার বললেন—অমিতেশবাবু, আমি লাইব্রেরিয়ানের চাকরি করি, ব্যক্তিগতভাবেও বই পড়া আমার নেশা। যাকে একেবারে অনপড় গোলা লোক বলে—আমি তা নই। এই ব্যাপারটা আমি কিছু কিছু বুঝতে পারছি। বাকিটা আপনি পরিষ্কার করে দিন—

চা এল, সঙ্গে খাবার। আধঘণ্টা ধরে কথা বললেন অমিতেশ। সফিউল খুব ভাল শ্রোতা, একবারও বাধা না দিয়ে, প্রশ্ন না করে সবটা শুনে গেলেন। অমিতেশ থামলে সফিউল বললেন—বাপরে! আমার মাথা ঘুরছে প্রফেসর সাহেব! পাড়ার, রাজ্যের বা বড়জোর দেশের ব্যাপার নিয়ে আমরা সাধারণ গেরস্ত মানুষেরা মাথা ঘামাই। আর এ একেবারে পৃথিবীও নয়—মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আলোকবর্ষের কাণ্ডকারখানা! এতটুকু মাথায় ধরছে না।

ভিনসেন্ট বললেন—আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, আশাকরি বিপদের স্বরূপ আপনি ধরতে পেরেছেন, এবং আমরা কী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাও বুঝতে পেরেছেন। এখন বলুন তো, আপনি কী আমাদের সঙ্গে থাকবেন? কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সিদ্ধান্ত আপনিই নেবেন—স্বাধীনভাবে।

একসেকেন্ড ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে থেকে সফিউল জোরে হেসে উঠলেন, বললেন—মশাই, আমি যে মানুষ সে তো আপনিই স্বীকার করলেন। মানুষ হয়ে মানব-সমাজের সেবা করার এতবড় সুযোগটা ছেড়ে দেব? আমি খুব সায়েন্স ফিকশনের ভক্ত, এইচ. জি. ওয়েলস, জুল ভার্ন, আর্থার সি. ক্লার্ক, কারেল চাপেক, আসিমভ—এঁরা আমার মানসগুরু। আর এখন যা আমার নিজের জীবনে ঘটছে, সে তো সায়েন্স ফিকশনের বাবা। আছি, আছি—অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে আছি—এখন আমরা কীভাবে এগুবো, কী করবো, সেটা বুঝিয়ে বলুন দেখি—

—সে ব্যাপারটা আমরাও খুব ভালভাবে জানি না। মানবেতিহাসে এমন লড়াই তো আগে কখনো হয়নি। তবে একটা কথা বলি, এ যুদ্ধের শুরুটা আমরা দেখে যেতে পারব, শেষটা নয়। সারল্য, প্রীতি, মনুষ্যত্বের মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করতে হবে। প্রথমে লোক শুনতে চাইবে না, উপেক্ষা করবে, পাগল বলে উপহাস করবে। তারপর একটু একটু করে প্রেক্ষিত বদলাবে, যেমনটি হওয়া উচিত তেমনভাবে সবকিছু চলবে। একদিনে হবে না, তবে হবেই।

সফিউল বললেন—মানুষ শুনবে তো? হাজার হাজার বছর ধরে যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, গান্ধী এই কথা বলে এসেছেন—কেউ শোনে নি। আমাদের কথা শুনবে?

—বাচ্চাদের অসুখ হলে ভয় দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াতে হয়, এমনিতে কী খেতে চায়? এটা মানবমনের একটা মজার দিক। আমরাও একটু চাপ দিয়ে রাজি করাব—

—কী রকম?

—সোজা কথায়, ভয় দেখাব। অবাক করে দেব। জুজুর ভয় বড় ভয়।

সফিউল বললেন—আমাকে কী করতে হবে?

অমিতেশ বললেন—আমরা ঠিক সময়ে আপনাকে ডেকে নেব। আপনি শুধু তৈরি থাকুন।

সফিউল হায়দার চলে যাবার পর দুই বন্ধু অনেক রাত্রি অবধি বসে পরামর্শ করলেন।

*　　　*　　　*

পরের দিন সকালে তালিকা তৈরি হয়ে গেল।

মোট দশজনকে আপাতত বাছাই করা হয়েছে। লেখক, অধ্যাপক, কর্মজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক ইত্যাদি মিলিয়ে বেছে নেওয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নামের তালিকা। রবিবার সকালে এঁদের ডাকা হয়েছে অমিতেশের বাড়িতে। যাঁদের ফোন আছে, গাইড দেখে তাঁদের সঙ্গে ফোনেই কথা বলা হয়েছে। কয়েকজনকে চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বাড়িতে। প্রায় প্রত্যেকেই জানতে চেয়েছেন ব্যাপারটা কী। এখন কিছু ভাঙা হয়নি, বলা হয়েছে এলেই জানতে পারবেন। এই কৌতূহলে যদি সবাই আসে।

দুজন ছাড়া এলেন প্রায় সবাই। সকাল নটার ভেতর বসবার ঘর ভর্তি হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সাড়ে নটা অবধি অপেক্ষা করে সভা শুরু করা হবে, যদি তার মধ্যে বাকি দুজন এসে পড়েন। সবাইকে চা দেওয়া হল। চায়ে চুমুক দিয়ে সাংবাদিক প্রকাশ রায়

বললেন—মিঃ গুপ্তভায়া, আজকের এই আমন্ত্রণ একটু আনইউজুয়াল। চাঁচাছোলা ভাবে বলছি বলে মার্জনা করবেন, নেহাৎ আপনার মত একজন দায়িত্বশীল মানুষ ডেকেছেন বলেই আমরা এসেছি। নইলে কোনো কারণ না দেখিয়ে এভাবে ডাকলে দল বেঁধে কেউ কারো বাড়ি যায় না। আশাকরি আপনার আহ্বানের পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি বলেছেন—মানবসমাজের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হবে। কী সেটা?

অমিতেশ ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—সাড়ে নটা প্রায় বাজে। আমি তাহলে এঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি, কী বল?

যাঁরা শুনছেন তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই অমিতেশ মিনিট কুড়ি কী পঁচিশের মধ্যে যা বলবার বলে ফেললেন।

ঘরে স্তব্ধতা। মাথার ওপর পাখা চলবার অস্পষ্ট শব্দ।

স্তব্ধতা ভেঙে প্রকাশ রায় বললেন—অমিতেশবাবু, আপনি আমাদের রূপকথার গল্প শোনাচ্ছেন। আপনার বক্তব্যের মূল বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত, বোধহয় আমরা সবাই একমত। কিন্তু মহাকাশপারের বার্তা, অন্য নক্ষত্রলোকের প্রাণী—এসব হজম করা কঠিন। সত্যি বলুন তো, কেন ডেকেছেন আমাদের? বাজারে যারা একটা যা-হোক হৈ চৈ তুলে সস্তায় দুদিনের নাম কেনাব চেষ্টা করে, আপনি সে দলে পড়েন না বলেই আমার বিশ্বাস। তাহলে?

ভিনসেন্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এবার তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন—আমি একটু কথা বলতে পাবি কী? আমার নাম ভিনসেন্ট লাকরা, অমিতেশের বন্ধু। বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য একটু-আধটু চর্চা করি। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন, সরাসরি উদাহরণ দেওয়াই ভাল তাতে সময় বাঁচে—

—ঠিক কথা। কী উদাহরণ?

—আপনারা ইচ্ছেমত আমাদের পরীক্ষা করুন। যেমনভাবে ইচ্ছে—

ভিনসেন্ট বললেন—নক্ষত্রলোকের বার্তা আমার কাছেই আগে পৌঁছেছিল। আমাকেই আগে পরীক্ষা করুন।

—শুরু করছি তাহলে?

—বেশ।

প্রকাশ রায় বললেন—আপনি কী করেন?

—তা তো আগেই বলেছি। আমি একজন বিজ্ঞানকর্মী। মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চা করি।

—পড়াশুনো কোথায় করেছেন?

—কলকাতায়। এম. এস. সি. করে দিল্লি যাই গবেষণার জন্য। পোস্ট-ডক্টরাল কাজ করি আমেরিকার হাভার্ডে। কিছুদিন প্রিন্সটনেও ছিলাম—

—ওঃ। তা, আপনি তো একজন উচ্চশিক্ষিত লোক, এ রকম গোলমেলে ব্যাপারে জড়ালেন কেন? কী চান আপনি? খবরের কাগজে নাম? চটজলদি খ্যাতি?

কান গরম হয়ে উঠল ভিনসেন্টের। তবু তিনি শান্ত গলায় বললেন—ওসব কিছুই নয়।

—তাহলে?

—আমরা প্রচার অবশ্যই চাই, তবে নিজেদের জন্য নয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য—

প্রকাশ রায় বললেন—ওসব বড় বড় কথা ইউরি গেলার, পিটার হারকোস—এরাও

বলত। তাদের ফাঁকিবাজি বহুদিন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে কেন?

ভিনসেন্ট বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক তাঁকে রাগাবার চেষ্টা করছেন। সে ফাঁদে পা না দিয়ে বললেন—ইউ আর বিটিং অ্যাবাউট দি বুশ। পরীক্ষা কই? পরীক্ষা করুন—

—বেশ। আপনি আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলুন। আমাকে দেখে আপনার যা মনে হচ্ছে—

ভিনসেন্ট প্রকাশ রায়ের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন—অলক ভাল আছে।

দারুণ বিস্ময়ে প্রকাশ রায়ের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

—মানে, আপনি—আপনি

—আপনার ভাইপো অলক, সম্ভবত শান্তিপুরে থাকে। কলেজে পড়ে। সে ভাল আছে।

ওদিক থেকে এক ভদ্রলোক বললেন,—কী হল? উনি কী ঠিক কথা বলছেন?

বিহ্বল গলায় প্রকাশ বললেন—হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু কীভাবে উনি—আমি তো নিজেই মাত্র কাল সকালে খবর পেয়েছি। সেভাবে কেউ জানেও না ব্যাপারটা—

ভিনসেন্ট বললেন—কাল সন্ধে থেকে জ্বর নামতে শুরু করেছে। আজ সকালে ডাক্তার নতুন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন। দাঁড়ান—

থেমে গিয়ে মাথা নিচু করে দু আঙুলে চোখ টিপে ধরলেন ভিনসেন্ট। মক্স বদলে ট্যাক্সিম দেওয়া হচ্ছে—

মুখ তুলে টেবিলের ওপরে রাখা টেলিফোনটা দেখিয়ে বললেন—ফোন করুন, জেনে নিন আমি ঠিক বলছি কী না। এস. টি. ডি. কানেকশন আছে। করুন—

প্রকাশ রায় টেলিফোন নিজের দিকে টেনে নিলেন। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে গিয়ে ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই কলের খরচটা কিন্তু আমি দিয়ে দেব—

ভিনসেন্ট বললেন—রবিবার সারাদিন হাফ চার্জ। করুন ফোনটা।

প্রকাশ রায় ডায়াল করে কানে রিসিভার লাগালেন।

—হ্যালো, দীপক? আমি সেজদা বলছি। অলক কেমন আছে এখন? ভাল? কাল সন্ধে থেকে জ্বর নামছে? বেশ, বেশ। অ্যান্টিবায়োটিক কী বদলে দেওয়া হয়েছে? আজ সকাল আটটায় ডাক্তারবাবু এসেছিলেন? মক্সের বদলে ট্যাক্সিম দেওয়া হচ্ছে? ঠিক আছে, পরে আবার ফোন করব।

ফোন রেখে প্রকাশ রায় বললেন—মানছি আপনি সবই ঠিক ঠিক বলেছেন। আমার ভাইপোর নাম আপনার জানার কথা নয়, তার যে অসুখ করেছে তাও জানার কথা নয়। তারপর ওষুধের নাম ইত্যাদি—যাই হোক, তবু বলি, এই প্রমাণগুলো কনক্লুসিভ নয়। আমি আরও যাচাই করতে চাই—

—বেশ তো, খুব ভাল কথা। আজ রাত্তির এগারোটা নাগাদ আপনি ফ্রি থাকবেন?

—থাকব। আপনারা যাবেন আমার বাড়িতে?

—না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের দুজনের মধ্যে কারো যোগাযোগ হবে।

অবাক হয়ে প্রকাশ রায় বললেন—ঠিক বুঝলাম না।

—ধীরে ধীরে বুঝবেন। আসলে আপনার মনের ভেতরে একটা অবিশ্বাস কাজ করছে। আমি যাই বলিনা কেন, আপনার মনে হবে আমি আগে থেকে খবর নিয়ে জেনে বলছি, অথবা ম্যাজিক দেখাচ্ছি। কোনো ব্যাখ্যাই আপনার কাছে যথেষ্ট মনে হবে না। বিশ্বাস—সে

যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন—একটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরার ব্যাপার। রেভারেন্ড জন লা ফার্জ কী বলেছেন মনে আছে তো?—'For those who believe, no explanation is necessary; for those who do not, no explanation is possible.'

—সে তো ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রসঙ্গে। আপনি কী এর মধ্যে ধর্ম টেনে আনছেন?

ভিনসেন্ট হাসলেন।—মোটেই না। বিজ্ঞানী হিসেবে আমার কর্মক্ষেত্রের পরিধি আমি জানি। আজ রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করুন না, তারপর আবার কথা হবে—

উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরা অনেকেই অনেক প্রশ্ন করলেন। এলোমেলো প্রশ্ন। অপরিচিত পরিস্থিতিতে পড়লে সাধারণ মানুষ সাময়িকভাবে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ঘটনার তাৎপর্য না বুঝে অনেকেই ভানুমতির খেল্ দেখবার সময় মানুষ ম্যাজিসিয়ানকে যেমন প্রশ্ন করে, তেমন কিছু প্রশ্ন করলেন। প্রত্যেককেই বলা হল সময়মত তাঁদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা হবে। একটু একটু করে চেতনা তো জাগুক, সময় লাগবে সে জানা কথাই।

॥ পাঁচ ॥

সঙ্ঘর্ষ

রাত্রি এগারোটার সময় নিজের চেতনাকে সূচীমুখ করে প্রকাশ রায়ের উদ্দেশে প্রজেক্ট করলেন ভিনসেন্ট। নিজের বাড়ির তেতলায় লেখাপড়া করার টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে অপেক্ষা করছিলেন প্রকাশ রায়। এগারোটা বাজতে তখনো মিনিট পনেরো দেরি। প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে তাঁর সাপ্তাহিক ফিচারের ছকটা একটু এগিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিনিট দশেক কলম চালাবার পর দেখলেন তিনি চমৎকার একটি পদ্মফুল এঁকে ফেলেছেন। ভাল মজা! ছবি তিনি মোটেই আঁকতে পারেন না, ময়ূর আঁকলে চামচিকের মত দেখায়, তিনি এত সুন্দর ফুলটা আঁকলেন!

রাত এগারোটা।

একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছে কী? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো তিনি কখনো ঘুমোতে যান না। মনের ভেতরটা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক নিজের বশে থাকছে না। বেশ আরামদায়ক একটা রিমঝিম ভাব। লেখাটা একটু এগিয়ে রাখলে ভাল হত। হাতে কলম, সামনে প্যাড তো রয়েইছে। লেখা যাক না। ছোটবেলায় স্কুলে বাংলার মাস্টারমশাই অমিতবাবু শ্রুতিলিখন লিখতে দিতেন। এখন, এই মুহূর্তে, কে যেন তাঁকে শ্রুতিলিখন দিচ্ছে। এ বড় আরামের। নিজের চিন্তা কিছু নেই, শুধু নির্দেশমত কলম চালিয়ে যাওয়া। ঘুম ঘুম ভাব, ঘুম ঘুম ভাব—

চমকে জেগে উঠলেন প্রকাশ রায়।

এগারোটা দশ।

এই দশমিনিট তিনি কী করছিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

সামনের প্যাডে কয়েকছত্র লেখা তাঁরই হস্তাক্ষরে। কখন লিখলেন তিনি?

'এই বিশাল মহাবিশ্বের কতটুকুই বা আমরা জানি? আজ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান যতদূর এগিয়েছে তার বাইরের কিছুর মুখোমুখি হলেই আমরা সেটাকে প্রাণপণে অস্বীকার করতে চাই। আদিম মানুষ যেমন অজানাকে ভয় পেত, অন্ধকারকে ভয় পেত, এও তাই। আসলে

কিন্তু বিশ্বাস করার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব, আমার তার্কিক মন আর অভিমান সেটা প্রকাশ করতে বাধা দেয়। আমি মানুষের মঙ্গল চাই, আমি বিশ্বাস করতে চাই।'

টেবিলের ওপরে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। প্রকাশ রায় ফোন তুললেন।

—হ্যালো।

—হ্যালো, আমি ভিনসেন্ট লাকরা। লেখা হল?

প্রকাশ রায় বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু কী হল বলুন তো?

—যা হল তা তো দেখলেনই, আমি আর আলাদা করে কী বলব? নিজের আঁকা ফুল পছন্দ হয়েছে? আচ্ছা, একবার মিলিয়ে নিন তো, কী লিখেছেন আমি পড়ে যাচ্ছি—

গড়গড় করে ভিনসেন্ট বলে গেলেন অনুচ্ছেদটা, দাঁড়ি আর কমা সুদ্ধ।

—ঠিক আছে?

কোনোরকমে প্রকাশ রায় বললেন—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

—আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন প্রকাশবাবু। এখন কাগজে কিছু ছাপাবেন না। কারণ সাধারণ মানুষ সমস্ত ব্যাপারটার তাৎপর্য ঠিক বুঝবে না। তারা মামলায় জেতার জন্য, সন্তান হবার জন্য, কিম্বা চাকরি পাওয়ার জন্য তাবিজ মাদুলি চাইতে আসবে। আমাদের কাজ অনেক, অনেক বড় মাপের। ধ্বংসের হাত থেকে মানবসমাজকে মুক্তি দিতেই হবে—

প্রকাশ রায়ের রাত্তিরটা না ঘুমিয়েই কাটল।

*　　　*　　　*

কাগজে না বেরুলেও খবর ছড়িয়ে পড়তে বাধা নেই। 'গোস্ট টু গোস্ট হুক-আপ' বলে একটা ব্যাপার আছে। দশজন লোক প্রত্যেকে দশজনকে, এবং তারা আবার দশজনকে যদি একটা খবব বলতে থাকে, তাহলে সে সংবাদ অতি দ্রুত প্রায় বিনাশ্রমে বহুদূর ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে অনেকটা তাই হল। প্রকাশ রায় কোনো স্টোরি করলেন না বটে, কিন্তু যে মানুষেরা সেদিন সকালে অমিতেশের বাড়ি এসেছিল, তাদের মারফৎ খবরের বৃত্ত ক্রমেই বড় হতে লাগল।

দিনদুয়েক বাদে একটা ফোন পেলেন অমিতেশ। অচেনা গলা।

—হ্যালো, অমিতেশবাবু আছেন?

—বলছি, কী প্রয়োজন? কে বলছেন?

—আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম ধনপতি গুপ্ত। একটু দরকারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই—

—আমার সঙ্গে? কী ব্যাপারে বলুন তো?

—সেটা সামনা-সামনি বললেই ভাল হয়। টেলিফোনে হবে না।

—বেশ তো, কবে কখন আসছেন বলুন, আমি বাড়ি থাকব।

ওপারে সামান্য স্তব্ধতা, তারপর ধনপতি গুপ্ত বললেন—আমি যাব না, আপনি আসবেন। কথাবার্তা এখানেই ভাল হবে—

প্রস্তাবটার মধ্যে একটা রূঢ়তা আছে। একজন তার বাড়িতে কাউকে আসতে বলতেই পারে, কিন্তু সেটা এভাবে নয়। অমিতেশ বললেন—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনাকে চিনি না। আপনার সঙ্গে আমার কোনো দরকারও নেই। আমি কেন যাব বলুন

তো? প্রয়োজন হলে আপনি আসুন—

ধনপতি গুপ্ত বললেন—ভয় নেই, বুক ফুলিয়ে চলে আসুন। আমি জানি আপনি আসবেন, কৌতূহল আপনাকে টেনে আনবে। আপনার কে একজন খ্রিশ্চান বন্ধু এখন আপনার বাড়িতে আছেন না? তাকেও নিয়ে আসুন না সঙ্গে?

—শুনুন, আমি কেন—

—ঠিকানাটা হচ্ছে, লিখে নিন—

ফোন নামিয়ে রেখে অমিতেশ বললেন—আশ্চর্য!

ভিনসেন্ট কী একটা বই পড়ছিলেন, চোখ তুলে বললেন—কী হল?

অমিতেশ ফোনের ব্যাপারটা খুলে বললেন। ভিনসেন্ট বললেন—ভয় পেয়ে গেলি নাকি? চল ঘুরে আসি, কবে যেতে বলেছে? কাল? এই কলকাতা শহরে—যতই দিনকাল খারাপ হোক—দুটো প্রাপ্তবয়স্ক লোককে বেমালুম খুন করা বা হাওয়া করে দেওয়া সোজা কথা নয়। ভয় পাস না—

পরের দিন ঠিকানা খুঁজে দুই বন্ধু মধ্য কলকাতার যে অঞ্চলে গিয়ে হাজির হলেন, তাকে শহরের sleazy area বলা যেতে পারে। অন্ধকার, নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে লম্বা করিডর। দেওয়ালে পানের পিকের দাগ। বাইশ নম্বর ঘরের সামনে টুল পেতে নিয়ানডার্থাল চেহারার একজন মানুষ বসে।

'ধনপতিবাবু আছেন কী?'—এই প্রশ্নের উত্তরে লোকটি নিঃশব্দে দরজাটা ফাঁক করে বলল—'যান।' গলার স্বরও চেহারার সঙ্গে মানানসই।

ধনপতি গুপ্ত বিশালকায় মধ্যবয়স্ক পুরুষ। মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। পরনে ধূসর রঙের টাউজার্স আর হালকা নীল বুশ শার্ট। সামনে টেবিলের ওপর পেপারওয়েট চাপা কাগজপত্র, ফোন আর সিগারেটের প্যাকেট।

দুই বন্ধু বসার পর ধনপতি প্যাকেট থেকে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। ভিনসেন্ট আর অমিতেশের দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন—চলে?

—না, আপনি খান।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন ধনপতি, তারপর বললেন—আমি কম কথার লোক। আমার মনে হয় সময় নষ্ট না করে একেবারে প্রথমেই কাজের কথা সেরে নেওয়া ভাল। বুঝতেই পারছেন, খোসগল্প করবার জন্য আপনাকে এখানে ডেকে আনিনি। আপনাদের সম্বন্ধে বাজারে যে গুজব শুনছি তা কী সত্যি?

অমিতেশ কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে ভিনসেন্ট বললেন—আমাদের সম্বন্ধে বাজারে কী গুজব চালু হয়েছে, তা জানলে উত্তর দিতে পারি—

—আপনারা নাকি অপরের মন পড়ে দিতে পারছেন? ভবিষ্যতে কী হবে না হবে তাও বলে দিতে পারছেন। এসব সত্য হলে আমার হয়ে আপনাদের কিছু কাজ করে দিতে হবে।

—বুঝতে পারলাম না। যা শুনেছেন তা যদি সত্যও হয়, তাহলেও আপনার হয়ে আমরা কাজ করতে যাব কেন? কাজটাই বা কী?

মোটা কাঁচের ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে অমায়িক হাসলেন ধনপতি।

—দেখুন ভাই, আমি যে মানুষ খুব ভাল নই সেটা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। যে ব্যবসা আমি করি, তাতে আমার প্রতিপক্ষের মনের আসল কথা আগে বুঝতে পারলে

পাল্টা চাল ভেবে রাখতে পারি। আপনাদের কোনোভাবে সরাসরি ইনভলভ্‌ড্ হতে হবে না। ঠিকানা দিয়ে দিলাম, কিছু একটা ছুতো করে আপনারা গেলেন, দশমিনিট বসে নমস্কার করে উঠে চলে এলেন। আমাকে এসে রিপোর্ট করলেন—ব্যস। কাজ হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, পাজি লোকেদেরও ইমান থাকে। আপনাদের আমি বঞ্চিত করব না। লাভের একটা অংশ আমি আপনাদের দেব—

লোকটার নির্লজ্জতায় দুই বন্ধু প্রথমে অবাক হয়ে বসে রইলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে অমিতেশ বললেন—আপনার আশ্চর্য ঔদ্ধত্যে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনি ভুল লোকের কাছে টোপ ফেলেছেন, আমরা আপনার হয়ে কাজ করব না—

ধনপতি চটলেন না। মৃদু হেসে তিনি বললেন—এত তাড়াতাড়ি 'না' বলবেন না। আপত্তি করছেনই বা কেন? আমি আপনাদের এত টাকা দেব যা আপনারা সারাজীবনে রোজগার করতে পারবেন না। কেউ জানতেও পারছে না—

—সে আপনি বুঝবেন না। কেউ না জানলেই কী অন্যায় কাজ করা যায়? নিজের কাছে তো ফাঁকি চলে না। যাক, আমরা উঠি। থ্যাঙ্কস্ ফর নাথিং—

সিগারেট ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে ধনপতি বললেন—বেশ, আসুন তাহলে। তবে কাজটা ভাল করলেন না। রাজি হলেই পারতেন। পথে-ঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন—

ভিনসেন্টের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।—আপনি কী আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন?

ধনপতি জিভ কেটে বললেন—আরে, ছি ছি! সে কী কথা! ওসব তো হিন্দি ফিল্মের গুণ্ডারা করে! আমি কী তাই? বলছিলাম যে, দিনকাল ভাল না, কতরকম বদমাস লোক নানান ধান্ধায় ঘোরে। তাদের থেকে সাবধানে থাকবেন। বন্ধুর মত বললাম কথাটা—

ভিনসেন্ট স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ধনপতির দিকে। এবার তিনি বললেন—ধনপতিবাবু, আপনার জন্য আমার মায়া হচ্ছে। কী বিপুল শক্তির সঙ্গে আপনি টক্কর লাগাতে যাচ্ছেন, তা এখনো বুঝতে পারেন নি। আপনার ভাড়াটে গুণ্ডারা আমাদের কী কববে? আমরা কী তার জন্য প্রস্তুত নই বলে মনে করেছেন? বাইরে আপনার মাইনে করা যে বনমানুষটা বসে আছে, তাকে একবার ডাকুন তো—

ধনপতি ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর জায়গায় এসে কেউ তাঁকে ধমক দেবে, এটা তাঁর ধারণার অতীত। আবছাভাবে ধনপতি অনুভব করলেন খেলাটা এখন অন্য লোক দেখাচ্ছে।

—কী হল? ডাকুন—

টেবিলের ধারে লাগানো ঘণ্টার বোতাম টিপলেন ধনপতি। পরমুহূর্তে বাইরে বসে থাকা দৈত্যাকৃতি লোকটা ভেতরে এসে ঢুকল। দেখবার মত চেহারা বটে! প্রায় ছ ফুট লম্বা, শালগাছের গুঁড়ির মত দুই হাত। চৌকো মুখে থ্যাবড়া নাক। শরীরে লোমের প্রাচুর্য তাকে একটা আদিম ভাব এনে দিয়েছে। মর্তমান কলার ছড়ার মত দুহাতের আঙুল।

—আপনে বুলায়া সাব?

ভিনসেন্ট বললেন—আপনার এই সহকর্মীটিকে দেখে বেশ বলশালী বলে মনে হয়। আচ্ছা, ওকে বলুন তো টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েটটা হাতে করে তুলে নিতে—

ধনপতি গুপ্ত একটু ধাতস্থ হবার চেষ্টায় গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—এসব কী পাগলামি হচ্ছে? পেপারওয়েট! বুলাকিলাল দুহাতে তিন মন ওজন তুলতে পারে?

—খুব ভাল কথা। পেপারওয়েটটার ওজন তিনশো গ্রাম। তুলতে বলুন—

বুলাকিলাল কথাবার্তার গতি অনুসরণ করতে না পেরে অবাক হয়ে একবার ভিনসেন্ট, একবার ধনপতির দিকে তাকাচ্ছে। তার বুদ্ধিহীন মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

ধনপতি পেপারওয়েটটা দেখিয়ে বললেন—বুলাকি, তুম ইয়ে চিজকো উঠাকে বাবুকো হাতমে দে দো—

হুকুম পালন করা বুলাকিলালের অভ্যেস। কাজেই অবাক হলেও সে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল।

এবং বাড়িয়েই রইল। পেপারওয়েটের চার ইঞ্চি ওপরে তার হাত শূন্যে স্থির হয়ে আছে।

—কই, কী হল? ধনপতিবাবু, আপনার সঙ্গী কথা শুনছে না কেন?

ধনপতি গুপ্ত হুঙ্কার দিলেন—ক্যা হুয়া বুলাকি?

টেবিলের ওপরে বুলাকির হাত থরথর করে কাঁপছে, খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। নিবিড় বিস্ময়ে বুলাকি কম্পিত গলায় বলল—নহি সক্‌তা সাব!

—ক্যা নহি সক্‌তা! উঠাও।

ভিনসেন্ট বললেন—ওকে খামোখা ধমকাচ্ছেন, কাজটা করা ওর ক্ষমতার বাইরে। বেচারি ভয়ও পেয়েছে। এই প্রথম ও আবিষ্কার করেছে পৃথিবীতে সব কাজ গায়ের জোরে হয় না।

উঠে দাঁড়িয়ে ভিনসেন্ট বললেন—আমরা আসি তাহলে। মনে কোনো রাগ বা বিদ্বেষ নিয়ে যাচ্ছি না, ওগুলোর বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান। আপনিও আর ভুলপথে চলবেন না মানুষকে ভালবাসুন, দেখবেন খুব আনন্দে বাঁচতে পারছেন। হ্যাঁ, বুলাকি, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। ওটা বাবুকে দাও—

সহজেই পেপারওয়েটটা তুলে ধনপতির হাতে দিল বুলাকি।

মৃদু হেসে ভিনসেন্ট বললেন—চল অমিতেশ, যাই।

॥ ছয় ॥

বিশ্বপরিচয়

দুই বন্ধু যখন অন্ধকার করিডর বেয়ে আবার মহানগরীর জনাকীর্ণ পথে এসে দাঁড়ালেন, তখন বেলা গড়িয়ে আসছে। অমিতেশ মানুষটি কিছুটা মৃদু প্রকৃতির। তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। এমন লোকের সঙ্গে তিনি আর কখনো মেশেন নি। ছোটবেলায় কুহেলিকা সিরিজের গোয়েন্দা উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনার কথা পড়েছেন বটে, কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতেও এসব সত্যি ঘটে তাহলে!

ভিনসেন্ট বললেন—খুব ঘাবড়ে গিয়েছিস, না? স্বাভাবিক বটে, আমরা শান্তিপ্রিয় লোক, মারদাঙ্গা গুণ্ডামির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবে বাস্তবকে তো মেনে নিতেই হবে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের কাজ। ভয় পাস না, শেষ জয় আমাদেরই। তাছাড়া লোকটা দারুণ চমকে গিয়েছে। আমাদের পেছনে তো আর লাগবেই না, এবার থেকে কোনো খারাপ কাজ করার আগেও অনেকবার ভাববে—

রাত্রিতে খাওয়ার পর ভিনসেন্ট বললেন—অমিতেশ, তুই কদিন ছুটি নিয়ে আমার

সঙ্গে চল। আমার কাজের জায়গায়। অনেকদিন শহর ছেড়ে বাইরে যাস নি, তোর ভাল লাগবে। আমাদের নতুন রিফ্লেকটরে আকাশ দেখিয়ে দেব। যাবি?

দু একবার আপত্তি করে অমিতেশ রাজি হয়ে গেলেন। ঠিক হল ওঁর খুড়তুতো শালা স্ত্রীকে নিয়ে এসে কটা দিন মঞ্জুলার কাছে থাকবে। অত নির্জন জায়গা, ভিনসেন্টও অবিবাহিত, একা ভাল লাগবে না বলে স্ত্রীকে রেখে যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিলেন অমিতেশ। স্থির হল দুদিন পরে রওনা দেওয়া হবে। সম্বলপুর এক্সপ্রেসে বিশেষ একটা ভিড় হয় না, সহজেই রিজার্ভেশন পাওয়া গেল।

যাওয়ার আগের দিন টুকিটাকি বাজার করতে বেরিয়েছিলেন দুই বন্ধু। বাড়ি ফিরে সবে পাখা চালিয়ে বসেছেন, এমন সময় দরজার বেল বেজে উঠল। অমিতেশ উঠে গিয়ে দরজা খুললেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ধনপতি গুপ্ত।

—আপনি!

ম্লান হেসে ধনপতি বললেন—হ্যাঁ। খবর না দিয়েই এলাম। একটু বসতে পারি?

এই পাষণ্ড লোকটাকে আপ্যায়ন করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না অমিতেশের, কিন্তু অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মজ্জায় মিশে থাকা সামাজিক সংস্কার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমিতেশ বললেন—আসুন।

ধনপতিকে দেখে ভিনসেন্ট বললেন। আশ্চর্য স্পর্দ্ধা লোকটার, একেবারে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে।

কিন্তু না, আজ ধনপতি যেন অনেকটা স্তিমিত। আগের সেই দাম্ভিক, উদ্ধত ভাবটা আর নেই। কী একটা যেন পরিবর্তন হয়েছে মানুষটার।

ভিনসেন্ট ব্যঙ্গমাখা গলায় বললেন—আপনি একা যে? বুলাকিলাল কই?

মাথা নিচু করে ধনপতি বললেন—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি—

ব্যাপারটা এতই অসম্ভব আর আকস্মিক যে, দুই বন্ধু চুপ করে বসে রইলেন। দুদিনের ভেতরে একটা মানুষের এমন পরিবর্তন হয় নাকি? এটা আবার নতুন কোনো চাল নয় তো?

অমিতেশ বললেন—বেশ, বলুন কী দরকারে এসেছেন?

মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেই ধনপতি গুপ্ত বললেন—প্রথমেই বলে রাখি, আমার নাম ধনপতি গুপ্ত নয়। ব্যবসার—মানে, কাজের প্রয়োজনে ও নামটা ব্যবহার করি—

ভিনসেন্ট বললেন—জানি। আপনার নাম বিষ্ণুপদ দাস। বলুন—

অবাক হয়ে একবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিলেন ধনপতি।

—ঠিকই ধরেছেন। আর, আপনার কাছে—আপনাদের কাছে যে লুকিয়ে রাখতে পারব না, সে তো আমার বোঝাই উচিত ছিল। দেখুন, আমি লোকটা মূলত খুব খারাপ নই, অন্তত ছিলাম না। জানি, একথা আমার আচরণ দেখে বিশ্বাস করা কঠিন। এই কঠিন পৃথিবী আমাকে এই রকম করে তুলেছে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা যান, বিশেষ লেখাপড়া শিখতে পারি নি। পরের গল্পটা খুব সাধারণ, আরও হাজার গরীব ছেলের গল্প। বৃদ্ধা মা, অনেকগুলো ভাইবোন—সব আমার ওপর নির্ভরশীল। দস্যু রত্নাকরের গল্পের মত তাদের দাবি অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের। দাবিটা আমার কাছে। কিন্তু কী করে সে দাবি

পূরণ হবে তা তারাও জানে না, আমিও জানি না। ধীরে ধীরে অসৎ সঙ্গে মিশলাম। আমার মত অসহায়, ভেসে বেড়ানো ছেলেদের খাবাপ কাজে নিয়োগ করার জন্য বহু আড়কাঠি বাজারে ঘুরে বেড়ায়। তাদের পাল্লায় পড়লাম। আমার কর্মদক্ষতা ছিল, বুদ্ধি ছিল। সহজেই আমি তাদের দলপতি হয়ে উঠতে পারলাম। অনেক টাকা উপার্জন করলাম। মা ভাল চিকিৎসা পেয়ে ঐশ্বর্যের মধ্যে মারা গেলেন। বোনেদের ভাল ঘরে বিয়ে দিলাম। তারা এখন সুখী। সবাই সুখী—একা আমি ছাড়া।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে যেন হাঁফিয়ে গিয়ে থামলেন ধনপতি।

ভিনসেন্ট বললেন—কেন, আপনি সুখী নন কেন?

—আমার একমাত্র ছেলে পঙ্গু। জন্মের সময় ফরসেপস্ ডেলিভারি করতে গিয়ে তার মাথায় চোট লেগেছিল। তখন বোঝা যায় নি। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সে হাঁটতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না। এখন তার বয়েস বারো বছর, কিন্তু কার্যত সে ছ মাসের শিশুর মত অপরিণত এবং অসহায়। আমার একমাত্র সন্তান—

মুখ তুললেন ধনপতি। তাঁর দু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। অশ্রুরুদ্ধ গলায় তিনি বললেন—ছেলেব জন্য আমি কী না করেছি! ভারতে কোনো চিকিৎসা বাকি রাখি নি, এমন কী দেশের বাইরে ভিয়েনাতে নিয়ে গিয়েছি। ভাবুন! আমি বিষ্টুপদ দাস, কলকাতার পথে পথে ফ্যা ফ্যা কবে বেড়াতাম, শুকনো রুটি জুটত না, আমি দশ লক্ষ টাকা খরচ করে বিলেত থেকে ছেলের চিকিৎসা করিয়ে আনলাম! কী লাভ হল? কিচ্ছু না।

একটু দম নিয়ে আবার বললেন—আমাব এখন সব আছে, কিন্তু আসল জায়গায় ফাঁকি। এখানে হুকুম খাটবে না, ভয় দেখানো খাটবে না, টাকার জোর গায়ের জোব কিচ্ছু খাটবে না। সেই দুঃখে আর রাগে সর্বকিছু তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করত। কোনো ভাল জিনিস, সুন্দর জিনিস দেখলে মনে হত মুচড়ে, ভেঙে নষ্ট করে দিই। আমি সুখ পাব না, অন্যে পাব কেন।

শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ধনপতি আবার বললেন—গতকাল সকালে রাজুর, মানে আমার ছেলের, ভয়ানক একটা খিঁচুনি মত হয়েছিল। দম বন্ধ হয়ে, সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে সে এক কঠিন অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের ফোন করি। তাঁরা এসে কিন্তু কোনো ভরসা দিতে পারলেন না। বরং বললেন এবার আমাকে মনে মনে প্রস্তুতি নিতে হবে। এবার সময় হয়ে এসেছে। ভাবুন আপনারা, বাবা আর মা-কে সন্তানের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। কী কঠিন কাজ! তাও আমি তো পুরুষ, আমার বাইরের জগৎ আছে—আমি চেষ্টা করে ভুলতে না পারি, অন্যমনস্ক থাকতে পারব। কিন্তু আমার স্ত্রী?

একটা নিশ্বাস ফেলে ধনপতি বললেন—বড় রকমের চোট না পেলে মানুষ নিজের চেতনায় ফেরে না। দুঃখ এই, সন্তান শোক দিয়ে আমাকে এই সত্য চিনতে হল। আমার আর টাকা বা ক্ষমতার দরকার নেই, কিছুর দরকার নেই। নানা রকম আবছা ব্যবসার সঙ্গে দুটো সৎ ব্যবসাও আমার আছে। এখন থেকে সে ব্যবসা নিয়েই থাকব। আপনারা হয়তো ভাবছেন এটাও আমার একটা চাল, এর পেছনে নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। না, কিছু নেই। পরিবর্তন হলে এক মিনিটেই হতে পারে। ডাক্তাররা সবাই একমত যে, আমার রাজু আর মাস দুয়েকের বেশি কিছুতেই বাঁচবে না। আমি কাল সারারাত জেগে পায়চারি করেছি, চিন্তা করেছি। এমনভাবে আর কখনো চিন্তা করিনি। বিশ্বাস করুন, আর কখনো আমি—

ধনপতির চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল, গলা বুঁজে এল।

ভিনসেন্ট উঠে গিয়ে ধনপতির পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

—ধনপতিবাবু, অনুতাপের আগুনে সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আপনার ছেলের জন্য আমরা মর্মাহত। জানবেন আমরা আপনার সঙ্গে আছি—

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ধনপতি বললেন—একটা অনুরোধ জানাই—

—কী?

—আমার ছেলে যাতে কষ্ট না পেয়ে চলে যেতে পারে, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন। আর—

—আর কী?

—নিজের জীবন নির্বাহের জন্য সামান্য কিছু রেখে আমার যা কিছু সব আমি কোনো ভাল কাজে দান করে দিতে চাই। আপনারা নেবেন টাকাটা?

—আমরা? আমরা টাকা নিয়ে কী করব?

—আপনারা যেখানে ভাল বুঝবেন দান করে দেবেন। অন্য কারুকে বিশ্বাস করতে পারছি না—

একটু চুপ করে থেকে ভিনসেন্ট বললেন—ঠিক আছে, ভেবে দেখছি—

বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ধনপতি বললেন—আঃ। নিশ্চিন্ত হলাম।

অমিতেশ বললেন—বসুন, আপনার জন্য চা বলি—

চমকে উঠে ধনপতি বললেন—না, না। সন্ধে হয়ে গিয়েছে, এবার আমি বাড়ি যাব। দিনের এই সময়টা আমি আমার ছেলের কাছে কিছুক্ষণ বসি। সে কথা বলতে পারে না, আমার কথাও বোঝে না, শুধু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিও চুপ করে তার একটা হাত আমার হাতেব মধ্যে নিয়ে বসে থাকি। আর তো বেশিদিন নয়। কিছু মনে করবেন না। আর একদিন বরং—

ধনপতি চলে গেলেন।

ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আলো জ্বালিয়ে দিলেন অমিতেশ।

*   *   *

স্টেশনের বাইরে ভারত সরকারের নাম লেখা জিপ অপেক্ষা করছিল। বন্ধুকে নিয়ে ভিনসেন্ট স্টেশন থেকে বেরুতেই খাকি উর্দি পরা ড্রাইভার এগিয়ে এসে তাঁর হাত থেকে সুটকেস দুটো নিয়ে বলল—নমস্কার স্যার। ভাল ছিলেন?

—নমস্কার। তুমি ভাল আছ দীপকান্ত?

—হ্যাঁ স্যার। আসুন—

নির্জন পাহাড়ি স্টেশনের মোরাম ঢাকা ড্রাইভওয়ে দিয়ে বেরিয়েই দুপাশে বন আর পাহাড়। শাল সেগুন আর কেঁদ ছাড়া বাকি গাছ ভাল চিনতে পারলেন না অমিতেশ। ভিনসেন্ট চিনিয়ে দিতে লাগলেন—ওটা হল করম, ওই ধও, ওই দেবকাঞ্চন।

প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার যেতে হবে এই জনমানবহীন অরণ্যভূমি মধ্যে দিয়ে। অমিতেশের ভারি আনন্দ হচ্ছিল। বহুদিন তিনি এমন জায়গায় বেড়াতে আসেন নি। কলকাতার বাইরে বা দেশের বাইরে প্রায়ই যেতে হয় বটে, কিন্তু সে বিজ্ঞানীদের সেমিনারে পেপার পড়তে, কিম্বা জরুরি কনফারেন্সে যোগ দিতে। তখন পথটা কোনোরকমে অতিক্রম করার দিকেই মন থাকে, পথের ধারের সৌন্দর্য উপভোগ করার মত বাড়তি সময় হাতে

থাকে না। মনে পড়ল কলেজ জীবনে পড়া কীটসের কবিতা—সেই শহরের খোঁয়াড়বাসী মানুষটির কথা।

অমিতেশ বললেন—খুব ভাল লাগছে এসে। ভাগ্যিস তুই জোর করলি—

—করলাম। তুই বেসিক্যালি কবি, কলেজে কবিতা লিখতিস মনে আছে?

—যাঃ, ও রকম সব বাঙালিই অল্প বয়েসে লিখে থাকে। সবাই কী বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথ হয় নাকি?

অরণ্য ক্রমে ঘন হয়ে আসছে। বেশ চমৎকার ছায়া-ছায়া ঘুম-ঘুম ভাব। অমিতেশ বললেন—এসব জায়গায় লোকের বাস নেই? কোনো গ্রাম বা কিছু?

—আছে। তবে ঠিক পথের ওপর পড়বে না। আর তাকে ঠিক গ্রাম বলা যায় কী না তাই বা কে জানে। জঙ্গলের মধ্যে আট-দশটা কুঁড়ে ঘর—এই মাত্র।

অমিতেশ শহরে মানুষ। তাঁর ভারি অবাক লাগল। বিস্তৃত জঙ্গলের মধ্যে এভাবে কয়েকজন মানুষের থাকা—অদ্ভুত তো!

—তাদের জীবিকা কী? প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পায় কোথায়?

ভিনসেন্ট হেসে বললেন—জীবিকা সে অর্থে কিছুই না। ওদের প্রয়োজন খুব কম, তোর-আমার হিসেবের মধ্যে নয়। ওদের যা দরকার সব ওরা এই জঙ্গল থেকেই পায়। মাটির দেওয়ালের বাড়ি, গাছ কেটে খুঁটি, পাতার ছাউনি। সামান্য চাষ করে কেউ কেউ, তার থেকে কিছু শস্য পায়। বন্যজন্তু শিকার করে মাংস খায়—

—কী জন্তু?

—সজারু, সম্বর, হরিণ—

প্রায় পনেরো কুড়ি কিলোমিটার রাস্তা চলে আসা হয়েছে। ভিনসেন্ট হঠাৎ বললেন—দীপকান্ত, গাড়ি একটু থামাও তো—

অমিতেশ বললেন—কেন রে, হঠাৎ কী হল?

—দেখ না, একটা মজার অভিজ্ঞতা হবে—

দীপকান্ত একটা বড় গাছের নিচে গাড়ি থামাল। ভিনসেন্ট নেমে পড়ে বন্ধুকে বললেন—তুইও নাম। এদিকে আয়—

অমিতেশ নামতে ভিনসেন্ট বললেন—দীপকান্ত, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ কর।

ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হতেই এক আশ্চর্য স্তব্ধতা নেমে এল পরিবেশে। এখনো বেশ বেলা আছে, ওপরে তাকালে গাছের মাথায় সূর্যের আলো দেখা যায়। কিন্তু অরণ্যের ভেতর যেন অসময়ে সন্ধ্যার আবছা আলো-আঁধারি। বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে একটা শুকনো শালপাতা মাটিতে খসে পড়ল। স্পষ্ট তার আওয়াজ শুনতে পেলেন অমিতেশ। কিট কিট করে এক ধরনের পোকা ডাকছে গাছের সারির মধ্যে। এমন স্তব্ধতা আগে কখনো অনুভব করেন নি অমিতেশ। স্নিগ্ধ, শান্ত অনুভূতি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এও সত্য, তাঁর শহরের উচ্চকিত কলরবের পরিবেশও সত্য। কোনটা বেশি সত্য?

বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে ভিনসেন্ট বললেন—দেখছিস, চারদিক কেমন শান্ত? তোকে এই স্তব্ধতার ভাষা শোনাবার জন্য এখানে গাড়ি থামালাম। এখানে তুই শহরকে পথের ধারে নামিয়ে রেখে যা। তোর শহুরে মনকেও। এইরকম স্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে মানব সভ্যতার শুরু। আমাদের পূর্বপুরুষরা বাস করতেন এমন অরণ্যেই।

পূর্ণতার কোনো ভাষা নেই। অমিতেশ ভরা হৃদয়ে চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন।

ভিনসেন্ট বললেন—চল। ভাল লাগার এই তো সবে শুরু। কদিন আমার সঙ্গে থাকার পর বুঝতে পারবি কেন আমি ছন্দপতন সহ্য করতে পারি না। কেন আমি সব কিছু ছেড়ে মানুষের শান্তির কথা ভাবি। এই অরণ্য তোকেও জাদু করবে—

অমিতেশ কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ভিনসেন্ট তাঁর হাত চেপে ধরলেন। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ করে থাকতে বলে বনের ভেতর একদিক নির্দেশ করলেন।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়েই অমিতেশ দেখতে পেলেন হরিণটাকে।

গাছের ডালপালার মত শিঙওয়ালা বাছুরের মত বড় একটা হরিণ। ডানদিকের জঙ্গলের মধ্যে থমকে থেমে গিয়ে অবাক হয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরেই জড়তা ভেঙে হরিণটা তড়বড় করে দৌড়ে ঢালু জমি দিয়ে নেমে রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকের গাছপালার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

* * *

অবজারভেশন কেজ-এর ভেতর পাশাপাশি দুখানা গদিমোড়া চেয়ারে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন ভিনসেন্ট আর অমিতেশ। মাথার ওপরে আড়াআড়ি আকাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে ওন্দ্রিয়ভ রিফ্লেকটরের ধাঁচে তৈরি দূরবীনের স্কেলিট্যাল টিউব। এই দূরবীনে আকাশের যে কোনো অংশ মাত্র এক মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে দৃশ্যমান করা যায়। আপাতত ভিউইং স্ক্রিনে বৃহস্পতি গ্রহের প্রতিচ্ছবি ভেসে আছে। পাশে আলোর বিন্দুর মত চারটি উপগ্রহ। ছিয়ানব্বই ইঞ্চি মিরর দিয়ে টেনে আনা প্রতিচ্ছবি।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে ভিনসেন্ট বললেন—লিপারসে।

অমিতেশ মুগ্ধ হয়ে বৃহস্পতি গ্রহের রূপ দেখছিলেন। তিনি বললেন—অ্যাঁ?

—হল্যান্ডের হান্‌স লিপারসে। দূরবীনের আবিষ্কর্তা হিসেবে গ্যালিলেওর নাম প্রচলিত থাকলেও আসল আবিষ্কর্তা হলেন লিপারসে। ১৬০৯ সালে তাঁর এই অদ্ভুত কাঁচের পরকলা এবং যন্ত্রের কথা শুনে গ্যালিলেও জিনিসটা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং নিজে একটি দূরবীন তৈরি করেন। ওঃ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কী সব দিন গিয়েছে! এখন সেই অর্থে ব্রেক থ্রু কিছু হয় না, আমরাও তেমন করে চমকাতে ভুলে গিয়েছি—

ভিনসেন্ট বললেন—ঠিক। এখন কেন লিপারসে আর গ্যালিলেওর নাম মনে এল জানিস? গ্যালিলেও তাঁর তৈরি ছোট্ট দূরবীনে প্রথম দেখেছিলেন বৃহস্পতি গ্রহ আর চাঁদ। এখনো সেই একই রোমাঞ্চ জাগে দেখলে। প্রকৃতি পুরনো হয় না—

রাত তিনটে পর্যন্ত দুই বন্ধুর চোখের সামনে দিয়ে সরে সরে গেল মহাবিশ্বের ছায়াছবি। অনন্ত নক্ষত্র আর নীহারিকার দল দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে থেকে তাদের আলো পাঠাল উৎসুক অমিতেশের চোখের রেটিনায়। প্রথম দিকে দু-একটা কথা বলছিলেন অমিতেশ, তারপর সংযত হয়ে আত্মস্থ হয়ে গেলেন। ভিনসেন্ট এই অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তাঁর পুরো কর্মজীবন, তবু তাঁর বিস্ময় অমিতেশের চেয়ে কম নয়।

ওই যে দূরে প্রজ্বলন্ত এপসাইলন এরিডানি, ছায়াপথের উপান্তে ভেসে থাকা মাজেল্লানিক ক্লাউড, কাশ্যপী মণ্ডলী, উত্তর ভাদ্রপদ নীহারিকার আবছা ধূসর সীমারেখা, ওই দিকহারা মহাবিশ্বের পটভূমিতে যে মহানাটক অভিনীত হয়ে চলেছে আজ হাজার কোটি বছর ধরে, মানুষ সেই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের রূপকার। এই সমগ্র বিশ্ব তার ক্রীড়াভূমি।

ভিনসেন্ট বললেন—চল, এইবার ফিরে যাই। আর আধঘণ্টার মধ্যে পূর্বদিক থেকে

সমস্ত আকাশে হালকা একটা আলোর আভাস ছড়িয়ে পড়বে, এখনই পড়তে-শুরু করেছে। আমাদের ভাষায় যাকে বলে আর্লি ডনলাইট। খালি চোখে ধরা কঠিন, কিন্তু দূরবীনের কাজ আর হবে না—

সামনের কনসোলে একটা বোতাম টিপতে হাইড্রোলিক মোটর চালু হয়ে অবজারভেশন কেজকে নিচের মেঝেতে নামবার সিঁড়ির মুখে এনে দিল। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে করিডর পার হবার সময় ভিনসেন্ট দেখলেন মণিদেবের দরজার নিচে দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

—আয়, ডাইরেকটরের সঙ্গে দেখা করে যাই—

দরজায় নক্ করতেই ভেতর থেকে অধ্যক্ষের গলা—কাম ইন।

টেবিলের ওপাশে নিজের চেয়ারে বসে কী একটা কাগজ দেখছিলেন মণিদেব। মুখ তুলে হেসে বললেন—সো ইউ কলড্ ইট এ ডে অ্যাট লাস্ট? কেমন অভিজ্ঞতা হল প্রফেসার গুপ্তভায়া?

অমিতেশ বললেন—দারুণ। নিজের প্রকৃত প্রেক্ষাপট দেখলাম—

—তাও তো এখনো কিছু কিছু গোলমাল আছে ইমেজ ফর্মেশনে। ফলস কালার আছে, ডিসটর্‌শন আছে। বসে বসে সেগুলো দূর করবার উপায়ই চিন্তা করছি। ঠিক হয়ে যাবে—

বেরিয়ে আসবার আগে ভিনসেন্ট বললেন—সারারাত জেগে কাজ করেন, আপনি ঘুমোন কখন স্যার?

—দিনে কিছুটা ঘুমিয়ে নিই। চোর আব জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাত্রিতেই কাজ করে—

দুই বন্ধু পাহাড়ের পথে নামতে নামতে দেখলেন আকাশে ভোরের ছোঁয়া লেগেছে।

॥ সাত ॥

বুধুয়ার গ্রামে

একটু বাদেই কাক-কোকিল ডেকে ভোর হয়ে গেল।

ভিনসেন্ট বললেন—বুধুয়া আসতে এখনো দেরি আছে অন্তত ঘণ্টাখানেক। আমরা নিজেরাই বরং একটু চা বানিয়ে নিই, কী বলিস?

জল গরম করবার ইলেকট্রিক যন্ত্র আছে ভিনসেন্টের। পাত্রের ভেতর জল দিয়ে প্লাগের সুইচ দিলে জল আপনি গরম হয়ে যায়। তারপর চা চিনি ফেলে দিলে চা তৈরি হয়ে যায়। অনেকক্ষণ গরমও থাকে। একসঙ্গে বেশি করে বানিয়ে নিলে বেশ কয়েকবার চা খাওয়া যায়।

এক কাপ করে চা নিয়ে দুই বন্ধু সবে সোফায় বসেছেন, এমন সময় বাইরের দরজায় বেল বেজে উঠল। অমিতেশ বললেন—এত সকালে কে এল?

ভিনসেন্ট উঁচু গলায় বললেন—দরজা ভেজানো আছে, ঠেলে চলে আসুন—

তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন—এখানে চুরি-ডাকাতি বলতে গেলে হয়ই না। দরজা হয় খোলা থাকে, নয়তো ভেজানো থাকে। কলিং বেলটা অলঙ্কার মাত্র—

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন মণিদেব রায়।

অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভিনসেন্ট বললেন—স্যার! আপনি!

সোফার হাতলের কাছে অ্যালুমিনিয়ামের লাঠিটা ঠেসান দিয়ে রেখে জমিয়ে বসতে বসতে মণিদেব বললেন—চা খেতে এলাম। আছে নাকি বাড়তি এক কাপ?

'অবশ্যই স্যার', বলে উঠে গিয়ে ভিনসেন্ট পারকোলেটর থেকে এক কাপ চা এনে মণিদেবের সামনে রাখলেন। কাপ তুলে চুমুক দিয়ে মণিদেব বললেন—আঃ, দারুণ চা হয়েছে, কে বানিয়েছে?

ভিনসেন্ট বললেন—আমি স্যার।

—ব্যাচেলার মানুষরা রান্নার ব্যাপারটা ভাল বোঝে। চা তো ভাল করেই। প্রফেসর গুপ্তভায়া, আপনি রান্না জানেন?

অমিতেশ হেসে বললেন—না। ও জিনিসটা স্ত্রীর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি। একবার বেগুনভাজা করতে গিয়েছিলাম, কড়ার তেলসুদ্ধ জ্বলে উঠেছিল—

—তাহলে মাই অবজারভেশন ইজ কারেক্ট, ব্যাচেলাররা রান্নায় অগ্রণী—

ভিনসেন্ট ক্রমশই অবাক হচ্ছিলেন। মণিদেব তাঁর কোয়ার্টার্সে আসেন কম। এলেও কালে-ভদ্রে নিতান্ত দরকারে। আজ এসে দরকারি কোনো কথা তো বলছেনই না, বরং যাকে বলে 'স্মল টক'—খেজুরে আলাপ—তাই করছেন। মণিদেবের গম্ভীর, ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণের সঙ্গে ব্যাপারটা খাপ খায় না। পেছনে কারণ আছে অবশ্যই। কী সেটা?

কাপ নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন মণিদেব। ধীর অত্বরিত ভঙ্গি। তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন—প্রফেসার সাহেব, আপনি উঠে গিয়ে ওই কোণের চেয়ারটায় বসুন—

অকস্মাৎ প্রসঙ্গান্তরে অবাক হয়ে অমিতেশ বললেন—আমি? ওই চেয়ারে? কেন বলুন তো? মানে—

—দেরি করবেন না, চলে যান। কারণ একটু পরেই বুঝতে পারবেন। ভিনসেন্ট তোমার কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে? নেই বোধহয়? আচ্ছা, এটা তুমি রাখো। ফায়ার করতে হবে না, প্রয়োজনে ভয় দেখাবে—

ঢিলে জামার পাশেব পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে ভিনসেন্টের হাতে দিলেন মণিদেব।

—এটা পয়েন্ট টু টু বোরের বেরেটা। সেফটি ক্যাচ আটকানো আছে, হঠাৎ গুলি ছুটে যাবে না। এই দেখো, নখ দিয়ে ঠেলে ওপরে তুলে দিলে 'অন' হয়ে যাবে—

ভিনসেন্টের হাতে রিভিলভারটা প্রায় গুঁজে দিলেন মণিদেব। ভিনসেন্টও ঘটনার গতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। হঠাৎ এ আবার কী নাটক?

মণিদেব বললেন—তুমি আমার বাঁদিকে ওই দিকটায় চলে যাও—ব্যস, ঠিক আছে—

ভিনসেন্ট বললেন—স্যার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব কী ব্যাপার?

—পরে বুঝবে। এখন আর সময় নেই, বুধুয়া দৌড়ে পাহাড়ের মাঝ বরাবর চলে এসেছে—

—বুধুয়া? সে কোথায় আসছে?

—এখানেই। সে এবং তার গ্রামের লোকেরা খুব বিপদগ্রস্ত—

মণিদেবের কথার মাঝখানেই ঘরের আধখোলা দরজার পাল্লা দুটো দড়াম করে পুরো খুলে গেল। প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকল বুধুয়া। তার বয়েস বছর চৌদ্দ কী পনেরো হবে। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, কিন্তু চোখে-মুখে সরল বুদ্ধির দীপ্তি। তার পরনে ঘিয়ে রঙের

হাফ প্যান্ট আর খয়েরি বুশ শার্ট। উত্তেজনায় তার চোখ বিস্ফারিত, দৌড়ে আসার জন্য সে হাঁফাচ্ছে।

দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই বুধুয়া দেখতে পেল মণিদেবকে, সে ছুটে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল—ডাইরেক্টর সাহেব! এক্ষুনি চলুন, ওরা বলছে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেবে।

মণিদেব বুধুয়াকে নরম গলায় বললেন—কোনো ভয় নেই, তুমি চুপ করে দাঁড়াও এখানে। কেউ তোমার গ্রামের ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা আছি তোমার সঙ্গে—

এবার চারদিকে তাকিয়ে বুধুয়া অমিতেশ আর ভিনসেন্টকে দেখতে পেয়ে কেঁদে ফেলল। ভিনসেন্ট বললেন—কী হয়েছে বুধুয়া? কাঁদছো কেন?

—ওরা জিপ নিয়ে এসেছে, সঙ্গে গুণ্ডা এনেছে। সবাইকে মেরে ফেলবে—

ভিনসেন্ট বুঝলেন বুধুয়া ভয়ে আতঙ্কে আর উত্তেজনায় দিশাহারা হয়ে গিয়েছে। ঠিকভাবে নিজের বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারছে না। মিষ্টি কথায় তাকে আশ্বস্ত করে, বারবার প্রশ্ন করে মোটামুটি যা জানা গেল তা এই—বরাবরের মত এবারও শহরের মহাজন এসে চাষের মরশুমের আগে বীজ কেনা, লাঙল ভাড়া করা, জনমজুরের খরচ এসব বাবদ টাকা দাদন দিয়ে গিয়েছিল। এখন তারা অন্যান্য বছরের চাইতে অনেক বেশি সুদসহ টাকা ফেরৎ চাইছে। গ্রামের লোকেরা ন্যায্য সুদ দিতে রাজি, কিন্তু মহাজনের চাহিদা মত অত টাকা তারা কোথা থেকে দেবে? এই নিয়ে বচসা হতে হতে শেষে বিরাট গোলমাল বেধেছে। গুণ্ডারা হুমকি দিচ্ছে, তারা গুলি চালাবে, আগুন লাগাবে। বুধুয়াকে তারা আটকে রেখেছিল, কোনোরকমে সে পালিয়ে খবর দিতে এসেছে।

বুধুয়ার কথা শেষ হতে না হতে বাইরে একটা গাড়ি থামবার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপরেই মোরামের ওপর ব্যস্ত পায়ের শব্দ।

মণিদেব বললেন—ভিনসেন্ট, প্রফেসর সাহেব, তৈরি থাকুন।

পরক্ষণেই হুড়মুড় করে ঢুকল তিনজন দুষ্টু চেহারার লোক। দুজনের শরীর ভারী, লম্বা-চওড়া। তাদের পরনে টাইট জিনসের প্যান্ট, একজনের গায়ে কালো, আর একজনের সবুজ গেঞ্জি। মুখে তাদের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে নিষ্ঠুরতার ঝিলিক। তিন নম্বর লোকটি শীর্ণকায়, পরনে পায়জামা আর লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ করা আধময়লা পাঞ্জাবি। তার হাতে একটা পান মশলার কৌটো আর মুখভর্তি পান। নানারকম উৎকট নেশা করে সম্ভবত তার স্নায়ু শিথিল, আধা অকেজো। মাঝে মাঝেই তার গালের পেশি কেঁপে কেঁপে উঠছে, সেই সঙ্গে একটা চোখ অর্ধেক বুঁজে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে কাকে যেন একটা অসামাজিক চোখের ইশারা করছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এই দলটার সেই দলপতি। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে কৌটো খুলে মশলা মুখে দিল।

ভিনসেন্ট রাগী গলায় বললেন—এ কী! কার অনুমতিতে তোমরা এখানে এসেছ? জানো না এটা সরকারি জায়গা? এখানে ঢুকতে গেলে আগে পারমিশন নিতে হয়? কে তোমরা?

শীর্ণ পাঞ্জাবি পরা লোকটা অবহেলার সঙ্গে ভিনসেন্টের দিকে তাকাল, বোধহয় উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। তারপর কম্পমান বুধুয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—ক্যা রে ছোকরা, এখানে পালিয়ে এসে ভাবছিস বেঁচে গেলি? এদের কাছে চুকলি খাচ্ছিলি আমার লোকের নামে, অ্যাঁ? এরা বাঁচাবে তোকে?

সোফার হাতলে ভর দিয়ে মণিদেব দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভদ্র গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা বাচ্চা ছেলেকে খামোকা ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আমাদের সঙ্গে কথা বলুন—

দলপতি লোকটা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একবার ভাল করে দেখে নিল, তারপর মণিদেবের দিকে তাকিয়ে বলল—তু তো লেংড়া মালুম হো রহা হ্যায়, বেশি কথা না বলে বসে থাক—আও ছোকরা, আও তো—

বুধুয়াকে কাছে ডাকল লোকটা। বুধুয়া ভয় পেয়ে মণিদেবের কাছে আরও ঘেঁসে দাঁড়াল। দলপতি লোকটা ওধারের গাবদা চেহারার গুণ্ডাটাকে বলল—রামু, ইসকো থোড়া মরাম্মত কর দে তো—বাত নেহি শুনতা হ্যায়—

এক ধরনের লোক থাকে যারা দুর্বল এবং অসহায়ের ওপর অত্যাচার করে খুব আনন্দ পায়। সবুজ গেঞ্জি পরা গুণ্ডাটা—তার নাম রামু—সে হাসি মুখে এগিয়ে এসে বুধুয়ার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই বুধুয়া চিৎকার করে উঠল, এবং—

এবং চোখের পাতা ফেলবার আগেই মণিদেব তাঁর অ্যালুমিনিয়ামের লাঠিটা দিয়ে রামুর হাতে আঘাত করলেন সজোরে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে রামু বুধুয়াকে ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত চেপে ধরল। কালো গেঞ্জি আর দলপতি প্রথমে অবাক হয়ে তাকাল মণিদেবের দিকে। তারা কল্পনাই করতে পারেনি একজন পঙ্গু মানুষ অত দ্রুত কাউকে আঘাত করতে পারে। পরক্ষণেই তারা দুজন হুঙ্কার দিয়ে সামনে লাফিয়ে পড়তে গেল।

যারা এমনিতে ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, তারা রেগে গেলে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। অমিতেশ আর ভিনসেন্টও তাই করে ফেললেন। ওরা দুজন লাফিয়ে পড়তেই ভিনসেন্ট পকেট থেকে রিভলভার বের করে বললেন—থামো! নইলে গুলি করব। আর অমিতেশ হঠাৎ পা টা সামনে বাড়িয়ে ধরলেন, তাতে হোঁচট খেয়ে কালো গেঞ্জি পড়ে গেল।

মণিদেব কেন তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়াতে বলেছিলেন এবার তা স্পষ্ট হল। যেভাবেই চেষ্টা করুক না কেন, গুণ্ডাগুলো কিছুতেই তিনজনকে একসঙ্গে কাবু করতে পারবে না। বরং ভিনসেন্ট একাই লোকগুলোকে কভার করে রেখেছেন।

মণিদেব দলপতিকে বললেন—তোমার নাম কী?

লোকটা অবরুদ্ধ রাগে বিকৃত গলায় বলল—ছোটেলাল।

—বেশ ছোটেলাল, চলো সবাই একসঙ্গে বুধুয়ার গ্রামে যাওয়া যাক। দেখি সেখানে কী অবস্থা করেছ তোমরা। চল, এগিয়ে পড়ো। কোনো বেচাল করবে না, আমার বন্ধু রিভলভার তাক করে আছে। তোমাকে মারলে আমাদের শাস্তি হবে না। কারণ তোমরা সরকারি জায়গায় ঢুকে গুণ্ডামি করছ—

কোয়ার্টার্সের বাইরে একটা লক্কড়মার্কা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। মণিদেব তার সামনের সিটে ছোটেলাল, রামু আর কালো গেঞ্জিকে বসতে বললেন। নিজেরা চারজন বসলেন পেছনে। গাড়ি চালাতে লাগল কালো গেঞ্জি। তার নাম এখনো কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। এখন ছোটেলাল এবং তার দুই সঙ্গী অনেকটা শান্ত হয়েছে। কারণ গাড়ি যাচ্ছে পাহাড়ের নিচের গ্রামে, সেখানে তাদের বাকি সঙ্গীরা আছে। একবার গ্রামে পৌঁছতে পারলে এরা সবাই তাদের খপ্পরে এসে পড়বে। তারপর দেখা যাবে কে কত বড় ওস্তাদ।

গ্রামের মাঝখানের খোলা প্রাঙ্গণে এসে জিপ থামতে ভিনসেন্ট দেখলেন বুধুয়ার শান্ত

গ্রামের পরিবেশ বর্তমানে একবারে এলোমেলো হয়ে আছে। গ্রামের ছেলে বুড়ো প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে এই খোলা জায়গাটায়। এক জায়গায় কয়েকজন মানুষকে পেছনে হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ভেতর একজন বুধুয়ার বাবা। বুধুয়া দৌড়ে গিয়ে বাবার পাশে দাঁড়াল। শয়তান চেহারার কয়েকটা লোক উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তারা তাদের নেতা এবং সঙ্গীদের এভাবে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নামল ছোটেলাল। কৌটো খুলে পান মশলা মুখে দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বলল—এবার কী করবে তোমরা? বোকার মত এখানে নিয়ে এলে, এখানে তো সব আমারই লোক চারদিকে। জানো তো, শেয়ালের মরণ ঘনিয়ে এলে শহরের দিকেই দৌড়ায়? তোমাদের হয়েছে তাই—

ভিনসেন্টও হাসলেন, বললেন—বেশ, আমরা তাহলে যখন তোমাদের হাতে, তখন আর খামোকা রিভলভার উঁচিয়ে কী হবে? এই নাও ভাই, এটা তুমিই ধরে বসে থাকো। তখনকার মত গোলমাল থামানোর জন্য এটা বের করতে হয়েছিল, মানুষ মারবার জন্য নয়। নাও, ধর—

খুব আশ্চর্য হয়ে ছোটেলাল রিভলভারটা হাতে নিল। জীবনে সে বহু গুণ্ডামি করেছে, বহু কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছে, কিন্তু এমন মানুষ কখনো দেখেনি। এরা লেখাপড়া করে, পড়ুয়া শ্রেণীর নরম ধাতের লোক—অথচ অনায়াসে তাদের মত মারামারিতে অভিজ্ঞ লোককে কাবু করে ফেললো। আবার এখন অস্ত্রটা শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। মুখ দেখে বোঝা যায় এরা কিছুমাত্র ভয়ও পায় নি। এদের নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে গভীর একটা মতলব আছে। কী সেটা?

রিভলভারটা হাতে নিয়ে বহুদিনের অভ্যাসবশত ছোটেলাল একবার গর্জন করে উঠল—নড়বে না, সাবধান। নড়েছ কী মরেছ।

কিন্তু কেউই ভয় পায়নি, নড়ছেও না। শান্তমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া অস্ত্রটাও তারাই তাকে দিয়েছে। গর্জন করে ওঠার পর ছোটেলালের কেমন বোকা বোকা লাগতে লাগল।

মণিদেব বললেন—তোমরা খামোকা এই গরীব লোকগুলোর ওপর হামলা করছ কেন?

ছোটেলাল বলল—খামোকা ঝামেলা করছি না। এরা চাষের আগে টাকা দাদন নিয়েছিল, এখন ফেরৎ দিতে চাইছে না—

যে লোকগুলোকে হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তার ভেতর একজন গ্রামের মুখিয়া। সে বলে উঠল—মিথ্যে কথা। আমরা বরাবর যে সুদে টাকা নিই, এবারও তাই নিয়েছিলাম। এখন ফেরৎ দেওয়ার সময় এরা অনেক বেশি টাকা চাইছে। কোথা থেকে আমরা তা দেব?

মণিদেব ছোটেলালের দিকে তাকিয়ে বললেন—এরা যা বলছে তা ঠিক?

—না, ঠিক নয়। পাঁচমাস আগে দাদন দিয়েছিলাম। এর মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, ব্যবসার খরচ বেড়েছে। সুদ বেশি না দিলে চলবে না। নগদ দিতে না পারে ফসল বেশি দিক—

মুখিয়া বলল—এর চেয়ে বেশি ফসল দিলে আমরা সারা বছর খাব কী?

ভিনসেন্ট বললেন—শোনো ছোটেলাল, এভাবে এ তর্কের মীমাংসা হবে না। তুমি যে সুদে রাজি হয়ে টাকা দিয়েছিলে, এবারের মত সেই হারে ফেরৎ নাও। পরের বছর এরা যদি নতুন শর্তে টাকা নিতে পারে তাহলে নেবে। নইলে নেবে না, অন্য ব্যবস্থা দেখবে। ঝগড়া করে কী লাভ?

পেশির শক্তি থেকে পরিস্থিতি আবার আলোচনার স্তরে নেমে এসেছে দেখে বোধহয় ছোটেলাল একটু একটু করে মনের বল ফিরে পাচ্ছিল। সে বলল—ঝগড়া কে করছে? আমি আমার টাকা চাই। আর তোমরা বিদেশি লোক এর মধ্যে নিজেদের জড়াচ্ছ কেন? চিরকাল এদের বাঁচাতে পারবে?

মণিদেব বললেন—হ্যাঁ, পারব।

—পারবে? চিরকাল?

—হ্যাঁ। চিরকাল। এমন ব্যবস্থা যে, তোমরা নিজেরাই আর ঝামেলা বাধাতে সাহস পাবে না।

ছোটেলাল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। সে এখন অনেকখানি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। সে বলল—তাই নাকি? আচ্ছা, দেখা যাক—

হাত-বাঁধা লোকগুলোর কাছে এগিয়ে গেল ছোটেলাল, ভয়-দেখানো গলায় মুখিয়াকে বলল—চট্‌পট্ রাজি হয়ে যা, আমার সময়ের দাম আছে। এমনি দিয়ে দিলে ভাল, নইলে সব ফসল জোর করে নিয়ে নেব। কাজিয়া বাধলে এখানে দু-চারটে লাশ পড়ে যাবে মুখিয়া। এই শহুরে বাবুরা শুধু মুখে বড় বড় কথা বলে। এরা কেউ তোদের বাঁচাতে পারবে না—

মণিদেব শান্ত ধীর গলায় বললেন—ফসল দিও না, মুখিয়া।

ছোটেলাল চেঁচিয়ে বলল—রামু, মোহন, কপিল, দে শালাদের কয়েক ঘা।

শুধু হুকুমটুকুরই যা অপেক্ষা ছিল। ছোটেলালের পোষা গুণ্ডারা হাত বাঁধা মানুষগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ে তাদের এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করল।

সহ্য না করতে পেরে ভিনসেন্ট এগিয়ে যাচ্ছিলেন, মণিদেব তাঁকে বাধা দিলেন।

—যেও না।

—কী বলছেন স্যার! এ জিনিস দাঁড়িয়ে দেখব?

—চুপ করে দেখো। এখুনি খুব মজা হবে—

না বুঝতে পারার দৃষ্টিতে মণিদেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভিনসেন্ট। তারপর সমবেত গলায় কাতরোক্তি শুনে অবাক হয়ে গুণ্ডাগুলোর দিকে তাকালেন।

অদ্ভুত দৃশ্য! রামু মোহন কপিলরা নিজের নিজের গালে, পিঠে, শরীরে হাত বোলাচ্ছে। যে আঘাত তারা বন্দিদের করেছিল, তা তাদের নিজেদের শরীরেই ফিরে এসে লেগেছে। উবু হয়ে বসে থাকা একজনের পাঁজরে লাথি মেরেছিল কপিল, সজোরে। এখন কপিল নিজের বুক চেপে ধরে চিৎকার করছে।

ছোটেলাল রেগে চিৎকার করল—আরে! ছোড় দিয়া কাহে? ক্যা হুয়া তুম লোগোঁকো?

—কর্তা, ভূতে আমাদের মারছে। বাবা রে। হুকুম দিন, আমরা চলে যাই—

—কী বাজে কথা বলছ? কোথায় ভূত? কীসের ভূত?

—হ্যাঁ কর্তা, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, অথচ কারা যেন আমাদের মারছে।

এইসব নিম্নশ্রেণীর পেশিজীবী মানুষের মধ্যে অপ্রাকৃতের ভয় খুব বেশি। মূলত এরা

কাপুরুষ এবং সংস্কারবদ্ধ। অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু ঘটতে দেখলেই এরা যুক্তি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। এদের দিয়ে এখন আর কোনো কাজ হবে না।

ছোটেলাল নিজেও খুব অবাক হয়েছে। কিন্তু নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করলে দলপতি হওয়া যায় না। সঙ্গীদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য সে বলল—ভীতুর দল। শাড়ি আর চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকগে যা। এই দেখ—

বলেই ছোটেলাল সজোরে চড় কষাল বুধুয়ার বাবার গালে।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমান জোরের একটা অদৃশ্য চড় এসে পড়ল তার নিজের গালে। প্রায় ঘুরে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল ছোটেলাল।

চড়ের দাপটে মাথা ঝিমঝিম করছে ছোটেলালের। সত্যিই তো, এ কী ভূতুড়ে ব্যাপার! মণিদেব বললেন—কী হল ছোটেলাল? আর মারবে না এদের?

কিছু না বলে ছোটেলাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—যাও, এই লোকগুলোর বাঁধন খুলে দাও। রামু, কপিল, তোমরাও যাও—

কখন দলপতিত্ব মণিদেব হাতে নিয়েছেন। সবাই তাঁর হুকুম মানছে।

এখন আর কেউ চটে নেই। কেউ গর্জন করছে না। ভূতের চড় খেয়ে সবাই শান্ত। ভালমানুষের মত তারা বন্দিদের মুক্ত করে দিল।

মণিদেব বললেন—ছোটেলাল, দেখলে তো, যাকে ব্যথা দিচ্ছ তার কতখানি কষ্ট হয়? মনে রেখো, এখন থেকে তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা মনে হিংসা কিম্বা বিদ্বেষ নিয়ে কাউকে আঘাত করলে সে আঘাত সমান ভেজে ফিরে এসে তোমাদেরই বিপদ ঘটাবে। শুধু শারীরীক আঘাত নয়, যে কোনো দুষ্টুমি করলেই তার প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গে পাবে। বিশ্বাস না হয় বাড়িতে গিয়ে চেষ্টা করে দেখো।

একটু হেসে আবার বললেন—ছোটেলাল, জানি একদিনে কারো স্বভাব বদলানো যায় না, এ তো আর ফিলিমের গল্প নয়। তবু বলি, আজ থেকে ভাল হও, শান্ত হও। তোমার সঙ্গীদেরও এই কথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও। ওদের দুর্ভাগ্য, ওরা আজ এখানে উপস্থিত ছিল। জীবনে আর কখনো ওরা গুণ্ডামি করতে পারবে না। সারাজীবন এদের বাঁচাতে পারব কিনা দেখলে তো?

তারপর মোড়লের দিকে তাকিয়ে বললেন—মুখিয়া, ওকে ওর পাওনা বুঝিয়ে দাও—ন্যায্য হিসেব অনুযায়ী। সামনের বার থেকে কী করবে ভেবে দেখো—

সবাইকে অবাক করে ছোটেলাল বলল—আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমরা পুরনো হারেই টাকা পাবে। আমার ব্যবসা অনেক বড়, একটা পার্টির কাছ থেকে কম নিলে কিছু এসে যাবে না—

হিন্দি ফিল্মের মতই ব্যাপারটা হল বটে। গ্রামবাসীরা সমবেত গলায় চিৎকার করে উঠল—ছোটেলাল কী জয়!

জীবনে প্রথম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা পেয়ে অবাক হয়ে ছোটেলাল এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

॥ আট ॥

ভূতের চড়

মণিদেব ছোটেলালকে বললেন—আমার পায়ে কষ্ট হচ্ছে, তাছাড়া বয়েসও হচ্ছে, আব চড়াই ভাঙতে পারছি না। তোমার গাড়িতে আমাদের একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেসে বললেন—নিয়ে যখন এসেছ, পৌঁছানোও তোমাদেরই দায়িত্ব।

ভয় জিনিসটা চমৎকার কর্মোদ্যম জোগায়। মণিদেবকে এরা এখন সম্ভ্রম এবং ভয়ের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। ছোটেলালের ইঙ্গিতে কপিল গাড়ি চালিয়ে এঁদের আবার ভিনসেন্টের কোয়ার্টার্সের সামনে ছেড়ে দিয়ে গেল।

পা ছড়িয়ে সোফায় আরাম করে বসতে বসতে মণিদেব বললেন—ওহে ভিনসেন্ট, আর এক কাপ চা খাওয়াও দেখি চটপট—

ভিনসেন্ট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অধ্যক্ষের দিকে। তাঁর চোখে কেমন যেন না-বোঝার চাউনি। তিনি বললেন—স্যার—

—বলো।

—এটা কী হল স্যার? সকালে যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল, তখনও আপনি তো কোনো আভাস দিলেন না—আর এখন দেখছি ক্ষমতার দিক দিয়ে আপনিই আমাদের নেতা। কী ভাবে আপনি—

—সব কথা হবে, আগে চায়ের জল বসাও—

পাঁচ মিনিটে চা হয়ে গেল। ধূমায়িত কাপ মণিদেবের হাতে দিতে তিনি তাতে প্রথম আরামের চুমুক দিয়ে বললেন—বোসো। আসলে তুমি যখন ছুটি নিয়ে কলকাতায় প্রফেসর গুপ্তভায়ার কাছে গেলে, সেই সময়টায় আমার সঙ্গেও মহাজগতের বন্ধুরা যোগাযোগ করেছিল। প্ল্যানটা ভাল, বিশৃঙ্খলভাবে সমস্ত পৃথিবীতে একসঙ্গে কাজে না নেমে একটা বিশেষ পকেট ধরে কাজ করা হচ্ছে। প্রথমে তুমি, তারপর তোমার বন্ধু, তারপর আমি—একটু একটু করে বৃত্তটা কেমন ছড়িয়ে পড়ছে লক্ষ্য করছ?

অমিতেশ বললেন—শুধু এঁরাই নন, এর সঙ্গে আছেন সফিউল হায়দার, প্রকাশ রায়, ধনপতিবাবু—এঁদের কথাও আপনাকে বলা দরকার। দল ক্রমশ বড় হচ্ছে মিঃ রায়, সবে তো ঢিল পড়েছে জলে—

মণিদেব বললেন—মানুষের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত, একটা জোর আঘাত না পেলে তার চেতনার উদয় হয় না। মজাটা দেখলে তো, ভূতের চড় খেয়ে লোকগুলো কেমন শান্ত আর লক্ষ্মী হয়ে গেল?

ভিনসেন্ট বললেন—কলকাতায় সফিউল হায়দার নামে এক পাঠাগার কর্মী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—কেন লোক আমাদের কথা শুনবে? আমি উত্তরে এই কথাই বলেছিলাম। প্রথম দিকে মানুষ ভয়ে কথা শুনবে। আধিভৌতিক ব্যাপারে মানুষের বড় ভয়, সেই আদিম গুহাবাসের সময় থেকে। তবে আমার মনে হয় মিঃ রায়, কিছুদিন অভ্যাস করার পর মানুষ সত্যিই ভাল হয়ে উঠবে, 'মরা' থেকে 'রাম' ততদিন একটু ভূতের চড় খেয়ে নিক, ফিয়ার ইজ এ গ্রেট স্টিমুলেটর—

ভিনসেন্ট বললেন—ভূতেদের পরিচয় কী? কোথাকার অধিবাসী এরা?

মণিদেব বললেন—বিশ্বজগতের অনন্ত প্রসারের মধ্যে সঠিক কোথায় এদের বাস কে

জানে? তারামণ্ডলীর নাম তো আমাদের দেওয়া, ওদের ভাষায় তার নাম হয়তো আলাদা—আমাদের কাছে অর্থহীন কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মাত্র। তবে যারা চিন্তার মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বের সর্বত্র প্রক্ষেপ করতে পারে, তাদের আর নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান বলে কিছু আছে কী? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গাতেই একসঙ্গে হয়তো এরা বিরাজমান। আমার মনে হয়, সেই অর্থে এরা দেহধারীও নয়—ডিসএমবডিয়েড্ কনশাসনেস।

ভিনসেন্ট বললেন—তা কী সম্ভব, স্যার? এ নিয়ে তো বৈজ্ঞানিকেরা অনেক আলোচনা করেছেন, কেউই একমত হতে পারেন নি। দেশ ছাড়া কী চেতনা থাকতে পারে?

—আমি জানি না, ভিনসেন্ট। প্রকৃতির গূঢ়তম কর্মপদ্ধতি নিয়ে কথা বলার মত বড় বিজ্ঞানী আমি নই। কিন্তু বিশ্বে কী হতে পারে বা পারে না, সে বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসে নি। নতুন যান্ত্রিক উদ্ভাবন মানুষের শরীরকে ক্রমেই অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। খুব তাড়াতাড়ি এমন দিন হয়তো আসবে যখন যন্ত্রের বোতামটাও আমাদের আর আঙুল দিয়ে টিপতে হবে না, শুধু ইচ্ছে করলেই হবে। তাহলে মন আর চেতনাই থাকুক, শরীরের দরকার কী? ধীর, অমোঘ বিবর্তন হয়তো শরীরকে বাতিল করে দেবে—

অমিতেশ বললেন—মাপ করবেন মিঃ রায়, আপনি আমার চাইতে অনেক বেশি জ্ঞানী মানুষ, পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু এ যুক্তি মেনে নেওয়া খুব কঠিন। মন বা চেতনা শরীর-নির্ভর জিনিস। আধার না থাকলে আধেয় থাকবে কী করে?

মণিদেব বললেন—ঠিকই তো। এর উত্তর আমি জানি না প্রফেসর। তবে প্রকৃতি বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। আজ বিজ্ঞানে যা ধ্রুব সত্য, কাল তা নাকচ হয়ে যায়। এই তো পঞ্চাশ বছর আগেও মানুষ ইথারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত, ইথারকে ধ্রুবক হিসেবে মেনে না নিলে পদার্থবিজ্ঞানের অঙ্ক মিলত না। আজ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে ইথার বলে কিছু নেই। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ইথারের মাধ্যম ছাড়াই বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে। আমাদের এই অন্য নক্ষত্রজগতের বন্ধুরা একদিন হয়তো দেহধারী ছিল, আজ আর নয়। একথা আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছি না, আমার ধারণাটা জানালাম মাত্র—

অমিতেশ বললেন—তাই যদি হয় তাহলে আমাদেরও ভবিষ্যৎ কী তাই?

—হয়তো। হয়তো একদিন আমরা আর হেমো স্যাপিয়েনস থাকব না, হয়ে যাব হোমো স্যাপিয়েনস ইনভিজিবিলেনসিস্। তবে সে তো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এখন নিজের প্রজাতিকে তো বাঁচাই। শৈশব পার হয়ে পরিপক্ক যৌবনে তো পা রাখি—

ভিনসেন্ট বললেন—স্যার, আপনাকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আমরা গর্বিত। কিন্তু আমরা এখন কী করব? বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-ওখানে কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে দলে টেনে কী কাজ এগুবে? ভূতের চড় কতদিন মনে রাখবে মানুষ?

মণিদেব হেসে বললেন—কাজ তো হচ্ছে, দেখছ না? তুমি নিজেই আমাকে প্রথম দিন বলেছিলে উপদেশ মানুষ তেমন গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ভয় দেখালে কাজ হয়। কথাটা একেবারে খাঁটি। ছোটেলাল ভূতের চড় না খেলে কী অত সুবোধ বালকের মত আমাদের কথা অনুযায়ী কাজ করত? হোক না, ভাল কাজ এভাবেই এগুক না। আর এতে কারো ক্ষতি হবে না। আমি মেকানিজমটা বুঝতে পেরেছি। ব্যথাটা ওদের শরীরে কোথাও লাগছে না। শরীরের কোনো স্নায়ুতে একটুও ঝাঁকুনি লাগছে না, মস্তিষ্কের ব্যথা অনুভব করার কেন্দ্রে ওরা জিনিসটা অনুভব করছে। যাকে ফ্যান্টম পেইন বলে, তাই। এত সহজে

কাজ আদায় হলে ক্ষতি কী?

—একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষকে কী এভাবে বোঝাতে পারবেন?

—বোধহয় না। সেক্ষেত্রে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। তবে মূল অস্ত্রটা একই থাকবে—দি এলিমেন্ট অফ্ ফিয়ার—

অমিতেশ আর ভিনসেন্টকে চুপ করে থাকতে দেখে মণিদেব আবার বললেন—একটু খারাপ লাগছে, না? লাগুক। কাজটা তো ভাল। ভাব দেখি, এভাবে যদি আমরা নিষ্ঠুরতা বন্ধ করতে পারি, যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারি, মন্দ কী?

বুধুয়া এসে দরজার কাছ থেকে উঁকি দিচ্ছিল। ভিনসেন্ট তাকে ভেতরে ডাকলেন।

—কী রে? লোকগুলো আর কী বলল?

বিস্ময়ে বুধুয়ার চোখ গোল গোল হয়ে গিয়েছে। সে বলল—ওরা চলে গিয়েছে। যাবার আগে যাদের বেঁধে রেখেছিল, মেরেছিল, তাদের কত ভাল ভাল কথা বলল। তারপর জিপে উঠে চলে গেল।

—তোরা টাকা দিয়েছিস?

—হ্যাঁ। চাঁদা তুলে কিছু বেশি টাকা দেওয়া হয়েছিল। নেয় নি। পুরনো হিসেবে টাকা নিয়ে বাকি টাকা জোর করে ফেরৎ দিয়ে গিয়েছে। আবার বলে গিয়েছে ছট্ পরবের সময় এসে সবাইকে মিঠাই খাওয়াবে—

ভিনসেন্টের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা। তিনি বললেন—ঝট করে আমাদের জন্য কিছু খাবার বানিয়ে ফেল। তারপর ইস্কুলে চলে যা—

অমিতেশ অবাক হয়ে বললেন—বুধুয়া কী স্কুলে পড়ে নাকি? বাঃ—

—পড়ে বইকি। ও তো কেবল আমার কর্মচারী নয়, আমার ছেলের মত। এখানে আমি ওকে যে টাকা দিই তার কিছুটা ও নিজে জমায়, কিছুটা বাবাকে দেয়। এভাবে ওর স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়। ওর স্কুলের খরচ, বইপত্র এসবও আমি দিই। আমাদের তো বয়েস হয়ে আসছে। এরপর ওরাই স্বপ্ন দেখবে, কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে—

অমিতেশ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোন স্কুলে পড় বুধুয়া?

—আমাদের গ্রামে মিশনারীদের ইস্কুল আছে স্যার। ভাল ইস্কুল—

—ইংরিজি মিডিয়াম?

—হ্যাঁ, স্যার।

—হোয়াটস ইয়োর ফুল নেম?

স্পষ্ট, জড়তাহীন উচ্চারণে বুধুয়া বলল—মাই নেম ইজ বুধকুমার ওঁরাও, স্যার।

—হোয়াট ক্লাস আর ইউ ইন?

—আই অ্যাম ইন ক্লাস সিক্স স্যার।

এই খালি পা, অতি সাধারণ পোশাক পরা দরিদ্র আদিবাসী ছেলেটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন অমিতেশ। বেশ সুন্দর কাজ করছে ভিনসেন্ট, ভাল কাজ করছে। এই সব ছেলেই তো আর কিছুদিন পরে দেশের ভার নেবে। এদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায়।

অমিতেশ বললেন—তুমি খুব ভাল ছেলে বুধুয়া। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। বড় হলে আমি তোমাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে আমার কাছে রেখে পড়াবো। আমার নিজের ছেলে নেই। তুমি আমার ছেলের মত থাকবে—

বুধুয়া এখনো ধন্যবাদ দিতে শেখেনি। সে সলজ্জভাবে হাসল।

ঘরের কোণে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। ভিনসেন্ট গিয়ে ধরলেন।

—হ্যালো।

অন্যদিকে নেটওয়ার্ক অপারেটরের গলা—মিঃ এস ভি লাকরা?

—হ্যাঁ, বলছি, কী ব্যাপার?

—স্যার, আমাদের রাউরকেল্লা সেন্টার থেকে কলকাতার একটা কল রিলে করছে। ওখানে প্রফেসর এ গুপ্তভায়া বলে আপনার কোনও গেস্ট আছেন?

—আছেন। কেন?

—ওঁর স্ত্রী ফোন করেছিলেন। দিল্লি থেকে প্রফেসরকে ডেকে পাঠিয়েছে, দুদিন পরে রওনা দিতে হবে। ওঁর স্ত্রী ওঁকে কালই ফিরে যেতে বলেছেন।

—থ্যাংক ইউ। আমি প্রফেসরকে জানিয়ে দিচ্ছি।

—ও কে স্যার।

ফোন ছেড়ে ভিনসেন্ট বললেন—অমিতেশ, তোকে দিল্লী থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। তোর স্ত্রী মেসেজ পাঠিয়েছেন। কালই তোকে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। একটা কথা শুধু বলি, যত বড় পদের লোকই হোক—তার কথায় বিবেক বিসর্জন দিবি না। ভয় পাস না, প্রয়োজন হলে লাগাবি ভূতের চড়। মনে রাখিস, বৈজ্ঞানিকের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।

॥ আট ॥

পরিচয়

সেদিন দুই বন্ধু জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। সারাদিন। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার, ফ্লাস্কে চা, বোতলে খাবার জল। পরের দিন অমিতেশ কলকাতা ফিরে যাবেন, আজ দুজনে অনেকদিন পরে সেই পুরনো দিনের মত খেয়াল খুশির আনন্দে কাটালেন। অমিতেশ কলেজ জীবনে বাবার বইয়ের সংগ্রহ থেকে রাশিয়ান ছোট গল্পের একটা সংকলন পড়েছিলেন। তার ভেতরে ফিয়োদর সোলোগাব-এর 'দি হুপ' নামে একটি গল্প তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। একজন প্রৌঢ় লোক কাজে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে বাচ্চাদের খেলা করার একটা চাকা কুড়িয়ে পেয়েছিল। সাইকেলের টায়ারের মত আকারের চাকা—বাচ্চারা যা নিয়ে সারাদিন দৌড়ে বেড়াতে ভালবাসে। সেটা হাতে নিয়ে তার মনে পড়ে গেল নিজের ছোটবেলার কথা। আর তার কাজে যাওয়া হল না। ওই চাকাটা হাতে নিয়ে শিশুর মত সারাদিন সে খেলা করে বেড়াল গ্রামের বাইরে মাঠে মাঠে, পাহাড়ের ঢালু অরণ্যে, ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে। তার মনে পড়ে গেল তার হারানো স্নেহময়ী মায়ের কথা, হারানো শৈশব সঙ্গীদের কথা। সন্ধে হয়ে গেল, তখনো সে চাকাটা হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে।

আজ বন্ধুর সঙ্গে সারাদিন ইচ্ছেমত কাটানোর জন্য বেরিয়েই তাঁর মনে পড়ে গেল গল্পটার কথা। ঠিক যেন আবার ছোটবেলাটা ফিরে এসেছে। যে দায়িত্ব, কর্তব্য আর দুশ্চিন্তার ভার মানুষকে চটজলদি বুড়ো করে ফেলে, কুঁজো করে দেয়, আত্মবিশ্বাস আর খুশিয়াল মেজাজের ভিত্তিতে ধাক্কা মারে—সেই ভয়ানক কঠিন একান্ত বিশুদ্ধ বাস্তব জগতটা অন্তত আজকের জন্য অস্বীকার করা গিয়েছে। এখন খেলার ঘণ্টা।

ভিনসেন্ট হঠাৎ চিৎকার করে বললে—অমিতেশ! ময়ূর! ময়ূর! তোর ডানদিকে তাকা—

অমিতেশ তাকাতে না তাকাতেই ময়ূরটা ভিনসেন্টের চিৎকারে ভয় পেয়ে ঝটপট করে উড়ে আরও গভীর বনের মধ্যে পালাল। অমিতেশ কেবল একটা ময়ূরকণ্ঠী রঙের ঝলক দেখতে পেলেন।

—যাঃ, তুই যেন একটা কী! চেঁচালি কেন? এমনিই দেখতে পেতাম—

—তুই যেমন তালকানা, হয়তো ওদিক তাকাতিসই না—

যেমন নিয়ম, আকাশে ঝকঝক করছে সূর্য, কিন্তু বনের মধ্যে সুন্দর ছায়াচ্ছন্ন নীরবতা। পায়ের নিচে শুকনো পাতা মচমচ করে গুঁড়িয়ে যাবার শব্দ। বন্য লতাপাতা থেকে অদ্ভুত একরকম গন্ধ ভেসে আসছে। ভিনসেন্ট বললেন—আমরা সভ্যতার সংস্পর্শে থেকে থেকে কত কিছু আর খেয়ালই করি না। আচ্ছা, বল তো, বনের মধ্যে এই জায়গায় যদি দু বর্গমিটার জমি দাগ দিয়ে আলাদা করে দিই, তার ভেতরে কতরকম উদ্ভিদের স্পেসিমেন পাওয়া যেতে পারে বলে তুই মনে করিস?

অমিতেশ একটু ভেবে বললেন—কত আর, এখানে তো তেমন ঝোপঝাড়ও নেই, ধর আট কী দশ রকম—

ভিনসেন্ট হেসে বললেন—ভুল।

—ভুল? তুই মনে করছিস আরও বেশি পাওয়া যাবে? কত?

—একজ্যাকটলি বলতে পারব না, তবে ডবলেরও বেশি—

—যাঃ, তাই হয় নাকি? দেখাই তো যাচ্ছে—আচ্ছা, তুই মাপ—

ভিনসেন্ট কটা শুকনো কাঠি তুলে নিয়ে মাটিতে একটা চৌখুপি আঁকতে শুরু করলেন। অমিতেশ বললেন—না, না—ওটা বড্ড বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে। ছোট কর—

ভিনসেন্ট বললেন—ঠিক আছে। এই? এর চাইতে ছোট তো হবে না? আয়, দেখি—

দুজনে মিলে উবু হয়ে বসে উদ্ভিদের নিদর্শন তুলে পাশেই একটা ফাঁকা জায়গায় আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

মোট চব্বিশ হল। ঘাসফুলই পাওয়া গেল ছ-সাত রকমের।

ভিনসেন্ট হেসে বললেন—কী?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে অমিতেশ বললেন—তাই তো। আমি ভেবেছিলাম—

দুপুরে দুজনে একটা শুকনো নালার পাশে বড় পাথরের ওপর বসে খাবার খেলেন। ফ্লাস্ক থেকে প্লাস্টিকের কাপে চা ঢেলে চুমুক দিয়ে অমিতেশ বললেন—আঃ, এমন জায়গায় বসে চা খাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে। ঘরে বসে এ মজা পাবি না—

কুক্ কুক্ করে একটা পাখি ডাকছে কোথায় বসে। বনের ভেতরে তার ডাক যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। চারদিক ভারি শান্ত স্তব্ধতা।

অমিতেশ বললেন—মণিদেব রায়কে কখন আসতে বলেছিস?

—রাত আটটায়। নক্ষত্রপারের বন্ধুরা বলেছিল প্রয়োজনে তেমন করে ডাকলে তারা যোগাযোগ করবে। দেখা যাক—

—আমি ভাবছি, এটা যথেষ্ট বড় প্রয়োজন তো? অকারণে বিরক্ত করা হয়ে যাচ্ছে না তো?

ভিনসেন্ট বললেন—কাল তুই চলে যাবি, দিল্লিতে তোকে কী জন্য ডেকে পাঠিয়েছে কে জানে। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল নয়, হয়তো শিগ্‌গির একটা যুদ্ধগোছের বাধতে চলেছে। সেক্ষেত্রে সরকার তোর কাছে কী চাইবে? কী ধরনের সহযোগিতা? বোমা বানাতে বলবে? মারণ-রশ্মি তৈরি করতে বলবে? তাহলে কী করবি তুই? আর এদিকে

আমরা যা করছি, তা তো একধরনের ছেলেখেলা। গুটি দশ-বারো মানুষকে আমরা এ পর্যন্ত আমাদের দলে আনতে পেরেছি। পৃথিবীতে পাঁচশো কোটির ওপরে মানুষ, সবাইকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করতে কম সময় লাগবে? ততদিনে আর পৃথিবী থাকবে কী? এসবের উত্তর জেনে নিতে হবে না? এর চাইতে বড় প্রয়োজন আর কী আছে?

ঠিকই তো, অমিতেশ ভাবলেন, অনেক কিছু জেনে নেবার আছে।

বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বনের মধ্যে এক রহস্যময় পরিবেশ ঘন হয়। দিনের শব্দ এখানে আলাদা, রাতের আলাদা। দিনে পাখির ডাক, ঝরাপাতার ওপর দিয়ে বন্যপ্রাণীর দ্রুত চলাফেরা। রাত্রিতে ফিসফাস, সন্ত্রস্ত বিচরণ, আবছা ছায়ার খেলা। পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে এসে পড়া চাঁদের আলোর জাফরি। সবকিছু মিলিয়ে এই গ্রহের ক্রীড়াভূমিতে প্রাণের যে নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে তার স্পর্শ চেতনায় উত্তীর্ণ হয়। দিন ও রাত্রির সেই সন্ধিক্ষণে ভিনসেন্ট বললেন—চল, এবার ফিরি।

ঠিক আটটায় এসে গেলেন মণিদেব। ভিনসেন্ট তাঁকে আজ এখানেই খেতে বলেছিলেন। আলুর দম, পরোটা আর ডিমের ডালনা দিয়ে তোফা রাত্তিরের খাওয়া হল। এখন সবাই আবার বসবার ঘরে এসে জড়ো হয়েছেন। শতরঞ্চি মার্কা বেড়ালটা ঘরের কোণে রাখা প্লেটে দুধ-রুটি শেষ করে থাবা চাটছে। ঘরের বাতাসে মৃদু ধূপের সুগন্ধ, ভিনসেন্ট তাঁর প্রিয় মহীশূর চন্দন ধূপের কয়েকটা কাঠি জ্বেলে দিয়েছেন।

মণিদেব বললেন—ভিনসেন্ট, রাত সাড়ে নটা বাজে। এবার তাহলে—

—হ্যাঁ, স্যার। এবার শুরু করি—

নিচু কাঁচ ঢাকা টেবিলটা সামনে টেনে নিলেন ভিনসেন্ট। এপাশে সোফায় অমিতেশ আর তিনি, ওপাশে মণিদেব। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেড়ালটা মেঝেতে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমের উদ্যোগ করছে। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বুক শেল্‌ফের ওপরে রাখা ফুলদানির গায়ে। পাহাড়ের নিচে বুধুয়াদের গ্রাম থেকে নাচ আর গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা আজ আনন্দ করছে রাত জেগে।

তিনজন মাথা নিচু করে বসে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। প্রত্যেকের মন পাশাপাশি রাখা এক পর্দায় বাঁধা দামি বাদ্যযন্ত্রের মত ঐক্যবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে।

হঠাৎ অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্যতার মধ্যে দিয়ে, ধূমকেতু আর গ্রহাণুপুঞ্জের পাশ কাটিয়ে সুদূরের বন্ধুর আহ্বান ভেসে এল—স্বাগতম আমাদের চিন্তার জগতে, পৃথিবীর মানুষ।

তিনজনের মন এখন একসূত্রে বাঁধা। সম্মিলিতভাবে তাঁরা বললেন—নমস্কার। আমরা কাজ শুরু করেছি, কিন্তু সামনে দুস্তর সমস্যার সমুদ্র। কী করব আমরা এখন?

প্রসন্ন গলা নক্ষত্রপারের বন্ধুর—এগিয়ে চলো। তোমরা জানো না, তোমাদের সহায়তা করার জন্য আমাদের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বে। পৃথিবীকে দ্রুত বিষবাষ্পের মেঘ থেকে বের করে আনার জন্য আমরা বিশ্ব-রূপকারদের কাজে লাগাতে চলেছি, তোমাদের ভাষায় যাকে বলা যেতে পার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সৌরজগৎ সহ পুরো ছায়াপথ নীহারিকার গতিপথ তাঁরা অন্যমুখী করে দেবেন। নইলে বিপদ গভীর। আমরা হিসেব করে দেখলাম এই কালো ধোঁয়ার মেঘ পৃথিবীর ভ্রমণপথ বরাবর সামনে ত্রিশ আলোকবর্ষ বিস্তৃত। আগামী বহু লক্ষ বছরের মধ্যে তোমরা এই মেঘপুঞ্জ ভেদ করে বেরুতে পারবে না। ততদিনে সব শেষ হয়ে যাবে।

—সমগ্র সৌরজগতের গতির মুখ বদলে দেওয়া, সে তো বিপুল কাণ্ড!

—বিপুল কাজ, তবে অসম্ভব নয়। শুধু ছায়াপথ নয়, আঞ্চলিক নক্ষত্রমণ্ডলী

গুলিকেও সরিয়ে দিতে হবে কিছু কিছু। নইলে বিশ্বের এই অংশের বস্তুপুঞ্জের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। সে হিসেব চলছে। কিন্তু তাতেও সময় লাগবে তোমাদের সময়ের মান অনুযায়ী দেড়শো বছর।

—আমরা কী ততদিন অপেক্ষা করতে পারব?

—ব্যক্তিগতভাবে তোমরা পারবে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবজাতি পারবে।

—ততদিন আমরা কী করব? কী করে এক বিশ্বাসের আশ্রয়ের নিয়ে আসব পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে? কতটুকু ক্ষমতা আমাদের এই ক'জনের?

—ভুল কোরো না। তোমরা একা নও। সমস্ত পৃথিবীতে, সব দেশে আমরা চিহ্নিত মানুষের গোষ্ঠী গড়ে তুলেছি। তারাও ঠিক সময়ে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। আর দশ বছরের মধ্যে মানবিকতার পক্ষে পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে।

—দুটো জরুরি প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমটা বলি—আমাদের সন্দেহ হচ্ছে আসলে তোমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, তোমরা আমাদেরই সম্মিলিত বিবেকবুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ।

—বেশ তো। তাই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কী? বিশ্বের দুই রূপ—প্রত্যক্ষ এবং ভাবগত। সব ধারণাই তো ভাবজগৎ থেকে অনূদিত হয়ে প্রত্যক্ষীভূত হয়। পার্থক্য কোথায়?

—পরের প্রশ্ন করি। কে তোমরা? পরিচয় দাও। আমাদের জন্য কেন তোমরা চিন্তিত?

—এর উত্তর কী না দিলেই নয়? কী হবে পরিচয় দিয়ে?

—মানুষী কৌতূহল বলতে পারো। কৌতূহলই তো মানুষকে বড় করেছে—

যোগাযোগের সূত্রে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কোনো আদানপ্রদান নেই।

—কথা বলো, পরিচয় দাও।

—তোমরা বুদ্ধিমান, ভেবেছিলাম নিজেরাই এর উত্তর খুঁজে পাবে। প্রবীণেরা কেন গোষ্ঠীর তরুণ সদস্যকে ভালবাসে? পিতা কেন সন্তানকে স্নেহ করে? আমরাও ব্যতিক্রম নই।

পৃথিবী নামক গ্রহের ওপরে তিনটি আবিষ্ট দেহ সত্যের মুখোমুখি হয়ে কেঁপে উঠল।

—তাহলে কী নিজেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদিন আমরা যা ভেবেছি তা মিথ্যা? সত্য তাহলে কী?

—পার্থিব বিজ্ঞান অনুযায়ী বিবর্তন সত্য। বহু লক্ষ বছর আগে মানবলক্ষণ সম্পন্ন স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কে আর জীবন সংকেতে আমরা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। তাই তোমাদের প্রজাতির দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছিল। তোমরা আমাদেরই সৃষ্টি। যে অর্থে সন্তান পিতার সৃষ্টি, কাব্য কবির সৃষ্টি। তোমাদের আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে দেব না। কিছুতেই না। সমস্ত সঙ্কটে আমরা এসে তোমাদের হাত ধরব। তোমরা নির্ভয়ে ছড়িয়ে পড়ো, সকল বিরোধীতার মুখোমুখি হও, মানুষকে ভালবাস। শেষ জয় তোমাদেরই।

* * *

বুক শেল্‌ফের সামনে রাখা ফ্লোর ম্যাটের ওপর বেড়ালটা ঘুমোচ্ছে। বাইরের জঙ্গলে প্যাঁচা ডাকছে কোথায়। আবেশ কেটে তিনজনে বসে রইলেন চুপ করে। তাঁদের কাছে পৃথিবীর রূপ এখন অন্যরকম, জীবনের অর্থ অন্যরকম। এখন থেকে নির্জনতম প্রবাসেও কেউ অনুভব করতে পারবেন না, তিনি একা।

বন্ধুরা ছড়িয়ে আছে বিশ্বলোকে।

ডাকটিকিট

নাগ পাহাড় যখন আর মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে, তখন মহম্মদ নিসার গাড়ির ব্রেক কষল। আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কী হল?

—সামনে ট্রাক উলটে গিয়েছে স্যার। বহুৎ লম্বা লাইন গাড়ির—

নিঃশ্বাস ফেলে আমরা তিন বন্ধু নামলাম গাড়ি থেকে। সড়কপথে লম্বা ভ্রমণের এই এক বিপদ, মাঝে মাঝেই নানারকম ঝামেলায় রাস্তা বন্ধ থাকে। আধঘণ্টা থেকে আটঘণ্টা —যেমন খুশি দেরি হতে পারে। তবে এ ধরনের দুর্যোগ পশ্চিমবঙ্গে যতটা হয়, এই রাজস্থানে ততটা না।

গাড়িটা চৌদ্দ সিটের লাক্সারি মিনিবাস, আরামদায়ক গদি, পাশের একটা বোতাম টিপলে পেছনদিকে হেলে পড়ে আরোহীকে 'আমি শুয়ে আছি' গোছের অনুভূতি দেয়। কিন্তু যতই আরাম হোক, সাত ঘণ্টা বাসে বসে থেকে এখন সবাই ক্লান্ত, বিশেষ করে মেয়েরা। তিন বউয়ের মধ্যে দুজন ঘুমোচ্ছে। একজন জেগে আছে বটে, কিন্তু সে বসে আছে নীরস মুখে। কতক্ষণ দেরি হবে কে জানে।

বিমল একটা সিগারেট ধরাল। আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে বলল—নেবে?

—নাঃ। চলো, বরং একটু এগিয়ে দেখে আসি কী হয়েছে—

লাইন দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে, তার পাশ দিয়ে হেঁটে এগুলাম। সামনে রাত্রির আকাশের গায়ে নাগ পাহাড়ের সিল্যুয়েট দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে আজমির, পাহাড় পার হয়ে ওপারে পুষ্কর। সেখানে রাজস্থান ট্যুরিজমের সরোবর হোটেলে আমাদের ঘর বুক করা আছে।

ব্রতীশ বলল—আজকাল তেমন বলবার মত কিছু ঘটে না, খেয়াল করেছিস? আমরা এক সপ্তাহের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত পাহাড়, কেল্লা, হ্রদ আর মরুভূমি দেখছি, কিন্তু যাকে 'কিছু ঘটা' বলে, তেমন হল না--

বিমল বলল—কী ঘটবে? ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ডাকাতি বা মরুভূমির মধ্যে ভিন্‌গ্রহীদের সঙ্গে আলাপ হওয়া—এরকম কিছু?

ব্রতীশ বলল—না, না, তা নয়—আমি কী বোঝাতে পারছি না—

বললাম—আমি বুঝেছি। ঠিকই বলেছ, তেমন কিছু আর বিশেষ ঘটে না। যে উপাদান দিয়ে গল্প লেখা হয়, দশবছর পরে বন্ধুদের আড্ডায় বসে জমিয়ে বলা যায়। সমারসেট মমের 'মিস্টার হ্যারিংটন্‌স্ ওয়াশিং' মনে আছে? কিছুই বলবার মত মালমশলা নেই, তবু মনে রাখবার মত গল্প।

—আমাদের কপালে ঘটছে না কেন?

—মানবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে, আমরা কেউ কারো জন্য ব্যস্ত নই, তাই। তাছাড়া আমাদের চোখ আর মনও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বলার মত কিছু চোখের সামনে ঘটলেও আমরা তাকে আলাদা করে চিনে নিতে পারি না।

এইসব আলোচনা করার সময়েও জানি না আর মাত্র কুড়ি কী পঁচিশ মিনিট পরেই আমাদের আলাপ হবে একজন প্রৌঢ় মানুষের সঙ্গে, যিনি না ভারতবিখ্যাত, না ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, না নাম করলে চেনার মত—তবু যাঁর জন্য মনের কোণে একটু জায়গা পাকাপাকিভাবে রেখে দিতে হয়েছে।

কথা বলতে বলতেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। হেভি ক্রেন এসে উলটে যাওয়া ট্রাক টেনে সরিয়ে দিয়েছে। এত রাত্তিরেও কোথায় ক্রেন পায় এরা কে জানে। আসলে ট্যুরিস্ট স্পট আর তীর্থস্থানে যাওয়ার জন্য আর্টেরিয়াল রোড বলে কর্তৃপক্ষ বোধহয় বিশেষ নজর দেয়। আমরা তিনজন তড়িঘড়ি করে ফিরে এসে বাসে উঠলাম। দুই বউ এখনো ঘুমিয়ে, আর একজন হতাশ হয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে। কেবল বাচ্চাদের কোনো ক্লান্তি নেই, তারা চারজন হইহই করে ডাম্ব শ্যারাড খেলছে।

বাস ছাড়ল। নির্জন রাত্রির ভেতর দিয়ে নাগ পাহাড়ের রাস্তা। বাতাসে মৃদু ঠাণ্ডার আবেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড় পার হয়ে আমরা পুষ্করে ঢুকলাম। ছোট্ট শহর। রাত্তিরে কিছুই প্রায় দেখা গেল না। একটা মাথার ওপরে ত্রিপল টাঙানো পুলিশ চৌকিতে জিজ্ঞাসা করতে তারা সরোবর হোটেলের পথ দেখিয়ে দিল।

হোটেলটা আগে ছিল জয়পুরের মহারাজার বাড়ি। তীর্থ করতে এসে তিনি পরিবারবর্গ এবং দলবল নিয়ে এইখানে থাকতেন। পুরনো লোহার গেট দিয়ে ঢুকে পথ বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে হোটেলের দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সমস্ত পরিবেশে বেশ একটা প্রাচীন আর রোম্যান্টিক আমেজ মাখানো। শিউলি ফুলের গন্ধে চারদিক ভরপুর। বাস গিয়ে থামতেই একজন নাইট অ্যাটেনডেন্ট এগিয়ে এসে বলল—ক্যালকাটা পার্টি স্যার? দাশগুপ্তা? ধব?

—হ্যাঁ।

—আইয়ে সাহেব। ঘর তৈয়ার হ্যায়।

লোকটি ভদ্র, নিজেই টেনেটেনে মালপত্র নিয়ে গেল। মেয়েরা আর বাচ্চারা আগে হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ধাতস্থ হবে, তারপর আমরা। কাজেই আপাতত আধঘণ্টা এককাপ চা খেয়ে কাটানো যায়। কিন্তু সমস্ত হোটেল নিস্তব্ধ, আলো নেভানো, এখন কী চা হবে?

রাত্রিব পাহারাদারটি সহায়তার প্রতিমূর্তি। নিশ্চয় চা হবে। সে নিজে বানিয়ে দিচ্ছে। স্যাবেরা ততক্ষণ লাউঞ্জে বসুন। সে কী আলো জ্বেলে দেবে?

—না, আলো জ্বালতে হবে না। রিসেপশন কাউন্টারের দিক থেকে ভেসে আসা হালকা আলোয় লাউঞ্জে একটা বিশ্রামের আমেজ তৈরি হয়েছে। আমরা তিনজন সোফায় গিয়ে বসলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের ভেতর থেকে প্রশ্ন ভেসে এল—মশাইরা কী বাঙালি?

ঠাহর করে তাকিয়ে দেখি ওপাশের একটা সোফায় নিশ্চুপে বসে আছেন একজন প্রৌঢ়। এত অল্প আলোয় চেহারা ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হল ভদ্রলোক বেশ সুপুরুষ।

বললাম—হ্যাঁ।

—আমিও তাই। আজ কদিন ধরে খিচুড়ি হিন্দি বলে বলে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। আপনারা নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলছেন, তাই ভাবলাম—

বিদেশে ভ্রমণের সময় বাঙালি দেখলে ভাল লাগে। কিন্তু সারাদিন বাসের ধকলের পব এখন আব বিশেষ কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু একজন প্রবীণ মানুষ সামনে ...কে অগ্রাহ্য করলেও দেখায় খারাপ। বললাম—আপনিও কী কলকাতার লোক?

...সর্ট অফ। বাইরে বাইরে চাকরি করেছি সারাজীবন, আত্মীয়স্বজনেরা অনেকে

কলকাতায় রয়েছেন, কিন্তু আমার আর কোথাও সেট্‌ল করা হয়নি। বিয়ে-থাওয়া করিনি, অবসর নেবার পর এই একটু বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে একঘেয়েমি কাটাই—

আমাদের চা এল। বললাম—একটু চা হবে কী? ভাগ করে হয়ে যাবে এখন।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন—না, না। আমি রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছি! আপনারা খান। আমার চায়ের বিশেষ নেশাও নেই। খান আপনারা—

আধঘণ্টা রাজস্থানের দ্রষ্টব্য স্থান ও ভ্রমণের সুবিধে-অসুবিধে বিষয়ে আলোচনার পর দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—এবার একটু চেঞ্জ করে নিই গিয়ে, বড্ড ক্লান্ত—

ভদ্রলোক বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। যাবেন বইকি। আমি বরং আর একটু বসি। ঘুম আসছে না, বুঝলেন? বেড়াতে হলে ভাল একজন সঙ্গী চাই। একা কী ভাল লাগে? দেখুন না, কাল নাগ পাহাড়ের মাথার ওপর কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল দুপুরবেলায়। এত চমৎকার দেখাচ্ছিল যে কী বলব! কিন্তু এমন কেউ সঙ্গে নেই যাকে ডেকে দৃশ্যটা দেখাই। প্লেজার শেয়ারড্‌ ইজ প্লেজার ডাবল্‌ড্‌। তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে। একাকীত্বের কষ্টটা এবার একটু কমবে। আছেন তো কয়েকদিন?

ঘরের দিকে আসতে আসতে চাপা গলায় বিমল বলল—এ তো মুশকিল হল! ওঁর একাকীত্ব কাটানোর দায় আমাদের ওপর পড়লে তো বিপদ।

বললাম—না, তেমন কিছু না। সকালে দল বেঁধে বেরিয়ে গেলে উনি আর আমাদের পাচ্ছেন কোথায়?

ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হল।

সকালে উঠে আমি আর ব্রতীশ বাগানে পায়চারি করতে করতে শিউলি ফুল কুড়োচ্ছি, দেখি কাল রাত্তিরের ভদ্রলোক কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে হেঁটে আসছেন। আমাদের দেখে বললেন—নমস্কার। ঘুম হয়েছিল তো?

আমরা বিনয়ের হাসি হেসে বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার?

—বেশ ঘুমিয়েছি। একটু রাত্তিরে ঘুম এল বটে, কিন্তু ভাল ঘুম হয়েছে। ঘুম ভাঙল খুব মজার পরিস্থিতিতে, জানেন?

—কী রকম?

—একটা বিচ্ছিরি কর্কশ আওয়াজে তাকিয়ে দেখি জানালার ওপর বসে আছে একটা ময়ূর। বেশ বড় সাইজের। আমার ঘরটা একতলায়, জানালায় আবার গরাদ নেই। বাগান থেকে উড়ে এসে বসেছে আরকি। এখানে তো দেখছি যত্রতত্র কাকের মত ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। বেশ মজা। পাখিটার দিকে তাকিয়ে মনে হল—

আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়লেই হয়।

বললাম—ঠিক আছে, ওবেলা দেখা হবে তাহলে—

—বেরুচ্ছেন নাকি আপনারা? কোনদিকে যাচ্ছেন?

—আজমির যাব। দুপুরে কোথাও লাঞ্চ সেরে বিকেলের দিকে ফিরব।

বিমলের আশঙ্কা সত্যি করে ভদ্রলোক বললেন—ও। আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের বাসে কী একটা সিট বাড়তি হবে? আমিও আজমির যাচ্ছিলাম আজ। যদি হয়—অবশ্যই আপনাদের অসুবিধা না হলে। আমি নিজেকে ইম্পোজ করতে চাই না। একা ঘুরতে বড় খারাপ লাগে—

এমন ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান অসম্ভব। বললাম—সে বেশ তো। কিন্তু আমরা প্রায় তৈরি, আপনি তো বোধহয় এখনো ব্রেকফাস্ট করেননি। এত তাড়াহুড়োতে আপনার কষ্ট হবে না তো?

—কিছু না, কিছু না। সকালে প্রায়দিনই আমি কিছু খাই না। বয়েস হচ্ছে তো, আজকাল বেশি খাওয়া সহ্য হয় না। আমি এখনি আসছি।

ভদ্রলোক নিজের ঘরের দিকে চলে যাওয়ার পর মনে হল ওঁর নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। ব্রতীশকে বললাম—ভদ্রলোকের নামটা জানা হল না।

—ওঁর নাম ডাকটিকিট।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ। ডাকটিকিট যেমন একবার খামে সেঁটে গেলে আর আলাদা করা যায় না, ইনিও তাই হয়ে পড়লেন দেখা যাচ্ছে। ডাকটিকিট ছাড়া কী?

বাসে ওঠবার সময় জিজ্ঞেস করলাম—আপনার নামটা কিন্তু—

—আমার নাম বিজয়কেতন রায়। আপনাদের?

নাম বলে আমরা সৌজন্য বিনিময় করলাম। মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল।

আমরা যে বিজয়বাবুকে একটু এড়িয়ে চলেছি, সেটা বোধহয় ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না। পরম উৎসাহে তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন সারাদিন। আজমিরে যে হোটেলে আমরা দুপুরে খেলাম, তার লনে বাচ্চাদের সঙ্গে ছোটাছুটি করতে গিয়ে বিমলের স্ত্রীর পায়ে বেশ চোট লাগল। কাছে গিয়ে দেখি বেচারি ঘাসের ওপর বসে পড়েছে, পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা। সামান্য মচকে গিয়েছে মনে হচ্ছে। বিমল উবু হয়ে বসে স্ত্রীর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে খাবার জলের বোতল থেকে জল ঢেলে পটি দেব বলে ভিজিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় দূর থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে বিজয়বাবু হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বললেন—কী, কী হয়েছে? ইস্, বড্ড লেগেছে নাকি? দাঁড়ান, আগে জলপটি দেবেন না। আমার কাছে খুব ভাল ব্যথা কমাবার মলম আছে, লাগিয়ে দিলে সন্ধের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ধরুন তো আমার ক্যামেরাটা—

কাঁধের ছোট ব্যাগ হাতড়ে একটা মলমের টিউব বের করলেন বিজয়বাবু। ঘাসের ওপর বাবু হয়ে বসে বললেন—দেখি দিদিভাই, লজ্জা করবেন না, পা-টা এদিকে বাড়িয়ে দিন তো—

পিয়ালি লজ্জা পেয়ে পা টেনে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল—না, না, একি! ছিঃ, পায়ে হাত দিতে হবে না। ও এমনিই ঠিক হয়ে যাবে।

—এমনি ঠিক হবে না। ওষুধ না লাগালে একঘণ্টার মধ্যে পা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। দেখি—

পিয়ালি সঙ্কোচে মুখ লাল করে বসে রইল। বিজয়বাবু টিউব থেকে মলম বের করে তার গোড়ালিতে ভাল করে মালিশ করে দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন —দেখি ভাই, আপনার বোতল থেকে একটু জল ঢেলে দিন তো, হাতটা ধুয়ে ফেলি। বিকেলের মধ্যে দিদিভাইয়ের পায়ে আর ব্যথা থাকবে না, মিলিয়ে নেবেন কথাটা। আমার নিজের কোমরের ব্যথায় খুব উপকার পেয়েছি, ওষুধটা তাই ব্যাগে রাখি সব সময়।

সত্যিই সন্ধের মধ্যে পিয়ালির পায়ের ব্যথা কমে গেল। বিজয়বাবু খুশি হয়ে বললেন—কী, আমার কথা মিলল তো?

বিমল বলল—সত্যি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার ওষুধ না থাকলে—

—ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। ওঁর ব্যথা কমে গিয়েছে, আই অ্যাম হ্যাপি।

তারপর কিছুটা আত্মগতভাবে বললেন—আমার নিজের প্রয়োজনেই হয় মুশকিল—

—কেন, কিসের মুশকিল?

—নিজের কোমরে কখনো ওষুধ মালিশ করেছেন? সে ঠিকঠাক হয় না মশাই। তাছাড়া এখন বয়েস হয়ে গিয়েছে, পেশীর নমনীয়তা নেই আগের মত। পিঠের সব জায়গায় হাত যায় না বলে পিঠে ময়লা পড়ে, সাবান দিতে পারি না। কোমরের ব্যথা বাড়লে যতটা পারি দু'হাত দিয়ে মলম লাগাই—যতটা হাত যায়। অবশ্য তাতেই বেশ কাজ হয়। ভাল ওষুধ।

সেদিন রাত্তিরে পিয়ালি বলল—নাঃ, বিজয়বাবুর ওষুধে কিন্তু আমার খুব উপকার হয়েছে। ব্যথাটা একদম নেই—

বিমল বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—পদসেবা খুব ভাল লেগেছে বুঝি?

—যাঃ। তোমার মুখে কোনো কথা আটকায় না। দিন দিন কী হচ্ছ? একজন বয়স্ক লোক, বুড়োমানুষই বলতে হবে, ওঁকে নিয়ে রসিকতা করাটা—

বিমল হেসে বলল—এই বয়েসে রসবোধ বাড়ে, শাস্ত্রে বলেছে। তাছাড়া বিয়ে-থাওয়া করেননি—এতদিনে হয়তো পছন্দ মত মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন, তাই ওষুধ লাগানোর অজুহাতে পদসেবা করে নিলেন।

রাগ করে পিয়ালি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

পরের দিন সকালে বিজয়বাবু বড় একঠোঙা খাবার হাতে হাসিমুখে এসে হাজির।

—এই যে, সবাই এক জায়গায় রয়েছেন। পুষ্করে ক্ষীরের মালপোয়া খুব নামকরা, জানেন তো? খুব সকালে উঠে একেবারে গরম গরম ভাজিয়ে এনেছি। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা। নিন—

আমরা সবাই একযোগে বললাম এমন কাণ্ড করে উনি খুবই অন্যায় করেছেন। বিজয়বাবু বললেন—কিছু না মশাই। আসুন, হাতে হাতেই দিচ্ছি। দেখুন তো কেমন জিনিস—

মানুষের মনের ভেতর কোথাও বোধহয় একটা নিষ্ঠুরতার বীজ লুকোনো থাকে। সেই আদিম, গুহাবাসী মানুষ—দাঁতে-নখে যে লড়াই করত, হনন করত, তার রক্তের উত্তরাধিকার গোপনে গোপনে আজও আমরা বহন করে চলেছি। তাই বোধহয় অকারণ নিষ্ঠুরতা করতে আমাদের বাধে না। বিজয়বাবু আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু যতই তিনি সে চেষ্টা করছেন, ততই আমাদের ভেতর একটা বিরোধীতা এবং বিরক্তি গড়ে উঠছে।

খেতে খেতে বললাম—ব্রতীশ, তোর জন্মদিনটা ভালই শুরু হল।

বিজয়বাবু বললেন—তাই নাকি? ওঁর জন্মদিন আজ? বাঃ, আমার শুভেচ্ছা নেবেন ভাই—

সেদিনটা আমাদের পুষ্কর ঘুরে দেখবার কথা, শহরের বাইরে কোথাও যাবো না। ব্রহ্মা মন্দির, পুষ্কর হ্রদ ইত্যাদি দেখে ফেরবার পথে আবার বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ছবি তুলছিলেন। বিমল বলল—ওই যে ডাকটিকিট। সেরেছে!

বলতে বলতেই চোখ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে মাথা ঘোরাতে ভদ্রলোক আমাদের দেখতে পেলেন।

—এই যে! হল শহর দেখা?

বিমল বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু ডাকটিকিট দরকার ছিল, পেয়েও গেলাম।

বিজয়বাবু অবাক হয়ে বললেন—ডাকটিকিট? কিন্তু পোস্ট অফিস তো এদিকে নয়। সে তো—

বিমলটা যেন কী! আমি তাড়াতাড়ি বললাম—আমার কাছে ছিল, দিয়ে দিলাম। সেই কথা বলছে।

—ওঃ। তা যাক। আচ্ছা, এবেলা তো ঘুরতে গিয়ে প্রপার লাঞ্চ হল না। রাত্তিরে কিন্তু এক সঙ্গে খাব, মনে থাকে যেন, কেমন?

বিমল বলল—আপনি কী ফিরছেন? আমরা চিঠিটা পোস্ট করে একটু বাদে ফিরব।

—ও, ঠিক আছে। পোস্ট অফিস ওই দিকে। চলি তাহলে—

বিজয়বাবু চলে গেলেন। বললাম—চিঠি পোস্ট করাটা আবার কী?

—ডাকটিকিট লাগিয়ে পকেটে চিঠি নিয়ে ঘোরাটা কোনো কাজের কথা নয়। পোস্ট করে দিলে রেহাই। হালকা হওয়া যাবে।

রাত্তিরে খেতে বসে বিজয়বাবু খুব উৎসাহ দেখালেন।

—কী খাওয়া হচ্ছে রাত্তিরে? দেখি মেনুটা—

বললাম—আমাদের তো একটু চাইনিজ খাবার ইচ্ছে। দেখুন—

—আমার আবার রিচ রান্না বিশেষ সহ্য হয় না। তবে একসঙ্গে বসে অন্যথা করব না। আপনারা যা খাবেন, আমিও তাই খাব। এমনিতে আমি রাত্তিরে দুটো প্লেন চাপাটি, কিছু সবজি আর একটু ডাল খাই। আজ কিচ্ছু মানব না—

সত্যিই তিনি কিছু মানলেন না। আমাদের অর্ডারের ওপর আবার বোনলেস চিলি চিকেনের অর্ডার দিলেন। খাওয়ার টেবিলে গল্প আর আড্ডা আজ একটু স্তিমিত। দলে বাইরের একজন লোক থাকলে যেমন হয়ে থাকে। বিজয়বাবু নিজে অনেক গল্প করলেন, বাচ্চাদের ম্যাজিক দেখালেন। যদিও এক টাকার কয়েন উধাও করবার সময় অপটু পামিংয়ের জন্য ব্যাপারটা পরিষ্কার ধরা পড়ে গেল, কিন্তু আমরা তা না দেখার ভান করলাম।

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। বিজয়বাবু বাচ্চাদের কী একটা মজার গল্প শোনাচ্ছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন—এই যে, বিলটা এদিকে দাও তো ভাই, আজ আমি পেমেন্ট করব—

এবার আমরা চমকে উঠলাম। বিল নেহাৎ কম হয়নি, এগারোজন মিলে খেয়েছি। এখন বুঝতে পারলাম বিল উনি দেবেন বলে প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, তাই অর্ডার দেবার জন্য অত উৎসাহ দেখাচ্ছিলেন। এ হে, জিনিসটা বড্ড কেমন হয়ে গেল।

বললাম—না, না, আপনি বিল দেবেন কেন? সে হয় না, আপনি আমাদের গেস্ট—

—গেস্ট তো বটেই। কিন্তু অতিথিরও তো কিছু দায়িত্ব থাকে—

ব্রতীশের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন—আজ আপনার জন্মদিন, এটা আমার সামান্য উপহার বলে ধরে নিন। সবাই মিলে আনন্দ করলাম—

এরপরে আর কথা হয় না। বিল উনি দিয়ে দিলেন। আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বিজয়বাবু বললেন—আচ্ছা, আমি তাহলে এবার ঘরে যাই। খুব আনন্দ হল আজ। জানেন, আমি গোমড়ামুখে চুপ করে বসে থাকতে একদম ভালবাসি না, অথচ আমারই গল্প করার মত বন্ধু কেউ নেই। আজ আপনারা সেই সুযোগ দিলেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের—

বিজয়বাবু চলে যাবার পর বিমল বলল—উনি তো আমাদের দলে ভর্তি হয়ে গেলেন দেখছি।

পিয়ালি বলল—ও রকম বোলো না। বেশ মানুষটা। একা থাকে বেচারি, মানুষের সঙ্গ পেলে খুশি হয়। কাউকে অমন বলতে নেই।

দেখলাম ডাকটিকিটের প্রতি আমাদের দলের মনোভাব একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। আসলে যতই দিন বদলাক, মানুষের প্রতি মমত্ববোধের জায়গা থেকে আমরা খুব একটা সরে আসিনি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আমরা উঠে আসছি, পেছন থেকে ডাইনিং রুমের পরিবেশনকারী ছেলেটি আমাদের ডেকে বলল—স্যার, রুমালটা কী আপনাদের? ফেলে যাচ্ছেন?

রুমালটা আমাদের কারও নয়। নিশ্চয় বিজয়বাবুর। বললাম—তোমরা যাও, আমি এটা দিয়ে আসছি।

ষোলো নম্বর ঘরের দরজায় নক করতে বিজয়বাবু এসে দরজা খুলে দিলেন।

—আরে, আপনি! আসুন, আসুন। কী ব্যাপার?

—নাঃ, এখন আর আপনাকে ডিস্টার্ব করব না। আপনি খাওয়ার ঘরে রুমালটা ফেলে এসেছিলেন, দিতে এলাম।

—ওঃ হো, দেখুন দিকিনি কাণ্ড! আমার আজকাল বড্ড ভুলো মন হয়েছে। দিন, থ্যাঙ্ক ইউ। এসেছেন যখন একটু বসে যান। আসুন।

খাটের পাশের চেয়ারে বসলাম, বিজয়বাবু বসলেন খাটে। তাঁর পরনে এখন পায়জামা আর পাঞ্জাবি। বিছানার ওপর তাস ছড়ানো, মনে হল ভদ্রলোক পেশেন্স্ খেলছিলেন।

—একা একা খেলছিলেন?

—হুঁ। পেশেন্স্। তাসের অন্য কোনও খেলা বিশেষ জানিই না বলতে গেলে। একা খেলা যায় বলে কষ্ট করে এটা শিখেছি। আনন্দবাবু, একাকীত্ব বড় অভিশাপ।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জোরে হেসে উঠে যেন প্রসঙ্গটাকে উড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন—আচ্ছা, বলুন তো, নিজের সঙ্গে তঞ্চকতা কী খুব অপরাধ?

—কেন, হঠাৎ এ কথা কেন?

—আরে, আর বলেন কেন। প্রায়ই রাত্তিরে পেশেন্স্ খেলি তো, মাঝেমাঝে অনেকক্ষণ খেলার পরে শেষের দিকে একখানা মাত্র তাসের জন্য পুরো খেলাটা ভণ্ডুল হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তখন এত খারাপ লাগে! এতদূর এগিয়ে এখন ছেড়ে দেব? অনেক ভেবেচিন্তে উলটো করে রাখা তাসগুলোর তলা থেকে প্রয়োজনমত একখানা তাস বের করে খেলাটা মিলিয়ে দিই। পেশেন্স্ একার খেলা, কেউ দেখতে বা জানতে পারছে না, তবু মনে হয় কেমন যেন একটু তঞ্চকতা হয়ে যাচ্ছে। এতে অন্য কারো ক্ষতি হচ্ছে না বটে, কিন্তু নৈতিক বিচারে কী আমি ঠিক?

এমন অদ্ভুত সমস্যার কী উত্তর দেব? হেসে বললাম—কিচ্ছু অন্যায় হয়নি, আপনি ঠিক কাজই করেছেন। ব্যক্তিগত কোনো কাজ আটকে গেলে আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজটা সারেন না? এও তো তাই। কারো অসুবিধে হচ্ছে না, কোনো প্রতিপক্ষ নেই—

আমার কথা বোধহয় ভদ্রলোকের মনঃপূত হল না। বললেন—কেউ দেখতে পাচ্ছে না বলে কী গোপনে অন্যায় করা যায়?

—এটা আর এমন কী অন্যায়?

—তা একটু অন্যায় বই কী। নিজের সঙ্গে কতগুলো নিয়ম তৈরি করে খেলা, নিজেই তা ভাঙব? রজনীকান্তের গান মনে আছে? সেই যে—'যেমন পাপের বোঝা এনে প্রাণের আঁধার কোণে রাখি, অমনি চমকে উঠে দেখি পাশে জ্বলছে তোমার আঁখি।' নিজের কাছে তো ফাঁকি চলে না—

বিচিত্র সমস্যা। চুপ করে থাকাই শ্রেষ্ঠ উপায় মনে হল।

বিজয়বাবু বললেন—এই দেখুন, অযথা আপনাকেও একটা সমস্যা দিয়ে ভাবিয়ে তুলেছি। বয়েস হতে আরম্ভ করলে নানারকম চিন্তাভাবনা মনে ভিড় করে আসে তো! বাদ দিন এসব কথা—

বললাম—আপনি বুঝি রজনীকান্তের গান খুব ভালবাসেন?

—শুধু রজনীকান্ত কেন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ—সব। তবে রজনীকান্তের কথায় আর সুরে একটা এমন নরম মাধুর্য আছে যে, সহজেই মনকে ভিজিয়ে দেয়, তাই না?

আরও খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর রাত্তিরের মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজা ধাক্কানোতে ঘুম ভেঙে গেল। বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি বের করে দেখি রাত দুটো বাজে। অচেনা শহর, হোটেলটাও নির্জন জায়গায়, এত রাত্তিরে হঠাৎ দরজা খুলব? কে হতে পারে? আমার স্ত্রীও জেগে গিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

দরজার কাছে গিয়ে বললাম—কে? কী চাই?

—আমি। আমি বিজয় রায়। একটু দরজাটা খুলবেন?

এত রাত্তিরে বিজয়বাবু! আবার কী গান মনে পড়ে গেল নাকি? ঝামেলা হল তো!

দরজা খুলে দেখি বিজয়বাবু ফ্যাকাশে মুখে দরজার ফ্রেমে হাত দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। এই তিন-চার ঘণ্টা আগেও ওঁর সঙ্গে গল্প করে এসেছি, কিন্তু এর মধ্যেই যেন ওঁর মুখচোখ কেমন হয়ে গিয়েছে।

বললাম—কী হয়েছে আপনার? চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন? আসুন, ভেতরে এসে বসুন—

দরজা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে ভদ্রলোক টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, আমি ধরে ফেলে এনে বসালাম।

—আনন্দবাবু, আপনার কাছে পেট ব্যথার কোনো ওষুধ আছে? পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন—দিচ্ছি। ভাল করে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসুন। কতক্ষণ থেকে হচ্ছে?

ভদ্রলোকের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। ঢোক গিলে বললেন—এই তো, ঘণ্টাদেড়েক হবে। প্রথমে ভাবলাম কমে যাবে, আপনাদের আর বিরক্ত করতে চাইনি। তারপর এমন বাড়ল—

—বিরক্ত কিসের? ঠিকই করেছেন। শরীর খারাপ লাগছে, আসবেন না? একা ট্র্যাভেল করছেন।

আমার স্ত্রীর কাছে একটা প্যাকেটে হঠাৎ প্রয়োজন হতে পারে এমন কিছু ওষুধ সবসময় থাকে। সে প্যাকেট থেকে খুঁজে একটা স্প্যাসমিন্‌ডন বের করে জগ থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে এগিয়ে দিয়ে বলল—খেয়ে নিন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা কমে যাবে—

পাশের ঘরে গিয়ে ব্রতীশকে ডেকে তুললাম, তারপর দুজনে মিলে বিজয়বাবুকে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। ব্রতীশ জিজ্ঞেস করল—আপনার কী এ রকম ব্যথা আগেও হয়েছে?

—না ভাই, এই প্রথম। আসলে রাত্তিরের খাওয়াটা বোধহয় সহ্য হয়নি। আমি তো খুব হালকা খাই। ইনডাইজেশন—

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বিজয়বাবুর। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ব্যথার দমকে মুখ কুঁচকে উঠছে। এ লক্ষণগুলো ভাল নয়। জিনিসটা আরও বাড়লে বিপদ হবে। ব্রতীশকে বললাম—যা, তুই বিমলকে একবার ডাক—

বিজয়বাবু বললেন—না, না, ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না। এমনিতেই আমি খুব লজ্জিত—

বিমলকে ডাকতেই হল। বিজয়বাবুর ব্যথা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দুবার কোনোরকমে উঠে বেসিনে গিয়ে বমি করে এলেন। কিন্তু অদ্ভুত সহ্যশক্তি ভদ্রলোকের, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে আছে, তবু একটুও শব্দ করছেন না।

তিন বউও উঠে এসেছে। সংকটের মুহূর্তে সঙ্কোচ থাকে না—পিয়ালি তোয়ালে ভিজিয়ে বিজয়বাবুর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে।

প্রথমদিনের সেই নাইট অ্যাটেনডেন্টেরই আজও ডিউটি। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হল—এখানে কাছাকাছি কোনো ডাক্তার পাওয়া যাবে ভাই?

—আছে স্যার? কেন, কী হয়েছে?

—ষোলো নম্বর ঘরে যিনি আছেন, তাঁর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

—হোটেলে কারো অসুখ হলে ডাক্তার মহেন্দ্র সিংকে ডাকা হয়। ফোন করব স্যার আসতে?

—করো। বলো এখনি চলে আসতে। উনি এলে ষোলো নম্বরে নিয়ে এসো।

ঘরে এসে দেখলাম বিজয়বাবু আবার বমি করছেন। তাঁর আর ওঠার ক্ষমতা নেই। মুখের কাছে বাথরুম থেকে প্লাস্টিকের মগ এনে ধরা হয়েছে, তাতেই বমি করছেন। ডাক্তারকে কল দেওয়া হয়েছে শুনে ওই অবস্থাতেই তিনি বললেন—কেন এত কষ্ট করলেন! এমনিতেই ঠিক হয়ে যেত—

মহেন্দ্র সিং এলেন মিনিট কুড়ির মধ্যেই। মধ্যবয়স্ক, শান্ত চেহারা। অত্বরিত ভঙ্গি। পালস আর প্রেসার দেখলেন, পেট টিপে দেখলেন। তারপর বললেন—রাত্তিরের খাওয়াটা এগ্রি করেনি। ভয় নেই, কাল বিকেল নাগাদ ঠিক হয়ে যাবেন। বমির সঙ্গে বোধহয় যে ট্যাবলেট দিয়েছিলেন সেটা বেরিয়ে গিয়েছে। আমি বমি কমানোর আর ঘুমের জন্য ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বেন। কাল সকালে এসে একবার দেখে যাবো।

মহেন্দ্র সিং চলে যাওয়ার পর মিনিট দশেকের মধ্যে বিজয়বাবু অনেকটা শান্ত হয়ে এলেন। মেয়েদের শুতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা বসলাম চেয়ারে আর খাটে ভাগাভাগি করে।

ব্রতীশ বলল—এখন কষ্টটা কী একটু কম বোধ করছেন?

বিজয়বাবু বললেন—একটু! তবে শরীর বড় দুর্বল লাগছে। বুকের মধ্যেটা—

—ভয় নেই। ঠিক হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বললেন—একটা কথা বলি। আপনারা তিনজনই

এখানে রয়েছেন, শুনে রাখুন। আমার যদি খারাপ কিছু হয়, যদি আমি না বাঁচি, তাহলে আমার জিনিসপত্রগুলোর দায়িত্ব আপনারা নেবেন—

হাঁপিয়ে উঠে বিজয়বাবু থামলেন। বললাম—কী যা তা বলছেন! কাল সকালেই—

—না, শুনুন। ইভেনচুয়ালিটির কথা কেউ বলতে পারে না। শুনে রাখুন। আমার সুটকেসে কিছু ক্যাশ টাকা আর ট্র্যাভেলার্স চেক আছে। আর জামাকাপড়। ওসবের জন্য ভাবি না। ওয়ালেটে আমার ভাইপোর ঠিকানা আছে, তাকে সব পাঠিয়ে দেবেন। সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস আছে সুটকেসের একেবারে তলায়, জামাকাপড় নীচে—

বললাম—কী জিনিস?

—আমার লেখা কবিতার পাণ্ডুলিপি। ওগুলো আমার প্রাণ। ওগুলো যদি হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমি মরেও শান্তি পাবো না। ভেবেছিলাম এবার কলকাতায় ফিরে নিজেই খরচ করে একখানা বই ছাপাবো। নইলে আমার কবিতা আর কে ছাপবে বলুন? তা বোধহয় আর হল না—

এবার সত্যিই বিজয়বাবুর জন্য মায়া হল। উনি কবিতা লেখেন তা জানতাম না। সত্যিই তো, কোনো প্রকাশক আগ্রহ করে ওঁর মত অনামী লেখকের কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করবে? অথচ সব লেখকের কাছেই তার নিজের লেখা বড় আদরের।

বললাম—আপনার কিছুই হবে না, কালই আপনি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার পাণ্ডুলিপি আমার কাছে নিরাপদে থাকবে।

ইনজেকশনের প্রভাবে বিজয়বাবুর চোখ বুঁজে আসছে, কথা জড়িয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে উনি বললেন—দিদিভাইয়ের পায়ের ব্যথাটা কমেছে তো?

আমরা তিন বন্ধু ওঁর বিছানার পাশে বসে রইলাম। ঘরে ছড়ানো সামান্য কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। চেয়ারের ওপর হালকা নীল তোয়ালে, মেঝেতে দেয়ালের ধারে সুটকেস, পাশে একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। টেবিলের ওপর হাতঘড়ি, কিছু খুচরো পয়সা, রুমালটা, এককপি শেষের কবিতা। বইটা পড়তে পড়তে উলটো করে রাখা, সম্ভবত পড়ার মাঝখানেই শরীর খারাপ হয়েছিল।

একজন নির্জন মানুষের সম্বল। কোথাও কোনো স্বাক্ষর না রেখেই হয়তো যাঁকে চলে যেতে হবে। অবাক হয়ে দেখলাম আমাদের বিরাগ কখন বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।

পরের দিন সকাল থেকে বিজয়বাবু সত্যিই ভাল হয়ে উঠলেন। মহেন্দ্র সিং এসে দেখে গেলেন। বললেন—ব্যস, একদম ভাল হয়ে গিয়েছেন।

—কাল রওনা হতে পারব ডাক্তারবাবু?

—সার্টেনলি, হোয়াই নট? বেরিয়ে পড়ুন।

মহেন্দ্র সিং চলে যাবার পর বললাম—কোথায় যাবেন এখন আপনি?

—কলকাতাতেই ফিরছি ভাই। আর দেরি করব না, তাড়াতাড়ি বইখানা ছাপানোর ব্যবস্থা করে ফেলি। বলা তো যায় না, এবারের মত বেঁচে গেলাম, পরের ধাক্কাটা সামলাতে পারব কিনা কে জানে। বয়েস নয় নয় করে কম হল না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে না, 'চলিতে চলিতে পথে আজকাল হরদম, বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম?' আমারও তো তাই। কাল সকালের বাসে জয়পুর চলে যাচ্ছি, ওখান থেকে ট্রেন ধরে নেব—

একটু ইতস্তত করে বললাম—একটা অনুরোধ জানাতে পারি?

—কী? কী অনুরোধ?

—আপনার কয়েকটা কবিতা আমাদের শোনাবেন? আমাদের সবাইকে। বিকেলে

রোদ্দুর পড়ে গেলে বাগানে বসে শোনা যাবে।

বিজয়বাবু খুব খুশি হলেন। বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয় শোনাব।

বিকেলে হোটেলের সামনের বাগানে বসল কবিতার আসর। বিজয়বাবু কবিতা পড়ছেন, ওঁর মাথায় মাঝে মাঝে দু-একটা ফুল ঝরে পড়ছে। বাতাসে দিনাবসানের শান্ত স্নিগ্ধতা।

ভেবেছিলাম কবিতা শোনার পর প্রথাসিদ্ধ প্রশংসা করতে হবে, যেমন মৌখিক ভদ্রতা সচরাচর করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিজয়বাবু লিখেছেন সত্যিই ভাল। এতটা আমরা আশা করতে পারিনি। ভাব, ভাষা সবই উঁচু জাতের। আমরা অকুণ্ঠ প্রশস্তি করলাম। বিজয়বাবু বললেন—কাল চলে যাব। অনেক বিরক্ত করেছি আপনাদের, নিজের সঙ্গীহীনতা কাটাবার জন্য অবুঝের মত আপনাদের সঙ্গ প্রার্থনা করেছি। মার্জনা করবেন সেজন্য। তবে বড় আনন্দ পেয়েছি—

দুপুরে খাওয়ার পর ঘরে বসে গল্প করতে করতে ব্রতীশ বলল—ডাকটিকিট হয়তো, কিন্তু খুব দামী আর দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট। পেনি ব্ল্যাক গোত্রের। লাখটাকা দাম। আমরাই ভুল করেছিলাম।

পরের দিন সকালে বিজয়বাবু পোস্ট হয়ে গেলেন।

ভূতেরা এখন

মানুষের মধ্যেই তাদের বাস। একই জনপদে। দেশ আর কাল এক, কেবল ভিন্ন স্তর আর মাত্রার বিন্যাসে তাদের সমাজ আলাদা। কত গল্প তাদের নিয়ে, কত উপকথা, ছড়া আর প্রবচন। বেশ ভাল আছে দুই সমাজ, পাশাপাশি, আজ বহুদিন ধরে। যতদিন মানবসমাজ, প্রায় ততদিনই ভূতসমাজও। প্রতিবেশী হলেও উভয় সমাজের সদস্যদের যোগাযোগ হয় কম। আগে তবু হত, এখন বড্ড বেশি আলো আর সভ্যতার ধুমধাড়াক্কার চোটে কেউ কারো দেখা পায় না। এ ভাল কথা নয়।

সেদিন সন্ধেবেলা জেগে ওঠার পর থেকে ক্রমাগত মাকে বিরক্ত করে যাচ্ছিল নোংরা। নোংরার মা অতিষ্ঠ হয়ে শেষে বলে ফেলল, বাঁচ, বাঁচ, তুই বাঁচলে আমি মরি—

বকা খেয়ে নোংরা একগাল হেসে বাতাসে ভর করে চলে গেল নদীর ধারের ঝুপসি জিলিপি ফলের গাছটায়। সেখানে জড়ো হয়েছে শুঁটকি, পোকা, নিমকি, গোবর—এককথায় মশানপাড়ার সব ছেলেপুলে। এখন থেকে দুপুর রাত্তিরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত চলবে খেলাধুলো। গোটাকতক আলেয়া ধরে রাখা আছে, সেগুলোকে তাড়া করে খেলা হবে।

শেওড়াগাছের নিচু ডালে বসে গতমাসের ভয় দেখানোর হিসেব দেখছিল মশানপাড়ার কমিশনার কলেরা পাঁচু। সেখান থেকেই পা দোলাতে দোলাতে সে বলল, নোংরার মা, যতই রাগ হোক, ছেলেপুলেকে বাঁচার গাল দিতে নেই। দিন দিন কী হচ্ছে?

নোংরার মায়ের নাম পোড়ানি। সে হেসে বলল, ভয় নেই কলেরা ঠাকুরপো, মায়ের গালে ছেলে বাঁচে না। তোমার হিসেব কদ্দুর হল?

হিসেব তো হল, কিন্তু মন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে বৌদি—

কেন, কেন?

মশানপাড়া ওয়ার্ডে যুবক ভূত আছে অন্তত বাহান্নজন। গেল সভায় তাদের মাথাপিছু পাঁচজন করে মানুষকে ভয় দেখানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাহলে মোট কত হয়? দুশো ষাট জন। আজ পর্যন্ত কত হয়েছে জানো? মাত্র ছিয়ানব্বই জন। তাও প্রকৃত ভয় পেয়েছে কুড়ি জন, বাকিরা চোখের ভুল কিংবা ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

পোড়ানি সমায়োচিত বিষণ্ণ মুখ করে বসে রইল। সমাজের পরিবর্তন, সভাসমিতি—এসব জটিল কথাবার্তা তার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু পোড়ানি লক্ষ্য করেছে এসব কথা বলা আজকালকাব ফ্যাশান। আলোচনা করতে গেলে বেফাঁস হয়ে পড়বার সম্ভাবনা, কাজেই বুঝদাবের মত চুপ থাকাই ভাল।

কলেরা পাঁচুর মাঝে মাঝে সত্যিই মন কেমন করে। সে আজকের ভূত নয়। সিপাহি বিদ্রোহের পরে পরেই মুর্শিদাবাদ জেলার কলেরা মড়কে সে ভূতজন্ম পায়। দুশো বছরে কত লোককে সে ভয় দেখিয়েছে, ঝুপ ঝুপ বর্ষার দিনে জোলো বাতাসে ভর দিয়ে মেঘলা আকাশের নিচে ভেসে বেড়িয়েছে। আর এখন সব গেল। কোথায় সেই সবুজ ধানক্ষেত, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা পোড়ো বাড়ি, সন্ধের পরে জ্বলে ওঠা জোনাকি। একটু একটু করে শহর এগিয়ে এসে গ্রাম খেয়ে ফেলেছে। তারপর আছে তীব্র ইলেকট্রিক আলোর বন্যা। পাঁচজন ভূতেই বলুক, অত আলোয় স্বচ্ছন্দে বাস করা অসুবিধে না? এই তো খন্তাই সুখে থাকত পুবপাড়ার বটগাছে। আজ দেড়শো বছরের পারিবারিক ভিটে তাদের। হঠাৎ গতবছর থেকে সেই বটগাছের পাশে বিরাট বাড়ি উঠছে। একধরনের লোক হয়েছে আজকাল, তাদের বলে প্রোমোটার, তারাই বাড়ি তুলছে। দুমদাম ঝনঝন খটাংখট আওয়াজ, লরি আর পে-লোডারের আনাগোনা, শতেক মানুষের দিনরাত চিৎকারে খন্তাই উদ্বাস্তু হয়ে বটগাছ ছেড়ে পালিয়েছে। নতুন বাসস্থান না পেয়ে এখন সে রেললাইনের ধারে কনডেম্‌ড কেবিনঘরে কোনোমতে মাথা গুঁজে আছে। ভূতসমাজের দিক থেকে অবশ্য এই অত্যাচার এবং অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। শহরের লোকাল মস্তান দাদাকে প্রভাবিত করে তাকে দিয়ে হাঙ্গামা বাধানো হয়েছে। প্রণামীর টাকা না পেলে তারা বাড়ির কাজ করতে দেবে না। বাধ্য হয়ে প্রোমোটার টাকা দিয়েছে, এবং সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য কম ভাগে সিমেন্ট, গঙ্গামাটি আর দু'নম্বর মালমশলা দিয়ে গাঁথুনির কাজ চালাচ্ছে। ভূতসমাজ গভীর আশা পোষণ করে এ বাড়ি অচিরে ভেঙে পড়বে।

আজ একটু বেশি রাত্তিরে পাঁচুর পাড়ার খেঁদি ভূতিনীর বিয়ে। পাত্র হল বীরভূম তেলিপাড়া মহাশ্মশানের এক নব্য ভূত। গত হপ্তায় সে দলবল নিয়ে পাত্রী দেখতে এসে খেঁদির দুধে-আলকাতরা রঙ, ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা শ্ব-দন্ত আর মাথাভরা উলুকুটি-ধুলুকুটি চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তাছাড়া মেয়ে কত কাজের দেখাবার জন্য বাড়ির লোকেরা পাত্র খেতে বসলে খেঁদিকে দিয়ে পরিবেশন করিয়েছিল। পরিবেশনের সময়ে খেঁদির মাথা থেকে বরের পাতে আট-দশটি উকুন পড়ে। তা দেখে আত্মহারা পাত্র বাড়ি গিয়ে নাকি বলেছে—এ মেয়ে ছাড়া সে বিয়ে করবেই না। তাহলে একরকম পছন্দের বিয়েই বলা যেতে পারে। খুব জাঁকজমক হবে। গায়ে পাঁক মেখে, চুলে ধুলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে যতরকম সম্ভব ভাল সাজগোজ করে পাঁচু নেমন্তন্ন খেতে যাবে। শোনা গেল আনন্দিত খেঁদির মা সকাল থেকে মেয়েকে বারবার আশীর্বাদ করছে—এত ভাল পাত্রও তোর কপালে ছিল মা! এখন প্রার্থনা করি, সারামরণ তোদের অশান্তিতে কাটুক, শীগগির ডাইভোর্স হোক—

পুলকিত খেঁদি মাকে প্রণাম করে বলেছে—তোমার আশীর্বাদ যেন সত্য হয় মা—

শেওড়াগাছের নিচে বসে নোংরার ছোট ভাই নোনতা সেই কখন থেকে একঘেয়ে সুরে বায়না করে যাচ্ছে—আঁমি পঁচা মাঁছ খাঁবো। অঁ ম্যাঁ গঁ, পঁচা মাঁছ খাঁবো—

অতিষ্ঠ হয়ে পোড়ানি বলল, আর পারিনে রে বাপু! সন্ধে থেকে বায়না চলেছে! আমরা কী বেম্মদত্যি না মামদো, যে কথায় কথায় দামী খাবার খাওয়াবো? আমরা সাধারণ ঘরের পাঁচমেশালি ঘাঁটা ভূত, রোজদিন কী ঘরে পচা মাছ থাকে? এখন দুটো টাটকা মাছ যাহোক করে খেয়ে নে, তারপর দুপুর রাত্তিরে খেঁদির বিয়েতে পেটভরে পচা মাছ খাবি—

গাছের ডাল থেকে কলেরা পাঁচু বলল, শুধু কী তাই? আরও কী কী খাওয়াচ্ছে শুনবে নোংরার মা? শকুনের ডিমের ওমলেট, বাসি চাটনি—

মেয়েদের নোলা দেখাতে নেই। খুব লোভ হলেও পোড়ানি অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করল।

হিসেব শেষ করে গাছের ডাল ছেড়ে বাতাসে ভাসল পাঁচু। পাড়ার একেবারে শেষে একটা তুঁতঝোপে থাকে তার বন্ধু দন্তাই. কিছুদিন ধরে তার শরীর ভাল যাচ্ছে না। একবার দেখতে যাওয়া দরকার।

বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে পাঁচু দেখল ব্যাপার খুবই গুরুতর। চালতে গাছের গা বেয়ে ওঠা তেলাকুচো লতার দোলনায় দুলতে দুলতে দন্তাই আধুনিক বাংলা কবিতা আবৃত্তি করছে, আর ঝোপের পাশে বসে কান্নাকাটি করছে বাড়ির লোকজন। পাঁচুকে দেখে দন্তাইয়ের ভাই খন্তাই এগিয়ে এসে বলল, পাঁচুদা, সর্বনাশ হয়েছে! দাদাকে বোধহয় মানুষে পেয়েছে। ইদানিং বড্ড মানুষের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করত, সবাই কত বারণ করতাম--সে কথা শুনতো না। ও পাড়ার বাতাস তো ভাল নয়, ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছে—

পাঁচু জিজ্ঞেস করল, কী দন্তাই, এসব কী হচ্ছে?

দুলতে দুলতেই দন্তাই প্রথমে হিঃ হিঃ করে হাসল, তারপর বলল, বাতাসে লোহার ঘ্রাণ, পরবশ প্রার্থনায় কাটে দিন, কাটে ঘন হিম রাত। কার ছবি অন্ধকারে? মৃগয়ায় বেরিয়েছে কোন সে কিরাত?

তারপরেই আবার হিঃ হিঃ হিঃ।

ধাক্কা খাওয়ার মত করে পিছিয়ে এল পাঁচু। তার মুখে ভয় ও বিস্ময়।

খন্তাই বলল, শুনলেন পাঁচুদা? এইরকম চলছে আজ তিনদিন।

কিন্তু এসব কী বলছে দন্তাই? এর মানে কী?

মানে তো জানি না। তবে একে বলে আধুনিক কবিতা। বাজারে খুব কদর। শুধু কী কবিতা? এদিকে আসুন, দাদার কাণ্ড দেখাই—

তুঁতঝোপের পেছনে সামান্য একটু খোলা জায়গা ঘিরে কয়েকটা কাঁটাওয়ালা বাবলা গাছ। গাছেদের গায়ে কাঁটায় ফুটিয়ে কয়েকটা কাগজ টাঙানো। তাতে রঙিন হিজিবিজি কীসব আঁকা। খন্তাই বলল, দেখেছেন? ছবির একজিবিশন।

বিস্মিত পাঁচু জিজ্ঞেস করল, এ কার আঁকা?

সব দাদার। দু'দিন ধরে ছবি এঁকে গাছে টাঙিয়েছে। আমরা খুলে ফেলতে চেষ্টা করলে কামড়াতে আসছে। খুব বিপদ পাঁচুদা।

পাঁচু কাছে গিয়ে প্রথম ছবিটা দেখল। সবুজ রঙের একটা গোলমত, তার নিচে কয়েকটা ঢেউ খেলানো খয়েরি দাগ, ডানদিকে আর বাঁদিকে চারটে বাঁশগাছ ঠেলে

আকাশের দিকে উঠেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর ওপারে সূর্যাস্তের ছবি। কিন্তু নীচে লেখা আছে—জ্যোৎস্নায় তাজমহল। পরের ছবিতে একটা নীল লম্বা দাগ, সেই দাগের ওপর একটা হলুদ ত্রিভুজ, পাশে পাখির খাঁচার মত কী যেন। তলায় লেখা—স্নানরতা নারী। বাকি ছবিগুলোর দিকে হতভম্ব পাঁচু ভয়ে এগুলো না।

খন্তাই বলল, কী বুঝছেন পাঁচুদা?

বুঝবো আর কী? মানুষেই পেয়েছে। তুই একবার কানকুলো বুড়োকে খবর দে, সে এসে স্বস্ত্যয়ন করুক, ভূতপত্রীর পুঁথিটা একবার পড়ুক, দোষ কেটে যাবে এখন। সামনের শনিবার রাত্তিরে করতে পারিস। রাত্তিরটা ভাল, ত্র্যহস্পর্শ। পাঠ শেষ হলে পাড়ার ভূতসকলকে প্রসাদ খাইয়ে দিস। দশ কিলো ব্যাঙ আর পাঁচ কিলো গিরগিটিতেই কুলিয়ে যাবে। খরচ বাড়াস না—

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আজ আমার বহুদিনের একটা ধাঁধা কেটে গেল।

কী পাঁচুদা?

ভয় দেখানোর ডিউটিতে ঘুরতে ঘুরতে শহরের অনেক জায়গাতে এরকম ছবি টাঙানো দেখেছি। ভাবতাম এগুলো কারা করে। আজ বুঝতে পারছি আমরাই উৎস। ভূত পাগল হলে এসব আঁকে।

খন্তাই বিষণ্ণমুখে চুপ করে রইল।

খেঁদির বিয়ের উৎসবে রাত্তিরে মশানপাড়ায় বেশ বড়রকমের একটা হট্টগোল বাধল। বরযাত্রী এসেছিল প্রায় পঞ্চাশজন ভূত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়ে বিবাহবাসরের আশেপাশে শেওড়া আর বেলগাছের ডালগুলো দখল করে চড়ে বসল। বাকিরা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় ব্যস্ত হয়ে খেঁদির কাকা ছারমুই এসে বলল, আসুন, আসুন! দাঁড়িয়ে কেন সব? এই এখেনে এসে বসুন—

বরযাত্রীদের মধ্যে একজন বলল, ওই ওখেনে? মাটিতে বসব? কেন বলুন তো? বাকিরা তো সব সুন্দর গাছের ডালে জাঁকিয়ে বসেছে। আমরা কী অপরাধ করলাম?

আজ্ঞে, ওঁরা নিজেরাই ওখেনে গিয়ে বসেছেন। আমরা তো বসাই নি। আমরা সবার জায়গা উঠোনেই করেছিলাম। দেখুন না, কেমন শ্মশান থেকে আনা মড়ার গদি পেতে দিয়েছি—

একজন রগচটা লোক বলল, আপনি বসুন গিয়ে মড়ার বিছানায়, আমরা নিচু আসনে বসব না। তেলিপাড়া গঙ্গাযাত্রা ইউনিয়নের নাম শুনেছেন, আমরা সেই ইউনিয়নের মেম্বার। আমাদের যা তা ভূত ভাববেন না—

ঘাবড়ে গিয়ে ছারমুই বলল, না, না! তা কেন? আপনারা সকলেই মাননীয় ভূত।

সে মান দিচ্ছেন কোথায়? যারা গাছের ডালে গিয়ে বসেছে তারা কারা জানেন? তারা হচ্ছে গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। ওদের গুরুত্ব কী আমাদের চাইতে বেশি?

না, না, সে কী কথা! আপনারা সবাই সমান—

গাছের ডাল থেকে একজন মাতব্বর ভূত বলল—ও আবার কী? সমান কেন হব? আমরা সম্মানে ও প্রতিষ্ঠায় বড়। জানেন, আমাদের অদৃশ্য প্ররোচনায় গত একবছরে দেড়শো গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে? বাষট্টিজন গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে? আমাদেরই গোপন উৎসাহে সারা দেশে সতেরোশটা নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে? গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের অবদানকে বাদ দিয়ে ভূতসমাজের প্রকৃত ইতিহাস লেখা যায় না।

গঙ্গাযাত্রা ইউনিয়নের একজন বলল, খালি বড় বড় কথা! পাড়ার বাইরে কে চেনে ওদের?

খেঁদির বাবা আরমুই এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে তখনকার মত বিরোধ মিটিয়ে দিল।

পরিবেশনের সময় আর একটা ঝামেলা বেধেছিল! চাটনির স্বাদ ভাল হওয়ায় সবাই দু'তিনবার চেয়ে নিচ্ছিল। গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের ভূতেরা চেঁচামেচি শুরু করে—এ কী মশাই! আমাদের পাতে যা দিলেন, এ তো তিনদিনের বেশি বাসি নয়। ওদের তো গতহপ্তার চাটনি দিচ্ছেন—

আরমুই বিনীতভাবে বলল, মাননীয়গণ, আপনারা সবাই বরযাত্রী। একই দলে এক জায়গা থেকেই এসেছেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন কেন?

ইউনিয়নের লোকেরা বলল, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিই তো বেঁচে থাকার সার্থকতা।

অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা বলল—ভ্রাতৃবিরোধের আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

দুই দলের লোক একসঙ্গে বলল, জয় হাঙ্গামা! লাগাও কাণ্টাল!

নিমন্ত্রিতদের খাবার সাপ্লাই করেছিল মড়কানন্দ ময়রা। খবর পেয়ে সে এসে বলল, দাদারা, আমি পচা খাবার ছাড়া দোকানে রাখি না। আপনাদের মত মানুষকে কি টাটকা খাবার দিয়ে ঠকাতে পারি? খবর নিয়ে দেখবেন মানুষজন্মে দোকান থেকে বিয়েবাড়িতে পচা দই সাপ্লাই করে মানুষ মারবার কারণে গণধোলাইতে আমি ভূতজন্ম পাই। টাটকা খাবার কাকে বলে আমি জানিই না। মনে সন্দেহ না রেখে প্রাণভরে খান দাদারা, আমি জামিন—

পাঁচু ইউনিয়ন করা ভূত। স্বজাতির অধঃপতন দেখে সে পরের সপ্তাহে ব্রহ্মডাঙার মাঠে এক বিরাট মিটিং ডাকল অঞ্চলের সব ভূতেদের নিয়ে। পাঁচু তাদের বলল, ভাইসব, মানুষ আমাদের বড্ডই ক্ষতি করেছে। আমরা তাদের কাজকর্মে কখনো নাক গলাইনি। পোড়ো বাড়ি, অন্ধকার রাত্তির, শ্মশান-মশান নিয়ে বেশ ছিলাম। পাজি মানুষেরা আমাদের সব সুখ কেড়েছে। পোড়ো বাড়ি ভেঙে পাঁচতলা ফ্ল্যাট উঠছে, শ্মশানে আলোর বন্যা, সেখানে ইলেকট্রিক চুল্লি বসেছে, যুক্তিবাদী সমিতির লোকেরা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বক্তৃতা করে সবাইকে বোঝাচ্ছে আমরা নাকি নেই। দশরথের ছেলেও আমাদের এত ক্ষতি করতে পারেনি। বেশ, আমরাও মজা বোঝাচ্ছি মানুষদের। আসুন ভাইসব, আমরা দলে দলে ভাগ হয়ে মানুষের বুদ্ধি দখল করি। তারা যা করতে চাইছে, তার উল্টোটা করাই। কেউ প্রশাসকদের কাছে যান, কেউ যান জনপ্রতিনিধিদের কাছে। খবরের কাগজের ভার নিক একদল, আর একদল যাক ডাক্তারদের কাছে। শিক্ষক, অধ্যাপক আর পড়াশুনোর সিলেবাস যারা তৈরি করে তাদের তো আমরা এর আগেই দখল করেছি। এভাবেই ভূতুড়ে বুদ্ধি ছড়িয়ে দিই মানবসমাজের সর্বস্তরে। সবাই বলুন—ভূতের জয়!

নিজেদের কাজ বুঝে নিয়ে বাতাসে মিশে গেল তারা। ছড়িয়ে পড়ল নতুন কর্মক্ষেত্রে।

এ হল আজ থেকে এক কী দেড় দশক আগেকার কথা। ভূতেরা খুব বিবেকবান কর্মী। তারা কাজে ফাঁকি দেয় না। নতুন কর্মসূচীতে তারা কতখানি সফল সেটা এই যুগে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা বুঝতেই পারছেন। ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া এর থেকে রেহাই পাওয়ার তো কোনো পথ দেখছি না।

নিরামিষ গল্প

সত্যরঞ্জনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার বয়েস কত বলে মনে হয়?

তাঁর দিকে ভাল করে তাকালাম। পাকসিটে খাওয়া দরকচা মার্কা চেহারা। মাথার চুল আন্দাজ অর্ধেক মত পাকা। চোখের কোণে বয়েসের রেখা। সমস্ত শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। বললাম--কত আর, এই পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি হবে—

ভদ্রলোক বিষণ্ণভাবে হাসলেন, বললেন—আপনার দোষ নেই। সবাই তাই মনে করে। আমার বয়েস এই একান্ন চলছে—

বলেন কী সত্যরঞ্জনবাবু! একান্ন! চামড়া শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যের মাঝামাঝি বয়েসে চেহারায় যে নির্ভুল প্রাচীনত্বের ছাপ্ ফুটে ওঠে, এটা সেই বয়েস। পঁয়ষট্টি না হোক, বাষট্টি তো বটেই। একান্ন!

---বিশ্বাস হল না তো? তা, আপনার আর দোষ কী? কেউ কেউ সত্তরও বলে। বাবুলাল দত্তের জন্য আজ আমার এই অবস্থা।

কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই সাম্প্রতিক। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর শরীর সুস্থ রাখবার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে রোজ বিকেলের দিকে শহরের প্রান্তে এই পার্কে বেড়াতে আসি। মাধবীলতার ঝোপের পাশে একটি বেঞ্চ আমার খুব প্রিয়। সেখানে বসে ঘণ্টাখানেক বাচ্চাদের খেলাধুলো আর নানান মানুষের মিছিল দেখি, তারপর আবার বাড়ি ফিরে যাই। এই বেঞ্চিতেই একদিন এসে বসলেন সত্যরঞ্জনবাবু। দুজন লোক পাশাপাশি কিছুক্ষণ বসে থাকলে যতটুকু আলাপ হতে পারে ততটুকুই হল। বিশেষ কিছু ঘনিষ্ঠতা নয়, পরস্পরের নাম জানা, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যবিনিময়—এইসব। আজকে সামনের মাঠে ইস্কুলের ছেলেদের শরীরচর্চা দেখতে দেখতে ব্যায়ামের উপকারিতা এবং তরুণ বয়েসের জীবনচাঞ্চল্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চলছিল। হঠাৎই সত্যরঞ্জনবাবু আমার দিকে ফিরে নিজের বয়েস সম্বন্ধে প্রশ্নটা করলেন।

বললাম—বাবুলাল দত্ত কে?

সত্যরঞ্জনবাবু বললেন—তাহলে গল্পটা আপনাকে প্রথম থেকেই বলি। গল্প নয়, আমার জীবনের করুণ কাহিনী। শুনুন এবং এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন।

অতঃপর সত্যরঞ্জনবাবুর জবানীতেই ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করছি।

আমি মশাই আজ থেকে আট বছর আগে আপনাদেরই মত হাস্যোজ্জ্বল যুবাপুরুষ ছিলাম। কিন্তু কুক্ষণে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাবুলাল দত্তের। না, বাবুলাল সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা করে নেবেন না। সে মহাপাষণ্ড কিংবা দুষ্টপ্রকৃতির লোক নয়। বাবুলাল নিতান্তই শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির সরল মানুষ। দোষের মধ্যে সে নিরামিষ খায়।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—নিরামিষ খায়? সেটা দোষের হল কী করে?

সত্যরঞ্জনবাবু বললেন—শুনুন সবটা। শুনলেই বুঝতে পারবেন।

পাড়ার একটা ক্লাবে সে সময়টা সন্ধেবেলা প্রায়ই ব্রিজ খেলতে যেতাম। খুব যে ভাল

খেলতাম তা নয়, টুর্নামেন্টেও কখনো যোগ দিইনি। তবে অকশন ব্রিজটা মোটামুটি চালিয়ে দিতে পারতাম। সেই ক্লাবেই বাবুলাল দত্তের সঙ্গে আমার আলাপ। বাবুলালও খুব ভাল খেলত না, প্রধানত আড্ডাই দিতে আসত। পাতলা চেহারার ফর্সা মানুষ, কোনো একটা ইস্কুলে ভূগোল পড়ায়। নরম ধাতের লোক, বেশি জোরে কথা বলতে পারে না। কোনো বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হলে চুপ করে সবার কথা মেনে নেয়। সে লুকিয়ে কবিতা লেখে এমন একটা গুজবও পরিচিতদের মধ্যে চালু ছিল। তবে লাজুক মানুষ হওয়ায় নিজের লেখা কবিতা বাবুলাল কখনো কাউকে দেখাত না। কেউ তার কবিতা শুনতে চাইলে বাবুলাল বলত—না, না, সে কিছুই নয়। ওসব আমার পাগলামি, দেখাবার মত কিছু না—

বাবুলালের সঙ্গে আমার জীবনের একটা বড় মিল ছিল। সে এবং আমি দুজনেই অবিবাহিত। একলা বাড়িতে থাকি, নিজেরাই রেঁধেবেড়ে খাই। অবসর সময়ে আমি বই পড়ি আর ছাদে টবের গাছের পরিচর্যা করি। বাবুলাল কবিতা লেখে আর তবলা বাজায়। নিঃসঙ্গ মানুষেরা তাড়াতাড়ি বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হয়। আমাদেরও তাই হল।

একদিন ক্লাবে বসে খেলা আর আড্ডা চলেছে, রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ বাবুলাল বলল—নাঃ, আজ উঠি। রাত হয়ে গেল—

বললাম—সাড়ে-আটটা আবার রাত নাকি! বসুন, পরে যাবেন এখন।

—নাঃ, আমি বরং আজ যাই। গিয়ে আবার রান্না বসাতে হবে। এমনিতে দু'বেলার রান্না করে রাখি। কিন্তু আজ যা গরম পড়েছে, এবেলার রান্না ওবেলা খাওয়া যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। যাই—

বললাম—কী রান্না করবেন আজ?

—দেখি, ভাত আর একটা কিছু তরকারি করে নেব এখন।

—সঙ্গে একটা ডিমের ঝোল করে নিন না, তোফা খাওয়া হয়ে যাবে।

—কিন্তু আমি তো ভাই মাছ-মাংস বা ডিম খাই না। আমি পুরোপুরি নিরামিষাশী—

এ খবরটা জানতাম না। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাই নাকি? তা তো জানতাম না। আপনি কি বরাবরই—মানে ছোটবেলা থেকেই নিরামিষ খান?

বাবুলাল বলল—ঠিক তা নয়। বাবা-মা বেঁচে থাকতে মাছ-মাংস সবই খেতাম। তারপর কলেজে পড়বার সময় ওঁরা দুজনেই মারা গেলেন। একা মানুষের পক্ষে আমিষ রান্না বিরাট একটা ঝামেলা, তাছাড়া নিরামিষ খাওয়া শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী—সে কথা আপনি নিশ্চয় জানেন? এর ওপরে বেশ কিছু ইংরেজি-বাংলা বই আর পত্রপত্রিকা পড়ে ফেললাম। দেখলাম নিরামিষ খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, আয়ু বাড়ে, জীবহিংসা করতে হয় না। তাই আজ এতবছর ধরে—

—রোজ নিরামিষ ভাল লাগে?

—কেন লাগবে না? আসলে আমরা নিরামিষ রান্নার কায়দাটাই একটু একটু করে ভুলে যাচ্ছি। আধুনিক দ্রুতগতির জীবনে কারো হাতে বাড়তি সময় নেই, বাড়ির মেয়ে-বৌরাও কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। কে মশাই মোচা কুটবে, এঁচড় কাটবে, চচ্চড়ি রাঁধবে? দেখুন না, আর পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার দোকান থেকে প্যাকেটে ফাস্ট ফুড কিনে এনে লাঞ্চ বা ডিনার সারবে—

কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর বাবুলাল বলল—আসুন না একদিন আমার বাড়ি।

একটা কোনো ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়াটা আমার কাছে সারুন। আমি নিজের হাতে আপনাকে নানারকম নিরামিষ রান্না করে খাওয়াবো। ভেজিটেরিয়ান প্রিপাবেশন ভালবাসেন তো?

—খুবই। কিন্তু পাচ্ছি কোথায়? একা লোক, বোঝেন তো—

—আরে একা তো আমিও। শিখে নিতে হয়। তাহলে সামনের শুক্রবারে চলে আসুন, গুড ফ্রাইডের ছুটি আছে। জমিয়ে আড্ডাও দেওয়া যাবে, কেমন?

লোভ সামলাতে না পেরে নেমন্তন্নটা নিয়ে ফেললাম। খেতে চিরকালই ভালবাসি, একসময়ে বন্ধুদের মধ্যে খাইয়ে বলে নামও ছিল। গ্রাম থেকে প্রথম যখন শহরে পড়তে আসি, তখন কিছুদিন একটা হোটেলে দু'বেলা খেতাম। সে হোটেলে দু'রকম মিল চালু ছিল—পাঁচ টাকার আর ছ' টাকার। আমি পাঁচ টাকার মিল খেতাম। পেটচুক্তি খাওয়া। ভাত ডাল তরকারি আর মাছ বা ডিম। মাছ একটা বাটিতে একবারই দিত, কিন্তু ভাত ডাল আর তরকারি যতবার ইচ্ছে নেওয়া যেত। ছ' টাকার মিলে দিত দুটো তরকারি, ভাজা আর চাটনি একস্ট্রা। যাই হোক, খেতে তো শুরু করলাম। দিন আট-দশের মধ্যে মালিকের মুখ শুকিয়ে এল। গ্রামের ছেলে, ভাতটা একটু বেশিই খেতাম। তাছাড়া পয়সা দিয়ে খাচ্ছি, লজ্জা করবার কোনো কারণ নেই। প্রথমবারের পরেও অন্তত দু'বার ভাত নিতাম হয়তো, কিন্তু কেমন একটু বাধো বাধো ঠেকত। পয়সা দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু একেবারে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে তো খাওয়া যায় না।

মাসের শেষে টাকা দেবার সময় হোটেলের ম্যানেজার বিব্রতমুখে আমতা আমতা করে বললেন—মানে, হয়েছে কী ভাই—আপনি যদি ছ'টাকার মিলটা নেন তাহলে বড় ভাল হয়। অন্য কিছু না—আসলে জিনিসপত্রের দরটাও যেভাবে বেড়ে চলেছে—কিছু মনে করবেন না—

মনে করবার কিছু ছিল না। পালিশ দিয়ে বললেও ভদ্রলোক কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। পরের মাসের প্রথম দিন থেকে ছ'টাকার মিল খেতে শুরু করলাম।

এবার আর আমার কোনো সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জার বাধা নেই। বেশি পয়সা দিচ্ছি। কাজেই চারবার করে বেড়াল লাফিয়ে ডিঙোতে পারে না এত ভাত নিতে লাগলাম। হোটেলের কর্মচারীরা দূর থেকে অবাক হয়ে আমার খাওয়া দেখত। আমি পরোয়া করতাম না। দেখছে দেখুক, তাই বলে তো আর আধপেটা খেয়ে থাকতে পারি না।

সে মাসের শেষে ম্যানেজার ফের ঘাড় চুলকে বললেন—ভাই, আপনাকে ছ'টাকার মিল খেতে বলে গতমাস থেকে বড়ই মনোকষ্টে আছি। আপনি বরং পাঁচ টাকার মিলটাই নিন।

বললাম—না, না, তা কেন? আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। আমি ছ' টাকার মিলই—

ম্যানেজার আকুল হয়ে বললেন—পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা। তাহলে ওই কথাই রইল—

আমি পুনরায় মূষিক হলাম।

শুক্রবার গিয়ে হাজির হলাম বাবুলালের বাড়ি। সে একাই থাকে। বই পড়বার নেশা আছে, বাইরের যে বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে বসালো তার দু'দিকের দেয়ালে গাঁথা তাকে বেশ কিছু ভাল বই। সাধারণ পাঠক সহজে পড়ে না এমন লেখকের রচনাও রয়েছে যেমন ত্রৈলোক্যনাথ, মধুসূদন, রমেশ দত্ত। বললাম—বাঃ, আপনি তো দেখছি একজন

বড়দরের সাহিত্যভক্ত।

লজ্জিতমুখে বাবুলাল বলল—ঠিক তা নয়। বই-টই পড়তে আমার ভালই লাগে, তবে আমি বই পড়ি প্রধানত রান্না খুঁজতে।

—রান্না খুঁজতে?

—হ্যাঁ, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না বাংলা সাহিত্যে কত ভাল ভাল রান্নার নাম আর বিবরণ আছে। ইংরেজিতেও হয়তো আছে, কিন্তু আমি তো অত ভাল ইংরিজি জানি না, আর সে-সব রান্না এখানে করাও যাবে না। বই পড়ে পড়ে আমি রান্না বের করে এক্সপেরিমেন্ট করি। কেবলমাত্র রামায়ণ আর মঙ্গলকাব্যগুলো থেকেই আমি অন্তত দশ-বারো রকমের নতুন রান্না শিখেছি। যাক, ওসব গল্প পরে শোনাবো। এখন একটু চা হয়ে যাক, কী বলেন?

—তা মন্দ না। কিন্তু আপনাকে আবার উঠতে হবে—

—ও আমার অভ্যেস আছে। এক্ষুনি হয়ে যাবে।

সত্যিই দশ মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে এল বাবুলাল। চায়ের সঙ্গে ট্রে-তে প্লেটের ওপর একগোছা কড়াভাজা টোস্টের মত দেখতে কী জিনিস।

বললাম—এগুলো কী?

বাবুলাল হাসল, বলল—আজ আপনাকে আমার পছন্দমত কিছু খাবার খাওয়াব। চায়ের সঙ্গেই শুরু করা যাক। এ হচ্ছে পাটপাতা ভাজা।

—পাটপাতা ভাজা?

—হ্যাঁ। কতরকম পাট আছে জানেন? তেতো পাট, মিঠে পাট, বগি পাট, কুচো পাট—আরও কত ভ্যারাইটি। এ হচ্ছে মিঠে পাট। খান, ভাল লাগবে—

দান্তের বর্ণিত নরকের প্রবেশদ্বারের ওপরে লেখা ছিল—'সমস্ত আশা-ভরসা বাইরে রেখে তবে ভেতরে এসো।' যেহেতু বাবুলালের বাড়ির দরজায় তেমন কোনো সতর্কবাণী লটকানো ছিল না তাই নিঃশঙ্কচিত্তে ঢুকেছিলাম। জানতাম না পাটপাতা তো সবে শুরু।

পাটপাতা ভাজা অবশ্য মন্দ লাগল না। মুচমুচে, মুখরোচক। বললাম—বেশ খাস্তা ভাজা হয়েছে। চালবাটা দিয়ে করেছেন, তাই না?

—অবশ্যই। সঙ্গে দু' চিমটি বেকিং পাউডার, নইলে মুচমুচে হত না—

পরের একঘণ্টা রান্নাবান্নার গল্প চলল। নিরামিষ রান্নার ব্যাপারে বাবুলালের একটা খ্যাপাটে ভালবাসা আছে। আমিষ আহার যে শরীরের পক্ষে কত ক্ষতিকর, মাছ-মাংস বা ডিম যেভাবেই রান্না করা যাক না কেন, মশলার কারিকুরি বাদ দিলে আসলে তা মাছ-মাংস এবং ডিম মাত্র, সে তুলনায় হাজার হাজার রকমের নিরামিষ রান্না করা যেতে পারে, উৎসাহিত গলায় এসব তথ্য সে আমাকে পরিবেশন করল। তারপর বলল—দাঁড়ান, খিদে বাড়াবার জন্য আপনাকে একটু অ্যাপিটাইজার খাওয়াই—

হেসে বললাম—কী জিনিস? জিরা পানি?

—আরে নাঃ, ওসব বাজারি জিনিস আমার একদম চলে না। দেখুন না—

ভেতরের ঘর থেকে সবুজ রঙের তরল পদার্থ ভরা দুটি গ্লাস এনে সে সামনে রাখল। চমকে উঠে বললাম—নিমপাতা বাটা নাকি? রবীন্দ্রনাথ খেতেন শুনেছি, আমার মত সামান্য মানুষের কি সহ্য হবে?

—নির্ভয়ে খান। এ হচ্ছে পুদিনা পাতা বাটার সঙ্গে বিটনুন, চিনি আর একটু

গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি। তাছাড়া রয়েছে—আচ্ছা, আগে খেয়ে দেখুন—

চুমুক দিলাম। পুদিনার মেন্থলমার্কা গন্ধের সঙ্গে একটা যেন কেমন কেমন স্বাদ। বাবুলাল আশায় উজ্জ্বল চোখ নিয়ে প্রশংসা শোনবার জন্য তাকিয়ে আছে।

বললাম—বেশ হয়েছে। তবে কীসের একটা যেন গন্ধ, সিদ্ধি নয় তো?

—ছি ছি ছি! খিদে বাড়াবার নামে যারা সিদ্ধি খায় তারা ছোটলোক। নেশা করা তাদের আসল উদ্দেশ্য, খিদে বাড়ানোটা অজুহাত। না, সিদ্ধি নয়। আমি নিজে একটা ফর্মুলা ব্যবহার করে খুব উপকার পেয়েছি, তাই একটু মেশানো আছে—

আধ গ্লাস অ্যাপিটাইজার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে ঠক করে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললাম—জিনিসটা সেফ্ তো? কী মেশানো আছে এতে?

বাবুলাল বলল—ভয় পাবেন না, দেশি গাছ-গাছড়ায় কখনো কারো ক্ষতি হয় না। জিনিসটায় সামান্য ওলটকম্বলের পাতার রস মেশানো রয়েছে।

আঁতকে উঠে বললাম—সে কী! ওলটকম্বল তো কবিরাজী মতে জটিল স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়! যতদূর জানি আমার তেমন কোনো প্রব্লেম নেই। আমার কি এ খাওয়া উচিত হল?

নতুন পথ কেটে যারা বেরোয় সেই দেবোন্মাদ শহীদের চোখের আলো জ্বলজ্বল করছে বাবুলালের চোখে।

—কোনো চিন্তা নেই। আমি নিজে অন্তত দুশোবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। দারুণ খিদে বাড়ে। অবশ্য সেই সঙ্গে চুলও একটু তাড়াতাড়ি বাড়ে।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ। ওই আপনি যা বললেন, স্ত্রীরোগের ওষুধ হিসেবে হয়তো সেজন্যেই কাজে লাগে। এমন কিছু একটা কেমিক্যাল আছে যাতে দাড়ি গোঁফ চুল চটপট বাড়িয়ে দেয়। আমিই তো আগে দেড়মাস পৌনে দু'মাস অন্তর চুল কাটতাম, এখন বাইশ-তেইশ দিন অন্তর সেলুনে যাই। হাত-টাতগুলোও দেখুন, একটু বেশি লোমশ, না?

আগে খেয়াল করিনি, এখন ভাল করে তাকিয়ে মনে হল বাবুলালের চেহারায় হাল্কা বনমানুষ-বনমানুষ ভাব আছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—একদিন মাত্র খেলে বোধহয় অতটা প্রতিক্রিয়া হবে না, কী বলেন?

—সামান্য হবে, টের পাবেন না। ভয়ের কিছু নেই, বরং মাঝে মাঝে যদি খান তাহলে কোনোদিন টাক পড়ার ভয় থাকবে না। জিনিসটার পেটেন্ট নেব ভাবছি।

বাবুলাল একটু বাতিকগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু তার পাঁচন খাবার পর খিদেটা সত্যিই বেশ বেড়ে গেল। সেই কারণে, এবং তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বললাম—ক্রমে তো বেলা হচ্ছে, এবার খেয়ে নিলে হত না?

মিটিমিটি হেসে বাবুলাল বলল—খিদে পেয়ে গিয়েছে, না?

—তা, তা—

—জানি। পাবেই। আমার অনেকবার পরীক্ষা করা কিনা। আসুন, খাবার তৈরিই আছে।

ভেতরে ঢুকে বেশ সাজানো খাবার জায়গা। সানমাইকা বসানো টেবিলের ওপর ফুলদানিতে পাতাসুদ্ধ কৃষ্ণচূড়া ফুল, সরু মাদুরের কাঠি দিয়ে বোনা টেবল্ ম্যাট। পাতলা চিনেমাটির দামি প্লেট, পলকাটা কাচের গ্লাস। টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে অজস্র

ঢাকনা দেওয়া বিভিন্ন সাইজের চিনেমাটি আর স্টেনলেস স্টিলের পাত্র।

বাবুলাল বলল—পরিবেশন করবার লোকের অভাব, তাই সব একেবারে নিয়েই বসলাম। দরকার মত নিজেরাই নিয়ে নেব।

বললাম—বেশ তো।

মিনিকিট চালের সাদা ঝকঝকে ভাত, তার ওপরে সুগন্ধি কাঁচামুগের ডাল ঢেলে দিল বাবুলাল। কিন্তু ডালের মধ্যে এসব কী? বিচিত্র প্রকার পাতালতা, সবজি এবং আরও কীসব যেন ডালে ডুবন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে বাবুলাল বলল—ওতে বাঁধাকপির পাতা, কাটোয়ার ডাঁটা, রাজমার দানা আর কাঁঠালবিচি দেওয়া আছে। আইডিয়াটা বুঝেছেন? ডালকে ডাল, সবজিকে সবজি। এখনই কী, চালাতে থাকুন, আরও অনেক আইডিয়া পাবেন। আহা-হা, শুধু ডাল দিয়ে খাচ্ছেন কেন? এই নিন—

থকথকে কী পাতালতা সেদ্ধ আর খানকতক কী বড়াগোছের জিনিস পাতে তুলে দিল বাবুলাল। হেসে বলল—পালং শাক ভাতে। আর ওটা হচ্ছে গিমে শাকের বড়া। খান, ভাল লাগবে।

খেলাম। তারপর ছোট হাতা দিয়ে পাতে একটা কী ঘন চচ্চড়িমত জিনিস দিয়ে বাবুলাল বলল—এটা বেশি দিলাম না। এই জিনিসটা অল্পই খেতে হয়। খুব উপকারী।

—কী এটা?

—খেয়ে বলুন দিকি।

ভাতের সঙ্গে সামান্য মেখে মুখে দিতে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত কটকট করে উঠল। ভয়ানক তেতো! আমাকে কি বিষ খাওয়াল নাকি বাবুলাল? বাবুলাল দেখি হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রয়েছে।

—কী? কেমন লাগল?

আর কেমন লাগল! বললাম—কী খাওয়ালেন মশাই? বড্ড তেতো যে!

—তেতো তো হবেই। ও হচ্ছে ব্রাহ্মী শাক। স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। রোজ একটু একটু খেলে দেখবেন গতজন্মের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। গিমের বড়া কেমন লাগল?

ধরা গলায় বললাম—ভাল।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা আসুন, এবার একটু এটা চাখুন—

কুচোনো পটলভাজার মত দেখতে কী একটা জিনিস দু' চামচ থালায় তুলে দিল বাবুলাল।

—এটা—এটা কী?

—এ হচ্ছে তেলাকুচো ভাজা। বাজারে পাবেন না। আমার বাড়ির পেছনে নিজের খাবার জন্য কিছু লতা লাগিয়েছি। আপনি আসবেন বলে তার থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ভাজা। খান, খান, চর্মরোগের মহৌষধ—

তাও খেলাম। বাবুলাল বলল—কেমন? ভাল না? নিন, এবার হচ্ছে কণ্টিকারীর ফল ভাতে। বেশ করে সরষের তেল দিয়ে চটকে মাখুন। একটু কষা লাগতে পারে, কিন্তু মাইন্ড করবেন না। জিনিসটা রক্ত পরিষ্কারক। আচ্ছা, হয়েছে? তবে আর একটু রক্ত পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। জিনিস আলাদা, কিন্তু ফল একই। নিন—

পাতে পড়ল বড় বড় মরা চামচিকের ডানার মত বিচিত্রদর্শন কী পাতা। উঠে দৌড়ে পালিয়ে যাবার উপায় নেই, কারণ বেরুবার দরজার দিকেই বাবুলাল বসেছে। কপাল ঠুকে

দিলাম মুখে পুরে।

বাপ্‌রে! কী উৎকট স্বাদ আর বুনো গন্ধ। আমার মাথা ঘুরতে লাগল, চোখে জল এসে গেল। ক্ষীণকণ্ঠে কোনোমতে বললাম—কী খাওয়ালেন ভাই? কীসের পাতা এ?

নিজের রান্নার গৌরবে উৎসাহিত বাবুলাল বলল—চেনা চেনা লাগল না? এ হচ্ছে ঘেঁটুপাতার বাটিচচ্চড়ি। কাঁচা ঘেঁটুপাতা সামান্য ভাপিয়ে নিয়ে, তার ওপর তেল ছড়িয়ে দিয়ে—

পুরো রন্ধনপদ্ধতিটা বলে গেল বাবুলাল। শুনতে শুনতে আমিও অসাধ্যসাধন করলাম। সমস্ত চচ্চড়িটা খেয়ে ফেললাম। পেটে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কে জানে আর বাঁচব কিনা।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বাবুলাল বলল—একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে করছে কি? চাটনি খাবেন? দাঁড়ান, নেনুয়া শাক থেঁতো করে তার সঙ্গে জিরে ভাজার গুঁড়ো মিশিয়ে এটা কেমন হয়েছে দেখুন তো—

থপ্‌ করে থানকুনি বাটার মত খানিকটা থকথকে পদার্থ প্লেটে পড়ল।

এরপর এল সরষেবাটা দিয়ে কচুর লতি, তারপর ঘেঁটকোলের ঘণ্ট, পলতাপাতার ঝোল, সেদ্ধ করা কাঁচকলার খোসা বাটা দিয়ে ছোলা দিয়ে তৈরি মাখো মাখো তরকারি, আসশেওড়া ফলের টক—আরও অনেক অভোজ্য, অসম্ভব, অবাস্তব নিরামিষ পদ। শেষে যখন বাবুলাল একটা বাটির ঢাকনা খুলে বলল—'এবার আমি আপনাকে কচি বটপাতার'—তখন তাকে শেষ করবার সুযোগ না দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—আর না, কিছুতেই না। না, না, না!

অবাক হয়ে বাবুলাল বলল—এর মধ্যেই পেট ভরে গেল? যাঃ, তিনটে আইটেম তো খাওয়াই হল না—

সুস্থ, সবল, হাসিমুখ একজন মানুষ ঢুকেছিলাম বাবুলালের বাড়ি। বেরুলাম বিধ্বস্ত, কাঁদোকাঁদো একজন লোক। বাড়ি ফিরে তিনদিন শুধু বিছানায় শুয়ে পেটের ব্যথায় ছটফট করেছিলাম।

তারপর ধরল ডিসপেপসিয়ায়। সপ্তাহে তিনদিন দৌড়োতে লাগলাম ডাক্তারখানায়। চঞ্চল ডাক্তারের একতলা বাড়ি ছিল। আমার দৌলতে দোতলা হয়ে গেল। বিশ্বাস ফার্মেসি ব্রাঞ্চ খুলল নতুনবাজারে, এত অ্যান্টাসিড আর হজমের ওষুধ বিক্রি হল তাদের। আমার চুল ঝরে টাক পড়ল, গাল তুবড়ে গেল, পেট মোটা হয়ে হাত-পা লিকলিকে হয়ে গেল। এমন সময় একদিন বাবুলালের সঙ্গে পথে দেখা। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল—বাঃ, বেশ ফ্রেশ আর স্লিম দেখাচ্ছে। আবার কবে আসছেন বলুন—নতুন নতুন সব রান্না শিখেছি, খাওয়াবো।

হাত

পা টান টান করে শরীরটা বেতের আরাম কেদারায় লম্বা করে মেলে দিয়ে সমরেন্দ্রনাথ বললেন—আঃ। তারপর জোরে ডাকলেন—ভজু, এই ভজু।

—আভি আয়া ডাগদরসাব—

বনবাংলোর চৌকিদার হিসেবে ভজু বা ভজনরাম একটু ধীরগতি হলেও সে রাঁধে অসাধারণ। লোকটাও সৎ এবং বাধ্য। কয়েকবার বনবিভাগের রেঞ্জারের গাড়িতে ওর বৌকে দেখাবার জন্য চক্রধরপুরে সমরেন্দ্রনাথের চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা করে ভজুর স্ত্রীকে ভাল করে দিয়েছিলেন সমরেন্দ্রনাথ। ফলে মাঝে মাঝে কাজের চাপ থেকে ছুটি নিয়ে এখানে বেড়াতে এলে ভজনরাম প্রাণপণে তাঁর সেবা করে।

ভজনরাম এসে দাঁড়িয়ে বলল—আপনে বুলায়া ডাগদারসাব?

—বাপু ভজু, তোমার কি খেয়াল আছে আমি লাস্ট চা খেয়েছি দু-ঘণ্টা আগে? আজকের সন্ধেটা কেমন সুন্দর দেখেছ? চাঁদ-টাঁদ উঠে এক্কেবারে দারুণ লাগছে। এখুনি আমার এক কাপ চা দরকার। চা খেতে খেতে আমি জীবনানন্দের কাব্যপাঠ করব। ব্যাপারটা সমঝা? আচ্ছা, সে আমার বুঝে প্রয়োজন নেই, তুমি চা আনো। আর রাত্তিরে কেবল ভাত আর ডিমের ডালনা বানাও। দুটো ডিম—

—বহুৎ খুব, ডাগদারসাহেব—

ভজু চা বানাতে চলে যাচ্ছিল, সমরেন্দ্রনাথ ডাকলেন—এই, শোনো—

ভজু ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—জী?

—চারটে ডিম। ফোর।

চার আঙুল তুলে দেখালেন সমরেন্দ্রনাথ।

ভজু নির্বিকার। —বহুৎ খুব, সাব।

কোলহান ডিভিশনের এই বনবাংলোর অবস্থান ভারি সুন্দর জায়গায়। চারদিকে সারান্ডা বনভূমির নিবিড় সবুজ বিস্তার। সামনেই জমি ঢালু হয়ে গিয়ে মিশেছে নিচের ছোট্ট উপত্যকায়, আবার ঠেলে উঠেছে ওপাশের দিগন্তে টিলার রূপ ধরে। সদ্যোদিত চৈত্র পূর্ণিমার চাঁদ মায়াময় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে যেন ফ্রেমে বাঁধা সমস্ত দৃশ্যটার ওপর। একটা কোৎরা হরিণ ডেকে উঠল কোথায়, ওপারের পাহাড়ে তার ডাকের প্রতিধ্বনি হল। ডাকটা শুনে মনে পড়ল বহু বছর আগে চল্লিশের দশকে এই বিশেষ বনবাংলোতে কয়েকবার এসেছিলেন বিভূতিভূষণ। তিনিও তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন বার্কিং ডিয়ার, অর্থাৎ কোৎরা হরিণের ডাকের কথা। সেদিন যে হরিণটা ডেকেছিল সে কি জানত বিভূতিভূষণ তাকে তাঁর রচনায় অমর করে যাবেন?

বাইরে কয়েকজনের গলার আওয়াজ—ভজুয়া, ভজুয়া হো—

এই জঙ্গলের মধ্যে এরা আবার কারা? এলোই বা কোথা দিয়ে? বাংলোর পেছনদিকের সরু পাকদণ্ডি দিয়ে উঠে এসেছে বোধ হয়। ওদিকে কিছুদূরে একটা আদিবাসী গ্রাম আছে বলে শুনেছেন। তারাই কী?

ভজুর গলা—ক্যা হুইস্ হ্যায় ভাই এব্রাহাম?

আব্রাহাম নামক ব্যক্তির কণ্ঠ—ডাগদারসাব আইস্ হ্যায় না? উনসে মিলনা হ্যায়—

সমরেন্দ্রনাথ একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেললেন। গেল অরণ্যের শান্তি উপভোগ, জ্যোৎস্না আর জীবনানন্দের কবিতা। তিনি আসলে ঢেঁকি, স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হবে। নিশ্চয় ওদের গ্রামে কেউ অসুস্থ, তাই ডাকতে এসেছে। কোনো ভাবে খবর পেয়ে থাকবে তিনি আজ দুপুরে এসেছেন। যেতেই হবে, রোগীর ডাক উপেক্ষা করে তো কাব্য করতে পারবেন না। যেখানেই যান না কেন, এরকম পরিস্থিতির জন্য তাঁর সঙ্গে চিকিৎসার সরঞ্জাম আর ওষুধভর্তি একটা ব্যাগ থাকে। দেখা যাক কী জন্য এসেছে এরা।

ভজনরাম এসে বলল—সাব, বিটকেলসোয়া বস্তি থেকে কজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এখানে ডেকে আনব?

—আনো। কী চায় তারা?

—বুঝতে পারছি না সাব। জিজ্ঞাসা করলে আবোলতাবোল বকছে।

—সে আবার কী? আচ্ছা, ডাকো—

একটু পরে তিনজন লোক এসে সমরেন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়াল। দুজন যুবক, একজন প্রৌঢ়। একজনের কাঁধে গাঁইতি, একজনের হাতে লাঠি, একজনের লণ্ঠন। সমরেন্দ্রনাথ বললেন—আব্রাহাম কার নাম?

প্রৌঢ় লোকটি বলল—আমার নাম সাব। আব্রাহাম কারকাট্টা।

—কী চাও তোমরা? তোমাদের গ্রামে কারো অসুখ করেছে?

—না সাব। আমরা বনবিভাগের রাস্তা তৈরি করছি। এখান থেকে কুমডি পর্যন্ত একটা নতুন রাস্তা হচ্ছে, এটা হয়ে গেলে আর ঘুরপথে কুমডি যেতে হবে না। কাজ সেরে গ্রামে ফেরবার পথে বনের মধ্যে আমরা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেয়েছি—সেইজন্য এলাম।

সমরেন্দ্রনাথের কৌতূহল উদ্রিক্ত হল। কী এমন জিনিস দেখেছে এরা যে, বাড়ি না ফিরে তাঁর কাছে ছুটে এসেছে? তিনি বললেন—কী দেখেছ? কী অদ্ভুত জিনিস?

—জঙ্গলের ভেতর একটা লোক পড়ে আছে সাব, তার কথা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। পাশে একটা কী যন্ত্র ভেঙে পড়ে আছে—কাঁচ দিয়ে ঢাকা হাওয়াগাড়ির মত দেখতে।

—কথা বুঝতে পারছ না কেন? কী ভাষায় কথা বলছে সে?

—জানি না ডাগদরসাব। আর লোকটাও ঠিক—ঠিক মানুষের মত দেখতে না।

মানুষের মত দেখতে নয়! পাশে আবার একটা ভাঙা যন্ত্র পড়ে আছে! সমরেন্দ্রনাথ উঠে পড়লেন, বললেন—চলো, আমি যাচ্ছি—

আব্রাহামের একজন সঙ্গী ওষুধের সুটকেস বয়ে নিয়ে চলল। টর্চ হাতে জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন সমরেন্দ্রনাথ। সামান্য চড়াই ভাঙতে হচ্ছে, কিন্তু নিয়মিত শারীরীক পরিশ্রম করায় তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল। জ্যোৎস্না আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে, কী একটা নিশাচর পাখি ডাকছে নিচের বনে। সমস্ত পরিবেশে মায়াময় শান্তি মাখানো। কী দেখেছে আব্রাহাম আর তার সঙ্গীরা?

বাংলো থেকে মিনিটদশেক হাঁটার পর পথের ধারে একটা জায়গা দেখিয়ে আব্রাহাম বলল, এই যে, এখানে—

ঝোপের ফাঁক দিয়ে তাকিয়েই সমরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন তিনি জীবনের সবচেয়ে

বড় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, এবং আব্রাহাম কারকাট্টার নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

যে প্রাণীটি পাথরে হেলান দিয়ে অবসন্নভাবে বসে রয়েছে, সে পৃথিবীর অধিবাসী হতেই পারে না। মানুষের সঙ্গে অনেকটা গঠনগত মিল থাকলেও তার ওষ্ঠহীন বিরাট মাথা, নিষ্পলক বড় বড় চোখ, হাত-পায়ের জায়গায় কয়েকটি শুঁড়ের মত ব্যাপার পার্থিব প্রাণীদের থেকে তার পার্থক্য সূচিত করছে। পাশেই পড়ে আছে হেলিকপ্টারের কাঁচের ডোমটার মত একটা ছোট্ট যন্ত্র। পতনের বেগে তার কাঁচে—বা যে জিনিস দিয়েই সেটা তৈরি হোক—তাকে কয়েকটা ফাটল ধরেছে। প্রাণীটি অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

এই গভীর বিস্ময় এবং চমক সত্ত্বেও সমরেন্দ্রনাথের দাঁতে দাঁত লেগে গেল না, বা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল না। তিনি ভুললেন না যে, আসলে তিনি ঢেঁকি। সুটকেস মাটিতে রেখে ঝট করে স্টেথোসস্কোপ বের করে কানে লাগালেন। কিন্তু চেস্ট পিস বসাবেন কোথায়? এ প্রাণীর শারীরসংস্থান কেমন, হৃৎপিণ্ড আছে কি? থাকলে শরীরের কোন অংশে? যাই হোক, খুঁজে নেওয়া যাবে। আন্দাজমত বুক নাগাদ স্টেথো বসালেন। প্রথমে চেস্ট পিসের ডায়াফ্রামে সোয়েডের মত খসখসে চামড়ার কর্কশ শব্দ, তারপর নির্ভুলভাবে হৃদপিণ্ডের স্পষ্ট স্পন্দন। একটু দ্রুত, তবে প্রাণীটি আকৃতিতে মানুষের চেয়ে ছোট। সেক্ষেত্রে হার্ট বিট একটু বেশি দ্রুত হওয়াই সম্ভব। নাঃ, এক্ষুনি খারাপ কিছু হবে বলে মনে হয় না।

—তোমার কাছে পারমাণবিক ওজন তালিকায় এক, বারো আর ষোলো স্থানাঙ্কের মৌল মেশানো কোনো ওষুধ আছে?

সমরেন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললেন—অ্যাঁ? কে? কী?

আব্রাহাম আর তার সঙ্গীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারা কোনো কথা বলেনি। সমরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন প্রশ্নটা তিনি কান দিয়ে শোনেন নি, সেটি সরাসরি ভেসে উঠেছে তাঁর মনে। বাংলা ভাষায় নয়, চিন্তার ভাষা হিসেবে। কেমিস্ট্রিতে খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, বা ভাবলেন—আবার বলো—

—পারমাণবিক ওজন। স্থানাঙ্ক এক, বারো, ষোলো।

সমরেন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন—হাইড্রোজেন, কার্বন আর অক্সিজেন। বেশ, প্রাণীটি কোনো ধরনের হাইড্রোকার্বনের কথা বলছে। কিন্তু কী যৌগ?

তিনি চিন্তাপ্রক্ষেপের চেষ্টা করলেন—যৌগটির অণুশৃঙ্খলের গঠন বলতে পারবে? ধীরে ধীরে বলো—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসতে শুরু করল। সমরেন্দ্রনাথ চোখ বুঁজে শুনলেন।

মরফিন। প্রাণীটি ব্যথা কমানোর ওষুধ মরফিনের কথা বলছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি আঘাত লেগেছে? ব্যথা হচ্ছে খুব?

—হ্যাঁ। তুমি ওষুধটা দাও।

ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ নিয়ে মরফিনের ভায়াল থেকে ওষুধ টানলেন সমরেন্দ্রনাথ, একটা শুঁড়ের গোড়ার দিকে পুশ করে দিলেন। মিনিট দুই তিনের মধ্যে তাঁর মনে একধরনের শান্তি আর তৃপ্তির ভাব ছড়িয়ে পড়ল। মানে প্রাণীটির ব্যথা কমে যাচ্ছে, সেটা সে বোঝাবার চেষ্টা করছে শান্তির মনোভাব প্রসারিত করে।

সমরেন্দ্রনাথ আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা, তোমরা এবার বাড়ি যাও তাহলে। এর জন্য চিন্তা নেই। একে চাঙ্গা করে আমি শহরে পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকে ও নিজের দেশে ফিরে যাবে। যাও তোমরা—

যেতে গিয়েও আব্রাহাম ফিরে তাকিয়ে বলল—কোথাকার আদমি এটা ডাগদারসাব? কোন দেশে বাড়ি?

সমরেন্দ্রনাথ মাথা চুলকে বললেন—আরে, এ হচ্ছে—ইয়ে, ওই আমেরিকার পাশেই ইউনিভার্স বলে দেশ আছে না, সেখানকার মানুষ।

সরল আদিবাসী তিনজন বুঝদারের মত মাথা নাড়ল, বলল—আমরাও তাই আন্দাজ করেছিলাম। আচ্ছা ডাক্তারসাব, আসি।

সমরেন্দ্রনাথ আবার স্টেথো বসালেন। এবার হৃদস্পন্দন একটু কমে গিয়েছে। অর্থাৎ ইনজেকশনের ফলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভাল।

পেছন থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে কেউ তাকিয়ে থাকলে কোনো কাজ করা যায় না, খুব অস্বস্তি লাগে। তাই ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে পারবেন বলে গ্রামের মানুষদের তিনি সরিয়ে দিলেন। কিন্তু এবার কী করবেন? এখন অবশ্য অন্য নক্ষত্রলোক থেকে আসা প্রাণীটিকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে, শক সামলে নেবার সুযোগ দিতে হবে। ততক্ষণ পাশে বসে কথা বলা যেতে পারে। পরে দরকারমত ভজুকে ডেকে নেওয়া যাবে।

—তুমি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো বন্ধু।

কান দিয়ে না শোনার চমকটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। সমরেন্দ্রনাথ আবার সামান্য চমকে বললেন—অ্যাঁ? কী?

—তুমি ব্যথা কমিয়ে আমাকে শান্তি দিয়েছ। তুমি আমার বন্ধু।

—তুমি—তোমাদের জগতেও 'বন্ধু' বলে ব্যাপার আছে? ভালবাসা?

প্রাণীটির চোখ স্থিরভাবে ডাক্তারের দিকে নিবদ্ধ হল। সে বলল—'সভ্যতা আছে, বিজ্ঞান আছে, অথচ বন্ধুত্ব আর ভালবাসা নেই—তা আবার হয় নাকি?

ঠিকই তো, হয় না। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

—তুমি কি খুব বেশি আঘাত পেয়েছ? আমি তো তোমার শরীরের গঠন ঠিক জানি না—

—এই শরীরটা আর চলবে না, এটা বদলে নিতে হবে। আমি এখন অতিরিক্ত শক্তি ভাণ্ডার থেকে ধার নিয়ে চালাচ্ছি। ততক্ষণ তোমার অনুগ্রহে ব্যথাটা ভোগ করতে হল না।

—শরীর বদলে নেবে মানে? সেটা কীভাবে হয়?

—ও, তোমরা বুঝি ওটা এখনো পারো না? শরীর কোনোভাবে অকেজো বা পঙ্গু হয়ে গেলে আমাদের চিকিৎসকরা ভাঙা শরীর থেকে বুদ্ধি আর চেতনাটা বের করে নিয়ে নতুন একটা খোলসের মধ্যে পুরে দেন। নইলে তো মারা পড়তে হবে—

ক্ষীণ গলায় ডাক্তার বললেন—ও। তা, ইয়ে—তোমাদের মৃত্যু নেই?

গ্রহান্তরের বন্ধুর মুখগহ্বরের কাছ থেকে পুরনো কাপড় ছেঁড়ার মত একধরনের শব্দ ভেসে এল। বোধহয় হাসি। সে বলল—আছে বইকি, মৃত্যু বাদ দিয়ে জীবন সম্পূর্ণ হয় না। বেশ কিছুদিন বাঁচার পর আমরা পরের প্রজন্মকে স্থান করে দেবার জন্য যন্ত্রণাহীন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিই। আমার এখনো সে সময় হয়নি।

—এখানে, এই অবস্থায় কী করে দেহ বদলে সুস্থ হবে তুমি? এ গ্রহে তো তেমন—

—তার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আমাদের মূল মহাকাশযান তোমাদের উপগ্রহ চন্দ্রের কক্ষপথে ভেসে আছে। আমি একটা নিরীক্ষাযান নিয়ে এই গ্রহটা দেখতে নেমেছিলাম। সেটা খারাপ হয়ে এখানে ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অতিসংকেতের মাধ্যমে আমার সঙ্গীদের খবর দিয়ে দিয়েছি। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে—

—এত তাড়াতাড়ি?

আবার পুরনো কাপড় ছেঁড়ার মত শব্দ।

—আমাদের দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা আছে।

নিশাচর পাখিটা একটানা ডেকেই চলেছে। অসংখ্য নক্ষত্রে ভরে আছে সমস্ত আকাশ। ওরই কোথাও থেকে এসেছে তাঁর মহাবিশ্বের বন্ধু। অথবা তাও নয়, তার নক্ষত্রলোক হয়তো পৃথিবী থেকে দেখাই যায় না। এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, কেউ খবর পেল না, একজন সাংবাদিকও এলো না, ছবি তোলা হল না। কিম্বা এই হয়তো ভাল। লোকজন ছুটে এলে, ভিড় জমে গেলে এ বেচারির আর নিজের দেশে ফেরা হত না।

সমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কেন এসেছ আমাদের গ্রহে? কী চাও তোমরা?

প্রাণীটির মুখ ভাবলেশহীন, মানুষী কোনো আবেগ তাতে প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু সে বড় বড় চোখ করে আশ্চর্য সরলভাবে তাকাতে পারে। সেইরকম ভাবে তাকিয়ে গ্রহান্তরের বন্ধু বলল—শান্তির বার্তা নিয়ে। জয় করতে বা শোষণ করতে নয়। বহুদিন আগেই আমরা পঞ্চভূত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে শিখেছি। কাজেই কাঁচামাল বা খনিজ পদার্থের জন্য আমাদের আর কোনো চাহিদা নেই। আমরা এসেছি বেড়াতে, নতুন দেশ দেখতে—

—আর বন্ধুত্ব করতে?

—আর বন্ধুত্ব করতে।

গ্রহান্তরের প্রাণী একবার আকাশের দিকে তাকাল, বলল—আমার সঙ্গীরা প্রায় এসে গিয়েছে। তোমাকে একটা জিনিস উপহার হিসেবে দিয়ে যাই, আমাদের দেশে প্রথম আলাপে পরস্পরকে কিছু উপহার দিতে হয়। এই নাও—

একটা কালো এবোনাইটের তৈরি কিউবমত জিনিস শুঁড়ের ডগায় করে সমরেন্দ্রনাথের হাতে দিল বন্ধু। জিনিসটা দেখতে কালোরঙের চৌকো পেপারওয়েটের মত। বন্ধু বলল—এটা একধরনের কর্মসহায়ক যন্ত্র। তোমরা তো ছবি আর শব্দ পাঠানোর কৌশল আবিষ্কার করেছ? কী নাম বললে? দূরদর্শন? ওই ছবির বাক্সের পাশে এটা রেখে চালু করলে পর্দায় তোমার প্রার্থিত সমস্ত তথ্য মুহূর্তে ভেসে উঠবে—তোমার মাতৃভাষায় অনূদিত হয়ে।

বটে! জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সমরেন্দ্রনাথ বললেন—এটা চালু করব কী করে? এর তো বোতাম-টোতাম কিছুই দেখছি না—

—কিছু দরকার হবে না। তোমার মস্তিষ্কের আলফাতরঙ্গের সঙ্গে এই যন্ত্র একই কম্পনসংখ্যায় বেঁধে দিলাম। তুমি শুধু ইচ্ছা করলেই এটা চালু হয়ে যাবে, অন্য কেউ চালু করতে পারবে না। তোমার দেহ নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ভেঙে বা খুলে ভেতরে কী আছে দেখার চেষ্টা কোরো না। ওর ভেতরে কিছুই নেই। একটি মহাগণকযন্ত্রের গঠন এবং মালমশলা সম্বন্ধে উপলব্ধিটা ওর উপাদানের ভেতর ভরা

আছে। মূল যন্ত্রটা রয়েছে অন্য জায়গায়, মহাকাশের গভীরে। এটা ক্ষুদ্রায়িত যোগাযোগ কেন্দ্র মাত্র।

একটা স্নিগ্ধ আলোকবৃত্ত হঠাৎ জেগে উঠল তাঁদের দুজনের শরীর ঘিরে। সমরেন্দ্রনাথ ওপরে তাকিয়ে দেখলেন কখন নিঃশব্দে মাথার ওপরে ভেসে এসেছে মহাশূন্য থেকে আসা আগন্তুকদের বিশাল যান। তিনি বললেন—বন্ধু, আমাদের মধ্যেও আপনজনকে প্রীতি উপহার দেবার রীতি আছে। কিন্তু তোমাকে আর কী দেব, তুমি বরং এইটে ধরো, নাও—

গ্রহান্তরের বন্ধুর শুঁড়ের মধ্যে নিজের খালি হাতটা গুঁজে দিলেন সমরেন্দ্রনাথ।

মনোহর, ও মনোহর

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল মনোহর।

ডাকটা এখনো যেন পুরো মিলিয়ে যায়নি, বাতাসে তার প্রতিধ্বনি রয়েছে। দরজার বাইরে থেকে, কিম্বা ঘরের ভেতরেই কে যেন তাকে ডাকছিল—মনোহর, ও মনোহর—

বড্ড ভ্যাপসা গরম আজ। মশারীর মধ্যে বাতাস ঢোকেনা, তার ওপর আবার চালের যে ফুটোটা আপাতত বন্ধ করার জন্য সেফটিপিন দিয়ে আটকানো ছিল, সেটা খুলে আবার হাঁ হয়ে গিয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকছে অজস্র মশা। গরমে আর মশার কামড়েই ঘুম ভেঙেছে নিশ্চয়, এত রাতে কে ডাকবে তাকে?

কমলা ঘুম ভেঙে অবাক চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। মনোহর জেগে কেন এত রাতে?

—কী হয়েছে গো? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

—না না, কিছু না। তুমি ঘুমোও, মশার কামড়ে জেগে গিয়েছি, আর যা গরম!

স্ত্রীর কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য সে চটাস চটাস করে কয়েকটা কাল্পনিক মশা মারল, তারপর বলল—তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, আমি একটু বাইরে যাব—

কমলা সরল মেয়ে, তার ঘুমও খুব গভীর, স্বামী বিছানা থেকে নামতে না নামতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বারান্দায় রাখা কাঠের চেয়ারটায় মনোহর এসে বসল। এখানে একটু ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। উঠোনের নিমগাছটার পাতা কাঁপছে থিরথির করে। আজ চন্দ্রহীন রাত্রি, কিন্তু তবু নক্ষত্রের আবছা আলোয় পৃথিবীকে একটু একটু চেনা যায়। অথবা চেনা যায় কি? তার পরিচিত পৃথিবীটা কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে আজ কদিন। সে কাউকে বলেনি, কমলাকেও না।

গঞ্জের মোড়ে তার মুদিখানার দোকান। এমন কিছু বড় না হলেও সবই পাওয়া যায় সেখানে। চাল ডাল তেল মশলা থেকে লবেঞ্চুস খাতা-পেনসিল আশ্চর্য মলম—সব। ছোট সংসার, বৌ ছেলে আর বুড়ি মা, ভাল চলে যায়। হাতে দু পয়সা জমেও। পয়সা করার কায়দাটা সে জানে। কিন্তু বর্তমানে সে বড় মুশকিলে পড়েছে, তার কায়দাগুলো আর কাজ দিচ্ছে না।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল আজ থেকে মাসখানেক আগে, হঠাৎই। এমন কী, মনোহর বুঝতেও পারেনি এ ধরনের কিছু ঘটতে চলেছে। নিঃশব্দে তার জীবনে এতবড় অদল-বদলটা ঘটে গেল।

সন্ধের দিক, কিছুক্ষণ আগে সারাদিন কাঠফাটা গরমের পর তুমুল কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে চারদিক ঠাণ্ডা হয়েছে, বৃষ্টিও হয়েছে একপশলা। দোকানের ঢালু টিনের চাল বেয়ে সামনের রাস্তায় টিপটিপ করে জল ঝরে পড়ছে। ঝড়বৃষ্টি হলে সাধারণত এদিকে লোডশেডিং হয়ে যায়। তেলের বড বাতিটা জ্বেলে বাঁশের আড়া থেকে ঝোলা লোহার হুকে টাঙিয়ে দিয়েছে মনোহর। আজ আর বিশেষ খদ্দের হবে বলে মনে হয় না, হিসেব মিলিয়ে দোকান বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

এমন সময় মাথায় ছাতি ধরে হাতে চটের বড় ব্যাগ নিয়ে জিনিস কিনতে এল বোকা চক্কোত্তি। বোকা চক্কোত্তির আসল নাম বোধহয় বিষ্ণু বা রাম চক্রবর্তী কিছু হবে, কিন্তু পাড়ার লোক তাকে সে নামে কখনো ডাকে না। লোকটা একটু উদোমার্কা, কাছাখোলা। মুখে সবসময় বোকাটে হাসি, দেখা হলেই সবাইকে নমস্কার করে গদগদ স্বরে বলে—'বেশ ভাল আছেন তো? বাড়ির সবাই ভাল?' চালচলন থপথপে, আনাড়ি মত। দুহাতে ব্যাগ ধরে হাঁটতে গেলে লুঙ্গির কষি খুলে যাবার উপক্রম হয়। বোকা চক্কোত্তি হলুদবেড়ে-পলাশপুর লাইনের বাসের টাইমকিপার। ছোট্ট গুমটিতে সামনে টেবিলঘড়ি নিয়ে বসে থাকে, সময় দেখে, হুইস্‌ল্ বাজায়। হপ্তার মাইনে পেলে সন্ধেবেলা ব্যাগ নিয়ে সওদা করতে আসে। তাকে দেখলে ভারি খুশি হয় মনোহর। বোকা চক্কোত্তিকে ঠকানো খুব সোজা, অন্য খদ্দেরকে ওজনে কম দেবার সময় গালগল্পে ভুলিয়ে রাখতে হয়, এর বেলা সে ঝামেলা নেই। কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকলেও বুঝতে পারবে না তাকে ঠকানো হচ্ছে। আজ পর্যন্ত মনোহরের দোকানে কোনো জিনিসে বোকা চক্কোত্তি কিলোতে আটশো কি সাড়ে-আটশো গ্রামের বেশি পায়নি। সে এলেই মনোহর চিঁড়ে আর মুড়ির বস্তার ফাঁকে লুকিয়ে রাখা বাটখারার দু নম্বরি সেটটা বের করে, যেগুলোর প্রত্যেকটার নিচে অনেকখানি করে লোহা খুবলে বের করা আছে। তার ওপরে আবার হাতের কায়দাও কাজে লাগায়, কাঁটা সমান হবার আগেই কড়ে আঙুলের সামান্য টোকা—ব্যস পঞ্চাশ গ্রাম ঘরে চলে আসে। আটশো গ্রাম মেপে ঠোঙায় বেঁধে সামনে রেখে বলে—এই রইল এককিলো মুসুরির ডাল। তারপর বলো—

—আড়াইশো মুগ, একপাল্লা মিডিয়াম চাল, এককিলো নুন, পাঁচশো সর্ষের তেল—

জমাট লাভ। খুশিমনে মাল-ওজন করতে করতে গল্প করে মনোহর।

আজ অন্যরকম হয়ে গেল।

বোকা চক্কোত্তি এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, তার মুখে চিরচেনা বোকাটে হাসি, তালিমারা ছাতার শিক দিয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসছে, পরনে আধময়লা খদ্দরের ঘেমো গেঞ্জি।

চক্কোত্তি বলল—ভাল আছ মনোহর? এই—হপ্তার মাল নিতে এলাম—

'খুট' করে মাথার ভেতর কী যেন একটা শব্দ হল মনোহরের। কিম্বা ঠিক যে মাথার ভেতর তা নয়, চেতনার ভেতর কোথায় শব্দটা হল। সঙ্গে সঙ্গে—

সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা অদল-বদল হয়ে গেল তার জীবনে। খুব সূক্ষ্ম বদল, প্রথমে তো সে বুঝতেই পারেনি কী হয়েছে। কিন্তু সবকিছু আর আগের মত রইল না।

—কী হল মনোহর? শরীর কি খারাপ লাগছে নাকি?

একটু চমকে মনোহর বলল—অ্যাঁ? না, শরীর ঠিক আছে। কী দেবো বলো—

তারপর কী অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হল! চক্কোত্তি বলছে, সে মাল মেপে যাচ্ছে, কিন্তু মাপছে একনম্বরি ঠিকঠাক বাটখারা দিয়েই। সে কয়েকবার চেষ্টা করল চিঁড়ে আর মুড়ির বস্তার ফাঁক থেকে দু নম্বর সেটটা বের করতে, কিন্তু তার হাত কে চেপে ধরল। চেষ্টা করল কড়ে আঙুলের টোকায় পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর গ্রাম এদিক ওদিক করতে। হল না। আঙুলে যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। গুঁড়ো মশলার প্যাকেটে যা দাম লেখা আছে তাই নিল, অন্যবারের মত লোকাল ট্যাক্স্ বলে বাড়তি পয়সা নিতে পারল না। কী বিপদ! মন চাইছে পুরনো অভ্যেসমত দোকানদারি করতে, আর কে যেন তার স্বাধীন ইচ্ছের ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে দিয়েছে।

ঠোঙা আর প্যাকেটগুলো ব্যাগে ভরতে ভরতে চক্কোত্তি বলল—আজ কি ভুল ওজন দিলে নাকি হে? বেশ ভারী ঠেকছে। গুঁড়ো মশলার দামও কি কমেছে নাকি?

কোনরকমে মনোহর বলল—লোকাল ট্যাকস উঠে গিয়েছে, এখন ওই দামেই পাবে—

কাঁধ আর গলার খাঁজে ছাতিটা আটকে রেখে কতগুলো ময়লা নোট আর খুচরো গুনতে গুনতে চক্কোত্তি খুশির হাসি হাসল, বলল—তুমি লোকটা ভাল মনোহর, তোমার দোকানে ঠিক ঠিক ওজন পাওয়া যায়, জিনিসপত্রের দাম কখনো বেশি নাও না, আবার সিগ্রেট দিয়ে খাতির করো। কই, আজ দিলে না তো?

চারমিনারের প্যাকেটটা চক্কোত্তির দিকে বাড়িয়ে দেয় মনোহর। চক্কোত্তি প্যাকেট খুলে বলে—এতে দুটো আছে। একখানা নিলাম, এই নাও ভাই—

—আপনি দুটোই রাখুন। এই নিন দেশলাই।

সবল তৃপ্তিতে চক্কোত্তি হেসে বলে—তুমি সত্যি ভাল লোক, খুব ভাল লোক—

হাসবার চেষ্টা করে মনোহব। অনিচ্ছার হাসিতে তাব মুখখানা অস্বাভাবিক দেখায়। ভাল লোকই বটে। গত আট-দশ বছর তোমাকে ঠকাচ্ছি চক্কোত্তি, শুধু সিগ্রেট খাইয়ে কতদিনে সে ঠকানোর দাম শোধ হবে?

অন্যমনস্কভাবে হিসেব মেলাতে বসে মনোহর, তারপর দোকান বন্ধ করে। বন্ধ করার ঠিক মুখে হারু নন্দীর ছোট মেয়েটা মুড়ি, সাবু আর চিনি কিনতে আসে। ছুতোরের কাজ করে সংসার চালায় হারু। ছেলেটা জন্ম থেকে জড়বুদ্ধি, বড় হয়ে বাপের সহায় হতে পারবে না। বউ কাহিল, রুগীমানুষ। এই মেয়েটাই এতটুকু বয়েসে সংসার দেখে, রান্না করে। ওর কি কোনদিন বিয়ে দিতে পারবে ওর বাপ? বড় দুঃখী মানুষ হারু।

অন্যদিন এই মেয়েটা এলে মনোহর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—'কী চাই রে?' সামান্য জিনিসের খদ্দের, বেশি খাতির করার প্রয়োজন কী? আজ সে বলল—কী চাই মা?

—মুড়ি, সাবু আর চিনি—

—সাবু কেন? রাত্তিরে সাবু কে খাবে?

এত ঘনিষ্ঠতা বা স্নেহ এই মানুষটির কাছে সে কখনো পায়নি। মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলল—মায়ের জ্বর হয়েছে, রাত্তিরে ভাত খাবে না, তাই—

জিনিস মেপে একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে দিল মনোহর। মেয়েটা চলে যাচ্ছিল, মনোহর তাকে ডেকে বলল—দাঁড়াও একটু।

কাঁচের বয়ামে নানারকম লজেন্স্ বিস্কুট সাজানো আছে। কমদামী এবড়োখেবড়ো জিনিস না নিয়ে মনোহর রঙিন কাগজে মোড়া লর্ড কোম্পানির টাকায় দুটো দামের লজেন্স্ বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল—এই নাও—

মেয়েটি বলল—লজেন্‌স্ লাগবে না তো—

—না, আমি এমনি দিচ্ছি, নাও—

ফ্রকের সেফটিপিনটা হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে হারুর মেয়ে বলল—আমার আর পয়সা নেই।

—পয়সা লাগবে কেন? আমি তোমাকে এমনি খেতে দিচ্ছি, নাও—

হাতের মুঠোয় লজেন্‌স্ ধরে মেয়েটি যখন ফিরে চলে যাচ্ছে, তখন, সেই টিপটিপ বৃষ্টিঝরা অন্ধকার সন্ধ্যায়, মনোহর প্রথম ডাকটা শুনতে পেয়েছিল। দোকানের ভেতরে না, বাইরে না, আকাশে-বাতাসে না—কোথায় কোন গহন অজানা দেশ থেকে ডাক এলো—মনোহর, মনোহর!

ভয় হওয়া উচিত ছিল, হল না। কেননা যে ডাকছে, সে মানুষটাকে ডাকের মধ্যে দিয়ে চেনা যায়। খুব নরম, খুব কাছের কেউ, তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

দোকান বন্ধ করে বাড়ির পথ ধরল মনোহর। উকিলপাড়ার মোড় ঘুরেই সিদ্ধেশ্বরী কালীতলা মন্দিরের চাতালে বসে সেবাইত সাধন ভটচায, গায়ে নামাবলী, দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকোচ্ছে।

—কী মনোহর? দোকান বন্ধ করলে?

—হ্যাঁ ভটচায মশাই, বাদলার দিন, তায় আলো গেল নিবে। আজ আর খদ্দের হবে না—

—এসো, বোসো এখানে, একটা বিড়ি খেয়ে যাও। এত তাড়া কিসের?

মন্দিরের পুরোহিত এবং বয়েসে বড় হওয়া সত্ত্বেও সাধন ভটচায মনোহরকে একটু সমীহ করেন। দরকারে অদরকারে ব্যবসাদার মানুষের সাহায্য নিতে হয়, ক্ষমতাবান লোক চটিয়ে সংসারে বাস করা যায় না। প্রায়দিনই মনোহর সাধনের আহ্বান এড়িয়ে যায়, আজ বসল। সাধন টিনের কৌটো থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করে এগিয়ে ধরলেন—নাও, ধরাও।

অন্যমনস্কভাবে বিড়ি নিয়ে ধরাল মনোহর। বাদলায় দেশলাইয়ের বারুদ নরম হয়ে গেছে, তিনটে কাঠি লাগল ধরাতে। দেশলাই ফেরৎ দিতে দিতে সে বলল—ভটচায মশাই, আপনার কতদিন হল এ মন্দিরে?

—কেন বলো তো? তা, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তো আছিই, সেই ভবেশ আচার্যর পর থেকে—

—সিদ্ধেশ্বরী মাকে কখনো ভোগ খেতে দেখেছেন?

সাধন ভটচায অবাক হয়ে তাকালেন। —অ্যাঁ?

—ভোগ উৎসর্গ করলে কখনো কমে যেতে দেখেছেন? নকুলদানা? ফলমূল?

বিপন্নমুখে সাধন বললেন—তুমি কি নাস্তিক, মনোহর?

—নাঃ, না তো—

—তাহলে?

—তাহলে কী?

—তাহলে এমন নাস্তিকের মত কথা বলছ কেন? মা কি হাত দিয়ে ভোগ খান যে নৈবেদ্য কমে যাবে? সিদ্ধেশ্বরী তাঁর মহিমা দিয়ে নৈবেদ্যকে প্রসাদ করে দেন—

জোনাকি জ্বলছে মন্দিরের ওপাশে আসশেওড়ার জঙ্গলে। বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। ব্যাঙ ডাকছে পেছনের ডোবায়, কেমন শান্তি পরিবেশে। মনোহর বলল—ওসব

আপনাদের বানানো কথা, নিজেদের সুবিধের জন্য বানিয়ে নিয়েছেন। রাগ করবেন না ভটচায মশাই, এর ভেতরে যেন কী একটা গোলমাল আছে—

—তুমি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করো না মনোহর? ভগবান মানো না?

একটু চুপ করে থেকে মনোহর বলল—ভোগের বাতাসা আর নৈবেদ্য খাওয়া ভগবান?

—ওটা আমার কথার উত্তর হল না।

—কী জানি। জানি না। আপনি মানেন ভটচায মশাই?

উত্তেজিত হয়ে সাধন বললেন—নিশ্চয়! তিনি সর্বশক্তিমান, করুণাময়—

—তবে মানুষ রোগে কষ্ট পায় কেন? মরে কেন? গরীব খেতে পায় না কেন?

সাধন একটু ইতস্তত করে বললেন—ওসব হচ্ছে কর্মফল।

চাতাল থেকে নামতে নামতে মনোহর হেসে বলল—বেশ কথা, কথার মত কথা। কর্মফল মেনে নিন, দেখবেন আর কোনো দুঃখু নেই, জ্বালা নেই। যাক গে, চলি ভটচায মশাই, অনেক আজেবাজে কথা বলে ফেললাম, রাগ করবেন না—

সিদ্ধেশ্বরীতলা ছাড়িয়ে একটু হাঁটলেই বাঁদিকে রাস্তা থেকে সামান্য ভেতরে হরিপদ কুণ্ডুর বাড়ি। হরিপদ আর সে প্রাইমারী ইস্কুলে একসঙ্গে পড়েছে, খেলাধুলো করে বড় হয়েছে। বছর চারেক আগে হরিপদ হঠাৎ মরে গেল মহকুমা শহরে গাড়ি চাপা পড়ে। এখন বাড়িতে থাকে হরিপদর বউ রাধা আর বারো বছরের ছেলে রামপদ। প্রথম প্রথম বন্ধুর ছেলে-বৌকে কর্তব্যের খাতিরে দেখতে আসতো মনোহর, দোকান-বাজার করে পাঠিয়ে দিত। তারপর তার আসাযাওয়া অন্যরকমের মোড় নিল। রাধার বয়েস বছর চল্লিশ, কিন্তু এখনো তার শরীরের বাঁধুনি অটুট এবং নিজের আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সন্ধেবেলা রামপদ পড়তে যায় মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি, মনোহরই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হপ্তায় দু-একদিন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে ঘণ্টাদেড়েক সময় রাধার কাছে কাটিয়ে যায় মনোহর। রাধাও বেশ নিষেধহীন মেয়ে, স্বামীর উপকারী বন্ধুকে ঘনিষ্ঠতা দান করতে তার আপত্তি নেই। তার লজ্জাহীন ক্ষুধা এখনো জাগ্রত।

হরিপদর বাড়ির রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল মনোহর। আজ সে অনেক আগে দোকান বন্ধ করেছে, কিছুক্ষণ সময় রাধার কাছে কাটিয়েই যাওয়া যেতে পারে। প্রাত্যহিক দিনযাপনে নিজের বউ কেমন যেন পানসে হয়ে গিয়েছে, তাছাড়া কমলা নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, রান্নাবান্না আর সংসার গোছানো ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না। পুরুষের রক্তে ঢেউ জাগাবার ক্ষমতা তার নেই। অপ্রতিরোধ্য সেই আকর্ষণেই এখানে আসে মনোহর।

দরজা খুলে মনোহরকে দেখে হাসল রাধা, বলল—ঠিক জানতাম আজ আপনি আসবেন। ভেতরে আসুন ঠাকুরপো—

একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে মনোহরকে বসালো রাধা। দুহাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে বলল—চা খাবেন তো?

রাধা জানে এই ভঙ্গিতে তাকে উদ্দীপক দেখায়, সে সময় নিয়ে খোঁপা ঠিক করতে লাগলো।

মনোহর আজ চোখ নামিয়ে নিল, বলল—শুধু চা খাবো, আর কিছু না।

—ঠিক আছে, বসুন। আমি চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েই আসছি—

খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসে রইলো মনোহর। ঘরের সামান্য গৃহসজ্জা যত্ন করে সাজিয়েছে রাধা। পুরনো চাদর কেটে সেলাই করে তৈরি বালিশের ওয়াড়, দেওয়ালে

টাঙানো বাঁধাই করা ছুঁচের কাজ। দেওয়ালে বামার লরী কোম্পানির ক্যালেন্ডার, সেটা এ ঘরের পক্ষে বেমানান, বেখাপ্পা। এ ঘরের দেওয়ালে কালিয়দমন বা লাড্ডুর স্তূপের সামনে গণেশের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার বেশি মানায়। এই ক্যালেন্ডার কে দিল রাধাকে? তাহলে কি রাধা মনোহর ছাড়াও অন্য প্রার্থীকে অনুগ্রহ বিতরণ করে থাকে?

ঈর্ষার সামান্য রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। কী এসে যায়? কিছুই তো কিছু না।

চায়ের জল গরম করতে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে রাধা, একেবারে ঘেঁসে। অন্যদিন এ সময় একটু প্রারম্ভিক ফষ্টিনষ্টি করে নেয় মনোহর। আজ তার দিক থেকে বিশেষ সাড়া না পেয়ে রাধা পরিস্থিতি নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করল। এক হাত মনোহরের কাঁধে রেখে অন্য হাত দিয়ে তার মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল—কী হয়েছে ঠাকুরপো? আজ এত গম্ভীর যে?

রাধার শরীরের একান্ত সান্নিধ্য, পরিণত নারীদেহের কস্তুরীঘ্রাণ মনোহরের সুপ্ত বাসনাকে মুহূর্তে জাগিয়ে তুললো। সে এক হাতে রাধার কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে আনলো, রাধা মাথা রাখলো তার কাঁধে, আদুরে বেড়ালের ভঙ্গি তার।

ঠিক তক্ষুনি, নারী ও পুরুষের ঘনিষ্ঠতার সেই সবকিছু ভুলিয়ে দেওয়া শূন্য মুহূর্তে, কে যেন খুব মৃদু অথচ দৃঢ় আদেশের স্বরে বলল—না, না, মনোহর, না—

আবেগের সূক্ষ্ম পরিবর্তন মেয়েরা চট করে টের পেয়ে যায়। রাধা অনুভব করলো মনোহরের হাত তার শরীর থেকে এখনো সরে যায়নি বটে, কিন্তু সেই আলিঙ্গনের মধ্যে ঔদাসীন্য প্রবেশ করেছে। সে ফিসফিস করে বলল—কী হল?

এবার স্পষ্টই সরে গেল মনোহর, বলল—কিছু না, তোমার চায়ের জল হল?

চোখে শঙ্কা নিয়ে চা করতে গেল রাধা। আশ্রয় হারানোর কষ্ট সে জানে।

মনোহরের মনে পড়ে গিয়েছে কমলাকে। সে বেচারী বোকাসোকা, সরল মানুষ, স্বামীর দ্বিচারিতা তার কল্পনাতেও আসবে না। কিন্তু তার সেই সহজ সারল্যে আঘাত করতে পারবে না মনোহর।

অথচ মনোহরের শরীরভরা কামনা উদ্রিক্ত, হাত বাড়ালেই সে পেতে পারে।

হাত লোহার মত ভারী। শরীরে আগুন, মনে আশ্চর্য বিতৃষ্ণা।

দূর ছাই! ভয়ানক রাগ হতে থাকে মনোহরের। কেন এমন হচ্ছে? কেন সে আগের মত হতে পারছে না? কে বাধা দিচ্ছে তাকে? ওই আদেশের কণ্ঠ কার?

চা নিয়ে এল রাধা। মনোহর এখানে আর বেশিক্ষণ থাকবে না, এ লড়াই তার ভাল লাগছে না। কোনোরকমে চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে। রাধা বলল—যাচ্ছ ঠাকুরপো?

—হুঁ, কাজ আছে। এখন আর আগের মত ঘন ঘন আসতে পারব না—

—সে কী! কেন?

—দোকানে কাজ বেড়েছে। তাছাড়া—

কথা শেষ না করে কোমর থেকে খাকি রঙের গেঁজে বের করল মনোহর, গুনে গুনে কয়েকটা নোট নিয়ে খাটের ওপর রেখে বলল—রামপদর পড়ার খরচ ছাড়াও বাড়তি কিছু রইল। যদি নিজে নাও আসতে পারি তবুও কারো হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব প্রতিমাসে। আচ্ছা, চলি—

বাড়ি আসার পথে রাগে বিড়বিড় করতে করতে এল মনোহর—আমার যা ইচ্ছে করব। তাতে বাধা দিচ্ছ তুমি কে বটে হে? ভারি মজা তো!

বৃথা রাগ। যাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তার সঙ্গে যুদ্ধটা হবে কী করে? এ

যেন ছায়ার সঙ্গে লড়াই। তাছাড়া গত একমাসে মনোহর বুঝতে পেরেছে এটা কোনো ধর্মীয় ভাব কিম্বা ভগবানের নির্দেশ গোছের কিছু নয়। সে খুব ধার্মিক লোকও না, ঠাকুরদেবতার মূর্তি দেখলে কপালে হাত ঠেকানোটা অভ্যেসমাত্র, ভক্তির প্রকাশ নয়। তার কি তাহলে কোনো অসুখ করেছে?

এই তো দিন পনেরো আগের ঘটনা। দুপুরের দিকে যখন চারদিক সুনসান, খদ্দেরপত্র নেই, সে সময় পাঁচু মল্লিক তিনচাকা ভ্যানে করে একটা ড্রাম নিয়ে এসে হাজির। একগাল হেসে সে বলল—একটু হাত লাগাও মনোহরদা, মালটা নামাই। চল্লিশ কিলো শেয়ালকাঁটার তেল আছে, দু কুইন্টাল সরষের তেলে মিশিয়ে যা একখানা খাসা মিক্‌চার বানাবো না! দেখে অবাক হবে—

—বলিস কী পাঁচু! দু' কুইন্টালে চল্লিশ কিলো! তোর কি মাথা খারাপ হল নাকি? গন্ধেই তো খদ্দের ধরে ফেলবে—

পাঁচু হাসতে হাসতেই হাতে ধরা থলে থেকে একটা মাঝারি সাইজের লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো বের করে দেখাল।

—কী ওতে?

—ইস্পিশাল এসেন্‌স্‌, কলকাতায় নতুন এসেছে। জলিল মিয়াকে দিয়ে আনিয়েছি। কিলোয় ঠিক দু ফোঁটা করে দিলে ঝাঁজে মাথা ঘুরে যাবে। আসলের চেয়ে ভাল ঠেকবে—

পাঁচুর কথায় নির্ভর করা যায়। সে এই অঞ্চলের নামকরা মিশেলদার। কুইন্টালে দুশো টাকা করে নেয় বটে, কিন্তু মিশেল যা বানায় তা একেবারে চমৎকার।

মনোহর আর পাঁচু ধরাধরি করে ড্রামটা ভ্যান থেকে নামিয়ে দোকানের পেছনে ছোট গুদামঘরটায় নিয়ে গেল। মনোহরের মনে খুব ফুর্তি, দু' কুইন্টাল মাল কাটতে আর কদিন! এবার মোটা লাভ আসবে হাতে।

কোমরে বাঁধা লাল গামছা খুলে মুখ মুছে পাঁচু যখন তেলের ড্রামে হাত দিয়েছে, তক্ষুনি মনোহর অসহায়ের মত বুঝতে পারল—হবে না, এবারেও হবে না। তার মাথার ভেতর, বুকের ভেতর, শরীরের ভেতর কে বলছে—না মনোহর, না মনোহর, না—

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল—না!

তেলের ড্রামের ওপর ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই পাঁচু অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে, বলল—কী হয়েছে মনোহরদা? চেঁচালে কেন?

মনোহরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, কপালে ঘামের বিন্দু। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ভাঙা গলায় সে বলল—না।

বিস্মিত পাঁচু বলল—না? না মানে?

ক্লান্ত, হতাশ, অনিচ্ছুক গলায় মনোহর বলল—আমি মিশেল দেব না।

—দেবে না? পাগল হলে নাকি? কী হয়েছে তোমার?

—কিছু না। এদিকে এসো—

দোকানঘরে এসে তবিল থেকে একটা পঞ্চাশটাকার নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল মনোহর—এই নাও ভাই তোমার ভ্যানের ভাড়া আর মেহনতের জন্য সামান্য কিছু—

পাঁচু অবাক হয়ে তাকিয়েই আছে তার দিকে। মনোহর আবার বলল—নাও, ধরো—

কিছু না বলে নোটটা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলো পাঁচু, বলল—ধরো, ড্রামটা তুলে দাও ভ্যানে। হাত লাগাও—

যাবার সময় একবার ফিরে বলল—কাজটা ভাল করলে না মনোহরদা। পাঁচু মল্লিক

যেখানে ঠেকে, সেখানে দুবার যায় না।

মনোহর কিছু না বলে তাকিয়ে রইল। তার সত্তার একটা অংশ চাইছে পাঁচুকে ডেকে ফিরিয়ে আনতে, আর একটা অংশ অবহেলায় তাকে স্তব্ধ করে রেখেছে, তাকে অমান্য করার ক্ষমতা মনোহরের নেই। অক্ষম মনোহর দেখল পাঁচু চলে যাচ্ছে।

এভাবেই তারপর। তার দু নম্বরি বাটখারার সেটে মরচে পড়ে, বোকা চক্কোত্তি সুদ্ধু সব খদ্দের এক কিলোতে এক কিলো মাল পায়, রাধার বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—কেবল পাগলা তপুকে দিয়ে সময়মত কিছু খরচের টাকা পাঠিয়ে দেয়, পাঁচু মল্লিক আর আসে না।

খামোকাই মা কালী বস্ত্রালয় থেকে কমলার জন্য গেল হপ্তায় একখানা দামি শাড়ি কিনে ফেলে মনোহর। একেবারে খামোকা। কাপড়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় সেই যে কে যেন, সে বলল—কেনো, কমলার জন্য শাড়ি কেনো—

ইস্, ভারি পেয়ে বসেছে তো! চাকরের মত হুকুম তামিল করে চলেছে মনোহর। কিন্তু উপায় নেই, বলেছে যখন কিনতেই হবে। তাও আবার মোটামুটি আটপৌরে না, হাত বারবার চলে যাচ্ছে তসর বা মুর্শিদাবাদ সিল্কের দিকে।

তারপর কিন্তু বেশ লাগে। অপ্রত্যাশিত আদরের উপহার পেয়ে কমলার সরল, নির্বোধ মুখ খুশিতে ভরে ওঠে। মনোহর বলে—এমন সাদামাটা থাকো কেন? একটু স্নো-পাউডার মাখলে তো পারো, ভাল দেখায়—

কমলা হেসে বলে—মাখবো, কিনে দিও তুমি। পাউডার, সেন্ট, টিপের পাতা। দেবে?

মনোহর বলে, তাকে দিয়ে বলায়—দেবো। কালই এনে দেব।

পুরনো জীবনে, পুরনো অভ্যেসের মধ্যে ফিরে যাবার জন্য মনোহরের বুকের ভেতরটা ছটফট করে। পারে না। সব ভুলে যেতে বসেছে সে, ব্যবসার সমস্ত কায়দা, পয়সা উপায়ের রাস্তা। কারো কাছে পরামর্শ চাইবারও নেই। কী বলবে সে? দেখুন, আগে আমি খদ্দেরকে ওজনে ঠকাতাম, তেলে ভেজাল দিতাম, অন্য মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতাম—এসব কিছুদিন ধরে আর করতে পারছি না। কী করা যায় বলুন তো?

ভেবে তার নিজেরই অদ্ভুত লাগল। যাঃ, তাই কি জিজ্ঞেস করা যায় কাউকে?

মাঝে আট-দশদিন বেশ কাটলো, কারো আদেশ বেজে উঠলো না মনের মধ্যে। একটা ভার প্রায় নেমে যাচ্ছিল বুক থেকে। তাহলে কি মুক্তি? তাহলে কি অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যাওয়া?

কিন্তু না, আজ রাত্তিরেই আবার সেই ডাক। মধ্যরাতের এই অন্ধকারে, নক্ষত্রের নিষ্প্রভ আলোয়, বারান্দায় রাখা কাঠের চেয়ারে বসে নিদ্রাহীন প্রহর যাপন করতে করতে চোখে জল এলো মনোহরের। সে ভগবান মানে না, পুজো করে না, কারো কাছে তার কোনো প্রার্থনা নেই। তার জীবনে যা কিছু আছে, তা সবই তার নিজের অর্জিত। তাহলে তাকে কেন এভাবে বেছে নেওয়া? কষ্ট দেওয়া? এত মানুষ পৃথিবীতে থাকতে সে কেন? সে কিছু চায় না, তাকে তার পুরনো জীবনে ফিরে যেতে দেওয়া হোক।

নিমপাতা থিরথির করে কাঁপে মৃদু বাতাসে। শীলপাড়ার দিক থেকে রাতজাগা একটা কুকুরের ডাক ভেসে আসে। ঘরে কমলা ঘুমোয় নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়। বারান্দায় বসে মনোহর একা কাঁদে।

পরের দিন সন্ধেবেলা থলে হাতে হপ্তার বাজার করতে আসে বোকা চক্কোত্তি। মনোহরের দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে বলে—বেশ আছো মনোহর। চালু দোকান,

ছোট সংসার, তোমার আর চিন্তা কী? ফাঁকা আকাশে ঘুড়ির মত গায়ে বাতাস লাগিয়ে উড়ছো। আমাদেরই যত জ্বালা—

সওদা ওজন করতে করতে মনোহর বলে—ভাল বলেছেন, ঘুড়িই বটে। মহানন্দে ভাসছি।

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়, জিজ্ঞাসা করে—লাটাইটা কার হাতে আছে চক্কোত্তিমশাই?

মাই গগ্!

ফোন নামিয়ে রেখে রিনির দিকে তাকিয়ে অম্বর বলল—চক্রবর্তী আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। তুমি চায়ের সঙ্গে কী দেবে একটু ঠিক করে রাখো—

রিনি হাতের তালুতে গাল রেখে বিষাদের প্রতিমূর্তির মত সোফায় বসে ছিল। স্বামীর কথায় মুখ তুলে বলল—আমার হাত-পা অবশ লাগছে। কী হবে আমাদের?

প্যান্টের দু পকেটে হাত পুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অম্বর। তার কপালে চিন্তার কুঞ্চন। চেহারায় ক্লান্তি। সকাল থেকে আসা সব ফোন তাকেই ধরতে হয়েছে, ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। দু একটা ফোন সে কাছে না থাকায় রিনি ধরেছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই 'আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলুন' বলে তাকে রিসিভার ধরিয়ে দিয়েছে। সকাল সাতটা থেকে এই সাড়ে আটটার ভেতর ফোন করেছে অন্তত পনেরো কী ষোলোজন। কয়েকজন সমবেদনা এবং উদ্বেগ জানিয়ে কর্তব্য শেষ করেছে। ঘনিষ্ঠ এবং অতি-উৎসাহীরা এই এলো বলে। তারক চক্রবর্তী, রাজা চৌধুরী, সেনদা, বিভাস মিত্র—আরও কতজন।

ফোন।

প্যান্টের পকেট থেকে একটা হাত বের করে রিসিভার তুলে কানে লাগালো অম্বর।

—হ্যালো।

—কে, অম্বর নাকি? আমি প্রদ্যুম্নদা বলছি—

—বলুন প্রদ্যুম্নদা। ভাল আছেন তো?

—আমি তো ভাল। এদিকে তোমার ব্যাপারে একটা খবর শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। অফ কোর্স, আমি খবরটা ফেস ভ্যালুতে অ্যাকসেপ্ট করিনি। এটা তো পিওর হিয়ারসে। তোমার কাছ থেকে না শোনা পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি না—

—আপনাকে কে জানালো? খুব বেশি কেউ তো এখনো জানেনা।

—এই-রে! তাহলে আমি ফোন করে বোধহয় অন্যায় করলাম। সোর্স কি এক্সপোজ করা উচিত? আমি ভেবেছিলাম সবাই বুঝি জানে। সরি ভাই—

—সরির কিছু না। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা মাত্র। আমরা তো অপরাধী নই।

ওদিক থেকে প্রদ্যুম্ন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। —না না, সে কী কথা! অপরাধী কেন হতে যাবে ভাই? তাই জন্যই তো পুলক বসুকে বললাম—ওই যাঃ! নামটা বলে ফেললাম! যাক গে, পুলককে বললাম—আগে ফোন করে কনফার্মড হই, তারপর অন্য কথা। ঘটনাটা তাহলে সত্যি?

—হ্যাঁ দাদা।

—ইস্-স্-স্। যাক, সাহস হারিও না। আমি সন্ধেবেলা আসছি।

ফোন রেখে ফ্লেয়ার বোলার পেন হাতে তুলে নিল অম্বর। ক্যাবিনেটের ওপর লেখার প্যাড রয়েছে। তার প্রথম পাতায় বাঁদিকে লেখা 'সকাল', ডানদিকে লেখা 'বিকেল'। সকালের কলমে কয়েকটি নাম—টি. চক্রবর্তী, চৌধুরী, মিত্র, সেনগুপ্ত। ডানদিকের কলমে ব্যানার্জী, রঞ্জন বসু, ভবেশ রায় ইত্যাদি। এর নিচে অম্বর লিখল—প্রদ্যুম্নদা।

রিনি বলল—মোট ক'জন হল?

—আপাতত আটজন। আরও হবে।

—ইস্, কী যে বলব এতগুলো লোককে!

অম্বর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল ঘরের ভেতর। টেবিল ক্লথটা একটু টেনে দিল, একটা চেয়ার একটু সোজা করে রাখল। তারপর রিনির দিকে তাকিয়ে বলল—মৌ আজ আসছে না তো? হঠাৎ এসে পড়লে কিন্তু বিপদ। এত লোকের প্রশ্নের ঠেলায় বেচারা কনফিউজ্ড্ হয়ে যাবে—

—না, ও তো কাল বিকেলে আসবে। তোমার বাবাই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন—

বাবার প্রসঙ্গে অম্বরের মুখ একটু কঠিন হল। বাবার দোষেই আজ তাদের এই হেনস্থা।

রিনি বলল—আচ্ছা, এখন আর কোনো উপায় নেই, না? চেষ্টা করে দেখলে—

—উপায় থাকবে না কেন? কিন্তু বাবা তা করতে দেবেন না। জোর করে কিছু করতে গেলে সে আরও বিপদ, বাবার সঙ্গে সম্পর্কই নষ্ট হয়ে যাবে। বাবাকে তো চেনো?

হ্যাঁ, রিনি শ্বশুরমশাইকে বেশ ভাল করেই চেনে। অবিনাশবাবু রাশভাবী চালের সেকেলে ধরনের লোক, নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন। সে আমলের গ্র্যাজুয়েট, সারাদিন বসে বইপত্র পড়েন। বিড়ি-সিগারেট বা পান দোক্তা কিছুরই নেশা নেই, ওই এক বই পড়া ছাড়া। বাদুড়বাগানে নিজস্ব পৈতৃক বাড়িতে থাকেন। দোতলা বাড়ি, স্বামী-স্ত্রীর অতগুলো ঘর কাজে লাগে না। কিন্তু অবিনাশবাবু ঘর ভাড়া দেবেন না কারুকে। বলেন—ভদ্রাসন হচ্ছে মন্দির। মন্দিরে ব্যবসা করতে নেই। তাছাড়া অত টাকার দরকারই বা কী আমার? পেনসন আর জমানো টাকার সুদ থেকে দিব্যি চলে যায়।

অম্বর তার বৌ রিনি আর মেয়ে মৌ-কে নিয়ে অফিসের দেওয়া সাজানো ফ্ল্যাটে থাকে। বাবার সঙ্গে তার কোনো অসদ্ভাব বা মনোমালিন্য নেই। একসঙ্গে থাকলেও অনায়াসেই হত, তবে কোম্পানির দেওয়া সুন্দর ফ্ল্যাট পাওয়া যাচ্ছে—ছাড়ি কেন? এইরকম মনোভাব। অবিনাশবাবুও বেশ কঠিন মানুষ। ছেলেকে ভালবাসেন ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে এসে থাকবার জন্য ছেলেকে সাধ্যসাধনা করবেন না। নাতনীকে খুবই ভালবাসেন, বোধহয় ছেলের চেয়েও বেশি, তাকে মাঝেমাঝেই কাছে এনে রাখেন। যেমন এখন। আর সেই রাখাতেই আজ এই সর্বনাশ।

আপত্তি করবার উপায় নেই, অন্যরকম কিছু ভাববারও উপায় নেই। যেমন জেদী লোক, জমানো টাকা, বাড়ি—সব রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু তা হলে তো চলবে না। অম্বরের ইচ্ছে আছে, ভগবান না করুন, বাবার ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে পড়লে মাকে সে কাছে এনে রাখবে। আর বাদুড়বাগানের বাড়িটা প্রথমে কিছুদিন ভাড়া দিয়ে রাখবে, তারপর বিক্রি করে দেবে কোনো প্রোমোটারের কাছে। টাকাও পাওয়া যাবে অনেক, একটা বড় ফ্ল্যাটও পাওয়া যাবে। বাবা গুরুজন, বলতে নেই, মানুষটার বুদ্ধিসুদ্ধি সুবিধের নয়। ওয়েলথ জেনারেট করার একটা এতবড় সুযোগ হাতের কাছে পড়ে রয়েছে, উনি সে কথা ভেবেও দেখবেন না। পুরনো মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকবেন।

ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল বাজল।

অম্বর রিনির দিকে তাকাল। রিনি নিশ্চেষ্ট বসে আছে। তার মুখে ক্লান্তি, হতাশা আর ক্ষোভের ছাপ। সে এখন উঠে দরজা খুলতে পারবে না। অগত্যা অম্বর এগিয়ে গিয়ে প্রথমে পিপহোল দিয়ে উঁকি দিল। তারক চক্রবর্তী এসেছে। দরজা খুলে সে বলল—আসুন তারকদা।

তারক চক্রবর্তী একটু ফর্মালিটি পছন্দ করেন। চৌকাঠের ভেতরে এসেই বললেন—জুতোটা কি—

—না, না, জুতো খুলতে হবে না। আসুন আপনি। বসুন—

সোফার একপ্রান্তে বসে চক্রবর্তী বললেন—হ্যালো ম্যাডাম, এ ভেরি গুড মর্নিং টু ইউ!

রিনি অস্পষ্টভাবে কী বলল ভাল বোঝা গেল না।

অম্বর লজ্জিত হয়ে বলল—ডোন্ট মাইন্ড হার ম্যানার্স তারকদা, আজ খুব আপসেট হয়ে আছে—

—আরে না, না। আমি বুঝতে পারছি। সত্যিই তো, একটা স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার ব্যাপার—

খুবই অস্বস্তিকর কথাবার্তা। কিন্তু উপায় নেই, সারাদিন ধরে আজ এসব শুনতে হবে। আর নিজেরও কি ভাল লাগছে? বুকের ভেতরটা খামচে খামচে উঠছে না? কত আকাঙ্ক্ষা ছিল, আহ্লাদ ছিল।

তারক চক্রবর্তী বললেন—খবরটা শুনলাম শুভেন্দু মিত্রর কাছে। খুব ভোরে ফোন করে জানাল। বলল—শুনেছ নাকি, এ ভেরি স্যাড নিউজ। অম্বরের তো এইরকম ব্যাপার। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। তারপর তোমাকে ফোন করে কনফার্মড হলাম।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন তারক চক্রবর্তী। একবার অম্বরের, একবার রিনির মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—ওয়েল, আর কি কোনোই উপায় নেই? কান্ট উই মেক দি জেন্টলম্যান সি রিজন?

মাথা নাড়ল অম্বর।—না তারকদা, আপনি বাবাকে চেনেন না। এক কথার লোক—

কথা বলতে বলতে এসে পড়লেন রাখাল চৌধুরী, বিমান সেনগুপ্ত। চা আর খাবার এলো। আলোচনার সূত্রে জানা গেল সেনগুপ্তর ছেলে লিটন ভর্তি হয়েছে সেন্ট স্টিফেনস্-এ, চৌধুরীর মেয়ে পম্পি কারমেল-এ, চৌধুরীর ছেলে বাপন সিক্স থেকে সেভেনে উঠতে দারুণ ফল করেছে লা মার্টিনিয়ার-এ।

অম্বর আর রিনি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ঘর থমথমে।

সারাটা দিন কাটল অতিথি সামলে। সমবেদনা ভাল, কিন্তু একের পর এক মানুষ এসে আহা-উহু করলে ব্যথার জায়গায় বারবার খোঁচা লাগে।

রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ বাড়ি একটু ফাঁকা হল। ডিভানে হাতের ওপর মাথা রেখে রিনি শুয়ে আছে, প্যান্ট-শার্ট খুলে পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে সোফায় বসে টেবিলে পা তুলে সিগারেট ধরিয়েছে অম্বর। এমন সময় আবার কলিং বেল।

'ওমাঃ আর পারিনা।' বলে ডিভানে নেতিয়ে পড়ল রিনি। বিরক্তমুখে উঠে গিয়ে অম্বর পিপহোলের ফুটো দিয়ে তাকাল, তারপরেই সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে এসে অ্যাশট্রেতে

সিগারেটটা গুঁজে দিতে দিতে বলল—এই, ওঠো। তোমার বাবা-মা এসেছেন!

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল অম্বর। শ্বশুর রথীন লাহিড়ী ভয়াবহ সাহেব, ঘরে ঢুকেই জ্বলন্ত চোখে জামাইয়ের দিকে তাকালেন, তারপর পাইপ কামড়ে ধরে বললেন—ওঃ, শেম!

অম্বর লালমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের বেগে আরও অনেক কিছু বলে গেলেন লাহিড়ী, পাইপের ডাঁটি কামড়ে থাকায় তার অর্ধেক বোঝা গেল না। শাশুড়ি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ডিভানে বসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন—এতও তোর কপালে ছিল মা!

রিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

লাহিড়ী সাহেব পাইপ মুখে বলছেন—আই কুউন্ড্ বিইভ্! হাউ কুৎ ইক্ হ্যাকেন?

তিনি বেশ কিছুদিন একটানা রেগে আছেন। বড় সখ ছিল মারুতি চালাবেন, ভুঁড়িতে স্টিয়ারিং ঠেকে যাওয়ায় সেই পুরনো অ্যামবাসাডর চালাতে হচ্ছে। এতেই রাগ।

শাশুড়ি রিনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—সব তো এখনো শুনিনি মা, খবর পেয়েই দৌড়ে চলে এসেছি। খুলে বল তো, মৌকে কোথায় ভর্তি করলেন বেয়াইমশাই?

ভেজা গলায় রিনি বলল—কত আশা করেছিলাম মা, মেয়ে বাড়িতে ইংরিজিতে কথা বলবে, ইংরিজিতে স্বপ্ন দেখবে, বাংলায় কথা বলতে গেলে ভুল করবে—যেমন ওর বন্ধুদের ছেলেমেয়েরা সবাই। তারা কেমন সুন্দর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে মা—

—মৌ-কে কোথায় ভর্তি করল তোর শ্বশুর?

কাঁদতে কাঁদতে রিনি বলল—বলতে মুখে আটকাচ্ছে মা, ক্ষীরোদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়! ভেবে দেখো, এবার থেকে তোমার নাতনী বাংলায় কথা বলবে!

লাহিড়ী সাহেব বললেন—মাই গগ্! মাই গগ্!

কলের পুতুল

বাড়ি ফিরে অমল বুশশার্টটা খুলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখছে, এমন সময় চায়ের কাপ হাতে ছায়া এসে বলল—আজ যাবে?

চায়ে চুমুক দিয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল—কোথায়?

—বারে! তুমি ভুলে গেছ? কতদিন থেকে বলছি। আজ টুটুলের মাস্টারমশাই আসবেন না, কোথায় নাকি বরযাত্রী যাবার কথা আছে। ওকে নিয়েই বেরুই চল, কাল বৃহস্পতিবার। ওরিয়েন্ট এম্পোরিয়াম বন্ধ থাকবে—

ওরিয়েন্ট এম্পোরিয়াম শুনে অমলের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। চায়ে আর একটা চুমুক দিয়ে সে বলল—ও, তোমার সেই মিক্সার গ্রাইন্ডার!

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সামনের চেয়ারে বসে ছায়া বলল—আমার গ্রাইন্ডার! জিনিসটা কিনলে আমার একার উপকার হবে?

ছায়ার গলায় তর্কের আভাস। স্বামী-স্ত্রীতে এই বিষয় নিয়ে এর আগে কয়েক প্রস্থ যুক্তি বিনিময় হয়ে গিয়েছে। ছায়া বলেছে—কত সময় বাঁচে বলো তো? আজকাল তোলা কাজের লোক পাওয়া যায় না, যদি বা পাওয়া যায় তারা বাটনা বাটতে চায় না। এতে

কোনো ঝামেলা নেই—জিরে মরিচ হলুদ যাহোক নিয়ে বৌলে ভরে দিয়ে সুইচ টেপো, বাস্! দু-মিনিটে মশলা তৈরি। এই বিজ্ঞানের যুগে নতুন আবিষ্কারের সুযোগ নেব না কেন বলতে পারো?

না। অমল বলতে পারে না। সত্যিই তো মানুষের সুবিধা করে দেবার জন্য এসব যন্ত্রের সৃষ্টি, মানুষ সে সুবিধা নিলে দোষ কী?

চায়ের কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে অমল বলল—চল তাহলে, ঘুরেই আসি। একদম ফিরে স্নান করব—

রিক্সায় করে শান্তিবাজারের দিকে যেতে যেতে ছায়া নরম গলায় বলল—তুমি রাগ করেছো আমার ওপর, না? কেন বল তো? তোমাকে আমি মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না। দেখো, তুমি অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পাও বলে গ্যাস নিলাম না। সেই সাবেকি ঘুঁটে-কয়লায় রান্না চালাচ্ছি। আমার কি একটু ঝাড়া হাত-পা হতে ইচ্ছে করে না? আজকাল গিন্নীদের কাজ সহজ করে দেবার জন্য কত রকম জিনিস বেরিয়েছে। বিলেতে আমাদের মত মধ্যবিত্ত সংসারেও কাপড় কাচার মেশিন ব্যবহার করে, তা জানো?

মহিলাদের জন্য আজকাল অনেক রঙচঙে পত্রিকা বেরিয়েছে। তার থেকেই ছায়া এসব খবর সংগ্রহ করে। অমল ম্লান হেসে ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি রাগ করিনি তো। আসলে প্রত্যেকের সব বিষয়ে একটা ব্যক্তিগত মত থাকে। আমি ছোটবেলা থেকে বাটনা বাটতে, ঘুঁটে সাজিয়ে উনুন ধরাতে দেখেছি আমার মাকে। কাপড়কাচা কলের কথা তখন কেউ শোনেও নি। মার কিন্তু কোনো অভিযোগ ছিল না, সুখী মহিলা ছিলেন—

ছায়া অসহিষ্ণু গলায় বলল—সে সময় তো এসব আবিষ্কারই হয়নি। সে কারণে কারো মনে এসবের জন্য চাহিদা ছিল না।

—ঠিক তাই। কাজেই বুঝতে পারছ বাজারে এসব জিনিস না থাকলে চাহিদাও থাকত না। তা সত্ত্বেও মানুষ সুখে থাকতো. কবিতা লিখত, বাগান করত, গান গাইত। এ চাহিদার কোনো শেষ নেই ছায়া—

ছায়া রাগ করে বলল—রিক্সা ঘোরাতে বলো, আমি যাবো না।

—এই দেখো, তুমি আবার রাগ করছ। আমি কী কিনব না বলেছি?

—না, আমার দরকার নেই।

টুটুল বাবার কোলে বসে অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। অমল বলল—ছি। এত রাগ করে না। রাস্তার লোক তাকিয়ে দেখছে। চলো—

দোকানে পৌঁছে কিন্তু ছায়ার মত ভাল হয়ে গেল। সুদৃশ্য কার্পেট, সান-মাইকার প্যানেল আর আয়না দিয়ে সাজানো দোকান। শো-কেসে কত আশ্চর্য জিনিসের সজ্জা। চাহিদা তৈরি না হয়ে উপায় কী?

—ইস্, রঙীন প্রেসার কুকার বেরিয়েছে, দেখেছ? উনুনের আঁচে কালো হয়ে যাবে না, ন্যাকড়া দিয়ে জোরে ঘষে দিলেই আবার ঝক্‌ঝকে।

ছায়া শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে জিনিসপত্র দেখছে, টুটুল বাবাকে হাত ধরে টেনে দোকানের অন্যদিকে নিয়ে গেল।

—দেখো বাবা, এইখানে ওরা খেলনা রাখে। এই যে চাকাওয়ালা কামানটা দেখছ? এটা কিন্তু আসলে ব্যাটারীতে চলে। একটু যায়, দাঁড়িয়ে পড়ে, দুম দুম করে কামানের

আওয়াজ হয়—তারপর আবার চলে। ভেতরে যন্ত্র আছে। কেমন সুন্দর, না?

তারপর বাবার মুখের দিকে করুণচোখে তাকিয়ে বলল—কিনে দেবে বাবা? তুমি অনেকদিন আমাকে কিছু কিনে দাও না—

টুটুলের বয়সে অমল গাছের ডাল আর ন্যাকড়ার বল দিয়ে হকি খেলত। তবে ছেলের আর দোষ কী? দিন বদলাচ্ছে—

—দেব বাবা, আজ তো বেশি টাকা নেই সঙ্গে। তোমার মা তাহলে জিনিস কিনতে পারবে না। পরে দেব, কেমন? আজ বরং তুমি চুয়িং গাম কেনো—

নতুন ঘটি কিনলে মানুষ বারবার জল খায়। রাত্তিরে বিছানা করে মশারী টাঙিয়ে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে ছায়া বলল—শুনছো, একটু শুয়ে ছেলেকে গল্প বলো না, আমি চট করে কালকে রান্নার মশলাটা গুঁড়িয়ে রাখি—

টুটুল ওদিকে সরে গিয়ে বাবার জন্য জায়গা করে দিল। অমল ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—মানুষের গল্প শুনবি বাবা?

বাবাকে টুটুল মায়ের চেয়ে বেশি পছন্দ করে, বোধহয় সারাদিন বিশেষ কাছে পায় না বলেই। তার অবশ্য ইচ্ছে ছিল অন্য গল্প শোনার। তবে বাবা যখন বলছে মানুষের গল্পই হোক।

অমল বলল—দেখ, মানুষ চিরদিন এইরকম দেখতে ছিল না, বুঝলি? এক ধরনের বাঁদর থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পরিবর্তন হতে হতে মানুষের আবির্ভাব। মানুষ তো প্রথমে চাষবাস জানত না, তাই তাকে বনের জন্তু শিকার করে আর গাছের ফলমূল পেড়ে খেতে হত। ক্রমে মানুষ চাষ করতে শিখল। তাতেও কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। সেই আদিম মানুষরা বিজ্ঞান জানত না, তাদের কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না—কাজেই শুধু খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকবার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। কখনই বা তারা গান গাইবে, কবিতা লিখবে আর ছবি আঁকবে। সময় কই? অথচ মানুষ তো শুধু খাওয়ার জন্য বাঁচে না।

টুটুল বলল—তারা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করল না কেন?

—করল তো? কাজের বোঝা হাল্‌কা করে আসল দিকে যাতে মন দিতে পারে সেজন্য কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ কেবল নানারকম আবিষ্কার করেই আসছে। এখন মজাটা কী দাঁড়িয়েছে জানিস?

—কী?

—এখন আরাম পাওয়াটা মানুষের নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কী করে কাজ আরও সহজ করা যায়, শরীরটাকে আরও আরামে রাখা যায়—নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছেই—হচ্ছেই—

একটু থেমে অমল বলল—কিন্তু আসল ব্যাপারটাই চাপা পড়ে গেল। কাজ কমে গেলে ভাবা গিয়েছিল মানুষ নিজেকে আর উন্নত করার চেষ্টা করবে, ভাল ভাল কাজে মন দেবে। হল তার উল্টো, এখন এইসব আরাম পাবার জিনিস কেনবার জন্য মানুষকে রাতদিন খাটতে হয়। সবারই চাই তো, কাজেই প্রতিযোগিতা খুব বেশি।

এ গল্প টুটুলের ভাল লাগল না। তার চোখ বুঁজে এসেছে দেখে অমল বলল—তুই ঘুমো। কাল তোকে শেয়াল আর ধোপার গল্পটা বলব—

ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে।

রান্নাঘর থেকে মিক্সার-গ্রাইন্ডার চলার যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছে।

আজ অফিস যাবার সময় ট্রেনের মধ্যে সুশান্ত রায় বলছিল—শুনেছেন দাদা, আমেরিকানরা ক্লেম করছে তাদের স্পাই স্যাটেলাইটে এমন টেলিস্কোপিক ক্যামেরা বসিয়েছে যে, রাস্তায় একটা জামার বোতাম পড়ে থাকলেও তিনশো মাইল ওপর থেকে সেটাকে ক্লোজ আপে ধরতে পারবে—

বারীনবাবু বুড়োমানুষ, রিটায়ার করার পর কী একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করেন। তিনি বললেন—বাঃ, অমন ক্যামেরা হয় নাকি?

সুশান্ত অনেক খবর রাখে, সে উত্তেজিত হয়ে বলল—হয়না? বলছেন কী বারীনদা? পৃথিবী কত এগিয়ে গিয়েছে জানেন? আপনাদের গরুর গাড়ি, মোমবাতি আর পাটের দড়ির দিন আর নেই। জার্মেনীতে সামনের বছর থেকে একরকম ট্রেন চালাবে, তার চাকা রেললাইন ছোঁবে না, পুরো গাড়িটা শূন্যে ভেসে থাকবে। তাকে বলে ম্যাগনেটিক লেভিটেশন। আরও কত কত আবিষ্কার। দেখছেন কী, এই ইন্ডিয়াকেই আমরা কেমন বদলে দিই দেখুন না। দশ বছরের মধ্যে প্রত্যেকের মোটরগাড়ি থাকবে। শুধু তাই? আইজাক্ অ্যাসিমভ বলেছেন কুড়ি বছর পরে মধ্যবিত্তরাও বাড়ির কাজের জন্য রোবট সাহায্যকারী কিনতে পারবে—

ছায়া ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

—যাই বলো হলুদটা এত মিহি গুঁড়ো হল যে বলবার কথা নয়—একেবারে পাউডারের মত। জিনিসের মত জিনিস কেনা হল একটা—

ছায়াও ঘুমিয়ে পড়ে একসময়। অমল জেগে থাকে।

এই পৃথিবীতেই কোথায় যেন খড়ের চালে ঝরে পড়ত বৃষ্টিধারা। বাবলা ফুলের গন্ধে আকুল গ্রামের পথের বাঁকে মিলিয়ে যেত হাটফেরতা গরুর গাড়ি। জ্যোৎস্নারাতে শালবনে কবির দল গাইত বসন্তের গান। সরল মানুষ নিজের দু-হাতের শ্রমের ওপর নির্ভর করে জোগাড় করত ক্ষুধার অন্ন।

রাত্রির আকাশ জুড়ে মিক্সার-গ্রাইন্ডার চলার শব্দ।

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরতে গিয়ে অমলের বুকের মধ্যে শব্দ হল—ঠুন্।

সেকি! তার শরীরের ভেতরের হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, লিভার সব লোহার হয়ে গেল নাকি? সে নিজেই যন্ত্র হয়ে গেল? পৃথিবীর সব মানুষই এইরকম হয়ে যাচ্ছে আজ রাতে?

সারারাত ধরে পাশ ফিরল অমল। তার বুকের মধ্যে থেকে ভেসে আসতে লাগল লোহালক্কড় গড়িয়ে যাবার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ।